প্রবাসী
ইতিহাসের ধারা

প্রথম খণ্ড

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন। কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৯০

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ শিল্পী
সোমনাথ ঘোষ

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১-৬৯৮৯

জে এন. ঘোষ অ্যান্ড সন্স
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
দূরভাষ : ২২৪১-৬৪৭০/২২৪১-৭৫১৯

মুদ্রণ
কালার ইন্ডিয়া
১/১বি, চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কোলকাতা-৭০০ ০১২

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির
শ্রেষ্ঠ গবেষক-লেখক

অধ্যাপক স্বপন বসু-কে

নিবেদন

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশনার প্রবাহে *প্রবাসী* দিকচিহ্নপ্রতিম। বস্তুত বিশ শতকের প্রত্যুষে প্রকাশিত এই সাময়িকপত্র বাঙালির রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বাঁকবদলের কালবিন্দুকেই যেন চিহ্নিত করে রেখেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিপুল অর্জন নিশ্চিত হয়ে গেল, রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগাঢ় দেশচেতনার নানা স্রোত-প্রতিস্রোত যেভাবে উন্মথিত হল, সংস্কৃতির অন্য নানা আঙিনা যে সোনালি ফলনে সমাকীর্ণ হল, তার প্রতিভাস মিলে যাবে *প্রবাসী*-র অক্ষরসমারোহে, অলংকরণ, অঙ্গসজ্জা, আলোকচিত্র ও চিত্রবহুলতার আয়োজনে। *প্রবাসী* এবং তার জন্মদাতা ও স্বপ্নদ্রষ্টা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রায় সমার্থক শব্দ। *দাসী*, *প্রদীপ* বা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত *মডার্ন রিভিয়্যু*—এগুলিও রামানন্দ-জীবন ও মননের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত থাকলেও *প্রবাসী* নামের সঙ্গে রামানন্দ নামের সমীপবর্তিতা বুঝি পূর্বতন দৃষ্টান্তগুলির তুলনায় অধিকতর নিবিড়। *প্রবাসী* প্রকাশনার পূর্বে সম্পাদনাকর্মে তাঁর দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্ব ছিল, সম্পাদকের বৃত্তি ও যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা ছিল, সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পকলা, রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ছিল। এসবের ধারাবাহিক প্রতিফলন পাওয়া যাবে *প্রবাসীর* পাতায়-পাতায় বছরের পর বছর।

প্রবাসী থেকে চয়ন করে বিবিধ প্রসঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট রচনা সংকলিত হল গ্রন্থাগারে। এই কাজটি সম্পাদন করেছেন প্রাজ্ঞ গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং অধ্যাপক সুদীপ বসু। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর রসবোধ ও গবেষণাকর্মে প্রাবীণ্য এবং অধ্যাপক সুদীপ বসুর বিদ্যোৎসাহী উদ্যম এই সংকলন বাস্তবায়নের পথে আমাদের প্রভূত সহায়তা করেছে।

দ্বিতীয় প্রচ্ছদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রগান *প্রবাসী*-র উদ্দেশ্যে রচিত। পাণ্ডুলিপিচিত্র শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষের সহৃদয় সৌজন্যে পাওয়া গেছে।

প্রথম খণ্ডে সংকলিত হল সাহিত্য ও বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—বাংলা সাহিত্যের এই তিন মহাবৃক্ষপ্রতিম ব্যক্তিত্বের সাহিত্যকৃতি বিষয়ে বহুল রচনা যেমন এই পর্বে সংকলিত হল তেমনই দীনেশরঞ্জন দাশ অবধি বাংলা সাহিত্যের বহু কৃতী লেখক ও কর্মীর উদ্যোগ-উদ্যমের সাক্ষ্যও *প্রবাসীর* পাতা থেকে গ্রন্থিত হল এখানে। বিজ্ঞানপর্বে জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে একাধিক রচনা যেমন সংকলিত হল তেমনই বাঙালির

বিজ্ঞানসাধনা ও বিজ্ঞানসাহিত্যসাধনার পথরেখাও অনুধাবন করতে পারবেন একালের পাঠক।

পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশেও আমাদের আগ্রহ ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আশা করি এই সংকলন বাঙালি পাঠককে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার বিষয়ে উদ্দীপিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

প্রাক্‌কথন

গ্রন্থনামে আছে *প্রবাসী*-তে ইতিহাসের ধারা। এই নাম কতখানি যথার্থ তা যাঁরা *প্রবাসী*-র পঞ্চাশ বছরের পৃষ্ঠা ওলটাবেন তাঁরাই উপলব্ধি করবেন। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং সমাজজীবনের নানা অন্ধিসন্ধিতে *প্রবাসী* সম্পাদকের মন প্রবেশ করেছে এবং সেসকল বিষয়ে নানা লেখকের নানা রচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের লেখা **বিবিধ প্রসঙ্গ**-ও ছিল। এই গ্রন্থে আমরা প্রধানত **বিবিধ প্রসঙ্গ**-র রচনাগুলি থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেছি। সংকলনকালে 'ইতিহাসের ধারা' কথাটি স্মরণ করে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে পরিবর্তমান সামাজিক জীবনের রূপের উপর। রবীন্দ্রনাথ যখন *প্রবাসী*-র প্রথম কবিতাতে বলেছিলেন, "প্রবাসী স্বদেশী হবে!—এক পরিবার/সব নর নারী!—বিশ্ব একই সংসার", তখনই তিনি *প্রবাসী*-র জাতিচরিত্র নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। নামে *প্রবাসী* থাকলেও অচিরকালে *প্রবাসী* বিশ্ববাসী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশাত্মবোধ ও বিশ্বাত্মবোধ উভয়ের পরিচয়ই *প্রবাসী*-তে মিলবে। এই গুরুপরিচয় আমাদের এই নির্বাচনে কতখানি প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছি, তার বিচারের ভার পাঠকসাধারণের উপর।

সংকলিত রচনাগুলির বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনো একরকম রীতি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাবে কোনো বিভাগের ভিতরে উপ-বিভাগও করা হয়েছে। সেখানে অবশ্য কালানুক্রমিক বিন্যাস আছে। তবে একই ব্যক্তি সম্বন্ধে একাধিক রচনা গৃহীত হলে কালভঙ্গ করে সেগুলিকে একত্র করা হয়েছে।

কোন্ বিভাগে কোন্ ব্যক্তি বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়ে আমাদের বিশেষ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। দৃষ্টান্ত : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিরাট পণ্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক, শিক্ষাব্রতী, সেইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের লেখক। সাহিত্য বিভাগেও তিনি যেতে পারতেন। কিন্তু বাকি দুটি বিষয় উপযুক্ত গুরুত্ব পেত না। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে **শিক্ষা ও সংস্কৃতি**-র অন্তর্গত **জ্ঞানব্রতী শিক্ষাব্রতী** বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রবাসী-র বানান সম্পর্কে বলা দরকার যে, মূল রচনার বানান যথাসাধ্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কখনো-কখনো দেখা গেছে, *প্রবাসী*-তে মুদ্রিত একই রচনার মধ্যে বিশেষ একটি বানানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্তমান। সেক্ষেত্রে যে বানানটি যেমন, তেমনই রাখা হয়েছে। তবে '**প্রাসঙ্গিক কথা**'য় বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত বানান বজায় আছে। ব্যতিক্রম—'ঞ্চ', 'দ্ধ'; 'ঞ্চ'-এর পরিবর্তে 'ঞ্চ' এবং দ্ধ-এর পরিবর্তে 'দ্ধ'।

এই গ্রন্থের ছবিগুলি প্রবাসীর পুরাতন জীর্ণ কীটদষ্ট বিবর্ণ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত। সেজন্য উপযুক্ত চিত্রমান নেই। দু-একটি ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে উৎস নির্দেশ করা আছে।

এই সংকলনের ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার, হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গ্রন্থাগার এবং ওই ইনস্টিটিউটের স্বামী বিবেকানন্দ আর্কাইভ্‌স-এর। সকল গ্রন্থাগারের কর্মীরাই সানন্দে সহযোগিতা করেছেন।

এই গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রকাশনা-সম্পাদক শুভময় মণ্ডলের উদ্যোগ ভিন্ন সম্ভব হত না।

গ্রন্থারম্ভকালে বিশেষ সাহায্য পাওয়া গেছে শ্রীমতী অভয়া দাশগুপ্তের কাছ থেকে। তা ছাড়া সহায়তা করেছেন সুনীলবিহারী ঘোষ, লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, স্বপন মজুমদার, ড. প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, সুনীল দাস, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অরুণ ঘোষ, সুজাতা রাহা, মৌসুমী বসু, অনিন্দিতা বসু, দেবদত্ত গুপ্ত, নিলয় রায়, শঙ্খ বসু প্রমুখ।

সূচি

সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্য সাহিত্যিকগণ

সাহিত্যের নানা কথা

সাহিত্যের শ্রেয় রূপ ও প্রবাসী প্রসঙ্গ —

ভাষা প্রসঙ্গ —

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন —

গ্রন্থ-সমালোচনা

বিজ্ঞান

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর বৈজ্ঞানিক শিষ্যবৃন্দ —

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক —

বিজ্ঞানের নানা কথা —

সাধারণ ভূমিকা

১ ❖ প্রথম আক্রমণেই দুর্গাধিকার

> তেরোশো আট বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে নিদাঘ সূচনায় একজন অশ্বারোহী প্রয়াগধাম হইতে কলিকাতার অভিমুখে—।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাটকীয় সূচনার অনুকরণ এইখানেই সাঙ্গ করা যাক, যদিও অনুকরণের কারণ নেই তা নয়। বস্তুতপক্ষে বলবার কথা হল, ১৩০৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে এক প্রবাসী বাঙালি, এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার (কলেজ) অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ থেকে মালিক-সম্পাদকরূপে একটি বাংলা মাসিক পত্রিকা বের করলেন। পত্রিকাটি সে-ই কলকাতায় এসে পৌঁছোল যা তখন সারা ভারতের রাজধানী, প্রাচ্যের এথেন্স অভিধায় ভূষিত, জ্ঞানে গরিমায় আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলনে তরঙ্গায়িত, যেখান থেকে কিছু-বেশি দেড় দশকের মধ্যে বিদায় নিয়েছেন কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যেখানে তখনও জীবিত আছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সংগঠক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনায় ও অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে সৃষ্টিশীল গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিম গোলার্ধে আলোক বিচ্ছুরণের পরে শেষ-রশ্মি বিকিরণকারী স্বামী বিবেকানন্দ, নব নব দিগন্তের অভিমুখিন বরেণ্য প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ। সময়টি তখনই। সে হেন সময়ে, অভিমানী ও অহংকারী বাঙালিকে প্রবাস থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতির বার্তাবাহী পাঠিয়ে জয়ঘোষণায় চমৎকৃত করা—ব্যাপারটা বিস্ময়কর বই-কি।

প্রচ্ছদেই মাত। তাতে গোটা ভারতের নানা ধর্মের মানুষের ভাবসাধনা ও শিল্পসাধনার আশ্রয় মঠ-মন্দির, চৈত্য-বিহার, মহল-মিনার ও প্যাগোডার ছবি। লেখকদের মধ্যে এসে গেছেন—রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রমুখ। স্বয়ং সম্পাদক রামানন্দ অতি বিনয়ে পশ্চাদ্‌অপসরণ করেননি—দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন—'অজন্টা গুহা চিত্রাবলী'—বহুসংখ্যক চিত্রে সজ্জিত। বিষয়ের মধ্যে এসেছে—কাব্য, সাহিত্যতত্ত্ব, ভ্রমণকাহিনি, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, বিজ্ঞান—এবং রামানন্দর বিখ্যাত 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। বাকি রইল গল্প উপন্যাস, শনৈ শনৈ যাদের আগমন ঘটবে।

প্রবাসী হয়েও বঙ্গবাসীর জন্য পত্রিকা? সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসী বাঙালিরা সে দর্প সহ্য করবে কেন? রামানন্দকে আশ্বস্ত করতে রবীন্দ্রনাথের উদার মহান স্বস্তিবচন এসে পৌঁছোল 'প্রবাসী' কবিতা নাম ধরে—এবং তা বেরুল একেবারে প্রথম সংখ্যাতে :

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

সুতরাং—

"প্রবাস কোথাও নাহি-রে নাহি-রে জনমে জনমে মরণে।"

রবীন্দ্রনাথ নামক কবি-বিধাতা ললাটে জন্মপত্রিকা লিখেছেন—এই গুরু ভাগ্য নিয়ে প্রবাসীর আবির্ভাব।

পরবাসী হয়ে রামানন্দর প্রাণ হয়তো কাঁদছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর কলমে তুলে নিয়ে কিনা জানি না, দেবেন্দ্রনাথ সেন 'আবাহন' কবিতায় দীর্ঘ বিলাপ করেছেন মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতার ভঙ্গিতে :

"এ বিদেশে, এ প্রবাসে, আমি গো প্রবাসী;
প্রাণ কাঁদে, হতাশে, নিরাশে! হে ভারতি,
এস, এস আজি। কল্পনা-কুসুম, সতি,
কৌতুকে সুহস্তে লয়ে; গালভরা হাসি
মুখে; নয়ন-কিরণে সৌভাগ্য প্রকাশি;..."

সেইসঙ্গে বিহারীলালের সারদামঙ্গল ও রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভার ভাবানুকরণও দেবেন্দ্রনাথ করেছেন :

"এস মা, কবির নেত্রে সহসা উদয়
অফুরন্ত ফুলবীথি হয় গো যেমতি,
কানন-দুর্গমে! ভক্ত-সাধক-হৃদয়
করি উচ্ছ্বসিত, ইষ্ট-দেবতা-মুরতি
হয় যথা আবির্ভূত! বন্ধ্যারে যেমতি
করি পুলকিত, করি শঙ্খধ্বনিময় গৃহাঙ্গন,...
আমি কাঁদি এ প্রবাসে; কোথা মা গো তুমি?
লও মোরে ক্রোড়ে তুলি, নেত্রজল চুমি!"

সদ্‌-ব্রাহ্ম রামানন্দ স্বয়ং পরমেশ্বরের কৃপাভিক্ষা করেছেন সূচনা-অংশে :

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা 'প্রবাসী' প্রকাশ করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকলে বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে।

পরমেশ্বরের 'কৃপা' অবশ্যই, তবে সেইসঙ্গে পরমেশ্বরের জীব 'লেখক ও পাঠকবর্গের সহানুভূতি

ও সাহায্য'ও চাই। তার প্রার্থনাও জানিয়েছেন। তবে আত্মবিশ্বাসী মানুষ তিনি। ফলেন পরিচীয়তে। সুফল সৃষ্টিতে স্থিরপ্রত্যয় রামানন্দর সংযত নিবেদন :

> প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভালো। এইজন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।

যথাকালে এই নীরবতা তিনি ভঙ্গ করবেন।

প্রকাশের পর *প্রবাসী*-র বার্তা নিবেদিতার কানে পৌঁছেছিল। কিন্তু *প্রবাসী* তো কেবল বাঙালির জন্য। *প্রবাসী*-র প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়েও, ঈর্ষাতুর আকাঙ্ক্ষায় নিবেদিতা বলেছিলেন—রামানন্দ কেন ভারত ও বিশ্বে প্রসারিত হবেন না? কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষিতিমোহন সেন নিবেদিতার মুখে সে-কথা শুনেছেন :

> এই যে একটি প্রদীপ জ্বলিল দেখিলাম, অপরিসীম তাহার শক্তি। ...বুঝিলাম, এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশপ্রদীপ হইবে।... শুধু বাংলার কথা বলিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাঁহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং জগতের কথাও তাঁহার ভুলিলে চলিবে না। তিনি বাঙালী, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী। [১]

শুরু থেকেই *প্রবাসী* নানা মহলের প্রশংসায় ভূষিত। প্রশস্তিকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখরা ছিলেন।

২ ❀ নোঙর ছিঁড়েছিলেন...

প্রশংসার স্রোতে নোঙরে টান পড়েছিল। কিন্তু অবিলম্বে পুরো নোঙর ছিঁড়তে পারেননি। স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য আরও কয়েক বৎসর প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে। সেইকালে নিজ সামর্থ্যের যাচাই-পর্ব চলবে। তার অন্তে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তখনকার হিসেবে মোটামুটি ভালো মাইনের কলেজীয় অধ্যক্ষ-পদে ইস্তফা দিয়ে রামানন্দ *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ*—এই দুই চাকার গাড়িতে দেশ-বিদেশ পরিক্রমণের সিদ্ধান্ত করলেন।

জন্মগত সামথ্য তাঁর ছিল। বাঁকুড়া শহরে এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে ২৮ মে ১৮৬৫, তাঁর জন্ম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন; প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে, বস্তুদর্শনে বাল্যাবধি ঝোঁক ছিল; বৃত্তি পেয়েছেন নিয়মিত, ১৮৮২ সালে এনট্রান্স পরীক্ষায় চতুর্থ, তারপর ফার্স্ট আর্টসে প্রথম বিভাগে চতুর্থ, বিএ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম এবং ইংরেজিতে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে চতুর্থ। অর্থাৎ দেদীপ্যমান ছাত্রজীবন।

রামানন্দ প্রেমিক-প্রকৃতির মানুষ। অপরিসীম তাঁর মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম এবং সাংসারিক দায়িত্ববোধ। সুন্দরী পত্নী মনোরমাকে—তাঁর সাধের 'মুনুটিকে'—তিনি "বড্ড ভালবাসতেন।"[২] ঈশ্বরপ্রেমও ছিল। বাঁকুড়ায় শিক্ষক কেদারনাথ কুলভীর প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হয়, কলকাতায় এসে শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রেরণায় হিন্দু-ব্রাহ্ম হয়ে ওঠেন।

বিএ পাস করার পরে সিটি কলেজে প্রথমে অবেতন, পরে সবেতন অধ্যাপনা করেছেন। ছাত্রাবস্থায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ঐতিহাসিক রচনাদি, তাঁকে দেশপ্রেমের প্রেরণা দিয়েছে। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানও করেছেন। সব জড়িয়ে তখন একটি সুসংগঠিত জীবনবোধে সম্পন্ন যুবক তিনি।

প্রবাসী-র সম্পাদক হবার মতো সযত্ন প্রস্তুতিসাধনা রামানন্দর ছিল। তিনি যেমন অশিক্ষিত পটু নন, তেমনই নন অপ্রস্তুত কর্মবীর। জলে ঠেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেউ বিজয়ী সাঁতারু হয়ে পড়ে, এমন দিব্য প্রতিভায় রামানন্দর বিশ্বাস ছিল না। তাই পুরো চাকরি করার সময়েই সম্পাদনা করে গেছেন বেশ কয়েকটি ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকা। বুঝে নিয়েছেন পত্রিকা চালাবার কার্যরীতি— মূলধন-সংগ্রহ, লেখক-সংযোগ, ছাপাখানার সঙ্গে বোঝাপড়া, প্রচার-ব্যবস্থা—এ সবই সম্পাদনার সঙ্গে জড়িত।

সাত বছরের মতো সিটি কলেজে পড়ানোর (১৮৮৮-'৯৫) মধ্যে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি সাপ্তাহিক *ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার*-এর সহকারী সম্পাদক, বাংলা পাক্ষিক *ধর্মবন্ধু*-র সম্পাদক (১৮৯০ থেকে), শিশুদের মাসিক *মুকুল* পত্রিকার অন্যতম প্রধান আয়োজক, দৈনিক *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য-লেখক, কৃষ্ণকুমার মিত্রের সাপ্তাহিক *সঞ্জীবনী*-র অন্যতম প্রধান লেখক (সম্পাদকীয়সুদ্ধ)।

সম্পাদকরূপে তাঁর প্রথম আত্মস্থ আবির্ভাব ব্রাহ্মসমাজের কিছু মানুষের দ্বারা সংগঠিত সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান 'দাসাশ্রম'-এর মুখপত্র *দাসী* পত্রিকার মধ্য দিয়ে। তারপর রামানন্দ সিটি কলেজের চাকরি ছেড়ে এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। সেখানে *প্রদীপ* পত্রিকার সম্পাদনাসূত্রে তিনি সম্পাদক-জীবনের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়েছেন বলা যায়। রামানন্দ তাঁর বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ দাসের এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দুই বৎসর দুই মাস। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে *প্রদীপ*-এর প্রথম সংখ্যায় রামানন্দ মাসিক পত্রিকায় ভরা দেশে আবার নতুন মাসিক কেন, তার জবাব দেন আত্মবিশ্বাসীর যোগ্য গর্বে : "প্রদীপকে আমরা যেরূপ কাগজ করিতে চাই তদ্রূপ বাংলা কাগজ একটিও নাই।" "আড়ম্বরের বিরোধী" হলেও তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, "সংসারে মানুষের অনুশীলনীয় যতগুলি বিষয় আছে তৎসমুদয়ের সর্ববিষয়ক প্রবন্ধ প্রদীপে থাকিবে।" সে প্রতিশ্রুতি তিনি যথাসম্ভব রক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকদের রচনায় (রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে *প্রদীপ*-সূত্রেই রামানন্দর প্রথম সম্পর্ক স্থাপন) সমৃদ্ধ এই পত্রিকায় "শ্রীম-লিখিত রামকৃষ্ণ কথামৃত বোধহয় প্রথম অংশবিশেষে বাহির হয়।" চিত্রকলার প্রতি রামানন্দর গভীর আসক্তি—*প্রদীপ*-এ নানা ধরনের ছবি বেরিয়েছে। বাংলায় জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখা প্রবেশ করুক, এই কামনা করে রামানন্দ *প্রদীপ*-এর বৈশাখ ১৩০৫ সংখ্যায় লিখেছিলেন :

> কেবল কবিতা ও গল্প লিখিয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করা শুভলক্ষণ নহে। চেষ্টা করিলে সকলে সুকবি বা উৎকৃষ্ট গল্প-লেখক হইতে পারেন না। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকল শিক্ষিত লোকই চলনসই গদ্য-প্রবন্ধ লিখিতে পারেন।[৩]

এই আহ্বান বিফল হতে দেবার ইচ্ছা রামানন্দর ছিল না।

প্রদীপ-সম্পাদনায় রামানন্দ যতদিন পুরো স্বাধীনতা পেয়েছিলেন ততদিন সানন্দে সে-কাজ করেছেন। ক্রমে দেখলেন তাতে টান ধরছে—উত্তর দিলেন পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে। নিজ মর্যাদাকে রামানন্দ মূল্য দিতেন।

প্রদীপ তো ছেড়ে দিলেন। কিন্তু রামানন্দ যে—ঈশ্বর, পত্নী এবং পত্রিকা—এই তিন প্রেম ভিন্ন বাঁচতে পারেন না। ঈশ্বর অলক্ষ্যে, পত্নী সকাশে, কিন্তু পত্রিকা এখন করচ্যুত। অথচ পত্রিকা চাই-ই, যাতে থাকবে অলক্ষ্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং সান্নিধ্যগত পত্নীর সহায়তা।

রামানন্দ স্থির করলেন—এবার নিজের পত্রিকা বের করবেন—করলেন—প্রবাস থেকে প্রকাশিত বলে 'প্রবাসী'। প্রথম সংখ্যা বেরোল বৈশাখ ১৩০৮ (এপ্রিল ১৯০১)।

প্রদীপ ঘিরে রামানন্দ অনেককিছুর কল্পনা করেছিলেন। কিছু সফল হয়েছিলেন, আরও কিছুর চেষ্টা যখন করছেন—ছেদ এল। ইতিমধ্যে তিনি নিজ শক্তির মাপ খানিক বুঝে নিয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁর মজ্জাগত, পত্রিকার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণসাধনের অভিপ্রায় তাঁকে তাগিদ দিচ্ছে—এর পূরণ একমাত্র হতে পারে কোনো পত্রিকার স্বত্বাধিকারী-সম্পাদক হলে। বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে এ-ও বুঝেছিলেন, পত্রিকার আয়ু নির্ভর করে আর্থিক সামর্থ্যের উপর—এবং উপযুক্ত লেখকগোষ্ঠীর রচনা সংগ্রহের শক্তির উপর। খালি পেটে যদি ধর্ম না হয় তাহলে সাহিত্য তো হয়ই না, সুতরাং লেখকদের যথাসাধ্য পারিশ্রমিক দিতে হবে (এই ইচ্ছা দাসী পত্রিকাতে প্রকাশ করেছেন আগেই), অন্তত কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যেন লেখকদের ত্যাগব্রতের উপদেশ না দেয়। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়নি, কাঞ্চনস্নেহে মানুষের মন সহজে তৈলাক্ত হয় এবং তার ঔজ্জ্বল্য বজায় থাকে সৌহার্দ্য ও মনোযোগের সুখ-মর্দনে।

আরও নানা দিক থেকে পত্রিকা চালাবার গুণ তাঁর আয়ত্তে ছিল। মেধা, পাণ্ডিত্য ও রচনাশক্তির কথা আগে বলেছি। সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তিনি নানা শ্রেণির মানুষের সঙ্গে শান্ত মর্যাদায় মিশতে পারতেন, প্রবাসে থাকার জন্য গড়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, কংগ্রেসি কাজকর্মের সঙ্গে জীবনের এক পর্বে যুক্ত থাকায় আন্দোলনমূলক রাজনীতির চেহারা চিনতেন। এইসব কারণে তাঁর পত্রিকা কেবল বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকেনি, ভারতদর্শনও হয়ে উঠেছিল। এবং সংগৃহীত বৈদেশিক সংবাদের পরিবেশননৈপুণ্যে বিশ্বের ঝাঁকিদর্শনের সুযোগ দিয়েছে। সম্পাদক মানুষটি যুগপৎ প্রবাসী ও দেশবাসী। *প্রবাসী* যখন দেশবাসী হয়েছিল, তার পরেও তিনি প্রবাসের বাড়িটিকে রক্ষা করেছিলেন। আরও গুণলক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল। দৃঢ় আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে দিয়েছিল সংগ্রামী মনোভাব। আবার আদর্শনিষ্ঠার সঙ্গে আদর্শের ঘ্যানঘ্যানানির পার্থক্য করতে পারতেন বলে নিজ সম্প্রদায়ের অনেক নিরেট-নিষ্ঠাবানের মতো নিজেকে বৃহত্তর হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়েছিল মালিক-সম্পাদকের নিঃসপত্ন কর্তৃত্ব এবং বেতনভুক সম্পাদকের দপ্তুরি কার্যকারিতা।

৩ ঌ আমি বঙ্কিমচন্দ্র নই, আমি রবীন্দ্রনাথ নই, আমি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্গভূমে বাংলা ভাষায় এতাবৎ প্রকাশিত নামিদামি সাময়িকপত্রিকার সংখ্যা কম নয়, সম্পাদকদের মধ্যে মহাপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তাঁরা তাঁদের পত্রিকার আদর্শ ও চরিত্র সম্বন্ধে যথাসম্ভব বলেছেনও, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অপর এক মহাপ্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বোত্তম সম্পাদক এবং তিনি *বঙ্গদর্শন*-এর পত্রসূচনায় (পরেও) পত্রিকার নীতিনির্ণায়ক যেসব কথা বলেছেন তাদের অপেক্ষা সুরচিত রচনার কথা আমরা তো ছার, স্বয়ং রামানন্দও জানতেন না।

১৩৪৫ শ্রাবণ সংখ্যার *প্রবাসী*-তে রামানন্দ লিখলেন :

> বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন শিক্ষিত বাঙালীর মনকে যে এতবেশি আলোড়িত করিতে পারিয়াছিল, তাঁহার প্রতিভা তাহার কারণ বটে; এবং তখন এরূপ মাসিকপত্রের নূতনত্বও একটি কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। তাহার মধ্যে একটি এই যে, কাগজ চালানো তাঁহার ব্যবসা ছিল না। তিনি পেশাদার সম্পাদক বা সাংবাদিক ছিলেন না। তাঁহাকে কোনো ধনী স্বত্বাধিকারী বা কোম্পানির মুখের দিকে তাকাইয়া বা তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কাগজ চালাইতে হয় নাই। (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৪৫)।

বাংলার সাময়িকপত্রিকার আয়ুক্ষীণতার প্রসঙ্গে রামানন্দ একই সংখ্যায় আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার কথা তুলেছেন। ইংল্যান্ডে যেখানে শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত পত্রিকাসমূহ আছে, সেখানে বাংলা পত্রিকার শিশুমৃত্যু হয় কেন? বাঙালির পক্ষে কারণটি অরুচিকর। "জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্যিক প্রতিভা, দল বাঁধিবার ও দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিবার শক্তি, বাঙালীদের মধ্যে এইসব গুণ ও শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা সন্দেহের বিষয়; কেননা তাহা হইলে বঙ্গদর্শন ও সাধনার মতো কাগজ উঠিয়া যাইত না।"

রামানন্দ বিশেষভাবে অবহিত করাতে চাইলেন এই বিষয়টি :

> মনে হইতে পারে বটে, সম্পাদকতা করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাশালী লোক তো বরাবর পাওয়া যাইত না সুতরাং অন্য কোনো ব্যাঘাত না ঘটিলেও কেবল উপযুক্ত সম্পাদকের অভাবেই কালক্রমে বঙ্গদর্শন ও সাধনা উঠিয়া যাইত। তাহা ভুল। ইংরেজি যেসব সাময়িকপত্র বিলাতে বহু বৎসর ধরিয়া, শতবর্ষেরও অধিককাল ধরিয়া, সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে, ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাই তো তাহার সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছেন না। যাঁহারা সম্পাদকতা করিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ সাহিত্যজগতের সাধারণ লোক। বাস্তবিক, সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকিলেও সাময়িক পত্রিকা চালানো যায়।

এর পরে সরাসরি নিজের কথায় এসে গেলেন :

> তাহার প্রমাণের জন্য বিলাত যাইবার দরকার নাই। আমাদের দেশের অন্য সম্পাদকের কথা বলিতে পারি না, নিজের কথা বলিতে পারি। বর্তমান অগ্রহায়ণ সংখ্যা সমেত দুইশতখানি প্রবাসী ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে নিয়মিতরূপে বাহির হইল। আমাদের সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভা এবং রচনানৈপুণ্য না থাকা সত্ত্বেও আমরা যে নানাপ্রকার বিঘ্ন বাধার মধ্যে দুই শত মাস ধরিয়া কাগজ

> চালাইতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভা না থাকিলেও মাসিকপত্র চালানো যায়। প্রবাসীর বয়সের উল্লেখের অন্তত এইটুকু প্রয়োজন আছে। (অগ্রহায়ণ ১৩২৪)।

সুতরাং, আমি রামানন্দ যখন কথা বলছি তখন হে বঙ্গবাসী, তোমাদের শোনার প্রয়োজন আছে।

৪ আরও কিছু দাবি ও গর্বের ঘোষণা

রামানন্দ তো বলে দিলেন, সাদামাঠা পরিশ্রমী বিচক্ষণ সম্পাদক হলেই পত্রিকা চলে যায়, কিন্তু অন্যত্র একবার সম্পাদকের পক্ষে দরকারি যেসব গুণাবলির ফিরিস্তি দিয়েছিলেন তা পড়লে যে-কোনো সম্পাদকের বুক ধক্ করে উঠবে :

> সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সম্পাদকদের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান (Political Science), সমাজতত্ত্ব (Sociology), ব্যবস্থা-বিজ্ঞান (Jurisprudence), অপরাধতত্ত্ব (Criminology), নানা লৌকিক ও বৈষয়িক ব্যাপারের সাংখ্যিক তত্ত্ব (Statistics)/বার্তাশাস্ত্র, পৌর ও জনপদবর্গের অধিকার ও কর্তব্য (Civics), নানা দেশের গ্রামের শহরের ও সমস্ত দেশের সার্বজনিক কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয় তাহার বৃত্তান্ত, নানা দেশের শিক্ষার, শান্তিরক্ষার ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিবরণ, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির উপায় প্রভৃতি জানা আবশ্যক। (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)।

বাপ্ রে! একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার সম্পাদককে নিজের মধ্যে পুরতে হবে!! এবং দেহধারী রামানন্দ ভিন্ন কারও পক্ষে ওইসব জ্ঞান একসঙ্গে ধারণ করা সম্ভব নয়। রামানন্দ অবশ্য বলেছেন, "আমি অল্পই জানি", কিন্তু তিনি "হাল ছাড়িয়া দিয়া কেবল শূন্যগর্ভ মুরুব্বিয়ানা এবং ফাঁকা প্রশংসা নিন্দা বা গালাগালিকেই...একমাত্র হাতিয়ার" করে বসে থাকতে রাজি ছিলেন না। অপরকে "হ্যান করো ত্যান করো" উপদেশ দিয়ে নিজে 'ঈশ্বরের উপর নির্ভরতার' দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকাতেও তাঁর মতি ছিল না। যারা ঈশ্বর-প্রদত্ত শক্তির ব্যবহার করে না, তাদের ঈশ্বরবিশ্বাস "বিশ্বাস নামের যোগ্য নহে।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)।

আত্মবিশ্বাসী মানুষের রক্তের রসায়ন--গর্ব ও গৌরববোধ। তদনুযায়ী রামানন্দ *প্রবাসী*-র চৈত্র ১৩৪৭ সংখ্যায় পত্রিকাটির কয়েকটি বিশিষ্টতার উল্লেখ করেছিলেন। *প্রবাসী* বিষয়ে যাঁরা লিখতে চাইবেন তাঁদের পক্ষে এমন উপকারী গুণ-সূচি আর মিলবে না। আমরা জেনেছিলাম, এই পত্রিকা একই ব্যক্তির সম্পাদনায় একদম বন্ধ না হয়ে চল্লিশ বৎসর বেরিয়েছে; নব্যভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে; প্রাচীন ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য-বিষয়ে নিয়মিত স-দৃষ্টান্ত রচনা প্রকাশ করেছে; দেশের সর্বপ্রকার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক, শিক্ষাগত বিষয়ের পর্যালোচনা করেছে; 'পঞ্চশস্য', 'বেতালের বৈঠক', 'কষ্টিপাথর', 'মহিলা মজলিশ', 'ছেলেদের পাততাড়ি', 'আলোচনা' প্রভৃতি বিভাগ প্রকাশ করে গেছে; কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকাদিও প্রকাশ করেছে, বলাই বাহুল্য।

৫ একটি সানন্দ ব্যর্থতা

বলা বাহুল্য, ব্যর্থতা আমাদেরই।

ভাবা হয়েছিল, *প্রবাসী*-র রচনাগুলির বিষয়-পরিচয় এবং লেখক-পরিচয় দেওয়া হবে। সম্পূর্ণত তা করা সম্ভব নয়।

যাই হোক, বিষয়ের দিকে নজর দিয়ে শিহরিত হতে হয়েছে।—বঙ্গদেশ এবং ভারত এত বৃহৎ ও বিচিত্র! তার ঐশ্বর্যের শেষ নেই এবং তার দারিদ্র্য অপরিমেয়; আকাশছোঁয়া উচ্চতার পাশেই নরকপ্রবেশ নিম্নতা। ভারতবর্ষ দিতে পারে কত কী, শিখতে পারে আরও কত— চিত্রগুপ্ত রামানন্দর নির্দেশে তার বিবরণ যেন লেখা হয়েছে *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠাগুলিতে। হৃদয়, মস্তিষ্ক ও হস্তের পূর্ণাঙ্গ বলাধানের ব্যবস্থা ছিল এই পত্রিকায়। সর্বোপরি সম্পাদকের 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। এক প্রেমিক অথচ নিরপেক্ষ মানুষ যেন জাতীয় জীবনের ডায়েরি লিখে গেছেন—এক-একটি 'প্রসঙ্গ' ওই ডায়েরির এক-একটি পৃষ্ঠা।

লেখকদের নামের হিসাব নেবার চেষ্টা করার সময়ে দেখা গেছে, স্বয়ং সম্পাদক ভাবীকালের শ্রমকুণ্ঠ অনিসন্ধিৎসুদের (শব্দটা ব্যাকরণসিদ্ধ তো?) উপকারের জন্য ১৩৪৭ সালের চৈত্র মাসে *প্রবাসী*-র লেখকবর্গের একটি তালিকা (কিছু অসম্পূর্ণ) প্রকাশ করেছেন—তাতে লেখকসংখ্যা ৩৫৪। সাহিত্যের চতুর্ভুজ ব্রহ্মা রবীন্দ্রনাথসহ এ-দেশের প্রায় সকল কবি, কথাসাহিত্যিক ও মনীষী-প্রাবন্ধিকের লেখা *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে—লক্ষণীয় ব্যতিক্রম কেবল শরৎচন্দ্র। সেই নামগুলি নাড়াচাড়া করলেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আশি ভাগের কথা বলা হয়ে যাবে। সে-কাজ করা আমাদের সাধ্যাতীত।

তবু এই প্রসঙ্গে দু-একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

প্রবাসী-র এক মহাসম্পদ ভ্রমণকাহিনিগুলি। সত্যকার ভ্রমণকাহিনি কাকে বলে জানতে হলে *প্রবাসী*-র ওইসব লেখা পড়ে নেওয়া উচিত। ইদানীং ভ্রমণকাহিনির মানে দাঁড়িয়েছে—রসালো আত্মচরিতের খণ্ডাংশ। অপরপক্ষে প্রবাসীর ভ্রমণকাহিনি-লেখকদের দায় ছিল—ভ্রমণস্থানের ভৌগোলিক রূপ, সেখানকার লোকজনের আচার-ব্যবহার, ধর্মকর্ম ইত্যাদির তথ্যমূলক বিবরণ দান। আর ওসব বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রমাণ হল ছবি—তাই অনেক ছবি চাই। ছবি তোলার খরচ সম্পাদক দেবেন, এমন প্রতিশ্রুতি তিনি ছাপার অক্ষরে দিয়েছিলেন।

প্রবাসী-র ইতিহাস-বিষয়ক লেখাগুলির আলোচনা করতে গেলে অরণ্যে পথ হারানো মূঢ় বালকের মতো আঁকুপাঁকু পথসন্ধান হয়ে দাঁড়াবে। তা করার প্রয়োজন নেই। কেবল বলা চলে, কেউ বাংলায় ইতিহাসচর্চার চর্চা করবেন অথচ *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠা ওলটাবেন না, তিনি নির্ঘাত ট্রেন থেকে বেণিমাধবের ধ্বজা দেখে কাশীদর্শন সাঙ্গ করেছেন ধরে নিতে হবে।

শিল্প-প্রসঙ্গও প্রায় বিনা আলোচনাতে বাদ থাকবে। অন্যত্র এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথায় আলোচনা আছে। *প্রবাসী*-র প্রথম সংখ্যা থেকেই ছবির ঢল। অজন্তা গুহা সম্বন্ধে স্বয়ং সম্পাদকের লেখা দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ তাঁর দৃষ্টির দিকদর্শন করিয়ে দেয়। রবি বর্মার অজস্র ছবি ছেপে, তাঁর বিষয়ে লিখে, তাঁকে বাংলার মনোজগতে রামানন্দই স্থাপন করেছেন। তারপর নিবেদিতার প্রভাবে নব্যবাংলার চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি কী শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন, সে-বিষয়ে বেশি বলার প্রয়োজন

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। | বৈশাখ, ১৩০৮। | ১ম সংখ্যা

সূচনা

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা "প্রবাসী" প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। বঙ্গদেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, সকল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং পাঠকবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা কর্ম্ম দ্বারাই কার্য্যের বিচার হওয়া ভাল। এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।

আবাহন

এ বিদেশে, এ প্রবাসে, আমি গো প্রবাসী
প্রাণ কাঁদে, হতাশে, নিরাশে! হে ভারতি,
এস, এস আজি। কল্পনা-কুসুম, সতি,
কৌতুকে সুহস্তে পরে; প্রাণভরা হাসি
মুখে, নয়ন-কিরণে সৌভাগ্য প্রকাশি;
মোহন শ্রবণমূলে রক্তোৎপল দুল,
ঝলমল্ ঝলমল্ বাসন্তী দুকূল;
এস, বিশ্ববিমোহিনি, লয়ে রূপরাশি।
এস মা, এস মা আজি, ঊষা যথা আসে,
আলোক-আবীর-রাশি ঢালি, হাসি, হাসি
অরুণের শিরে!—আসি যথা পৌর্ণমাসী
খুলি দেয় জোৎস্না-ফোয়ারা!—বিশ্ব ভাসে
আনন্দ-সলিলে! লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া!

এস মা, কবির মেত্রে সহসা উদয়
অদৃশ্য ফুলবীথি হয় গো যেমতি,
কানন-দুর্গমে! ভক্ত-সাধক-হৃদয়
করি উচ্ছ্বসিত, ইষ্ট-দেবতা-মূরতি
হয় যথা আবির্ভূত। বহ্যাত্রে যেমতি
করি পুলকিত, করি শঙ্খধ্বনিময়
গৃহাঙ্গন, আঁধারেতে জ্বালি শত জ্যোতি,
জননী-উৎসঙ্গে শোভে সুন্দর তনয়;
শিশু যবে, গৃহ ছাড়ি, পথ হারাইয়া,
হয়, আহা! ভয়-ত্রস্ত, ক্রন্দন-আকুল,
মা তাহার, পশ্চাতে, এলাইয়া চুল,
উন্মাদিনী-প্রায়, লয় বাহুতে তুলিয়া;
আমি কাঁদি এ প্রবাসে; কোথা মা গো তুমি?
লও মোরে ক্রোড়ে তুলি, নেত্রজল চুমি!

৩

বহুদিন পাই নাই শেফালীর বাস;
বহুদিন শুনি নাই কোকিল-কাকলী!

প্রবাসী-র প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র • বৈশাখ ১৩০৮

প্রবাসী

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফিরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারি নি তাদের আপনা করিতে,
তারা নিশি দিশি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

তৃণে পুলকিত সে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমারে ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা'কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির জনমের ভিটাতে?

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা।
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে।
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস?
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস?
নিঃশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির আহ্বান আনিছে।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে।

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে।
মিথ্যার ঘেরে, ছোট কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।

রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতা • বৈশাখ ১৩০৮

প্রথম ভাগ। বৈশাখ, ১৩০৮। প্রথম সংখ্যা।
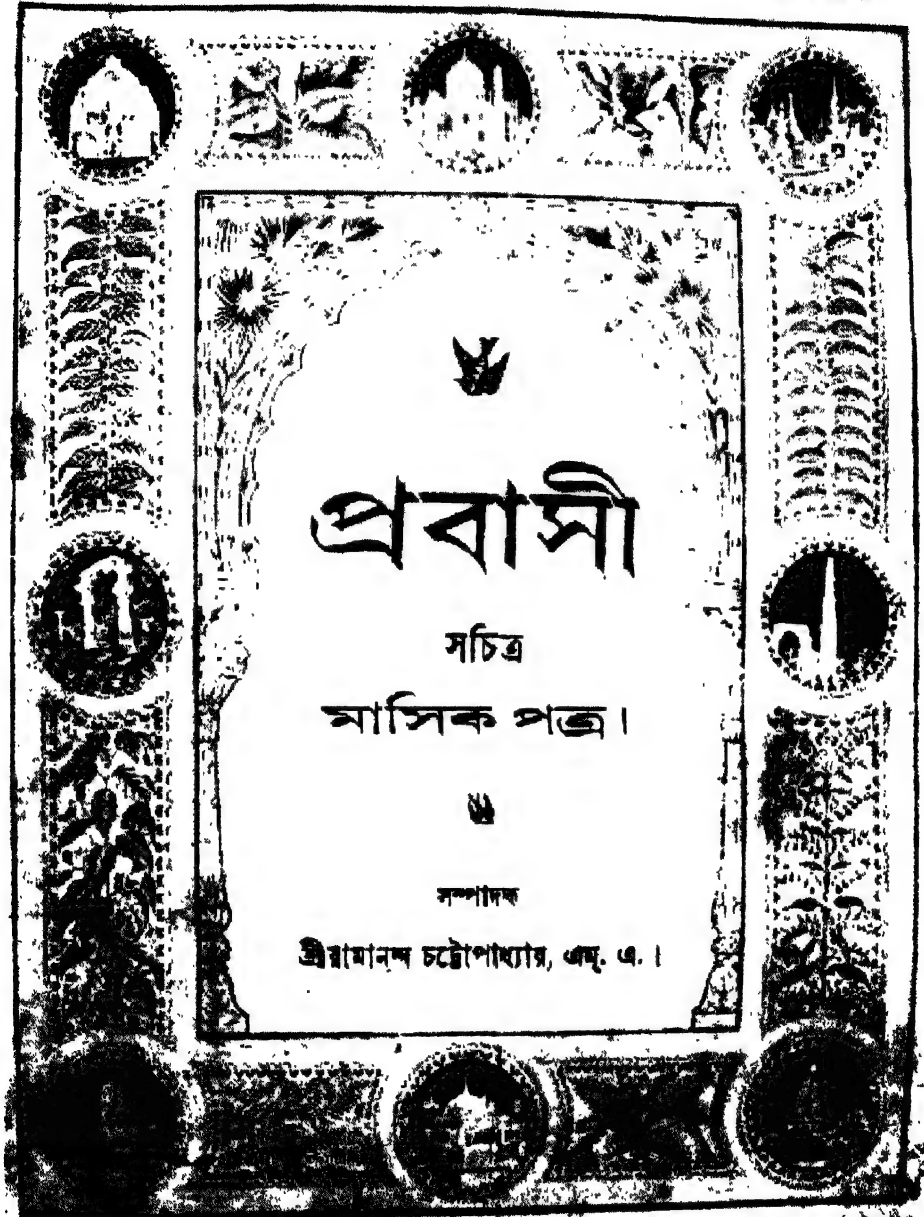
প্রবাসী প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ • বৈশাখ ১৩০৮

জন-হিতৈষণা-বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

দাসী পত্রিকার প্রচ্ছদ

প্রথম বৎসর

১২৯৯ আষাঢ় হইতে ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত

তৃতীয় ভাগ　　　অগ্রহায়ণ, ১৩০৭　　　১২শ সংখ্যা

যাঁহারা অবিলম্বে ৪র্থ বর্ষের মূল্য পাঠাইবেন, তাঁহারা রবীন্দ্র বাবুর সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থাবলী ৩৲ স্থলে ২॥০ টাকায় পাইবেন। পুস্তক অতি অল্পই আছে। ন্যূন মূল্যে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

প্রদীপ পত্রিকার প্রচ্ছদ

উইন্টারনিৎস-রামানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-লেজনি • ফাল্গুন ১৩৪৩

প্রবাসীর ক্রোড়পত্র

শ্রীরবীন্দ্র-জয়ন্তী

(কবিবরের ৭০ বৎসর পূর্ণ-হওয়া উপলক্ষে)

এই উৎসব ২৫শে বৈশাখ প্রাতঃকালে শান্তি-নিকেতনের আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সকলে সমবেত হইলে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবার পর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বরচিত নিম্নমুদ্রিত কবিতা পাঠ করেন।

জ্যোতির্জিত্বরমুৎস্বজন্তমশিবঃ কর্মাত্তিরেমমজঃ
জাতো যত্র রবিঃ পুমাংসি তিরয়ন্ সর্বং সমুদ্ভাসয়ন্ ।
পাপ্মানং বিনিপাতয়ন্ প্রতিপদং ভদ্রং সমুদ্ভাবয়ন্
ভূয়াদ্ ভাগ্যযো রবেরবিরতং বিশ্বস্য ভব্যং মহম্ ।
ভেদো যত্র ন বস্তুতোঽস্তি ভুবনে প্রাচী প্রতীচীতি বা
মিত্রত্বং প্রকটীকৃতং চ সততং যেনাত্মনঃ কর্মণা ।
বিশ্বং যত্র পদং প্রসিদ্ধমনিশং সত্যো চ যস্য স্থিতি—
দীর্ঘায়ুস্তস্য জয়ো রবেরবিরতং তেনাস্তু তুষ্টং জগৎ ॥

অতঃপর কবির রচিত "তুমি আমাদের পিতা" গানটি গীত হয়। তাহার পর কবি-আবাহন প্রভৃতি পরে পরে মুদ্রিত অনুষ্ঠানগুলি হয়। গানগুলি সমস্তই কবির রচিত। মন্ত্রগুলি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও অনুবাদিত। সেগুলির সানুবাদ আবৃত্তি তিনিই করেন। কতকগুলি মন্ত্রের উচ্চারণ আশ্রমের হিন্দীশিক্ষক এবং কয়েকটি ছাত্রছাত্রীও করিয়াছিলেন।

চীনদেশের চারিজন ভদ্রলোক ও একটি মহিলা তাঁহার জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কবি যিনি তিনি স্বরচিত চৈনিক কবিতা সুর করিয়া পড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। যিনি চিত্রকর তিনি একটি উৎকৃষ্ট চিত্র উপহার দেন।

বৃক্ষরোপণ ও প্রপা উৎসর্গের পর কবি যাহা বলেন, তাহা মুদ্রিত হইল। বক্তৃতান্তে তিনি তাহারই প্রপূর্তি স্বরূপ তাঁহার তিনটি কবিতা পড়েন। প্রথমটি "কবি-পরিচিতি" নামক সদ্যপ্রকাশিত পুস্তকে ছাপা হইয়াছে। অন্য দুটি হস্তলিখিত খাতা হইতে পঠিত হয়। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এই আশীর্ব্বাদ পাঠ করেন :—

এষ ত্বাং সবিতা দিনোতু ভগবান্ যজ্জ্যোতিরাবীপ্যতে
ত্বাং শান্ত্যাশ্রম দেবতা ভগবতী নিত্যং প্রসন্নাশয়া ।
জীব ত্বং শরদাং শতং স্ফুটতরং বিশ্বস্য পঙ্ক্তিবৎ
ভূপ্যাদ্বেত্তজনারতং চ ভুবনং শান্তিং সবামাগতম্ ॥

মন্ত্র-সংগ্রহ *

তুমি আমাদের পিতা
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হ'য়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা হে দেব দূর ক'রে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা
তোমা হ'তে সব ভালো
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার ॥

কবি-আবাহন

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ
দীপ্যমান দিব্য মন লইয়া, হে বাণীর অধিপতি,
আবার আমাদের মধ্যে এসো।

* মন্ত্রগুলি সবই অথর্ব-বেদ হইতে সংগৃহীত।

চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরের অষ্টপঞ্চাশতম বাৎসরিক উৎসবের
সভাপতি রামানন্দ, বক্তা : রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও অন্যরা • শ্রাবণ ১৩৩৮

রামানন্দ-এলম্‌হার্স্ট-ক্ষিতিমোহন • মাঘ ১৩৪৫

নেই। দেশের সেরা শিল্প-বিশেষজ্ঞদের লেখা তাঁর পত্রিকা অলংকৃত করেছিল। নব্যশিল্পীদের অজস্র রঙিন ছবি ছেপেছেন, তার জন্য গালাগাল খেয়েছেন প্রচুর, কিন্তু শরজাল বুকে নিয়েও অবিচলিত থেকেছেন। শেষ পর্যন্ত যখন ঢলে পড়লেন তখন সামনে যে শিখণ্ডী ছিল তার নাম বয়স। কিন্তু তাঁর শান্তিপর্বের মৃদুবচনে এই সত্যের ঘোষণা পেয়ে যাই—দেশ-জাগরণের সঙ্গে শিল্প-জাগরণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; শিল্পকে বাদ দিলে তোমার দেশসৌধ হয়ে উঠবে ইটের পাঁজা—তা হবে না কোনো শ্রীনিকেতন।

৬ ❀ সমাজ—কার সমাজ?

প্রবাসী সম্পাদকের মনে যদি এই প্রশ্ন উঠে থাকে, তার উত্তরও আছে। সমাজ বলতে তিনি কেবল এক বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সমাজ বুঝতেন না। উচ্চবর্গের মানুষেরা সমাজের অন্তর্গত অবশ্যই, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখদের নিয়ে। এই ক্ষেত্রে রামানন্দ বঙ্কিমকেও ছাড়িয়ে আদিম অরণ্যের মনুষ্যমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর পত্রিকা অতুলনীয়। ভারতীয় মহাজাতি বলতে আমরা সাধারণত কিছু উচ্চবর্গীয় মানুষকে বুঝে থাকি, যদিও সোচ্ছ্বাসে আবৃত্তি বা গান করি, "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন শক-হূণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" বিবেকানন্দের সমাজদৃষ্টি আরও গহনে প্রবেশ করেছে, যেখানে ভারতের ইতিহাসকে "এক নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা" বলে অভিহিত করে, তার মধ্যে তিনি সুমাত্রার অর্ধ-বানর, ডোলমেন, পাথরের অস্ত্র-ব্যবহারকারী, পত্রসজ্জাকারী, মৃগয়াজীবী, গুহাবাসী ও নেগ্রিটো-কোলারীয়দের পর্যন্ত ধরেছেন—দ্রাবিড়, আর্য, তাতার, মঙ্গোল, পারসিক, গ্রিক, ইয়ুংচি, হূন, চিন, সীথিয়ান, ইহুদি, আরব, স্ক্যান্ডিনেভীয় জলদস্যু ও জার্মান বনচারী দস্যুদল তো ছিলই। (স্বামীজির 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ কারও কথাতেই বিশেষ কান দেওয়া হয়নি। রামানন্দ ছিলেন কানের শল্যচিকিৎসক। তাই তাঁর পত্রিকা কয়েক দশক ধরে সমাজবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতের আদিম অধিবাসী, বিভিন্ন উপজাতি ও নরগোষ্ঠীর সংবাদ শিক্ষিত মানুষের গোচর করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেসব সংবাদ বিদগ্ধ পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক লাগার কথা নয়—তবু প্রবাসী তেমন বহুসংখ্যক দীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ ছেপে গেছে। সেই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে শিক্ষিত সাধারণের ঔদাসীন্যের প্রমাণ—'আলোচনা' বিভাগে ওদের বিষয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই নেই। এক্ষেত্রে উৎসাহের অভাব থাকতে পারে, ধারণার অভাবও, কারণ তখনও সুপরিকল্পিতভাবে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা এ দেশে আরম্ভ হয়নি (এখন হয়েছে, এমন সাধু ধারণা আমরা পোষণ করতে ইচ্ছুক!)। রামানন্দ কিন্তু অবিচলিতভাবে ওহেন রচনাদি ছেপেছেন—শরৎচন্দ্র রায়ের মতো বিশেষজ্ঞ লেখককে তিনি সহায়ক পেয়েছিলেন।

৭ রাজনীতির নানা তরঙ্গ

রাজনীতির নানা তরঙ্গে রেখাঙ্কিত *প্রবাসী*-র শত শত পৃষ্ঠার পাঠ সংকলন করলে ভারতের গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনপঞ্জি তৈরি হয়ে যায়। রামানন্দ সতর্ক লেখক ছিলেন, আইন বাঁচিয়ে লিখতে জানতেন, *মডার্ন রিভিউ*-তে রাজনীতি-বিষয়ে নিবেদিতার চড়া-ধাঁচের লেখাকে নমনীয় করে ছাপতেন নিবেদিতারই অনুমতিক্রমে, তবু সরকারি রোষ তাঁর উপরে খাড়া ছিল, কিন্তু ভয় পাননি (তা-ও জেনেছি নিবেদিতার চিঠি থেকে)। পরবর্তীকালে ভারতবন্ধু জে টি সান্ডারল্যান্ডের 'ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ' প্রকাশ করার অপরাধে গ্রেফতার হওয়া-স্বহ অর্থদণ্ড দিয়েছেন, তার আগেই উইলিয়ম স্টেডের *রিভিউ অব রিভিউজ* পত্রিকার জানুয়ারি ১৯০৯ সংখ্যায় সেন্ট নিহাল সিং-এর বচনায় দেখা যায়, সরকারের চোখে তিনি "ভারতীয় অস্থিরতার পিছনকার এক মদতদাতা মানুষ" বলে চিহ্নিত হয়েছেন।

সংক্ষেপে রাজনীতির দু-এক মনুষ্য-ঢেউয়ের কথা তুলে আনব। একজন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সরকার-বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের নেতৃত্ব-শিখর থেকে ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদারি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পর্যন্ত এঁর রাজনৈতিক জীবনের গতিরেখা রামানন্দর চোখের সামনে খোলা ছিল। অপরদিকে কবি ও ভোগী ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের দেশবন্ধুতে রূপান্তরও দেখেছেন। তবু সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে পূর্বে নিবেদিত নমস্কার তিনি উঠিয়ে নিতে পারেননি, আর চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে তাঁর অভিবাদন শেষ পর্যন্ত—অগত্যা।

ব্রাহ্মসমাজের বিদ্রোহী সন্তান, রবীন্দ্রনাথের রা নৈতিক ও সামাজিক ধারণার সমালোচক চিত্তরঞ্জনকে মেনে নেওয়া রামানন্দর পক্ষে সম্ভব ছি না। 'মহান প্রহরী'র ভূমিকা গ্রহণ করে গান্ধি-নীতির সমালোচনা মাঝে মাঝে করলেও সাধারণভাবে গান্ধি-নীতির সমর্থক তিনি— গান্ধি-বিরোধী চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল গঠন পছন্দ করেননি। 'জনগণের জন্য স্বরাজ' এই ধ্বনি তুলে চিত্তরঞ্জন ক্ষমতাশালী মধ্যবিত্ত সমাজের স্বার্থপরতার নিন্দা করেছিলেন। তার উত্তরে রামানন্দ লেখেন, "রুশিয়ার এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাধারণ লোকেরা মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদিগকে নৃশংসতা ও নির্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে।" (অগ্রহায়ণ ১৩২৯)। কাউন্সিলে প্রবেশ করে তাকে ভিতর থেকে ভাঙার স্বরাজনীতি তাঁর মতে কপটাচার। অহিংসা-প্রশ্নেও চিত্তরঞ্জনের কপটাচার, কারণ আর্নেস্ট ডে-র হত্যাকারী গোপীনাথ দে-র প্রশংসায় তাঁর পত্রপত্রিকা ও সমর্থকদল মুখর। এইকালে চিত্তরঞ্জনের নীতিকে আক্রমণ করার ঝোঁকে রামানন্দ প্রায় সরকারি যুক্তিগুলির পুনরুচ্চারণ করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের বিশেষ সুযোগ রামানন্দ পান চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুর ভাষণের সূত্রে। এর আগে আমেরিকায় প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' বক্তৃতায় রুষ্ট চিত্তরঞ্জন মনে করেছিলেন, স্বদেশি আন্দোলনের দেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ 'স্যার রবীন্দ্রনাথ' হয়ে জাতীয়তাবিরোধী তত্ত্ব সমর্থন করছেন। ক্রুদ্ধ রামানন্দও তার উত্তর দেন (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)। আট বছর পরে রামানন্দ সুযোগ বুঝে চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেমের ঘাটতি দেখাতে ব্যস্ত হলেন। ফরিদপুর ভাষণে চিত্তরঞ্জন নরম সুরে এমন কথাও বলেন যে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে 'স্বরাজ' ব্যাপারটা খুবই মহৎ। নির্মমভাবে রামানন্দ লেখেন, "দাশ-মহাশয় কর্তৃপক্ষকে খুশি করিবার জন্য এতটা নীচে নামিয়াছেন যে, তাঁহার ও তাঁহার

দলের নিন্দাভাজন মডারেটরাও এত নীচে নামেন নাই।" (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২)

বিধাতার হাসি অপেক্ষা করছিল। দু-মাসের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে রামানন্দকে শোকনিবন্ধ লিখতে হল—এবং তাতে চিত্তরঞ্জন প্রথম ওঁর কলমে নামের আগে 'দেশবন্ধু' শব্দটি লাভ করার ভাগ্য অর্জন করলেন। রামানন্দকে শেষ পর্যন্ত নিরাবেগ হলেও মোটামুটি দীর্ঘ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধ এইসূত্রে লিখতে হয়েছিল। তিনি দেশের সঙ্গে বুদ্ধিযোগে যতখানি জড়িত ছিলেন, ভাবানুভূতিযোগে ততখানি ছিলেন না। দেশের হৃদয়ে চিত্তরঞ্জনের জন্য কোন্ আসন পাতা হয়েছিল তা যে ধরতে পারেননি, সে-কথা লিখিতভাবে স্বীকারও করেছেন।

এর ঠিক পরেই লিখলেন সুরেন্দ্রনাথের উপর শোকনিবন্ধ। সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা তখন তলানিতে। তবু দীর্ঘ ও চমৎকার ওই রচনায় রামানন্দ সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও কার্যাবলির তথ্যমূলক বিবরণ দেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই : "বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর উত্তর ভারত সম্বন্ধে ইহা সত্য যে, সুরেন্দ্রনাথ এই ভূখণ্ডে সর্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তক ও অগ্রণী।" চিত্তরঞ্জনের চিতার তাপ তখনও দূর হয়নি, তবু রামানন্দ লিখতে পেরেছিলেন : "[সুরেন্দ্রনাথের] মতো নানা গুণশালী নেতা বঙ্গদেশে এ-পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে রামানন্দর মনোভাবে অনেক ওঠা-পড়া। সাধারণভাবে সুভাষচন্দ্র তাঁর পছন্দের মানুষ নন। সুভাষচন্দ্র প্রথমত দেশবন্ধুর রাজনৈতিক শিষ্য, আর দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে রামানন্দর প্রকট বিরূপতা। দ্বিতীয়ত সুভাষচন্দ্র ব্রাহ্ম-পরিচালিত সিটি কলেজ হস্টেলে হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতীপূজা আন্দোলনে নিজেকে অনুচিতভাবে জড়িয়েছিলেন, যার জন্য *প্রবাসী*-তে তিনি কঠোরভাবে সমালোচিত। সুভাষচন্দ্রের ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে জি.ও.সি. ভূমিকা তাঁর পছন্দসই ছিল কি না সন্দেহ। স্বরাজ্য দলের কর্মী হিসাবে এবং দেশবন্ধু-উত্তরকালে বাংলার কংগ্রেসি দলাদলিতে জড়িত চরিত্র হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে তিনি বিরূপমনেই লক্ষ্য করেছেন। তবু সুভাষচন্দ্র অনস্বীকার্য। ব্যাপক জনমণ্ডলীতে তাঁর প্রভাব কে অগ্রাহ্য করবে? এবং তাঁর ত্যাগ ও বীর্যকে? রামানন্দর মনের একাংশ নিশ্চয় নাড়া খেয়েছিল এসবের জন্য। তা ছাড়া মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কংগ্রেসের মেরুদণ্ডহীন নীতির ফলভোগ কীভাবে বাঙালি হিন্দুদের করতে হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করলেও কংগ্রেসি হাইকম্যান্ডের জো-হুকুম না হবার জন্য উচ্চতর কর্তৃত্ব থেকে কীভাবে বাঙালিকে সরিয়ে রাখা হচ্ছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। সুতরাং বাংলা থেকে একজনের কংগ্রেস সভাপতি হওয়া চাই— এবং তিনি সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কেউ নন। ইউরোপপ্রবাসের পরে সুভাষচন্দ্র কীভাবে নূতনতর দৃষ্টিতে চালিত হয়ে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার পক্ষে সরব তা-ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। সর্বোপরি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল যন্ত্রশিল্পায়ন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সুদৃঢ় সমর্থন। নিছক গান্ধিনীতির অনুসরণে কুটিরশিল্পের মধ্যে আটকে থাকলে জাতীয় অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না, এ কথা রামানন্দর যুক্তিবুদ্ধিতে ধরা পড়তে দেরি হয়নি। গান্ধিজির প্রতি শ্রদ্ধাকে তিনি চরকার প্রতি শ্রদ্ধাতে নিয়োজিত করতে রাজি ছিলেন না। তাই সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি-পদের সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী ঘোষণা করে তিনি প্রচার চালিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র হরিপুরায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলে তিনি নিজ চেষ্টার সাফল্যে খুশি

হন। তারপর, গান্ধিজির অননুমোদন সত্ত্বেও পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি-পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্রের জয়, তাঁর বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসিদের হিংস্র আক্রমণ, তাতে প্রকারান্তরে গান্ধিজির সমর্থন, এসব রামানন্দর মনে ঘোর বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করেছিল। এইসকলের কঠোর সমালোচনা তিনি করেছেন। গান্ধিজি তখন তাঁর কাছে কংগ্রেসি ডিকটেটর, যাঁর সঙ্গে গান্ধি-শিষ্য গোবিন্দবল্লভ পন্থ হিটলারের তুলনা করেছেন। (বৈশাখ ও আষাঢ় ১৩৪৬)। কিন্তু তার পরেই তাঁর মনের পটবদল হয়ে গেল যখন কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনে মুসলিম লিগের সঙ্গে চুক্তি করলেন, এবং তাঁর অনুগামীরা ক্ষোভে রোষে বিরোধীদের সম্পর্কে কিছু অবিহিত উত্তেজনা দেখালেন। রামানন্দর কলম তখন খরশান হয়ে উঠেছিল সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাই বলে রামানন্দ কখনও গান্ধিজির মূল ভূমিকা যে, "বিনা রক্তপাতে স্বদেশের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা", এ কথা ভোলেননি, বহু রচনায় সে-কথা বলেছেন; তাঁর অন্য গুণাবলির বিশ্লেষণও করেছেন; এবং ভারতবর্ষ থেকে সুভাষপর্ব শেষ হয়ে যাবার পরে রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধী মহারাজ' কবিতাটি কেবল ছেপেছেন (ফাল্গুন ১৩৪৭) তা-ই নয়, যাতে গান্ধিজি সম্বন্ধে বাঙালি কবির মনোভাব সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গোচরীভূত হয় সেজন্য কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথকে তাগিদ দিয়েছেন।

৮ *প্রবাসী*—বিশ্ববাসী

প্রবাসী-র পৃষ্ঠায় এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবাদে প্রবাসী ভরপুর। বিশ্বরাজনীতিতে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বিপ্লব, রাশিয়াব বিপ্লবকে, রামানন্দ সাগ্রহে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রামানন্দর ভাষা তাঁর পক্ষে রীতিভঙ্গ করে অতিশয় আবেগাত্মক হয়ে উঠেছিল :

> রুশিয়ার নেতৃবর্গ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, কতজন চিরজীবনের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত হইয়াছেন, কতজন বহু বৎসরব্যাপী কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, কতজন বেত্রাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়াছেন, কতজন রুশীয় পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কতজন যাহা কিছু প্রিয় ও মূল্যবান তাহা দেশের মঙ্গলার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন, কতজন দরিদ্র মজুরের বেশে গরিব মজুর ও চাযাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, কতজন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? ('রুশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব', বৈশাখ ১৩২৪)।

স্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে।

কিন্তু রুশ কমিউনিজমের মানবমুখের মতো দানবমুখ দেখাও রামানন্দর বরাতে ছিল। স্টালিনি শাসনের মুখ যখন বিকটতর হয়ে আগ্রাসী ব্যাদিত রূপ ধরল, তখন রামানন্দর প্রতিবাদও কঠিন থেকে কঠিনতর। রাশিয়া স্বদেশীয় স্বার্থে ক্ষুদ্র ফিনল্যান্ডকে আক্রমণ করে এবং বোমা-কামানের ধাক্কায় তাদের

প্রতিরোধকে চূর্ণ করে দেশটি অধিকার করে নেয়। এতে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের সীমা ছিল না—কবিতার ভাষায় ধিক্কারও দিয়েছিলেন। রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যান্ড আক্রমণের সম্ভাব্য কারণসমূহ পর্যালোচনার পরে রামানন্দ মূল কারণ এই নির্ধারণ করেছিলেন, "রুশিয়া এবং তাহার সর্বাধ্যক্ষ স্টালিন কম্যুনিস্ট হইলেও বস্তুত সাম্রাজ্যিকতাগ্রস্ত, এইজন্য ফিনল্যান্ডের নৈসর্গিক সম্পদ অধিকার করিতে চায়। বলা বাহুল্য কাহারও সাম্রাজ্যিকতা সমর্থনযোগ্য নহে— কম্যুনিস্টদের সাম্রাজ্যিকতাও নহে।"

৯ অসাম্প্রদায়িক হিন্দুস্বার্থের প্রহরী

ব্রাহ্ম রামানন্দ হিন্দু মহাসভার সভাপতি হয়েছিলেন ১৯২৯ সালে। তারও আগে, পরেও বহু বৎসর ধরে ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারতবর্ষে কীভাবে হিন্দুস্বার্থ প্রতিপদে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং রাজনৈতিক কারণে সাদরে পোষিত হয়েছে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা, তার তথ্যমূলক কাহিনি লিখে গেছেন *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠায়। এক্ষেত্রে নমুনা ঘটনা হিসাবে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে নেওয়া যায়।

ভারতে হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থসংঘাতে আহা বড়োই ব্যথিত ব্রিটিশ শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড ১৭ অগস্ট ১৯৩২ কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা করেন। এই বিধানে, ভারতে হিন্দুরা যেহেতু অতিরিক্ত পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই সংখ্যালঘু মুসলমানদের সদস্যসংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। হিন্দুসংখ্যাধিক্যযুক্ত প্রদেশে এই ব্যবস্থা বলবৎ করা হলেও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে তা করা হয়নি। বিশেষ মার খেয়েছিল বাঙালি হিন্দুরা, তাদের জনসংখ্যা যেখানে শতকরা ৪৫-এর বেশি সেখানে তাদের দেওয়া হল ২৫০ সদস্যের আইনসভায় আশিটি আসন—সেখানে মুসলমানদের জন্য ১১৯টি আসন। পুনা প্যাক্টের কল্যাণে ওই আশিটি আসনের তিরিশটি পাবে অনুন্নতরা, যদিও বাংলায় ভারতের অন্য প্রদেশের তুলনায় অনুন্নত সমস্যা এখানে বড়ো কিছু ছিল না। অবিচার এমনই ঘোরতর যে, সমাজতন্ত্রী সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত তীব্র সমালোচনা করলেন ('ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে ও অন্যত্র), ব্রাহ্মসমাজের নামি মানুষেরা পর্যন্ত প্রতিবাদপত্রে স্বাক্ষর এবং প্রতিবাদসভায় যোগদান করলেন। "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষ হইতে ভারত সচিবের নিকট একটি দরখাস্ত গিয়াছে, যাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষী [র]... স্বাক্ষর আছে।" (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৪৩)। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র বাঁটোয়ারা-বিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে রবীন্দ্রনাথ-সহ বাঙালি মনীষীরা যে বিবৃতি প্রচার করেছিলেন তাতে প্রশ্ন ছিল—বাঙালি হিন্দুরা কীভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করবে—"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার হিন্দুগণ তাহাদের জন্মভূমিতেই দাস-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে।" (আশ্বিন ১৩৪৬)।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেস বিচিত্র সতীত্ব রক্ষা করে 'না-গ্রহণ, না-বর্জন' নীতি নেয়। তার যুক্তি— সে সর্বশ্রেণির প্রতিনিধি। সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরাও একটা শ্রেণি, তারা যেহেতু, বাঁটোয়ারাকে পছন্দ করে, তাই কংগ্রেস তাকে বর্জন করতে পারে না, আবার বাঁটোয়ারাটি এমন জঘন্য যে, তাকে গ্রহণও করা যায় না। কংগ্রেসের অসহ্য এই ভণ্ডামি, যা রামানন্দর কাছে 'দেশদ্রোহিতা'

বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। (ফাল্গুন ১৩৪১)

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে 'শ্রী' ও 'পদ্মফুল' থাকার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি জানানো হয়। মুসলমান বাদশাহগণের কাছে 'শ্রী' ও 'পদ্ম' অচ্ছুত ছিল না, মুদ্রায় ও অন্যত্র তাঁরা ওসব ব্যবহার করতেন, ইসলামি পতাকার চন্দ্রকলা শিব-শিরেও আছে, সেক্ষেত্রে মুসলমানেরা তা বর্জন করছেন না কেন—এসব কথায় কোনো ফলোদয় হয়নি। (আশ্বিন ১৩৪৪)।

বঙ্কিমচন্দ্র অনেকদিন ধরেই সাম্প্রদায়িক আক্রমণের চাঁদমারি। হিন্দু-গন্ধ আছে বলে কংগ্রেসকে বন্দেমাতরম্ সংগীতের অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রতীক-বিরোধী ব্রাহ্মরা, যথা কৃষ্ণকুমার মিত্র, ললিতমোহন দাস বন্দেমাতরম্-এর মধ্যে পৌত্তলিকতা নয়, রূপক দর্শনই করেছেন। (ফাল্গুন ১৩৪৩)। একদা মৌলনা আক্রাম খাঁয়েরও ছিল তাই মত। (শ্রাবণ ১৩৩৮)। এবং বঙ্কিম-সাহিত্য সত্যসত্যই মুসলিম-বিদ্বেষী নয়। (শ্রাবণ ১৩৪৫)। রামানন্দর এসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের শুভ্র অঙ্গে পর্যন্ত পৌত্তলিকতা ও মুসলিম-বিদ্বেষের গন্ধ সন্ধান করা হয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত অভিযোগে সন্ত্রস্ত রবীন্দ্রনাথ মর্মবেদনার সঙ্গে উত্তর দেন। ("রবীন্দ্রনাথ ও 'মোহাম্মদী' ", আষাঢ় ১৩৪৩)।

১০ পাপের বেতন মৃত্যু

আত্মঘাতী হিন্দুসমাজের দিকে তাকিয়ে রামানন্দর মনে ওই কথাটা বারবার উঠেছিল। পুনা চুক্তির সমালোচক তিনি—কিন্তু নির্মম উদ্যত এই প্রশ্ন—অনুন্নতদের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথাটা ওঠে কেন? কেন অনুন্নত হিন্দুরা মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়ে যায়? অজস্র সম্পাদকীয়তে দুঃখ-বেদনা-ক্ষোভ-আক্ষেপের সঙ্গে রামানন্দ বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন। ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বিবিধ প্রসঙ্গে' ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে প্রদত্ত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভাষণের বড়ো অংশ উদ্ধৃত করে তিনি প্রয়োজনীয় মন্তব্য করেন। তথ্যমূলক ওই ভাষণে আচার্য রায় হিন্দুদের ক্ষয়িষ্ণু জনসংখ্যার পাশে মুসলমানদের জনস্ফীতি, হিন্দুসমাজে বিধবার অধিকারহীনতা, অস্পৃশ্যতা, তথাকথিত নিম্নশ্রেণি কর্তৃক উচ্চবর্ণের দ্বারা আচরিত সামাজিক ব্যবহারসমূহের ক্ষতিকর অনুকরণ, দেশব্যাপক ঘোর অশিক্ষা ইত্যাদির জাজ্জ্বল্যমান রূপ তুলে ধরেন। অস্পৃশ্যতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। অভিভাষণের শেষে আচার্য রায় আর্তনাদ করে বলেছিলেন, "হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে। এখনও যদি আমাদের মোহনিদ্রা না ভাঙে তাহা হইলে ২০০/২৫০ বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে।"

ধর্মান্তরগ্রহণ-প্রশ্নে রামানন্দ অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। ধর্মকে তিনি বেচাকেনার জিনিস মনে করতেন না। তাই হিন্দুসমাজের অনাচার-অত্যাচারকেও হিন্দুসমাজত্যাগের পক্ষে যুক্তি বলে মানতে চাননি। ১৯৩২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয়তে, নানা তথ্যযোগে একটি কথা স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন—ভেদবিভেদ মুসলমান, খ্রিস্টান-সহ সব ধর্মমতেই আছে এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত গোষ্ঠীগুলি নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে বহুবৎসরব্যাপী রক্তক্ষয়ী লড়াই করেছে—তারা কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করেনি। হিন্দুদের নিম্নবর্ণের কাছে তাঁর আবেদন (যে আবেদন

বিবেকানন্দ একদা করেছিলেন)—কী দরকার উচ্চবর্ণের মুখাপেক্ষী হবার? নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের পছন্দমতো ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি তৈরি করে নিলেই তো হয়।

১১ নিরপেক্ষতার জাতিভেদ

না, নিরপেক্ষতার সত্যই জাতিভেদ হয় না। আবার নিরপেক্ষতা যেহেতু মনুষ্যমনের তাই তা নির্বিকারও হতে পারে না। সুতরাং রামানন্দর 'নিরপেক্ষতায় পক্ষপাত' ছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ সেই পক্ষপাতী নিরপেক্ষতার অংশ পেয়েছেন। গিরিশের নাটকগুলি তিনি পছন্দ করেছেন বলে মনে হয় না। তাত্ত্বিকভাবে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আপত্তি না থাকলেও তাঁর ভিতরকার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজি সংস্কার পাবলিক থিয়েটারের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকতেই পারে, বিশেষত যে-মঞ্চে বাজারের মেয়েরা নাচ-গান করেও সতী সাজে। পতিতার কন্যা উদ্ধার ক'রে, শুদ্ধিকরণের পরে তাকে সুপবিত্র শিক্ষাদানের ব্রত রামানন্দ যৌবনকালে গ্রহণ করেছিলেন, সেকথা সত্য, কিন্তু তাই বলে যারা থিয়েটারের সঙ্গে অন্য ব্যবসাও চালিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রশ্রয়দাতা মঞ্চনেতাকে তিনি কখনো সহ্য করতে পারেন? সুতরাং যে গিরিশচন্দ্র বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবিসংবাদিত নেতা (তার 'খুড়া জেঠা কেউ নেই') যিনি দেশের অন্যতম প্রধান নাট্যকার ও অভিনেতা, পৌরাণিক নাটকে যিনি নবচেতনা এনেছেন, সংস্কার আন্দোলনে এবং দেশাত্মবোধ সৃষ্টিতে যাঁর নাটকের ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে, বাংলার জাগরণের একাংশের যিনি প্রতিনিধি—তাঁর মৃত্যুর পরে ওইসব কার্যাবলি সম্বন্ধে বাধ্যতামূলক বধিরতা ও অন্ধতা অবলম্বন করে রামানন্দ এই অসাধারণ কৃচ্ছ্রক্লিষ্ট রচনাটি লিখেছিলেন :

> সম্প্রতি বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্যিকের দেহান্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাটককার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোনও নাটক পড়ি নাই, বাংলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারেও কখনও যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

১২ শরৎচন্দ্রের লেখা চাই না

শরৎচন্দ্র রামানন্দর মনের মানুষ নন, হওয়া সম্ভবও নয় *দত্তা* লেখার পরে। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রকে ঘিরে যেসব কথাগল্প গজিয়ে উঠেছিল সেগুলিতে সুনীতি সন্দর্ভের মোহর ছিল না। ওই দুঃসাহসী লেখক তাঁর একটি বইয়ের নাম দিয়েছিলেন 'চরিত্রহীন'। অস্থান-কুস্থান থেকে পবিত্র প্রেমের বার্তা আহরণের প্রযত্ন ছিল ওই লেখকের। অথচ বাংলা দেশ তখন শরৎ-আলোর মদে মাতাল। *প্রবাসী*ও অন্তত অর্ধাংশে রস-সাহিত্য পত্রিকা। সেখানে শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতি শরৎচন্দ্রের যতখানি না, *প্রবাসী*-র ব্যবসায়িক দিকটির পক্ষে ততোধিক ক্ষতির কারণ। শরৎচন্দ্র অসম্ভব জনপ্রিয়, প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকাদির স্বাস্থ্যশ্রী বিধায়ক। এক্ষেত্রে রুচির সাত্ত্বিকতা সামলে কি *প্রবাসী* কখনো লেখার জন্য শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়নি?

নরেন্দ্র দেব 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' পুস্তকে লিখলেন, *প্রবাসী* শরৎচন্দ্রের লেখা পেতে আগ্রহী ছিল, রবীন্দ্রনাথও *প্রবাসী*-র হয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র গররাজি ছিলেন না, কিন্তু রামানন্দ যখন শরৎচন্দ্রের লেখার চুম্বক পূর্বাহ্ণে পেশ করা দরকার বলে জানালেন তখন শরৎচন্দ্র বেঁকে দাঁড়ালেন, এবং *প্রবাসী*-র আচরণে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। নরেন্দ্র দেবের বইয়ের এই বিবরণ রামানন্দকে নানা আক্রমণের মুখে ঠেলে দিল; রুষ্ট রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে এইসূত্রে চিঠি লিখলেন। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, তিনি শরৎচন্দ্রকে *প্রবাসী*-তে লেখা দিতে বলেছেন বলে মনে পড়ে না। খুবই দুঃখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এইজন্য মরতে আমার সঙ্কোচ হয়—তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো খোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?" রামানন্দও কঠোরভাবে লিখলেন, "আমি শরৎবাবুর লেখা পাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ বা চেষ্টা করি নাই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ১১৯, ৪০৭-০৮; ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত)।

গিরিশচন্দ্র কিছুটা পড়তি দশায় মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র অপরাহ্ণেও সমুজ্জ্বল। তাই তাঁকে বিদায়মূল্য দিতে হয়েছিল। এক বিবেচনাধীন সম্পাদকীয়তে রামানন্দ "সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে, এ কথা বলেন এবং দাবি করেছিলেন (সে দাবি নিজের উদারতার পক্ষেও) তিনিই প্রথম *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* মারফত এগারো বছর আগে জানিয়েছেন—শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতি ইউরোপে পৌঁছেছিল, রম্যাঁ রল্যাঁ *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের অনুবাদের অনুবাদ পড়ে তাঁকে প্রথম শ্রেণির ঔপন্যাসিক বিবেচনা করেছিলেন। রামানন্দর লেখা থেকে জানা গেছে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি, দু-এক বার মাত্র আলাপ হয়েছিল, সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে শরৎচন্দ্রকে "তাকিয়ার উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় একপায়ের উপর এক পা তুলিয়া" বসে থাকতে এবং "দু একটা মন্তব্য প্রকাশ" করতেও দেখেছেন।

রামানন্দ অন্যত্র জানিয়েছেন, শরৎচন্দ্রের যেসব লেখা দূষিত বলে কথিত, "সেগুলি আমরা পড়ি নাই।"

১৩ প্রসঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

এক্ষেত্রে রামানন্দর মনোভূমি কিছু অস্থির। রামকৃষ্ণের প্রতি প্রথমাবধি ভক্তিশ্রদ্ধার কথা তাঁর স্বীকারোক্তিতে আছে, কিন্তু প্রায় সমসাময়িক বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে তিনি একেবারে চুপ, (বিবেকানন্দের দেহান্ত-সংবাদ *প্রবাসী*-তে বেরোয়নি) কিংবা এমনও হতে পারে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *ইন্ডিয়ান মেসেনজার*-এ (যার সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদকীয় লেখক তিনি ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন) যেসব অম্লরসাক্ত মন্তব্য বেরিয়েছিল তার লেখক-অংশী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ছোকরা গায়ক, স্বভাবে বেপরোয়া নরেন দত্তর হঠাৎ কালীসাধক রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়ে পড়া এবং তারপরে পুনশ্চ হঠাৎ 'ভূমিতে চাঁদের উদয়'-বৎ আবির্ভাব বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিরূপে—এই কালে অনেককেই সংকুচিত, সন্দিগ্ধ, ঈর্ষাতুর এমনকি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। রামানন্দ এই দলভুক্ত হবার মতো মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভালোবাসার ঢলও নামেনি। এমনও দেখা যায়,

বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্বন্ধে নিছক ছিদ্রান্বেষী কটু রচনাও তিনি *প্রবাসী*-তে ছেপেছেন। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। কারণ বিবেকানন্দ মরিয়া না মরে রাম। নানা কারণে, বিশেষত বিবেকানন্দের রচনার সঙ্গে অধিকতর পরিচয়ের সুবাদে, তদুপরি রামমোহন রায়ের প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য (রামমোহন রামানন্দর কাছে পরমাদর্শ প্রতীক) এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সংগঠন ও সেবামূলক কার্যাদি জ্ঞাত হওয়ার ফলে—তিনি স্বামীজি-বিষয়ে কিছু কিছু অনুকূল মন্তব্য করতে থাকেন, তাঁর বিষয়ে অন্যের লেখা প্রশংসামূলক প্রবন্ধও বেরোতে থাকে, যদিও অল্পসংখ্যায়।

রামানন্দ নানা সময়ে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছেন তার বেশি অংশে স্বামীজির একটি উক্তির উদ্ধৃতি ছিল—তিনি আলমোড়ায় নিবেদিতাকে বলেছিলেন— বেদান্ত অবলম্বন, স্বদেশপ্রেম প্রচার এবং হিন্দু-মুসলমানকে সমদৃষ্টিতে দেখা, এসব ব্যাপারে তিনি রামমোহনের অনুগামী। এই কথাগুলি কতখানি গ্রাহ্য এবং কোথায় গ্রাহ্য নয়, তার বিস্তৃত আলোচনা অন্যতম সম্পাদকের একটি গ্রন্থে আছে, এখানে তার মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই।[৪] স্বামীজির সেবাধর্ম, ভারতীয় জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট পরাভূতের মনোভাব ও হীনম্মন্যতা দূর করার জন্য নির্ঘোষ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণবিনিময়ের চেষ্টা, ইত্যাদির বিষয়েও রামানন্দ বলেছেন। কয়েকটি বিষয়ে বুদ্ধের সঙ্গে স্বামীজির সাদৃশ্যও লক্ষ করেছেন।

রামানন্দ একবার প্রাণ ঢেলে বিবেকানন্দের মহিমার জয়গান করেন। নিবেদিতার *Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda* বইটিই তাঁর ভাবাপ্লুত রচনার আশু কারণ :

> বহিখানি পড়িয়া মনে হইল, এরূপ একজন অসামান্য ব্যক্তির সহিত ভারত-ভ্রমণ কী সৌভাগ্য!...বিবেকানন্দ সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে ক্রিয়াশীল, অধর্মের সহিত সমরপন্থী এবং দীক্ষা দ্বারা অহিন্দুকেও নিজ ক্রোড়ে আশ্রয়দানে যত্নবান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানের, সকল জাতির, অন্ন ও জল গ্রহণ করিতেন, এবং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের ঘোর বিরোধী ছিলেন।
>
> বুদ্ধদেব তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে এই মর্মে উপদেশ দিয়াছিলেন, 'তোমরা নিজেই নিজের আলোক হও; নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের মোক্ষ সাধন করো!' বিবেকানন্দও ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেষ্টা বিফল হয় নাই। (বৈশাখ ১৩২০)।

রামানন্দর একাধিক জীবনীতে তাঁর বাল্যের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগের কথা আছে। পূর্ব-উল্লিখিত তাঁর খণ্ডিত দিনপঞ্জিতে পাই, কলকাতায় আসার পরে তিনি রামকৃষ্ণ-উপদেশ সংগ্রহে সচেষ্ট হয়েছিলেন। *প্রবাসী*-র মাঘ ১৩৪২ সংখ্যাতে লিখেছেন :

> রামকৃষ্ণ যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ভারতবর্ষের পরম গৌরব। হিন্দুজাতির ও ভারতবর্ষের নিন্দুকেরা যাহাই বলুক, এদেশে যে আধুনিক যুগেও মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হন, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, ভারতবর্ষ অধম দেশ নহে, হিন্দুজাতি অধম জাতি নহে।

রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী দেশ-বিদেশে নানা স্থানে পালিত হয়েছিল। রামানন্দ মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, এ জিনিস এদেশে একালে অভূতপূর্ব।

> নানা দেশের নানা জাতির ও নানা ধর্মের লোকদের সহযোগিতায় পুষ্ট এতবড় সর্বধর্ম সম্মেলন ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। (চৈত্র, ১৩৪৩)।

যৌবনে দাসাশ্রমের কর্ণধার রামানন্দ ব্রাহ্মসমাজের সেবাকাজের সংবাদ যথাসম্ভব ছেপে গেছেন। এই ব্যাপারে তাঁদের প্রচেষ্টা যখন দুর্বল হয়ে পড়ল এবং রামকৃষ্ণপন্থীরা নবপ্রেরণায় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তখন ভারতের নানা জায়গায় সেই সংগঠিত সেবাকাজের কথা জেনে বা স্বচক্ষে দেখে রামানন্দ মুগ্ধ হলেন, এবং তাঁর মুগ্ধতা লিখিতভাবেও প্রকাশ করলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কীভাবে "আধুনিক উন্নত প্রণালীতে" শিক্ষা দিয়ে শত শত কুমারী ও বিবাহিত নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করেছেন, সে-কথা আনন্দের সঙ্গে বলেছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের কার্যবিবরণ প্রশংসা-সহ নানা সময়ে *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে। রায়বাহাদুর চুনীলাল বসুর লেখা 'সেবাকার্যে আহ্বান' প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ মিশনের ওই কার্যের উজ্জ্বল বিবরণ আছে। (পৌষ ১৩২৬)। স্বামীজির শিক্ষা ও সংস্কারমূলক চিন্তার উপর প্রামাণ্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে প্রথম প্রবন্ধরূপে (চৈত্র ১৩২৫)। রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলি সম্বন্ধে রামানন্দর মূল্যায়ন এই :

> রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বারা জনসমাজের যে-কল্যাণ হইয়াছে—ক্ষুদ্র ও ক্ষণভঙ্গুর জিনিস সম্বন্ধে বৈরাগ্য, মহৎ ও শাশ্বতের প্রতি অনুরাগ, এবং দরিদ্র ও অজ্ঞের সেবার ভাব হইতে তাহা হইয়াছে।.. বাঙালী ছাড়া ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনেব মতো একটি জিনিস কেহ দেখাইতে পারে না।

উচ্চপ্রশংসা, কিন্তু স্মর্তব্য, প্রাণধর্মে ও ধর্মে রামকৃষ্ণ মিশন বাঙালি ব্যাপার ছিল না, যদিও বাংলায় উদ্ভূত বলে তাতে বাঙালির প্রাধান্য ঘটেছিল।

শেষে স্মরণ করাতে পারি—শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবীর একটি সুলিখিত সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবনী *প্রবাসী*-তেই বেরিয়েছিল। (বৈশাখ ১৩৩১)। লেখক অন্য কেউ নন বাঁকুড়াবাসী রামানন্দ, যিনি বাঁকুড়া-নন্দিনী সারদাদেবীর মহিমায় খুবই গর্বিত ছিলেন। নানা স্থান থেকে, বিশেষত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ থেকে, সংগৃহীত উপাদানের সাহায্যে রচিত এই রচনাটিকে তথ্যমূলক এবং শ্রদ্ধাঘন জীবনচিত্রের আদর্শ নমুনা বলা যায়।

১৪ ❖ নিরপেক্ষতার কঠিনতম পরীক্ষা—

রামানন্দ তাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সে পরীক্ষা হয়েছিল রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকীর সময়ে, কিছু পূর্বে এবং পরেও।

রামানন্দ একনিষ্ঠ রামমোহন ভক্ত। তাঁর সম্পর্কে তথ্যমূলক প্রশস্তিমূলক রচনা তিনি *প্রবাসী*-তে অকাতরে ছেপে গেছেন। কিন্তু উক্ত শতবার্ষিকী উৎসবেব কাছাকাছি সময়ে ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন নথিপত্র ঘেঁটে এমন কিছু তথ্য আবিষ্কার করলেন যাতে আপাতত মনে হল, বামমোহনের হিন্দু পত্নীর মতো মুসলমানি পত্নী ও পুত্র ছিল, কৈশোরে তাঁর তিব্বতগমন সত্য নয়, পিতৃসম্পত্তি ভোগ কবলেও পিতা যখন দেনার দায়ে জেলে গেলেন তখন রামমোহন উপুড়হস্ত করেননি,

ইত্যাদি। রামানন্দর মধ্যে তখন এই চিত্তসংকট—লেখাগুলি কি প্রকাশ করবেন? ওগুলি তাঁর অনুভূতির পক্ষে মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক—তবু ছেপেছিলেন। (ব্রজেন্দ্রনাথের এই-জাতীয় লেখা বঙ্গশ্রী ও শনিবারের চিঠি-তেও বেরিয়েছে, বাংলা ছাড়া ইংরেজিতেও তিনি লিখেছেন)। ব্রজেন্দ্রনাথের বক্তব্যের খণ্ডনাত্মক রচনাও রামানন্দ ছেপেছেন—এক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ। রামানন্দর মনোভাব ছিল—রামমোহনের উপর নিক্ষিপ্ত কর্দম উপেক্ষায় সরিয়ে দিলে দুর্নাম ঘুচবে না, তার রূপ প্রকাশিত হোক, আর প্রকাশিত হোক এই সত্য—রামমোহন কর্দমাবিল ছিলেন না। এই একটি ক্ষেত্রে রামানন্দর দুঃসাহসী সত্যনিষ্ঠা সমুচ্চ শ্রদ্ধার যোগ্য, তাঁর ন্যায়বুদ্ধিও—বিশেষত যদি স্মরণে রাখি, ওইসব প্রবন্ধের লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবাসী-র বেতনভোগী কর্মচারী।

রামমোহনের ছবি মলিন হতে পারে এমন লেখা কেন ছাপলেন তার কৈফিয়ত রামানন্দ একাধিক বার দিয়েছেন। গৌরবজনক সত্যপ্রীতির এবং সাংবাদিক সাধুতার পরিচায়ক তেমন লেখার একটিতে (চৈত্র ১৩৩৬) রামানন্দ বলেছেন, "সত্য নির্ণয়ের জন্যই [এরূপ] করিয়াছি, সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই, এই বিশ্বাসে করিয়াছি।" তাঁর শেষ বক্তব্য এই .

> সব মানুষই অপূর্ণ। রামমোহন রায় মানুষ ছিলেন, সুতরাং অপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার যে-কোনো দোষ যে-কেহ দেখাইয়াছেন বা দেখাইবেন, তাহাই আমরা মানিয়া লইয়াছি বা লইব, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। উপযুক্ত প্রমাণ পাইলে মানিব, নতুবা মানিব না। এ-পর্যন্ত সম্প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা লেখা বা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করি নাই। পরে কি হইবে জানি না। (ফাল্গুন ১৩৪০)।

তাঁর একই দৃষ্টিভঙ্গি পরেও দেখা গেছে। (ফাল্গুন ১৩৪৩)।

১৫ ❀ বিবিধের মাঝে দেখ

কী দেখব—সে যে অগণ্য! সুতরাং মাত্র একটিকে তুলে আনা যাক। রামানন্দর বাঙালিপ্রীতি অসাধারণ। বাঙালি এবং বাংলা ভাষার স্বার্থরক্ষায় ধারাবাহিক চেষ্টা তিনি চালিয়ে গেছেন। সি ভি রামন বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে এবং তারপর বাংলার গবেষণাগারে কাজ করে, যে আবিষ্কার করেন তা তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। পুরস্কারপ্রাপ্তির পরে তিনি বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির অঢেল প্রশংসা করেন। কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সংবর্ধনার উত্তরে তিনি কলকাতা শহর সম্বন্ধে বলেন :

> For a hundred years, Calcutta has been the intellectual metropolis not only of Bengal, or of India, but of the whole of Asia. From Calcutta has gone forth a living stream of knowledge in many branches of study. It is inspiring to think of the long succession of scholars, both Indian and European, who have lived in this city, made it their own, and given it of their best. It must be a profound privilege to be able to work and live in such environment. (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৩৮)।

লুঠের জন্য সাহেব কর্তৃক স্থাপিত 'শহর কলকাতার' তিনশো বৎসরের এই জন্মোৎসবে চমৎকার একটি প্রশস্তিপত্র। কিন্তু এ জগতে কিছুই স্থায়ী নয়; সাতপাকে বাঁধা হিন্দুদের জন্য বিবাহবিচ্ছেদের আইন যেখানে পাস হয়েছে সেখানে সাধারণ প্রেমে বিচ্ছেদ তো তুচ্ছ ব্যাপার। মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত 'কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স' প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব নিয়ে রামনের সঙ্গে বাঙালিকুলের বিবাদ বাধল। রামন কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটিকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা রামানন্দ ভালো চোখে দেখেননি। আর সেই চেষ্টায় বাধাদানও রামন ভালো চোখে দেখেননি। চশমা পালটে তিনি বাঙালীদের কোন্ চোখে দেখেছেন তা *বোম্বাই ক্রনিকল*-এর সম্পাদক লিখেছিলেন :

> His [Raman's] prejudice against Bengal, ...is very deep-set. He sees nothing good in Bengal and sincerely believes that the Bengalees have made no contribution whatsoever to the life of the country. In a mood of half-jest and half-seriousness he said to me : "Don't you think they have, these Bengalees, some taint of Mongoloid blood in them? At least I do. After the war when the provincial boundaries are re-drawn, it would be a very good thing if Bengal could be shunted out of India and joined to Burma. We in India would be a happier family. (*প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৪৯)।

সি ভি রামনের শুভবাসনার আলিঙ্গিত সঙ্গী ছিলেন রাজাগোপালাচারী; সর্বভারতীয় শুদ্ধিব্রতে বাংলার সবটাকে না পারলেও বড়ো অংশকে ভারতবর্ষের বাইরে খেদিয়ে দেওয়া তাঁর ও তাঁর দলবলের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৬ বিজ্ঞানে জয়যাত্রা

সাহেব-বিশ্বে ভারতের বড়ো নিন্দা—ভারতীয়রা যতরাজ্যের ঘুমপাড়ানি ধর্ম-দর্শনের চর্চা করে, বিজ্ঞানের ধারে-কাছে নেই। কিন্তু সে একদা পৃথিবীর সেবা কিছু বিজ্ঞানেব আবিষ্কার করেছে—এ কথা ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান পুরুষ বিবেকানন্দ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—এবং আধুনিক কালে ভারতীয়ের বিজ্ঞান যখন জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সত্যই বিশ্বমানে উঠেছিল, তখন জানিয়েছিলেন *সহর্ষ অভিনন্দন*। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চেষ্টার সহায়তায় যোগ দেন নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ। ভারতের পক্ষে সেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রধান প্রচারকর্তার ভূমিকা নেন রামানন্দ। *মডার্ন রিভিউ* ও *প্রবাসী*-তে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের উপর বহু উৎকৃষ্ট সচিত্র প্রবন্ধ বেরিয়েছে, জগদীশচন্দ্রের প্রতিটি সাফল্য ঘোষিত হয়েছে উদ্দীপনার সঙ্গে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার বিষয়ে জগদানন্দ রায় ক্রমান্বয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখে গেছেন, তার দ্বারা একদিকে বিজ্ঞান সামাজিক জ্ঞানবস্তু হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার দ্বার খুলে গেছে।

রামানন্দ জগদীশচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রচারের দ্বারা তিনি ছাত্র-ঋণ এবং দেশ-ঋণ জানিয়েছেন।

সমকালের আর-এক বিখ্যাত বাঙালি বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর গবেষণা ও রচনাদির সম্বন্ধে সমাদরসূচক মন্তব্য রামানন্দ করেছেন। পরবর্তীকালে প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রদের কাছে আচার্য-ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং বেশ কয়েক জন কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। সেইসকল তরুণ বৈজ্ঞানিকদের পরিচয় রামানন্দ *প্রবাসী*-তে দিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সূত্রে দুমুখো কথাবার্তা বললেন, তখন রামানন্দ সেসকলের কঠোর সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি।

১৭ শিক্ষার দুনিয়ায় সন্ধানী সাংবাদিকতা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রথম শ্রেণির ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারেননি। তাই *প্রবাসী*-র মধ্যে বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, শিক্ষার মহামাতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সতর্ক মনোযোগ দেখিয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অজস্র লেখা তাঁর পত্রিকায় বেরিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষের কঠোর সমালোচনা করেছেন নানা সময়ে, যদিও আশুতোষের গুণাবলি সম্বন্ধে সবিশেষ প্রশংসা করেছেন আশুতোষের শোকনিবন্ধে।

শিক্ষার সর্বস্তরের দিকে রামানন্দর নজর ছিল—এবং শিক্ষা থেকে শিক্ষকদের বাদ দেননি। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ তাঁর মনোযোগে, কখনো তারিফের, কখনো নিন্দার বিষয় হয়েছে। প্রবাসী বাঙালিদের শিক্ষা-বিষয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখা গেছে, সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষে দৃঢ় প্রচার চালিয়েছেন, এবং সর্বদাই জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠাংশের সম্মিলনের প্রয়োজনের কথা বলেছেন।

১৮ চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ—এবং অচির সংঘাত

'*প্রবাসী*-র রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের *প্রবাসী*'—এই শিরোনামাও দেওয়া যেত। কিংবা 'রবি-সনাথ রামানন্দ!' কিংবা—।

না, কোনোভাবেই *প্রবাসী*-র কাছে রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন উপযুক্তভাবে বোঝানো যাবে না। এবং কিছু নিচুস্বরে, রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রবাসী কত কী করেছে, তা-ও কি বোঝানো যাবে? আদর্শের প্রেরণা, ভক্তির আনুগত্য, বন্ধুত্বের নিষ্ঠা এবং অবশ্যই ব্যাবসায়িক স্বার্থ, সানন্দে মিলিত হয়েছিল রামানন্দর *প্রবাসী*-গত রবীন্দ্র-সাধনায়। রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে প্রথমাবধি চিনেছিলেন—সেই জ্ঞান অটুট ছিল শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁর মর্যাদারক্ষায় রামানন্দ-তুল্য অক্লান্ত সংগ্রামী এবং বিজয়ী যোদ্ধা আর কেউ ছিলেন না; রবীন্দ্রনাথও অপরের ঈর্ষাতুর চোখের সামনে নিজ ভাণ্ডার *প্রবাসী*-র কাছে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সাহায্য ছিল পারস্পরিক।

এই পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে *প্রবাসী*-সম্পাদক ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'প্রবাসী ও রবীন্দ্রনাথ' লেখায় বলেছেন :

> আশ্বিন (১৩৩৩) সবুজপত্রে 'প্রবাসী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা সমগ্র কিম্বা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা প্রবাসীর পক্ষে শোভন হইবে না। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যাওয়াও ভদ্রতা ও বন্ধুত্বের রীতিবিরুদ্ধ। সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমরা কেবল রবীন্দ্রনাথেব সহিত প্রবাসীর আজন্ম সম্বন্ধের কথাই বলিব। প্রবাসীর সাহিত্যিক আদর্শ ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ভিতর একটা যোগ থাকাতে এবং বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে প্রবাসীর সম্পাদক তাঁহাকে অতি প্রিয়জনরূপে বহুকাল শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখাতে প্রবাসী কোনোদিন রবীন্দ্রনাথকে লেখকমাত্র কি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকমাত্ররূপে দেখিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীর আত্মীয়স্বরূপ। অর্থ ও রচনার আদান-প্রদান এসম্বন্ধের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে পারে না। অর্থের বিনিময়ে প্রবাসী কিছু পাইয়াছে বলিয়া মনে করে না। তাঁহার অমর-লেখনী-প্রসূত অমূল্য রচনাকে সে বন্ধুত্বের উপহাররূপেই গণ্য করিয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে যৎসামান্য সাহায্য করিতে পাইয়া বন্ধুজনোচিত আনন্দই লাভ করিয়াছে।
>
> এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা আমাদের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

প্রবাসী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাণী ছাপায় রামানন্দর এই অনিচ্ছা কিন্তু পাঁচ বছর পরে দূর হয়ে যায়। ১৩৩৮ ফাল্গুন *প্রবাসী*-র 'কষ্টিপাথর'-এ পরিচয় পত্রিকা থেকে (১৩৩৮ কার্তিক) যে-অংশ উদ্ধৃত করা হলো তাতে *প্রবাসী* সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষরকম প্রশংসার কথা আছে। হালকা চালের গল্পগাছায় ভরপেট জনপ্রিয় পত্রিকার সঙ্গে মননশীল বিষয়সমৃদ্ধ পত্রিকার তুলনা কবি করেছিলেন। *প্রবাসী* প্রসঙ্গে কবির বক্তব্যের কিছু অংশ :

> ...প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের ক'রলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চল্‌তে পারে তা বিশ্বাস হয় নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে নিয়মরক্ষা ক'রে চলবার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে যাত্রা শুরু করতে লজ্জিত হত না, মাসিক পত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখ মাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসঙ্কোচে আসরে নাম্‌ত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের পরে নির্ভর ক'রে এমনতর আটপৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেন নি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজনে কম পড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জ্জনা করবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না।..
>
> প্রবাসী-জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজনসিদ্ধি করেচে। জনসাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু আঘাতে জাগিয়ে রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের বিনিময়-সংবাদ বৃহৎ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হবার যোগ্য। এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছেও।[৫] সুতরাং যথাসম্ভব সংক্ষেপে দু-একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কর্তব্য সমাধা করব।

প্রথমেই আসল কথায় নেমে পড়া যাক—টাকা। ধন্য রামানন্দর ৩০০টি টাকা, যা তিনি রবীন্দ্রনাথের কোনো একটি 'ইচ্ছা হয়ে আছে মনের মাঝারে' লেখার জন্য দাদন দিয়ে রেখেছিলেন—আর তারই টানে শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের সুমহৎ উপন্যাস—গোরা।

কিন্তু টাকা 'অতি বিষম পদার্থ'। রবীন্দ্রনাথের বিদুষী ভাগিনেয়ী, লেখিকা, সম্পাদিকা এবং দেশনেত্রী সরলাদেবীর মনে হয়েছিল, তাঁর সর্বপূজ্য মাতুল একটি মুখচলতি প্রবচনে ধরা দিয়েছেন—"পৃথিবীটা কার বশ?" "পৃথিবী টাকার বশ।" *প্রবাসী* টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা কেনে—এটা লেখকদের টাকা না-দিতে বদ্ধপরিকর *ভারতী*-সম্পাদিকা সরলাদেবীর কাছে অতিশয় অরুচিকর মনে হয়েছিল। মাতুল রবীন্দ্রনাথ এবং সম্পাদক রামানন্দকে এক বাণে বিদ্ধ করে তিনি *ভারতী* পত্রিকায় লিখেছিলেন : "প্রবাসী-সম্পাদক বাল্মীকি প্রতিভার কবিকেও সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।" রবীন্দ্রনাথের অসহ্য লেগেছিল বড়োলোকের দুলালি কন্যার এই মুরুব্বিয়ানা। সবুজ পত্রের আশ্বিন ১৩৩৩ সংখ্যায় এক পত্রে তিনি সরলার বাচালতার কঠিনতম সমালোচনা করেন। সরলা তাঁর আত্মীয়া বলে প্রকাশ্যে এই লেখার প্রয়োজন বোধ করেন। সরলা দাবি করেছিলেন, *ভারতী*-র একাধিক সম্পাদক হয়েছেন, কিন্তু কোনো সম্পাদকই অর্থলিপ্সায় *ভারতী*-র সেবা করেননি, *ভারতী*-র সেবাকে তাঁরা জীবিকার অবলম্বনও করেননি। রবীন্দ্রনাথ সরলার মতো সরলা ছিলেন না, তাই জানতেন—ব্যবসা না ক'রে পত্রিকা চালানো একমাত্র সম্ভব যদি পিছনে পরধনের ভাণ্ডার মজুত থাকে, এবং সেই ধন আসে— ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ জানতেন, ব্যবসা থেকে—এবং জমিদার রবীন্দ্রনাথ জানতেন, তা আসে জমিদারির টাকা থেকেও। তদুপরি ব্যবসায়ী ও ভিক্ষুক রবীন্দ্রনাথ জানতেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে তাঁকে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রির ব্যবসা করতে হয়েছিল (বৃদ্ধ বয়সেও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে); লক্ষ্মী তাঁর "লেখনীর উপরে স্বর্ণবৃষ্টি করলে" তিনি মোটেই দুঃখিত হবেন না। এই সূত্রে রামানন্দর কাছে তাঁর ঋণের কথা কবি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন : তাঁর পক্ষে লড়াই করে রামানন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন; রামানন্দই প্রথম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর প্রবন্ধের জন্য অর্থদান করেছেন; ('মাসিক পত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার'); রামানন্দ প্রদত্ত ধারাবাহিক সম্মান-দক্ষিণা তিনি 'দেশের কাজে লাগাতে' পেরেছেন। তারও বড়োকথা—

> প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কেবল লেখা দিয়ে *প্রবাসী*-র সাহায্য করেননি, যখন তিনি 'বিখ্যাত কবি' তখনও বিলাতি বা আমেরিকান পত্রপত্রিকা থেকে অংশ বেছে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের দ্বারা

তাদের অনুবাদ করিয়ে, প্রয়োজনমতো সংশোধন করেও, *প্রবাসী*-তে পাঠাতেন। (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮)।

রবীন্দ্র-সাহিত্য এবং ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালির অবজ্ঞা অথবা আক্রোশ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ছিল স্থায়ী অভিযোগ। কিন্তু সর্বত্র যেমন এখানেও তেমনই, মহৎ ব্যতিক্রম ছিল—রামানন্দ বিনীত গর্বের সঙ্গে ব্যতিক্রমদের প্রথম সারিতে নিজের স্থান নির্দেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পরে তিনি লেখেন :

> রবীন্দ্রনাথ বিলাত গিয়া তাঁহার গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনেক পূর্ব হইতেই তাঁহাকে জগতের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ সমঝদার লোকের, বা এরূপ রসজ্ঞের মতো বুঝিয়া-সুঝিয়া জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করিবার লোকের একান্ত অভাব বঙ্গদেশে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও শেষোক্ত ব্যক্তিদের মতো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগৌরব কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাই আজ...'আমরা তাঁহাকে মোটেই চিনিতে পারি নাই, বিদেশী তাঁহাকে চিনাইয়া দিল তবে চিনিলাম', এরূপ চিন্তাপ্রসূত লজ্জায় ও ক্ষোভে আমাদিগকে মাথা হেঁট করিতে হইতেছে না। (অগ্রহায়ণ ১৩২০)।

তাই বলে 'মধ্যাহ্নে অন্ধকার' কথাটা বাতিল হয়ে যাচ্ছে না—তদনুযায়ী 'অপরাহ্নে অন্ধকার'ও আমরা ব্যবহার করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দর সম্পর্কের মধ্যে অপরাহ্নের অন্ধকার কালো ছায়া ছড়িয়েছিল। মানবিক সম্পর্কের কাহিনি রচনায় যাঁদের আগ্রহ আছে তাঁরা এখানে উত্তম সাহিত্যের উপাদান পেয়ে যাবেন।

রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ চিঠিপত্রগুলি নাড়াচাড়া করে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরার মোট কারণ এই মনে হয়েছে—

রামানন্দ, ততোধিক তাঁর তরুণ পুত্র অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের (তারুণ্যের ঔদ্ধত্যে যিনি টগবগে) মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিকটবর্তী কিছু ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে বন্দি মহারাজা করে ফেলে, তাঁর মোহর ব্যবহার করে, রাজ্যপাট চালাচ্ছেন। অপরদিকে 'উক্ত কিছু ব্যক্তির' মনে হয়েছিল, রামানন্দবর্গ রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁর সম্পত্তি লিখিয়ে নিচ্ছেন, তার দ্বারা *প্রবাসী*-র ভাঁড়ার ভরাচ্ছেন।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত সূক্ষ্মরসচিহ্নিত নয়, বড়োই মোটাদাগের, তবে ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়ায়।

সংঘর্ষ কয়েকটি বিষয় নিয়ে। একটি নীতিঘটিত। রামানন্দ ১৯২৫ সালে বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের (কলেজ বিভাগ) অধ্যক্ষ হলেও কিছুদিন পরেই তা ত্যাগ করেন কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর ছাত্রদের আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দেবার অনুমতির বিনিময়ে বিশ্বভারতীতে পরিদর্শক পাঠাবার অধিকার নিয়েছিলেন। অথচ রামানন্দর পক্ষে "বাহিরের কোনো কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের অধীন কোনো বিদ্যামন্দিরে কাজ" করা সম্ভব ছিল না। (রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, ২২-৮-১৯২৫)। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হল না। রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছোল যে, অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "তার হাতে এমন ডকুমেণ্ট আছে" যাতে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতী, সকলকেই "ডাস্টবিন-এ বসাইতে পারে।" (রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ, ১৬ আষাঢ় ১৩৩৪)। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, বিশ্বভারতী সম্বন্ধে *প্রবাসী*-তে যা বেরিয়েছে তার উদ্দেশ্য "বিভীষিকা" দেখানো। (ওই, ১৬ আষাঢ় ১৩৩৪)। রামানন্দ

দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন, কিন্তু বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা এলে তার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য সংবাদসংগ্রহের অধিকার ছাড়তে রাজি হলেন না। (ওই)

এখানেও শেষ হয় নি। রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপভ্রমণ করছেন, রামানন্দও বিদেশে, তখন *প্রবাসী*-র অস্থায়ী সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় ইতালিতে রবীন্দ্রনাথের মুসোলিনির আতিথ্যগ্রহণ, পরে মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট চরিত্র সম্বন্ধে নিন্দাবাদের সূত্রে ব্যঙ্গবিদ্রুপে-ভরা সম্পাদকীয় লেখেন (আশ্বিন ১৩৩৩)।

লেখাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথের ক্রোধ ও ক্ষোভের সীমা ছিল না। ভিয়েনা থেকে ২৫ অক্টোবর ১৯২৬, রামানন্দকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে তাঁর মথিত মনেব রূপ দেখা গেছে। *প্রবাসী*-র সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক তাতে ওই কাগজে "আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধতা স্বতই অতিপরিমাণ লাভ করে লোকের চোখে উগ্র হয়ে লাগে", রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। আরও বলেন, "আমার সম্বন্ধে এ-রকম তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেশী বিদেশী শত্রু মিত্র কারো কাছ থেকে অনেকদিন পাইনি।"

ব্যাপারটা কিন্তু বিশুদ্ধ নীতিঘটিত ছিল না। এর সঙ্গে ব্যবসায় নামক স্থূল ব্যাপারটি জড়িয়ে গিয়েছিল। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে *প্রবাসী*-কে তাঁর রচনার প্রধান অংশ অর্পণ করা আর সম্ভব হচ্ছিল না, বা তাঁর সচিবরা তাঁকে সে-কাজ করতে দিচ্ছিলেন না। এমন করতে না দেওয়ার একটা হেতু—সরস্বতীর বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষ্মীলাভের চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের ঘর-সংসার বা বৃহত্তর বিশ্বভারতী-সংসার অর্থাভাবে এমন অচল অবস্থায় পৌঁছোয় যে, নিলামের বড়ো ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হয়েছিল। সূক্ষ্মতম স্পর্শানুভূতিযুক্ত কবির পক্ষে মর্মন্তুদ অবস্থা। এইসঙ্গে আরও যা হয়, তাঁর পরিমণ্ডলীর অনেকের কাছে তাঁর উপরে *প্রবাসী*-র আধিপত্য অসহ্য *ঠেকেছিল*—এবং তাঁরা *প্রবাসী*-কে 'crush' করবার সংগ্রামী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্তত রামানন্দর কাছে সেই সংবাদ পৌঁছেছিল। সংবাদটিকে বিশ্বাস করবার হেতুও তিনি পেয়ে যান। প্রথমত দেখলেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ *বসুমতী*-তে 'নটীর পূজা' লেখাটি ৬০০ টাকায় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়, *বিচিত্রা* পত্রিকার সঙ্গে লেখার ব্যাপারে আর্থিক বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। রামানন্দ এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে, *বসুমতী*-র মতো পত্রিকায় ('নটী' পত্রিকা!) 'নটীর পূজা' দেওয়াকে তিনি 'নটীর পুরস্কার' বলে একাধিক বার উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে লেখা এক চিঠিতে (২৬ বৈশাখ ১৩৩৩)। এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তও করেছিলেন, "আপনার নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনি অতঃপর আমাকে বাংলা বা ইংরাজি কোনো লেখা দিবেন না।"

তবু রামানন্দ জানতেন, হিন্দুভাব-জড়ানো পাঁচমিশালি বসুমতী-তে রবীন্দ্রনাথ আটকা পড়বেন না। এমনকি চিরনবীন কবি আদর্শের প্রেরণায় *সবুজ পত্র*-তে যতই সবুজ বার্তা লিখতে থাকুন সেসব *প্রবাসী*-র পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু *বিচিত্রা*!

বিশের দশকের শেষভাগে *প্রবাসী* 'প্রবীণ অভিজাত'— এবং 'প্রকৃষ্টরূপে বাসী' (নজরুলের সোৎসাহ উক্তিমতো)— এই দুই প্রান্ত ছুঁয়ে অবস্থিত। মর্যাদার ভারী বর্ম *প্রবাসী*-র স্বচ্ছন্দ বিচরণের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল, বিশেষত যখন *ভারতবর্ষ* বা *বিচিত্রা*-র মতো ঈষৎ পুরাতন বা সদ্যোজাত পত্রিকাগুলি চৌঘুড়ি হাঁকাচ্ছিল—যার একটিতে আসীন অসম্ভব জনপ্রিয় শরৎচন্দ্র, অন্যটিতে ইতস্তত ভ্রমণে এখন উদ্যোগী অন্য কেউ নন—*প্রবাসী*-র প্রাণপুরুষ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!! রামানন্দ ক্রমান্বয়ে পত্রযোগে রবীন্দ্রনাথকে নিজের অভিমান, যন্ত্রণা ও আহত রোষ প্রকাশ করে যেতে লাগলেন। যথা,

> অনেকদিন আগে আমি আপনাকে একটা উপন্যাস লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন আপনার ইচ্ছা হয় নাই।... তাহার পর নানা কারণে এবং আপনার ইচ্ছা হওয়ায় আপনি বিচিত্রার জন্য উপন্যাস লিখিতেছেন। (১৫ আষাঢ় ১৩৩৪)।
>
> আপনিও আমাকে এখানে মৌখিক বলিয়াছিলেন যে, বিচিত্রার লোকেরা যে-রকম করিয়া আপনার সব কবিতাগুলি দখল করিয়া লয়েন বা লইতে চান, তাহা আপনার ভালো লাগে না। কার্যত দেখিতেছি যে, তাঁহারা পর্যাপ্তেরও অধিক লেখা পাইয়াছেন।

বিচিত্রা-র জোর কোথায় তা *বিচিত্রা*-র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জবানি থেকেই দেখা যাক :

> 'তিন পুরুষ' উপন্যাস (পরে 'যোগাযোগ') রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরোধক্রমে লিখেছিলেন। 'নটরাজ' কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই লিখেছিলেন। একটি সমসাময়িক মাসিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেটি অধিকার করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ৬০০ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব করে তাঁরা ইতস্তত করছিলেন অবগত হয়ে আমরা একেবারে এক সহস্র টাকার একখানি চেক নিয়ে গিয়ে 'নটরাজ' হস্তগত করি। 'যোগাযোগ' উপন্যাস বিচিত্রায় প্রকাশ করার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে তিন সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলাম। এই দক্ষিণার প্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাদের দেওয়া এ দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে decent'। (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 'স্মৃতিকথা', চতুর্থ পর্ব, পৃ. ১০৩)।

রামানন্দর অভিযোগ ছিল, বিশ্বভারতী যখন রবীন্দ্রনাথের লেখা বিক্রয় করছেন তখন দেয় টাকার অঙ্ক পরিষ্কারভাবে বলছেন না কেন? তিনি তো কখনো দক্ষিণার ব্যাপারে কার্পণ্য করেননি! প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথকে লেখার জন্য দক্ষিণা দিয়ে আসছেন। তা ছাড়া *প্রবাসী*-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখক-সম্বন্ধ "সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী।" এবং *প্রবাসী* এমন কোনো "সাহিত্যিক, নৈতিক বা অন্যবিধ অপকর্ম" করেনি যে, তাকে "অন্য কাগজের পাত্রাবশিষ্টের মতো" জিনিস দেওয়া যায়। রামানন্দ বারবার জানালেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে *প্রবাসী*-র ঋণ অপরিশোধ্য, এবং তিনি ঋণী থাকতেই চান। কিন্তু "ইহাও গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা যে, আমি অহঙ্কারশূন্য নহি।" সুতরাং রামানন্দ নিজের হৃৎপিণ্ডকে মুঠিতে ধরে লিখলেন :

> প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যা হইতে আমি আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম।...প্রবাসী crushed হয় কিনা, তাহার experiment-টা সম্পূর্ণ সন্তোষজনকরূপে হইয়া যাওয়াই ভালো। (১৫ আষাঢ় ১৩৩৪)।
>
> আপনার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ আমি কেন করিব? প্রবাসীর [সঙ্গে আপনার] সাহিত্যিক সম্বন্ধ ছেদন গভীর দুঃখের সহিত করিতেছি, স্পর্ধার সহিত করিতেছি না। ক্ষুদ্রচেতা লোকদের বাক্যবাণ সহ্য করা আমার এখন ক্ষমতার অতীত হইয়াছে বলিয়া আমি এই উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহা আমার সমূহ ক্ষতির এমন-কি সর্বনাশের কারণ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়াও করিলাম। (১৬ আষাঢ় ১৩৩৪)।

অপরদিকে অপরিমেয় ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যাতনা এবং অপমানবোধ। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কটু হয়ে মাথা তুলেছিল 'টাকা' শব্দটা। জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পেয়েছেন, সত্যকার বন্ধুর সংখ্যা

খুবই কম। যে দু-এক জন ছিলেন তাঁরা সরে গেছেন। সর্বশেষে রামানন্দও গেলেন। তাও টাকা লেনদেনের টানাটানিতে। *প্রবাসী*-র প্রতি প্রীতির জন্য তিনি ঘরে বাইরে সমালোচিত হয়েছেন, সেই *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ*-র 'দরোয়াজা বন্ধ' হয়ে গেল তাঁর কাছে—টাকার জন্য!! রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাবোধকে যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝবেন তিনি কোন্ মর্মান্তিক অপমানের জ্বালায় রামানন্দকে লিখেছিলেন :

> আজ দৈববিপাকে যখন থেকে লেখা বেচাকেনা করতে বাধ্য হয়েছি তখন থেকে নিজেকে অবমাননা ও বেদনার থেকে রক্ষা করা আমার পক্ষে অসাধ্য হল। যে-মানুষ হাটে নেমেছে সে বন্ধুত্বের দাবি করতে পারে না। পূর্বে আমার যে সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য ছিল আজ পণ্যশালায় তা বিকিয়ে দিয়েচি। (১ জুলাই ১৯২৭)।

তাঁর একেবারে কান্নাকরুণ কণ্ঠস্বর,

> "আমাকে ভিক্ষা কেউ দেয় না, উপার্জন করতে হয়।" (২ জুলাই ১৯২৭)।

রবীন্দ্রনাথ কেন *বিচিত্রা*-র পোষকতা করেছিলেন? সে কি কেবল অর্থের প্রয়োজনে? অর্থের প্রয়োজন সত্যই ছিল, *বিচিত্রা* আশাতীত অর্থও দিয়েছিল। সুতরাং আপাতত কারণ অর্থ নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালের বন্ধন-অসহিষ্ণু। সংগঠনের গণ্ডিতে বাঁধা পড়তে গররাজি। নিজের প্রাণরস দিয়ে গড়া শান্তিনিকেতনে কত ভাঙাগড়া করেছেন, কত বার শান্তির নিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এ কথা ঠিক যে প্রবাসী তাঁর জন্য বহু কিছু করেছে, *প্রবাসী* দীর্ঘদিন ধরে তাঁর রচনার প্রধান পত্রাধার। তবু তাঁর পক্ষে "রবীন্দ্রনাথ কেবল প্রবাসীরই", এই কথাটা অস্বস্তিকর। তিনি সেই ভূমিকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন যখন আতপ্ত রবি-কর পাবার অধিকার ছিল 'রাস্তার ওই ছোট ছেলেটারও।' নানা পত্রে নানা আকারে নিজেকে স্থাপিত দেখার রসশিল্পীসুলভ বাসনাও তাঁর থাকতে পারে। বাসাবদল কি রবীন্দ্রনাথের স্বধর্মের মধ্যে পড়ে না— জোড়াসাঁকো থেকে শান্তিনিকেতন, সেখানে উদয়ন, কোণার্ক, শ্যামলী, উদীচী, পুনশ্চ। আবার শান্তিনিকেতন থেকে সুদূর আর্জেন্টিনা। সব ঠাঁই মোর ঘর আছে।

মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান। তবু মরণযন্ত্রণা বড়ো যন্ত্রণা। রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "আমি বড় অশান্তিতে আছি।" "ভগবানের নিকট আলো চাহিতেছি। আপনার আশীর্বাদ ও স্নেহ চাহিতেছি।" (৩ জুলাই ১৯২৭)।

ভগবানের আলো এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও আশীর্বাদ তিনি অচিরে লাভ করেছিলেন। রামানন্দই দরজা বন্ধ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ করেননি। যখন তিনি *বিচিত্রা*-র জন্য 'যোগাযোগ' লিখছেন তারই মধ্যে *প্রবাসী*-র জন্য লিখেছেন 'শেষের কবিতা'। সে-লেখা *প্রবাসী*-তে বেরোবার পরে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপবেন না, সত্যনিষ্ঠ রামানন্দর এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হয়েছিল। তাতে সত্যের মুখরক্ষা হয়নি, কিন্তু প্রাণরক্ষা হয়েছিল। 'শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা! শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা!'

দেবতা শুনেছিলেন।

১৯ প্রবাসীর আবাসে

অন্দরমহলের মধ্যে উঁকি দিয়ে কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীরা অনেক বেআব্রু সৌন্দর্যদর্শন করে থাকেন, আর রসিকবাবুরা নিজেদের গিন্নিকে তালাবদ্ধ করে দিয়ে এসে তা উপভোগও করেন। *প্রবাসী*-র বেলায় সেটি হবার জো নেই। পরিমল গোস্বামী তো প্রায় বলেই ফেলেছেন, বাপ্ রে, ও যে ব্রাহ্মমন্দির।[৬] কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের দেখা ওখানকার ছবিটি এইরকম :

> প্রবাসী অফিস ছিল একেবারে পিউরিটান। রামানন্দবাবুর পাশের একটা ঘরে সহকারীদের অফিস। টেবিলের একদিকে ব্রজেনবাবু, অন্যদিকে যোগেশ বাগল। অন্য এক টেবিলে শৈলেন লাহা, আর একজন কর্মচারী, এঁর নামটা মনে পড়ছে না। ...ব্রজেনবাবু ইতিহাসের স্কলার, গল্প করতে ভালবাসতেন। উনিই প্রধান বক্তা হয়ে গল্প করে যাচ্ছেন। শৈলেনবাবু, যোগেশবাবু, মাঝে মাঝে হাতের কাগজ থেকে চোখ তুলে জোগান দিয়ে যাচ্ছেন।... গল্প একটু নরম, সংযত কণ্ঠেই, পাশেই কর্তার ঘর, তবে মুক্তই।[৭]

সে-'কর্তা' যথাপূর্ব তথা পরম্। উনিশ শতকের শেষ দশকে তাঁর দিনপঞ্জিতে দিনকর্মের যে-চেহারা দেখা যায়, তা বিশের দশকের একেবারে শেষেও বদলায়নি। এই সময়ে কী করতেন গোপাল হালদারের স্মৃতিতে 'রূপনারায়ণের কূলে' (২য়, পৃষ্ঠা ২৬৪) গ্রন্থে তা দেখা যায়।

এহেন *প্রবাসী*-তে জাত আড্ডা মারা সত্যই সম্ভব নয়। সেখানে আসেন দারুণ দারুণ সব লোক। একদা আসতেন রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ। পরের যুগেও গোপাল হালদার নানা ভারী মানুষের সাক্ষাৎ ওখানে পেয়েছেন। তবু প্রবাসী তো সাহিত্যিকদের কাগজও। তার কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে দেশের দিকপাল জ্ঞানী গুণী কবি-সাহিত্যিকরা ছিলেন : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, নীরদ চৌধুরী, পুলিনবিহারী সেন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার এবং অসংবরণীয় সজনীকান্ত দাস। রামানন্দর আত্মীয়-কুটুম্বগণও কম যান না—পুত্র কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, কন্যা সীতা ও শান্তাদেবী, জামাই কালিদাস নাগ। কালিদাস নাগ আবার কল্লোলের দলকে *প্রবাসী*-তে জুটিয়েছেন, সজনীকান্তের টানে বনফুল এসেছেন। 'রসকলি' প্রত্যাখ্যাত হলেও 'কালিন্দী' ইত্যাদি নিয়ে তারাশঙ্কর জায়গা করে নিয়েছেন; বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন তাঁর সেরা সব লেখা নিয়ে (আরণ্যক, অপরাজিত); শরদিন্দুর অনবদ্য ঐতিহাসিক রোমান্সভরা গল্পগুলি বেরুচ্ছে; পরশুরামের গল্পও; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তো নিয়মিত লেখক; মোহিতলালের প্রধান কবিতার আশ্রয় এই পত্রিকা; বোহেমিয়ান প্রবোধকুমার সান্যালও নাক গলিয়েছেন—তবু প্রবাসী-তে আড্ডা নয়? একেবারে হত না তা নয়। প্রবাসী অফিস ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে অশোক চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে আড্ডা জমত, যাতে কমবেশি যোগ দিতেন যোগানন্দ দাস, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, হেমচন্দ্র বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে, কালিদাস নাগ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য, ভাষারীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজ—সবই আলোচনার বিষয় হত, তবে মন্দমন্থরে।

পরিমল গোস্বামীর লেখায় ('প্রবাসীর আড্ডা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১) পাই— খনিত্র এবং লেখনী নিয়ে ইতিহাসের গুহায় প্রবিষ্ট [৮] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র বাগল পুরাতনী বিষয়ে তর্কবিতর্ক করতেন, ব্রজেন্দ্রনাথ উত্তেজিত এবং যোগেশচন্দ্র শান্ত, উত্তেজিত হলে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে সাধুভাষা, তিনি কিঞ্চিৎ রসিকও বটে, তাঁর চাপা রসিকতার চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'জীবনতীর্থ' গ্রন্থে। *প্রবাসী*-তে সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর লেখা নিয়মিত মস্ত মস্ত আকারে বেরোয়, সেগুলির অভাবে বাংলা সাহিত্য শুকিয়ে মরত না। তবু অমনটি কেন ঘটছিল তার সুমিষ্ট উত্তর ব্রজেন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন : "জানেন বিভূতিবাবু, অনেকের রাগ প্রবাসীতে সীতাদেবী, শান্তাদেবীর লেখা বেশি বের হয়। তা আমি বলি—তাদের মতো আর কেউ বলতে পারবে না—প্রবাসী আমার বাবার কাগজ।"

কিন্তু দীর্ঘাকার, শুভ্র কেশ-গুম্ফ-শ্মশ্রু এবং শুভ্রবসন-সমন্বিত ঋষি-প্রতীক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে যতখানি নৈকষ্য গম্ভীর ভাবা হয়, তিনি কি পুরো তাই ছিলেন? বিধাতা মানবসৃষ্টিকালে প্রত্যেকের ভিতরেই অল্পবিস্তর অম্লের বরাদ্দ রেখে দিয়েছেন। রামানন্দর অম্ল-কোটা কম, তবু শূন্য নয়। সুতরাং এ-কথা বিস্ময়কর হলেও বলা হয়েছে যে, "স্বয়ং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় [বন্ধ হয়ে যাওয়া] শনিবারের চিঠির পুনর্জীবনের প্রধান উদ্যোক্তা হইয়াছিলেন।" [৯] উক্ত পুনর্জীবিত *শনিবারের চিঠি*-তে রামানন্দ মুসলমানি বাংলা এবং সাম্প্রদায়িকতাকে আক্রমণ করে বেনামে ব্যঙ্গরচনা লিখেছেন। *ভারতী* সম্পাদিকা সরলাদেবীকেও তিনি রেহাই দেননি। "প্রবাসী-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিরা" শিরোনামায় যা লিখেছিলেন তার প্রথম অনুচ্ছেদ এই : "সর্বসাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, ভারতী-র সম্পাদিকা পণ্ডিতানী সরলা দেবীচৌধুরাণী প্রবাসী-সম্পাদকের মাসতুতো দিদিমা হন। সেইজন্যই তিনি ভারতী-র ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় উক্ত সম্পাদককে শুধু 'রামানন্দ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

আর সজনীকান্ত সন্ধান করে জানিয়েছেন, রামানন্দ বাল্যকাল থেকেই পুরো ঋষি নন, কেন-না দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় আছে, "বাঙাল বাঁকুড়াবাসী দুষ্ট রামানন্দ।" [১০]

আর সত্যমিথ্যা বিচারের দায় গ্রহণ না করে এই সংবাদ নিবেদন করি—*শনিবারের চিঠি*-র সঙ্গে সংস্রবের কথা রামানন্দ একেবারে অস্বীকার করেছিলেন। (*প্রবাসী*, শ্রাবণ ১৩৩৫)।

২০ রামানন্দনামা

এই ক্ষেত্রে যিনি সর্বোত্তম রচনায় সমর্থ সেই রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে রবীন্দ্র-বিহীন জগতে ফেলে রেখে ("ভাবি নাই রবীন্দ্র-বিহীন জগৎ দেখতে হবে") তিন বছর আগেই প্রস্থান করেছেন। তার আগে তিনি অবশ্য অনেক বারই রামানন্দ নাম-গানে যোগ দিয়েছেন। *প্রবাসী* তার ২৫ বৎসর পূর্তির পরে ২৬ বৎসর শুরুতে (বৈশাখ ১৩৩৩) পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' নামক একটি কবিতাকে মুখপাতরূপে পেয়েছিল। এই সংখ্যাতে সমাজের নানা মহলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির "আশীর্বাদ ও স্বস্তিবাচন" আছে। সে-বস্তু নিয়মিত *প্রবাসী*-র ভাগ্যে জুটেছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বনস্পতিগৌরব তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন। রামানন্দর বয়স যখন ৭৮ বৎসর পূর্ণ হয়েছে, তখন তাঁর রোগশয্যাপার্শ্বে উপনীত

হয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ সংবর্ধনা জানাবার জন্য—এবং মানপত্র দান করেছিলেন ঐতিহাসিকশ্রেষ্ঠ যদুনাথ সরকার। তার মধ্যে এই কথাগুলিও ছিল, "আপনার বাণী শুধু জন্মভূমি বঙ্গদেশেই আবদ্ধ নাই, ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীই আপনার বাণী শুনিয়াছে। ...আপনি চিরজীবন অসত্য, অবিচার ও অশুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন।" বিশ্বভারতীর পক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত মানপত্রের একাংশে ছিল : "সৎ, সাহসী এবং নির্ভীক এই পুরুষকে দর্শনেই পুণ্য।" কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে অভিনন্দনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রফুল্লকুমার সরকার স্বাক্ষরিত মানপত্রটি, যার সম্বোধনে বলা হয়েছিল "হে সাংবাদিক শিরোমণি!" আর-একটি মানপত্রের উল্লেখ করতেই হয়—'নিখিল ভারত অন্ধ আলো নিকেতন'-এর পক্ষে যা দেওয়া হয়। অন্ধদের কাছে রামানন্দ ছিলেন আলোক-দূত। "ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সৃষ্টির প্রথম করুণা হইতে যাহারা বঞ্চিত" সেই অন্ধের দল বলেছিলেন, " 'দাসী' পত্রিকায় তোমার দরদী মন যে 'অন্ধ লিপিমালা'র সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই আজ সামান্যতম পরিবর্তিত আকারে সমগ্র বাঙালী অন্ধদিগের সম্মুখে নূতন জগৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়েছে।" [১১]

রামানন্দ রোগশয্যায় শুয়ে এইসব অভিনন্দন গ্রহণ করেছিলেন। আরও বহু প্রস্তুত অভিনন্দনজ্ঞাপনের সুযোগ সাঙ্গ করে কয়েক মাসের মধ্যে তাঁর দেহান্ত হল—১৩ আশ্বিন ১৩৫০। আট বৎসর নানা অসুখে কাতর ছিলেন, তথাপি "১৯৪২-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি অপরিমাণ সহিষ্ণুতার সহিত সম্পাদকের এবং জনসাধারণের পথনির্দেশকের কার্য...পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করিয়াছেন।" "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বেও তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতেছিলেন।" [১২]

দেহান্তের পরে তাঁর জীবন ও কার্যাবলির পর্যালোচনা করে বহু লেখা নানা স্থানে বেরিয়েছে। এই বিপুল বিস্ময় বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে—এক জীবনে এমন বৃহৎ কর্ম একজন কীভাবে সমাধা করতে পারলেন—*প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ, বিশাল ভারত*। সিটি কলেজে রামানন্দর ছাত্র ও সহকর্মী, পণ্ডিত-লেখক রজনীকান্ত গুহ এই প্রশ্নটি তুলে ধরেছিলেন, "তিনি অবিচ্ছেদে একটি বাংলা পত্রিকার বিয়াল্লিশ বৎসর, এবং তৎসহ একটি ইংরেজি পত্রিকার ছত্রিশ বৎসর সম্পাদকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; সময়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমার জানিতে কৌতূহল হয় যে, ভারতবর্ষে একই ব্যক্তি স্বদেশী ও বিদেশী ভাষায় দুইখানি পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছেন, এরূপ দ্বিতীয় কেহ আছেন কিনা?" [১৩]

বিংশ শতাব্দীতে প্রক্ষিপ্ত উনবিংশ শতাব্দীর অতিকায় এই পুরুষ, কীভাবে ওই ধারাবাহিক দৈহিক মানসিক শ্রমের জীবন বহন করেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর রামানন্দ দিয়েছিলেন যোগেশচন্দ্র রায়-বিদ্যানিধিকে :

> আমার পিতৃপুরুষ ভট্টাচার্য ছিলেন। তাঁদের আলোচালের গুণে ও আশীর্বাদের ফলে চালাচ্ছি। [১৪]

আলোচালের গুণে কী অন্য গুণে, আমরা ঠিক জানি না। এইটুকু জানি, এক পরিপূর্ণ কৃতার্থ জীবনের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। এবং তিনি এই সার্থক আশীর্বাদ পেয়েছেন ষাট বৎসর পূর্ণ হলে, তাঁর আচার্য এবং এক শ্রেষ্ঠ ভারতীয় জগদীশচন্দ্র বসুর কাছ থেকে :

> প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই।...
>
> যে শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মানুষ ভয়ের অতীত হইত, যে-বীরধর্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা তুমি জীবনে অনুষ্ঠান করিয়াছ এবং লেখাদ্বারা সর্বসাধারণে প্রচারিত করিতেছ। [১৫]

রামানন্দ সম্বন্ধে চরম কথাটি জগদীশচন্দ্রই উচ্চারণ করেছেন।

প্রথম সংখ্যার সূচি

তথ্যসূত্র

১ ক্ষিতিমোহন সেন, 'পুণ্যচরিতকথা', প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০।
২ 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দিনপঞ্জি ১৮৯০' (প্যাপিরাস প্রকাশিত)-এর পাতায় পাতায় আকুল পত্নীপ্রেমের কথা ছড়িয়ে আছে।
৩ প্রবাসী-পূর্ব রামানন্দর জীবনকথার জন্য প্রধানত নির্ভর করেছি শান্তাদেবীর 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্ধশতাব্দীর বাংলা' এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়'-এর (সাহিত্যসাধক চরিতমালা) উপর।
৪ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৩য়, ২২০-৩৩।
৫ যথা রবীন্দ্র-রামানন্দ পত্রাবলি প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য-সহ উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদনা করেছেন ড. ভবতোষ দত্ত— 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ড। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদনা করেছেন 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ— প্রবাসী (১৩০৮-৪৮ আষাঢ়)।' এর ভূমিকায় ও পরিশিষ্টে প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে। সেইসঙ্গে চিত্রা দেব-কৃত 'প্রবাসী ১৩৫০ পর্যন্ত রবীন্দ্র-আলোচনার সূচী।' এই বইয়ে বাদ-পড়া বিষয়গুলিকে নিয়ে উদ্ধৃতিযোগে আলোচনা করেছেন ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী 'নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে। এ ছাড়া রামানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ সবিশেষ।
৬ পরিমল গোস্বামী, 'প্রবাসীর আড্ডা', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১।
৭ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'জীবন-তীর্থ', পৃ. ৪০৯।
৮ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ', (সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ১৪০।
৯ সজনীকান্ত দাস, 'আত্মস্মৃতি', ১ম, পৃ. ২১৯।
১০ ওই, পৃ. ২২১।
১১ মানপত্রগুলি প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যা এবং শান্তাদেবীব গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।
১২ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫০।
১৩ রজনীকান্ত গুহ, 'শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়', প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০।
১৪ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় : স্মৃতিকথা', প্রবাসী, পৌষ ১৩৫০।
১৫ প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫০।

সাহিত্য

প্রাসঙ্গিক কথা

প্রবাসী-র এক মূল্যবান অংশ— বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেহান্ত সংবাদ— সেইসঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য। কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি কোন্ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন, সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করতে হয়েছে। একাধিক বিষয়ে তাঁরা গুণপ্রকাশ করেছেন। যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা শিবনাথ শাস্ত্রী। সাধারণ পাঠকের কাছে এঁদের মুখ্য পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবেই যদিও ইতিহাসমনস্ক কোনো মানুষের কাছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য এবং দার্শনিকরূপে অধিক মান্য। তেমনই শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সংগঠক হিসাবে ইতিহাসে স্বীকৃত পুরুষ। সেজন্য সাহিত্যিক পরিচয় গুরুত্বপূর্ণ হলেও এঁদের 'সাহিত্য' অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সাহিত্য-বিষয়ে কোনো বিতর্ক উঠলে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সেই-বিষয়ক বিতর্কগুলি একত্রে রাখা হয়েছে।

কালানুক্রমিকভাবে 'সাহিত্য' বিভাগে প্রথমে 'বঙ্কিমচন্দ্র'-অংশ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রামানন্দর মন্তব্যাদি বঙ্কিম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পর থেকে ছাপা হয়েছে। অথচ রবীন্দ্র-বিষয়ে রামানন্দর মন্তব্য ও অন্যান্য রচনা ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়ে রবীন্দ্র-দেহান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। সেইজন্য 'সাহিত্য' অধ্যায়ের সূচনায় 'রবীন্দ্রনাথ' এসেছেন। তিনি তাঁর সর্বশ্রেণির সাহিত্যসম্ভার *প্রবাসী*-তে ঢেলে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে মন্তব্যাদি 'সাধারণ ভূমিকা'য় আছে। বিস্তারিত উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তবে সাহিত্যমনস্ক পাঠকদের কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে নিজ কাব্য-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকাতরতার ব্যাপারটি। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও টমসনের সাহিত্যগত সম্পর্কের কথা এসে যায়। রেভারেন্ডে এডোয়ার্ড টমসন রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে দুটি বই লিখেছিলেন। বই দুটিকে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই পছন্দ করেননি। এমনকি নিজে কলম ধরে ছদ্মনামে বই দুটিকে, বিশেষত দ্বিতীয় বইটির কঠোর সমালোচনা করেন। বিষয়টি বিস্ময়কর এবং কৌতূহলজনক। একসময়ে এই বিতর্ক নিয়ে সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে এডোয়ার্ড টমসনের পুত্র ই পি টমসন 'Alien Homage : Edward Thompson and Rabindranath Tagore' বইটি লিখেছেন (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩)। উমা দাশগুপ্ত নানা তথ্যপূর্ণ টীকা এবং পরিশিষ্ট এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। উক্ত গ্রন্থসূত্রে প্রাপ্ত কিছু তথ্য সংক্ষেপে নিবেদন করা যায়। (প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ-টমসনের চিঠিপত্র সংকলন করে ভূমিকা ও টীকা-সহ আর-একটি গ্রন্থ উমা দাশগুপ্ত প্রস্তুত করেছেন : 'A Difficult

Friendship : Letters of Edward Thompson and Rabindranath Tagore 1913-1940', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৩)।

এডোয়ার্ড টমসন-লিখিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম বইটি ক্ষুদ্রাকার— 'Rabindranath Tagore : His Life and Work' (1921)। বৃহত্তর আকারের দ্বিতীয় বইটি 'Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist' (1926)। দুটি গ্রন্থই ১৯২০–১৯২২-এর মধ্যে লিখিত যখন টমসন নানা ঝঞ্ঝাটে ছিলেন।[১] প্রথম বইটি ১০০ পৃষ্ঠার; কলকাতা থেকে ১৯২১-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বইটির বিলম্বিত প্রকাশ ১৯২৬-এ। প্রথমটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও অনেক প্রাণপূর্ণ, কিন্তু তা দ্বিতীয়টির তুলনায় অবিবেচনাপ্রসূত। এর প্রথম অর্ধাংশ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রথম প্রকাশিত সাহিত্যিক জীবনী। সংবাদগুলির প্রধান ভিত্তি প্রশান্তকুমার মহলানবিশ, অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-প্রদত্ত তথ্যাবলি। প্রথম গ্রন্থে তথ্যে ও মন্তব্যে যেসব গন্ডগোল ছিল, দ্বিতীয় গ্রন্থে টমসন তা সংশোধন করে নেন। দুটি বইতেই টমসনের ভূমিকা ছিল একজন গুণগ্রাহী অথচ যুক্তিপূর্ণ সমালোচকের। তিনি সর্বজনীন সাহিত্যের মাপকাঠিতে 'রবি'র সম্বন্ধে পাক্কা মতামত দিতে চেয়েছেন।

এডোয়ার্ড টমসন-লিখিত গ্রন্থদ্বয় রবীন্দ্র-অনুরাগী মহলে ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এমন-কি টমসন যাঁকে আচার্য মনে করতেন সেই ব্রজেন্দ্রনাথ শীল[২] এবং টমসনের বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমনই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে নিজে কলম ধরে দ্বিতীয় বইটিকে ছিন্নভিন্ন করেন। (রচনাটি বর্তমান সংকলনমধ্যে মুদ্রিত হয়েছে)। একই কাজ বাংলা ও ইংরেজিতে করেছিলেন *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ*-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (বাংলা লেখাটি বর্তমান সংকলনে গৃহীত)। এ ছাড়া রবীন্দ্র-ভক্তদের আরো কেউ কেউ কলম ধরে এগিয়ে আসেন।

ই পি টমসনের 'Alien Homage : Edward Thompson and Rabindranath Tagore' গ্রন্থটিতে এডোয়ার্ড টমসনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সম্পর্ক এবং উভয়ের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে নানা ওঠাপড়ার চিত্তাকর্ষক বিবরণ আছে। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রমহলের প্রাচীন অংশ যেমন বই দুটির উপর খড়্গহস্ত, তেমনই রবীন্দ্র-অনুরাগী তরুণ বুদ্ধিজীবী লেখকদের অনেকেই দ্বিতীয় বইটিকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উৎকৃষ্ট সমালোচনা মনে করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুশোভন সরকার প্রমুখ। প্রমথনাথ বিশীরও একই মত।

---

১ ১৯২০-র গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে এবং ১৯২২-র শেষের দিকে বই দুটি লেখার কালে টমসন শরীরে ও মনে প্রায়ই অসুস্থ ছিলেন। বাঁকুড়ার অসহ্য গরমের মধ্যে তাঁকে ওয়েস্‌লিয়ান কলেজে কাজ করতে হয়েছিল। কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষও ছিলেন। বন্যাত্রাণের জন্য তাঁর লেখার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় নানা রাজনৈতিক আঘাত কলেজের উপর পড়েছিল। সেইসঙ্গে ইংরেজ সহকর্মিদের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হতো। এই পর্বের কথা টমসন নিজেই তাঁর স্ত্রী ও বন্ধুদের চিঠিতে লিখেছেন।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে পরিচয় ও ভাব বিনিময়ের পর টমসন রবীন্দ্রনাথকে সরিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথকেই তাঁর পথপ্রদর্শক করেন। টমসন তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছেন : "এই দুই মহান ভারতীয় সম্বন্ধে আমার সম্পর্ক কি পরিমাণ না পৃথক!...রবি লেখক হিসাবে আরো বড় আর ব্রজেন্দ্রনাথ আরো বড মনের অধিকারী এবং আরো বড় মানুস।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টমসনের সরাসরি সম্পর্ক ১৯১৩ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত; মধ্যপর্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে টমসনের যোগদান এবং রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী সফরের সময় বাদ দিতে হবে। তার পরেও উভয়ের সম্পর্ক ছিল। সেই পর্বে দুজনেই সাহিত্যবিষয়ক সংঘাত এড়িয়ে ব্যক্তিগত প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে যেদিন কবির নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদ এসে পৌঁছয় সেদিন টমসন সেখানে উপস্থিত আছেন। পূর্ব থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। পুরস্কারপ্রাপ্তির সংবাদের পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দনের সময় টমসন বলেছিলেন : "রবিবাবু, আমিই প্রথম ইংরেজ হিসাবে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—এই গৌরব আমাকে দেবেন।" শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী-অধ্যাপকদের মধ্যে সে সময়ের প্রমত্ত আবেগ উচ্ছ্বাসেরও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। রবীন্দ্রনাথকে সেই সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল খুবই লাজুক মানুষ। রবীন্দ্রনাথ যথেষ্টই অস্বস্তিতে ছিলেন এবং যেন এইসকল প্রশস্তিতরঙ্গের ধাক্কা থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিলেন। তবে পিয়ারসন এবং এন্ডরুজের গদগদ রবীন্দ্রভক্তিও টমসনের পছন্দ হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল এই দুই জন মানুষ কবির গুণগরিমা ফলাও করে দেখিয়ে কবিকে এক ভ্রান্ত জগতে উঠিয়ে দিচ্ছেন। টমসনের অভিযোগ—রবীন্দ্রনাথ কার্যত এন্ডরুজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথকে পুনশ্চ টমসন ইউরোপ আমেরিকা সফরের সময় বহুসংখ্যক মানুষের স্তুতিতে আলোড়িত দেখলেন। টমসন বক্র মনে ভেবেছেন, রবীন্দ্রনাথ মুখে অস্বস্তি জানালেও গোটা ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করছেন। ১৯২০-র শেষের দিকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে টমসন লেখেন : "রবির স্বার্থেই বলা উচিত তাঁর সম্বন্ধে রচিত কতকগুলি মোহজনক ধারণা ভাঙা প্রয়োজন। সেগুলিকে যদি কবি অসার ও অর্থহীন ভাবেন তবু কিন্তু নিজের থেকে দূর করতে চেষ্টা নাও করতে পারেন। যথা, বছরের পর বছর তিনি তাঁর বন্ধুদের ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রকাশ্য সাক্ষাৎকারে বলে গেছেন যে, তিনি পাবলিসিটিকে কি পরিমাণে ঘৃণা করেন। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আলোর কাছ থেকে দূরে থাকতে পারে না, তেমনি তিনিও প্রচার থেকে দূরে থাকতে পারেন না।" টমসন অন্যত্র একই কথা বলেছেন—আন্তর্জাতিক খ্যাতিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নিয়তি' বলতেন। কিন্তু টমসনের চোখে সেটা তাঁর অভিপ্রেত আত্মশ্লাঘা। আর উচ্চাসন থেকে রবীন্দ্রনাথের বাণী-বিতরণ ব্যাপারটিও (ঋষিতুল্য আকার, অনুরূপ পরিমিত বচনবিন্যাস ইত্যাদি) টমসনের কাছে উত্তম ব্যাপার মনে হয়নি। ১৯২১-এ উইলিয়াম ক্যান্টনকে লেখা চিঠিতে টমসন বলেছেন, "কবি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু অসহ্য ঐ প্রশস্তির পরিবেশ। পুরনো কালের ঋষির ভূমিকা তিনি নিয়ে ফেলেছেন। তাঁর কাছে যেই আসুক সেই তাঁর পাদস্পর্শ করে, যাবার সময়েও তাই করে। তারা তাঁকে 'গুরুদেব' বলে। আমি অবশ্য তা বলি না। ...কবিকে আমি সোজাসুজি কিছু কথা বলেছি। তিনি তাঁর *বিশ্বখ্যাতির* কথা বলছিলেন। সেটা তাঁর কাছে নাকি প্রলোভনের বস্তু। আমি বললাম, হ্যাঁ, তবে সেটা অন্যদের তুলনায় আপনার কাছে অধিক প্রলোভনের বস্তু। তিনি সেকথা খুব পছন্দ করলেন না।" ১৯২৭-এ রোটেনস্টাইনকে টমসন লিখেছেন, টেগোরের খ্যাতি অবলুপ্তিতে তিনি আশাহত। তার মূল কারণ, তাঁর মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য দেশ ভারতবর্ষের যে কথা শুনতে পারত, তার সুযোগ তিনি হারিয়েছেন। ইংল্যান্ড তাঁর কথায় এক বার কান দিয়েছিল, তারপর তা হারিয়ে যায়।

প্রশস্তির মধ্যে যেভাবে তিনি আত্মতুষ্টিতে নিজেকে আটকে রাখেন তা ঘটতে পারত না যদি কুড়ি বছর আগেকার রসবোধ এবং প্রাণপ্রাবল্য তাঁর থাকত। যে মানুষ তিনি ছিলেন সে মানুষ এখন নেই।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকাভ্রমণ সম্বন্ধে *মডার্ন রিভিউ*-তে উচ্ছ্বসিত প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তা পড়ে টমসন একেবারে ক্ষিপ্ত। তা নাকি বিকট বীভৎস নোংরা ছবি। কবি তখন আরামপ্রদ আবাসে থেকে নানা সঙ্গীসাথি পরিবৃত হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনা করছিলেন—খরচ জোগাচ্ছিল আমেরিকানরা। এই সূত্রে একটি আমেরিকান কাগজের বাঁকা মন্তব্য টমসনের মনে ধরেছিল। যথা, টেগোরকে আমাদের বিরুদ্ধে 'প্রতিটি কটু নিন্দা করার জন্য সাতশো ডলার দিতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের গায়ে 'মিস্টিক' ছাপ লাগিয়ে প্রচার করাও (ইয়েট্‌স, আন্ডারহিল যা করছিলেন) টমসন অনুচিত মনে করেছিলেন। কারণ তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টি-প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হয়। ১৯১৭-র অক্টোবরে টমসন লিখেছেন, 'কবিকে গীতাঞ্জলি, দ্য গার্ডেনার, দ্য ক্রিসেন্ট মুন, দ্য কিং অফ দ্য ডার্ক চেম্বার ইত্যাদির মিস্টিক কবি এবং দার্শনিক হিসাবে সাধারণ ইংরেজ জানে। কিন্তু তারা জানেই না সামাজিক রাজনৈতিক ব্যাপারে কি দারুণ শক্তিশালী তাঁর লেখা এবং কি মহান নিখুঁত প্রেরণাময় এবং অপ্রতিরোধ্য তাঁর ভাবরাজি। বস্তুতপক্ষে আধুনিক বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে তাঁরই প্রধান নেতৃত্ব। কিন্তু উপযুক্ত অনুবাদের অভাবে সেই বিরাট শক্তিধর রবীন্দ্রনাথ 'মিস্টিক' শব্দটির আড়ালে ঢাকা পড়ে আছেন।' টমসনের মতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিস্ময়কর প্রাচুর্য এবং শৈলীগত বৈচিত্র্য যথাযথভাবে উপস্থিত করা না হলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ পরিচয় পাশ্চাত্যের মানুষ পাবে না।

রবীন্দ্রনাথের লেখার ইংরেজি-অনুবাদসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে টমসনের আদি সংযোগ। রবীন্দ্রনাথ নিজে *গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি*-র কিছু কবিতার যে গদ্যানুবাদ করেন তার মধ্যে মূল বাংলা লেখার সূক্ষ্ম রস এবং নানা অনুষঙ্গ ফোটেনি বলে টমসনের ধারণা। সি এফ এন্ডরুজের অনুবাদও সাহিত্যপদবাচ্য নয়। অন্য অনুবাদগুলির ক্ষেত্রেও তিনি অপ্রসন্ন। টমসনের ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ এক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল না তা নয়। ওয়েস্‌লিয়ান পাদরি হিসাবে অ্যাংলিকান পাদরিদের মতো সরকারি সাহায্য তিনি পেতেন না। কলেজ-শিক্ষক হিসাবে টমসনের বেতনও যথেষ্ট ছিল না। ফলে তাঁর অর্থকষ্ট ছিলই। অন্য উপায়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করতে হত। তিনি নিজে কবি ছিলেন (এবং ব্যর্থ কবি)। নিজের পয়সায় কবিতার দুটি বই ছাপেন। রবীন্দ্র-কবিতার যে দু-একটি অনুবাদ টমসন করেন তা রবীন্দ্রনাথের পছন্দসই হয় এবং ঠিক হয় টমসন, রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় অনুবাদের কাজ করে যাবেন। ইতিমধ্যে ম্যাকমিলানের পক্ষ থেকে অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। টমসন আশা করেন উভয়ের সহযোগিতায় যেসব অনুবাদ হবে সেগুলির কমিশন তিনি পাবেন। রবীন্দ্রনাথ অথবা ম্যাকমিলান সে ব্যাপারে গা করেননি। আশাহত টমসন অবশ্য পরে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করেছিলেন এই মনে করে যে, অনুবাদের ব্যাপারে তিনি বন্ধুকৃত্যই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প-অনুবাদ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ-টমসন উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় পর্যন্ত হয়। সেটা এমন পর্যায়ে উঠেছিল যে পুত্র ই পি টমসনের

বক্তব্য—যদিও তাঁর পিতা রবীন্দ্রনাথের রচনাদির মধ্যে ছোটোগল্পকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন (এবং সংগীতকেও), কিন্তু বৃহত্তর দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে ছোটোগল্প প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়েছেন।[৩]

বলে নেওয়া ভালো, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে টমসনের শেষ বিচার হল—সমকালীন বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। এইটি ধরে নেবার পর তিনি বাঙালি ভাবালুতার বশবর্তী না হয়ে, এমনকি এন্ডরুজ-পিয়ারসন প্রমুখের গদগদ ভাবুকতার বন্ধন ছিন্ন করে, সেই ধরনের সমালোচনা করতে চেয়েছেন যা তিনি যে-কোনো ইংরেজ কবি সম্বন্ধে করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথকে যদি বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে মহান লেখক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে হয় তাহলে অন্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাঁর লেখাকে খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার।

সমালোচক হিসাবে টমসনের আড়ম্বরপূর্ণ আত্মবিশ্বাসে অতিশয় আহত রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে রোটেনস্টাইনকে ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন—"টমসনের বই...কোনো কবির জীবন এবং রচনা সম্বন্ধে সবচেয়ে উদ্ভট লেখা, এতাবৎ আমি যা দেখেছি। যদিও বইয়ের মধ্যে তিনি কখনোই বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞান সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করাননি, অথচ ঐ অসম্পূর্ণতা আমাদের ভাষায় সৃষ্টির আবহ, রূপরস, সঙ্গীত এবং প্রাণরস বুঝবার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে। ...যাঁরা বাংলা জানেন তাঁদের কাছে টমসন যেভাবে বিষয়বস্তু উপস্থিত করেছেন তা প্রায়ই হাস্যকরভাবে সামঞ্জস্যহীন। ...আর ক্রিশ্চান মিশনারীরূপে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, আমার রচনার মধ্যে নিয়ত বহমান অনেক ভাব বুঝবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সামর্থ্য তাঁকে দেয়নি। যথা, জীবনদেবতা তত্ত্ব—ব্যক্তিজীবনের মধ্যে ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ প্রকাশ—যা ব্যক্তিজীবনে বিশ্বজীবনের তুলনায় বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। ক্রিশ্চানদের ঈশ্বর সমগ্র মানবসমাজে ঈশ্বররূপে সবিশেষ একটি বোধ। অপরদিকে হিন্দুধর্মে আমরা প্রতিদিনের ধ্যানধারণায় ঈশ্বরের নিখিল রূপ-কে উপলব্ধির চেষ্টা করি, সেই উপায়ে আমাদের ঈশ্বরবোধ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হয় যদিও তিনি প্রতি ব্যক্তির জীবনে ব্যক্তিঈশ্বর, কালগতে যিনি ক্রিয়াশীল হন পরম পরিণতির দিকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে। সমগ্রত বলতে গেলে, লেখক [টমসন] কখনোই অন্যায় করতে ভীত নন, সেটা তাঁর শ্রদ্ধাবোধের অভাবই সূচিত করে। ইউরোপের কোনো নামী কবি যদি তাঁর বিষয়বস্তু হতেন তাহলে বিচারের ক্ষেত্রে তিনি আরো সতর্ক হতেন, এই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। ইউরোপে প্রায় কারোরই বাংলা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁরা তাঁর [টমসনের] বইটির গুণাগুণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সমর্থ নন—টমসনের পক্ষে সে দায়িত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয় ছিল। অথচ তাঁর অসামর্থ্যই তাঁকে পুরো গোঁড়ামির ও সাহসিক হবার শক্তি দিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত লেখার মধ্যে দুটি বড়ো অভিযোগ—এক, রবীন্দ্রসাহিত্যের উপযুক্ত বিচার করার মতো বাংলা জ্ঞান টমসনের নেই, অথচ সবজান্তা হামবড়াই যথেষ্ট। দুই, ক্রিশ্চান মিশনারি হিসাবে

৩ অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে টমসনের বন্ধুত্ব ছিল। অবনীন্দ্রনাথ টমসনকে বলেন, টমসন রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প অনুবাদ করলে তিনি ও গগনেন্দ্রনাথ তার জন্য ছবি এঁকে দেবেন।

ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতি সম্বন্ধে টমসনের আজন্মলালিত সংস্কার রবীন্দ্রকবিতার সঠিক আস্বাদনে বাধা দিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, টমসনের পুত্র ই পি টমসন ছিলেন ঐতিহাসিক, এবং পাশ্চাত্য শান্তি আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য। পিতার সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, উনি যতই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করুন, আসলে বিচার করছিলেন ভিক্টোরীয় কবিদের মাপে। এখানে ই পি টমসনের বই সম্বন্ধেও আমাদের বলতে হবে, যদিও তিনি ঐতিহাসিক, কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের জ্বালাযন্ত্রণা বুঝবার চেষ্টা করেননি। সুতরাং কী রবীন্দ্রনাথ কী এডোয়ার্ড টমসন—উভয়ের বিচারেই খণ্ডিত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি।

সমস্ত বিতর্ক বিবাদের উর্ধ্বে এডোয়ার্ড টমসনের মনে রবীন্দ্রনাথের সর্বোচ্চ স্থান। ১৯২৫ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তখন টমসন, উইলিয়ম ক্যান্টনকে ব্যক্তিগত পত্রে লেখেন : "তিনি সুমহান পুরুষ—ভারতবর্ষে মহত্তম। তাঁর মৃত্যু—সে হবে যেন দেবতার দিব্যচ্ছায়ার অপসরণ।"

শরৎচন্দ্রের মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখকের লেখা *প্রবাসী*-তে বেরোয়নি। রামানন্দর ব্রাহ্মধর্ম-সম্পর্ক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রাখলে ব্যাপারটি সহজে বোধগম্য হবে। *দত্তা*-র লেখক শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্মী রামানন্দর অরুচি থাকতেই পারে এবং পতিতা বা অর্ধ-পতিতা নারীদের সাহিত্যে সহানুভূতির সঙ্গে স্থান দেওয়ায় নীতিবাদী রামানন্দর বিরূপতাও থাকা সম্ভব। শুধু রামানন্দর নয়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও নীতির প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। শরৎ-নিন্দাত্মক বহু রচনা তাঁরা পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন, এমনকি গ্রন্থাকারেও। কোনো কোনো জবরদস্ত মহিলা সাহিত্যিক, শরৎচন্দ্রকে কেন জন্মাবস্থায় নুন খাইয়ে মেরে ফেলা হল না, সে বিষয়ে আক্ষেপ বোধও করেছেন। শরৎচন্দ্রের লেখা প্রবাসীতে না-ছাপা প্রসঙ্গ নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক বেধেছিল যাতে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত জড়িয়ে যায়। সে বিষয়ে কয়েকটি রচনা এই সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। তবে রামানন্দর ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের পক্ষেও তাঁকে দাঁড় করিয়েছে। দৃষ্টান্ত এই সংকলনেই মিলবে।

বাকি প্রধান কবি-সাহিত্যিকদের যে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার চেষ্টা 'প্রাসঙ্গিক কথা'-য় করা হয়েছে, সেসকল সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবার যোগ্য।

বঙ্গরঙ্গামঞ্চের প্রধান এক পর্বের অবিসংবাদী অধিনায়ক, নাট্যকার-নট-নাট্যশিক্ষক-মঞ্চসংগঠক-পরিচালক সুবিখ্যাত গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহু কষ্টে যে-কয়েকটি লাইন লিখেছিলেন, তা 'সাধারণ ভূমিকা'-য় উদ্ধৃত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে এতখানি মানসিক কার্পণ্যের কারণ, প্রথমত গিরিশ থিয়েটার করেন; দ্বিতীয়ত তিনি সন্দেহজনক নৈতিক চরিত্রের মানুষ; তৃতীয়ত সামাজিকভাবে অস্পৃশ্য-গণিকাদের (অভিজাতগণের ব্যক্তিগত ভোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই অস্পৃশ্য নয়) তিনি থিয়েটারে নামিয়েছিলেন। আর থিয়েটার সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজিদের

শুচিবাতিকতা সুপরিচিত সামাজিক সত্য। এবং রামানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজি ছিলেন। সেজন্য গিরিশচন্দ্র যত প্রতিভাধরই হোন, অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত। গণিকাদের থিয়েটার এবং অন্য সামাজিক কাজে নিয়োগ করা সম্বন্ধে কয়েকটি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং একটি 'আলোচনা' সংকলনের মধ্যে আছে।

অথচ যা ছিল একদা তিরস্কারের বিষয় তা-ই এখন পুরস্কারের বিষয়। সেকালের সমাজ-সংস্কারকেরা গিরিশচন্দ্রকে যে কাজের জন্য ধিক্কার দিয়েছেন, সেই একই কাজের জন্য সমাজবিপ্লবে বিশ্বাসী মার্কসীয় তত্ত্বে জারিত ব্যক্তিরা রামকৃষ্ণকে শিরোপা দিচ্ছেন—থিয়েটারে পতিতা অভিনেত্রী বিনোদিনীকে রামকৃষ্ণের আশীর্বাদের সূত্র ধরে। এই ঘটনার প্রযোজক গিরিশচন্দ্র একই কারণে প্রশংসা পাচ্ছেন। বিখ্যাত অভিনেতা এবং চিন্তায় প্রগতিবাদী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বিনোদিনী দাসী লিখিত 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

"কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা দরকার, রঙ্গালয়ে রামকৃষ্ণের আগমন সে সময়ে একটি বড় ঘটনা। রঙ্গালয় ও অভিনেতা-অভিনেত্রীকে লোকে তখন সুনজরে দেখত না, সমাজে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল—অভিনেতারা দুশ্চরিত্র, আর অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা বলে ঘৃণার্হ ছিল। গিরিশচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে কবিতা লিখেছিলেন : "লোকে কয় অভিনয়,/কভু নিন্দনীয় নয়,/নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাজন।" অথচ এই 'নিন্দাভাজন' ব্যক্তিরা সমাজের একটি মহৎ ভূমিকায় অশেষ ত্যাগ ও কষ্টের জীবন বরণ ক'রে নিয়েছিল। অভিনয়-জীবন তখন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রঙ্গালয় থেকে লাভবান হওয়া দূরে থাক, কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে উঠত। অধিকন্তু এই অবস্থায় সামাজিক অসম্মান ছিল মর্মান্তিক। রামকৃষ্ণের পদার্পণ তাই রঙ্গালয়ের একটি সামাজিক মর্যাদা এনে দিয়েছিল বলেই মনে হয়।" (বিনোদিনী দাসী, 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত, সুবর্ণরেখা, কলকাতা-৯, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)।

আর বাংলার প্রসিদ্ধ নাট্যসমালোচকরা যেখানে গিরিশচন্দ্রকে মঞ্চের প্রয়োজনে নাট্যসরবরাহকারী প্লে-রাইট এবং ভক্তিরসে মাখামাখি নাট্যকার বলে লাঞ্ছনা করেছেন, সেখানে মার্কসীয় বিপ্লববাদী, দেশবিদেশের নাট্যতত্ত্বে সুপণ্ডিত, অভিনেতা এবং নাট্যকার উৎপল দত্ত গতানুগতিক ধারার নাট্য-আলোচকদের পিলে-চমকানো কথা বলেছেন। 'গিরিশ-মানস' নামক একটি গ্রন্থে তাঁর মত প্রকাশিত। মাত্র কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

"গিরিশ নাট্যকৌশল ছাড়াও আরও অনেক কিছু। নাটকগুলির লোমহর্ষক বহিরঙ্গে আবদ্ধ না থেকে আমরা যদি সেগুলির অন্তঃস্থলে পৌঁছবার চেষ্টা করি তবে দেখব—গিরিশ ভারতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তো বটেই, তাঁর কোনো কোনো রচনা বিশ্ব-নাট্যসাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য। আধুনিকতায় তিনি কখনো কখনো বের্টল্ট্ ব্রেখট-এর এপিক থিয়েটারে সমাবিষ্ট। জর্মন এক্সপ্রেশনিস্টদের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি এক্সপ্রেশনিজম্-এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগকর্তা। মানবচরিত্রের জটিল ও দ্বন্দ্বময় বিকাশে তিনি কখনো বা শেকস্‌পিয়ারের যোগ্য ছাত্র।"

পুরোনো বিচার ও নতুন বিচারের মধ্যে পুরো দ্বান্দ্বিকতা।

প্রবাসী যে নিছক সাহিত্য পত্রিকা নয় তা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—যদি না মননমূলক এবং তথ্যমূলক সর্বশ্রেণির বাংলা লেখা সম্বন্ধে 'সাহিত্য' শব্দটি প্রযুক্ত হয়। সাধারণভাবে সাহিত্য বলতে কল্পনাশ্রয়ী সৃষ্টিশীল রচনাই বোঝা হয়। সেদিক থেকে *প্রবাসী* অবশ্যই কেবল সাহিত্য পত্রিকা নয়। কবিতা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি এই পত্রিকার একাংশই মাত্র অধিকার করে থাকত।

তবু *প্রবাসী*-র এতই খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছু প্রায় সকল লেখকই *প্রবাসী*-র ছাপ পেতে উৎসুক ছিলেন। 'রবীন্দ্রঠাকুর' পথ রোধ করে আছেন বলে যেসব তরুণ সাহিত্যিক বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন, দেখা যাবে তাঁরাও *প্রবাসী*-র প্রসাদপ্রার্থী হয়েছেন। যেমন ধরা যাক নজরুল ইসলাম, *প্রবাসী* সম্বন্ধে যাঁর একটি ব্যঙ্গোক্তি সাহিত্যিক মহলে প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—'প্রবাসী মানে প্রকৃষ্টরূপে বাসী'—সেই নজরুল ইসলামেরও অনেক কবিতা *প্রবাসী*-তে পত্রস্থ হয়েছে। *প্রবাসী* বিনা দক্ষিণায় লেখা প্রকাশ করত না বলে এই সকল সরস্বতী-সেবক লেখকগণ *প্রবাসী*-লক্ষ্মীর মুষ্টিভিক্ষা যুক্তকরে গ্রহণ করতেন। কল্লোল যুগের লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্প *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে, *কল্লোল* পত্রিকার সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের লেখাও। সত্যকার আধুনিক লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এখানে লিখেছেন। একই সময়ের পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর লেখা *প্রবাসী*-তে পাওয়া যায়। প্রগতিশীল লেখক বুদ্ধদেব বসু, কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নানা দিকে সমর্থ লেখনী চালনা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। *প্রবাসী*-তে তিনি 'বর্ত্তমান রুশ-সাহিত্য' সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে বাঙালি পাঠকের সঙ্গে রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পরিচয়সাধন করতে চেয়েছেন।

বিস্ময়কর এই তথ্য আমাদের সামনে রয়েছে যে, বাংলার প্রধান প্রধান ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্প লেখকদের বহু রচনার ধাত্রী *প্রবাসী*। এইসব কিছু সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। তার দ্বারা সাহিত্য-ইতিহাসে *প্রবাসী*-র ভূমিকা নির্ণীত হতে পারবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দেহান্তের পরে *প্রবাসী*-র ১৩৩৯ বৈশাখের 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এ রামানন্দ তাঁর সম্পাদনাকালে প্রকাশিত *প্রবাসী*-র পূর্ববর্তী *দাসী* ও *প্রদীপ* পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসাবে প্রভাতকুমারের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন। প্রভাতকুমার উপন্যাস এবং ছোটোগল্প ছাড়াও সাহিত্যের নানা দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। যেমন তিনি কবিতাও লিখেছেন, সেইসঙ্গে প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, ইংরেজি গল্পের অনুবাদ, এবং '*মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিস্তর গদ্য ও পদ্য রচনার ইংরেজি অনুবাদ' করেছেন। তা ছাড়া তিনি *মানসী* ও *মর্ম্মবাণী* পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। *প্রবাসী*-তে প্রভাতকুমার উপন্যাস ছাড়াও প্রচুর ছোটোগল্প লিখেছেন এবং রামানন্দর ধারণা 'উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী।'

রামানন্দর এই মত সর্বথা গ্রাহ্য। বাংলা সাহিত্যে প্রভাতকুমারের স্থান ছোটোগল্পকার হিসাবে নির্ণীত হবে। এবং সে স্থান অবজ্ঞার কোনো আসন নয়, যদিও বিদেশি সাহিত্যের রসে মগ্ন এবং সেই ধারায় সাহিত্যরচনায় নিয়োজিত আধুনিকরা, প্রভাতকুমার শুধুই গল্প লিখেছেন, সেইজন্য তাঁকে

গুরুত্ব দিতে গররাজি। অথচ ওইসব লেখকের মনোজীবনের আকুতি-কাকুতি-মেশানো অনেক গল্পই একেবারে হারিয়ে গেছে। কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্প হাতে পেলে স্বচ্ছন্দে সানন্দে পড়ে যাওয়া যায়। কারণ তিনি সত্যই গল্প লিখেছিলেন এবং গল্পহীন গল্পের তুলনায় পুরোপুরি গল্পের পাঠকই বেশি। প্রভাতকুমার ছোটোগল্পের পুরোনো কাঠামো বজায় রেখেছিলেন। স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হয়ে তাঁর গল্প পরিণতিতে চমক দিতই। সেসব অনেক গল্পেই হাসির ছিটে আছে, জীবনের মজা লেখক উপভোগ করতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালের সামাজিক আন্দোলনের তথ্যও তার মধ্যে মেলে। গল্পের কাঠামো এবং জনপ্রিয়তার জন্য একদা তাঁকে বাংলার মোপাসাঁ বলা হত। এটা অবশ্যই তাঁর ইচ্ছায় হয়নি। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট, নবীনচন্দ্র সেন বাংলার বায়রন এবং রবীন্দ্রনাথ বাংলার শেলি—এই কথা বলে সমকালের সাহিত্যরসিকেরা সুখানন্দে ভাসতেন। তাঁদের ভাবখানা ছিল—ইংল্যাণ্ডের বড়ো বড়ো লেখকদের সমস্তরে বসিয়ে বাঙালি লেখকদের 'উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে' তো উঠিয়ে দিলাম। তাই প্রভাতকুমার মোপাসাঁ নন। কিন্তু তিনি বাংলা সাহিত্যে গণ্য ছোটোগল্পকার। 'দেবী'র মতো ট্র্যাজিক গল্প কিংবা 'আদরিণী'র মতো চোখের-জলে-ধোয়া গল্প তিনি লিখেছেন। (তা ছাড়া যথেস্ট-সংখ্যক চমৎকার সরস গল্প তো আছেই)। সাহিত্যে তাই তাঁকে অগ্রাহ্য করা অসংগত। সে-কথা মনে হয়েছিল মনোরহস্যের গল্পকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে খ্যাত জগদীশ গুপ্তের। উনিশ বৎসর বয়সে প্রস্ফুটিত তরুণ বুদ্ধদেব বসুর প্রভাতকুমার সম্বন্ধে চরম বিচার ঘোষণায় রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। ১৩৩৪ ভাদ্রের *কল্লোল* পত্রিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, প্রভাতকুমারের গল্প 'সুখপাঠ্য' হলেও 'কালের নিকষমণিতে কতদিন পর্য্যন্ত টিঁকিতে পারিবে তা অনুমান করা শক্ত।' জগদীশ গুপ্তের মতে 'তাঁহার [প্রভাতকুমারের] গল্পগুলিতে যে শান্তশ্রী এবং সরসতা আছে তাহা চিরকাল রসগ্রাহীর উপভোগ্য হইয়া থাকিবে।' এইসঙ্গে আরো বলেন, প্রভাতকুমারের রচনায় নরনারীর বিবাহ-নিরপেক্ষ যৌন সম্বন্ধ না থাকার 'অপরাধে যদি তাঁহাকে বাংলার সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব কেহ কখনো করেন তবে সাহিত্যের প্রতিই নিদারুণ অবিচার করা হইবে।...বসু-মহাশয়ের লেখনী অক্ষয় হোক্, কিন্তু প্রভাতবাবুর গল্পগুলিকে ভুলিবার কথা তিনি যেন আর না বলেন।'

হাস্যরসের সাহিত্যিক হিসাবে (যদিও হাস্যরসের সাহিত্যিক কথাটা লেখকদের সম্বন্ধে খুবই একপেশে কথা) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরেই রাজশেখর বসুর স্থান। রাজশেখর বসু নিজকালে কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের মিশাল দেওয়া গল্প লেখায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর কিছু নামকরা গল্প *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে। লেখাগুলির কয়েকটি সচিত্র।

সাহিত্যক্ষেত্রে পরশুরাম ছদ্মনামে রাজশেখর বসুর হঠাৎ আবির্ভাবে চতুর্দিকে জয় জয় রব। বৃত্তিতে তিনি রাসায়নিক। প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স-এর কর্ণধার। স্বভাবে গম্ভীর। কিন্তু চল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন তখন বোঝা গিয়েছিল এই গম্ভীর মানুষটির ভিতরে রস ছিল জমাট-বাঁধা। গল্পের মধ্য দিয়ে সেগুলি নির্গত হতে থাকে। তাঁর গল্পগুলির বর্ণনায় এমনই চিত্ররস যে, চরিত্রগুলিকে সামনে যেন জীবন্ত আকারে ঘোরাফেরা

করতে দেখা যায়। যেটুকু বাদ ছিল তা তাঁর নির্দেশে যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত ছবিগুলিতে পূর্ণতা পায়। কথায় ও ছবিতে এমন হাত-ধরাধরি কদাচিৎ দেখা যায়। ব্যতিক্রম অবশ্য সুকুমার রায়-চিত্রিত ও লিখিত কবিতা ও গল্পগুলি এবং সত্যজিৎ রায়-চিত্রিত তাঁর গল্প ও কাহিনিগুলি। স্মর্তব্য, নিজনামে রাজশেখর বসু উৎকৃষ্ট কিছু কাজ করেছেন। যেমন মূল *রামায়ণ* ও *মহাভারত* গদ্যে সারানুবাদ, কালিদাসের *মেঘদূত*-ও। ভাষাবিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁর অবদান 'চলন্তিকা' অভিধান। বেশ-কিছু প্রৌঢ় চিন্তার প্রবন্ধও লিখেছেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরশুরামের সাহিত্যে হঠাৎ-আসা এবং অবিলম্বে দিগ্‌বিজয়ের কথা স্বীকার করেছেন। আরও কেউ কেউ সে কাজ করেছেন। এ কথা ঠিক, *প্রবাসী* পরশুরামের প্রধান পত্রাধার ছিল না, তবু কয়েকটি উত্তম লেখা তো বেরিয়েছিল এবং এই রসসাহিত্যিক সম্বন্ধে আর-এক রসসাহিত্যিক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। প্রমথবাবু পরশুরাম-চিত্রিত চরিত্রগুলি কেবল সমকালীন নয় বাংলার সমাজজীবনে দীর্ঘজীবিত চরিত্র তা দেখিয়ে দিয়েছেন :

> "শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, নন্দবাবু, তারিণী কবিরাজ, কেদার চাটুজ্যে, লাটুবাবু, নাদু মল্লিক—এরা কি আজকের! এদের কেউ কেউ মুরারি শীলের সঙ্গে ভাগে ব্যবসা করেছে, ভাঁড়ুদত্তর সঙ্গে বাজারে তোলা আদায় নিয়ে ভাগাভাগি করেছে, আবার ঠকচাচার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছে, দুনিয়া বুরা মুই সাচা হয়ে কি করবো? ডমরুধরের আসরে কেদার চাটুজ্যে গল্পের শিকল বোনেনি এবং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী যে নদেরচাঁদের ব্যবসার পার্টনার ছিল না এমন কথা কে হলপ করে বলবে? এরা সবাই তিপরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই চনতি পারা যায়নি!" (*পরশুরাম গ্রন্থাবলী*, ১ম খণ্ড, প্রমথনাথ বিশী লিখিত ভূমিকা)।

অনুবাদ এবং চলচ্চিত্রের সুবাদে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি দেশসীমা অতিক্রম করে গেছে। প্রধান যে কয়টি উপন্যাসের উপর তাঁর খ্যাতি নির্ভরশীল তাদের মধ্যে পথের পাঁচালি-কে বাদ দিলে *অপরাজিত, আরণ্যক, দৃষ্টিপ্রদীপ—প্রবাসী*-তে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল, অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গল্পও। বিভূতিভূষণের বহুবন্দিত প্রতিভা নূতন বন্দনার অপেক্ষা রাখে না। আলো বাতাস জল যেমন সহজ তাঁর রচনাও তাই।

পরিষ্কার বলা ভালো, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্যের অবলম্বন গ্রাম, নগর, বাড়ির সদর-অন্দর সবই হতে পারে। সেই ধরনের স্থান-চিহ্নিত কোনো শব্দ দ্বারা লেখককে চিহ্নিত করলে তাঁর প্রতিভার অবমূল্য ঘটে। তারাশঙ্কর সাহিত্যিক ছিলেন—এটাই মূল কথা। গল্পকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি যেসব গল্পের উপর নির্ভর করে তাদের অনেকগুলি *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে। আর তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক হিসাবে একেবারে প্রথম স্তরের। তাঁর উচ্চাঙ্গের উপন্যাস *কালিন্দী প্রবাসী*-তে ধারাবাহিক বেরিয়েছিল।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও বলা চলে *প্রবাসী* তাঁর সাহিত্যজীবনের অনেকখানি অংশের আধার। তাঁর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প *প্রবাসী*-তে পত্রস্থ হয়েছে। হাসিকান্না-মেশানো তাঁর গল্পগুলি। কর্দম সাহিত্য রচনায় তাঁর উৎসাহ ছিল না। উৎফুল্ল কৌতুক সৃষ্টিতে তিনি অদ্বিতীয়। জীবনের মজা

নির্লিপ্তভাবে তিনি উপভোগ করতেন, তার অনেক প্রমাণ তাঁর গল্পে মিলবে। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি যেসব রচনার উপর নির্ভরশীল তাদের প্রধান একটি 'নীলাঙ্গুরীয়' *প্রবাসী*-তে ধারাবাহিক প্রকাশিত। সার্থকনামা উপন্যাস। প্রেমের নীলগরল পান করেছিলেন রহস্যময়ী নায়িকা।

অনেক অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের বাধা ঠেলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনের শেষ পর্বে এবং মরণোত্তর কালে বাংলার অতি জনপ্রিয় লেখক। শেষ পর্যন্ত কালের বিচারেই নির্মিত হয় কোন্ সাহিত্য টিকবে এবং কোন্ সাহিত্য টিকবে না। শরদিন্দু কালবিচারে কিছুটা উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রগতিশীল আধুনিক সমালোচকদের কাছে শরদিন্দুব প্রধান দোষ তিনি গোয়েন্দা কাহিনির লেখক এবং রোমান্স রচয়িতা। অর্থাৎ তিনি বস্তি কয়লাখানি এবং গণিকালয়ে যাতায়াতের লেখক নন। সেজন্য তিনি নীরব তাচ্ছিল্য পেয়েছেন। বলা চলে 'দোষ হইয়া গুণ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।' ভাগ্যে শবদিন্দু তাঁর লেখায় কর্দমাক্ত পায়ের ছাপ এঁকে দেননি। সমাজের গ্লানির ইঙ্গিতময় পরিচয় কিন্তু তাঁর কিছু গল্পে আছে। আর হাসির গল্পে তো তিনি অনবদ্য। সামাজিক উপন্যাসে অবশ্য তিনি সফল হননি কিন্তু গোয়েন্দা গল্প সম্বন্ধে সন্দেহ না রেখে বলা যায়—শরদিন্দু গোয়েন্দা-সাহিত্য লিখেছেন। তাঁর কিছু গোয়েন্দা গল্প প্রথম শ্রেণির সাহিত্য। বিষয়বস্তুতে সেগুলি খুনজখমাদির সঙ্গে জড়িত বটে, কিন্তু সেগুলি আবার মানবজীবনের হিংসা ক্ষোভ রোষের ট্র্যাজিক কাহিনি। তা ছাড়া তাঁর গল্পগুলি সাধারণ গোয়েন্দা কাহিনির মতো নিছক পরিণতিনির্ভর নয়। ভাষায় এমনই সরসতা এবং সুচারু ইডিয়মের প্রয়োগ যে, সেগুলি ছত্রে-ছত্রে আস্বাদ্য।

রোমান্টিক কাহিনির লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই শরদিন্দুর স্থান। শরদিন্দুর এইসব কাহিনির পটভূমিকায় ছিল বৌদ্ধযুগ, গুপ্তযুগ, গুপ্তোত্তর যুগ এবং মধ্যযুগ। তাঁর ভাষার জাদু অন্যের অনায়ত্ত। ইতিহাসরস তিনি এইসব লেখায় ঢেলে দিতেন। একালের মানুষ বিচরণ করত সেই স্বপ্ন কল্পনা এবং আকাঙ্ক্ষায়-মেশানো অতীতের রসলোকে, যদিও সে যুগের রাজকীয় চক্রান্ত, ক্রূরতা এবং সংঘাতের বাস্তবতা তাঁর লেখায় কম ছিল না।

শরদিন্দুর পূর্ণ প্রতিভার বেশ কয়েকটি এই ধরনের গল্প *প্রবাসী*-র গৌরব। সাহিত্যজীবনের বিশেষ পর্বে শরদিন্দু *প্রবাসী*-রই লেখক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীং বহুচর্চিত লেখক। *প্রবাসী* মানিকের কোনো বড় মাপের লেখা প্রকাশ করেনি। তবে ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৩-এর মধ্যে মানিকের কয়েকটি গল্প *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে।

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) পাঠকসমাজে গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর অনেক উপন্যাসের ভিতরেই বেশ কিছু কবিতা আছে। তিনি *প্রবাসী* পত্রিকায় কবিরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তারপর খাতবদল করে *প্রবাসী*-তে তিনি গল্প লিখতে শুরু করেন, নাটক ও ধারাবাহিক উপন্যাসও। *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত তাঁর একাধিক গল্প শ্রেষ্ঠ গল্প-সংকলনে গৃহীত হয়েছে। বনফুলের রচনার যে প্রকৃতির জন্য তাঁর খ্যাতি, কবিতায় তা নেই, রয়েছে নাটকে ও উপন্যাসে। বৃত্তিতে চিকিৎসক বলে তিনি সাহিত্যরসের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় করতে পেরেছেন।

প্রবাসী-র পৃষ্ঠায় আরো কয়েক জন গল্পকারের লেখা পাই। যেমন ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পের

লেখকরূপে একদা-খ্যাত সরোজকুমার রায়চৌধুরী, একসময়ে রোমান্টিক গল্প-কাহিনির লেখকরূপে খ্যাত মণীন্দ্রলাল বসু। যে দুটি উপন্যাসের উপর মণীন্দ্রলালের সুনাম নির্ভরশীল, তার একটি 'জীবনায়ন' *প্রবাসী*-তে ধারাবাহিক বেরিয়েছে, তা ছাড়া কয়েকটি গল্পও। প্রবোধকুমার সান্যাল একদা জনপ্রিয় লেখক। স্বচ্ছন্দ গতিশীল ভাষায় লেখা তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রচলিত জীবনের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার প্রবল চেষ্টা। তবে এক্ষেত্রে বাস্তববাদের পথ না ধরে রোমান্টিক ভাবকেই তিনি আশ্রয় করেছেন এবং তাঁর নায়ক প্রায়শ বোহেমিয়ান। তাঁর বিশেষ খ্যাতি অবশ্য কেদার-বদ্রী যাত্রাকথা নিয়ে রচিত 'মহাপ্রস্থানের পথে'র জন্য, যা একদা বাংলার পাঠকদের মাতিয়েছিল। তাঁর কিছু গল্প *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে। মনোজ বসুর অধিক খ্যাতি উপন্যাস অপেক্ষা ছোটোগল্পেই। তাঁর কুড়িটিরও বেশি উল্লেখযোগ্য গল্প এই পত্রিকায় পাই। ছোটোগল্পকার ও ঔপন্যাসিক বিমল মিত্র বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাঁর বহু বই ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রথমদিকের কিছু গল্প *প্রবাসী*-তে মুদ্রিত। নরেন্দ্রনাথ মিত্র *প্রবাসী*-তে বেশি লেখেননি। তাঁর কয়েকটিমাত্র গল্প এখানে পাওয়া গেছে।

জটিল মনস্তত্ত্বের গল্পকার জগদীশ গুপ্তের অল্প কয়েকটি লেখা *প্রবাসী*-তে মেলে। 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নামক কমেডি-নাট্য লিখে রবীন্দ্রনাথ মৈত্র একদা পাঠকসমাজে এবং দর্শকসমাজেও (নাট্যাভিনয়ের কল্যাণে) নাড়া দিয়েছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যু একজন গুণী লেখকের সাহিত্যরচনায় ছেদ আনে। মৃত্যুর পূর্বে *প্রবাসী*-তে অন্তত তাঁর আটটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

বেশি সংখ্যায় না হলেও কয়েক জন মহিলা লেখকদের রচনা *প্রবাসী*-তে মেলে। এঁদের মধ্যে আছেন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী। জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রবাসী সাহিত্যিক, অনেক দিন বাংলার পাঠকদের মনে প্রবাসী হয়েই থেকেছেন। তাঁর স্বীকৃতি আসে অনেক দিন পরে, এবং তিনি রবীন্দ্র-পুরস্কারে ভূষিত হন। *প্রবাসী* পত্রিকা কিন্তু তাঁর লেখাকে অবহেলা করেনি, কয়েকটি গল্প ছেপেছিল। কী সমাজে কী সাহিত্যে 'নারীর মূল্য' প্রতিষ্ঠার জন্য আশালতা দেবী (সিংহ) সবেগে এবং আবেগে অল্পবয়সেই কলম ধরেছিলেন, তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি কেবল প্রাবন্ধিক বা সাহিত্য-সমালোচকই ছিলেন না, *প্রবাসী*-তে গল্পও লিখেছেন, এমনকি একটি ধারাবাহিক উপন্যাসও। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে সীতা দেবী এবং শান্তা দেবীর রচনা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে কেন 'সাহিত্য' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সে প্রশ্ন উঠতে পারে। সংস্কৃতিজগতে একাধিক বিষয়ে তাঁর যশস্বী ভূমিকা। তবে এখন আপেক্ষিকভাবে শিশুসাহিত্যিক হিসাবেই তিনি খ্যাত। অবশ্য তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে, যেমন তিনি শিল্পী। তাঁর ততোধিক খ্যাতি হাফটোন সম্বন্ধে গবেষণা এবং 'প্রক্রিয়া ও যন্ত্রের উদ্ভাবনের' জন্য। তাঁর ছাপাখানায় মুদ্রিত একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কাজও সেখানে হত। রামানন্দর ইংরেজি ও বাংলা দুই পত্রিকাতেই প্রকাশিত শিল্পীদের ছবি উপেন্দ্রকিশোরের মুদ্রণালয়ে প্রস্তুত হত, তাদের মুদ্রণসৌকর্য শিল্পীদের ছবিকে ব্যাপক পরিচিতি দিয়েছিল। আরো উল্লেখ্য, স্বয়ং ব্রাহ্ম রামানন্দ, উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর কী ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করে

গেছেন, তা বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর সম্প্রদায়নিষ্ঠ অথচ সাম্প্রদায়িকতামুক্ত এক চরিত্র—এইভাবে রামানন্দ উপেন্দ্রকিশোর সম্বন্ধে শোকমন্তব্যে এই মত প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্র-কালে এবং উত্তরকালের প্রধান বাঙালি কবিদের অনেকের কবিতাই বহু সংখ্যায় *প্রবাসী*-তে বেরিয়েছে। প্রথমেই আসে অগ্রণী কবি, ছন্দের জাদুকর হিসাবে বহুবিদিত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা। তাঁকে কার্যত *প্রবাসী*-র কবি বলা যায়। রবীন্দ্র-স্নেহধন্য সত্যেন্দ্রনাথ রামানন্দর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের আকস্মিক বিয়োগের পরে রামানন্দ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-তে যে মন্তব্য করেছেন তাতে কবির প্রতিভা, স্বাদেশিকতা, নানা ভাষাজ্ঞান এবং 'নির্ভীক মনুষ্যত্বে'র মুক্ত প্রশংসা আছে। কেবল তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ একটি কবিতা-সহ তৎকালীন বাংলার অনেক নামকরা কবির সত্যেন্দ্রনাথ-বিষয়ে বেদনার্ত কবিতা ছেপেছেন। সেইসঙ্গে কবির জীবনচিত্র এবং কাব্যচরিত্র ব্যক্ত হয়েছে একাধিক গদ্য লেখায়।

প্রবাসী-র লেখক হিসাবে অন্য মুখ্য কবিদের মধ্যে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এমনকি আধুনিকমনা জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী (তিনি সাহিত্য-বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন), মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং পল্লিকবি জসীম-উদ্দিনের কবিতা *প্রবাসী*-তে মেলে। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে মন্তব্য আগেই করা হয়েছে।

প্রবাসী-র মহিলা কবিদের মধ্যে আছেন প্রিয়ম্বদা দেবী, অমিয়া চৌধুরী, লজ্জাবতী বসু, নিরুপমা দেবী প্রমুখ।

বাংলাব সেরা প্রাবন্ধিকরা ইতি্‌াস, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প বিষয়ে উচ্চাঙ্গের প্রচুর প্রবন্ধ *প্রবাসী*-তে লিখেছেন। যেহেতু সেসকল 'সাহিত্য'-অংশে গৃহীত হয়নি তাই তাদের বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে আমরা বিরত থাকছি। তবে ভূ-তাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল খ্যাতি. *প্রবাসী*-তে যাঁর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে, সেই তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উপন্যাসকে বাদ দেননি। তাঁর একটি উপন্যাস *প্রবাসী*-তে ধারাবাহিক বেরিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্য, জীবন, কর্ম ও বিতর্ক

১৩১৩ অগ্রহায়ণ

পুস্তক-পরিচয়

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত]

২। *খেয়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত* ৫৪টি খণ্ড কবিতা সম্বলিত গ্রন্থ। কবি রবীন্দ্রনাথের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও এই কবিতা কয়েকটীর একটু সমালোচনার প্রয়োজন; কেন না অনেকগুলি কবিতাই অনেক পাঠকের নিকট অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইবার ভয় আছে। কবিতা হইলেই যে তাহা জলের মত তরল হইবে, পড়িবা মাত্র অর্থ বোধ হইবে, একটুও ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার ভাব সংগ্রহ করিতে হইবে না, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। দুর্ব্বোধ্যতা যথার্থই দোষ, এবং উহা দ্বারা কবির অক্ষমতাই প্রকাশ পায়; কিন্তু অনেক স্থলে ভাবের গভীরতার ফলে সাধারণ পাঠকেরা সহসা কাব্যমাহাত্ম্য, অনুভব করিতে পারেন না। বিদেশী দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া স্বদেশী সাহিত্য হইতে দৃষ্টান্ত দিয়াই বলিতে পারি, যে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পাষাণী অনেক পাঠক উপরে উপরেও পড়িয়াও হয় ত ভাল কাব্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান না করিলে কেহ যথার্থ ভাবগ্রহণ করিতে পারেন না। অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিয়াছি, যে, পাষাণ খানি তাঁহাদের ভাল লাগে নাই।

সমালোচ্য কবিতাগুলি যে সকলের কাছে তেমন স্পষ্ট হইবে না, কবি তাহা নিজেই বুঝিয়াছেন; এবং বুঝিয়াছেন বলিয়াই উৎসর্গ-পত্রে এই কার্য্যকে লজ্জাবতী লতার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন :—

যত্ন ভরে খুঁজে খুঁজে তোমায় নিতে হবে বুঝে;
ভেঙ্গে দিতে হবে যে তার নীরব ব্যাকুলতা।

জ্ঞানবৃদ্ধেরাই যথার্থ প্রবীণ; কিন্তু দীর্ঘব্যাপী সময়ের প্রভাবে যে প্রাচীনতাটুকু পাওয়া যায় তাহাতেও একটুখানি প্রবীণতা জন্মে। সেই প্রাচীনতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, যুবকবর্গ অপেক্ষা তাঁহারা হয় ত এই কাব্যের রস অধিক অনুভব করিতে পারিবেন। ঠিক "পারের ঘাটের কিনারায়" না আসুন, কিন্তু যে "ঘরেও নহে পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে," অথবা "দিনের আলো ফুরাল যার, সাঁজের আলো জ্বলল না" : তাহারা বেশী অনুভব করিতে পারিবে। যাহাদের তরী, অনেক তরীর সঙ্গে একত্রে এক বন্দরে অনেক কাল ছিল, তাহারা যখন দেখিবে যে এখন কত তরী "অস্তাচলে তরীর তলে, ঘন গাছের কোল ঘেঁষে— ছায়ায় যেন ছায়ার মত যায়," তাহাদের প্রাণে একটু বেশী রকম বাধিবে। যাহাদের "শেষ হয়ে গেছে জলভরা আজ", তাহারাই "ঘাটের পথ" তাকাইয়া কাঁদিবে।

যাঁহারা অত্যন্ত স্পষ্টতার প্রার্থী, তাঁহাদের নিকট হয় ত অনেক কবিতাই উপেক্ষিত হইবে। 'বিদায়', 'কোকিল', 'সমুদ্র' এবং 'সমাপ্তি'র মত খুব স্পষ্ট কবিতা এ গ্রন্থে বেশী নাই। 'গোধুলিলগ্ন' এবং 'হারাধন' খুব অস্পষ্ট না হইলেও অনেককে ঐ সকল কবিতা বুঝাইয়া দিতে হয়। সত্য সত্যই স্ফুটিতে পারে নাই, কাজেই অস্পষ্টদোষে দূষিত হইয়াছে, এরকম কেবল তিনটি কবিতা এ গ্রন্থে আছে, যথা—দান, বাঁশি এবং হার। অস্পষ্টতার কথা উঠিয়াছে বলিয়াই ৫৪টি কবিতার মধ্যে

তিনটির বিকাশের অভাবের কথা বলিলাম।

কবিব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ সম্বন্ধে একটু আপত্তি করিবার আছে। “সিন্ধু-শকুন” পড়িলে মনে হয়, যেন কবি ইংরাজি seagullটি অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃতে পাখী অর্থ চলিলেও, শকুন কথাটার বঙ্গভাষায় বড় ভাল ভাব মনে উদয় হয় না। ভারতসমুদ্রের কূলপ্রদেশে ষ্টীমারে যাইবার সময় আমরা গাঙ্গাচিল লক্ষ্য করিয়া থাকি; সেটা দেশী। “অন্তর হইতে বাহিরে সকলি আলোকে হইল মিশা”; এখানে মিশা কথাটি মিশ্রিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মিশা বা মেশা কথাটা “কাহারো সঙ্গে মেশা”, কিম্বা “মেলা মেশা” প্রভৃতিতে চলে। বাঙ্গালায় মিশে যায়, এবং মিশ্রিত হয়, এইরূপ ব্যবহার সঙ্গত। “ফুলগুলি সব নীল নয়ানে—কোন ধ্যেয়ানে রতা”; এখানে “রত”র পরিবর্ত্তে “রতা” বসিল কেন? মিলের খাতিরে অতটা বাঁধন ভাঙ্গা সঙ্গত মনে হইল না।

১৩১৮ ফাল্গুন
রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা

সান্টননিবাসী ফ্লেচরের লেখায় এইরূপ একটি মত প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন মানুষ যদি কোন জাতির সমুদয় কথা ও কাহিনী ও গান রচনা করিতে পান, তাহা হইলে উহার আইনগুলি কে প্রণয়ন করে, তাহার খোঁজ লইবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। সোজা কথায় ইহার মানে এই যে লোকপ্রিয় সাহিত্য জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভবিষ্যৎ যেমন করিয়া গঠিত ও নির্দ্ধারিত করিতে পারে. আইনে তাহা পারে না। ফ্লেচারের মতটিতে কবিমাহাত্ম্য সুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত জাতীয় চরিত্রকে যে ভাবে গড়িয়াছে, কোন্ শাসনকর্ত্তা নিজের প্রভাব সেইপ্রকারে, তেমন স্থায়ী ভাবে, বিস্তার করিতে পারিয়াছেন? সুতরাং কবির সম্মান স্বাভাবিক, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। অনেক স্থলে কবির সম্মানলাভ ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান কালে অনেক কবি জীবিতকালেই বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। নর্ওয়ে দেশের বিখ্যাত কবি ইব্সেন্ যখন ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করেন, তখন তাঁহার স্বদেশবাসীরা ত তাঁহাকে অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াই ছিল; অধিকন্তু পৃথিবীর নানাদেশ হইতে তাঁহার নিকট উপহার এবং সাদর অভিনন্দন প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পর বৎসর নর্ওয়ের রাজধানী ক্রিষ্টিয়ানিয়ায় তাঁহার এক সুবৃহৎ ধাতব মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল *। মাছিমারা কেরানীকে সকলে উপহাসই করিয়া থাকেন;

* On the occasion of his seventieth birthday (1898) Ibsen was the recipient of the highest honours from his own country and of congratulations and gifts from all parts of the world A colossal bronze statue of him was erected outside the new National Theatre, Christiania, in September, 1899. — *The Encyclopaedia Britannica,* Eleventh Edition.

সুতরাং আশাকরি অন্ধ অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া নর্‌ওয়ের উদাহরণ হইতে কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না যে, ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইলে কোন কবিকে তাঁহার জীবিতকালে সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে।

বর্ত্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন এবং তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদানপ্রদান আমরা কখনও দেখি নাই। তৎপরে গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে বাঙ্গালী জাতির এক সভায় কবির সম্বর্দ্ধনা হয়। টাউনহলে এই উপলক্ষে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী, যাঁহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বরলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারাজীবের কার্য্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গের নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গের অগ্রণী, তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহুকৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গ মাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতিভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। গৃহধর্ম্মে নারীর সহকারিতা ব্যতিরেকে আর্য্যের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয় না। সমাজধর্ম্মেও যে এই নিয়ম অনুসৃত হইতেছে, ইহা অতি সুলক্ষণ। জাতীয় কবির সম্বর্দ্ধনা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন বঙ্গের যুবকগণ। তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছিল। শ্রেষ্ঠ কবিরা আমাদিগকে আশার বাণী শুনান, সেই স্বপ্নলোকের কথা বলেন, যারা ক্রমাগত মানুষের অন্তরে ও বাহিরে বাস্তবে পরিণত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বাস্তব হইয়া যাইতেছে না। সুতরাং, আশা ও উৎসাহ যাঁহাদের প্রাণ, স্বপ্নলোকে বিচরণ যাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, সেই তরুণবয়স্কেরা যে হাজারে হাজারে বঙ্গের কবিশিরোমণির সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

টাউনহলের সভা ভিন্ন আরও একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ, এবং একদিন সম্বর্দ্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; তিনি যে জীবিত বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে প্রথম স্থানীয় ইহাও অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর, পক্ষপাতশূন্য সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর, বিশ্বাস; যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের, এবং বহুভাষাভিজ্ঞ কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তির, মত এই যে তিনি বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিভাগে হাত দিয়াছেন, তাহাকেই

অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও তাহাতে নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন,—তাহা তাঁহার প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়াছেন; তাঁহার গদ্যরচনায় ও কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। নয়নগোচর রূপের জগৎ, সৌন্দর্য্যের জগৎ অনেক কবি, অনেক বাঙ্গালী কবি, দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন,—তিনি এ বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা কম শক্তিশালী নহেন; কিন্তু ধ্বনির জগতের রূপ তাঁহার মত করিয়া অনুভব করিতে ও নিপুণতার সহিত অন্যকে অনুভব করাইতে অল্প লোকেই পারিয়াছে। শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছে। তাঁহার নানা রচনার মধ্য দিয়া তিনি পরব্রহ্মের প্রেরণায় আমাদিগকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্বনিয়ন্তার সহিত যোগ স্থাপন করিতে আহ্বান করিতেছেন।

মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্ম্মস্থলে পৌঁছিতে তাঁহার মত আর কোন্ বঙ্গীয় লেখক পারিয়াছেন? মানবের বাহ্য আচরণের আন্তরিক কারণ কে এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন? তাঁহার হস্তে বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে। যে সকল আদর্শ, ভাব ও চিন্তার স্পর্শ, প্রভাব ও শক্তি বিশ্বমানবকে উন্নতির জন্য, নব আলোকের জন্য, নব জীবনের জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার রচনার মধ্যে অনুভব করিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষায় যদি কেবল তাঁহারই রচনা থাকিত, তাহা হইলেও উহা বিদেশীদের শিখিবার যোগ্য হইত। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন। তিনি ওস্তাদ্ না হইলেও, সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভা লক্ষিত হয়। তিনি যে কেবল ভগবদ্‌ভক্তি ও অন্যান্য নানাবিষয়ক বহুসংখ্যক অতি উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছেন, তাহা নয়; তিনি যে কেবল সুকণ্ঠে হৃদয়বীণার সহিত মিলাইয়া নানাভাবের গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে বহু বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়া আসিতেছেন, তাহা নহে; তিনি নূতন নূতন গানে নূতন নূতন সুর দিয়া নিজ বিশুদ্ধসঙ্গীতদক্ষতা দ্বারা অনেক সময় ওস্তাদ্‌দিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কবিতা ও নাটক পাঠে ও আবৃত্তিতে এবং সভাস্থলে লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা লক্ষিত হয়। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন, এবং না লিখিয়া মুখে মুখে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার বাগ্মিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার স্বরচিত নাটকের তিনি যেরূপ অভিনয় করেন, তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ অভিনেতা বলিয়াই মনে হয়।

তাঁহার রচিত স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশভক্তি বিষয়ক গানগুলি অতীব প্রাণস্পর্শী। তৎসমুদয় শ্রোতৃবর্গকে জন্মভূমিকে ভালবাসিতে ও ভক্তি করিতে শিক্ষা দেয়, মাতৃভূমিকে হৃদয়মন্দিরে আরাধ্যদেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখায়। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস এরূপ যে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বীররসের সঞ্চার করিতে হইলেই ভারতবাসী কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে মনকে উত্তেজিত না করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক গান রচনা করা সহজ হয় না। কিন্তু এরূপ গান, সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রীতিকর বা উৎসাহবর্দ্ধক হইতে পারে না। তদ্দ্বারা সম্প্রদায়বিশেষ ক্ষণিক উত্তেজনা, উৎসাহ ও তৃপ্তি লাভ করিলেও তাহা জাতিগঠনের উপায় হইতে পারে না। এই ভাবের বীররসাত্মক গান রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন নাই। তাহা না করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া বীরত্বসঞ্চারী কোন গানই যে তিনি রচনা করেন

নাই, তাহা নহে। বীরত্বের প্রধান উপাদান কি কি? সাহস, নির্ভীকতা, অপরের জন্য আত্মোৎসর্গ, স্বদেশবাসীর বা মানবের মহত্ত্বসম্ভাবনায় দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের পক্ষে স্বাধীনতার সম্ভাবনায় বিশ্বাস, সর্ব্বদেশে মানবপ্রকৃতির অদম্যতায় বিশ্বাস, সত্যন্যায়করুণার জয়ে বিশ্বাস, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল বিধানে বিশ্বাস। এই সব উপাদান তাঁহার "স্বদেশী" গানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আছে, "কথা ও কাহিনী"তে আছে। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে," এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে; বাহিরের শৃঙ্খল যত দৃঢ় করিবার চেষ্টা হয়, আভ্যন্তরীণ বন্ধন তত টুটিয়া যায়, এ শিক্ষা তাঁহার মত আর কে দিয়াছে? তাঁহার রচনাবলীর অসামান্য সুষমা ও সংযতভাব, তৎসমুদয়ে বাহ্য ডাক হাঁক আস্ফালনের বাক্যের বীরত্বোচ্ছ্বাসের অভাব আমাদিগকে অনেক সময় ভুলাইয়া দেয় যে তন্মধ্যে কিরূপ শান্ত সংযত আত্মসংবৃত অটল বীরত্বের উপাদান আছে।

তাঁহার স্বদেশপ্রেমে সংকীর্ণতা, অতীতগৌরবের অতিপূজা, কিম্বা বিদেশ ও বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা নাই। ভারতবর্ষের বিশেষত্বে এবং বিধিনির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্যে ও ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশেরও যে এইরূপ বিশেষত্ব, বিশেষকার্য্য এবং ভবিষ্যৎ আছে, তাহা তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, অনাবশ্যকও মনে করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশ সকলের একটা নিকৃষ্ট নকল মাত্র হয়, কিংবা উৎকৃষ্ট নকলও হয়, ইহা তিনি চান না। পশ্চিমের নিকট হইতে আমরা লইব, পশ্চিমও আমাদের নিকট হইতে লইবে। ভিক্ষুকের মত, পৈতৃকসম্পত্তিবিহীন অনাথ বালকের মত আমরা পশ্চিমের রাজপ্রাসাদের দ্বারস্থ হইব না। আমাদেরও প্রকৃতিতে সর্ব্ববিধ মহত্ত্ব, সর্ব্ববিদ সাফল্য, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যের বীজ নিহিত আছে; পশ্চিমের উত্তেজনায়, পশ্চিমের আলোড়নে, পশ্চিমের উত্তাপে, পশিমের নবশিক্ষাবারিসেচনে, ঐ সব বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে হইবে। অসাড় আমরা প্রাণবান্ পশ্চিমের সংস্পর্শে চেতনা পাইব। অন্ধকার গৃহের বদ্ধ বাতাসে আমরা ছিলাম; পশ্চিম আমাদিগকে বাহিরের আলো ও বাতাস, বাহিরের ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, বাহিরের জনতার সহিত ঠেলাঠেলির মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। এখন হাত পা ও মনটা একটু স্বাভাবিক ও সতেজ হউক। পশ্চিম উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। উহার আবির্ভাব আমাদেরই আভ্যন্তরীণ ব্যাধির ফল ও বাহ্যলক্ষণ। জোর করিয়া পশ্চিমকে গলাধাক্কা দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। আমরা মানুষ হইলে, সুস্থপ্রকৃতি হইলে, স্বদেশকে বাস্তবিক স্ব-দেশ করিতে পারিলে, ভাবে, চিন্তায়, জ্ঞানে, কার্য্যে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগকে স্বদেশী করিতে পারিলে, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য্যে স্বদেশী চেষ্টায় স্বদেশকে বরেণ্য করিতে পারিলে, আপনা আপনি পশ্চিমের প্রভুত্ব খসিয়া পড়িবে।

সুতরাং তাঁহার রাজনীতি আবেদন নিবেদন ততটা নহে, যতটা স্বদেশবাসী প্রত্যেকের ও স্বদেশী সমাজের আভ্যন্তরীণ সুস্থতাসম্পাদন ও শক্তিবর্দ্ধন। ভিতরে যে প্রবৃত্তির, স্বার্থের, ভয়ের, অজ্ঞানতার, কুপ্রথার দাস, বাহিরে সে স্বাধীন হইতে পারে না। অতএব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ আগে ভিতরেই অন্বেষণ করা চাই। এই জন্য রাজনীতিক্ষেত্রের রবীন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মাচার্য্য রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের-ছাপমারা-আমাদের অনেক সময়ে এইরূপ মনে হওয়া আরামদায়ক যে আর

কিছুতে না হউক, ইংরাজী-বহিপড়া-বিদ্যাতে এবং ইংরাজীরচনায় তিনি আমাদের সমকক্ষ নহেন; কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পাইবার চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং পানও নাই এবং ইংরাজী লিখিবার চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে মিশিলেই বুঝা যায় যে আমাদের মত বিদ্বৎখ্যাতি বিশিষ্ট বহুব্যক্তি অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী বহি পড়িয়াছেন ও এখনও পড়েন। আর, এম্-এ-পাশ-করা খুব বেশী লোকেই যে তাঁহার চেয়ে ভাল ইংরাজী লিখিতে পারেন, তাহাও ত দেখিতেছি না। অনেকে শুধু পড়েন, কিন্তু তিনি যত পড়েন, তদপেক্ষা চিন্তা করেন অধিক। সুতরাং ঔদরিকে ও মল্লে যে প্রভেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থকীটে ও তাঁহার মত লোকে সেই প্রভেদ। জগতে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবের গতি কিরূপ ক্ষিপ্র, কোন্ মুখী, তাহা আমরা অনেকে জানি না, কিন্তু সে খবর তিনি রাখেন। আর্য্য পিতামহগণ দর্শনে তত্ত্ববিদ্যায় শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান না। তিনি দেখিতেছেন, দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার জমিদারীর আবাদ পাশ্চাত্যেরাই করিতেছে, আমরা কেবল বংশগৌরব লইয়াই ব্যস্ত। সেই হেতু এই বয়সে তিনি পৃথিবীর জ্ঞানবীর জার্ম্মান্ জাতির ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই হেতু আবার ভ্রমণ দ্বারা পাশ্চাত্য জাতির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া নূতন আলোকে নূতন বাতাসে নবশক্তি লাভের প্রয়াসী হইতেছেন।

তিনি শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষার আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে তিনি ইহার প্রাণ বলিয়া চিনিয়া লইয়াছেন। এই আধ্যাত্মিকতা কতকগুলি বাহ্য জীবনহীন অনুষ্ঠান, বা সমাজবিমুখ সন্ন্যাস নহে। ইহা দেহমনের পবিত্রতা ও সুস্থতা দ্বারা প্রাণে, সমাজে, প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সংস্পর্শলাভ। কৃচ্ছ্রসাধন ব্রহ্মচর্য্য নহে। পবিত্রতা যেমন ব্রহ্মচর্য্যের প্রাণ, আনন্দ তেমনই ইহার হৃদয়। কঠোর শাসন চরিত্রগঠনের ব্রহ্মাস্ত্র নয়। আনন্দের সহিত শিক্ষা, মানবপ্রকৃতির স্বভাবসুস্থতায় বিশ্বাস, চরিত্রগঠনের প্রকৃত উপায়। সুস্থ প্রকৃতি বিলাস চায় না, জঘন্য আমোদ চায় না। পৌরুষেই তাহার আনন্দ। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর প্রাণ রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শরীরী হইয়াছে।

অনেকে বয়োবৃদ্ধিসহকারে সামাজিক কুপ্রথাদি বিষয়ে রক্ষণশীল হয়েন; রবীন্দ্রনাথ মতে ও আচরণে যাহা কিছু ভাল তদ্বিষয়ে রক্ষণশীল কিন্তু যাহা অনিষ্টকর তদ্বিষয়ে সংস্কারপ্রয়াসী। এবং এইভাব বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাড়িয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বৈচিত্র্যময় ও নানাজাতীয়; তিনি নিজেও বিচিত্রকর্ম্মা। তিনি নিজে তাঁহার রচনাবলী ও কার্য্য অপেক্ষা মহৎ। তাঁহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য বাঙ্গালী আরও অধিক আয়োজন করিলেও অতিরিক্ত হইত না। যাহা হইয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে সুলক্ষণ।

১৩১৯ ভাদ্র
ইংলণ্ডে সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ইংলণ্ডের সাহিত্যে যখন প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল, তখন সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিস্থানে দাঁড়াইয়া কবিদের চক্ষে এক নূতন জগতের স্বপ্ন উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। যেমন শেলি। ব্রাউনিংয়ের ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার সমস্ত কাব্যলোকটি "lies quivering in light as something lieth half of life before God's foot", ঈশ্বরের চরণসমীপে অর্দ্ধজীবনপ্রাপ্ত কোন বস্তু যেমন আলোকে কাঁপিতে থাকে, তেমনি করিয়া এক ভাবী জগৎসৃজনের নূতন আশার আবেগে এবং বেদনায় কম্পিত হইয়াছিল। সেই একই মাহেন্দ্রক্ষণে আবার ওয়ার্ডস্বার্থের ন্যায় কোনো কবির কাছে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপরকার পর্দ্দা উন্মোচিত হইয়া গেল এবং তিনি চাহিয়া দেখিলেন "into the life of things" সেই প্রাণহ্যেষঃ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাকে, যিনি বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ—যিনি বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন। সেই অরুণোদয়ে আশা-আনন্দের কোনো পরিমাণ রহিল না; সমস্তই অত্যন্ত উদার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দেখা দিল।

তারপরে ভিক্টোরিয়ার যুগে টেনিসন্ ব্রাউনিং এর সময়ে আমরা একেবারে মধ্যাহ্নের জনতার ভিড়ের মধ্যে, প্রবৃত্তি-ফেনায়িত বিচিত্র জীবনের তরঙ্গান্দোলনের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তখন স্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে, বাস্তবের সঙ্গে তখন মুখোমুখি পরিচয়। বিজ্ঞান প্রত্যহই বিশ্বপ্রকৃতির নূতন নূতন রহস্যের বার্ত্তা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সমস্ত মনুষ্যজাতির ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে। রাষ্ট্রে সমাজে কত পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে হাটের কলরবের মাঝখানে আমরা মানুষের বিচিত্ররূপ দেখিলাম—দূরদেশে, দূরকালে ব্যাপ্ত করিয়া তাহার সমস্ত মহত্ত্ব-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, তাহার কল্পনার গুহাগতি, তাহার প্রেমের নিবিড় অতলতা প্রত্যক্ষ করিলাম।

তারপর, দিন অবসান হইল। বাস্তবেই বাস্তবের পরিসমাপ্তি এ কথা আর সত্য রহিল না। যে মধ্যাহ্নের প্রখর দিবালোক আর কখনও ম্লান হইবে না মনে হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তাহার উপর সন্ধ্যার ঘোর নিবিড় হইয়া আসিল। হঠাৎ বিজ্ঞান দেখিল যে অণুর রহস্যের দিক্ দিয়াও শেষ নাই আবার জীবজগতের সারভূত মস্তিষ্কের জীবকোষের রহস্যেরও কোথাও শেষ নাই। অসীম রহস্য! জড়ে জীবে যে কল্পিত ব্যবধান ছিল তাহাও বুঝি ভাঙে ভাঙে! তত্ত্বজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিল, যে, তত্ত্ব মানে তো স্থিতির কথা, —কিছু আছে ইহা বলা—কিন্তু জীবন যে ক্রমাগতই চলিয়াছে—সুতরাং তাহার সম্বন্ধে কোনো তত্ত্বই শেষ কথা হইতে পারে না। দ্বৈত, অদ্বৈত, ওসবই স্থিতির কথা। অনন্ত স্থিতি এবং অনন্ত গতি ইহারি একটি সামঞ্জস্যের জায়গা হইতেছে চেতনাময় জীবন। এমনি করিয়া বাস্তবের সমস্ত রূপ, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার রহস্যের ঘোরে অত্যন্ত ঘোরালো হইয়া দেখা দিল।

এখন তবে কিসের কথা কবিতা গাহিবে? এখন যে রহস্যের হাওয়া দিয়াছে। এখন সুদূরের কথা, গভীরের কথা, অনন্ত আকাশের নক্ষত্রসভার

নিবিড় নিস্তব্ধতার কথা। অনেকের কথা নয়, একের কথা; বিচিত্রের কথা নয়, পূর্ণের কথা; সীমার কথা নয়, অসীমের কথা। ইউরোপীয় ভাবুকেরা সেই কথা বলিবার জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছেন;—কিন্তু হায়, ধূম যতটা তৈরি হইতেছে, অগ্নিশিখা ততটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইতেছে না; রহস্যের ঘোর যতটা জমিয়া উঠিতেছে, নিশ্চয়তার প্রত্যয় ততটা জাগিতে পারিতেছে না। মেটরলিঙ্ক প্রভৃতি আধুনিকদের লেখা পড়িলে এক মুহূর্ত্তেই তাহা বুঝা যায়।

কবি য়ীট্‌স্ (Yeats) ইংলণ্ডীয় সাহিত্যের এই সন্ধ্যাকালের ঘোরের কবি। তাঁহার মধ্যে এই অনিশ্চয়তার ব্যাকুলতা আছে। অবশ্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের অনুভব খুব গভীর। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে তাঁর সব কবিতা "বহুদূরে পাখা মেলিয়া"—

They come where your sad, sad heart is,
And sing to you in the night,
Beyond where the waters are moving
Storm-darkened or starry bright.

যেখানে তোমার দুঃখময় বেদনাময় অন্তরটি আছে সেইখানে আসিয়া রজনীতে তোমার কাছে গান গায়,—যেখানে জলধারা ঝড়ের অন্ধকারে বা তারকার দীপ্তির তলে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে—তাহারি পরপারে! তিনি আপনাকে 'pilgrim soul' অর্থাৎ পথিক আত্মা বলিয়াছেন—এবং সেই পথযাত্রার নানা রহস্যের গান গাহিয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লব হইতে আজ পর্য্যন্ত, সেই প্রথম অরুণাভাস হইতে এই সায়াহ্নের বিষাদমলিন ঘোর পর্য্যন্ত, যে আরম্ভ, মধ্য এবং পরিণামের এক আশ্চর্য্য লীলা দেখা গেল,—কবি রবীন্দ্রনাথ এক জীবনের মধ্যে সেইসকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া, সেই বিচ্ছিন্ন-কালের বিভিন্ন সকল লীলাকে এক অখণ্ড জীবনচক্রের মধ্যে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন দেখিতে পাই। এই পূর্ণ যুগচক্রের সঙ্গে তাঁহার পূর্ণ কবিজীবন-চক্রের কি বিচ্ছেদহীন মিলন! তাঁহার মধ্যে 'Alastor'-এর 'তারকার আত্মহত্যা' ছিল, 'Shadow-vested-misery'র ছায়াবগুণ্ঠিত বিষাদের সন্ধ্যাসঙ্গীত ছিল, অনন্ত সৌন্দর্য্যের 'প্রতিধ্বনি'র বেদনাময় সুর ছিল; আবার তাঁহারি মধ্যে 'প্রভাতউৎসব' জাগিয়াছিল, সমস্ত জগতের অন্তরের অন্তরে যে অফুরান রসের ও সৌন্দর্য্যের উৎস নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সেইখানকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সম্বাদ ছিল;—এসমস্তই যেন সেই ইংরাজী সাহিত্যের অরুণোদয়ের গান। তারপর "সোনার তরী" "চিত্রা"র যুগে গল্পে ও কবিতায় সেই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যাহ্নের বাস্তবানুভূতি জাগিল। 'Palace of Art' বা 'দেউল' ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিবার কথা, 'পরশপাথরে'র সন্ন্যাসীরও 'আকাশের চাঁদে'র প্রার্থীর হতাশ্বাসের কথা আমরা পাইলাম,— dylls রচিত হইল গদ্য গল্পে এবং 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'পুরস্কার' প্রভৃতি কাব্যে; বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি সিদ্ধান্তকে ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এক করিয়া লইবার, বিশ্বের চিত্র প্রাণধারাকে নিজের চেতনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিবার,—সমস্ত প্রাণকে এক প্রাণ ও সমস্ত চৈতন্যকে এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করিবার বার্ত্তা শুনিলাম,—"বসুন্ধরায়" 'জীবন-দেবতা' ও 'মৃত্যু'র উপরে সকল কবিতায়—"স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে"; —এবং "প্রেমের অভিষেক" 'one word more'-এর কথাও—ব্রাউনিংয়ের সকল কবিতার সাব কথাও—ফুটিয়া উঠিল। তারপর বৈকালের গলিয়া-পড়া রৌদ্রের মাধুর্য্য 'চৈতালী'র পাকা

শস্যের উপর যখন নামিল—তখন হইতেই ভোগবিরতির সুর। 'ক্ষণিকায়' 'কল্পনায়' সেই সুরের পূর্ণবিকাশ। এ সুর ইউরোপীয় কবির নাই। এ ঘোর নয়, আবেশ নয়—কিন্তু পরম শান্তি, নিবিড়তম উপভোগ। 'ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন ঝলমল প্রাণ' স্থাপন করিবার কথা! তারপরে নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলিতে একেবারে পরিপূর্ণতম গভীরতম রাগিণী—যে রাগিণী এখন ইউরোপীয় কবিসমাজকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—সে সীমার মধ্যে অসীমের রাগিণী, অরূপকে অনির্ব্বচনীয় রূপের মধ্যে গানের মধ্যে ধরিবার ব্যাকুলতার রাগিণী।—

সংবাদপত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন যে ইংলণ্ডের সাহিত্যসমাজ এই বঙ্গীয় কবিকে গত ১২ই জুলাই এক সান্ধ্য নিমন্ত্রণে কিরূপে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিয়াছিলেন। সেই সান্ধ্যসভায় ইংলণ্ডের প্রায় সকল বড় বড় সাহিত্যিক এবং সুধীবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কবি য়ীট্‌স্ ছিলেন সভাপতি। এচ্, জি, ওয়েল্‌স্ উপস্থিত ছিলেন, —তিনি সোস্যালিস্ট এবং ঔপন্যাসিক বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'A Modern Utopia' সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। মিস্ মে, সিন্‌ক্লেয়ার ছিলেন, তিনি একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী। নেভিন্‌সন্, হ্যাভেল, রদেনস্টাইন তো সুপরিচিত নাম। রলেস্‌টন্ ছিলেন, তিনিও একজন বড় কবি। একটা বিরাট্ জনতাময় সভা না করিয়া ইণ্ডিয়া সোসাইটি যে এই বাছা বাছা লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কবিসম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন এবং অনুষ্ঠানটিকেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। যে বৈঠক উপযুক্ত সমজদারের দ্বারা পূর্ণ হয়, সেখানে যে উৎসবটি জমিয়া উঠে, হৃদয়ের ভাব-উৎস যেমন সহজে খুলিয়া যায়, এমন কেবল বাজে লোকের দলবৃদ্ধির দ্বারা হয় না। স্বভাবত উত্তেজনাপ্রিয় ইংলণ্ডবাসী আপনা হইতে যে এরূপ চিত্তবিভ্রান্তকারী বারোয়ারি সৃষ্টি না করিয়া একটি রসিকজনসম্মিলনের মনোহর মধুচক্র রচিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

কবি য়ীট্‌সের সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি এদেশের অধিকাংশ কাগজেই প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সেদিন কবিকে যে স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেরই নিকট অতিবাদ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা য়ীট্‌সের কাব্যের সহিত পরিচিত, তাঁহার 'Pilgrim Soul'-এর পথিক আত্মার 'Sorrows of changing face' ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল মুখের সকল বেদনা যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন —সর্ব্বোপরি যাঁহারা আধুনিক সাহিত্যের রহস্যঘোরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া জানিয়াছেন কি ব্যাকুলতা এখন ইউরোপীয় চিত্তে প্রকাশের জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে—তাঁহারা য়ীট্‌সের স্তুতিবাদকে কখনই অতিশয়োক্তি বলিবেন না। তবে যাঁহারা দুনিয়ার কোনো খবরই রাখেন না—এবং আপনার ব্যঙ্গপ্রিয় প্রকৃতির চাপল্য ও লঘুতার দ্বারাই সকল গভীর জিনিষের অন্তরে প্রবেশ করিবার স্পর্দ্ধা ও দুরাকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহারা এরূপ প্রশংসাকে যে অতিশয়োক্তি বলিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি! যাহা হউক্ য়ীট্‌সের সমস্ত কথাগুলি এখানকার প্রায় কাগজে বাহির হয় নাই বলিয়া আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ দিলাম :

"একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন, যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যাহার অস্তিত্ব তিনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। আমার

কাব্যজীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে যে অদ্য আমি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান করিবার ভার পাইয়াছি। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার লিখিত প্রায় ১০০টি গীতিকবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে করিয়া ফিরিতেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোনো ব্যক্তিকে আমি জানি না, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন— এই কবিতাগুলির সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। এই অবিকৃত গদ্যানুবাদগুলি পাঠে আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, কি রচনারীতিতে, কি চিন্তায়, ইহারা অতুলনীয়। বহুশত বৎসর পূর্ব্বে একদা ইউরোপে এই রচনারীতি পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ একজন বড় গীতরচয়িতা—তাঁহার কবিতাতে তিনি সুর বসাইয়া থাকেন এবং তারপর তিনি সেই কবিতা ও গান কাহাকেও শিক্ষা দেন্। এবং এইরূপে মুখে মুখে সেই গান তাঁহার দেশবাসী কর্ত্তৃক গীত হইয়া চলিতে থাকে—যেমন তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে কবিতা গীত হইত। ইহার সকল কবিতার একটিমাত্র বিষয়— ঈশ্বরের প্রেম। আমি যখন ভাবিয়া দেখিলাম, যে, আমাদের পশ্চিম দেশে এমন কি গ্রন্থ আছে যাহার সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে, তখন আমার মনে পড়িল টমাস্ এ, কেম্পিসের "খৃষ্টের অনুকরণের" কথা। ইহারা সদৃশ বটে—কিন্তু এই দুই ব্যক্তির রচনায় কি আকাশপাতাল প্রভেদ! পাপের চিন্তার দ্বারা টমাস্ এ, কেম্পিস্ কিরূপ গুরুতররূপে অধিকৃত—কি ভীষণ উপমার সাহায্যে তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যে শিশু লাটিম লইয়া খেলা করিতেছে, সে যেমন পাপের চিন্তা জানে না—ঠিক্ তেমনি এই কবিও পাপ সম্বন্ধে কিছু মাত্র চিন্তা ব্যয় করেন নাই। টমাস্ এ, কেম্পিসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি প্রেমের কোনো স্থান নাই, তাঁহার কঠোর চিত্তের মধ্যে সেরূপ প্রেম প্রবেশ করিতে পারিত না কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রেমিক—তাঁহার কবিতার মধ্যে প্রকৃতির অনেক সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্মরেখাপাত হইয়াছে, যাহা তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও গভীর প্রেমেরই পরিচায়ক।"

য়ীট্‌স্ ইহার পর কবির অনুবাদিত তিনটি কবিতায় গদ্যানুবাদ পাঠ করেন। তাহার মধ্যে একটি কবির নৈবেদ্যের। 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেক্ষণে' এবং 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'— মৃত্যুর উপরে এই দুইটি কবিতাকে ভাঙিয়া ইংরাজী অনুবাদে একটি করিয়া লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি গীতাঞ্জলির একটি গান—"শ্রাবণঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে!" য়ীট্‌সের পরে দু একজন কিছু বলিবার পরে কবি স্বয়ং সেই সভায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়, রহস্যপ্রিয়তা এবং দূরদর্শিতা সমস্তই একাধারে ফুটিয়াছে। তাঁহার বক্তৃতাটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দিলাম :—

"আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করিলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই সে ভাষায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নাই। আশা করি আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন—আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে—তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই (ভাবিতে পারি) এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলা ভাষা অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণা গৃহিণীর ন্যায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবী করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকারপ্রবেশের তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেন নাই।

সেই জন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদিগকে এইটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি যে এদেশে আসা অবধি যে নিরবচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমাকে এত মুগ্ধ করিয়াছে যে আমি প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিনা। আমি একটি শিক্ষালাভ করিয়াছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষা লাভের জন্য আমার আসা সার্থক— যে যদিও আমাদের ভাষা, আমাদের আচার ব্যবহার সমস্তই পৃথক্ তথাপি ভিতরে ভিতরে আমাদের হৃদয় এক! নীলনদীর তীরে যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শস্যশ্যামল করিয়া দেয়, তেমনি পূর্ব্বাকাশের সূর্য্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিম্নে যে আইডিয়া আকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে হয়ত সমুদ্রপার হইয়া পশ্চিমে আসিতে হইবে— সেখানকার মনুষ্যহৃদয়ের মধ্যে তাহার সম্ভাষণ লাভের জন্য, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নাই এবং ঈশ্বর না করুন যে ইহার অন্যথা হয়—তথাপি এই উভয়ই মিলিতে পারে।— না—সখ্যে, শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে ইহারা একদিন মিলিবেই। ইহাদের ভিতরে প্রভেদ আছে বলিয়াই ইহাদের মিলন আরও সফল মিলন হইবে—কারণ সত্যকারের প্রভেদ কখনই বিলুপ্ত হইবার নয়—তাহা ইহাদের উভয়কে বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকার সম্মুখে এক পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে মিলিত করিবার দিকেই লইয়া চলিবে।"

ইহার পর কবির কাছে নানা স্থান হইতে ভক্তির অর্ঘ্য বহন করিয়া যেসকল পত্র আসিয়াছে তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রী-কবির পত্রই শুনাইবার মত। একজন লিখিয়াছেন :— "যে দিন প্রথম বাইবেলের কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়াছিলাম সেই দিনটি বাদে, আমার মনে পড়েনা যে গতরাত্রে যেমন অনুভব করিয়াছিলাম জীবনে আর কোনো দিন সেরূপ অনুভব করিয়াছি কিনা।"

আর একজন লিখিয়াছেন "আপনার কবিতাগুলির যে কবিত্ব হিসাবে একটি সম্পূর্ণতা এবং অখণ্ড সৌন্দর্য্য আছে মাত্র তা নয়—কিন্তু যে অতীন্দ্রিয় জিনিস বিদ্যুৎচমকের মত আসে, যাহা অনিশ্চয়তার বেদনায় অন্তরকে পীড়া দিতে থাকে—সেই তাহারি একটি চিরন্তন রূপ ইহাদের মধ্যে আমি পাইলাম। একজন লোক আরেকজনের চোখ দিয়া দেখিতে পারে কিনা আমি জানি না বোধ হয় পারেনা; কিন্তু একজনের অন্তরের সুদৃঢ় প্রত্যয় নিশ্চয় আর একজনের বিশ্বাসকে জাগায়। St. John of the Crossএর "আত্মার অন্ধকার রাত্রি" নামক কবিতাটি ছাড়া আপনার কবিতার তুলনা খুঁজিয়া পাইনা—কিন্তু আপনি একটি পরিপূর্ণ অদ্বৈত বোধে এবং একটি অধ্যাত্মক তত্ত্বদৃষ্টিতে St. John এবং অপর সকল খৃষ্টান কবিকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টান "মিষ্টিসিজ্‌ম্" ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমায় পরিপূর্ণ; সে যথেষ্ট সূক্ষ্ম নয়—জগতের মায়াবরণ ভেদ করিয়া সে সত্যকে দেখে নাই। সেই জন্য তাহার হৃদয়াবেগ যথেষ্ট নির্ম্মল নয়। তাহার এই অসম্পূর্ণতা আমাকে কোনো দিনই সন্তোষ দেয় নাই। কিন্তু যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি আমি চাই, তাহা গতরাত্রে আপনার কাব্যই আমাকে দিয়াছে। আপনি অতি স্বচ্ছসুন্দর ইংরাজীতে এমন জিনিষ আনিয়া দিয়াছেন যাহা আমি ইংরাজীতে কেন, কোনো পাশ্চাত্য ভাষায় কোনো দিন দেখিব না ভাবিয়া নিরাশ হইয়া গিয়াছিলাম।"

হাউস্ অব্ কমন্‌সে ভারতবর্ষীয় বজেট্ আলোচনাকালে সহকারী সচিব মিঃ মণ্টেগু কবির বক্তৃতার যে উল্লেখ করিয়াছিলেন বা ইংলণ্ডের

টাইম্‌স্‌ পত্রে যে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা খুব উল্লেখযোগ্য মনে করি না। কারণ কবির যথার্থ সম্মান রসিকসমাজে—জনগণের হৃদয়মধ্যে—রাষ্ট্রদরবারে তাঁহার উল্লেখমাত্র তাহার তুলনায় অতি নগণ্য।

ইংলণ্ডের একজন প্রথিতনামা মনীষীর নিকট হইতে আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যে পত্র পাইয়াছেন তাহার কিয়দংশের অনুবাদ এখানে দেওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে। তিনি লিখিতেছেন :—

"কবি আসিতেছেন শুনিয়া প্রথমটা যে আনন্দ হইয়াছিল, এখন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া তদপেক্ষা কত যে বেশি আনন্দ হইতেছে তাহা আর বলিবার নয়। আমি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়াছিলাম তাহার সমস্তই এই মধুরস্বভাব সাধুটির মধ্যে দেখিতে পাইতেছি এবং যাহা কল্পনা করি নাই এমনও বহু সদ্‌গুণরাশি দেখিতেছি। ইঁহার চেয়ে মহত্তর আত্মা কে কবে দেখিয়াছে—ইঁহার অপেক্ষা গভীরতর সত্যপ্রেরণা আর কোথায় মিলিয়াছে? আমি যে ইঁহার কবিতাকে কত উচ্চে আসন দিই তাহা আপনাকে আমি বলিতে পারি না—যদি বলি, তবে আপনি মনে করিবেন যে আমি বাড়াইয়া বলিতেছি। ইহাঁর অন্তরতর গভীর অভিজ্ঞতা হইতেই ইহাঁর সকল লেখার উৎপত্তি—তাহার মধ্যে নৈপুণ্য বা শক্তি ফলাইবার প্রয়াসমাত্র দেখিনা—তাঁহার সমস্ত রচনাই এই বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান সৌন্দর্য্যের নম্রমধুর আবেগপূর্ণ হৃদয়োত্থিত স্তব-অর্ঘ্য। তাঁহার কাছে সেই সৌন্দর্য্যই বিশ্বের ঐক্যের পরিপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট প্রকাশ—অনন্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য ভগবানের অনন্ত প্রেমের বাহ্যচিহ্ন বাহ্যবিগ্রহ মাত্র। সহস্র পদার্থে ইহাই তিনি দর্শন করেন এবং সহস্র রূপে জীবনের ও মৃত্যুর অক্লান্ত স্তবগানে ইহাই তিনি ব্যক্ত করেন। আপনাদের বাংলা ভাষায় যে ইঁহার কবিতার সৌন্দর্য্য কিরূপ, তাহা আমি আবছায়ামত কল্পনা করিতে পারি মাত্র—কিন্তু ইঁহার কবিতার বাহ্যরূপটি না পাইলেও তাহার নিগূঢ়-গভীর অর্থ হৃদয়কে ব্যথিত ও আত্মাকে আলোড়িত করিবার পক্ষে যথেস্ট। এই গদ্যানুবাদেও আমি এমন জিনিস পাই যাহা আর কোনো সমসাময়িক কাব্যের মধ্যে পাই না। এত বড় আপনাদের কবি, আপনাদের কি গর্ব্বের কথা!—বিশেষত যখন এত বড় কবির সঙ্গে এমন একটি চরিত্রের সম্মিলন ঘটিয়াছে। যদি এমন অনেক দূত আপনাদের দেশ হইতে এদেশে আসিতেন! এই কবিকে যে কেহ দেখিয়াছেন, তিনিই ভাল বাসিয়াছেন, এবং ইংরাজীগদ্যে ইঁহার কবিতা অনুবাদিত হইবার জন্য ইঁহার প্রতি অনেকের গভীর ভক্তি হইয়াছেন। সাম্‌নের শরতেই ইণ্ডিয়া সোসাইটি কবির অনুবাদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন এবং য়ীট্‌স্‌ স্বয়ং তাহার ভূমিকা লিখিয়া দিবেন। আমার বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ বাহির হইলে বহু লোকের নিকট তাহা সমাদর লাভ করিবে।"

এই অনুবাদগুলি কবির স্বকৃত। তিনি কবি য়ীট্‌সকে ঐগুলি মার্জ্জিত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলে কবি য়ীট্‌স্‌ বলিয়াছিলেন যে, "এই অনুবাদের কোনো কথা বদল করিয়া মার্জ্জিত করিয়া তুলিতে পারা যায়, যদি কেহ এমন কথা বলে তবে সে সাহিত্য কি তাহা জানে না।"

কবির প্রতি কাহারো কাহারো ভক্তি এমন প্রবল হইয়াছে যে তাঁহারা কবিকে গুরু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পদধূলি লইয়াছেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন তাঁহাদের মধ্যে একজন। দিল্লী কলেজের অধ্যাপক রেভারেণ্ড সি,

এফ, এণ্ড্রুজ, মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে লিখিয়াছেন—"যে-কবি তাঁহার কাব্যের দ্বারা তাঁহার স্বজাতিকে এতদূর উদ্বুদ্ধ ও উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতাম, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।...তাঁহার সহিত বাংলা দেশের প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া আমি বলিলাম 'জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসকলের মধ্যে বাঙালীর যথার্থ স্থানটি নির্দ্দিষ্ট হওয়ার সময় সুদূর নয়।' এই কথায় কবির মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল, একটি সুদূরের আলোক তাঁহার দৃষ্টিতে জ্বলিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম বঙ্গজননীর মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং ইংলণ্ডের সুধীসমাজের আতিথ্য ও সমাদরের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত প্রবাস-বেদনা অনুভব করিতেছে।...তাঁহার কবিতা-আবৃত্তি শুনিয়া ভাবাবেশে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ অক্ষিপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল—এ আজ কি আনন্দ, যে, ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এতদিনে আমার দেশ ভারত-প্রতিভার পূজা করিতেছে।... রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কবিতার অনুবাদে যেসকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, সেগুলি ললিত ও যথাযথ (marked by a stately grace and dignity), সুন্দর ও স্বচ্ছ (beautiful and lucid)। আবৃত্তি শুনিয়া একজন বলিয়াছিলেন 'আসল বাংলায় যে ইহা অপেক্ষা আর কি ভালো আছে তাহা আমার ধারণারও অতীত'।"

ইংলণ্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক—এ বিষয় তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোনো দেশে নাই।

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জিয়ান" পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে "ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আগমনে এদেশে যে সম্মান সম্ভ্রম প্রশংসা ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং রসিকসমাজে যে সাড়া পড়িয়াছে এমনটি এযুগের লোকের জীবদ্দশায় কখনো কোনো প্রাচ্য অতিথির জন্য হইতে দেখা যায় নাই।"

—

১৩২০ অগ্রহায়ণ

[রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি প্রসঙ্গ]

আমাদের দেশে যদি কেহ নূতন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া করেন, তাহা হইলে তাহা নূতন কিনা, এবং নূতন হইলে আবিষ্ক্রিয়াটির মূল্য কি, তাহা জানিবার জন্য আমরা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতের অপেক্ষা করিতে বাধ্য হই। কারণ, আমাদের দেশে এরূপ বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বড় কম যাঁহাদের মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। এখন এরূপ আশা হইতেছে যে আমাদের এই দুরবস্থা চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে না।

সুকুমারশিল্পক্ষেত্রেও আমরা এইরূপ পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষিতা করিয়া করিয়া এখন স্বাধীনভাবে ললিত কলার রস গ্রহণে সাহসী হইয়াছি।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা করিবার প্রয়োজন বাঙ্গালীর বহুকাল হইতেই ছিল না। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত গিয়া তাঁহার গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে জগতের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ সমঝদার লোকের, বা এরূপ রসজ্ঞের মত বুঝিয়া সুঝিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার, লোকের একান্ত অভাব বঙ্গদেশে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও শেষোক্ত ব্যক্তিদের মত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগৌরব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তাই আজ তাঁহার নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ দ্বারা জগতের সাহিত্যিকগণের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হওয়ায়, আমরা অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিতে পারিতেছি। "আমরা তাঁহাকে মোটেই চিনিতে পারি নাই; বিদেশী তাঁহাকে চিনাইয়া দিল, তবে চিনিলাম," এরূপ চিন্তাপ্রসূত লজ্জায় ও ক্ষোভে, আমাদিগকে মাথা হেঁট করিতে হইতেছে না! বাস্তবিক স্বদেশীয় মহৎব্যক্তির মহত্ত্ব অনুভব করিতে না পারার মত হীনতা সেই দেশবাসীর পক্ষে আর কি হইতে পারে? সেই হীনতা হইতে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

এ কথা কিন্তু বলিতে পারা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বঙ্গের "মান্যগণ্য" ব্যক্তিরাও বুঝিয়াছিলেন। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি প্রশংসিত হইবার পর, তথায় ভারতের সহকারী সচিব মন্টেগু সাহেব তাঁহার গুণগান করার পর, বড়লাট সাহেব রবীন্দ্রনাথকে "Poet Laureate of Asia" বা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি বলার পর, কিছু দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যাচার্য্য (Doctor of Literature) উপাধি দিবেন। কিন্তু তিনি এবার বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বালকদিগের উপযোগী করিয়া সম্পাদন করিয়া "পাঠসঞ্চয়" নামে একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট তাঁহাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার জন্য পাঠান হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কিম্বা উহার লিখনরীতির (style) মধ্যে কোন প্রকারের গুণ দেখিতে না পাইয়া উহা অগ্রাহ্য করেন। সেই নামঞ্জুর পুস্তকের লেখককে আজ বিশ্ববিদ্যালয় "সম্মানিত" করিবেন। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন নাই! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কি উপাধি দিবেন বা না দিবেন, তাহাতে তাঁহার কিছুই আসিয়া যায় না। কিন্তু আমাদিগকে ইহা লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাহিত্যরসজ্ঞতা রাজপুরুষদের মোসাহেবীর সহিত হয়ত অভিন্ন, এরূপ সন্দেহ চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না। অবশ্য ইহা একেবারে অসম্ভব নহে যে সত্য সত্যই বিশ্বপণ্ডিতদের চোখ খুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদের প্রভাবেও যে বাংলা সাহিত্যের সম্মান হইতেছে ইহা শুভ লক্ষণ।

নোবেল জাতিতে সুইড্ ছিলেন। নোবেল পুরস্কার পণ্ডিত ও রসজ্ঞ সুইড্দিগের দ্বারা প্রদত্ত হয়। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কারযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করেন সুইডেনের বিজ্ঞানপরিষদ্, চিকিৎসা বা শরীরতত্ত্ববিদ্যার বিচারক তদ্দেশের চিকিৎসক সমিতি, সাহিত্যের বিচার করেন সুইড্ সাহিত্যপরিষদ্, এবং জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে সম্ভাব বর্দ্ধন এবং শান্তির স্থায়িত্ব বিধান

কাহার দ্বারা অধিকতম পরিমাণে হইয়াছে, তাহা স্থির করেন পাঁচজন সুইডের এক পঞ্চায়েৎ। এই পাঁচ জন সুইডেনের স্টর্থিং বা প্রতিনিধি সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হন।

সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের জন্যই পুরস্কার দেওয়া হয় যাহা জীবনে ভাব ও সুকল্পিত আদর্শকে শ্রেষ্ঠ আসন দেয় ("the most distinguished of work an idealistic tendency in the field of literature," "the most remarkable literary works *dans le sens d' idealisme*")। অর্থাৎ কিনা ডাল-ভাত-পয়সা রূপী "বস্তুতন্ত্র"তাটা না হইলেও চলে। কিন্তু গ্রন্থখানি অলোকসামান্য হওয়া চাই, এবং সেরূপ গ্রন্থ লিখিতে সাধনারও প্রয়োজন হয়।

সুইডেন দেশজয় বা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র নহেন। সুইডেরা নিজেদের স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট; জ্ঞানার্জ্জন, জ্ঞানোন্নতি ও বাণিজ্যবিস্তার প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহারা ব্যাপৃত। কোন জাতির সঙ্গে তাঁহাদের রেষারেষি নাই। তাঁহাদের পুরস্কার দানের মধ্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব বা রাজনৈতিক কুটবুদ্ধি থাকে না। এই জন্য এপর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার নানাজাতীয় লোকে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইংরাজদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত সাহিত্যের জন্য একজন মাত্র (কিপলিং) নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহারও জন্ম ভারতবর্ষে, বোম্বাইয়ে। পদার্থবিদ্যায় দুজন (Lord Rayleigh ও Prof. J. J. Thomson) রসায়নে একজন (Sir W. Ramsay) চিকিৎসায় একজন (Sir R. Ross). এবং শান্তিভাব বর্দ্ধনে একজন (Sir W. R. Cremer) ইংরাজ নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইল। মানবজাতির লাভ এই হইল যে সাহিত্যের মনোময় রাজ্যে কার্য্যতঃ জাতিবর্ণদেশনির্ব্বিশেষে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইল; মানবাত্মা স্বরূপে আশায় আকাঙ্ক্ষায় যে সর্ব্ব দেশে এক, তাহা আবার একবার নূতন করিয়া বুঝা গেল। বাঙ্গালী বুঝিতে পারিল. তাহার সাহিত্য প্রাদেশিক নয়, বিশ্ববাসীর আদরের জিনিষ তাহাতে আছে। এই বোধ যদি আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, আলস্য, পাশবতা, ভীরুতা এবং আশাহীনতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ করে, তাহা হইলেই মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথের "নোবেল"-পুরস্কার প্রাপ্তি

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম

কবি যখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"জগৎকবিসভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব
বাঙালী আজি গানের রাজা বাঙালী নহে খর্ব্ব"

তখন অনেকে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—"এ সব নিতান্ত বাড়াবাড়ি, মিথ্যা স্তুতি মাত্র।" তাঁহাদের সেই হাসি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে সুদূর ভবিষ্যতে জগৎসাহিত্যের কষ্টি-পাথরে যখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যের নিকষ-রেখা জ্বলন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তখন এই বিজ্ঞেরা তাহা না দেখিতে

পাইলেও, তাহাদের বংশধরগণ তাহা দেখিয়া ধন্য হইবে। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠে য়ুরোপ ও আমেরিকা বিস্মিত ও আনন্দমুগ্ধ, তখন বুঝিলাম, একদিন যাহাকে সুদূর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই বর্ত্তমান হইতে চলিল। যাঁহারা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়াছিলেন তাঁহারা তখন বলিলেন—"ও একটা হুজুগ মাত্র।" কিন্তু আজ যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা শুনিয়া অতিবড় সংশয়ী জনও অবনতমস্তকে স্বীকার করিবে, আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

সকলেই হয়তো উৎসুক হইয়া ভাবিতেছেন সংবাদটি কি? সংবাদটি এই :—

(Reuter's Service)
London, Nov. 13, 1913.
The Nobel Prize for literature has been conferred on the Indian Poet Rabindranath Tagore.

অর্থাৎ—

"সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট নোবেল পুরস্কার ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রদত্ত হইয়াছে।"

কিন্তু "নোবেল পুরস্কার" জিনিষটা কি? "নোবেল পুরস্কার" বা "Nobel Prize" সমস্ত য়ুরোপ ও আমেরিকার মনস্বীগণের চরম সাধনার ও কামনার ধন,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। সেখানে নোবেল-পুরস্কারলাভ অমরতালাভের নামান্তর মাত্র।

সুইডেনের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও ডাইনামাইটের আবিষ্কারক আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল মৃত্যুকালে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ) কয়েকজন ট্রষ্টীর হস্তে তাঁহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ ২,৬২,৫০,০০০ দুই কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, ন্যস্ত করিয়া এই মর্ম্মে এক উইল করেন যে প্রতি বৎসর মানবচেষ্টার নানাবিভাগে বিশ্বমানবের কল্যাণার্থ যাঁহাদের কার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, তাঁহাদের মধ্যে এই অর্থের আয় সমানভাবে বিভক্ত করিয়া দিতে হইবে। পুরস্কারটি পাঁচভাগে বিভক্ত। পাঁচটি বিভিন্ন কর্ম্ম-বিভাগের কর্ম্মীশ্রেষ্ঠকে পাঁচটি পুরস্কার প্রদত্ত হইয়া থাকে। যথা—(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ('ফিজিক্স') (২) রসায়ন শাস্ত্র (৩) চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীরতত্ত্ববিদ্যা (৪) সাহিত্য (৫) জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহনিবারণ ও শান্তিপ্রতিষ্ঠা। কখনো কখনো দুইজন ব্যক্তি সমভাবে পুরষ্কারযোগ্য হইলে এই পুরস্কার দুই জনকেও দেওয়া হয়। এক একটী পুরস্কারের মূল্য প্রায় ১২০০০০ একলক্ষ কুড়িহাজার টাকা।

স্ত্রীপুরুষ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই পুরস্কার পাইতে পারেন। তবে সাহিত্যের পুরস্কার সম্বন্ধে একটি নিয়ম আছে এই যে, যে-পুস্তক বিচার করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় লিখিত হউক আপত্তি নাই—কিন্তু সেটির অন্ততঃ একটি য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ থাকা প্রয়োজন। সুইডেনের "একাডেমী অফ লিটারেচার" বা সাহিত্য পরিষদের উপর সাহিত্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার প্রদানের বিচারভার ন্যস্ত আছে। পুরষ্কারপ্রদাতা আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুর পাঁচবৎসর পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এই পুরস্কার-প্রদান আরম্ভ হয়। সাহিত্যবিভাগে এ পর্য্যন্ত যে-সকল পাশ্চাত্য সাহিত্যরথী পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯০১...সালী প্রুধোম (Sully Prudhomme) ইনি ফরাসী কবি। ইঁহার সুবিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "S'ances et Poéms সমালোচক-শ্রেষ্ঠ স্যাঁৎ-ব্যভ (Sainte-Beuve) কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁহার কাব্যখানি ফরাসী সাহিত্যজগতের একটি শ্রেষ্ঠসৃষ্টি। জন্ম—১৮৩৯, মৃত্যু—১৯০৩।

১৯০২...থিওডোর মমসেন্ (Theodore Mommsen) ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই এই প্রসিদ্ধ জর্ম্মান ঐতিহাসিকের নাম সবিশেষ অবগত আছেন; ইঁহার রচিত রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের একত্র সমাবেশ কেবল ইঁহার ইতিহাসেই দেখা যায়। জন্ম—১৮১৯, মৃত্যু—১৯০৩।

১৯০৩...বোর্ণষ্টার্ণ ব্যোর্ণসন্ (Bjohrnsterne

Bjohrnson) অনেকের মতে ইনি নরওয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। ছোটগল্প লিখনেও ইনি একজন ওস্তাদ ছিলেন। অভিনয়-কার্য্যেও ইঁহার পারদর্শিতা বড় অল্প ছিল না। জীবনের অধিকাংশভাগ ইনি নরওয়ের জাতীয় রঙ্গশালার অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসাধাবণ বাগ্মিতাবলে ইনি রাজনীতিক্ষেত্রেও যথেস্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইঁহার রচিত নরওয়ের প্রাণোন্মাদকর জাতীয় সংগীত ফরাসী জাতীয় সংগীত "লা মার্শেঁইয়ের" মত এক অপূর্ব্ব বস্তু। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার "তীর্থসলিলে" এই সংগীতের একটি মনোজ্ঞ অনুবাদ করিয়াছেন। জন্ম—১৮৩২, মৃত্যু—১৯১০।

১৯০৪..ফ্রেডেরিক মিস্ট্রাল (Frederic Mistral) ও জোসে একেগ্যারে (Jose Echegaray)।

১। ফ্রেডেরিক মিস্ট্রালের জন্মভূমি ফ্রান্সের অন্তর্গত "প্রভেন্স" (Provence) প্রদেশ। ইনি সেই "প্রভেন্সের" প্রাদেশিক ভাষাকে (Provencal) ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রভেন্সাল ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানির সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে অতি শীঘ্রই মিস্ট্রাল খ্যাতনামা হইযা পড়েন। এতদ্ভিন্ন তিনি "প্রভেন্সের" বহু ছড়া, ও কথা কাহিনী সংগ্রহপূর্ব্বক অনেকগুলি অতি মনোরম পুস্তক প্রণয়ন করিয়া 'প্রভেন্সাল' সাহিত্যকে অতি উচ্চস্থান দান করেন। জন্ম—১৮৩০।

২। জোসে একেগ্যারে উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্পেনীয় নাট্যকার। জন্ম—১৮৩২।

১৯০৫...হেনরিক সিঙ্কিভিচ (Henryk Sinkiewicz) ইনি জগদ্বিখ্যাত উপন্যাস "কুও ভাডিসের" রচয়িতা। জাতিতে পোল। জন্ম ১৮৪৬।

১৯০৬...গিয়োসুয়ে কার্দ্দুচি (Giosue Carducci) ইটালীর কবি ও পণ্ডিত। ইঁহার 'সয়তান' সম্বন্ধে রচিত কবিতা ইটালীর কাব্য-সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। জন্ম—১৮৩৬, মৃত্যু—১৯০৭।

১৯০৭...রাডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling) জাতিতে ইংরাজ, জন্মস্থান বোম্বাই। আধুনিক ইংল্যাণ্ডের জনপ্রিয় কবি, ব্রিটীশ 'ইম্পীরিয়লিজম' বা সাম্রাজ্যবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। জন্ম—১৮৬৫।

১৯০৮...রাডল্ফ্ অয়কেন্ (Rudolph Eucken) জাতিতে জর্ম্মান; আধুনিক য়ুরোপের চিন্তারাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক ও পরিচালক। সরসভাবে ও ভাষায় ধর্ম্ম ও দর্শনের উচ্চতত্ত্বপ্রচারে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি য়ুরোপে আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। এই মনীষী জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলি য়ুরোপের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পঠিত হইতেছে।

১৯০৯...সেলমা লেজারলফ্ (Selma Lagerlof) ইনি স্ত্রীলোক। সুইডেনের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। অসাধারণ প্রতিভাশালিনী। জন্ম—১৮৫৮।

১৯১০...পল্ হেয়সি (Paul Heyse) জর্ম্মান ঔপন্যাসিক ও জর্ম্মানসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-লেখক।

১৯১১...মরিস মেটারলিঙ্ক (Maurice Maeterlinck) জাতিতে বেলজিয়ান। নাট্যকার ও দার্শনিক। আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যজগতে মেটারলিঙ্কের স্থান সকলের উপরে। তাঁহার নাটকগুলি মানবের অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্রনিগূঢ় অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বিবৃতি। মেটারলিঙ্কের একখানি symbolical বা বিগ্রহরূপী নাটক কবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রবাসীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা তাঁহার "রঙ্গমল্লী" গ্রন্থে আছে। দার্শনিক প্রবন্ধাদি রচনাতেও মেটারলিঙ্ক সিদ্ধহস্ত। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ গদ্যগ্রন্থগুলি চিন্তাশীলের খোরাক, ভাবুকের উপভোগ্য। জন্ম—১৮৬২।

১৯১২...জেরহার্ট হপ্টম্যান (Gerhart Hauptman) আধুনিক জার্ম্মানীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। য়ুরোপীয় সমাজের নানা জটিল সমস্যা ইনি নাট্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছেন। হপ্টম্যান বিখ্যাত

সুইডেনীয় নাট্যকার ইবসেনের শিষ্য। জন্ম—১৮৬২।

১৯১৩...রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জন্ম—১৮৬১।

সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে যে-সকল মনীষী এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে রনজেন্, অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরী, মার্কনি, স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে, মেচনিকফ্, রুজভেল্ট, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি পাঠে য়ুরোপ যে কতদূর চমৎকৃত হইয়াছে, তাঁহার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিই সে কথার সাক্ষ্য দিতেছে। পুরস্কারের সঙ্গে অর্থ আছে বটে, কিন্তু যে সম্মান ইহার সহিত জড়িত তাহার নিকট এক লক্ষ কেন এক কোটি মুদ্রাও অকিঞ্চিৎকর। আবার রবীন্দ্রনাথের এই সম্মান নোবেলপুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য সাহিত্যিকদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রথমতঃ তিনি প্রাচ্যদেশবাসী। যদিও পাঁজিপুঁথিতে প্রাচ্যদেশবাসীকে নোবেল পুরস্কার প্রদানে কোন নিষেধ কিম্বা বাধা নাই, তথাপি সে দিকে যে য়ুরোপের একটা কত বড় সংস্কারগত বাধা আছে তাহা সকলেই বেশ বুঝিতে পারেন। কিন্তু কবির প্রতিভার আলোকে সকল সংস্কার, সকল বাধা সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত দূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। তিনি আজ য়ুরোপের কেন, সমস্ত বিশ্বের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে যাঁহারা নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বহুদিন ধরিয়া য়ুরোপীয় জগতে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সারাজীবন সাহিত্য-সেবায় তন্ মন্ ধন্ অর্পণ করিয়া জীবনের শেষভাগে এই গৌরবমুকুট লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপীয় সাহিত্য-জগতে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনো কোন য়ুরোপীয় ভাষায় এক ছত্রও লেখেন নাই। অথচ বিদেশীভাষায় তাঁহার প্রথম রচনা য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিল। যখন এ কথা ভাবি তখনই আনন্দে, গর্ব্বে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। এক শত বৎসরে আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্থান লাভ করিল। যিনি বাংলা ভাষাকে এই গৌরবমুকুট পরাইয়াছেন আজ তাঁহার গৌরবে সমস্ত বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব, সমস্ত প্রাচ্য ভূমির গৌরব। তিনি আজ সমস্ত এসিয়ার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। আজ কে না বলিবে

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা?

১৩২০ পৌষ

আভ্যুদয়িক *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের "নোবেল্-প্রাইজ্" প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য-পূজায় সপ্ত সাগর মিল্‌ল আসি'।
কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী,—
কি মন্তরে মিল্‌ল তবু অন্তরে কে টান্‌ল ডুরী!
কোলাকুলি কালায় গোরায় প্রাণের ধারায় প্রাণ মেশে,
রাজার পূজা আপন রাজ্যে কবির পূজা সব দেশে।

* * *

বাংলা দেশের বুকের মাঝে সহস্রদল পদ্ম ফোটে,

* ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে বোলপুরে "রবীন্দ্র-সঙ্গমে" পঠিত।

পবনে তার আমোদ ওঠে ভুবনে তার বার্ত্তা ছোটে,
জন্ম যাহার শান্ত জলে সুপ্ত-লহর স্নিগ্ধবাতে
সাগরে তার খবর গেছে শুভদিনের সুপ্রভাতে;
তুষারে তার রূপ ঠিকরে রং ফলায়ে মেঘের গায়,
রঙীন করে প্রাণের রঙে অরুণ-রাণী আরোরায়।

* * *

'রাজার পূজা আপন দেশে, কবির পূজা বিশ্বময়'—
চাণক্যের এই বাক্য প্রবীণ মিথ্যা নয় গো মিথ্যা নয়।
পাহাড়-গলা ঢেউ উঠেছে গভীর বঙ্গ-সাগর থেকে,
গল্‌ল এবার কঠোর তুষার দীপ্ত রবির কিরণ লেগে;
বাতাসে আজ রোল উঠেছে "নিঃস্ব ভারত রত্ন রাখে!"
সপ্ত-ঘোটক-রথের রবি সপ্ত-সিন্ধু-ঘোটক হাঁকে!

* * *

বাহুর বলে বিশ্বতলে করিল যা' নিপ্পনিয়া,—
বাংলা আজি তাই করিল!...হিয়ায় ধরি' কোন্ অমিয়া!
মানবতার জন্মভূমি এশিয়ার সে মুখ রেখেছে,—
মর্চে-পড়া প্রাচীন বীণার তারে আবার তান জেগেছে!
তান জেগেছে—প্রাণ জেগেছে—উদ্বোধিত নূতন দিন,
ভুজঙ্গ আজ নোয়ায় মাথা, ভেদের গরল বীর্য্যহীন।

* * *

জাদুর মুলুক বাংলা দেশে চকোর পাখীর আছে বাসা,
তাহার ক্ষুধা সুধার লাগি', সুধার লাগি' তার পিপাসা।
পূর্ব্বাকাশে গান আছে সে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি,
আজ্‌কে তাহার গান শুনিতে জগৎ জাগে প্রহর গণি;
অন্তরে সে জোয়ার আনে না জানি কোন্ মন্তরে গো
অন্তরীক্ষে সদ্যোজাত নূতন তারা সন্তরে গো!

* * *

বাংলা দেশের মুখ পানে আজ জগৎ তাকায় কৌতূহলী,
বঙ্গে ঝরে পরীর হাতের পুণ্য পারিজাতের কলি!
"বঙ্গভূমি! রম্য তুমি" বল্‌ছে হোরা, শোন্ গো তোরা,
"ধন্য তুমি বঙ্গকবি পরাও প্রেমে রাখীর ডোরা;
বিশ্বে তুমি বক্ষে বাঁধ, শক্তি তোমার অল্প নয়,
ধ্রুব তারার পিয়াসী গো শুভ তোমার অভ্যুদয়।

* * *

অন্ধকার এই ভারত উজল রবি তোমার রশ্মি মেখে,
তাই তো তোমার অর্ঘ্য এল নৈশ-রবির মুলুক থেকে;
তাই তো কুবের-পুরীর পারে দীর্ঘ উষার তুষার-পুরী
সোনার বরণ ঝর্ণা ঝরায় গলিয়ে গুহার বরফ্-ঝুরি;
দুর্গতির এই দুর্গ মাঝে তাই পশে প্রসন্ন বায়ু,
পুষ্ট তোমার সুকৃতিতে দেশের ভাতি জাতির আয়ু।

* * *

ধন্য কবি! কাব্য-লোকের ছত্রপতি! ধন্য তুমি;
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।
বঙ্গভূমি ধন্য হ'ল তোমায় ধরি' অঙ্কে, কবি।
ধন্য ভারত, ধন্য জগৎ, ভাব-জগতের নিত্য-রবি।
পুণ্যে তব পুষ্ট আজি বাল্মীকি ও ব্যাসের ধারা,
বিশ্ব-কবি-সভায় ওগো! বাজাও বীণা হাজার-তারা!

১৩২০ চৈত্র

[প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্র-শোধন]

এবারকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার প্রশ্নপত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ছিন্নপত্র" হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে বলা হইয়াছে—"Rewrite the following in chaste and elegant Bengali." "নিম্নোদ্ধৃত বাক্য-গুলিকে মার্জ্জিত শুদ্ধ সুন্দর বাংলায় লেখা।" হওয়া করা প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্যের আর সমুদয় অংশ যতই সংস্কৃতের মত হইবে, বাংলাটা ততই শুদ্ধ মার্জ্জিত সুন্দর হইবে এই সংস্কার এখনও বদ্ধমূল হইয়া

আছে। প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য সহজেই বুঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ কথিত বাংলায় লিখিয়াছেন, তাহা কেতাবী বাংলায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। কিন্তু কথিত বাংলা chaste এবং elegant হইতে পারে না, কেতাবী বাংলা হইলেই chaste ও elegant হয়, ইহা মনে করা ভুল।

১৩২১ শ্রাবণ
ইংরাজী গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলি আট লক্ষের উপর বিক্রী হইয়াছে। ইহা ছোট গল্প নয়, উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কতকগুলি ভগবদ্বিষয়ক কবিতার গদ্যানুবাদ। ইহার এত বিক্রী দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ইংরাজী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা সকলেই বিষয়সুখে মত্ত বা বিষয়সুখের জন্য লালায়িত নহে। অনেকের ধর্ম্মপিপাসা আছে, এবং ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা উচ্চতর সুখ তাঁহারা বোঝেন।

বাঙ্গালা গীতাঞ্জলি আনুমানিক চারি হাজার বিক্রী হইয়াছে।

১৩২৩ বৈশাখ
পরীক্ষকের মুরুব্বিয়ানা

১৯১৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় একজন পরীক্ষক রবিবাবুর লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া পরীক্ষার্থীদিগকে তাহা মার্জ্জিত খাঁটি সুন্দর বাংলা (chaste and elegant Bengali) করিয়া লিখিতে বলিয়াছিলেন। এবৎসর বি-এ পরীক্ষায় খুড়োকে রেহাই দিয়া রবিবাবুর ভাইপো অবনীবাবুর উপর আর এক পরীক্ষক (কিম্বা সেই আগেকার পরীক্ষকই) মুরুব্বিয়ানা কবিযাছেন। তিনি অবনীবাবুর কিছু রচনা উদ্ধৃত করিয়া আদেশ করিয়াছেন—"Re-write the following in chaste and elegant Bengali." "নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি খাঁটি মার্জ্জিত সুন্দর বাংলায় পুনর্ব্বার লিখহ।"

রবিবাবু যে এখনও নাবালক আছেন, বাংলা লিখিতে জানেন না, বয়স ৫৫ হইয়া যাওয়ায় আর উন্নতির আশাও নাই, ইহা সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরও যে এই দুর্দ্দশা ঘটিল, ইহা নিতান্তই আপসোসের কথা।

পরীক্ষকদ্বয় (বা পরীক্ষক মহোদয়) যে রবিবাবু ও অবনীবাবু অপেক্ষা বড় সাহিত্যিক, সুতরাং তাঁহাদেব বাংলা দুরুস্ত করিয়া দিতে সমর্থ, তাহাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। কিন্তু বাংলার

ঘরে ঘরে যে এতাদৃশ mute inglorious Miltonsও (মূক ও এতাবৎ-যশোহীন মিল্টন-বৃন্দও) হাজার হাজার জন্মিয়াছেন, যে, তাঁহারা রবিবাবু ও অবনীবাবুর বাংলাকে মার্জ্জিত বিশুদ্ধ সুন্দর করিয়া দিতে পারেন, এই সংবাদে পরম পুলকিত হইলাম।

জয় হউক পণ্ডিতি ও কেতাবি বাংলার!

১৩২৩ ভাদ্র
জাপানে রবীন্দ্রনাথ।

জাপানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব আদর অভ্যর্থনা হইয়াছে। জাপানী কোন কোন কাগজে দেখা যাইতেছে যে জাপানীরা তাঁহার কোন কোন বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়াছে। দি হেরাল্ড অব্ এশিয়া অর্থাৎ এশিয়া-দূত নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার একটি বক্তৃতার উপদেশ জাপানীদের মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে, ভাব ও চিন্তা রাজ্যে, ভারতবর্ষের নিকট জাপানের ঋণ অনেক জাপানী কাগজে স্বীকৃত হইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "ভারতবর্ষের ঋণ আমাদের শোধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।"

জাপানের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র-পরিচালকেরা রবীন্দ্রনাথকে ভোজ দিয়াছিলেন।

উয়েনো উদ্যানে জাপানের প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা প্রভৃতি দুইশতাধিক প্রধান প্রধান লোক রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা করেন। অভিনন্দনপত্রের উত্তরে কবি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বাংলা বক্তৃতা অধ্যাপক কিমুরা জাপানীতে অনুবাদ করিয়া জাপানী শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া দেন। কিমূরা অনেক দিন কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন।

ওকুমার বিদেশীভাষায় অজ্ঞতা।

রবীন্দ্রনাথের বাংলা বক্তৃতাকে জাপানের প্রধান মন্ত্রী ওকুমা ইংরেজী মনে করিয়াছিলেন; কারণ তিনি ইংরেজী কিম্বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা জানেন না। অবশ্য জাপান স্বাধীন দেশ বলিয়া, আমাদের যতটা বিদেশী ভাষা জানা দরকার, তাহাদের ততটা দরকার নয়। কিন্তু অনেকে চোস্ত ইংরেজী বলা ও লেখা এত বেশী দরকারী বলিয়া মনে করেন যেন উহা মোক্ষলাভের উপায়। ইংরেজেরাও সকলে বিশুদ্ধ ইংরেজি বলিতে ও লিখিতে পারে না। আমরা সুলেখক ও সুবক্তা ইংরেজদের মত ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে না পারিলে তাহা লজ্জার বিষয় মনে করা যায় না। খুব ভাল ইংরেজী লিখিবার ও বলিবার চেষ্টায় জীবন ক্ষয় করা সুবুদ্ধির কাজ নয়।

গত বৎসর পৌষমাসের প্রবাসীতে আমরা "শিক্ষার ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে, বাংলায় সমস্ত বিষয় শিখাইয়া ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা করিবার বিরুদ্ধে নানা আপত্তিখণ্ডন উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম :—

তৃতীয় আপত্তি, নানাবিধ চাকরী, আইন-ব্যবসায়, ডাক্তারী, বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য এখন ছাত্রেরা যতটা উপযুক্ত হয়, ইংরেজী কেবল

দ্বিতীয় ভাষা রূপে শিখিলে ততটা উপযুক্ত হইবে না। আমরা পূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ইংরেজী দ্বিতীয় ভাষা মাত্র হইলেও ছাত্রেরা যথেষ্ট ইংরেজী শিখিতে পারিবে; সুতরাং এই-সকল নানা কার্য্যে সিদ্ধি ইংরেজী-জ্ঞানের উপর যে পরিমাণে নির্ভর করে, তাহা তাহাদের অধিকৃত হইবার সম্ভাবনা। তাহার পর ইহাও বিবেচ্য যে সাংসারিক উন্নতির জন্য ইংরেজীর কিরূপ জ্ঞান দরকার। আমাদের ত মনে হয় ইংরেজী ভাষার সমস্ত ধরণধারণ খুঁটিনাটি তন্নতন্ন করিয়া না জানিলেও চলে। অন্য চাকরী দূরে থাক, দেশী হাইকোর্টের জজদের, সেশ্যান জজদের, মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে সকলেই যে বিশুদ্ধ ইংরেজী লিখিতে পারেন, এরূপ বলা যায় না। বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টার ও অধ্যাপকদের সম্বন্ধেও ইহা সত্য নহে যে তাঁহারা সকলেই ভাল ইংরেজী লেখেন, বলেন বা জানেন। খুব পসার ও রোজগার আছে এরূপ উকিল ইংরেজির ভুল করেন, ইহাও জানা কথা। ভাল ভাল ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ারদেরও এই ত্রুটি আছে। বণিকদের ত কথাই নাই। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বণিকদের মধ্যে অধিকাংশ ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ। জার্মেন ও জাপানীরা সামান্য ইংরেজী জানিয়াও আমাদের দেশের ব্যবসা দখল করিয়াছিল ও করিতেছে, আর আমরা এক-একজন বিদ্যার জাহাজ হইয়া উপবাস করিতেছি। বাণিজ্যে খুব কৃতিত্ব লাভের জন্য পৃথিবীব্যাপী কোন ভাষা কিছু জানা দরকার বটে, কিন্তু বাণিজ্যে সিদ্ধিলাভ ভাষাজ্ঞান অপেক্ষা অন্যবিধ যোগ্যতা ও গুণের উপর নির্ভর করে। আমরা নিশ্চয়ই ইহা মনে করি যে ইংরেজী ভাল জানা এবং ভাল লিখিতে ও বলিতে পারা বাঞ্ছনীয়। যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা চূড়ান্ত রকমে করাই আদর্শ। কিন্তু চাকরীতে ও নানা ব্যবসায়ে পয়সা রোজগার, অতি উৎকৃষ্ট ইংরেজী বলিতে বা লিখিতে না পারিলে হয় না, ইহা মহা ভ্রম। ইংরেজীতে বাহাদুরী দেখাইবার প্রয়াস একটা কুসংস্কার মাত্র। যাহার কোন বিষয়েই গভীর জ্ঞান নাই, এরূপ লোকও ফড়ফড় করিয়া ইংরেজী বলিতে এবং খচ্ খচ্ করিয়া ইংরেজী লিখিতে পারে। কিন্তু তাহার মূল্য কি?

ইংরেজী কাগজের সম্পাদক, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কংগ্রেসের নেতা, মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি, প্রভৃতিদের মধ্যে সবাই ইংরেজীতে মহাপণ্ডিত নহেন। নাম করা ভাল দেখাইবে না; নতুবা লেখার দৃষ্টান্ত সহ নাম করা অসম্ভব হইত না।

কাউণ্ট ওকুমা ওাসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানাবিদ্যার কঠিনতম অংশও জাপানী পুস্তক ও জাপানী ভাষার সাহায্যে শিখান হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে ও চেষ্টায় এই সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে।

জাপান ও ভারতবর্ষ।

বিদেশে আমাদের দেশের অগ্রণী কাহারও কাহারও আদর অভ্যর্থনায় আমরা যেন অসাবধান না হই। সকল দেশেই কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা ঠিক দেশের লোকদের প্রতিনিধি নহেন, দেশের লোকদের চেয়ে অধিক অগ্রসর; অবশ্য কেহ কেহ ভণ্ডও আছেন। মোটের উপর প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির সহিত ব্যবহারে পূর্ণমাত্রায় স্বার্থপর। জাপানে রবীন্দ্রনাথের খুব অভ্যর্থনা হইয়াছে বলিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে জাপানী শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিল্পবাণিজ্যের খুব ক্ষতি হইতেছে। ভারতবর্ষের বাণিজ্য দখল করিতে জাপানীবা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে ও করিবে। এ বিষয়ে তাহাদের

গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে খুব সাহায্য করিতেছে। কোন কোন স্থলে ব্রিটিশগবর্ণমেন্টও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে জাপানের বাণিজ্যবিস্তারের সহায় হইয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ভারতসাম্রাজ্যের বার্ষিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন রাজস্ব-মন্ত্রী বড়লাটের সভায় উপস্থিত করেন, তখন দেখা যায় যে লবণের ট্যাক্স এবং অন্যান্য অনেক জিনিষের ট্যাক্স বাড়িয়াছে, এবং কোন কোন জিনিষের উপর নূতন করিয়া ট্যাক্স বসান হইয়াছে। বিদেশ হইতে আমদানী কাপাসের সুতা ও কাপড়ের উপর কেন ট্যাক্স বসান হয় নাই, তাহার কারণ সম্বন্ধে রাজস্ব-মন্ত্রী এইরূপ আভাস দেন যে যুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষের সহিত বিলাতের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, এবং তাহাতে ভারতবর্ষের সুবিধা হইতে পারে; এখন সুতা-ও-কাপড়- নির্ম্মাতা ল্যাঙ্কেশায়ারের বণিক্‌দিগকে ঘাঁটাইলে ফল ভাল হইবে না; কিন্তু আমদানী সুতা ও কাপড়ের উপর ট্যাক্স না বসাইবার একটি কারণ যে জাপানকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। ইহা আমরা পরে জাপান ম্যাগাজিন নামক ইংরেজী জাপানী কাগজ হইতে জানিতে পারিয়াছি। জাপান ম্যাগাজিন বলেন :—

"When England increased her customs tariff to meet war needs, she thoughtfully provided rules for special treatment of certain exports from Japan; and likewise, when the Indian Government was proposing to levy a cotton export duty as well as one on imports of cotton, Britain had the proposal dropped owing to the serious effect it would have on Japan's cotton industries."

"ইংলণ্ড যখন যুদ্ধের খরচ জোগাইবার জন্য পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বাড়াইলেন, তখন তিনি সুবিবেচনা পূর্ব্বক জাপান হইতে বিলাতে রপ্তানী কয়েকটি জিনিষের সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম প্রণয়ন করেন; আবার যখন ভারত-গবর্ণমেন্ট আমদানী ও রপ্তানী কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রের উপর কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন ইংলণ্ড এই প্রস্তাব ভারত গবর্ণমেন্টকে পরিত্যাগ করাইলেন এই জন্য যে ইহা দ্বারা জাপানের কার্পাস শিল্পের গুরুতর অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে।"

ভারতবর্ষ হইতে ছাত্রেরা শিল্প শিখিবার জন্য জাপানে গেলে যদি জাপানীরা তাহাদিগকে শিল্পশিক্ষালয়ে ও কারখানায় ঢুকিতে দেন, তাহা হইলে আমরা যথেষ্ট মিত্রতা করা হইয়াছে মনে করিব। শিল্পবাণিজ্যে প্রতিযোগিতা জাপান পরিত্যাগ করিবে, এ আশা আমরা করি না। জাপানকে শত্রুও মনে করি না। আমরা শিল্পবাণিজ্যক্ষেত্রে যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারি, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যদি আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের সাহায্য না করেন, সেটা জাপানের দোষ নয়। "আর কারো দোষ নয় গো শ্যামা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

১৩২৪ ভাদ্র

রবিবাবু ও ষ্টেটস্‌ম্যান

ভারতবাসীদের বিরোধী ইংরেজী কাগজ এদেশে যতগুলা আছে, তাহার মধ্যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান একখানা প্রধান কাগজ। এই কাগজটাতে লেখা হইয়াছে,—

Sir Rabindranath Tagore has received much generous admiration from the English people in India and at Home. In the *Atalantic* monthly he reciprocates this kindness by an article on "Nationalism in the West," in the course of which he writes as follows;—"This abstract being, the nation, is ruling India. We have seen in our country some brand of tinned food advertised as entirely made and packed without being touched by hand. This description applies to the governing of India, which is as little touched by the human hand as possible. The governors need not know our language, need not come into personal touch with us except as officials; they can aid or hinder our aspirations from a disdainful distance, they can lead us on a certain path of policy and then pull us back again with the manipulation of office red tape; the newspapers of England, in whose columns Loudon street accidents are recorded with some decency of pathos, need take but the scantiest notice of calamities happening in India over areas of land sometimes larger than the British Isles." Statements of this kind published for a constituency which has no means of judging their merits, make one wonder why Sir Rabindranath Tagore accepted a knight-hood from a Government of which he thinks so poorly.

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের তাহা হইলে কি ইহাই বলা অভিপ্রায় যে মানুষ যাহাতে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য কথা না বলে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট উপাধিরূপ ঘুষ দিয়া থাকেন? অনেক ইংরেজ যে রবিবাবুর বহিগুলির আদর করিয়াছেন, তাহারও উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি যেন ভবিষ্যতেই ইংরেজ "নেশ্যন" বা গবর্ণমেণ্টের সত্য দোষত্রুটি না দেখান? নিখুঁত কোন জাতি বা গবর্ণমেণ্ট নাই। এরূপ পাগল বা ভণ্ড কি কেহ আছে যে বলিবে যে ব্রিটিশ জাতির বা গবর্ণমেন্টের কোন দোষ নাই? ষ্টেট্‌স্‌ম্যানেও ত গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা বাহির হয়? রবিবাবুও কি ব্রিটিশজাতির বা গবর্ণমেন্টের কেবল নিন্দাই করিয়াছেন? তাহা ত নয়। আমরাও তাঁহার এই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।

রবিবাবু ত উপাধি পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে দরখাস্ত করেন নাই। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যদি তাঁহার উপাধিটা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা প্রত্যাহার করাইতে পারেন, তাহা হইলে কাহারও কোন দুঃখ হইবে না।

১৩২৬ আষাঢ়
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম্‌এ পরীক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরীক্ষা দিয়া এম্ এ উপাধি লাভের ব্যবস্থা হওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি। নিম্নতর পরীক্ষাগুলিতেও বাংলাকে অন্য পরীক্ষণীয় বিষয়সকলের মধ্যে সমান স্থান দিলে আরো সুখী হইব। বাংলায় এম্‌এ পরীক্ষার যে-রূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সব অংশের আমরা অনুমোদন করি না,—বস্তুতঃ সর্ব্ববাদীসম্মত কোন ব্যবস্থা হওয়া দুর্ঘট—কিন্তু একটা জিনিষ খাড়া করাই প্রধান কাজ, উন্নতি ক্রমে ক্রমে হইতে পারিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় যাহাদিগকে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম থাকা উচিত ছিল। যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেকের চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য তিনটি প্রশ্ন আছে। (১) তাঁহারা যাহার অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, বিষয়ের সেই অংশটুকুর বিশেষ ও নবতম জ্ঞান তাঁহাদের আছে কি না; (২) তাঁহাদের সাহিত্য ভাষাজ্ঞান কেবল মাত্র স্বদেশীতে আবদ্ধ না থাকিয়া বিদেশীতেও এতটা পৌঁছিয়াছে কি না, যদ্দারা তাঁহারা স্বদেশী সাহিত্য ও ভাষা তদ্বৎ বিদেশী কিছুর পাশে দাঁড় করাইয়া স্বদেশীর মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন; (৩) যে সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান বিশেষজ্ঞকে সংকীর্ণতা ও কূপমণ্ডুকতা হইতে মুক্ত করে, তাহা প্রত্যেকের আছে কি না। প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? মনে রাখিতে হইবে, যে, অধ্যাপকদিগকে এম্‌এ পড়াইতে হইবে, এবং সাহিত্য ও ভাষা অধ্যাপনাবও critical comparative method তাঁহাদের আয়ত্ত থাকিলে তবে তাঁহারা আদর্শানুরূপ অধ্যাপক হইবেন।

পরীক্ষার্থীদিগকে আপাততঃ বাংলা ছাড়া, আসামী ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী গুজরাটী তেলগু তামিল কানাড়ী মলয়ালম সিংহলী ও উর্দ্দু, ইহার কোন-একটি ভাষার পরীক্ষা দিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, পরীক্ষার্থীকে, যে প্রধান ভাষা ও দ্বিতীয় ভাষায় তিনি পরীক্ষা দিবেন, তাহার উপর প্রভাবশালী নিম্নলিখিত চারিটি ভাষার কোন দুটির অল্পজ্ঞানের পরিচায়ক পরীক্ষা দিতে হইবে; যথা—প্রাকৃত, পালি, পার্সী, পষ্‌তু।* এই ভাষাগুলির আদ্য অক্ষর প বলিয়াই কি চারিটির নাম দেওয়া হইয়াছে, না, গণ্ডা ভর্ত্তি করিবার জন্য? কিম্বা হিন্দুর ভাষা দুটি, মুসলমানের দুটি, এইরূপ ভাগ করা হইয়াছে? কারণ দেখিতেছি, পষ্‌তুর কোন অধীতব্য পুস্তকের তালিকা দেওয়া হয় নাই, এবং পষ্‌তুকে বাদ দিয়া লেখা হইয়াছে, "Until further orders, the list of basic languages will include the following :— Prakrit, Pali, Persian" এখানে জিজ্ঞাস্য এই, যে, প্রাকৃত, পালি, পার্সী, পষ্‌তু (বিশেষতঃ পষ্‌তু) বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত বাংলা আসামী ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী গুজরাটী তেলুগু তামিল কানাড়ী

* "Elements of two of the following languages, to be selected by the candidate with special reference to their influence on the vernaculars chosen as principal and subsidiary subjects : Prakrit, Pali, Persian, Pashtu."

মলয়ালম সিংহলী ও উর্দ্দু ভাষাসমূহের মধ্যে কাহার কাহার ভিত্তিভূত (basic), এবং ঐ চারিটির মধ্যে কোন্‌টির কিরূপ প্রভাব ("influence") কোন্ আধুনিক ভাষার উপর আছে বা হইয়াছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, তামিল ও মলয়ালম দ্রাবিড়ী (Dravidian) ভাষা; প্রাকৃত পালি পার্সী বা পষ্‌তু উহাদের ভিত্তিভূত ভাষা নহে। পষ্‌তু ত তালিকার কোন ভাষারই ভিত্তিভূত নহে, এবং যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, উহার অধীতব্য পুস্তকাবলীর তালিকা দিবার মত জ্ঞান পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট-শিক্ষা-কৌন্সিলের কোন সভ্যেরই নাই, তখন উহার প্রভাব তালিকাভুক্ত কোন আধুনিক ভাষার উপর পড়িয়াছে কি না ও পড়িয়া থাকিলে তাহা কীদৃশ, তাহা বলিতেও কেহ পারেন না। এইজন্যই মনে হইয়াছে যে, উহা পকারাদ্য বলিয়া এবং গণ্ডা ভর্ত্তি করিবার জন্য কিম্বা মুসলমান দেশের ভাষা বলিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় প্রশ্নপত্র দ্বারা পরীক্ষার্থীর মধ্যযুগের ও আধুনিক কালের বাংলা গ্রন্থাবলীর জ্ঞান পরীক্ষিত হইবে। তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইবে। পুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কবিকঙ্কণচণ্ডী ও মেঘনাদবধ। নির্ব্বাচনের দোষ দেওয়া যায় না। কেবল লক্ষ্য করিতে বলিতেছি যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের কোন পুস্তক নির্ব্বাচিত হয় নাই;—হইতে পারে যে বাহুল্যভয়ে হয় নাই। তাহার পর বিবেচ্য, চতুর্থ প্রশ্নপত্রের বিষয়—(ক) ১৮০০ হইতে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গদ্যলিখনরীতির ক্রমবিকাশ (Development of prose style in Bengali Literature, 1800-1857); (খ) ১৮৫৭ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলনের প্রভাব (Influence of western culture on Bengali Literature, 1857-1880)। ছাত্রদের অনুসন্ধান ও চর্চ্চা করিবার এবং পরীক্ষা দিবার এই বিষয়গুলি সুনির্ব্বাচিত হইয়াছে। বৎসরগুলি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল আছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যেও কোন বিপ্লব, বিদ্রোহ, বা পুনর্জীবনলাভ আদির সুস্পষ্ট সূত্রপাত হইয়াছিল কি? ১৮০০ সালে, ১৮৫৭ সালে, ১৮৮০ সালে, "অথ" বলিয়া আরম্ভ করিবার মত, কিম্বা "ইতি" বলিয়া দাঁড়ি টানিবার মত বাংলাসাহিত্যে কিছু আছে কি?

একটা কথা মনে হইতেছে। ১৮৫৭ সালে রবিবাবু জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং ১৮৮০ সালে রবিবাবুর বয়স বোধ হয় ১৮/১৯ ছিল। বাংলা গদ্যলিখন-রীতির বিকাশ ১৮৫৭ পর্য্যন্ত অনুশীলিতব্য করায় এবং বাংলা-সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্যজ্ঞানানুশীলনের প্রভাব ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত অনুশীলিতব্য করায় কার্য্যতঃ রবিবাবু ৪র্থ প্রশ্নপত্রের সমুদয় বিষয় হইতে বাদ পড়িলেন। অভিসন্ধিপূর্ব্বক ইহা করা হইয়াছে, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না, কারণ "পরচিত্ত অন্ধকার"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা বাংলায় এম্-এ দিবেন, তাঁহাদের নিকট আধুনিক সাহিত্য মানে বস্তুতঃ ৪০ বৎসরেরও আগেকার সাহিত্যই দাঁড়াইবে, এবং যিনি উচ্চ হইতে উচ্চতম চিন্তাক্ষেত্রে বঙ্গসাহিত্যের ধ্বজা উড্ডীন করিতেছেন, যিনি সকল সভ্যদেশে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ কৌতূহল উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি বঙ্গসাহিত্যমন্দিরের সকল কক্ষ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং যাঁহার প্রতিভা এখনও নব নব আকারে ও প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে, সেই রবীন্দ্রনাথ, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোন প্রকারেই, এম্‌এ পরীক্ষার্থীদের আলোচনার বিষয় হইবেন না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্থান কাহারো

নীচে নহে, এবং তাঁহার প্রতিভা এত দিকে এত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহার প্রভাব আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের উপর এত বেশী ও এত ব্যাপক, বঙ্গের বাহিরের জগতের সহিত ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদানে তিনি বঙ্গীয় অন্য সকল লেখকদের অপেক্ষা এরূপ উচ্চস্থানীয়, যে, তাঁহাকে বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম বাংলা পরীক্ষার অধীতব্য বিষয় কোন বৎসরই পূর্ণাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

১৩২৭ কার্ত্তিক

বিহারে গীতাঞ্জলি।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"কে বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক করিয়াছেন। আদর দূরের লোকেরা করে দেখিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় এম্-এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, কিন্তু রবিবাবুকে বাদ দিয়া পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষিতব্য বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা কর্ত্তাদের কাব্যরসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

১৩২৭ মাঘ

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ

আমরা পৌষের প্রবাসীতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথ আপনাকে ব্রাহ্মসমাজ বা উহার কোন শাখার প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত করিবার একটি প্রস্তাব কিছুকাল হইতে ঐ সমাজের সভ্যগণের বিবেচনাধীন আছে। শুনিলাম, যাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধী তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদের কথাগুলির এইরূপ অর্থ করিয়া নিজেদের দল পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যে, প্রবাসীর মতে রবি-বাবু ব্রাহ্ম নহেন। এই কারণে, প্রবাসী ব্রাহ্মসমাজের বা উহার কোন অংশের মুখপত্র না হইলেও, এই বিষয়ে কিছু লিখিতে হইতেছে।

পৌষে আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা, আমাদের বিবেচনায়, ঠিকই লিখিয়াছি। কিন্তু তাহার মানে এ নয়, যে, রবি-বাবু ব্রাহ্ম নহেন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, "He who is not against us is with us". "যিনি আমাদের বিপক্ষে নহেন, তিনি আমাদের পক্ষে"। অন্ততঃ এই অর্থে

রবি-বাবুকে অ-ব্রাহ্ম বলিতে পারি না। তবে, প্রতিনিধিস্থানীয় না বলিবার কারণ আছে; এবং বাস্তবিক, বিশেষ কাজের জন্য যাঁহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা যায়, তিনি ছাড়া আর কেহই প্রতিনিধি নহেন।

মানব-আত্মাকে চিন্তায় ও ভাবে এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ ও চির-উন্নতিশীল করা ও রাখা ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ। এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও আছে; জগতের নানা দেশে আছে। যাঁহারা ব্রাহ্মনামধারী না হইয়াও এই আদর্শের অনুরাগী এবং যাঁহাদের জীবন এই আদর্শের অনুসরণ করিবার অকপট চেষ্টার পরিচয় দেয়, তাঁহাদের কাহাকেও যেমন অ-ব্রাহ্ম মনে করি না, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিও মনে করি না, জগতের সর্ব্বত্র যাঁহারা এই আদর্শের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ সেই সর্ব্বজাতীয়সংঘভুক্ত। এই সংঘের কোন সাম্প্রদায়িক নাম নাই। ব্রাহ্ম বলিতে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বুঝায়। কেহ যদি উক্ত বৃহত্তরসংঘভুক্ত বলিয়া নিজেকে কেবল মাত্র ক্ষুদ্রতর ব্রাহ্ম সমাজেরই, কিম্বা এমন কি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই, প্রতিনিধিও মনে না করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তিনি অ-ব্রাহ্ম বা অভারতীয় হইয়া যান না। কেহ যদি বলেন, আমি শুধু মানুষ, —তাহাতে প্রমাণ হয় না, যে, তিনি ব্রাহ্ম নহেন। ক্ষুদ্রতর বৃহত্তরের অন্তর্ভূত।

বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মসমাজ নিজের লোক বলিয়া সম্মান করিতে পারেন কি না, এরূপ তর্ক কেন উঠিয়াছে, বুঝিতে পারি না। আমি দীর্ঘকাল তাঁহার প্রতিবেশীরূপে তাঁহার দৈনন্দিন জীবন দেখিয়াছি, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছি, বুধবারে ছাত্র অধ্যাপক ও সমাগত অন্য বহু ব্যক্তির সহিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়াছি, তাঁহার বহিও পড়িয়াছি, স্বদেশে বিদেশে তাঁহার জীবনের কথাও জানি; যেমন এ পর্য্যন্ত নিখুঁত কোন মানুষ জন্মেন নাই, তিনিও তেমনি নিখুঁত নহেন, কিন্তু আমি তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী কিছু দেখি নাই। আমার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। ব্রাহ্মদিগের একেশ্বরবাদী কন্‌ফারেন্সে রবি-বাবুকে সভাপতি করিবার চেষ্টা ও অনুরোধ ব্রাহ্মসমাজের সব দলের লোক মিলিয়া একাধিক বার করিয়াছেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে পর ভাবেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের বহির ১৫০০ গানের মধ্যে ৩২৯টি তাহার। এ স্থলেও তাঁহাকে পর ভাবা হয় নাই। প্রতি রবিবার সামাজিক উপাসনায় অধিকাংশ সময় তাঁহারই গান গাওয়া হয়; তখন তাঁহাকে পর ভাবা হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একাধিক প্রচারক তাঁহাকে নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া প্রচারক্ষেত্রে দাবী করিয়া আসিতেছেন। তখন তাঁহাকে পর ভাবা হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন আচার্য্যের উপদেশে তাঁহার গান উদ্ধৃত হয়। তখন তাঁহাকে পর ভাবা হয় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ান ও উপাসনা করানও হইয়াছে। এ-সকল সত্ত্বেও অবশ্য তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচিত না-করিবার স্বাধীনতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে-কোন সভ্যের আছে। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন, কিম্বা না বলেন, যে, প্রবাসী-সম্পাদকের মতে রবি-বাবু ব্রাহ্ম নহেন। আমার মতে রবি বাবু ব্রাহ্ম এবং আরো কিছু যাহা ব্রাহ্মত্বের অবিরোধী, এবং আমি যতটুকু খবর রাখি তাহাতে রবি-বাবু অপেক্ষা অধিক নানাদেশব্যাপী আধ্যাত্মিক প্রভাব জীবিত অন্য কোন মানুষের নাই।

১৩২৮ ভাদ্র

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তন

বিদেশে মাতৃভূমির জন্য জয়মাল্য ও পূজার অর্ঘ্য অর্জ্জন করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার দ্বারা ভারতের ও জগতের আরো কল্যাণ হউক, এবং জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হইতে থাকুক, সর্ব্বান্তকরণে এই প্রার্থনা করি।

আমেরিকা ও ইংলণ্ড ছাড়া তিনি এবার আরো অনেক দেশে গিয়াছিলেন। সুইডেন, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, ফ্রান্স, জার্মেনী, অষ্ট্রীয়া, সুইট্জারল্যাণ্ড্ এবং চেকোস্লোভাকিয়া তিনি এবার দেখিয়া আসিয়াছেন। এইসকল দেশে যেরূপ মনীষী ও গণ্যমান্য লোকদের দ্বারা, যেরূপ বিপুল জনসংঘের দ্বারা তাঁহার যে-প্রকার আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা হইয়াছে, কোন কবি, কোন মনীষী, কোন রাজনীতিজ্ঞ, কোন সেনাপতি, কোন সম্রাটের তাহা হয় নাই। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা এবং তাঁহার দ্বারা প্রচারিত বলবিধায়ক ও শান্তিপ্রদ বাণী যে তাঁহাকে নানা দেশে অগণিত লোকের প্রীতি ও ভক্তির পাত্র করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, জার্মেনীতে তিন সপ্তাহে তাঁহার "সাধনা" নামক ধর্ম্মগ্রন্থের জার্ম্যান অনুবাদের পঞ্চাশ হাজার খণ্ড বিক্রয় তাহার অন্যতম প্রমাণ। কবি স্বয়ং কিন্তু অন্য একটি কারণেরই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এই ধারণা হইয়াছে, যে, যুদ্ধের পর ইউরোপের ভুক্তভোগী লোকেরা, পাশ্চাত্য সভ্যতার মন্দ দিক্টা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে; অর্থগৃধ্নুতা ও জাতিগত বিদ্বেষে জর্জ্জরিত হওয়া যে কিরূপ দুঃখের কারণ, তাহা তাহারা বুঝিয়াছে। নূতন জীবনের জন্য অনেকে ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আলোকের জন্য তাহারা আশার সহিত প্রাচ্যজগতের দিকে, ভারতের দিকে, দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতে প্রাচ্যভূখণ্ডে ভারতে যে মুক্তিপ্রদ শান্তিপ্রদ বাণী প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে, ইরোপীয়েরা রবীন্দ্রনাথে যেন তাহাকেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখিয়াছিল।

তাঁহার অসাধারণ সম্বর্দ্ধনায় ভারতীয়দিগের আনন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু আহ্লাদিত হইলে ও কিছু গৌরব অনুভব করিলেই কর্ত্তব্যের সমাপন হইবে না। দুটি চারিটি সভা করিয়া আমরাও যদি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করি, তাহাতেও কর্ত্তব্যের অবসান হইবে না। জীবনের যে পূর্ণ ও আধ্যাত্মিক আদর্শের জন্য প্রাচ্যের ও তাঁহার সম্মান, সেই আদর্শকে আমাদের জীবনে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; বিশ্বমানবের মধ্যে প্রীতি স্থাপন, ভারতীয় ও প্রাচ্য সভ্যতা ও বিদ্যার অনুশীলন, প্রভৃতি যে-সকল মহৎ কার্য্য এখন তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছে, তাহাতে আমাদিগকে তাঁহার সহায় হইতে হইবে।

১৩২৮ আশ্বিন

জগত্তারিণী পদক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাল বাংলা বহি লেখার জন্য জগত্তারিণী পদক পুরস্কার দিয়াছেন। পুরস্কারের উপযুক্ত সাহিত্যিক নির্ব্বাচনের জন্য মনোনীত কমিটি রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান রচনা বলিয়া গীতাঞ্জলি, বলাকা, কথিকা ও গল্পগুচ্ছের উল্লেখ করিয়াছেন। কথিকা বলিয়া তাঁহার কোনও বহি এখনও বাহির হয় নাই। ঐ নামের কয়েকটি লেখা মাসিকপত্রে বাহির হইয়াছে, বাকি হস্তলিখিত অবস্থায় আছে।

শুনিলাম, কমিটির সভ্যদের মধ্যে রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কার দেওয়ার বিরোধী ছিলেন। এই গুজব অসত্য হইলে রায় সাহেব যেন স্বয়ং প্রতিবাদ করেন, কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের কর্ণধার। এহেন সাহিত্যরথীর পক্ষে বকলমে কাজ সারা অশোভন।

১৩২৮ কার্ত্তিক

দুটি পুস্তিকা

জোড়াসাঁকোতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে যে বর্ষা-উৎসব হইয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে গীত ১৮টি বর্ষাবিষয়ক গান "বর্ষামঙ্গল" নামক পুস্তিকায় আছে। যোলটি গান রবীন্দ্রনাথের, তাহার মধ্যে ৫টি নূতন। পুস্তিকাটির দাম দুআনা; ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউসে পাওয়া যায়।

"সত্যের আহ্বান" পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য তিন আনা। ইহাও ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউসে পাওয়া যায়।

উভয় পুস্তিকার লভ্যাংশ বিশ্বভারতীকে দেওয়া হইবে।

১৩২৮ অগ্রহায়ণ

"বিশ্বভারতী"

বোলপুরের নিকটবর্ত্তী শান্তিনিকেতন পল্লীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "বিশ্বভারতী" নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বৎসরের কার্য্য আগামী পৌষ মাস হইতে আরম্ভ হইবে। তাহার বিজ্ঞাপন প্রবাসী-বিজ্ঞাপনীর মধ্যে দৃষ্ট হইবে। যাহাতে নূতন বৎসর হইতে কতকগুলি ছাত্রী আশ্রমে পড়াশুনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে বিশ্বভারতীতে এখন

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা আছে :—

ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ—সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, বাংলা, হিন্দী, গুজরাতী, মরাঠী, মৈথিলী, সিংহলী, ফরাসী, জার্ম্যান ও গ্রীক্। দর্শন বিভাগে---অভিধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন। কলাবিভাগে—ভারতীয় চিত্রকলা। সঙ্গীত বিভাগে—গান ও বাদ্য।

শ্রীযুক্ত সদ্ধর্ম্মবাগীশ ধর্ম্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সি এফ্ এণ্ড্রুজ, শ্রীযুক্ত এইচ্ মরিস্, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়া সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি বিশ্বভারতীতে আগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপনা করিবেন, ও ছাত্রগণকে গবেষণার কার্য্য বিশেষ রূপে শিক্ষা দিবেন।

অধ্যাপক লেভির প্রারম্ভিক বক্তৃতা আগামী ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নভেম্বর, রবিবার অপরাহ্নে হইবে। তৎপরেও তাঁহার ব্যাখ্যান প্রতি রবিবার অপরাহ্নে হইবে। এরূপ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য এই, যে, ইহাতে কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর ছাত্র ও অপর জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণ উপদেশ শুনিতে আসিতে পারিবেন, এবং সোমবারে পুনর্ব্বার স্ব স্ব স্থানে আসিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে করিতে পারিবেন। এইসকল বিদ্যার্থী বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ মহাশয়কে আগে হইতে খবর দিতে পারিলে ভালো হয়।

১৩২৮ মাঘ

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

বিশ্বভারতীর কার্য্য আগে হইতেই চলিতেছিল। গত ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে উহার নিয়মাবলী সভাস্থ সকলের সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য সিল্ভ্যাঁ লেভি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, প্রিন্সিপ্যাল সুশীলকুমার রুদ্র, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীস্ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকলেই বিশ্বভারতীর সভ্য হইতে পারেন। ইহাতে ছাত্র ছাত্রী উভয়েরই অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ছাত্রীদের বাস ও অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। বিশ্বভারতীতে, প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্ববিধ বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য, সকল বিদ্যা শিখাইবার বন্দোবস্ত এখন হয় নাই, কিম্বা অদূর ভবিষ্যতেও না হইতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার বিদ্যাকেই বাদ দেওয়া হয় নাই। কোন বিদ্যা শিখাইবার সামর্থ্য যখনই হইবে এবং উহা শিখিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীও জুটিবে, তখন উহা শিখাইতে আরম্ভ করা হইবে।

১৩২৯ শ্রাবণ

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ও বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর সংস্থিতিপত্র (constitution) ছাপা হইয়া রেজিস্ট্রি হইয়া গিয়াছে। ইহার কাজ আগে হইতেই চলিতেছিল। এখন সংস্থিতি অনুসারে চলিতে থাকিবে।

"জাতীয় শিক্ষা" কথা দুটি নানা জনে নানা অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু যিনি যে-অর্থেই করুন, সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নামের যোগ্য হইতে পারে না, যাহাতে অন্ততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি লক্ষণ না থাকিবে।

আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত ত নহেই। যাহারা চাষ করিয়া কুলি-মজুরের কাজ করিয়া বা কোন প্রকার কারিগরী মিস্ত্রীগিবি করিয়া খায়, তাহারাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও বিশ্বভারতীতে চতুস্পার্শ্বের গ্রাম্য জীবনেব ও জীবিকার সহিত সম্পর্ক আছে। এখানে চাষ ও কয়েক প্রকার কারিগরীর কার্য্যগত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আষাঢ়ের "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা হইতে তাহার কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি। সুরুলে বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগে চর্ম্মশিল্প আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

"ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমান্ কুলদাপ্রসাদ সেন এই বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী মৌদপুর গ্রামের তিনজন মুচীও বিশেষ আগ্রহের সহিত এক মাস শিক্ষালাভ করিয়া এই কাজে পাকা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষিবিভাগে বারোটি ছাত্র আছে। তাহাদের প্রত্যেককে নিজেদের স্বতন্ত্র জমি দেওয়া হইয়াছে। সেই জমি তাহারা নিজেদের হাতে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিনে বাদাম, বিলাতি বেগুন, বরবটি ও মূলার বীচ লাগাইয়াছে।...ছুতারের কাজেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রেরা নূতন বৃষ্টি পাইয়া কয়েক দিন চাষের কাজে ব্যস্ত আছে। তাহাদের জমির কাজ একটু কমিলেই তাহারা অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে।"

ছাত্রেরা পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল ও অন্যান্য সাধারণ লোকদিগকে লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষা দিয়া থাকে, এবং তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষের লোকদের সাধনায় শ্রমে ও প্রতিভায় যে যে বিদ্যা ও যেরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোন শিক্ষাপ্রণালী জাতীয় হইতে পারে না। বিশ্বভারতীতে এরূপ যোগ আছে।

আমাদিগকে সমুদয় মানবজাতির সহিত যোগ রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে শিখিতে হইবে ও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। বিশ্বভারতীতে এই আদান-প্রদানেরও ব্যবস্থা আছে। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের যেমন জাতীয় দিক্, তেমনি আন্তর্জাতিক দিক্ও বটে। ভারতবর্ষকে বাহির হইতে এখন বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান এবং তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ শিখিতে হইবে। শেষোক্ত বিষয়েও যে দৃষ্টি আছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত

উদ্ধৃত করিতেছি।

গ্রীষ্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলিয়া আশ্রমে দেড় শ' ফুট এবং সুরুলে প্রায় দু শ' ফুট মাটী মৃত্তিকাভেদন যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা হইয়াছে। কিন্তু নীচে পাথরের মত শক্ত মাটী বলিয়া কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। খনন করিবার যন্ত্রটি দিবারাত্রি চালাইবার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই অক্লান্তভাবে দিনরাত্রি কাজ করিয়াছিলেন।

নানা দেশের ও নানা ভাষার পুস্তক সংগ্রহ বিশ্বভারতীতে যেমন হইতেছে, এমন ভারতের আর কোথাও হইতেছে কি না সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি বহুমূল্য দুর্লভ চীনা ও জাপানী পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। সাংহাই হইতে আমরা সমগ্র চীন ত্রিপিটক (প্রায় চারশত গ্রন্থ) উপহার পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভারতীর বন্ধুগণ বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধীর বহু পুস্তক পাঠাইয়াছেন। জার্ম্মানীতে গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে যে-সব পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিও হাম্বুর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম্ম আলোচনার জন্য জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ বোথরা, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পূবণচাঁদ নাহার ও তদীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বী সিং এবং ভাওনগর, কাঠিবারের 'যশোবিজয় গ্রন্থমালার' প্রকাশক অনেকগুলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

তদুপরি অধ্যাপক সিল্‌ভাঁ লেভি, ডক্টর কুমারী স্টেলা ক্রাম্‌রিশ, অধ্যাপক ভিণ্টারনিট্‌স্ প্রভৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাবেশ।

এখানে অন্যান্য স্কুল-কলেজের মত সাধারণ শিক্ষিতব্য বিষয়ও শিখান হয়। অধিকন্তু সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিখান হয়।

১৩৩০ আষাঢ়

শান্তিনিকেতনে উপনিবেশ স্থাপন

বিশ্বভারতী অনেক জমী কিনিয়াছেন। তাহার কিয়দংশে কর্ত্তৃপক্ষ পল্লী পত্তন করিতে চান। পল্লীটির নাম হইবে শান্তিনিবাস। স্থানটি স্বাস্থ্যকর। অতি নিকটেই বর্ণপরিচয় হইতে পোষ্টগ্রাজুয়েট পর্য্যন্ত শিক্ষার আয়োজন থাকায়, যাঁহারা নিজের বাড়িতে সন্তানদিগকে রাখিয়া জ্ঞানী লোকদের প্রভাবের ও শিক্ষার অধীন করিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। আপাততঃ একত্রিশটি ভিটা বিলি করা হইবে। আটটি ভিটার প্রত্যেকটি তিন বিঘা পরিমিত, কুড়িটি ভিটা দুই বিঘা করিয়া এবং তিনটি চারি বিঘা করিয়া। যাঁহারা জমী লইতে চান, তাঁহারা নক্সা, মূল্য ও সর্ত্তাদি সমেত দলিলের খসড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সাধারণ সেক্রেটারীকে চিঠি লিখিতে পাবেন।

শান্তিনিকেতন পল্লীতে বিশ্বভারতীর সমুদয়

প্রতিষ্ঠান যেরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, উৎকৃষ্ট অবস্থায় সেগুলির স্থায়িত্বের উপর এই পল্লীপত্তনের সঙ্কল্পের সাফল্য নির্ভর করে, এবং পল্লীপত্তন কার্য্যতঃ হইয়া গেলে তাহার দ্বারাও বিশ্বভারতীর স্থায়িত্বের সাহায্য হইবে। ইহা মনে রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে কাজ করিতে হইবে।

১৩৩২ বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের ইংরজী [ইংরেজি] গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কোন-কোন বহি কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের ইসাবেলা থোবার্ন্ কলেজ নামক নারীদের উচ্চশিক্ষার কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিস ডিমিট রবীন্দ্রনাথের "দি কিং অব দি ডার্ক চেম্বার" ("রাজা") নাটক-সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিবার নিমিত্ত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়াছেন; আমেরিকার একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য তিনি গবেষিকারূপে এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন।

তিনি যদি মূল বাংলা নাটকটি পড়েন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

শান্তিনিকেতনে বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরে ও বাংলা দেশের অন্য অনেক স্থানে বালিকারা শিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টায় অনেক সময় স্বাস্থ্য হারাইয়া বসে। অবরোধ-প্রথা আছে বলিয়া তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া স্কুল-কলেজে যাইতে ও সেখান হইতে আসিতে হয়। সেইজন্য সচরাচর সকাল-সকাল তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া গাড়ীর জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, আবার আসিবার বেলা হয়ত স্কুল-কলেজের ছুটির অনেক পরে বাড়ী ফিরিতে হয়। তাহার উপর কলিকাতায় ও অন্যান্য অনেক সহরে মেয়েদের অঙ্গচালনা ও মুক্তবায়ু [illegible]নের কোন সুযোগ সচরাচর হয় না; অথচ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে-কেহ মস্তিষ্ক-চালনা করে, তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অঙ্গচালনা ও মুক্ত-বায়ুসেবন বিশেষ আবশ্যক।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মধ্যাহ্নে শারীরিক অবসাদ হয়। এইজন্য আমাদের প্রাচীন পন্থানুযায়ী পাঠশালা ও টোলে সকাল-বিকাল অধ্যাপনা হয়, দুপুরে কিছু হয় না। কিন্তু ইংরেজরা শীতের দেশের লোক বলিয়া নিজেদের দেশের রীতি-অনুসারে এদেশেও আফিস আদালত স্কুল কলেজের কাজ ১০টা ১১টার পর হইতে ৪টা-৫টা পর্য্যন্ত করেন

ও করান। এরূপ ব্যবস্থা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের, বিশেষতঃ ছাত্রীদের, স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে।

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষার যে-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপনা হয় সকাল-বিকাল। ফাঁকা জায়গায়, অনেক সময় গাছতলায় ক্লাস বসে; সুতরাং নির্ম্মল বাতাস ও যথেষ্ট আলোকের অভাব কখন হয় না। ছাত্রীনিবাস ও ক্লাস একই জায়গায়; সুতরাং তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে কিছু গুঁজিয়া ছাত্রীদিগকে গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাইতে হয় না। মুক্তবাতাসে খেলিবার ও বেড়াইবার সুবিস্তৃত জায়গা আছে। বোলপুর শহর এখান হইতে দূরে বলিয়া মেয়েরা অসঙ্কোচে খোলা জায়গায় বেড়াইতে পারেন। এইসকল কারণে এইস্থানে বাস ও শিক্ষালাভ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল।

ছাত্রীদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয়ে পড়িতে হয় না; তাঁহারা সব পরীক্ষাই (অবশ্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা ছাড়া) বাড়ীতে পড়িয়া "প্রাইভেট্" পরীক্ষার্থিনীরূপে দিতে পারেন। সুতরাং শান্তিনিকেতন হইতে ছাত্রীদের পরীক্ষা দিবার কোনো বাধা নাই।

এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া থাকে। ইংরেজী, গণিত, ইতিহাস, সংস্কৃত, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পালি, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্যান, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ইন্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা এখানে হইতে পারে। ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, ইতিহাস, দর্শন-শাস্ত্র এবং অর্থনীতিতে বি-এ ও এম্-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যাপনা করিবার লোক এখানে আছেন। অবশ্য, কেহ কোন পরীক্ষা দিবেন বা না-দিবেন, তাহা তাঁহার ইচ্ছাসাপেক্ষ।

উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার শিক্ষালাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নানা পুস্তক প্রচুর-পরিমাণে আছে। বোধ হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাড়া আর-কোন বঙ্গীয় কলেজে এত বহি নাই। কোন-কোন বিষয়ে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগার প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

সাধারণতঃ স্কুল-কলেজে যে-সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিলাম, এখন অন্য কথা বলি।

শিক্ষা-বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন, যে, বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে। অথচ তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করা সহজ নহে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে স্বাভাবিক ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এখন শিক্ষা বলিতে সাধারণতঃ পুস্তক হইতে জ্ঞান লাভ বুঝায়। কিন্তু যাঁহারা নিজে জ্ঞান লাভ করিয়া পুস্তক রচনা প্রথমে করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহা করিয়াছিলেন। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে বালক-বালিকারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হয়। ভিন্ন-ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন-ভিন্ন উৎসব করিয়া তিনি আশ্রমস্থ সকলের হৃদয়মনচক্ষুকর্ণাদিকে প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন করিতে ও রাখিতে চেষ্টা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদিগের সাহিত্য-সভা প্রভৃতির সাহায্যে তাহারা কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রভৃতি রচনা, আবৃত্তি ও পাঠ করিতে শিখে; তাহাদের উপযোগী অভিনয় ও সঙ্গীতাদিও তাহারা করে। তাহাদের কয়েকটি হস্তলিখিত সচিত্র মাসিক পত্র আছে।

কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্র-সংগীত শিখাইবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এখানে আছে।

চিত্রাঙ্কন এবং নানাবিধ কারুকার্য্য শিখাইবার

ব্যবস্থা এখানে আছে। প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এখানকার কলাভবনের অধ্যক্ষ।

ছাত্রীরা এখানে গৃহকর্ম্ম শুশ্রূষা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারেন।

আমরা যতদূর অবগত আছি, ছাত্রীদের এখানকার মতন সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার ব্যবস্থা বঙ্গের অন্যত্র কোথাও নাই। পাঁচটি ছাত্রীকে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মনস্থ করিয়াছেন। এই ৫ জনকে কেবল আহারাদির ব্যয় দিতে হইবে। "আশ্রমসচিব, শান্তিনিকেতন," এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে অন্যান্য সংবাদ জানা যায়।

১৩৩২ ভাদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসখানি মিঃ জে, ম্যানো কর্ত্তৃক জাপানী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা কাইটো ও টোকিও দুইটি পুস্তকালয় হইতে একযোগে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ জাপানী অনুবাদ খুব সুন্দর হইয়াছে; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটো, তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত একটি কবিতা এবং শ্রীনন্দলাল বসু ও শোকিন কাসুতার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি আছে।

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ

রবীন্দ্রনাথ ও আইন্‌ষ্টাইন্

পাশ্চাত্য দেশসমূহের মধ্যে জার্ম্মানীতেই রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জার্ম্মান্ ভাষাতে তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক অনূদিত হইয়াছে ও এইগুলির বহুল প্রচার হইতেছে। জার্ম্মানীর বহুলোকে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' বহিখানিকে 'জীবন-বেদ' স্বরূপ গণ্য করিয়া থাকেন। যুদ্ধ-সমাপ্তির অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ যখন জার্ম্মানী গিয়াছিলেন তখন তথাকার জনসাধারণে তাঁহাকে যে বিপুল সম্মান দেখাইয়াছিল তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার এই বারের অভিযানও অন্যদিক দিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গ ও ডাঃ আইন্‌ষ্টাইনের মত লোকেও প্রাচ্য কবির মনীষার প্রতি অবনত মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও ভারতের ঋষি-কবির এই পরস্পর সাক্ষাৎ— ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও কবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব মনীষা অধঃপতিত ভারতবর্ষকে জগতের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছে।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

আত্মীয়-বিচ্ছেদে মানুষ যেরূপ ব্যথা পাইয়া থাকে সেইরূপ একান্ত আন্তরিক বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী আশ্রমের কর্ম্মী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার গত ৩রা নভেম্বব কলিকাতা নগরীতে ৪১ বৎসর বয়সে অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ যে কয়েকটি বালককে লইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করেন সন্তোষচন্দ্র তাহাদের অন্যতম। এদেশের শিক্ষার পর তিনি আমেরিকার ইলিনয বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গো-পালন প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। দেশে ফিরিয়া তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি গোশালা স্থাপন করেন ও কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। সেই সঙ্গে অধ্যাপনাও তিনি করিতেন। পরে তিনি সুরুল শ্রীনিকেতনে এইসকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আবার শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ও এইখানে অনাথ বালকদিগের জন্য স্থাপিত শিক্ষাসত্রের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষাসত্রে তিনি বালকদিগকে সকল কার্য্যে স্বাবলম্বী হইতে ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নানা অর্থকরী বিদ্যা প্রাণ দিয়া শিখাইতে লাগিয়াছিলেন।

সন্তোষচন্দ্র জীবনে আশ্রমের শিক্ষাকে নানাভাবে সার্থক করিয়াছিলেন। অতিথি-সেবা ও ভদ্রতা তাঁহার ভূষণস্বরূপ ছিল। বিশ্বভারতী যুগের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম যখন আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল, তখনকার দিনে আশ্রমের উৎসবাদি ব্যাপারে এমন কোনো অতিথি বোধ হয় যান নাই, যিনি সন্তোষচন্দ্রের আতিথ্য ও সেবায় মুগ্ধ হন নাই। রাত্রি হউক দিন হউক, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়, শরীর ভাল থাকুক বা না থাকুক অতিথির সেবায় তিনি চিরজাগ্রত ছিলেন। শীতের রাত্রি দ্বিপ্রহরেও নিজে গরুর গাড়ী হাঁকাইয়া অতিথিদের ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, পাছে তাহাদের ট্রেন্ ফেল হইয়া যায় তাই নিজে রাত জাগিয়া যথাকালে তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আসিয়াছেন। কে কোথায় বেড়াইতে যাইবে, কে কি খাইবে, কোথায় ঘুমাইবে সকলকার সকল প্রয়োজন তিনি দেখিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে সে আতিথ্য ও সেবার ছবি আর দেখা যাইবে কি না সন্দেহ।

ভদ্রতায় তাঁহার দোসর কম মিলিত। তাঁহার আচারে ব্যবহারে কথায় বার্ত্তায় ভদ্রতার আদর্শ হইতে কোনো চ্যুতি কখনও দেখা যাইত না।

আশ্রমবাসী ও আশ্রমবন্ধু সকলকে আত্মীয় করিয়া তুলিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এবিষয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শ তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

গুরু ও গুরুস্থানীয়দের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা আদর্শস্থানীয় ছিল। তাহাতে কোনোও খাদ ছিল না।

তিনি গোঁড়া হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিলেও স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অতি উদার মত পোষণ করিতেন। সকল নারীরই যে কোনো-না-কোনো অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, ইহা ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশ্বভারতীর সেবাধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সন্তোষচন্দ্রের অকাল-প্রয়াণে তাহা কোনোদিন পূরণ হইবে কি না সন্দেহ।

তাঁহার শোকার্ত্ত মাতা পত্নী ভগ্নীগণ ও শিশুপুত্রদের এই শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের নূতন সম্মান

আমরা পাশকরা বাঙালীরা মনে মনে এই সন্তোষটুকু লাভ করিতে পারিতাম, যে রবীন্দ্রনাথ যত বড়ই হউন, তাঁহার মনে মনে এই দুঃখটা আছে, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ইত্যাদি স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। এবার তাঁহার সে-দুঃখ দূর হইল; এবং আমাদেরও লুক্কায়িত উল্লাস চূর্ণ হইল। কাগজে দেখিলাম, সম্প্রতি প্রবর্ত্তকসংঘের উৎসবে তাঁহাকে যে অভিনন্দিত করা হয়, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে তিনি নিতান্ত মন্দ ছেলে নন—পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম হইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, এবং দ্বিতীয় শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। এই খবরটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা কি কি বিষয়ে হইয়াছিল এবং পরীক্ষক কে কে হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভক্তগণ কৌতূহলী হইবেন।

প্রবর্ত্তকসংঘ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নূতন অভিনন্দন-রীতি অন্যত্র অনুসৃত হইবে কি না, তাহাও অনুমানের বিষয় হইবে।

১৩৩৪ আষাঢ়

প্রবর্ত্তক সংঘ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা

প্রবর্ত্তক সংঘ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা বিষয়ে আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজী দৈনিকের মন্তব্য পড়িয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রবর্ত্তক সংঘ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তখন পাই নাই, দেখি নাই; উহা আমাদের নিকট পরে আসিয়াছে। উহা পড়িয়া বুঝিলাম, যে, প্রবর্ত্তক সংঘ প্রথমে অরবিন্দ তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাহার পর গান্ধী, এবং তাহার পর রবীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, ইহাই বলিয়াছিলেন; ইঁহাদের শ্রেষ্ঠতার ক্রমনির্দেশ করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা তাঁহারা করেন নাই। আমরা আমাদের ভ্রমের জন্য দুঃখিত।

ইংরেজী দৈনিকটিতে যেরূপ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, তাহার কারণ ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের মনে হয়, অভিনন্দনপত্রটির ভাষা এরূপ, যে, উহা কাহাকেও পড়িতে শুনিলে, স্বয়ং না পড়িলে, উহার অর্থ সম্বন্ধে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

১৩৩৪ শ্রাবণ

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহি

শ্রী বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীর পক্ষে বাংলা দেশের গঙ্গা শুধু তো জলের ধারা নয়, তাহার চেয়ে অনেক বেশি। জলের ধারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু সেই অনেক বেশিটি অনির্ব্বচনীয়, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। এইজন্য গঙ্গা বাঙালীর মনে প্রাণে যে বিচিত্র ও গভীর আনন্দ আনে, তাহার প্রতি আমাদের যুগযুগান্তরব্যাপী যে নিরতিশয় মমত্ববোধ আছে ঠিকটি তাহার রস বোঝা এমন কোনো বিদেশীয়ের পক্ষে সম্ভবপর নয় বাঙালীকে অন্তরঙ্গভাবে যে জানে না। এই জন্য ডাণ্ডিবাসী বণিক টেম্‌স নদীর তীরকে উৎপীড়িত ও তাহার জলপ্রবাহকে কলুষিত করিতে যে পরিমাণে সংকোচ বোধ করে, গঙ্গাতীরে তাহা করে না।

ভাষামাত্রের মধ্যেই একটা আভিধানিক অর্থের এবং ব্যাকরণগত নিয়মের ধারা আছে, বিদেশী শব্দতত্ত্ববিদের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু সেই ভাষার মধ্যে আর একটি ঐশ্বর্য্য আছে, যাহা তাহার বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি, যাহা পৃথিবীর চারদিকের বায়ুমণ্ডলের মত, যাহার ভিতর দিয়া আলো আসে, বর্ণ বিভাসিত হয়, যাহা প্রাণকে জারিত করে. অথচ যাহাকে পকেটে লওয়া যায় না, সিন্ধুকে ভরা চলে না, যাহাকে রক্তের মধ্যে পাই, বিশ্বাসের মধ্যে অনুভব করি, যাহা আমাদের প্রাণের সামগ্রী।

ইংরেজি শিখিবার জন্য বাঙালীর যে প্রাণপণ গরজ, তাহার মধ্যে তাহার জঠরজ্বালার তাগিদ আছে; কলেজের পরীক্ষা জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে এই ভাষাই তাহার প্রধান অবলম্বন। একথা এক রকম জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, যে-কোনো ইংরেজ যে-পরিমাণে বাংলা জানে, তাহার চেয়ে যে-কোনো শিক্ষিত বাঙালী অনেক বেশী পরিমাণেই-ইংরেজি জানে। তবু ইংরেজি ভাষার যে স্বরূপটি চর্ম্মগত নয়, যাহা তাহার মর্ম্মগত, যাহা তাহার বস্তু নয়, যাহা তাহার প্রাণ, অর্থাৎ শব্দসাধনায় যাহা আর্থিক নহে যাহা পারমার্থিক, যাহা ইংরেজের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, খেলাধূলা, স্মৃতিসংস্কার, পুরাণ ইতিহাস, আলাপ আলোচনার বিচিত্র প্রাণময় তন্তুদ্বারা গ্রথিত, অতি অল্প বাঙালীই তাহাকে ঠিক মতো আপন করিয়া লইতে পারিয়াছে। এই ইংরেজিই রস-সাহিত্যের ইংরেজি। এই ইংরেজি ঘনিষ্ঠ ভাবে না জানিলেও তবু মোটামুটি ইংরেজি সাহিত্য ভোগ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে গভীর ভাবে, নিঃসংশয় ভাবে তাহার সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া ভোগ ও বিচার করা যায় না। তাহা লইয়া কাজ চলে, খবরের কাগজ চলে, এমন কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তার উপাধি লওয়াও চলে, যদি তাহার পরীক্ষক সাহিত্যরসজ্ঞ ইংরেজ না হয়, কিন্তু তাহা লইয়া ইংরেজি সাহিত্যগত আত্মীয়তা চলে না। অর্থাৎ যদি সেইটুকু বিদ্যা লইয়া কোনো একজন ইংরেজ কবির নাড়ীনক্ষত্র, প্রাণের কথা অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে যাই, তবে তাহা একই কালে হাস্যজনক ও শোকাবহ হইয়া উঠে। বাঙালী তাহার বাবু ইংরেজী লইয়া ইংরেজ মহলে অনেক হাসি হাসাইয়াছে, কিন্তু এত বড়ো প্রকাণ্ড স্পর্দ্ধা ও হাস্যকরতার সৃষ্টি সে আজও করে নাই, তাহার প্রধান কারণ, ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি সাহিত্য যে কি তাহা সে যথেষ্ট জানে, শ্রদ্ধার সহিত সে উপলব্ধি করিতে পারে, যে, ইহাকে লইয়া মুরুব্বিআনা করিতে গেলে সেটাতে নিজেকেই অপদস্থ করার সাংঘাতিক বিপদ আছে।

কিন্তু বাংলা কাব্য সম্বন্ধে ইংরেজের মনে সেরকম শ্রদ্ধাপূর্ণ দ্বিধা বোধ হয় স্বাভাবিক নয়। তাহারই প্রমাণ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বইখানাতে। এই দীর্ঘায়তন

গ্রন্থের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে লইয়া স্থূলহস্তে তিনি টানাছেঁড়া করিতে চলিয়াছেন, মনে একটুও ভয় ডর সঙ্কোচ অথবা আপন অপরিহার্য্য অক্ষমতা সম্বন্ধে নম্রতার লেশমাত্র লক্ষণ কোথাও নাই। এই দুঃসাহসিকতাব পুরস্কারও তিনি পাইয়াছেন, ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খেতাব পাইয়াছেন, যাঁহারা পরীক্ষক তাঁহারা বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে টম্‌সনের অপেক্ষাও আনাড়ি। তাহাদের অন্ধ সাহসের একটি মাত্র কারণ এই, যে, পরীক্ষার বিষয়টি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী কবি— পরীক্ষার্থী ইংরেজ এবং বাংলার কোনো বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন ইস্কুলমাস্টার। বিষয়টি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানই বা কি রকম, বোধই বা কি রকম, তাহা জানা তাঁহাদের পক্ষে বাহুল্য এবং সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। যদি কোনো ফরাসী কবিকে লইয়া টম্‌সন্ এতখানি প্রগল্‌ভতা করিতেন, তবে পরীক্ষকেরা নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। কোনো জর্ম্মন কবির কথা বলিলাম না। কারণ জর্ম্মন কাব্যের প্রতি যথেচ্ছাচার করিলে বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডে সেটা সাহিত্যিক দণ্ডবিধির কোঠায় আসে কিনা সন্দেহ আছে, অন্তত জুরিদের ন্যায়বোধকে জাগবূক না করিতেও পারে। বাংলা কাব্যবিচারে একজন ইংরেজের যোগ্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষকগণ গোড়াতেই যেমন নিঃসংশয়, ফরাসীসাহিত্যবিচারে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে গোড়াতেই তাঁহাদের তেমনি সংশয় হইত। কারণ বিদেশীর পক্ষে পরভাষার মর্ম্মস্থানে প্রবেশ দুঃসাধ্য, একথা জানিবার জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক-সভার সদস্য হইবার প্রয়োজন হয় না।

উপাধিপরীক্ষায় মার্কালাভ করিবার পক্ষে একটা গুণ হয়তো এই গ্রন্থে আছে। সেটা তথ্যসংগ্রহ। এই সংগ্রহের যে অংশ পরীক্ষার্থীর সে অংশ ভুলে জীর্ণ, যে অংশ শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা একেবারেই তাঁহার নিজের নয়। শুধু তথ্য নহে, কবির রচনা সম্বন্ধে অনেক অভিমতও তিনি তাঁহার বাঙালী বন্ধুদের নিকট হইতে খাপছাড়া ভাবে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকল মতের সহিত তাঁহার মত সম্পূর্ণ মেলে নাই, মাঝে মাঝে এমন কথা বলিয়া তিনি আপন স্বাধীন বুদ্ধির মর্য্যাদারক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যার দৌড়ের চেয়ে কলমের দৌড় যেখানে বেশি হয়, সেখানে আত্মাভিমানের খাতিরে সমালোচককে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। এক পক্ষ যেখানে জানে এবং অন্য পক্ষ জানে না, সেখানে উভয়ের মধ্যে অনৈক্য স্বাভাবিক, কিন্তু শেষ পক্ষ যদি বিচারকের পদ পান, তবে সেই অনৈক্যটাকে সহজেই তিনি নিজের গৌরবের বিষয় করিয়া লইতে পারেন।

বাঙালী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভালোমন্দ বিচার করা অনাবশ্যক। কেবল এইটুকু বলা দরকার, যে, এখনো পণ্ডিতী ভাষায় ইহার শ্রেণী নির্ণয় করিয়া ইহাকে জাদুঘরের নমুনা-ভাণ্ডারের মধ্যে বাক্সবন্দী করিবার সময় হয় নাই। যে সকল পাঠক যথার্থই বাঙলা বোঝে, তাহাদের কাছে এখনো ইহা ছায়ায় আলোয় বিচিত্র রহস্যে প্রকাশিত। সুতরাং কেবলমাত্র তথ্যতালিকা ও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত অভিমতগুলা জোড়া দিয়া ইহার আলেখ্য রচনা করা অভিজ্ঞ বাঙালী লেখকের পক্ষেও দুঃসাধ্য। ছবির টুক্‌রাগুলিকে জোড়া দিয়া তাহাকে সমগ্র করিয়া তুলিবার যে ইংরেজি খেলা আছে, সে খেলা খেলিতে হইলে টুক্‌রাগুলাকে কোনোমতে জড় করিলেই চলে না— ছবির ঐক্যবোধটা মনে থাকা চাই। টম্‌সন্ টুক্‌রাই জুড়িয়াছেন, কোনো ছবিকে জুড়িয়া তোলেন নাই। কেননা গুরুতর অনভিজ্ঞতা বশত ছবিকে সম্পূর্ণভাবে চেনা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। জোড়া দিয়ে কাঁথা তৈরি হইতে পারে। সে কাঁথায় ঢাকা দেয়, প্রকাশ করে না। কবির কাব্য ও জীবন লইয়া টম্‌সন্ যেমন জবড়জঙ্গ করিয়া জোড়াতাড়া দিয়াছেন, সে যেন একটা অন্ধ টর্ণেডো ঝড়ের লীলা, বটগাছ চড়িয়াছে ইমারতের মাথায়, ঘরের চাল পড়িয়াছে দীঘির জলের মধ্যে— আছে সকলি, কিন্তু সেই থাকার দ্বারা জ্ঞানের ও ভোগের বিষম অসুবিধা ঘটে। অজিতকুমারের

মত কোনো কোনো বাঙালী রবীন্দ্রনাথের রচনাবৈচিত্র্যকে একটা সহজ ঐক্য দান করিবার জন্য জোড়াগাঁথার পথে না গিয়া কাব্যকে নিছক্ তত্ত্বে চোলাই করিয়া লইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসুটিক্যাল কোম্পানি তাঁহাদের নিমের আরকের বোতলের মধ্যে নিমগাছকে যেমন অত্যন্ত সহজ ঐক্য দান করিয়াছেন এও সেই রকম। কিন্তু যাই হোক, ইহারা বাঙালী, বাংলা ভাষাটা জানেন, বাংলাসাহিত্যকে আত্মীয়ের মতো বোঝেন, আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কবির কাব্যকে ইঁহারা কোনো-না-কোনো দিক হইতে উপলব্ধি করিয়াছেন; সে উপলব্ধির মূল্য আছে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্যে আত্মবিশ্বাসের নিঃসংশয়তা অন্যায় নহে। তা ছাড়া ইহার মধ্যে যদি ঐক্যদেশিকতা থাকে, তবে অন্য পাঠকদের উপলব্ধিগত বিচারের দ্বারা তাহার পূরণ ও সংশোধন ঘটে। সকল দেশের সাহিত্যেই এইরূপ ক্রিয়া চলিতেছে।

কিন্তু যে মানুষ বাংলা অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে জানেন এবং বাঙালীর আন্তরিক জীবনযাত্রা যাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র যে অন্ধকার তাহা নহে, যাহা তাঁহার সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত সংস্কারের দ্বারা বিকৃতভাবে দৃশ্যমান— তিনি যদি নানা তথ্য ও মতের উঞ্ছবৃত্তির যোগে কোনো বাঙালী কবির একটা মূর্ত্তি ও বাংলাকাব্যের একটা চিত্র অসংশয় আত্মবিশ্বাসের সহিত রচনা করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে একটা কিম্ভূত ব্যাপার না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। কবির কাব্য ও তাঁহার জীবনের সমস্ত কাজের উপর তিনি ক্রমাগতই কেবল খাবল মারিয়াছেন। নারিকেলের রস ও শাঁস কোথায় আছে তাহার সমগ্র ধারণা যাহার নাই, সে উক্ত ফলটাকে যেমন অদ্ভুত অনভিজ্ঞতার সহিত কখনো কামড় দিয়া, কখনো মুঠা দিয়া খাবল মারিতে থাকে এও তেমনি। নিজের অক্ষমতার অত্যাচার সে নারিকেলের উপর প্রয়োগ করে। অন্যত্র এই অপরাধের দায়িত্ব তেমন অমার্জ্জনীয় না হইতেও পারিত, —কিন্তু যে সভায় অন্যান্য ভোগার্থী অতিথিদের নারিকেল সম্বন্ধে ধারণা আরো অসম্পূর্ণ, সেখানে এই ফলের রসতত্ত্ব বিচারে নিজেকে গুরু বলিয়া প্রচার করা ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু কোনো কবির প্রতি নম্রভাব সহিত ন্যায়াচরণ করিবার ইচ্ছাও সেই ক্ষেত্রে অনেকের মনে অলস হইয়া উঠে যেখানে বিচারের অযোগ্যতা ধরা পড়িবার আশঙ্কা অল্প।

এই গ্রন্থ ছাপা হইবার পরে আমাদের কোনো ইংরেজ বন্ধু আমাদিগকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, এই বই কয়েক পাতা পাঠ করিয়া ইহা শেষ পর্য্যন্ত পড়া তাঁহার পক্ষে একেবারে দুঃসহ হইয়াছিল। তাহার কারণ, এই গ্রন্থে লেখকের যে স্পর্দ্ধিত আত্মাভিমান প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার যোগ্যতার সহিত তাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই।

টম্‌সন্ তাঁহার ৩২৫ পৃষ্ঠা বোঝাই করিয়া যে সব ভুল সংবাদ ও ভুল তর্জ্জমা জমা করিয়াছেন, যদি প্রশস্ত স্থান ও দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, তবে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে। তবুও, to err is human, এবং বিদেশী সাহিত্য ও কবি সম্বন্ধে তথ্যের ভুল করা গুরুতর অপরাধ নয়। কিন্তু যেখানে তাঁহার চিরাভ্যস্ত ইস্কুলমাষ্টারের চৌকিতে বসিয়া আন্দাজের উপর সম্পূর্ণ জোর দিয়া তিনি বাঙালী কবির প্রতি য়ুরোপীয় লেখকদের প্রভাব কল্পনা করিয়াছেন সেখানে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন। "রাজা ও রাণী"র মধ্যে তিনি ইব্‌সনের Dolls' Houseর আঁচ পাইয়াছেন। তিনি কি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইংলণ্ড ইব্‌সন্‌কে যে চিনিয়াছে সে বেশি দিনের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন "রাজা ও রাণী" লিখিয়াছিলেন তখন কয়জন ইংরেজ ইব্‌সন্ পড়িয়াছিলেন! হয় তো ভুল বলিতেছি, হয়তো অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন—টম্‌সনের মতো আন্দাজে কথা বলিবার ঔদ্ধত্য আমাদের নাই, —কিন্তু এ কথা নিশ্চিত, ইব্‌সনের খ্যাতি তখনো বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই। এই জাতের আন্দাজী কথা তাঁহার গ্রন্থে আরো অনেক আছে: তাহার কারণ যেখানে সঙ্কোচ নাই, ভয় নাই,

যেখানে পদবী পাইবার পন্থা অত্যন্ত সহজ, সেই জমিতেই আন্দাজের আগাছা প্রবল হইয়া জন্মে।

এ তো গেল আন্দাজের কথা। তার পর যেখানে তিনি কাব্যগত কোনো তত্ত্বকথা সম্বন্ধে দুই চক্ষু বুজিয়া গম্ভীর গলায় রায় দিয়াছেন সেখানে তাঁহার যে অহমিকা সেটা সাহিত্যিক নহে, সেটা সাম্প্রদায়িক। কবির কাব্যে জীবনদেবতার যে আইডিয়া নানাস্থানে নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই একথা স্বীকার করিলে ক্ষতি ছিল না। ভারতবর্ষে আমরা গ্রামদেবতা, কুলদেবতা, গৃহদেবতা, ইস্টদেবতাকে মানি। সে মানা fetish মানা নয়। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে সীমাশূন্যতাকে অসীম বলে না। সকল সীমার মধ্যেই তিনি অসীম, এই জন্য ভক্তগণ সীমায় সীমায় তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হন। অসীম আকাশ আমার গৃহসীমার মধ্যে খণ্ড আকাশরূপেই আমার বিশেষ প্রিয়— অথচ পরমার্থত সেই আকাশ সীমাধর্ম্মী নহে— পরমাকাশ অসীম না হইলে প্রত্যেক গৃহেরই মধ্যে তাহা খণ্ডাকাশ হইতেই পারিত না। তেমনি পরমাত্মা অসীম বলিয়াই প্রত্যেক জীবাত্মায় তিনি বিশেষ,—সেই কারণেই বিশেষ আত্মায় পরমাত্মার সহিত বিশেষ মিলনেই,—সুতরাং সীমাবদ্ধ মিলনেই, ---আমাদের আনন্দ। বস্তুত খৃষ্টান ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যেই তত্ত্বই প্রধান। খৃষ্টানরা ঐতিহাসিক দেশে কালে সীমাবদ্ধ খৃস্টের মধ্যেই পরম পুরষের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া পরিত্রাণ কামনা করেন। ঘনিষ্ঠ আশ্রয় প্রত্যাশায় অনন্ত আকাশকে আমরা গৃহমধ্যে খণ্ড আকাশ করিয়া ধরিয়াছি, কিন্তু নিজের সীমার দোষে সেই খণ্ডতাকে আমরা বিকৃত করিতে পারি। আকাশকে একান্ত অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারের আকাশ করা অসম্ভব নহে, তাহাকে আলোকহীন আকাশ করিতে পারি, তাহাকে বিরূপের মধ্যে বদ্ধ করিয়া অসুন্দর আকাশ করিতে পারি। কবি তাই তাঁহার কাব্যে মাঝে মাঝে বলিয়াছেন, "হে আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তোমাকে কি আমার জীবনের বিকৃতির দ্বারা পীড়িত করিয়াছি? যদি করিয়া থাকি আমার এই জীবনের সীমাকে ভাঙিয়া ফেলিয়া পুনরায় ইহাকে নূতন রূপ দাও।" অর্থাৎ আমার জীবনের সীমার মধ্যে যদি ছন্দের সুষমা থাকে, তবে যিনি অসীম তাঁহাকে সুন্দর করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া আমারই জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। সেই প্রকাশেই আমার চরিতার্থতা। আর জীবনে যদি ছন্দের বিকার ঘটে তবে অসীমের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়।

এই জীবনদেবতাকে কবি কখনো পুরুষভাবে কখনো স্ত্রীভাবে দেখিয়াছেন। ইহাতেও টম্‌সনের বুদ্ধি কিছু হুঁচট খাইয়াছে। যেমন গাছের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে এমন কি অচেতন বিশ্ববস্তুর সঙ্গে পরস্পর নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি করিতে ভারতীয় বুদ্ধিতে বাধে না, তেমনি ভগবানের স্বরূপের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিকে একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া অনুভব করিতে সে আতঙ্কিত হয় না। কবিও নিজের জীবনের মধ্যে যে সকল পরম আবির্ভাব, যে সকল নিবিড় রস নানা উপলক্ষ্যে অনুভব করিয়াছেন নিঃসন্দেহেই তাহার মধ্যে কখনো পুরুষের কখনো নারীর ভাব পাইয়াছেন। সেই উভয় ভাবের মধ্যেই আনন্দের অসীমতা। এই জন্যই জীবনদেবতাকে তাঁহার পক্ষে প্রিয়তম বলাও যত সহজ, প্রেয়সী বলাও তত সহজ।

এই গেল তত্ত্বের দিকের কথা। কাব্যের রূপ সম্বন্ধেও যেখানে কথা কহিয়াছেন সেখানেও ইস্কুল-মাষ্টারের জোর গলায়। বাঙালী পাঠকমাত্রেই জানেন কবির লেখা গানগুলি প্রায়ই বারো লাইনের। টম্‌সন্ ইহার মধ্যে নিছক কৃত্রিমতার আভাস পাইয়াছেন। কাব্যসমালোচকের মুখে এমন কথা প্রত্যাশাই করা যায় না। কবিমাত্রেই নিজকৃত শাসন নিজের লেখার উপর প্রচার করেন সেটাতে অধীনতা নাই, সেটাতে কর্তৃত্ব। এই স্বপ্রতিষ্ঠিত শাসনের সীমার দ্বারাই স্বয়ং বিশ্ববিধাতাও সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের দেহে নাকের দুই পাশে দুই চক্ষু, মাথার দুই পাশে দুই কর্ণ, বক্ষের দুই ধারে দুই বাহু, যোজনা করিয়াছেন; করতলের পাঁচ পাঁচ আঙুল দুই হাতে

কেবল যে সমান করিয়া গণিয়া দিয়াছেন তাহা নহে এ-হাতের আঙুলের সঙ্গে ও-হাতের আঙুলের আকৃতিও একই রকমের। এই সমস্ত বিচার করিয়া আমার বিশ্বাস টম্‌সন্ সাহেবও বলিবেন না যে, নরদেহ রচনা করিবার সময় বিশ্বকবির প্রতিভা ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই তিনি পুনরাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। টম্‌সন্ সাহেব এই প্রসঙ্গে সনেট কাব্যরূপের চতুর্দ্দশ পদের কোনো উল্লেখ করেন নাই। সনেটের পদশাসনসঙ্কীর্ণতায় টম্‌সন্ সাহেব কোনো অবজ্ঞা বোধ করেন না। তার কারণ, স্কুলমাষ্টারের কাছে সনেট সুপরিচিত,—কিন্তু দ্বাদশপদীর কোনো নজিরের দলিল তাঁহার জানা নাই। সে কথাও যাক্। টম্‌সন্ যদি তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাহিরে অল্পমাত্র অনুসন্ধান করিতেন, তবে খবর পাইতেন যে, আস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি ভাগ অনুসারে আমাদের সঙ্গীদের একটা কলেবর বিভাগ আছে। তাহারই অনুসরণ করিয়া কবিতাগুলিকে সাধারণত দ্বাদশ পদ আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

ইস্কুল-মাষ্টারীর চূড়ান্ত হইয়াছে যেখানে নৈবেদ্য গ্রন্থের কবিতাগুলিকে একশো সংখ্যায় আবদ্ধ দেখিয়া কবির প্রতি সমালোচক হুঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। চৌকিদার লাফ দিয়া উঠিয়াছে, যেন তাহার বৃষচক্ষু লণ্ঠনের অনিমেষ দৃষ্টিতে বমালসুদ্ধ চুরি ধরা পড়িল। চিন্তা করিয়া, চেষ্টা করিয়া ঠিক একশো'টা কবিতা টানাটানি করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন তাহার কোনো আভ্যন্তরিক প্রমাণ কি তিনি এই গ্রন্থের মধ্যে পাইয়াছেন? কবিকে জিজ্ঞাসা করিলে খবর পাইতেন, একশো'র অনেক বেশি কবিতা লেখা হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ছাপা হয় নাই, কিছু কিছু এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমওয়ালার ঝুড়িতে ঠিক একশোটা করিয়া আম গণিয়া যে খরিদদার বলে, যেহেতু বাংলা দেশের আমগাছ আঙ্গুল গণিয়া গণিয়া একশোটা করিয়া আম ফলায় অতএব এ আম পান্‌সা, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আমগাছকে সে আপনার ছাত্র বলিয়াই কল্পনা করে, এবং সেই আমগাছকে ফুল মার্ক না দিয়া ফেল করিবার পক্ষে তাহার বিশেষ আনন্দ আছে।

এ তো গেল বাহিরের কথা। তারপরে লেখক কবিতার গুণ দোষ বিচার এমনভাবে করিয়াছেন যাহাতে উপাধিপরীক্ষার পবীক্ষকেরা সন্দেহমাত্র না করিতে পারে যে, তিনি বাংলাকাব্যকে নিশ্চিত ভাষাজ্ঞানেব সাহায্যে গভীবভাবে বুঝিবার অধিকারী নহেন। তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ইংরেজি সাহিত্যকে যদি খাস বাংলার ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করা যায়, ইংরেজি সাহিত্যকে যদি ইংরেজের জ্ঞান, বোধ ও দৃষ্টি দিয়া দেখিবার শক্তি একটুও না থাকে, যদি ইংরেজি ভাষার মধ্যে যে জাদু আছে তাহা অনুভব করা আমাদের পক্ষে স্বভাবত বা অশিক্ষাবশত অসাধ্য হয় তবে এই সাহিত্যের কতই অল্প অংশ বাঙালীর অধিগম্য হইতে পারে। শুধু তাই নয়, তাঁহাদের ভাষায় যাহাকে banal বলে, তা ছাড়া এ সাহিত্য আর কোনো বিশেষণের যোগ্য হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত বোধ করি তাঁহার জানা আছে। যদিও নিশ্চিত বলা কঠিন তবু আশা করি তিনি এতটুকু বাংলা জানেন যাহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, বাইবেলের যে বাংলা তর্জ্জমা সাধারণ্যে প্রচলিত তাহাতে বাইবেলের মতো এমন গ্রন্থেরও কিরূপ হাস্যকর দুর্গতি ঘটিয়াছে। তাহার কারণ এ নয় বাংলায় ভালো তর্জ্জমা হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা জানেন না যে, বাংলা তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা তাঁহাদের অশিক্ষার ভিতর দিয়া এক জিনিষকে আর এক জিনিষ করিয়া তুলিয়াছেন। অভিধান মিলাইলে শব্দার্থের কোনো অপরাধ পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাষার রস, যাহাকে ইংরেজিতে taste বলা যাইতে পারে, তাহা তাহার অর্থবস্তুর চেয়ে অনেক বেশি। তাহার উপলব্ধি যদি না থাকে তবে অন্ধ রসদৃষ্টির যোগে সাহিত্যের ব্যবহার করিতে গেলে তাহা নিতান্ত ক্রিমিনাল যদি নাও হয়, অন্তত সিভিল মাম্‌লার অধীনে আসিতে পারে। টম্‌সন বাংলা ভাষার যে অসাড় বোধের ভিতর দিয়া বাংলা কাব্যকে দেখেন তাহাকে তাঁহার ইংরেজির ভিতব দিয়া ছাঁকিয়া লইবার সময় যে,

কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়। এমন অবস্থায় যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্বন্ধে মাঝে মাঝে এক কথায় ডিক্রি ডিস্‌মিস্ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার হাকিমী সম্বন্ধে নালিষ কার কাছে তুলিব? সে কি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালযের উপাধিপরীক্ষা-সমিতির কাছে?

এমন কোনো ইংরেজি কাব্যসংগ্রহ নাই যাহার মধ্যে টেনিসনের The Lady of Shallott আদরের স্থান পায় নাই। ইংরেজি ভাষা, ভাব, তাহার পৌরাণিক ইতিহাসের সঙ্গে যাহার নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই এমন সাহিত্যরসজ্ঞ বাঙালী পাঠকের কাছে ইহা যে কতদূর নীরস ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে তাহা, যে-ইংরেজের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তিনিও বুঝিতে পারিবেন। উক্ত পাঠক "Bearded Barley"কে "দাড়িওয়ালা যব" তর্জ্জমা করিয়াও যদিবা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন তবু সমস্ত কবিতাটির মধ্যে সর্ব্বজনীন চিত্তের ব্যবহারযোগ্য খাদ্যের অভাব দেখিয়া তিনি যদি ইহাকে অশ্রদ্ধা, এমন কি, অবজ্ঞা করেন, তবে তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু তবু উক্ত বাঙালী পাঠক অবজ্ঞা করেন না; বলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। অবজ্ঞা যে করেন না, তাহার কারণ এ নয় যে, করিলে উপাধিপরীক্ষায় তাঁহার পাস্ করা অসাধ্য হইবে। তাহার কারণ এই যে, তিনি জানেন, ইংরেজ এই কবিতার মধ্যে যে-রস পান, কেবল মাত্র অনভিজ্ঞতাবশতই সেই রস পাইবার অধিকার তাঁহারও নাই। সে তাঁহার ভাগ্যের দোষ কাব্যের দোষ নয়। টেনিসনের "In the Valley of Cauteretz" নামক কবিতাটিও ইংরেজ সংগ্রহকারদের বরমাল্য পাইয়া থাকে। জানিনা ফরাসী বা জর্ম্মান ভাষায় ইহার তর্জ্জমা হইয়াছে কি না— এবং সেই তর্জ্জমার জোরে ইহা সেই সেই ভাষায় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যের একটা ক্ষুদ্র কোণও অধিকার করিতে পারিয়াছে কি না। ইহার সম্পদ যে কি, এবং "All along the Valley" ও "Living Voice" ও "Voice of the Dead" বাক্যের বারবার পুনরাবর্ত্তনের মধ্যে কি যে জাদু আছে তাহা অতি অল্প বিদেশীর কাছেই অনুভবগম্য। কিন্তু নিঃসন্দেহই ইহার শব্দযোজনার মধ্যে এমন একটি সঙ্গীত আছে যাহা অধিকারী ব্যক্তির মনে রস জোগাইয়া তোলে। "Deepening thy voice with deepening of the night" ইহার মধ্যে যদি কোনো মাধুর্য্য থাকে তাহা শব্দার্থের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, ভাষার অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে তাহা অবগুণ্ঠিত, ভাষার দরদ নাই যে বিদেশী বর্গী সমালোচকের মনে, সে যখন ইহার অবরোধ ভাঙিয়া চৌথ আদায় করিতে আসে তখন হতাশ হইয়া সে কি ক্ষাপ্পা হইয়া উঠিবে না? টম্‌সন্ সাহেব তেমনি মেজাজ লইয়া মাঝে মাঝে যখন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন তখন সেটাকে তাঁহার সাহিত্যিক ন্যায়াপরতা বলিব, না, কথাটা রূঢ় হইলেও, সেটাকে অন্যায়পরতা বলিব? যথার্থ ভাবে সাহিত্যরসের বিচার করিবার শক্তি যে সকলেরই আছে তাহা বলি না। অতএব তাহার অভাব দেখিলেও সহ্য করা চলে, কিন্তু উপকরণ ও শিক্ষার অভাবে সাহিত্যের বাহির দ্বারেই যে মানুষ বাধা পায়, সে যদি সেখানেই আপন হাতে উচ্চ মাচা বাঁধিয়া বিচারকের আসন খাড়া করে সেটা কি সুদৃশ্য? কেবল কল্পনাশক্তির অনুজ্জ্বলতাবশত নয়, অজ্ঞতার অশক্তিবশত যখন সমালোচক নিজের আত্ম-বিশ্বাসকে খর্ব্ব না করিয়া কবির কাব্যকে খর্ব্ব করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ভদ্র কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। কারণ এই স্পর্দ্ধা দ্বারা বাঙালী কবির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, অনুরূপ ভাষাজ্ঞান লইয়া কোনো য়ুরোপীয় কবির প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে এই ইংরেজ লেখক সাহস করিতেন না। আমাদের দেশের খ্যাতনামা কবির প্রতি এই অসঙ্কোচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতির প্রতি পদে পদে তিনি অহঙ্কৃত অসম্মান প্রকাশ করিবার একটা সুযোগ পাইয়াছেন।

[এটি বেনামে রবীন্দ্রনাথের লেখা
—সংকলন-সম্পাদক]

রেভারেণ্ড টম্‌সনের পণ্ডিতম্মন্যতা

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ববীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড টম্‌সনের বহির বিষয়ে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ কবিয়া একটি হাস্যোদ্দীপক কবিতার কথা মনে পড়িয়া গেল। একজন তরবারিচালননিপুণ ব্যক্তি অন্য এক জনের মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তলোয়ারটা এমন পাতলা ও এমন তীক্ষ্ণ ছিল এবং তলোয়ারী এমন লঘু হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথা কাটিয়াছিলেন, যে, সে বুঝিতেই পারে নাই, যে, তাহার মাথা কাটা গিয়াছে। দর্শকেরাও বুঝিতে পারে নাই। তলোয়ারী তখন কি করেন? নিজে যে খুব দক্ষতার সহিত অস্ত্র চালনা করিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একটু নস্য কর্ত্তিতমুণ্ড ব্যক্তির নাকের কাছে ধরিলেন। অমনি সে হাঁচিতে না হাঁচিতেই তাহার মাথাটা মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ তীক্ষ্ণ হইলেও এত সূক্ষ্ম যে, তাহা রেভারেণ্ড টম্‌সন্ অনুভব করিতে পারিবেন না। তাঁহার পণ্ডিতম্মন্যতার মাথা কাটা গেলেও তিনি জীবন্ত মানুষেরই মত বেশ চলাফিরা করিতে থাকিবেন। কিন্তু তাহা বাঙালী কবি ও অন্যান্য লেখকদের পক্ষে নিরাপদ নহে;— কখন্ কাহার উপর চড়াও করিয়া বসিবেন, বলা ত যায় না। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নস্য ব্যবহার করেন না। কিন্তু টম্‌সন্ সাহেবের বহিতেই তাহার মাল মশলা আছে। একত্র করিয়া ব্যাখ্যার হামানদিস্তায় পিষিয়া খুঁটিয়া দিলেই চলিবে। তখন সেই নস্য টম্‌সন্ নিজে ব্যবহার করিতে পারিবেন, অন্য কেহও তাঁহার নাকের কাছে ধরিতে পারিবেন।

ববীন্দ্রনাথের উপর এটি টম্‌সনেব দ্বিতীয় বহি। প্রথমটির দীর্ঘ সমালোচনা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। হয ত তাহারই ফলে তিনি দ্বিতীয় বহিটিতে স্বীকাব করিয়াছেন, যে, প্রথমটিতে কোন কোন বিষয়ে কিছু ভ্রম আছে।

টম্‌সন্ সাহেবের সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। কিছু চিঠি লেখালেখি এবং কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। একবার তিনি বাংলায কথোপকথনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাঙ্গা বাংলায় দুই তিনটা বাক্য বলিয়াই সে চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। ভারতবর্ষে থাকিবার সময় তাঁহার এই ধারণা ছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের বাংলা বহি কোন বিদেশী ভাষায় তর্জ্জমা করিবার জন্য বিদেশী অনুবাদকের ভাল করিয়া বাংলা জানিবার দবকার নাই; কোন বাঙালীকে বহিটির মানে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া বিদেশী অনুবাদক নিজের মাতৃভাষায অনুবাদ করিতে পারেন! তবে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন বটে, যে, বিদেশী অনুবাদকের নিজের মাতৃভাষায় দখল থাকা দরকার। অনুবাদ কার্য্যেব সহজসাধ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার এই অদ্ভুত ধাবণা এখনও বোধ হয় আছে। নতুবা তাঁহার এই অপূর্ব্ব দ্বিতীয় বহিটি তিনি লিখিতেন না।

টম্‌সন্ সাহেবকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য কোন বাঙালী জ্যাঠা ছেলে গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে কতকগুলি শব্দের অদ্ভুত অনুবাদ করিয়া দিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও টম্‌সনের বাংলাবিদ্যার দৌড় যে কত দূর,তাহা প্রমাণিত হইতে বাকী থাকে না। কিন্তু তাঁহার বহিটির কোন কোন জায়গা পড়িয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান সম্বন্ধে আমার যে ধারণা

হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, হাসির উপকরণগুলি তিনিই স্বয়ং যোগাইয়াছেন। তাহার কয়েকটি পাঠকদের সাম্‌নে ধরিবার আগে অন্য দু-একটা কথা বলি।

পুস্তকখানির ভূমিকায় লেখক বলিতেছেন, যে, তিনি রবিবাবুর সব বহি পড়িয়াছেন, যদিও পুস্তকতালিকায় তিনি একথাও কতকগুলি বহি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, সেগুলি তিনি দেখেন নাই। পড়ার মানে যদি চোখ বুলান হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহার দৃষ্ট বহিগুলি সম্বন্ধে তিনি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যদি তিনি অধ্যয়ন অর্থে পাঠ (reading) কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি? বিষ্ণু শর্ম্মা বলিয়াছেন, মানুষের টাকা থাকিলে তাহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতিও হয়—"অর্থাদ্ ভবতি পণ্ডিতঃ"। তিনি আজকালকার দিনে বাঁচিয়া থাকিলে অধিকন্তু ইহাও বলিতেন, যে, রাজনৈতিক প্রভুত্ব কোন জাতির লোকদের থাকিলে সেই জাতির লোকেরা পরাধীন জাতির ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন, যে টম্‌সন্ যত অল্প বাংলা জানিয়া বাঙালী কবির উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়াছেন, ফরাসীভাষা তত অল্প জানিয়া কোন ফরাসী কবি সম্বন্ধে বহি লিখিতে সাহস করিতেন না—তেমন আস্পর্দ্ধা ও দুঃসাহস তাঁহার হইলেও দুর্দ্দশাও কি হইত তাহা আমরা জানি। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, যেহেতু আমরা ইংরেজের অধীন এবং তিনি ইংরেজ, সেই কারণে তিনি আমাদের ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষোত্তীর্ণ ছেলেদের চেয়েও কম বাংলা জানিয়া জগদ্বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক হইয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথের উপর বহি লিখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব্ ফিলসফি উপাধি পাইয়াছেন। তিনি দর্শনের আচার্য্য না হইতে পারেন, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যাচার্য্য যে নিশ্চয়ই, তাহা এই উপাধির প্রভাবে আমাদিগকে মানিতেই হইবে!

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পদবী "ঠাকুর" কেন হইল, তাহার বড় চমৎকার কারণ টম্‌সন্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সেকালে সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা দেশী ব্রাহ্মণ চাকর্‌য়েদিগকে "ঠাকুর" বলিত, এবং তাহা হইতেই কবির পূর্ব্ব পুরুষরা "ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন! কিন্তু যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে বাংলাদেশের আরও শত শত ব্রাহ্মণ পরিবারের যে সব লোক সেকালে ইংরেজের চাক্‌রী করিত, তাহারা কেন "ঠাকুর" বলিয়া পরিচিত হয় নাই? কবি নিজে এই অপূর্ব্ব ইতিহাসটি ইতিপূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, যদিও তাঁহার নিজের পারিবারিক ইতিহাস এবং বাংলা শব্দার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান টম্‌সন্ অপেক্ষা অল্প স্বল্প বেশী হইবারই সম্ভাবনা। টম্‌সন্‌কে অতঃপর কোন হাস্যরসিক বলিয়া দিতে পারে, যে, কবির পূর্ব্বপুরুষ রাঁধুনী বামুন ছিলেন বলিয়া তাঁহারা ঠাকুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, এবং তাহা তিনি তৃতীয় কোন বহিতে লিখিয়া বসিতেও পারেন! এইজন্য এখন হইতেই বলিয়া রাখা ভাল, যে, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। হাস্যরসিকদিগকেও বলি, "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ," তাঁহারা অতীত কালের কবির এই প্রার্থনাটি যেন ভুলিয়া না যান।

রবীন্দ্রনাথের বংশ পিরালি, পিরালী বা পিরালী ব্রাহ্মণ। টম্‌সন্ বলিতেছেন, পিরালি শব্দের উৎপত্তি "পীর+আলি"—প্রধান মন্ত্রী হইতে, এবং পীর+আলি যে ফারসী, তিনি তাহাও বলিয়াছেন।

আমি ফারসী জানি না; কিন্তু অভিধানে দেখিয়াছি, যে, পীর ফারসী কথা, মুসলমানদিগের সাধু পুরুষদিগকে পীর বলা হয়, এবং আলী আরবী শব্দ। বস্তুতঃ পিরালি শব্দের জনশ্রুতিমূলক ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ, "যশোহরের মুসলমান রাজা পীর আলীর অন্নস্পর্শজনিত, মতান্তরে অন্নের আঘ্রাণ জন্য দোষাশ্রিত ব্রাহ্মণশ্রেণী বিশেষ" বলিয়া শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে লেখা আছে; এবং আমরাও বরাবর এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি।

টম্‌সন্ সাহেবের বহিতে মধ্যে মধ্যে এরূপ ইঙ্গিত আছে, যে, তিনি বাংলা ও ফারসী ছাড়া সংস্কৃতও জানেন। এরূপ বহুভাষাবিৎ লোককে ইংলণ্ডে যত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে।

এখানে টম্‌সনের গোটাকতক কথার অনুবাদ দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করি।

তিনি "কবিওয়ালার" মানে লিখিয়াছেন, "poet fellows"! তিনি জানেন না, যে, "কবি"র একটা মানে, "একশ্রেণীর গান; ইহাতে চিতান, পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া ও খাদ এই কয় অংশ থাকে"; জানেন না যে, "কবি" গাওয়া যায়, সুতরাং "কবিওয়ালা" মানে "কবি গানকারী"। "কবি" যে এক শ্রেণীর গান, তাহার একটা প্রয়োগ দিতেছি। মেদিনীপুরের জাড়া গ্রামের জমীদারদের বাড়ীতে এক কবির লড়াই সম্বন্ধে গল্প আছে, যে, একদলের মূল গায়েন জাড়াকে গোলোক বৃন্দাবনের সহিত তুলনা করেন। তখন অন্যদলের অধিকারী উঠিয়া গাহিলেন,

"কি কোর়্যে বল্‌লি, জগা, জাড়া গোলোক-বৃন্দাবন!

কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড?

সাম্‌নে আছে মাণিককুণ্ড, কোর়্গ্যে মূলো দরশন!—

কবি গাইবি, পয়সা নিবি, খোসামুদী কি কারণ?"

মাণিককুণ্ড জাড়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম। এখানে বড় বড় মূলা উৎপন্ন হয়। যিনি উতোর গাইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যঙ্গের অর্থ সহজবোধ্য। গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন, কিন্তু জাড়ার নিকটবর্ত্তী মাণিককুণ্ডে থাকেন বড় বড় মূলা!

নববিবাহিত দম্পতির কথোপকথন বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আছে, তাহাতে বালিকা বধূ বলিতেছে যে, সে আয়ী-মার কাছে শুইতে যাইতেছে। মাতামহীকে আয়ী বলে; কোথাও কোথাও মাতামহীর মাতাকে আয়ী-মা বলে। টম্‌সন্ আয়ী-মার মানে করিয়াছেন "nurse" "নার্স" অর্থাৎ দাই বা ধাই। "আয়ী" ও "আয়া" যে এক নয়, ততটুকু জ্ঞানও তাঁহার নাই।

"চলিত ভাষা"র মানে তিনি করিয়াছেন "walking language" অর্থাৎ কিনা যে-ভাষা হাঁটিয়া বেড়ায়, বলা বাহুল্য ইহার অর্থ কথোপকথনের ভাষা, প্রচলিত ভাষা।

রবীন্দ্রনাথের একটি বহির নাম "শব্দতত্ত্ব"। "শব্দতত্ত্ব" কথাটির মানে টম্‌সনের মতে "sound and reality", অর্থাৎ "ধ্বনি ও সত্তা"। বলা বাহুল্য ইহার অর্থ শব্দবিজ্ঞান বা ভাষাবিজ্ঞান। টম্‌সন্ এইরূপ ভাণ করিয়াছেন, যে, তিনি রবিবাবুর সব বহি পড়িয়াছেন। যদি "শব্দতত্ত্ব" তিনি পড়িতেন, তাহা হইলে ঐ বহির নামটির এমন অদ্ভুত মানে করিতেন না।

"ছুটির পড়া" রবিবাবুর আর একটি বহি; ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটির সময় পড়িবার জন্য অভিপ্রেত। টম্‌সনের বহিতে ইহা ইংরেজীতে "Chhutir Pada" লেখা হইয়াছে।

সুতরাং ইহা "ছুটির পদ"ও পড়া যায়। টম্‌সন্ ইহার মানে করিয়াছেন, "Verses in Leisure", অর্থাৎ "অবসর সময়ে রচিত পদ্য"! বলা বাহুল্য এই "পড়া"গুলি গদ্য।

"গীতপঞ্চাশিকা" রবিবাবুর আর একটি বহির নাম; টম্‌সন্ ইংরেজীতে লিখিয়াছিলেন "Gitapanchashika"। এই ইংরেজী অক্ষর-সমষ্টি "গীত-পঞ্চ-শিকা"ও পড়া যায়। সুতরাং, আর যায় কোথা? টম্‌সন্ অমনি মানে করিলেন, "Five Loops of Song"! অর্থাৎ কিনা রবিবাবু শিকায় তুলিয়া রাখিবার জন্য কতকগুলি গান রচনা করিয়াছেন! সেগুলি, রূপকভাবে কিম্বা সত্য সত্যই, পাঁচটি শিকাতে ঝুলান থাকে! টম্‌সন্ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরও অনেক বাঙালী কবির নাম করিয়াছেন, যেন সবই তাঁর নখদর্পণে! কিন্তু সত্য সত্যই যদি তিনি প্রচলিত সব বাংলা কাব্যের সহিত পরিচিত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের চৌরপঞ্চাশিকা তাঁহার জানা থাকিত, এবং পঞ্চাশিকার মানে পঞ্চাশের সমষ্টি না করিয়া তিনি পাঁচটি শিকা করিতেন না।

"অরূপ রতন" আর একটি পুস্তকের নাম। টম্‌সন্ মানে করিয়াছেন, "The Ugly Gem" অর্থাৎ কিনা "কুৎসিত রত্ন।" বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ পরমপুরুষ রূপহীন নিরাকার রত্ন বলিয়াছেন।

আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। যে-ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বহির নামেরই এমন অদ্ভুত মানে করিয়াছে, সে যে তাঁহার সব বই পড়িয়াছে, এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? অক্সফোর্ড অতি প্রাচীন সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অনেক বিদেশীভাষার অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদেরও বিদ্যা কি টম্‌সনের মত? তাহা হইলে ত অক্সফোর্ড পণ্ডিতের জায়গা না হইয়া পণ্ডিতমূর্খের জায়গা হইবে।

অরবিন্দ ঘোষ যখন হাজতে ছিলেন, তখনকার বৃত্তান্ত কাগজে লিখিয়াছিলেন। তাহার এক জায়গায় বলিয়াছিলেন, জেলে তাঁহাকে একটি বাটী দেওয়া হইয়াছিল। ইহা জল খাইবার জন্য, ডাল খাইবার জন্য, স্নানের জন্য, শৌচাগারের জন্য, প্রভৃতি সব কাজের জন্যই ব্যবহার করিতে হইত; অতএব তাঁহার মতে ইহা ভারতবর্ষের ইংরেজ সিবিলিয়ানদের মত। কেন না এই সিবিলিয়ান্‌রা সকল রকম সরকারী কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। অরবিন্দ টম্‌সনের বহি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, শুধু ইংরেজ সিবিলিয়ানরা নয়, কোন কোন ইংরেজ পাদরীও অনায়াসে সব কাজ করিতে সমর্থ।

১৩৩৪ কার্ত্তিক

রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত বংশপরিচয়

সিংহলের 'সিলোন ডেলী নিউস্' নামক ইংরেজী দৈনিকে ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিম্নমুদ্রিত প্যারাগ্রাফটি বাহির হইয়াছে :—

TAGORES PORTUGUESE ANCESTOR

In the Fifth Generation

News comes from Lisbon that in an interview given to the "Daily Mail," the Great Indian Poet, Rabindranath Tagore, announced his desire to visit Portugal, when he expected to deliver a lecture in Lisbon. In the course of the interview the poet said : "I shall not be content in seeing Lisbon alone, but shall travel across the whole country, which, as they tell me, is a wonderful land of the sun and I shall speak of my admiration and joy— joy of an Indian who still feels in his veins a streak of Portuguese blood! My ancestor to the fifth generation was a son of Portuguese, and I feel that this tie is not so remote as not to evoke in me a call to see a country so fertile in all that is beautiful and valorous."

ইহাতে রবীন্দ্রনাথকে বলান হইয়াছে, যে, তাঁহার ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পূর্ব্বপুরুষ এক পোর্ত্তুগীজের পুত্র ছিলেন! এই অদ্ভুত গাঁজাখুরি কথার উৎপত্তি কি প্রকারে হইল, বলিতে পারি না। কিন্তু এবিষয়ে আমরা মৌখিক ও ডাকের চিঠি দ্বারা জিজ্ঞাসা পাইয়াছি বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, সাক্ষাৎকার দ্বারা কোন কোন সংবাদাদিসংগ্রাহক (interviewers) কিরূপ সম্পূর্ণ অলীক কথা বানাইয়া লিখিতে পারে। উপরে উদ্ধৃত সাক্ষাৎকার বাস্তবিক হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। লণ্ডনে, প্যারিসে ও বোম্বাইয়ের ডেলীমেল নামক কাগজ আছে; আমেরিকাতেও থাকিতে পারে। কিন্তু এইসকল স্থান ও দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি যান নাই।

১৩৩৪ মাঘ

রবীন্দ্রনাথের বংশের মিথ্যা পরিচয়

বঙ্গের স্বরাজ্যদলের যে পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা চাহিয়া লইয়া তাহার পর তাহা ছাপেন নাই, তিনিই তৎপূর্ব্বে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে মালয় উপদ্বীপের ইংরেজদের কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ নিন্দা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে পরে লেখা চাওয়া তাঁহার পক্ষে যেমন সুশোভন হইয়াছিল, লেখা পাইয়া না-ছাপাও তদ্রূপ সুসঙ্গত ও ভদ্র আচরণ হইয়াছে। তাহাও পাছে এই সব পত্রিকার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচায়ক না হয়, এইজন্যই বুঝি জাপানের একটি কাগজ হইতে কুড়াইয়া এই সাংবাদিকপ্রবর, রবীন্দ্রনাথের এক পূর্ব্বপুরুষ পোর্ত্তুগীজ ছিলেন, এই মিথ্যা খবরটি ছাপিয়াছেন।

এরূপ খবর যে বাংলাদেশের কোন বাঙালী সম্পাদকের ছাপা উচিত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

কারণ, উচ্চশ্রেণীস্থ কোন বাঙালী হিন্দুরই কোন পূর্ব্বপুরুষ অহিন্দু পোর্ত্তুগীজ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন মূঢ়ের এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে রবীন্দ্রনাথকে কিম্বা তাঁহার কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত সহজ। তৃতীয়তঃ, গত কার্ত্তিকের প্রবাসীর ১৫৩ পৃষ্ঠায় সীলোন ডেলী নিউসে প্রকাশিত এই মিথ্যা সংবাদটির প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার ৪৯৯ পৃষ্ঠায় পুনর্ব্বার ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, বেঙ্গালী পত্রিকাতেও প্রতিবাদ হইয়াছিল। সুতরাং এতদিন পরে জাপানের ইয়ং ঈষ্ট নামক মাসিকের ডিসেম্বর সংখ্যা হইতে বিনা প্রতিবাদে এই মিথ্যা কথা উদ্ধৃত করা একমাত্র স্বজাতিদ্রোহী ক্ষুদ্রাশয় লোকদের দ্বারাই সম্ভবে।

"স্বজাতিদ্রোহী" কথাটা ব্যবহার করিবার কারণ বলিতেছি। লণ্ডনে ডেলী মেল বিলাতী ভারতবিরোধী সাম্রাজ্যোপাসক টোরীদের কাগজ। ইহারা যে কোন রকমে হউক ভারতবর্ষকে হেয় প্রমাণ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হয়। এই কাগজে রবীন্দ্রনাথের সহিত একটা মুলাকাতের (interviewর) মিথ্যা ব্যপদেশ সৃষ্টি করিয়া তাঁহারই মুখে এই মিথ্যা কথার আরোপ করিয়াছে, যে, তিনি অংশতঃ পোর্ত্তুগীজবংশোদ্ভূত। তাহার মধ্যে উহ্য শ্লেষ এই, যে, "খাঁটি ভারতবর্ষীয় কোন লোকের পক্ষে জগৎ সভায় সম্মানার্হ হওয়া অসম্ভব, ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী যিনি তিনিও ইউরোপীয় রক্তের জোরে প্রতিভাশালী, এবং সেই রক্তও আবার বর্ত্তমানে ইউরোপের অন্যতম হীন দেশ পোর্ত্তুগাল হইতে আমদানী, অতএব হে ভারতীয়গণ, তোমরা নিজেদের কাহারও বড়াই করিও না।"

রবীন্দ্রনাথের বংশের মিথ্যা পরিচয়ে স্বরাজদলের বাঙালী পত্রিকা-সম্পাদকের স্ফূর্ত্তি বোধ হইয়াছে, কিন্তু সুদূর পোর্ত্তুগালে যে-সব ভারতসন্তান আছেন, তাঁহারা এই মিথ্যা সংবাদে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। এই ভারতসন্তানদের নাম ইউরোপীয় এবং ধর্ম্ম খৃষ্টীয়; তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পোর্ত্তুগীজরা বলপূর্ব্বক খৃষ্টিয়ান্ করিয়া ইউরোপীয় নাম দিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা মনের ভাবে ও দেশের টানে ভারতীয়ই আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ডাক্তার সান্তানা রোদ্রিগেস্ (Dr. Santana Rodriguez) প্রবাসী-সম্পাদককে গত ১০ই ডিসেম্বর এ বিষয়ে একটি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি গোয়ার অধিবাসী, ইংরেজী ভাল জানেন না। তিনি পোর্ত্তুগ্যালের লীঝবোয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অন্যতম সহকারী (Assistant in the Medical Faculty, Lisbon University)। পত্রখানি এই :—

"My dear sir, In August of the current year the Portuguese press announced with satisfaction an interview of the London *Daily Mail* with our great national poet R. Tagore, wherein he confessed that his ancestors have been Portuguese I could not read the above interview, but this news led to all Indians of Lisbon [being] very displeased. Is the interview true? Is Dr. Tagore of European stock? I do not believe; but I beg you with great interest to ask for him and to send me a notice, accompanied with an original photograph of the poet to be published in the Portuguese press.

I am Indian, born at Goa. My patriotic feelings can be beheld in my books and leaflets, "A India Contemporanea" "O Monumento Nacional Indiano." "Literatura Hindu." Together I send to you my last work, "A Instruccad Public en Goa."

Yours faithfully
Dr. Santana Rodriguez

"বর্ত্তমান বৎসরের আগষ্ট মাসে পোর্ত্তুগীজ

সংবাদপত্রসমূহ সন্তোষের সহিত আমাদের জাতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত লণ্ডন ডেলীমেলের এক মুলাকাৎ প্রকাশ করে যাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পোর্ত্তগীজ থাকা স্বীকার করেন। আমি ঐ মুলাকাৎ পড়ি নাই; কিন্তু ইহাতে লীঝ্‌বোয়ার ভারতীয়েরা বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। মুলাকাৎটা কি সত্য? ডাঃ ঠাকুর কি ইউরোপীয় বংশজাত? আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোদ করিতেছি, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটি জ্ঞাপক পত্র ও তাঁহার ফোটোগ্রাফ পাঠাইবেন, যাহা পোর্ত্তুগীজ সংবাদপত্রসমূহে ছাপা যাইতে পারে। আমি ভারতীয়, গোয়ায় আমার জন্ম। আমার বহি ও পত্রীগুলিতে আমার স্বদেশভক্তির পরিচয় পাইবেন। এই সঙ্গে আপনাকে আমার নূতন বহি পাঠাইতেছি।"

১৩৩৪ ফাল্গুন
পুস্তক-পরিচয়

গীত-পঞ্চাশিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বরলিপি—শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২য় সংস্করণের বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ—১৩৩৪ সাল, মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩৬।

এই সংস্করণটি পূর্ব্ব দুইবার অপেক্ষাও সুন্দরতর হইয়াছে।

হাস্য-কৌতুক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪র্থ বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৩৪ সাল, মূল্য বারো আনা, ৮৭ পৃষ্ঠা।

পাঠ-সঞ্চয়—প্রথম সংস্করণের বিশ্বভারতী পুনর্মুদ্রণ, ১৩৩৪। মূল্য একটাকা, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

উপরেব তিনখানি বহিই ২১৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। হাস্য-কৌতুক পুস্তকখানি বাঙলার সকল ছাত্র-ছাত্রীর পড়া উচিত। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তকে বালকবালিকাদিগের জন্য নির্দ্দোষ হাস্যরসের অবতারণা করেন। এবং এখন পর্য্যন্ত এই ধরণের কৌতুক-নাট্যের বহি আর একটিও প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ-সঞ্চয়, একটু অধিক বয়স্ক ছাত্রদের উপযোগী। রবীন্দ্রনাথ নিজে আপনার লেখা হইতে ছাত্রদের পাঠের জন্য এই সঙ্কলন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্কুলে প্রচলিত সন্দর্ভ, সোপান প্রভৃতি সংগ্রহ-পুস্তকের সহিত তুলনা করিলেই এই পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। ছাত্রদের লেখার ভাষা ও ষ্টাইল যে বয়সে নির্দ্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে সেই বয়সে নিকৃষ্ট লেখকের লেখা পড়া যে কিরূপ ক্ষতিকর তাহা বর্ত্তমান তথাকথিত লেখকদের লেখা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। সেই জন্য, সকল স্কুলে রবীন্দ্রনাথের এই পুস্তকখানি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। বাঙলা ভাষার সাহায্যে কত বিভিন্নরূপে মনের ভাব চমৎকার প্রকাশ করা যায় এই পুস্তকেই বালকেরা তাহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ দেখিতে পাইবে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ, গঙ্গার শোভা, য়ুরোপের ছবি, লাইব্রেরি, ছোটনাগপুর, উৎসবের দিন, গুপ্তধন, কাবুলিওয়ালা, ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ু-প্রবাহ প্রভৃতির ভাষা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে মানুষ একই ভাষার সাহায্যে কত অপরূপ রূপে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য এই পুস্তকখানির একখণ্ড করিয়া তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের হাতে দেওয়া।

১৩৩৪ চৈত্র

রামমোহন রায় ছাত্রাবাস ও সরস্বতী পূজা

কলিকাতার সিটি কলেজের রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সরস্বতী পূজা সম্পর্কে খবরের কাগজে উভয়পক্ষের যে-সকল কথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক-বর্গের মন উত্তেজিত হইয়া আছে। ব্রাহ্মসমাজের লোকসংখ্যা অতি সামান্য—কয়েক হাজার মাত্র। অধিকাংশ পাঠক হিন্দু *। তাঁহারা সিটি কলেজের পক্ষ হইতে লিখিত কিম্বা তাহার কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যের সমর্থন করিয়া লিখিত সব কথা কতটা ধীর ভাবে পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, বলিতে পারি না। তথাপি এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

রামমোহন রায় ছাত্রাবাস সিটি কলেজের সন্নিহিত, এবং তাহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে প্রাপ্ত সরকারী টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহা পরিচালনার ভার ও ইহার আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার সিটি কলেজকে দিয়াছেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে এই ভার বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সিটি কলেজের উপর অর্পিত হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমী ও প্রভাবশালী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশ্যন্স অনুসারে প্রত্যেক কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ নিজ নিজ ছাত্রাবাসের আভ্যন্তরীন নিয়ম প্রণয়ন করিতে অধিকারী। সিটি কলেজ এবং তাহার তত্ত্বাবধানাধীন রামমোহন রায় ছাত্রাবাস ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ মূর্ত্তিপূজার অনুমোদন করেন না। এই কারণে উক্ত ছাত্রাবাসে প্রতিমা আনয়ন ও স্থাপন করিয়া কোন উৎসব করিবার নিয়ম নাই। এইরূপ নিয়ম সিটি কলেজেরই একটি অনন্যসাধারণ নিয়ম নহে। বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই প্রকার নিয়ম আছে। পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মূর্ত্তিপূজার নিয়ম ও রীতি নাই, যদিও তৎসমুদয়ে হিন্দু ছাত্রেরা পড়েন ও তাহাদের ছাত্রাবাসে বাস করেন। দৌলতপুরের হিন্দু য়্যাকাডেমীর মুসলমান ছাত্রেরা মুসলমান ছাত্রাবাসে হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বলিদান করিতে পারেন না। আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা লিখিলাম। কিন্তু যদি ইহাতে কিছু ভুল থাকে, কিম্বা যদি আমাদের সব খবরই ভুল হয়, তাহা হইলেও সিটি কলেজের নিজের ছাত্রাবাস সম্পর্কে নিয়ম করিবার যে অধিকার আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুমোদিত।

এইরূপ কথিত ও লিখিত হইয়াছে, যে, সিটি কলেজ নিজের তত্ত্বাবধানাধীন ছাত্রাবাসে প্রতিমা স্থাপন সহকারে উৎসব করিতে না দিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের অপমান করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় এরূপ কোন অপমান করা হয় নাই, এবং তাহা কখনও অভিপ্রেতও ছিল না। যাহার উপর যে-কাজের ভার থাকে, সে তাহার ব্যবস্থা নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিবেক অনুসারে করিয়া থাকে। অন্ততঃ তাহাই তাহার

* আমরা হিন্দু শব্দটি ব্যাপক অর্থে বুঝিয়া থাকি, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগকেও হিন্দু মনে করি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে হিন্দু শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়া ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত মনে করিতেছি

করা উচিত। কেহ কোন প্রকার ভয়ে বা লাভের আশায় নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিবেকের বিরুদ্ধ বন্দোবস্ত করিলে তদ্দ্বারা সে নিজের ও নিজের ধর্ম্মসমাজের অপমান করে। পৃথিবীতে নানাবিধ ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। তাহার মানে এ নয়, যে, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় অন্য সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অপমান কবিতেছে। এবম্বিধ নানা কারণে আমরা মনে করি, যে, সিটি-কলেজের ছাত্রাবাসে মূর্ত্তিপূজা সম্বলিত উৎসব নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের কোন অপমান করা হয় নাই।

ইহার দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতাতেও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, বা তাহা হৃত হয় নাই। কারণ, কোন হিন্দু ছাত্রকেই সিটি-কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতে কখন বাধ্য করা হয় নাই, এখনও হয় না। উল্লিখিত নিয়মের অস্তিত্ব জানিয়া যাঁহার ইচ্ছা সেখানে থাকিবেন, যাঁহার ইচ্ছা থাকিবেন না। এখন যাঁহারা ঐ ছাত্রাবাসে থাকেন, তাঁহারাও উহা সহজেই ত্যাগ করিতে পারেন। ব্যক্তিগত ভাবে হিন্দুমতে সন্ধ্যা আহ্নিক আদি করিবার স্বাধীনতা সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে আছে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ঐ ছাত্রাবাসের ছাত্রদের উহার বাহিরে সরস্বতী পূজা করিবার অধিকার আছে, এবং তাঁহারা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে ও অনুমতি লইয়া তাহা করিয়া থাকেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, ছাত্রেরা তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিয়াছেন।

প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বা ছাত্র নিজ গৃহে মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক সরস্বতী পূজা বা অন্য পূজা করেন না; কেহ যদি না করেন বা না-করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মলোপ হয় না। অবশ্য যিনি ইচ্ছা করেন, সামর্থ্য থাকিলে তাহা তিনি নিজের গৃহে বা নিজের কর্ত্তৃত্বাধীন গৃহে করিতে পারেন। যদি অন্যের গৃহে বা অন্যের কর্ত্তৃত্বাধীন গৃহে তাহা করিতে চান, তাহা হইলে তাহা সেই অন্য ব্যক্তির অনুমতি ও সম্মতিসাপেক্ষ। যে-গৃহ নিজের নহে বা নিজের কর্ত্তৃত্বের, তত্ত্বাবধানের ও পরিচালনার অধীন নহে, তাহাতে নিজের মত অনুযায়ী কিন্তু তাহার কর্ত্তৃপক্ষ, তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকের মত ও নিয়মের বিরুদ্ধ কোন কাজ করিবার কাহারও আইনসঙ্গাত, ধর্ম্মসঙ্গাত, সুনীতিসঙ্গাত ও শিষ্টাচারসঙ্গাত অধিকার নাই।

আমাদের যাহা মত, তাহা বলিলাম। যাঁহারা মনে করেন, আমাদের মত ভ্রান্ত, তাঁহাদের নিজ মত ও রামমোহন ছাত্রাবাসে মূর্ত্তিপূজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার শান্ত, ধীর, নিরুপদ্রব পন্থা বরাবর মুক্ত ছিল এবং এখনও আছে। সেই পথ কি, বলিতেছি। ঐ ছাত্রাবাসে মূর্ত্তি পূজা করিবার অধিকার পূর্ব্বেই সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চাওয়া উচিত ছিল। তাহাতে কোন ফল না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের নিকট অভিযোগ করা উচিত ছিল। তাহাতে কোন ফল না হইলে ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে বা মারফতে কিম্বা একাইক গবর্ম্মেণ্টের নিকট অভিযোগ করা উচিত ছিল। তাহাতেও ফল না হইলে সিটি কলেজ ও তাহার ছাত্রাবাস বর্জ্জন করাই অধিকার-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসীদের কর্ত্তব্য হইত। কিন্তু যদি সিণ্ডিকেটের বা গবর্ম্মেণ্টের মতে ঐ ছাত্রাবাসে মূর্ত্তিপূজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে উহার নাম রামমোহন রায় ছাত্রাবাস থাকা উচিত নয় এবং সিটি কলেজের সহিত উহার সংস্রব থাকা উচিত নয়। আর যদি সিটি কলেজ তাহার কোন ছাত্রাবাসে মূর্ত্তিপূজাতে সম্মতি দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সিটি কলেজের কোন সম্বন্ধ থাকা উচিত নয়।

এস্থলে আমরা আরও একটি কথা বলা উচিত মনে করিতেছি। আমাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ মূর্ত্তিপূজার অনুমোদন না করিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিরোধিতা করিতেছেন না। যাহা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহার অনেক শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার বিধি আছে। কতকগুলিতে মূর্ত্তিপূজার বিধি আছে। কোন্ বিধি শ্রেষ্ঠ, কোন্ বিধি অশ্রেষ্ঠ, তাহা এখানে বিচার্য্য নহে। কেবল ইহাই বক্তব্য, যে কেবল মূর্ত্তিপূজাই হিন্দুধর্ম্ম, নিরাকারের উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম নহে, ইহা মনে করা ও বলা আমাদের মতে ভ্রম। যাঁহাদের মত অন্য-প্রকার এবং যাঁহারা সরল বিশ্বাসে মূর্ত্তিপূজা করেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের কোন অশ্রদ্ধা নাই। যদি তাঁহারা নিরাকারের উপাসনা অসম্ভব মনে করিয়া তাহার প্রয়াসী ব্রাহ্মদিগকে ভ্রান্ত ও মূঢ় বলিয়া অবজ্ঞা করেন বা কৃপাপাত্র জ্ঞান করেন, ধীর শান্ত ভাবে সেই অবজ্ঞা ও কৃপা ব্রাহ্মদিগকে সহ্য করিতে হইবে।

রামমোহন ছাত্রাবাসে মূর্ত্তিপূজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার বৈধ উপায় উপরে লিখিত হইয়াছে। ছাত্রেরা সে-উপায় অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ের ফলস্বরূপ তাঁহাদের সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তর ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটির উভয়পক্ষের বর্ণনা আমরা যথাসাধ্য পড়িয়াছি। ছাত্রেরা ছাত্রাবাসের বাহিরে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে সরস্বতী পূজার বন্দোবস্ত করিয়াও ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গণে আবার রাত্রে গোপনে প্রতিমা স্থাপন করিয়া নিয়মভঙ্গ করিয়াছিলেন; তাঁহারা যে রাত্রে ও গোপনে ইহা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে, যে, তাঁহারা নিয়মের অস্তিত্ব জানিতেন এবং জানিতেন, যে, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা আরও কোন কোন অবৈধ কাজ করিয়াছেন। ধীর শান্ত ভাবে নিয়মভঙ্গের শাস্তি গ্রহণ করা তাঁহাদের উচিত ছিল, এখনও উচিত।

অধ্যাপক ব্রজসুন্দর রায় মহাশয় কোন অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন কি না, তাহার বিচার করা এখন নিষ্প্রয়োজন কেন না, যদি তিনি অন্যায় কিছু করিয়া থাকেন, কিম্বা করিয়াছেন বলিয়া ছাত্রদের বিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহার জন্য প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় ও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

ছাত্রেরা যাহা করিয়াছেন, তাহা ছাত্রাবাসের বা সিটি কলেজের সকল ছাত্রের বা অধিকাংশ ছাত্রের অনুমোদিত কি না, বলিতে পারি না। তাঁহারা যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। খবরের কাগজে তাঁহাদের কার্য্যের বৃত্তান্ত প্রতিদিন বাহির হইতেছে। আমরা তাঁহাদের কোন্ কোন্ কার্য্য নিন্দনীয় মনে করি, তাহাও লিখিব না। আমরা আশা করি, তাঁহারা ধীর শান্ত ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই নিজেদের দোষ বুঝিতে পারিবেন। না পারিলে, তাঁহাদের নিজের ও দেশের ক্ষতি হইবে।

এই ব্যাপার সম্পর্কে কোন কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় লোকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। তাঁহারা ছাত্রদের কোন দোষই দেখিতে পান নাই, বরং তাহাদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ক স্বাধীনতার সমরে বীর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা বীরত্ব নহে। যাহাদের ধর্ম্মমত ভিন্ন, তাহাদিগকে অপমানিত করিলে তাহা অশিষ্টতা নহে, এরূপ মনে করা ভ্রম।

অনেক সংবাদপত্রও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন না। দুজন ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া একজনের গলায় জুতার মালা পরান হইয়াছিল, এবং অপরের মাথায় ঘোল ঢালা

হইয়াছিল— এই সংবাদ এবং সিটি কলেজে যে-সব প্লাকার্ড লাগান হইয়াছে, তাহার প্রতিলিপি অনেক কাগজে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত কাগজগুলির সম্পাদকেরা ইহার কোন নিন্দা করেন নাই। ব্রজসুন্দর-বাবুর ঘরের আলো নিবাইয়া দেওয়া, তাঁহার রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা দেওয়া, তাঁহার এবং কলেজ কৌন্সিলের সভ্যদের প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করা, ইত্যাদির সংবাদও কাগজে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহারও নিন্দা করা হয় নাই। "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্" মনে করিবার রীতি আছে বটে। আমরা তাহা করিতে চাই না। আমরা বলি, সম্পাদকেরা নিন্দা বা প্রশংসা একটা-কিছু করিলে ভাল হয়। চুপ্ করিয়া থাকা ঠিক নয়; কারণ ব্যাপারটি গুরুতর। ইহার সহিত দেশের ভবিষ্যতের সম্পর্ক আছে। ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে যাহা কিছু করা হয় তাহাই প্রশংসনীয়, কাহারও মনের ভাব এরূপ থাকিলে, তাহাও বলিয়া ফেলা উচিত।

আমি ব্রাহ্ম, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বা অন্য কোন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নহি। সিটি কলেজের সহিতও আমার এখন কোন সম্পর্ক নাই। সেইজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ও সিটি কলেজকে কোন পরামর্শ দিবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু সম্পাদকরূপে যেমন অন্য অনেক বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়া থাকি, এই বিষয়েও তেম্‌নি লিখিলাম। আমার ধারণা এই, যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সিটি কলেজ যদি ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গতভাবে চালান হয়, এবং এরূপ একটি কলেজের যদি প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান ছাত্র সকলে উহা ছাড়িয়া গেলেও ভবিষ্যতে ছাত্র পাওয়া যাইবে। বঙ্গের সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং অন্য সব লোক সিটি কলেজের বিরোধী, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। যদি তাহাই হয় এবং একজন ছাত্রও না পাওয়া যায়, সিটি কলেজ উঠিয়া যাইবে। তাহাতেও ক্ষতি নাই। যদি অল্প ছাত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে কলেজ চালাইবার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারিবে। কোন-প্রকার চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার বশবর্ত্তী না হইয়া বিবেকানুমোদিত কাজ করিয়া চলিলে তাহার ফল নিশ্চয় শুভ হইবে।

অনেক দিন হইতে দেশে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপন করিবার জন্য, কমিটি-কন্‌ফারেন্স্ আদির আয়োজন হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা সেইসকল চেষ্টায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ছাত্রদিগকে সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য বীর বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা সংখ্যায় নগণ্য। তাহারা মার-পিট দাঙ্গা করে না, করিতে চায় না, করিতে পারে না। ব্রাহ্মে ও হিন্দুতে অসদ্ভাব থাকিলে সেই ব্যপদেশে গবর্ন্মেন্টের স্বরাজ না দিবার একটা কারণও বাড়িবে না। সুতরাং ব্রাহ্মদিগকে খুশি করিবার কোন কারণ নাই। আমরাও দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিবার জন্য কোন প্রকার ঘুষ চাই না। স্বাধীন ভারতে নগণ্য সংখ্যান্যূন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অবিচার অত্যাচার উৎপীড়ন হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে সংখ্যাবহুল শ্রেণীরা অন্যায় কিছু করিলে তাহারও প্রতিবাদ করিতে থাকিব।

ভিন্ন কলেজের কোন কোন অধ্যাপক সিটি কলেজের এই ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের উৎসাহদাতা হইয়া অত্যন্ত অশোভন কাজ করিয়াছেন। আমরা মৃদুতম বিশেষণই প্রয়োগ করিলাম।

"হিন্দুদের কোন আত্মসম্মান নাই"

এই শিরোনাম দিয়া খবরের কাগজে সিটি কলেজ কৌন্সিল সম্বন্ধে একটি মিথ্যা অপবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখা হইয়াছে, "গত বৃহস্পতিবার ছাত্রগণ সংবাদ পায় যে, কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ কলেজ কৌন্সিলের এক সভায় এই মর্ম্মে এক মন্তব্য করিয়াছেন, যে, হিন্দুদের কোন আত্মসম্মানজ্ঞান নাই; তারা শীঘ্রই আবার কলেজে ফিরিয়া আসিবে।" আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, যে, কৌন্সিলে হিন্দুদের আত্মসম্মান-জ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথাই হয় নাই; এই মর্ম্মের কথা হইয়াছিল, যে, ছাত্রেরা উত্তেজনার সময় অনুপস্থিত থাকিলেও, কলেজ খুলিবার পর অনেকে কলেজে আসিবে। বাস্তবিকও অন্যান্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এইরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। মানুষ উত্তেজনার সময় যাহা করে, ধীরভাবে বিবেচনার পর অনেক সময় তাহার বিপরীত আচরণ করে। ইহা মানবচরিত্রের উৎকৃষ্ট দিক্‌টিরই পরিচায়ক। একগুঁয়েমি করিয়া ভ্রমে পড়িয়া থাকা সদ্‌গুণের পরিচায়ক নহে। যাহা হউক, এপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাও এস্থলে অনাবশ্যক। কারণ কৌন্সিলে হিন্দুদের আত্মসম্মান-জ্ঞান বিষয়ক কোন কথাই উঠে নাই। দুটি কারণে তাহা উঠিতে পারে না। প্রথম, কৌন্সিলের সমুদয় ব্রাহ্মসভ্য হিন্দুবংশজাত; দ্বিতীয়, কৌন্সিলে হিন্দু সভ্যও আছেন। কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপক হিন্দু ও ভাইস্-প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ মহাশয় হিন্দু।

সিটি-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধে আরও অনেক মিথ্যা কথা কাগজে বাহির হইয়াছে। 'প্রবাসী' দৈনিক কাগজ হইলেও সবগুলার প্রতিবাদ করা দুঃসাধ্য হইত; মাসিকের পক্ষে ত তাহা অসাধ্য।

কলেজের যে কেহ যাহা বলিতেছেন, করিতেছেন বলিয়া কাগজে বাহির হইতেছে, সমুদয়েরই দোষ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ বা ব্রাহ্মসমাজের ঘাড়ে চাপান উচিত নহে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটি কাগজে দেখিলাম, ভাইস্-প্রিন্সিপাল কালীপ্রসন্নবাবুর সহিত না কি রাস্তায় দণ্ডায়মান ছাত্রদের পুলিস-ডাকা সম্বন্ধে কথা কাটাকাটি হইয়াছিল। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পুলিস্ ডাকিবার কথা তিনি নিজের দায়িত্বে বলিয়া থাকিবেন। আমরা অবগত হইয়াছি, যে, সিটি-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুলিসের সাহায্য লইবার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা ত প্রকাশ করেন নাই, বরং প্রিন্সিপাল মহাশয় উত্তেজনা ও প্রয়োজনের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বরাবর পুলিসের সাহায্য লইতে বিরত আছেন। তবে, যদি ভবিষ্যতে কোন কোন ছাত্রের নিজেদের কাজের ফলস্বরূপ নিকটবর্ত্তী থানা হইতে পুলিস স্বয়ং আসিয়া পড়ে, তাহার জন্য তাহারাই দায়ী হইবে। কিন্তু এরূপ কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা কম।

১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ

সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী-পূজা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কিত সিটিকলেজের অধীনের একটি ছাত্রাবাস আছে, ঠিক সেই জায়গাটাতেই মূর্ত্তিপূজা করাই চাই ব'লে সেখানকার একদল ছাত্র রুখে দাঁড়িয়েচে। এ কাজ ঠিক এইখানটাতে ব'সে না কর্‌লেই যে হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা হয় না তা সত্য নয়, অথচ ধর্ম্মের নামে বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের মনে এতে ক'রে অনাবশ্যক আঘাত দেওয়াতে অধর্ম্মই ঘটে, এমন কথা বলা চলে। একথা বল্‌লেও অন্যায় হয় না, যে, অপর পক্ষকে অপদস্থ কর্‌বার উদ্দেশে কৌশলে দেবতাকে ব্যবহার কর্‌লে তাতে দেবতার পূজা হয় না, অসম্মানই হয়। বস্তুত, এ যেন, যার উপরে রাগ আছে তাকে বেদনা দেবার জন্যে, নিজের দেবতাকে লাঠির মতো ক'রে তোলা। এতে দেবী সরস্বতী প্রসন্ন হ'তে পারেন এমন কথা যারা মনেও কর্‌তে পারে সরস্বতীর 'পরে তাদের শ্রদ্ধা নেই। যাইহোক, এ স্থলে কোনো তৃতীয়পক্ষ কর্ত্তব্যেব অনুরোধে যুক্তির দোহাই দিতে যদি সাহস করে তবে সেও যে এই উত্তেজিত ছাত্রদলের কটু ব্যবহারের লক্ষ্যবর্ত্তী হবে তাতে সন্দেহ নেই। বিরোধের যে-ক্ষেত্রে যুক্তিবিচার অপেক্ষা রূঢ় আচরণই প্রবল, সেখানে মাথা পাততে কারো সহজে ইচ্ছা হয় না। কেননা, এই অস্ত্র সকলের হাতে নেই।

কিন্তু এমন নয় যে, ব্যাপারটা কলেজ-বিশেষের অধ্যক্ষদের সঙ্গে ছাত্রদের একটা সামান্য ব্যবহারঘটিত দ্বন্দ্ব মাত্র। এই ঘটনাটির মূলগত যে নীতি, তার গুরুত্ব কোনো একটি সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয়। এমন স্থলে নিজের সম্বন্ধে অপ্রিয়তা ও অশান্তির আশঙ্কা ক'রে চুপ ক'রে থাকা অকর্ত্তব্য হবে।

যে-ধর্ম্মভেদ নিয়ে য়ুরোপে একদিন সাংঘাতিক বিবাদ ঘটেছিল সেই ধর্ম্মভেদটি আজও সেখানে আছে, কিন্তু তার বিবাদ গেছে ঘুচে। গেছে ব'লেই সেখানকার জনসাধারণের পক্ষে সামাজিক সুব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। পরস্পর ভেদ থাকা সত্ত্বেও যে শুভবুদ্ধির প্রভাবে পরস্পর বিবাদ থাকে না সেইটিই স্বরাজ-সাধনার বুদ্ধি। পরস্পরের বিহিত সীমাকে স্বীকার ক'রে আত্মসংযমের চর্চ্চার দ্বারাই স্বরাজ সত্য হয়ে ওঠে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভারতবাসীর মধ্যে ধর্ম্মভেদ অন্য সকল দেশবাসীর চেয়ে অনেক বেশি। সেই ভেদকে আশ্রয় ক'রে পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্গতি লাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। এইজন্যে আমাদের দেশেই অত্যন্ত সাবধানে এমন শুভ বুদ্ধির নিয়ত চর্চ্চা করা দরকার, যাতে ক'রে ধর্ম্মকেই অনৈক্য সংঘটনের প্রবলতম উপায় ক'রে না তোলা হয়।

ঐ কথাটা আমরা খুবই জানি, সর্ব্বদা ব'লেও থাকি, এবং রাষ্ট্র-সভায় এ নিয়ে আমরা আশ্চর্য্য ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করি, বিশেষ ভাবে যেখানে হননক্ষম কোনো এক পক্ষ দারুণ বলশালী। অথচ এই নীতিকে ব্যবহারে প্রকাশ কর্‌বার উপলক্ষ্য ঘট্‌বামাত্র যখন অন্যথা দেখতে পাই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারি কোন্ বাধা আমাদের চিত্ত বৃত্তির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠভাবে নিহিত যা'তে ক'রে আমাদের জনসাধারণ সর্ব্বজনীন লোকহিতের জন্যে কোনো মতেই ব্যূহবদ্ধ হ'তে পার্‌চে না।

অনেক মানুষ যেখানে একত্র বাস করে সেখানে সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি ও রাষ্ট্রিক মুক্তি লাভেই হচ্চে সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। এই সার্থকতা লাভ ও রক্ষার জন্যে সকল বড়ো জাতিই তপস্যা করে।

মানুষের এমন অনেক অপগুণ আছে যেগুলি শনির মতো, কলির মতো এই তপস্যাকে নষ্ট কর্‌বার জন্যে কেবলি ছিদ্র সন্ধান কর্‌তে থাকে। তার মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো অপগুণ হচ্চে নিজের মত ও নিজের রুচির অসংযত সংঘাতের দ্বারা অন্যের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ ক'রে আত্মশ্লাঘা সম্ভোগের উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা, বিশেষত সেই দুষ্প্রবৃত্তিকে ধর্ম্মনামে ঘোষণা ক'রে ধর্ম্মের অবমাননা। যে বিশেষ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবের অধিকার, সেখানে দেবীপূজাকালে বলপূর্ব্বক পশু বলি দিলেই শাক্তের ধর্ম্ম রক্ষা হয় এমন নীতিকে যদি কোনো শাক্ত গ্রহণ করে তবে ধর্ম্মের বাহ্য অঙ্গ রক্ষার চেষ্টায় তার আন্তর সত্যকে আঘাত করা হয়, আর, সেই আঘাতে সমাজস্থিতির কঠিন পীড়া ঘটে। এমনতরো উপলক্ষ্যে গায়েব জোরে এবং মানুষকে অপমান কর্‌বার অকুণ্ঠিত প্রবৃত্তির জোরে আক্রমণকারী দলের জিৎ হ'তে পারে, কিন্তু এই জিৎ কি সত্যকার জিৎ? এই নিয়ে খোল বাজিয়ে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যঙ্গ ক'রে আস্ফালন কর্‌লে তাতে কি ভদ্র সমাজের গৌরবরক্ষা হয়? বিনা নিন্দায় যে-দেশে এমনতরো গর্হিত অত্যাচার সহজে সম্ভবপর হয় সেদেশের পক্ষে কি আশঙ্কার কারণ নেই?

পরস্পরের ধর্ম্মের ক্ষেত্রকে উপদ্রবের দ্বারা বিঘ্নযুক্ত করা হিন্দুব ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ, একথা আমরা চিরদিন গৌরব ক'রে ব'লে আস্‌চি। এই জন্যেই সম্প্রদায়বহুল ভারতবর্ষে হিন্দুরা পরধর্ম্মকে নির্ব্বিকার চিত্তে স্থান দিয়েছে, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে নিজে গায়ের জোরে অনধিকার-প্রবেশ করেনি। হিন্দু বলে, পূজক-ভেদে পূজা-বিধি স্বতন্ত্র; হিন্দু বলে, প্রত্যেক ভক্তের বিশেষ পূজাক্ষেত্রে তার বিশেষ পূজার নিয়ম: সেই নিয়ম পালনেই ভক্ত ও ভগবানের পরিতৃপ্তি। হিন্দু বলে, সেই পূজাক্ষেত্রে যদি অন্য সম্প্রদায়ের কেউ ছলে-বলে-কৌশলে পূজাবিধির ব্যভিচার ঘটায় তবে তার দ্বারা, যিনি সর্ব্বসম্প্রদায়ের ভগবান, তাঁরই অসম্মান ঘটে। এই কথাই যদি সত্য হয়, তবে বল্‌তেই হবে যে, কেবল মাত্র পূজানুষ্ঠানের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্মরক্ষা হয় না, সেই সঙ্গে সেই অনুষ্ঠান অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি পীড়ন না ক'রে সাত্ত্বিক ভাবে স্বক্ষেত্রেই হওয়া চাই; তার অন্যথা যে করে সে "স্বাধিকার-প্রমত্ত" হ'য়ে আপন দেবপূজা দ্বারাতেই আপন দেবতার কাছ থেকে নির্ব্বাসিত হয়।

এই তো ধর্ম্মের নিয়ম, এ হোলো সকলের উপরে। আরো নীচে আসা যাক্। সেখানে ভদ্রসমাজের পক্ষে ভদ্রতার নিয়ম ব'লে একটি মূল্যবান জিনিষ আছে। কোনো বিশেষ ধর্ম্মসমাজ যে-বিদ্যালয়ের পরিচালনা করেন সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রের গায়ে প'ড়ে সেই সমাজের লোকদের ধর্ম্মবিধিকে আঘাত কর্‌বে না, এটা আর কিছু না হোক, ভদ্রপ্রথা। তাও মান্‌বার ধৈর্য্য যদি কারো না থাকে, তবে লোকালয়ের বাহ্য-শাসন আপনিই এসে পড়ে। লোকালয় তার বিচিত্র অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি রক্ষা ক'রে নিজের ব্যবস্থা পালনের উদ্দেশে কতকগুলি শাসনবিধি প্রবর্ত্তন করেচে, যার ভয়ে পরস্পরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন কর্‌বার স্বাধীনতা কেউ নিজের হাতে জোর ক'রে নিতে পারে না। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব হিন্দু ছাত্র আছে তারা যদি আপন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অভিমানে বলে বা ছলে, গভীর রাত্রে বা মধ্যদিনে, সেই বিদ্যালয় সম্পর্কীয় কোনো বিভাগে কালীপূজা করে তবে সেটা যে কেবল মাত্র ধর্ম্মনীতি ও ভদ্ররীতি-বিরুদ্ধ হবে তা নয়,—সেটা হবে অবৈধ, অর্থাৎ কোনো সভ্য লোকালয় আত্মরক্ষার খাতিরেই তাকে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। এমনতবো জবরদস্তি যিনি কর্‌তে যাবেন, ভদ্রাচারের ব্যত্যয়ে কেবল যে অন্তরের দিক থেকে তাঁর লজ্জার কারণ ঘট্‌বে তা নয়, লোকালয়-বিধিলঙ্ঘন জন্য বাইরের দিক থেকেও তাঁর শান্তির কারণ ঘট্‌তে বাধ্য।

তাহ'লেই কথা উঠবে, রামমোহন হস্‌টেলে সরস্বতী পূজা অবৈধ কি না। এই হস্‌টেল প্রথম থেকে যাঁদের পরিচালনার অধিকারবর্ত্তী, তাঁরা বল্‌চেন সেটা অবৈধ। বলা বাহুল্য, যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্চে তাঁদের ধারণা ভুল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁদের বিধানই অগ্রগণ্য। ছাত্রেরা যদি সে-বিধান অস্বীকার করে

তবে বৈধ প্রণালীতেই কর্‌তে হবে। অর্থাৎ এর শেষ মীমাংসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা আদালতে, কখনোই ছাত্রদের গায়ের জোরে নয়। আমার কলকাতার বাড়িতে যদি গণনা ক'রে দেখি তবে সম্ভবত দেখা যাবে নানা কর্ম্ম উপলক্ষ্যে যারা সেখানে আছে, তারা আমার আত্মীয়বর্গের চেয়ে সংখ্যায় বেশি—এবং মুসলমান বাদ দিলে তাদের অন্য সকলেই নিজের সমাজে প্রতিমা পূজা করে। যদি হঠাৎ তাদের মনে বিশ্বাস জাগে যে, আমাদের দালানে দেবীপূজা কর্‌বার বৈধ অধিকার তাদের আছে এবং দেশের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধার্ম্মিক বা ব্যক্তিগত যে-কোনো কারণেই হোক তাদের সেই বিশ্বাসে প্রশ্রয় দেন তবে গায়ের জোর থাক্‌লে আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে অপমানিত ক'রে এর মীমাংসা তারা নিজের হাতেই নিতে পারে, কিন্তু সেটাকে কি সভ্যসমাজের প্রথা বলা চল্‌বে? কিম্বা তাতে কি ভাবী স্বরাজের উৎকৃষ্ট নমুনা পাওয়া যেতে পারে? রুচি প্রত্যেকের নিজের, চরিত্র নিজের, ভদ্রতাবোধ নিজের, ধর্ম্ম নিজের, বুদ্ধি নিজের, স্বভাবে যদি না বাধে তবে এদের সম্বন্ধে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক যা খুসি করা চলে। কিন্তু আইন তো প্রত্যেকের নিজের গড়া হ'লে চলে না; গোবরের জলে, জুতার মালায় বা লগুড়াঘাতে তাকে নিজের ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে প্রমাণিত কর্‌বার ব্যবস্থা কোনো ভদ্রসমাজে নেই।

অবশ্য, এমন অবস্থা কল্পনা করা যেতে পারে যখন অসুবিধা বা বিপদ স্বীকার ক'রেও আইন লঙ্ঘন করাই কর্ত্তব্য। যদি বলি বর্ত্তমান ব্যাপারে সে-কথা খাটে, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ব্রাহ্মসামাজিক বিদ্যালয়ের হস্‌টেলেও ছাত্রদেরকে মূর্ত্তিপূজায় বাধা দেওয়া বৈধ হ'লেও সেটা উচিত হয় না। না হয় তাই মেনে নিলাম, কিন্তু এই ঔচিত্য কেবল সিটি কলেজের সীমানার মধ্যেই একান্ত অবরুদ্ধ কর্‌লে তো চল্‌বে না। তাহ'লে ধর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হিন্দু বিদ্যালয়ের হস্‌টেলে বা প্রাঙ্গণে মুসলমান ছাত্রদেরকেও কোরবানী কর্‌বার উদ্যোগে বাধা দেওয়া অনুচিত হবে। হিন্দুর আশ্রমে কোরবানীতে পাছে হিন্দুর ধর্ম্মরীতিতে ও তার হৃদয়ে অযথা আঘাত দেওয়া হয় এইজন্যেই নিষেধের বিধি। ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে জোর ক'রে মূর্ত্তিপূজাতেও ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করে, একথা সবাই জানে। তবু জেদের তর্কটা এই হ'তে পারে যে, আঘাত লাগা উচিত ছিল না। জেদের তর্ক মুসলমানও তুল্‌তে পারে, বল্‌তে পারে যে, কোরবানীতে হিন্দুদের ক্ষুব্ধ হ'বার সঙ্গত কারণ নেই। কেন না ধর্ম্মকর্ম্মে যে-মহিষকে হিন্দু উৎসাহের সঙ্গে বলি দেয় সে মহিষ গোরুর মতোই দুধ দেয়, চাষবাসে সাহায্য করে, ভার ব'য়ে নিয়ে যায় এবং জীবহিংসার বাহ্য পরিমাণ অনুসারে মহিষ-হিংসা গো-হিংসার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। বিরুদ্ধ পক্ষ বৈদিকযুগের নজিরের দ্বারা তর্কটার সমর্থন করাও সঙ্গত মনে কর্‌তে পারে। কিন্তু জেদের তর্কে হারজিৎ যাই হোক্ তাতে ব্যবহারক্ষেত্রে আঘাত বেদনার লাঘব হয় না।

শুনেছি এমন কথা কেউ কেউ বলেচেন যে, সরস্বতীপূজার প্রসঙ্গে কোরবানীর তুলনা তোলা উচিত নয়। মনে রাখা উচিত, এ তুলনা আমি তুলিনে। যে মুসলমান আপন শাস্ত্রমতে গোমেধকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে পালনীয় মনে করে সেই মুসলমান প্রতিমাপূজাকে ঈশ্বরের ভাবমাননা ও গর্হিততম অধর্ম্ম ব'লেই জানে। গো-হত্যাকারীকে হিন্দুরা যত বড়ো শাস্তি দিতে বা নিষেধ কর্‌তে প্রস্তুত, মূর্ত্তিপূজককেও নিষ্ঠাবান মুসলমান তত বড়ো শাস্তি দিতে বা নিষেধ কর্‌তে ইচ্ছা করে। এমন কথা কোনো মুসলমানের মুখে শোনা গেছে যে, হিন্দুরা গোরুকে হিংসা করা পাপ বলে, কিন্তু যে-মূর্ত্তিপূজার দ্বারা স্বয়ং ঈশ্বরের হিংসা করা হয় তার পাপের সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই চলে না। মূর্ত্তিপূজা করা ও তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধ সম্বন্ধে মুসলমানের মনে যে প্রবল ঘৃণা ও বাধা দেবার প্রথা আছে তাদের ইতিহাসে তার প্রমাণ রক্তের অক্ষরে লিখিত। অতএব এই প্রসঙ্গে হিন্দুর

সরস্বতী পূজার পাশাপাশি মুসলমানের কোরবানীর উল্লেখ করা অসঙ্গত নয়।

যাহোক্ যাঁরা আজ বল্‌চেন, অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারস্থলে স্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিধি জোর ক'রে খাটিয়ে পরের দুঃখ ও ক্ষতি ঘটিয়েও ধর্ম্মরক্ষা করা শ্রেয়, তাঁদের উচিত হবে সর্ব্বাগ্রে মুসলমান ও খৃষ্টানদের অধিকার-সীমার মধ্যে প্রতিমা নিয়ে এই ধর্ম্মসাধনা করা। কারণ সাহসিকতা দেখাবার এত বড়ো সুযোগ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে কোথাও নেই। উত্তরে অপর পক্ষ এমন কথা বল্‌তে পারেন যে, যেখানে শক্তি নেই সেখানে কর্ত্তব্যও নেই, কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রতি অনায়াসে জোর খাটানো চলে অতএব সেখানে ধর্ম্মের নামে জোর খাটাবই।

আমাদের দেশে বরযাত্রীরা প্রায়ই নিরুপায় কন্যাকর্ত্তার অতিথিরূপে তাকে অন্যায় উৎপীড়ন ক'রে থাকে। তাতে প্রমাণ হয়, যেখানে নিরাপদে জোর খাটাতে পারি সেখানে উপদ্রবের দ্বারা অন্যকে অপদস্থ ক'রে নিজের প্রভুত্ব প্রমাণ করাতে আমাদের আনন্দ। এই মনোবৃত্তিকে গৃহস্থের ঘরে, বা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বা রাষ্ট্রিক দলাদলিতে যদি আমরা সর্ব্বদা প্রবল হ'তে দেখি, যদি দেখি, পরের মতকে গায়ের জোরে চাপা দিতে, পরের বৈধস্বাতন্ত্র্যকে অবৈধ উপদ্রবের দ্বারা বিপর্য্যস্ত কর্‌তে আমাদের সঙ্কোচ নেই, তবে সেটা কি গভীর উদ্বেগের বিষয় নয়? প্রতিমাপূজার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও যে-সিটিকলেজকে দেশের সকল সম্প্রদায় অনায়াসে এতকাল স্বীকার ও ব্যবহার ক'রে এসেছে আজ তাকে নানা উৎপাতে ধ্বংস ক'রে দেওয়া দুঃসাধ্য না হ'তে পারে, কিন্তু এই আঘাতে আমাদের দেশের এক সম্প্রদায়ের মনে যে কাঁটা-গাছ রোপণ ক'রে দেওয়া হবে, সেটা নিয়ে আমাদের এই শতধাবিচ্ছিন্ন দুর্ভাগা দেশে আস্ফালন করাতে কি পৌরুষ আছে, না, তাতে ধর্ম্মবুদ্ধি বা কর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়? সবশেষে এঁদের কাছে আমার এই বক্তব্য, নীতিকথা যখনযেমন সুবিধা তখন তেমন ক'রে বলা চলে না। পরের প্রতি আমার ব্যবহারে ও আমার প্রতি পরের ব্যবহারে কর্ত্তব্যনীতির পার্থক্য করা অসঙ্গত। ভারত রাজ্যশাসন যাঁদের হাতে তাঁরা খৃষ্টান,—জোর আমাদের সকল পক্ষের চেয়েই তাঁদের বেশি। সেই সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি খৃষ্টানের অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষের অভাব নেই। তৎসত্ত্বেও খৃষ্টান কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের গৃহে, দেবালয়ে, বিদ্যায়তনে জোর ক'রে খৃষ্টান উপাসনাবিধির প্রবর্ত্তন করেননি। যদি কর্‌তেন তাহ'লে বিলাতী ভাটপাড়ার অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টান পণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ শাসনকর্ত্তাদেরকে শাস্ত্র আউড়িয়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবু সেই পবিত্র আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'য়েও তাঁরা ভারতবর্ষের অখৃষ্টান সম্প্রদায়ের পূজাধিকার-ক্ষেত্রে নিজের পূজাকে বলবান কর্‌তে চাননি। যাঁরা গোবরজল, পাঁক ও পানের পিকবর্ষণ, জুতোর মালা ও লগুড়াঘাতের সাহায্যে তাঁদের পবিত্রধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর্‌বার পৌরুষ প্রকাশে উদ্যত ও এই রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ে দেশাত্মবোধী ধার্ম্মিকদের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্চেন, অন্তত বাধা বা লেশমাত্র তিরস্কার পাচ্ছেন না, একান্তমনে আশা করি, তাঁদেরই শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ গুরুদের কাছ থেকে আমাদের ম্লেচ্ছ কর্ত্তারা যেন ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ না করেন।

সিটি-কলেজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিঠি

মডার্ন রিভিয়ুতে সিটিকলেজ-ঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে আমার যে-মন্তব্য বেরিয়েছে তার উত্তরে একটা অদ্ভুত তর্ক শুন্‌তে পাচ্ছি। কেউ কেউ বল্‌চেন, ছাত্রেরা বেতন দিয়ে হোস্টেলে বাস করে, তাদের সঙ্গে এমন কারো অধিকারের তুলনা হয় না যাঁরা বিনাব্যয়ে কারো বাড়ীতে থাকেন। এ সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কথা এই যে—

(১) সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহ করেচেন তাঁদের প্রধান বর্গেরই মধ্যে কেউ কেউ হস্‌টেলবাসের অথবা অধ্যয়নের জন্যে কিছুই দেননি। এমন কি, কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ অনেকে তাঁদের আনুকূল্যই করেচেন।

এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, এরকম আনুকূল্যের দ্বারা ছাত্রদেরকে অসম্মানিত করা হয়, এটা কর্ত্তৃপক্ষদেরই অপরাধ। এইরূপ অসম্মানিত চিত্তের বিরুদ্ধতা অপরিমিত উত্তেজনার আকারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কলেজের বদান্য কর্ত্তৃপক্ষের এইটেই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত। এটা তাঁদের কর্ম্মফল।

(২) বেতন দিয়ে হস্‌টেলে বাসের অধিকার স্বভাবতই সঙ্কীর্ণ। বেতন দিয়ে ক্লাসে পড়ার মতোই তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কোনো ছেলে ক্লাসে গিয়ে নৃত্যগীত কর্‌লে অধ্যাপক তাকে বিদায় ক'রে দিতে পারেন সে ছেলে বেতন দেওয়া সত্ত্বেও। ভাড়া দিয়ে যারা কোনো বাড়ীতে থাকে তারা মদ খেয়ে মাৎলামি কর্‌লেও বাড়ীওয়ালা তাকে জবাব দিতে পারে না; কারণ ভাড়াটে বাড়ী কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু বেতন দিয়েচে ব'লেই হস্‌টেলের নিয়ম লঙ্ঘন করার অধিকার কারো নেই। হস্‌টেলবাস অনেকটা রেলগাড়ীর যাত্রী হওয়ার মত ভাড়া দিলেও এবং সকল যাত্রী একমত হ'লেও গাড়ী নিজের নিয়ম অনুসারেই চলে, যাত্রীদের খেয়ালমত চলে না।

(৩) গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক লোক বাস করেন, যাঁরা সেখানে বাস কর্‌বার অধিকার পান কর্ম্মদানের পরিবর্ত্তে। বস্তুত তাঁরা অমনি থাক্‌তে পান না, কাজের বদলে তাঁদের থাক্‌বার দাবী আছে। যদি বাড়ীতে থাক্‌তে না পেতেন তবে বেতনে সেই অভাব পূরিয়ে দিতে হ'ত। অতএব প্রকৃতপক্ষে তাঁরা বেতনের এক অংশ দিয়েই গৃহস্থের বাড়ীতে থাক্‌তে পান। কিন্তু তাই ব'লে তাঁরা সেই গৃহস্থের দালানে নিজের সাম্প্রদায়িক পূজা কর্‌তে না পেলে হিন্দুধর্ম্মই বিপন্ন হয়, এমন অদ্ভুত কথা কেউ বল্‌তে পারে না। হিন্দু ধর্ম্মের যদি এই প্রকৃতিই সত্য হয় তবে এ দেশে যারা অহিন্দু বাস করে, তাদের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ আছে বল্‌তে হবে।

এমন কথাও কেউ কেউ বলেচেন, এই ব্যাপারে ধর্ম্ম বিরোধটা গৌণ। তাঁরা বলেন, সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের কতকগুলি গলদ ক'রে বসেচেন ব'লেই এই কাণ্ডটা ঘটেচে। প্রথমত, আমি জানিনে তাঁদের ব্যবহারে ত্রুটি কি ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, যদি কিছু ঘ'টে থাকে সেটা স্বতন্ত্র নালিশের অন্তর্গত। তার বোঝাপড়ার মধ্যে হস্তক্ষেপ কর্‌তে পারি এমন ইচ্ছা এবং অবকাশ আমার নেই। যারা সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে ত্রুটি দেখ্‌চেন তাঁরা ছাত্রদের কোনো ব্যবহারে কোনো ত্রুটি দেখ্‌চেন না। ছাত্রেরা হেরম্ববাবুর মতো মান্যলোকের গায়ে পানের পিক, গোবরের জল সিঞ্চন ক'রে উল্লাস প্রকাশ করেচে; যে-ছেলেরা সিটি কলেজে পড়্‌তে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে অবমাননা ও দৈহিক দণ্ডবিধানের ভয় দেখিয়ে পরের ন্যায্য অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ পূর্ব্বক নিরস্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চে, অথচ এইসমস্ত রূঢ় আচরণ ও উপদ্রব সম্বন্ধে ছাত্রহিতৈষীরা কোনো কথা বলেন না। আমিও বল্‌তে চাইনে। আমার আলোচনার প্রধান বিষয়টি হচ্ছে পূজার অধিকারের সীমা নিয়ে। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে এর চেয়ে গুরুতর বিষয় আর কিছুই নেই। অথচ যাঁরা ভারতে

রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তিসাধনকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেচেন তাঁরাও যখন প্রকাশ্য এই ধর্ম্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্বরাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি প্রকাশ কর্‌তে কুণ্ঠিত তখন স্পষ্টই দেখ্‌চি, আমাদের দেশের পলিটিক্স্‌ সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, দুর্ব্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ কর্‌বার পথেই দাঁড়িয়েছে। পরের সমালোচনা করার চেয়ে নিজের লোকদেরকে কঠোর অনুশাসনে ন্যায়ের পথে নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার কাজটাই স্বরাজ্যসাধনের গুরুতর কর্ত্তব্য,—এর অপ্রিয়তা স্বীকার করা জেলখানায় যাওয়ার চেয়ে অনেক বড়ো। যে-কোনো কারণেই হোক, তাতে যখন শৈথিল্য দেখি তখন কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌তেই হয়, বাইরের শত্রুর চেয়ে বড়ো শত্রুকে অন্তরে দেখ্‌লুম—রাষ্ট্রসাধনায় জয়লাভ করার পক্ষে এইটে সব-চেয়ে দুর্লক্ষণ।

২৩ বৈশাখ, ১৩৩৫ — শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩৫ ভাদ্র

সিটি কলেজে মিটমাট

সিটি কলেজ সমস্যার উপযুক্তরূপ সমাধান হইয়া যাওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। যে সময়ে বাংলার সমগ্র হিন্দুজাতি একজোট হইয়া সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, সেই সময়ে এরূপ একটা বিসদৃশ ঘটনা ঘটিয়া আমাদের বিশেষ চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, বহু অন্ধ বা স্বার্থান্বেষী প্রাচীনপন্থী লোক এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া যুবকমহলে নেতার আসন গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং সামাজিক বিষয়ে তাঁহাদিগের মতামত বর্ত্তমানকালের উন্নতিশীল হিন্দুর আদর্শের বিরুদ্ধ হওয়াতে যুবকদিগের দ্বারা তাঁহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ সুফলপ্রদ না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক ছিল। যাহা হউক বিষয়টির মীমাংসা হইয়া যাওয়ায় এই আশঙ্কা বহু পরিমাণে দূর হইয়াছে। যে যে সর্ত্তে এই মিটমাট হইয়া গেল, তাহা নিম্নলিখিতরূপ :—

(1) The City College authorities recognise the right of boarders of all communities including the Hindus to perform their worship according to their faith in the Ram Mohun Roy Hostel; but in view of differences of religious opinions and principles of the boarders and the College authorities, out of mutual deference to the religious views and feelings of each other, agree and decide that no public celebrations of communal forms of worship will at any time take place within the precincts of the Ram Mohun Roy Hostel.

(2) The City College authorities accept the offer of the City College Professors' Union to provide a place of worship near the Ram Mohun Roy Hostel where Hindu boarders of the Hostel will have full facilities for the performance of their religious observances and also to raise funds to place the arrangements on a permanent basis, so that no financial burden shall ever have to be borne by the students of the Hostel. Mr. S. M Bose in his personal capacity will see that the above arrangements are given effect to.

(3) If any other College Hostel or Mess exists or is, in future, started by the College authorities specially for Hindu students, unrestricted liberty of worship will be permitted there.

(4) The students express regret for any excess they may have committed in connection with the dispute.

(5) The City College authorities are sorry if any one among their staff has hurt the religious feelings of the Hindu students on any occasion.

অর্থাৎ

১। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যদিও রামমোহন রায় হষ্টেলে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগের (হিন্দুদিগেরও) নিজ নিজ ধর্ম্মমতানুসারে পূজা করিবার অধিকার স্বীকার করেন, তথাপি ছাত্র ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের পার্থক্য থাকায় ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষ পরস্পরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ, একমত হইয়া স্থির করিতেছেন যে, রামমোহন রায় হষ্টেলের সীমানার মধ্যে কোন সময়ে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক পূজা হইতে পারিবে না।

২। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ সিটিকলেজের প্রফেসার্স ইউনিয়নের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রফেসার্স ইউনিয়ন রামমোহন রায় হষ্টেলের হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য নিজের খরচে হষ্টেলের বাহিরে একটি পূজার স্থান ঠিক করিয়া দিবেন এবং যাহাতে বরাবর এই ব্যবস্থা থাকে এবং এই জন্য ছাত্রদিগকে অথবা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে না হয় তাহার জন্য একটি ফণ্ড খুলিবার চেষ্টা করিবেন। শ্রীযুক্ত এস এম, বসু ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যবস্থা অনুসারে যাহাতে কাজ হয়, তাহা দেখিবেন।

৩। যদি কখন সিটি কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য বিশেষ কোন ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন বা যদি এইরূপ কোন ছাত্রাবাস বর্ত্তমানে থাকে তাহা হইলে সেই ছাত্রাবাসে পূজার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইবে।

৪। ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ও সত্যাগ্রহ কালে কোনও বাড়াবাড়ি করিয়া থাকিলে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

৫। সিটি কলেজের কোন শিক্ষাদাতা যদি কোন ভাবে কোন ছাত্রের ধর্ম্মানুভূতিতে আঘাত করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

এবিষয়ে সিটিকলেজ প্রফেসার্স ইউনিয়নের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। সিটি কলেজের মীমাংসা সম্পর্কে তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে-সাহায্য করিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

In order to bring about a settlement of the present dispute between the College authorities and the orthodox Hindu students, the City College Professors' Union does hereby volunteer, on its own financial responsibility, to provide a place of worship for the orthodox Hindu boarders of the Ram Mohun Roy Hostel as near the Hostel as practicable, and to raise funds to place the arrangement on a permanent basis so that neither the college authorities nor the boarders will have to bear any expenses or undertake any responsibility.

Resolved further that if any member has any conscientious scruple to subscribe to this fund he be spared.

তাৎপর্য্য। সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ও আচারনিষ্ঠ হিন্দুছাত্রদের মধ্যে বর্ত্তমান বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সিটি কলেজ প্রফেসার্স ইউনিয়ন স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া নিজেদের আর্থিক দায়িত্বে রামমোহন রায় হস্টেলের যথাসম্ভব নিকটে উহার আচারনিষ্ঠ হিন্দু অন্তেবাসীদের জন্য একটি পূজাস্থানের ব্যবস্থা করিতে ও তাহা স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে স্বীকার করিতেছেন, যাহাতে ছাত্র বা কর্তৃপক্ষকে ব্যয়ভার বহন বা দায়িত্ব স্বীকার করিতে না হয়। যদি ইউনিয়নের কোন অধ্যাপক-সঙ্ঘের চাঁদা দিতে কোন বিবেক-প্রসূত বাধা থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হউক।

১৩৩৫ আষাঢ়

শান্তিভবন-বিদ্যালয়

কলিকাতার বাগবাজারের নবীন সরকারের গলির ২০ নং গৃহে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র-অধ্যাপক মিলিয়া প্রায় দুই বৎসর হইল এই শান্তিভবন বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইঁহারা শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপক দুই-ই ছিলেন বলিয়া তথাকার আদর্শ ও শিক্ষা-প্রণালীর সহিত বিশেষ পরিচিত। এইজন্য যাঁহাদের বালকদিগকে শান্তিনিকেতনে পাঠাইবার সুবিধা নাই, তাঁহারা শান্তিভবন বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে শিক্ষার জন্য পাঠাইলে সুফল পাইবেন। এখন এই বিদ্যালয়ে ছয়জন শিক্ষক ও ৫০টি ছাত্র আছেন। শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছাড়া আর সকলেই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং তথায় বহুদিন শিক্ষকতা কার্য্যেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ছাত্রগণ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকে। ইহার ছাত্রাবাসও শীঘ্র খুলিবার ইচ্ছা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তা ছাড়া বয়-স্কাউটের কাজ, ব্যায়াম ও সঙ্গীত শিখান হয়। ছাত্রদের মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ ও বনভোজন হয়। তাহাদের নিজেদের সাহিত্যসভা, পত্রিকা, বিচারসভা প্রভৃতি আছে।

১৩৩৫ শ্রাবণ

বঙ্গে নাট্য ও নৃত্য

বঙ্গের ১৯২৬-২৭ সালের সরকারী শাসন-রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে :—

Dramatic productions of note were Rabindranath Tagore's "Chira-Kumar Sabha" (The Life-long Bachelors Association), "Sodhbodh" (Complete Discharge of the Debt) and "Natir Puja" (The Dancing Girl's Worship). The last, which was staged privately in Calcutta for the benefit of the Visva-Bharati

Institution by its girl pupils, is a Buddhistic story of the highest sacrifice for the cause of religion The superb dancing introduced in the acting of the play by the poet's pupils has been hailed as the first step towards the revival of a dead art among Bengalis.

বিশ্বভারতী

আমরা সম্প্রতি শান্তিনিকেতন গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পব কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আসিয়াছে, আরও আসিতেছে। গ্রন্থাগারে অনেক নূতন বহি আসিয়াছে। অনেকে বিনামূল্যে হিন্দী বহি উপহার পাঠাইতেছেন। বিলাতে আইন অনুসারে কয়েকটি বড় লাইব্রেরীতে প্রত্যেক মুদ্রিত বহি একখানি করিয়া পাঠাইতে হয়। বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ যদি নিজেদেব উপর অলিখিত আইন জারী করিয়া তাঁহাদের এক একখানি বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত বহি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে তাহা সুরক্ষিত ও পঠিত হইবে। এখন লাইব্রেরীগৃহের কেবল নীচের তলায় পুস্তক রাখা হয়। উপরের তলায় কলাভবন অবস্থিত। কিন্তু কলাভবনের নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। কয়েক মাসেব মধ্যেই শেষ হইবে। তখন লাইব্রেরীভবনের সমস্ত স্থান পুস্তক রাখিবার জন্য পাওয়া যাইবে।

কলাভবনের শিক্ষালয়, গ্রন্থাগার ও মিউজিয়ম এবং ছাত্রদের থাকিবার জায়গা একই জায়গায় কিন্তু আলাদা আলাদা নির্ম্মিত হইতেছে। কলাভবনে আগে আগে প্রধানতঃ ছবি আঁকতে শিখান হইত; কিছুদিন হইতে মূর্ত্তিগঠনও শিখান হইতেছে। তাহাতে কাহারও কাহারও বেশ দক্ষতা দেখা যাইতেছে।

পিয়ার্সন হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারী ও নূতন ডাকঘর নির্ম্মিত হইতেছে।

ছাত্রীরা এখন যে বাড়ীতে থাকে, তাহা উৎকৃষ্ট এবং তাহার প্রশস্ত খেলিবার জায়গাও আছে। তাহাদের জন্য নূতন উৎকৃষ্টতর বাড়ী প্রস্তুত হইবে। তাহা হইয়া গেলে বর্ত্তমান ছাত্রনিবাস অধিকবয়স্ক ছাত্রীদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে শুনিলাম।

১৩৩৫ ভাদ্র

বিশ্বভারতীতে বর্ষা-উৎসব

কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে যে-সকল উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার কোন-কোনটি ঋতু উৎসব। যেমন হোলী বসন্তের উৎসব। এইরূপ অনেক উৎসবে মানুষের সহিত বাহ্য প্রকৃতির যোগ এখন আর অনুভূত ও রক্ষিত হয় না; সেগুলি এখন অনেক স্থলে প্রাণহীন বাহ্য

ক্রিয়াকলাপে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে-সব ঋতু-উৎসব প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা এখন পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য ক্রিয়াকলাপে পর্য্যবসিত হয় নাই। শান্তিনিকেতনের মুক্ত প্রান্তরে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর স্পর্শ অনুভব ও মুক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নূতন বেশ ধারণ করেন, এবং আকাশে আলোর ও রঙের খেলা ও নানা দৃশ্য ও ধ্বনির মধ্য দিয়া মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। আমরা সকলেই তাঁহার সেই প্রকাশ অনুভব করিতে পারি না; কিন্তু কবি তাহা বাহিরে ও অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া গানে কবিতায় গল্পে প্রকাশ করেন। এই ঋতু উৎসবগুলি শান্তিনিকেতনে প্রাণহীন মনে হয় না। তথায় নিপুণ শিল্পীরা থাকায় উৎসব ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রগুলি এরূপ সুসজ্জিত হয়, যে, অন্যত্র অনেক অর্থব্যয় ও আড়ম্বরেও তাহা সম্ভবপর নহে।

এবার বর্ষা-উৎসব উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও দর্শকেরা সমবেত হইবার পর ছাত্রনিবাস হইতে ছাত্রীরা সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দু জন ছাত্র একটি পত্রপুষ্পে শোভিত ডুলিতে একটি বৃক্ষশিশুকে বহন করিয়া আনিলেন। তাহার পর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পঠিত হইল :—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
ধন্যা মহীরুহা যেভ্যো নিরাশা যান্তি নার্থিনঃ॥ ১॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে॥ ২॥
ছায়ামন্যস্য কুর্বন্তি তিষ্ঠন্তি স্বয়মাতপে।
ফল্যান্যপি পরার্থায় বৃক্ষাঃ সৎপুরুষা ইব॥ ৩॥
হেতবঃ সম্পদাং লোকে কেতবো ধরণীশ্রিয়ঃ।
জীবাতবোঽত্র জীবানাং জীবন্তু তরবোঽক্ষতাঃ॥ ৪॥

১। বৃক্ষদের জন্ম শ্রেষ্ঠ! সকল জীব ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে। বৃক্ষগণই ধন্য! যাচকেরা ইহাদের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না।

২। পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, রস, ক্ষার, সার, অঙ্কুর এই সকলের দ্বারা ইহারা লোকের কাম্যবস্তু দান করে।

৩। সাধু ব্যক্তির ন্যায় ইহারা স্বয়ং আতপে অবস্থান করিয়াও অন্যকে ছায়া দান করে। ইহাদের ফলগুলিও পরের জন্য।

সংসারে সকল সম্পদের হেতু, ভূমিলক্ষ্মীর কেতুস্বরূপ ও জীবগণের জীবনৌষদস্বরূপ এই তরুগণ অক্ষত হইয়া বাঁচিয়া থাকুক।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের পক্ষ হইতে তাহাদের নিম্নমুদ্রিত প্রার্থনাগুলি পরে পরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন এবং যে যে বালিকা ক্ষিতি অপ্ প্রভৃতি সাজিয়াছিল, তাহারা তাহার পুনরাবৃত্তি করিল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন, হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে!
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চির-সখ্যে।
অন্তরে পাক্ কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক্ পত্রী
তোমার অন্নসত্রে॥

অপ্

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক্ এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এ'রে ডেকে
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে॥

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক্
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হোক্ তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি'॥

মরুৎ

হে পবন করো নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিঃশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি'।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সঙ্গীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লব-হিল্লোল শিক্ষা॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্ত্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্ত্তি।
দিয়েছে সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥

ইহার পর বৃক্ষশিশুকে ভূমিতে রোপণ করা হইল। সর্ব্বশেষে কবি এই মাঙ্গালিক কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :

মাঙ্গালিক

প্রাণের পাথেয়.তব পূর্ণ হোক্, হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধা-সিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। ল'য়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণ বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো;
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া; পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুম বর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষা গীতিকায়,
সন্ধ্যা-বন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জ-বীথিকায়
মঞ্জুল মর্ম্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হোতে
প্রাণ-মাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্য্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাবো আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সে দিন বর্ষণ-মহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন!
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সঙ্গীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্ব পরিমলে॥

বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পর সকলে একটি তাঁবুর নীচে ও সম্মুখে সমবেত হইলেন। তখন কবি তাঁহার সেই দিনই সেই উপলক্ষ্যে রচিত একটি সময়োপযোগী গল্প পড়িলেন। তাহা একটি বালকের কাহিনী যে উদ্ভিদের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করিত। রাস্তার মাঝখানে জাত তাহার স্নেহপালিত একটি শিমুলগাছ পরিবারস্থ এমন লোকেরা কাটিয়া ফেলে যাহারা দরদী ছিল না। তাহাতে বালকটির স্নেহময়ী কাকীমা দুঃখে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। ইহা ইতিহাস নহে, কিন্তু আমরা পরে কবির মুখে শুনিতে পাই, যে, বাল্যকালে উদ্ভিদ্জীবনের প্রতি তাঁহার হৃদয়মনের ভাব ঐ বালকটির মত ছিল।

ইহার পর বাদ্যসহকারে বর্ষার উপযোগী কয়েকটি বাংলা ও একটি হিন্দী গান গীত হয়। পরদিন ৬ই শ্রাবণ সুরুল গ্রামে স্থিত শ্রীনিকেতনে

হলচালন উৎসব হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, যে, পুরাকালে ইহা সীতাযজ্ঞ নামে অভিহিত হইত। একটি সুন্দর সামিয়ানার নীচে অনুষ্ঠানের স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। কতকখানি জমীর ঘাস চাঁছিয়া ফেলিয়া তাহা আল্‌পনায় ও রঙে সুশোভিত করিয়া হলচালনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিন জোড়া সুপুষ্ট চিত্রিত বলদ ও একটি সুশোভিত লাঙ্গল কৃষকেরা সম্মুখে রাখিয়াছিল।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ একটি গান করিলেন। তাহার'পর শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলেন :—

অক্ষৈর্মা দীব্য কৃষিমিৎ কৃষস্ব
বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাব্-কিতব তত্র জায়া
তন্মে বিচষ্টে সবিতায় মর্যঃ॥

ঋগ্বেদ, ১০, ৩৫, ১৩।

দ্যূতক্রীড়া করিও না, কৃষিই কর। তাহা দ্বারা যে বিত্ত পাও তাহাই বহু মনে করিয়া আনন্দিত হও। হে দ্যূতকর, তাহাতেই তোমার গাভীসমূহ, তাহাতেই তোমার স্ত্রী। এই সবিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাই আমাকে বলিতেছেন।

ইহার পর বলীবর্দ্দ সম্বর্দ্ধনা হইল। বলদগুলিকে ফুলের মালা পরাইয়া তাহাদের নানা সুখাদ্য তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইল।

তাহার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণসহকারে হলযোজনা করা হইল;—

সীরা যুঞ্জন্তি কবযো যুগা বিতন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া

দেবগণের অনুগ্রহে জ্ঞানশালী মেধাবিগণ যুগ (জোয়াল) গুলি বিস্তৃত করিয়া হলসমূহ যোজনা করিতেছেন।

ইহার পর চিত্রিত ভূমিখণ্ড কর্ষিত হইল। প্রথমে পুরোহিত শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র পাঠ করিলেন—

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং
কৃত যোনৌ বপতেহ বীজম্।
গিরা চ শ্রুষ্টি, সভরা অসন্ নো
নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্কমেরাৎ॥

(কৃষকগণ) তোমরা যুগসমূহ বিস্তৃত কর, হলসমূহ যোজনা কর, এই নির্ম্মিত ক্ষেত্রে বীজ বপন কর। গানের দ্বারা আমাদের অন্নসমূহ পুষ্ট হইয়া উঠুক। ইহা পক্ক হউক, এবং দাত্রদ্বারা ছিন্ন হইয়া আমাদের নিকটে আগমন করুক।

শুনং সুফালা বিকৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনাসীরা হবিষা তোয়মানা
সুপিপ্পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মে॥

যজুর্ব্বেদ, ১২, ৬৯

সুন্দর ফালগুলি ভূমিকে সুখে কর্ষণ করুক! হলধারিগণ বলিবর্দ্দের সহিত সুখে আগাইয়া চলুন! বায়ু ও সূর্য্য জল দ্বারা (ভূমিকে) সেচন করিয়া আমাদের জন্য ওষধিসমূহকে সুফল-যুক্ত করুন!

ঘৃতেন সীতা মধুনা সমজ্যতাং
বিশ্বৈ র্দেবৈরনুমতা মরুদ্ভিঃ।
উর্জস্বতা পয়সা পিন্বমানা
স্মান্ সীতে পয়সাভ্যা ববৃৎস্ব॥

বাজসনেয়িসংহিতা, ১২-৬৭-৬০

বিশ্বদেব ও মরুদ্‌গণের অনুজ্ঞায় সীতা (হালের রেখ) মধুর জলে সংসিক্ত হউক! হে সীতা, তুমি জলে পূর্ণ হইয়া অন্নবতী হইয়া আমাদের অনুকূল হও!

অতঃপর প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও পরে শ্রীনিকেতনের কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু হলচালন দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেন।

ইহারপর রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করিলেন। ইহা কেহ লিখিয়া রাখিলে ভাল হইত। ভূমির সহিত যোগ স্থাপন করিয়া মানুষ যে কেবল

দৈহিক পুষ্টি ও বাহ্য সম্পদ লাভ করে তাহা নহে, তাহার অন্তরাত্মাও যে প্রকৃতির স্পর্শে কেমন নানা প্রকারে শ্রী সম্পদ পুষ্টি লাভ করে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। মানুষ কেবল যে ভূমি হইতে সম্পদ আহরণ করিবে, তাহা নহে, নিজের জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা তাহাকে পুষ্টও করিবে। সর্ব্বশেষে "অচলায়তন" নাটকের গান "আমরা চাষ করি আনন্দে" গীত হয়।

১৩৩৫ কার্ত্তিক

দুটি-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মারফতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ যে দুই ব্যক্তি ও বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য জানাইয়াছেন, তদ্বিষয়ে প্রবাসীতে কিছু বাহির হয় নাই, মডার্ণরিভিউর এক পত্রলেখকের চিঠিতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু অমিয়বাবুর চিঠিখানি বাংলায় লেখা এবং প্রবাসীর জন্য অভিপ্রেত বলিয়া তাহা নীচে মুদ্রিত করিতেছি। ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণরিভিয়ুতে বাহির হইবে।

সম্পাদক, "প্রবাসী" সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন :—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার তাঁহার সম্বন্ধে মডারন্ রিভিয়ুতে প্রকাশিত মন্তব্য পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে কবি তাঁহার বক্তব্য আপনাকে জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

"শ্রীমান দিলীপকুমার রায়ের সহিত আমার আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গ বাঙ্গলায় প্রবাসীতে ও ইংরেজিতে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাসীতে উক্ত প্রসঙ্গের ভূমিকায় আমাকে লিখিতে হইয়াছিল যে, ঐ আলোচনার ভাষা সম্পূর্ণ আমার নিজের। * ইংরেজি অনুবাদে এই ভূমিকা অংশ অপ্রাসঙ্গিক বোধে আমি বাদ দিয়াছিলাম। এই কারণে উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের নাম থাকাতে ঐ লেখার বাঙলা ও ইংরেজী তাঁহারই রচনা বলিয়া সাধারণের ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু এজন্য দিলীপকুমারের কোনো দায়িত্ব নাই। যখন এই লেখাগুলি কোন গ্রন্থ বা পত্রিকায় তিনি নিজে প্রকাশ করিবেন, তখন লেখকের নাম তিনি স্বীকার করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

"শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের গায়কদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ খ্যাতি পাইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। পুরুষানুক্রমে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া পারদর্শিতালাভ করিয়াছেন, এ কথা অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীযুক্ত ভাট্‌খণ্ডে মহাশয় সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি— ইঁহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষ্যে অন্য কোন গীতিবিশারদের মান খর্ব্ব করার আমি

---

* ঐ আলোচনার প্রশ্নগুলি ছাড়া শুধু ভাষা কেন, আর সবই কবির, দিলীপবাবুর প্রশ্ন উপলক্ষ্য মাত্র; ইহা সুস্পষ্ট হইলেও মনে রাখা ভাল—প্রবাসীর সম্পাদক।

অনুমোদন করি না।" ইতি ৬ই অক্টোবর ১৯২৮
ভবদীয়—শ্রী অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দিলীপবাবুর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশের উপলক্ষ্যটি পাঠকদের বোধগম্য করিবার জন্য আমাদিগকে কিছু লিখিতে হইতেছে।

ইংরেজী বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের বৈশাখ (এপ্রিল) সংখ্যায় "The Function of Woman's Shakti in Society" নামক একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটির নামের নীচেই লেখা আছে "By Dilip Kumar Roy"। কিয়দংশ দিলীপবাবুর রচনা বলিয়া ষ্টার নামক কাগজের জুলাই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু প্রবাসীতে প্রকাশিত মূল বাংলা প্রবন্ধটি দিলীপবাবুর রচনা নহে, ইংরেজী অনুবাদও তাঁহার নহে। এইজন্য প্রবন্ধটিতে লেখক হিসাবে দিলীপবাবুর নাম প্রকাশ ঠিক হয় নাই। মডার্ণ রিভিয়ুর একজন পত্র লেখক এই মনে করিয়া দিলীপবাবুর উপর কটাক্ষ করিয়াছেন, যে, এই "ভুলের" জন্য দিলীপবাবুই দায়ী; কারণ, বাস্তবিক দায়ী কে, তাহা তাঁহার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশের জন্য দিলীপবাবু প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন, দায়িত্ব হয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিম্বা বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ষ্টারে উহার কিয়দংশের দিলীপবাবুর রচনা বলিয়া পুনর্মুদ্রণে দিলীপ বাবুর কোন দায়িত্ব ছিল কিনা জানি না। যাহা হউক, ইহা সুস্পষ্ট যে এপ্রিল মাস হইতে এ পর্য্যন্ত দিলীপবাবু ঐ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটির রচয়িতা বলিয়া প্রশংসা সম্ভোগ বিনা আপত্তিতে করিয়া আসিতেছেন, এবং মডার্ণ রিভিয়ুর পত্রলেখক কটাক্ষ না করিলে আরও অনির্দ্দিষ্ট কিছুদিন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা সম্ভোগ করিয়াই চলিতেন। গ্রন্থাকারে প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সময় তিনি অবশ্য প্রকৃত লেখকের নাম প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থপ্রকাশে এখনও কত বিলম্ব আছে, তাহা তিনিই জানেন। যে প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাহা এতদিন আত্মসাৎ করা কি ঠিক্ হইয়াছে? যে নিন্দা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা ত তিনি খুব ক্ষিপ্রহস্তে করিয়াছেন; প্রশংসা সম্বন্ধে বিপরীত ব্যবস্থা কেন? আমাদিগকে অনেকে অতিরিক্ত দোষদর্শী মনে করিতে পারেন। সেরূপ অখ্যাতি অর্জ্জনের ইচ্ছা আমাদের নাই। দিলীপবাবুই খুঁৎ ধরিতে বাধ্য করিয়াছেন। কারণ, মডার্ণরিভিয়ুতে প্রকাশের জন্য তিনি যে প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রশংসা সম্বন্ধে নিজের নির্লোভতার প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন, যে তাঁহাকে লোকে ডক্টার অব মিউজিক এবং ব্যাচিলার অব মিউজিক বলায় তিনি বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার ওরূপ উপাধি নাই। আলোচ্য ক্ষেত্রে এবম্বিধ নির্লোভতা তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সত্ত্বর প্রদর্শন করেন নাই। তাহার কারণ কি ইহা হইতে পারে না, যে, প্রবন্ধটির লেখকত্ব আপনা হইতে দাবী করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন "তরুণের" মনে কষ্ট দিবেন না, এইরূপ একটা আশা ছিল?

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য, গায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে। বাংলা দেশের বিদ্যালয় সকলে সঙ্গীত শিখাইবার প্রস্তাব গবর্ম্মেন্টের পক্ষ হইতে হওয়ায়, শিক্ষা কি রীতিতে কাহার দ্বারা হইবে, এই আলোচনা উপলক্ষ্যে প্রধানতঃ দিলীপবাবু ও তাঁহার অনুচর সহচরদের দ্বারা গোপেশ্বর বাবুকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা দৈনিক কাগজে হইয়াছে। সেই চেষ্টার বিরুদ্ধে মডার্ণরিভিয়ুর পত্রলেখক অনেক কথা লিখিয়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মত সঙ্গীতজ্ঞ ও

[শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু—

আশীর্ব্বাদ

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকবরেষু

তোমার সম্পাদিত প্রবাসী এবার ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। এই উপলক্ষ্যে আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। তুমি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, ভয়কে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিষ্যের জন্য ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গের বাহিরে সুদূর এলাহাবাদ হইতে প্রবাসী প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, প্রবাস হইতে প্রকাশিত হইল বলিয়াই বোধ হয় পত্রিকাখানির নামকরণ হইল প্রবাসী। পরে জানিতে পারিলাম, তখন হইতেই দেশের প্রকৃত অবস্থা তুমি বুঝিতে পারিয়াছিলে। প্রবাসীর ললাটে লিখা থাকিত,

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে,
পরদাস-খতে সমুদায় দিলে।"

অনেক দিন হইতেই দেশে চারিদিকে দলাদলি, জড়ত্ব ও অবসাদ দেখা যাইতেছে। অতি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থপরতা প্রতিদিন জাতীয় জীবন কলুষিত করিতেছে। দেশের যখন দুর্দ্দিন আসে, তখন দুঃখকে [illegible] দিক্ সমাই নিদারুণ করিয়া তোলে।

কেবল মাত্র অতীতের গুণ কীর্ত্তন করিয়া আমরা [illegible] প্রসাদ অনুভব করিতেছি এবং দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেছি। বর্ধার গ্রন্থিবন্ধনে আমরা যে-জাল বিস্তার করিয়াছি, সেই জালে আপনারাও আবদ্ধ হইয়াছি।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে, দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে; ভয়ের অতীত হইতে হইবে, সহস্র প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। অবিরাম চেষ্টা ও বিরুদ্ধশক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং মনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াই আমরা দেশের ও জগতের কল্যাণসাধন করিতে পারিব। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।

এই নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশার আলোক আছে। যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। অঁাধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জাতীয় জীবন [illegible] ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যে, স্বার্থপরতায় এবং পরশ্রীকাতরতায়। এ-সব অন্ধকারের আবরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে

যে-শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্ত্বের অনুসন্ধান করিত, যাহা দ্বারা মনুষ্য ভয়ের অতীত হইত, যে-বীরধর্ম্মের অনুষ্ঠানে শক্তিহীনের দুর্ব্বহ ভার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত,—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার দেশ আর সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু

প্রবাসী-র ২৬ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে রামানন্দকে জগদীশচন্দ্রের আশীর্বাদ • বৈশাখ ১৩৩৩

বঙ্কিমচন্দ্র • শ্রাবণ ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন, ১৩১৪

চেয়ারে উপবিষ্ট, বাম হইতে—৪র্থ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম হৃষীকেশ শাস্ত্রী, ৬ষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭ম মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ৮ম মহারাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা), ৯ম রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১০ম দেবেন্দ্রনাথ বসু

সম্মুখে উপবিষ্ট, বাম হইতে—১ম মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, ৩য় ব্যোমকেশ মুস্তফী, ৫ম অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ৬ষ্ঠ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ৭ম জগদানন্দ রায়, ৮ম কেদারনাথ মজুমদার, ৯ম চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ১০ম শশধর রায়, ১১শ দুর্গাদাস লাহিড়ী, ১৪শ রামকমল সিংহ, ১৬শ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১৭শ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সৌজন্যে

রম্যাঁ রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ • আশ্বিন ১৩৪২

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও রবীন্দ্রনাথ • আশ্বিন ১৩৪৮
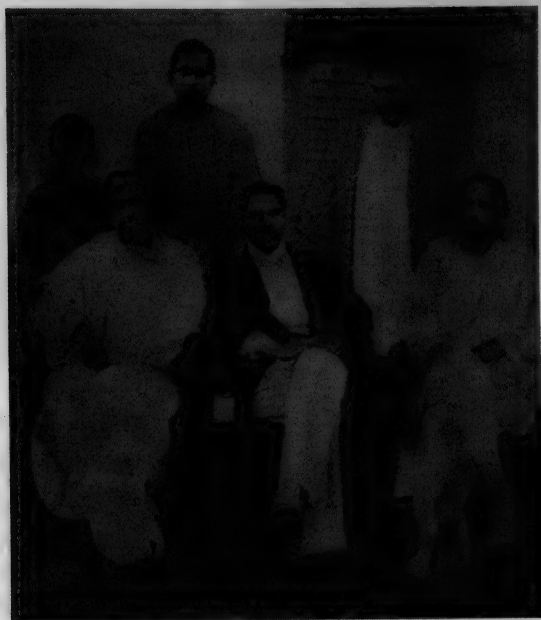
জগদীশচন্দ্র-লোকেন্দ্রনাথ পালিত-রবীন্দ্রনাথ • আষাঢ় ১৩৪৮

যবদ্বীপের মঙ্কুনগরো ভবনে রবীন্দ্রনাথ • বৈশাখ ১৩৩৮
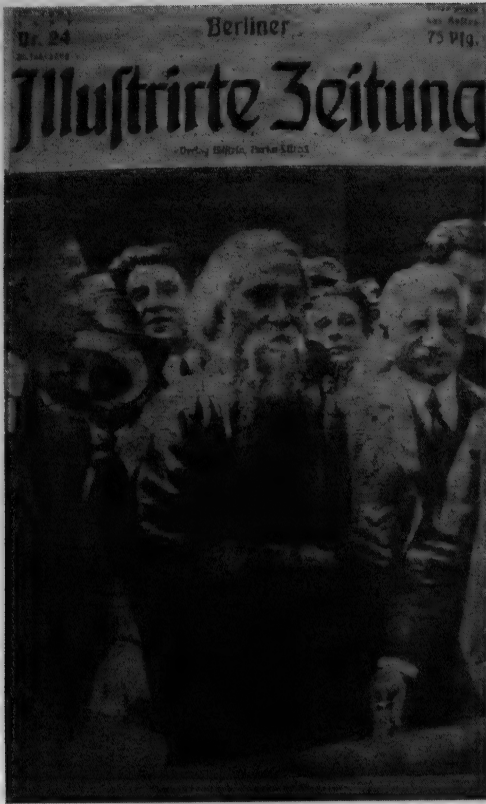
বার্লিনের সংবাদপত্রে
রবীন্দ্রনাথ • ভাদ্র ১৩২৮

রবীন্দ্রনাথ ও দীনবন্ধু এন্ডরুজ
• আশ্বিন ১৩৪৮

শেষের কবিতা-র অমিত রায় : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত
• ভাদ্র ১৩৩৫
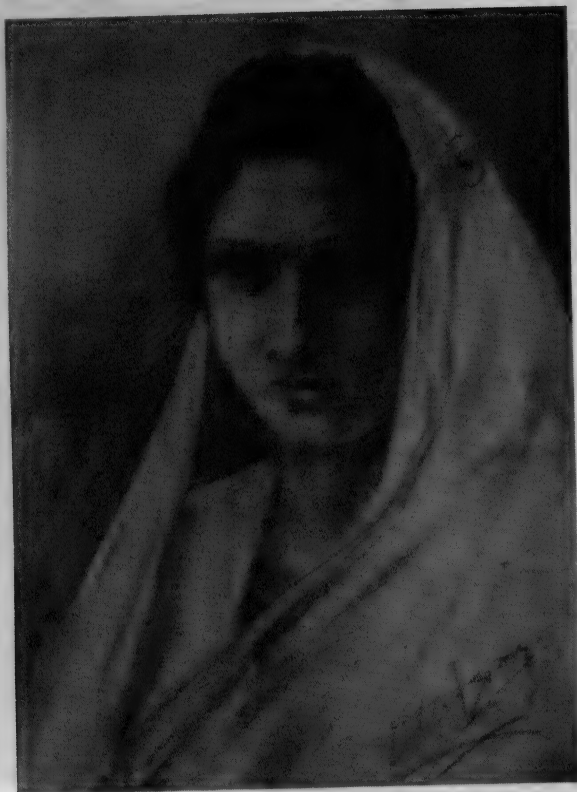
শেষের কবিতা-র লাবণ্য :
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত
• আশ্বিন ১৩৩৫

শেষের কবিতা-র কেটি :
দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত
• ভাদ্র ১৩৩৫

সঙ্গীতস্রষ্টা এক্ষণে গোপেশ্বর বাবুর ন্যায্য প্রশংসা করায় আশা করি ন্যায়পরায়ণ সঙ্গীতরসিকেরা সন্তুষ্ট হইবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত ভাটখণ্ডে মহাশয় সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞতায় ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি—ইহার যোগ্যতার প্রশংসাবাদ করিবার উপলক্ষ্যে অন্য কোনো গীতিবিশারদের মান খর্ব্ব করার আমি অনুমোদন করি না।" মডার্ণ রিভিয়ূর পত্রলেখকও এইরূপ কথা ঐ পত্রিকায় লিখিয়াছেন। যথা---"Bhatkhande is no doubt great; but let not those who have also served die unsung and unlamented because a blind man does not sing of them."

১৩৩৭ ভাদ্র

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি ছবি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রদর্শিত হয়। তথাকার বিখ্যাত চিত্রসমালোচকেরা সেগুলির খুব প্রশংসা করেন। তাহার পর ছবিগুলি ইংলণ্ডের বার্ম্মিংহাম শহরে প্রদর্শিত হয়। সেখানেও সেগুলি প্রশংসিত হয়। অতঃপর চিত্রগুলি জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনে প্রদর্শিত হইতেছে। সেখানেও প্রশংসা হইবে, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা সকল দেশে সকল সময়েই বিরল। বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া এরূপ প্রশংসালাভ কয়জনের ভাগ্যে পৃথিবীতে ঘটিয়াছে?

১৩৩৭ অগ্রহায়ণ

শান্তিনিকেতনে জুজুৎসু শিক্ষা

শান্তিনিকেতনে শ্রীযুক্ত এস্ তাকাগাকি জাপানী ব্যায়াম ও কুস্তি জুজুৎসু শিক্ষা দিয়া থাকেন। জাপানে এই ব্যায়াম শিক্ষা দিবার যত খুব বিখ্যাত শিক্ষক আছেন, তিনি তাহার মধ্যে একজন। শান্তিনিকেতনে অনেক ছাত্র ও ছাত্রী এবং অন্য কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা করেন। বালিকা ও বালকদের মধ্যে অনেকে ইতিমধ্যেই জুজুৎসু শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে জাপানী শিক্ষকের ছাত্রছাত্রীরা এই বিদ্যা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করা হয়। জাপানী শিক্ষক শ্রীযুক্ত

তাকাগাকির দুই জন জাপানী বন্ধুও কুস্তিতে যোগদান করেন। তাঁহারাও এ বিষয়ে ওস্তাদ।

যথানিয়মে জুজুৎসু অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ও শরীর বলিষ্ঠ হয়, এবং আততায়ীর কোন কোন প্রকার আক্রমণ হইতে জুজুৎসু দ্বারা বেশ আত্মরক্ষা করা যায়। এই জন্য যাহারা জুজুৎসু জানে তাহাদের সাহস ও মনের স্থৈর্য্য বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশের পালোয়ান ও কুস্তীগীররা যে-প্রকার মল্লযুদ্ধ করে এবং যত প্রকার প্যাঁচ জানে ও ব্যবহার করে, তাহার সহিত জুজুৎসুর নানা প্যাঁচের কিরূপ সাদৃশ্য ও প্রভেদ আছে তাহা কোন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চর্চ্চা করিলে বলিতে পারিবেন, এবং জুজুৎসু হইতে আমাদের দেশী রীতির কিছু উন্নতি হইতে পারে কি না তাহাও স্থির করিতে পারিবেন।

১৩৩৭ চৈত্র

শান্তিনিকেতনে গান্ধী পুণ্যাহ

মহাত্মা গান্ধী অনেক বৎসর পূর্ব্বে কিছু দিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তখন এখানকার ছাত্রদিগকে সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে তিনি বলেন। তাঁহার এখানে অবস্থিতির সশ্রদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ছাত্র ও ছাত্রীরা বৎসরে একটি দিন বিশেষ ভাবে যাপন করেন। এবার ২৬শে ফাল্গুন মঙ্গলবার সেই দিন পড়িয়াছিল। এই দিন আশ্রমের সমুদয় ভৃত্য ছুটি পায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের সমুদয় কাজ নিজে করে। মেথরের কাজও ছাত্রেরা করে। রন্ধন পরিবেশন প্রভৃতি কাজও তাহারা করে। আশ্রমে অনেক দেশের, প্রদেশের, ধর্ম্মের ও জাতির ছোট বড় যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ একত্র ভোজন করিয়া থাকেন—শুধু গান্ধী দিবসে নহে অন্য সময়েও। এখন এখানে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের লোক ছাড়া আমেরিকা, জাপান, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, হাঙ্গেরী, ডেন্মার্ক ও হল্যাণ্ডের লোক আছেন। হিন্দু ছাড়া এখানে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, পারসী ও মুসলমান আছেন। যেখানে ছাত্রীরা থাকেন তাহার নাম শ্রীভবন। সেখানে বাঙালী মেয়েদের মধ্যে একটি বিবাহিতা মুসলমান বালিকা আছেন এবং একটি পারসী, একটি সিংহলী ও একটি জাপানী মেয়ে আছেন।

১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ শ্রীমৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার জীবন নানা সাধনায় ও কর্ম্মে পরিপূর্ণ। শ্রেষ্ঠ মানবদিগের মধ্যে এই অক্লান্তকর্ম্মীর স্থান কোথায়, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা স্বদেশে ও বিদেশে অনেকে করিয়াছেন। আমরা তাহা করা অনাবশ্যক মনে করি। অন্যেরা আবশ্যক মনে করিলেও, তাহা করিবার মত জ্ঞান ও শক্তি আমাদের নাই।

তাঁহার প্রতিভা কোন্ বিষয়ে কত উচ্চ শ্রেণীর, তাহা নিরূপণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, মানবচরিত্রের জ্ঞানে ও বিশ্লেষণে, সাহিত্যের নানা বিভাগে সৃষ্টির কার্য্যে, গান রচনায় সুরের সৃষ্টিতে ও কণ্ঠসঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে ও স্থাপত্যে, অভিনয়ে ও নৃত্যকলায়, রাজনীতির সার অংশের জ্ঞানে, শিক্ষার মূলনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে ও তাহার প্রয়োগে, ইতিহাসের মর্ম্মস্থলে প্রবেশের শক্তিতে, দেশহিতের সত্য পথ নির্দ্দেশে ও তাহার অনুসরণে, দার্শনিক তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ভেদে, আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, জীবনকে বিশ্বনিয়মের ও বিশ্ববৈচিত্র্যের সহিত সকল দিক্ দিয়া সমঞ্জসীভূত করিবার সাধনায়, তাঁহার যে অসামান্য ও বহুমুখী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, অতীত ও বর্ত্তমান কালের অন্য কোন মানুষে একাধারে তাহা দেখা গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহার দ্বারা দ্বারা আমরা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিতেছি না; তাঁহার কোন অসম্পূর্ণতা নাই, তাহাও বলিতেছি না। এক একটি বিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও শক্তিমান্ অন্য অনেকে ছিলেন ও আছেন। আমরা কেবল এই বলিতেছি, যে, তাঁহার মত বিচিত্রশক্তিমান্ পুরুষ বিরল।

কালে আমরা তাঁহার সমসাময়িক। অন্যরূপ নৈকট্যও তাঁহার সহিত আমাদের কাহারও কাহারও আছে। এই জন্য আমরা কেহ-বা তাঁহাকে অযথা বড় করিয়া দেখিতে পারি, কেহ-বা অযথা ছোট মনে করিতে পারি। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় ভবিষ্যতের মানুষেরা লাভ করিতে ও দিতে পারিবে। তাঁহার চরিত ও ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরের পৃথিবীর কতখানি কল্যাণ ও আনন্দের কারণীভূত, তাহাও এখনও সংক্ষেপে বলিবাব নহে। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা তাহা বিবৃত হইবে।

নানা দেশ হইতে প্রাপ্ত অভিনন্দনের টেলিগ্রাম হইতে বুঝা যায় বিদেশে তাঁহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা।

কবির সপ্ততি বৎসর পূর্ত্তির উৎসব

সবিনয় নিবেদন—

অদ্য ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ (শুক্রবার, ৮ই মে, ১৯৩১) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে, এই শুভঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য আগামী

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (শনিবার, ১৬ই মে, ১৯৩১) সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্ গৃহে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

এই সভায় আপনার উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়। ইতি কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকামিনী রায়
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
বাসন্তী দেবী
শ্রীঅবলা বসু
শ্রীসরলা রায়
শ্রীনীলরতন সরকার
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী
আবুল কালাম্ আজাদ্
ঘনশ্যামদাস বির্‌লা
ডেভিড এজ্‌রা
শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
সুচারু দেবী (ময়ূরভঞ্জ)
শ্রীমন্মথনাথ রায়চৌধুরী (সন্তোষ)
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু
শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়
খাহ্‌জা নাজিমউদ্দিন
শ্রীযদুনাথ সরকার
গগনবিহারী এল্ মেহতা
শিবানন্দ (বেলুড়)
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ফস, কলিকাতা লর্ড বিশপ
আর্থার মূর
শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীহৃষীকেশ লাহা
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার)
ডব্‌লু এস্ আরকুহার্ট
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়
এ কে ফজলুল হক্
এইচ্ এ গিড্‌নী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব)
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
শ্রীজলধর সেন
মুজীবর রহমান্
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
আনন্দ্‌জী হরিদাস
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
এস্ খোদাবক্স্
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)
সরলা দেবী
মালুক্ সিং বেদী
হরিরাম গোয়েঙ্কা
পদমরাজ জৈন
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট্ রামন
হাসান সুরাবর্দ্দী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়
শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ই সি বেন্থল্
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়
শ্রীশরৎকুমার রায় (দিঘাপাতিয়া)
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
নন্দলাল পুরী
ওঙ্কার মল জাতিয়া
জাহাঙ্গীর কয়াজী
শ্রীসরোজিনী দে
গুর্‌দিৎ সিং
এ এফ্ এম্ আবদুল আলি

"রাশিয়ার চিঠি"

আর একটি অন্য রকমের সময়োপযোগী পুস্তক রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দিবসে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবাসীতে কবির রুশিয়া সম্বন্ধে যতগুলি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার অপর কয়েকটি লেখা একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া সবগুলি বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। রুশিয়া সম্বন্ধে নানা কথা জানিবার কৌতূহল অনেকেরই আছে। যাঁহারা প্রবাসী পড়েন না, তাঁহারা এই পুস্তকে প্রত্যক্ষদর্শী কবির ঐ চিঠিগুলি পড়িয়া উপকৃত হইবেন। আর যাঁহারা প্রবাসী পড়েন, তাঁহাদেরও চিঠিগুলি আবার এক জায়গায় পড়িবার ও রাখিবার সুবিধা হইল।

১৩৩৮ পৌষ

কবির প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা

বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখাপড়া শিখিতেছিলেন, তখন প্রথমে বাংলা এবং পরে ইংরেজী রচনার অভ্যাসও অবশ্য করিয়াছিলেন। এ লেখাগুলি গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে। তাঁহার কৈশোর এবং প্রথম যৌবনের অনেক বাংলা রচনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন কোনটির পুনর্মুদ্রণ ও স্থায়িত্ব তিনি চান না। তাঁহার ইংরেজী যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্তই প্রৌঢ় বয়সের। সেগুলির মধ্যে তিনি

কোন্ কোন্‌টি সর্ব্বাগ্রে লিখিয়াছিলেন, কোন্‌গুলিই বা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার ইংরেজী গীতাঞ্জলি তাঁহার প্রথম প্রকাশিত ইংরেজী রচনা নহে। আমরা যতদূর জানি, তাঁহার কবিতার স্বকৃত প্রথম ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম যেগুলি ছাপা হইয়াছিল, তৎসমুদয় কোন্ বৎসরের কোন্ মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইয়াছিল, নীচে তাহার তালিকা দিতেছি।

The Far Off ("সুদূর")—February, 1912.

ইহার হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Sparks from the Anvil ("কণিকা" হইতে)—April, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Infinite Love ("অনন্ত প্রেম")—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

The Small—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Youth—September, 1912.

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

Inutile—November, 1912.

Poems ("কণিকা" হইতে)—November, 1913

হস্তলিপি রক্ষিত হইয়াছে।

এই শেষোক্ত কবিতাগুলি ১৯১২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত ছোট কবিতাগুলির সহিত একই সময়ে অনুবাদিত এবং একখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজেই লিখিত।

১৯১১ সালের শেষে কিংবা ১৯১২-র গোড়ায় আমি কবিকে তাঁহার বাংলা কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করি। তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এবং ছাত্রাবস্থার পর হইতে যে ইংরেজী রচনার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে পরিহাসচ্ছলে তাহাই জানাইবার জন্য আমাকে লেখেন :—

"বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন জলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে?"

কিন্তু তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিল না। তিনি "কণিকা" হইতে কতকগুলি ছোট কবিতা অনুবাদ করিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভবনের দুতলার বৈঠকখানার একটি কামরায় আমাকে সেগুলি দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে এই মর্ম্মের কথা বলিলেন, "দেখুন তো মশায়, এগুলো চলে কি না—আপনি তো অনেকদিন ইস্কুলমাষ্টারী করেচেন!" এইরূপ পরিহাস উপভোগ আমার মত অন্য কোন কোন ইস্কুলমাষ্টারের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। এই অনুবাদগুলিই মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহার আরও অনেক ইংরেজী কবিতা ও গদ্য রচনা মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে ছাপা হইয়াছে। সেগুলি ইংরেজী গীতাঞ্জলির পরের রচনা বলিয়া তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না।

১৩৩৯ ভাদ্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা

রবীন্দ্র-জয়ন্তীর সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা হইবার কথা ছিল। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় উহা স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন। আর্টস্ ফ্যাকালটির ক্লাবেও অধ্যাপকগণ তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিয়াছেন। উভয় সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে তিনি অনেক স্মরণীয় কথা বলিয়াছেন।

তিনি নিজে যে বাল্যকালে স্কুলের প্রতি বীতরাগ ছিলেন, এই কথাটির আভাস বা উল্লেখ তাঁহার কোন কোন বক্তৃতায় থাকে। বক্ষ্যমান সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেও তাহা ছিল। তাহাতে স্কুলপলাতক নির্ব্বোধ ছাত্রদের মনে হইতে পারে কি-না, যে, স্কুল বয়কট করা রবীন্দ্রনাথ হইবার একটা সোজা উপায়, তাহা আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু স্কুলের সহিত বাল্যকালে তাঁহার আড়ি সম্বন্ধে কবি যাহা বলেন, তাহা হইতে যদি কেহ মনে করে, যে, তিনি লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে কম পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে, রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতি অনিচ্ছাকৃত অবিচার করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই, যে, বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য তিনি বাল্যকালে সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পড়িয়াছিলেন, বাংলা স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষা পাস করিবার জন্য যেরূপ যত্নসহকারে উহা পড়িয়া থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে কম পড়েন নাই। ইংরেজী বহির অনুবাদ তিনি কৈশোরে যেমন করিতেন, তাঁহার মত পরিশ্রম করিয়া কয় জন ছাত্র সেরূপ করেন জানি না। বিদ্যার নানা শাখার এত বেশীসংখ্যক বহি তাঁহার মত যত্ন করিয়া পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত অল্পসংখ্যক লোকেই পড়িয়াছেন। সুতরাং পড়াশুনা না করা, পরিশ্রম না করা, রবীন্দ্রনাথ হইবার একটা উপায় নহে। অবশ্য তাহা বলা কবিরও অভিপ্রায় নয়।

তিনি বলিয়াছেন, শুধু প্রবেশিকায় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সব রকম শিক্ষাতেও বাংলা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা আগে আগে যাহা বলিয়াছি তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম "বিশ্ববিদ্যালয়ে নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত বাংলা চলা উচিত।" তাহার সপক্ষে যুক্তি এবং নজীরও আমরা ঐ সংখ্যায় দিয়াছি। বিশবিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষাকে আমাদের মাতৃভাষার মধ্য দিয়া দেয়া উচিত এবং তাহা করা যে অসাধ্য নহে, তাহা বোম্বাইয়ে গত জুন মাসে ভারতীয় মহিলা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিদান সভায় আমার অভিভাষণে আমি দেখাইয়াছিলাম। ঐ বক্তৃতা জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে ছাপা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপকতা

রবীন্দ্রনাথ যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক দুই বৎসরের জন্যও হইয়াছেন, তাহা আনন্দের বিষয়। কিন্তু যিনি একদা স্যর উপাধি বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার চাকুরির মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয়কে গবর্ন্মেণ্টের নিকট লইতে হইবে, ইহা বাঙালী জাতির পক্ষে সম্মানকর নহে। তাঁহাকে যে বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই পারিশ্রমিকে ৰীডার নিযুক্ত করিলে গবর্ন্মেণ্টের অনুমোদন চাহিতে হইত না। তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলে বাংলা শব্দতত্ত্ব এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধেও তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারেন। বহু বৎসর পূর্বে যখন অন্য কেহ বাংলায় শব্দতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করিতেন না, তিনি তখন তাহা করিয়াছিলেন। বাংলা এম্-এ ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহাকে এই সব বিষয়ে কিছু বলিতে রাজী করিতে পারিলে লাভবান্ হইবে। শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার দক্ষতা আছে। তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে কীট্‌স ও শেলীর কলেজপাঠ্য ইংরেজী কবিতা কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, তাহা আমরা নিজে শুনিয়া তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্যের বিষয় জানি। বাংলা এম্-এ ক্লাসের ছাত্রেরা তাঁহার কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা যদি তাঁহার কাছে পড়িতে চায় এবং তিনি যদি তাহাদিগকে পড়ান, তাহা হইলে তাহারা উপকৃত হইবে।

তাঁহার দক্ষিণার কথাটা যে প্রকারে সেনেটের অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের পক্ষে প্রীতিকব হয় নাই। "রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক" দীনেশচন্দ্র সেনের বেতনের অর্দ্ধেক পরিমাণ টাকা রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁহাকে নীচু দরের এবং দীনেশবাবুকে তাঁর চেয়ে উঁচু দরের মানুষ মনে করিবে, এমন মূর্খ সম্ভবতঃ বাংলা দেশে নাই। তাহা হইলেও টাকা যখন দেওয়াই হইবে, তখন পূরা টাকাই তাঁহাকে দিলে তাঁহার সম্মান রক্ষিত হইত। কোন কাজ না করিয়া কিংবা রবীন্দ্রনাথ যাহা করিবেন তাহা অপেক্ষা কম কাজ ও নিকৃষ্ট কাজ করিয়া অন্য কোন কোন অধ্যাপক তাঁর চেয়ে বেশী টাকা পাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বস্তুতঃ দীনেশবাবুর জায়গায় নিযুক্ত হন নাই। কিন্তু দীনেশবাবুর বেতনের বাকী অংশে আরও কিছু টাকা যোগ করিয়া যাঁহাকে তাঁহার স্থলে নিযুক্ত করা হইবে, তাঁহাকে দীনেশবাবুর চেয়ে নীচু দরের লোক কেহ মনে করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিবে না। এরূপ একটা অসম্মানকর অনুমান সত্ত্বেও আজকালকার আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে এই চাকরি লইবার লোকের অভাব হইবে না।

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য এখন হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষায় অনেক পাঠ্যপুস্তক লেখাইবেন। এরূপ সময়ে ভাষা বিষয়বিন্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ বিশেষ কাজে লাগিবে।

বিশ্বভারতী-সংবাদ

গত জুলাই মাস হইতে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে নানা সংবাদ দিবার জন্য ইংরেজীতে "বিশ্বভারতী নিউস" নামক একটি মাসিক সংবাদপত্র শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত এক টাকা। এরূপ একটি পত্রিকার প্রয়োজন ছিল। পূর্ব্বে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় এইরূপ সংবাদ থাকিত। তাহা অনেক বৎসর হইল উঠিয়া গিয়াছে। বিশ্বভারতী নিউসে ছোট ছোট প্রবন্ধও আছে। জুলাই সংখ্যায় ডাক্তার টিম্বার্সের লেখা গ্রামের স্বাস্থ্যবিধান পদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রামহিতৈষীদের কাজে লাগিবে।...

১৩৩৯ চৈত্র

নোবেল প্রাইজ পাইবার আগে রবীন্দ্রনাথের আদর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক পাদরী এড্‌ওয়ার্ড টমসনের সঙ্গে আমার মধ্যে মধ্যে পত্রব্যবহার হইত। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে এদেশে তাঁহাকে পুঁছিত না, মিঃ টমসন তখন একবার এইরূপ মত প্রকাশ করায়, আমি তাঁহাকে জানাই, যে, ঐ মত ভ্রান্ত। প্রমাণস্বরূপ আমি রবিবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করি। সেই উপলক্ষ্যে 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিক পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাও নকল করিয়া পাঠাই। তাহাতে মিঃ টমসন নিজের ভ্রম স্বীকার করেন। এই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ত্তির উৎসব নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে হইয়াছিল।

সম্প্রতি 'কলিকাতা রিভিউ' মাসিক পত্রের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় মিঃ কে সি সেন একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Dr. Tagore was not much thought of in his own country until the Nobel Prize was received by him. He personally complained of the short-comings of his Indian neighbours when the latter hastened to honour him after the Swedish award."—*The Calcutta Review* for February 1933, p. 232.

তাৎপর্য্য। ডক্টর ট্যাগোর নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের দেশে তাঁহার (কাব্যাদিসমূহ) সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা ছিল না। সুইডেনের ঐ পুরস্কার ঘোষণার পর যখন তাঁহার ভারতীয় প্রতিবেশীরা তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য ত্বরান্বিত হয়, তখন তিনি স্বয়ং তাহাদের ত্রুটির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

প্রথমে লেখকের নিজের মন্তব্যের প্রতিবাদ করি। রবীন্দ্রনাথ যখন ৫০ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন, তাহার কিছু পরে এবং নোবেল প্রাইজ পাইবার অনেক আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উদ্যোগে কলিকাতার টাউন-হলে তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভবনেও তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হয়। এই সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক পূর্ব্বের এই স্বরচিত গানটি পাঠ করেন :—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর।
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা', দেখাইতে পুনর্ব্বার।
হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের শ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি,' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ওভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।

কলিকাতা টাউন-হলে কবির যে সম্বর্দ্ধনা হয়, ১৩১৮ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী' হইতে তাহার বর্ণনার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বর্ত্তমান বৎসর বৈশাখ মাসে কবি রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়া একান্ন বৎসরে পদার্পণ করেন। তদুপলক্ষ্যে বোলপুরে তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ সবান্ধবে তাঁহার জন্মোৎসব করেন এবং তাঁহাকে প্রীতি ও ভক্তির অঞ্জলি অর্পণ করেন। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদের এমন আদানপ্রদান আমরা কখনও দেখি নাই। তৎপরে গত ১৪ই মাঘ কলিকাতা টাউন-হলে বঙ্গীয়- সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বাঙ্গালী জাতির এক সভায় কবির সম্বর্দ্ধনা হয়। টাউন-হলে এই উপলক্ষ্যে এরূপ জনতা হইয়াছিল, যে, যাঁহারা অল্পমাত্র বিলম্বে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবেশ করিতে না পারিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিম্বা ফিরিয়া আসিযাছিলেন। সভাস্থলে আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। সাধুতা ও উন্নত চরিত্রের জন্য যাঁহারা সুপরিচিত, যাঁহারা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নত, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী, যাঁহারা চিত্রে সঙ্গীতে বাণীর বর লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও জ্ঞানানুশীলনে নিরত, যাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রাচীন সংস্কৃত বিদ্যার প্রদীপ এখনও নিবিতে দেন নাই, যাঁহারা ব্যবহারাজীবের কার্য্যে খ্যাতি লাভ করিযাছেন, যাঁহারা রাজনীতিকুশল, যাঁহারা বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে বঙ্গে নবযুগের প্রবর্ত্তক, যাঁহারা আভিজাত্যে ও ঐশ্বর্য্যে বঙ্গে অগ্রণী, তাঁহাদের স্ব-স্ব শ্রেণীর প্রতিনিধিকল্প বহু কৃতী পুরুষ ও মহিলা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গমাতার কন্যাগণও কবিকে প্রীতিভক্তিকৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। জাতীয় কবির সম্বর্দ্ধনা ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই মত পবিত্র। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন বঙ্গের যুবকগণ। তাঁহাদের উৎসাহদীপ্ত মুখশ্রী হলের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছিল।"

"টাউন-হলের সভা ভিন্ন আরও একদিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ, এবং একদিন সম্বর্দ্ধনা কমিটির সভ্যগণ সান্ধ্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথকে প্রীতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে চৌরঙ্গীর ফোটোগ্রাফার হপ সিং এণ্ড্ কোম্পানী "জগৎকবি-সভা"র একটি ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ছবির নীচে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে রচিত এই দুই পংক্তি কবিতা লিখিত ছিল :—

"জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব;
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।"

এই চিত্রে শেকস্‌পীয়র, টলস্টয়, গাটে, ভিক্টর হিউগো, বার্ণস, ওয়াল্ট হুইটম্যান, ও মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিল। এই চিত্রের প্রতিলিপি ১৩২০ সালের শ্রাবণের প্রবাসীর ৪৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীদের অবহেলা ও অনাদরের পাত্র ছিলেন না, পরন্তু তাহাদের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিন্দুক তখন ছিল, এখনও আছে। তিনি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর নিন্দুকদের প্রকাশ্য নিন্দা কমিয়াছে, এই প্রভেদ।

তিনি নোবেল প্রাইজ পাইবার পর যাঁহারা কলিকাতা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেন করিয়া শান্তিনিকেতনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে গিয়াছিলেন, কবি তাঁহাদের অভিনন্দনের উত্তরে কিছু স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছিলেন বটে। আমরা এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা ঘটিবার পর প্রকাশিত প্রবাসীর কোন সংখ্যায় উহার উল্লেখ করি নাই; সমালোচনা ত করিই নাই। এখন কলিকাতা রিভিউয়ের লেখকের কথার প্রতিবাদ উপলক্ষ্যে উহার উল্লেখ করিতে হইল। কিন্তু সমালোচনা এখনও করিব না। তাঁহার ভুল হইয়াছিল, আমাদের ধারণা এইরূপ।

১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ

শান্তিনিকেতন কলেজ

ম্যাট্রিকুলেশ্যন ও ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষার ফল বাহির হইতে বেশী দেরি নাই। যাঁহারা তাহার পর কলেজে আরও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে অতঃপর কলেজ খুঁজিতে হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া কালচার বা কৃষ্টির জন্য আবশ্যক অন্য কতকগুলি বিষয়ও শিখিতে চান, প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকিতে চান, বঙ্গের গ্রাম্য-জীবন পুনর্গঠন-প্রণালী শিখিতে চান, সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, চৈনিক ও তিব্বতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় চান, তাঁহাদের পক্ষে শান্তিনিকেতন কলেজ প্রকৃষ্ট শিক্ষাক্ষেত্র। নানা দিক দিয়া এখানকার গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য আছে। সংগীত চিত্রাঙ্কনাদি শিখাইবার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকায় এবং এখানে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দে মুক্ত আকাশের তলে দীর্ঘ ভ্রমণ ও নির্ম্মল বায়ুসেবনের সুবিধা থাকায় এই কলেজ ছাত্রীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কলেজে মোট এক শতের বেশী ছাত্র-ছাত্রী লওয়া হয় না বলিয়া অধ্যাপকেরা প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর অভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে সমর্থ। গ্রীষ্মের ছুটির পর মোটে ষাটটি ছাত্র-ছাত্রী লওয়া হইবে। প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যার বিজ্ঞাপনসমূহের মধ্যে শান্তিনিকেতন কলেজের ইংরেজী বিজ্ঞাপনে অন্য নানা জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে।

১৩৪০ ভাদ্র

নৃত্য-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

যাঁহারা সকল রকম নৃত্যের— বিশেষতঃ বালিকা ও নারীদের সকল রকম নৃত্যের—বিরোধী, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে সকল নাচের, এমন কি বাই-নাচেরও, সমর্থক মনে করেন। বলা বাহুল্য, তিনি বাস্তবিক তাহা নহেন। নৃত্য সম্বন্ধে তাঁহার মত উদয়শঙ্করকে তাঁহার নিম্নমুদ্রিত আশীর্ব্বাদ হইতে বুঝা যাইবে।

"উদয়শঙ্কর,

তুমি নৃত্যকলাকে সঙ্গিনী ক'রে পশ্চিম মহাদেশের জয়মাল্য নিয়ে বহুদিন পরে ফিরে এসেছ মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি তোমার জন্য রচনা ক'রে রেখেছে—জয়মাল্য নয়—আশীর্ব্বাদপূত বরণমাল্য। বাংলার কবির হাত থেকে আজ তুমি তা গ্রহণ করো।

"আশ্রম থেকে তোমাকে বিদায় দেবার পূর্ব্বে একটি কথা জানিয়ে রাখি। যে কোনো বিদ্যা প্রাণলোকের সৃষ্টি—যেমন নৃত্যবিদ্যা—তার সমৃদ্ধি এবং সংবৃদ্ধির সীমা নাই। আদর্শের কোনো একটি প্রান্তে থেকে তাকে ভারতীয় বা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নামের দ্বারা চরম ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা বিহিত নয়, কারণ সেই অন্তিমতায় মৃত্যু প্রমাণ করে। তুমি দেশবিদেশের নৃত্যরসিকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান পেয়েছ, কিন্তু আমি জানি তুমি মনে মনে অনুভব করেছ যে, তোমার সামনে সাধনার পথ এখনো দূরে প্রসারিত, এখনো তোমাকে নূতন প্রেরণা পেতে হবে, উদ্ভাবন করতে হবে নব নব কল্পমূর্ত্তি। আমাদের দেশে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'কেই প্রতিভা বলে। তোমার প্রতিভা আছে, সেই কারণেই আমরা আশা করতে পারি যে, তোমার সৃষ্টি কোনো অতীত যুগের অনুবৃত্তিতে বা প্রাদেশিক অভ্যস্ত সংস্কারে জড়িত হয়ে থাকবে না। প্রতিভা কোনো সীমাবদ্ধ সিদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকে না, অসন্তোষই তার জয়যাত্রাপথের সারথি। সেই পথে যে-সব তোরণ আছে তা থামবার জন্যে নয়, পেরিয়ে যাবার জন্যে।

"একদিন আমাদের দেশের চিত্তে নৃত্যের প্রবাহ ছিল উদ্বেল। সেই উৎসের পথ কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। অবসাদগ্রস্ত দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ। তার শুষ্ক স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার অবশেষ আছে সে পঙ্কিল এবং ধারাবিহীন। তুমি এই নিরাশ্বাস দেশে নৃত্যকলাকে উদ্বাহিত ক'রে আনন্দের এই বাণীকে আবার একবার জাগিয়ে তুলেছ।

"নৃত্যহারা দেশ অনেক সময় এ-কথা ভুলে যায় যে, নৃত্যকলা ভোগের উপকরণমাত্র নয়। মানবসমাজে নৃত্য সেইখানেই বেগবান, গতিশীল, সেইখানেই বিশুদ্ধ, যেখানে মানুষের বীর্য্য আছে। যে দেশে প্রাণের ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্ত, নৃত্যে সেখানে শৌর্য্যের বাণী পাওয়া যায়। শ্রাবণমেঘে নৃত্যের রূপ তড়িৎ-লতায়, তার নিত্যসহচর বজ্রাগ্নি। পৌরুষের দুর্গতি যেখানে ঘটে, সেখানে নৃত্য অন্তর্দ্ধান করে, কিংবা বিলাসব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে আবিষ্ট হয়ে তেজ হারায়, স্বাস্থ্য হারায়, যেমন বাইজীর নাচ। এই পণ্যজীবিনী নৃত্যকলাকে তার দুর্ব্বলতা থেকে তার সমলতা থেকে উদ্ধার করো। সে মন ভোলাবার জন্যে নয়, মন জাগাবার

জন্যে। বসন্তের বাতাস অরণ্যের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ও সফলতায় সমুৎসুক ক'রে তোলে। তোমার নৃত্যে ম্লানপ্রাণ দেশে সেই বসন্তের বাতাস জাগুক, তার সুপ্ত শক্তি উৎসাহের উদ্দাম ভাষায় সতেজে আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়ে উঠুক, এই আমি কামনা করি। ইতি।"

কবির এই আশীর্ব্বচন গত ২৮শে আষাঢ় উদয়শঙ্করের শান্তিনিকেতন আশ্রম দর্শন ও তথায় নিজ নৃত্যপ্রদর্শন উপলক্ষ্যে উচ্চারিত হইয়াছিল। ইহা আশীর্ব্বাদ বলিয়া ইহাতে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই সমালোচনা সুস্পষ্ট করেন নাই। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গো উদয়শঙ্করের দলের কোন কোন নৃত্য সম্বন্ধে কবির মত আমরা জানিয়াছি। উদয়শঙ্করের নৃত্যশিক্ষা রাজপুতানার কোন কোন রাজধানীতে হইয়াছিল। মুসলমান আমলের বিলাস ও ভোগলালসার উদ্দীপক পেশাদার নর্ত্তকীদের নৃত্যই সেখানে চলিত আছে। বাইনাচকে ও বাইজীদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের নাচকে কবি নিন্দনীয়, অননুকরণীয়, এবং সুরুচিসম্পন্ন দ্রষ্টাদের পীড়াদায়ক মনে করেন বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি।

প্রশংসায় উদয়শঙ্কর অহঙ্কৃত হইয়া যান নাই। তিনি নম্র প্রকৃতির লোক। তাঁহার কৃতিত্ব সমজদার লোকদের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও তিনি নিজে মনে করেন, যে, এখনও নৃত্যকলায় তাঁহার অনেক শিক্ষণীয় ও উদ্ভাবনীয় আছে। তিনি কবিকে বলিয়াছেন, আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার শিক্ষালাভে যত্নবান হইবেন।

কবি মণিপুরের নৃত্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন।

১৩৪১ ভাদ্র
বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব

খবরের কাগজে দেখিলাম, গত অনেক বৎসরের মত এই বৎসরও বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব হইয়াছিল। ২৭শে শ্রাবণ রবিবার এই উৎসব হয়। ইউনাইটেড্ প্রেস্ তাহার নিম্নমুদ্রিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ প্রাতে এখানে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। চারি দিকে আগ্রহান্বিত জনতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া খোলা মাঠের একধারে কবি উৎসবের পুরোধা রূপে বসিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রীরা গান গাহিতে গাহিতে, হাতে মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লইয়া শোভন ভঙ্গীতে উৎসবক্ষেত্রে আসিল। ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইল। শেষে কবি তাঁহার স্বাভাবিক বাচনপটুতা সহকারে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে কতকগুলি গাথা আবৃত্তি করিলেন। উৎসবের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। উৎসবান্তে এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গেল। ইহাতে সকলে প্রীত হইয়াছিলেন।

বিশ্বভারতীর পল্লী-সংস্কার বিভাগ শ্রীনিকেতনে বিকালবেলা হলকর্ষণ উৎসব সম্পন্ন হইল। যাহাতে প্রাণের পোষক প্রচুর অন্ন উৎপন্ন হয়, উৎসবের ইহাই অর্থ। বিশ্বভারতীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূমিতে হলসংযোগ করেন। এই উপলক্ষে কবি যে গানটি রচনা করেন, তাহাতে

গ্রামের সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য একটি গভীর আবেদন ছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামের সমবায়সমিতিসমূহের বহু কৃষক তাহাদের ভাল বলদ ও লাঙ্গল প্রদর্শন করিবাব জন্য আনিয়াছিল।

অতঃপর বিশ্বভারতীর উদ্যোগে বিভিন্ন পল্লীসংস্কার-সমিতির সদস্যগণের একটি সভা হয়। সমবায়-সমিতি-সমূহের রেজিস্ট্রার খান-বাহাদুর আরসাদ আলা সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ও নেপালচন্দ্র রায় এই সভায় বক্তৃতা করেন।

সন্ধ্যার পর শান্তিনিকেতনে কবির নূতন নাটক "শ্রাবণধারা" অভিনীত হয়। কবি নিজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীত এবং আলোক ও বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গানের সহিত যোগ হইয়াছিল সুরের, আবার তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল সঙ্গীতার্থব্যঞ্জক নৃত্য। আকাশ হইতে তৃষাহারা ধারা নামিয়া আসুক—সঙ্গীত ও নৃত্য এক সুরে এই প্রার্থনা জানাইয়াছিল।

নানাস্থান হইতে বহু অতিথি উৎসব উপলক্ষে সমাগত হইয়াছিলেন।

'পৃথিবীর নানা দেশের অনেক উৎসব আদিতে ঋতু-উৎসব ছিল। আমাদের দেশের অনেক উৎসবও তাই। নানা দেশে এই সব উৎসবের অনেকগুলি এখনও অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থলে লোকে তাহার উৎপত্তির কারণ ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল নিয়মরক্ষা ও আমোদপ্রমোদের জন্য অনেক স্থলে ঐ উৎসবগুলি হয়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঋতুর বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি ও ভাব এবং তাহা হইতে লব্ধ আনন্দ ও অনুপ্রাণনা লোকে সে-সব স্থলে অনুভব করে না। বিশ্বভারতীর বর্ষা-উৎসব নূতন প্রবর্ত্তিত, এবং এক জন মনীষী ও কবির দ্বারা প্রবর্ত্তিত। ইহা তাঁহার পৌরোহিত্য ও নেতৃত্বে তাঁহার রচিত গান ও নাটকাদি এবং তাঁহার উদ্ভাবিত নৃত্যের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য ইহার কর্ম্মী, দর্শক ও শ্রোতারা, রসানুভূতি ও আত্মিক যোগ্যতা থাকিলে, কবির উপলব্ধ সময়োচিত ভাব, আনন্দ ও অনুপ্রাণনা লাভ করিয়া থাকেন।

১৩৪৩ আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ ও 'মোহাম্মদী'

মাসিক 'মোহাম্মদী'তে (প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদের চেষ্টায় পুষ্ট) বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালান হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাও রেহাই পায় নাই। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁহার কোন কোন লেখাব উপর আক্রমণের উত্তর দিয়া ঐ মাসিককে সম্মানিত করিয়াছেন। এইরূপ সম্মান পুনর্ব্বার প্রদর্শন করিতে তিনি বাধ্য না হইলে আশ্বস্ত হইব। তিনি লিখিয়াছেন—

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "মোহাম্মদী" পত্রখানি আমার হাতে এল।

বাংলা প্রবেশিকা পাঠ্যপুস্তক যে অপাঠ্য লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। আমার রচনাও তার দৃষ্টান্ত জুগিয়েছে। নমুনাস্বরূপে

সেই অংশটুকু নিয়েই আমি আলোচনা কবব।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন—

সাহিত্যের আসরে নেমে অবধি আমার বিরুদ্ধে অনেক অত্যদ্ভুত অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়েছে; তৎসত্ত্বেও আজ যা শোনা গেল, এতটা প্রত্যাশা করি নি। সমস্তটা উদ্ধৃত করতে হোলো, পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাই।

তদনন্তর পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য চলিয়াছে। যথা—

"পূজারিণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌত্তলিকতার একেবারে চূড়ান্ত। 'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,'—বিশ্বের দরবারে বিশ্বকবির উপযুক্ত messageই বটে! আলোকেব দুয়ারে এ যেন অন্ধকারের আহ্বান! ইহাও কি এ যুগে চলিবে?

"গান্ধারীর আবেদন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কুরুপাণ্ডবের কাহিনী। নারীত্বের প্রতি লাঞ্ছনা এবং ন্যায়ের প্রতি অবিচারই এই কবিতার অন্তরালে উঁকি মারিতেছে। মজার কথা এই, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারকে ধৃতরাষ্ট্র এক অদ্ভুত যুক্তিবলে সমর্থন করিয়া যাইতেছেন। গান্ধারী যখন বলিতেছেন যে, পাপাচারী দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ কর, তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন :—

'এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপাণ্ডুগণ, তখন ধর্ম্মের সাথে সন্ধি করা মিছে।'

"চমৎকার যুক্তি এ! তাহা হইলে-একবার পাপ করিলে তাহার আর উদ্ধার নাই! সারা জীবন তাহাকে পাপ করিয়াই যাইতে হইবে? এ কথা শুনিলে নিরাশায় মানুষের চিত্ত ভরিয়া উঠিবে, পক্ষান্তরে পাপেব স্রোত নিরুদ্ধগতিতে বহিয়া চলিবে। মানুষ পাপ কবিতে পারে, তবু তাহার মুক্তির আশা আছে; কিন্তু যেদিন হইতে সে পাপের সহিত সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিবে. সেদিন তাহার ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকারময়। একবার পাপ করিলে আর ধর্ম্মের পথে ফিরিয়া আসায় কোন লাভ নাই—এই মারাত্মক ভ্রান্ত বিশ্বাস কিছুতেই মানুষের মনে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নয়।"

এই কথাগুলার উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে হইবে।

দেশের কোন পরিচিত লোককে যদি নিন্দা করতেই হয়, নিন্দার অহৈতুক আনন্দেই হোক্ অথবা কোনো উদ্দেশ্যমূলক কারণেই হোক, অন্তত সেটা বিশ্বাস্য হওয়া চাই। নইলে বুদ্ধির প্রতি দোষ আসে। কাব্যে আমি পৌত্তলিকতা প্রচার করেছি অথবা পাপ একবার সুরু করলে সেটা একেবারে চূড়ান্ত করাই কর্ত্তব্য, এই নীতিটাকে "মানুষের মনে বদ্ধমূল" করবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর, আমার সম্বন্ধে এমন অপবাদ বাংলার মতো দেশেও সম্ভবপর হোতে পারে,—এ আমি কল্পনাও করি নি!

লেখক বলবেন, তাঁর স্বপক্ষের দলিলসুদ্ধ তিনি দাখিল করেছেন। অস্বীকার করবার জো নেই যে আমার কাব্যে অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদ করবার উপলক্ষ্যে বলেছেন, "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার," আর ধৃতরাষ্ট্রও বলেছেন বটে, "এতকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ।"

এমনতরো অদ্ভুত যুক্তি নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। যদি বলি লেখক যা বলছেন নিজেই তা বিশ্বাস করেন না, তা হোলে সেটা রূঢ় শোনায়; আর যদি বলি করেন, তবে সেটাও কম রূঢ় হয় না।

অর্থাৎ লেখককে হয় কপটাচারী নয় মূর্খ বলিতে হয়। অথচ এই দুটি শব্দের কোনটিই সম্মানব্যঞ্জক নয়।

লেখক পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে সব কথা বলানো হয়, সে কথাগুলিতে কবির

কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্‌টে 'The Arch-Fiend' বলছেন :—

"To do aught good never will be our task, but ever to do ill our sole delight."

সন্দেহ নেই, কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনো মাসিক পত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিল্টনকে এ ব'লে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বর-বিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস্ লস্টাকে উচ্ছেদ করবার প্রস্তাব এখনো শোনা যায় নি; কিন্তু বাংলাদেশে কখনই শোনা সম্ভব হোতে পারে না, জোর ক'রে এমন কথা বলার মুখ আজ আর রইল না।

ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

আমি যে ধৃতরাষ্ট্র নই, সে কথা প্রমাণ করা এতই সহজ যে, সে আমি চেষ্টাও করব না। স্বয়ং শেক্সপীয়রকেও প্রমাণের চেষ্টা করতে হয় নি যে, তিনি লেডি ম্যাকবেথ নন বা তাঁর পক্ষে ওকালতনামা নেন নি। তাই রাজহত্যায় স্বামীকে উৎসাহিত করা উপলক্ষ্যে তাঁর নাটকের পাত্রীর মুখে এমন কথা নিশ্চিন্ত মনে বসাতে পেয়েছেন :—

Infirm of purpose!
Give me the daggers :
the sleeping and the dead
are but as pictures.

শেক্সপীয়রকে এমন উপদেশ বিস্তারিত করেই দেওয়া যেতে পারত যে, একখানা ছবি মুছে ফেলা ও নিদ্রিত মানুষকে হত্যা করা একই, এমন কথা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশ্রদ্ধেয়; বরঞ্চ নিদ্রিত মানুষকে বধ করার কেবল যে নরহিংসার পাপ আছে তা নয়, তার সঙ্গে কাপুরুষতা জড়িত। এই উপদেশকে আরো পল্লবিত করা যেতে পারে, কিন্তু নিরস্ত হলুম। কেননা সম্পাদক নিশ্চয়ই বলতে পারেন শেক্সপীয়রের মুখে যা সাজে রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষুদ্র পাপীর মুখে তা শোভা পায় না। এমন কথা বলবার আশঙ্কা আছে, এই প্রবন্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাই।

প্রমাণ তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে দিয়াছেন।

লেখক অধ্যাপক খগেন্দ্র মিত্রের একটা গল্পের উল্লেখ করে বলেছেন :—

"এই গল্পে নরপূজার এক কুৎসিত চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। মানুষকে সাক্ষাৎ ভগবানের আসনে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গল্প পাঠে মানুষের নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য্য।"

ইহার উপর কবির মন্তব্যটুকু 'মোহাম্মদী'র লেখক হজম করিতে পারিবেন। অতএব তাহা উদ্ধৃত করায় কোন দোষ নাই।

আমার নৈতিক সৌভাগ্যবশতঃ গল্পটি পড়ি নি, কিন্তু হিজ হাইনেস আগা খাঁয়ের বিবরণ জানি এবং সকলেই জানে। নরপূজা হিন্দুর লেখা গল্পে থাকলে নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য্য হয়, কিন্তু মুসলমান সমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রনায়কের ব্যবহারে থাকলে দোষ স্পর্শে না, এই প্রসঙ্গে এ কথাটা চিন্তার বিষয় হয়েছে।

"হিজ হাইনেস আগা খাঁয়ের" ব্যবহারে নরপূজা কি কি আকারে আছে, তাহা গত নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রবন্ধ ও তাহার সমর্থক আগা খাঁয়ের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মন্তব্য পড়িলে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।

ইহার পর কবি কিছু অবান্তর অথচ সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে একটা বাহুল্য কথা বলে নিই, কেননা দুঃসময়ে বাহুল্য কথাও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। জনশ্রুতি এই যে ভৈরব রাগ মহাদেবের বাংলা গানের জন্যেই প্রবর্ত্তিত, আর শুনলেই বুঝা যায়, মিঞা মল্লার বাদশাহী আসরের ফরমাসেই রূপ নিয়েছে। কিন্তু তবুও ভৈরব বা ভৈরবী হিন্দু নয়, আর মুসলমান নয় মিঞা মল্লার। ওরা সম্প্রদায়ের অতীত। তেমনি হোমরের ইলিয়ড বা মিল্টনের

প্যারাডাইস্ লস্ট মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়—ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ-বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্ত্তব্য, ধর্ম্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।

'মোহাম্মদী'র আক্রমণটা নূতন নয়। বাংলার সরকারী "পাঠ্যনির্ব্বাচন বিভাগের মুসলমান পক্ষ" পূর্ব্বেই ইহার নজীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার 'কথা ও কাহিনী'তে "বিচারক" নামক কবিতার একস্থানে আছে, মরাঠা রঘুনাথ রাও মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে বলছেন,—

"চলেছি করিতে যবন নিপাত
জোগাতে যমের খাদ্য।"

"যবন" শব্দটা কালক্রমে হয়তো শ্রুতিকটু হয়েছে। তাই সাধারণত নিজের জবানীতে মুসলমানদের সম্বন্ধে ঐ শব্দ কখনই ব্যবহার করি নে। কিছুকাল হোলো পাঠ্যনির্ব্বাচন বিভাগের মুসলমান পদ থেকে আদেশ এল ঐ "যবন" শব্দটা তুলে দিতে হবে। বিস্মিত হলেম। দুর্ব্বল পক্ষ আমরা, ভাবলাম এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া আর কোথাও এমন উৎপাত সম্ভব হোতে পারত না। মার্চ্চেন্ট অব ভেনিসে খ্রীষ্টান বারেবারে ইহুদিকে কুকুর ব'লে গাল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত বইখানাতে ইহুদির 'পরে অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, তা না হোলে ওর নাটকীয় বাস্তবতার অপলাপ হ'ত। তৎসত্ত্বেও [ইহুদি] লর্ড রেডিং যখন এখানে ভাইসরয় ছিলেন তখন ঐ বইটাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণী থেকে সরাবার জন্যে পরোয়ানা জারি করেন নি। আর [ইহুদি] ডিজরেলির মত প্রখর বক্তা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ ছিলেন। অথচ কাব্যে মরাঠা পাত্রের মুখে উচ্চারিত সামান্য একটা "যবন" শব্দের জন্য বাংলা সাহিত্য যদি লাঞ্ছিত হ'তে পারে, তাহ'লে এই মাথাগুণতির দিনে কার দরজায় দোহাই পাড়ব? সমস্ত কবিতাটিতে রঘুনাথ রাওকে আদর্শ পুরুষ ব'লেও খাড়া করা হয় নি। তার বিপরীত "যবন" শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যদি অন্যায় সূচিত হয়ে থাকে, সে অন্যায় কবির মধ্যেও নেই, কাব্যের মধ্যেও নেই, বস্তুত সে অন্যায় সাহিত্যকে স্পর্শও করে নি। এই সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ রাও যমের খাদ্য জোগাবার কথা বলেছে। ওটাও তো সাধুলোকের যোগ্য কথা নয়। ঐ পংক্তিটাও বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওথেলো নাটকে এক জন মুসলমান সেনাপতি অন্যায় সন্দেহে তার স্ত্রীকে খুন করেছে। খ্রীষ্টানে মুসলমানে বিবাহ হ'লে মুসলমান স্বামী কর্ত্তৃক এই রকম বীভৎস আচরণ স্বাভাবিক, শেকস্‌পিয়রের রচনার মধ্যে এমন একটা কুৎসিত ইসারা আছে, এই অভিযোগে পাঠ্যনির্ব্বাচন-সমিতির মুসলমান সদস্যেরা কি দণ্ড উত্তোলন করবেন? সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে সুরু হবে?

কবি "উপসংহারের ন্যায়ের অনুরোধে একটা কথা বলা উচিত" মনে করিয়াছেন।

সাহিত্যবিচার নিয়ে এই রকম অদ্ভুত বুদ্ধিবিকার আমার হিন্দু ভ্রাতাদের মধ্যেও উগ্র হয়ে উঠতে পারে, আমি হতভাগ্য তার প্রমাণ পেয়েছি। "ঘরে বাইরে" নামক একখানা উপন্যাস অশুভলগ্নে লিখেছিলাম। তার মধ্যে বর্ণিত সন্দীপ নামক এক দুর্ব্বৃত্তের মুখে সীতার প্রতি অসম্মানজনক কিছু আলোচনা ছিল। বলা বাহুল্য, সন্দীপের চরিত্র-চিত্র পরিস্ফুট করা ছাড়া এই আলোচনার মধ্যে অন্য কোনো অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। হঠাৎ আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কলরব উঠল, সীতাকে স্বয়ং আমিই অপমান করেছি। কবি বাল্মীকি অযোধ্যার প্রজাদের মুখের দুর্ব্বাক্যকে দুর্ম্মুখের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করিয়ে নিরপরাধ সীতার নির্ব্বাসন সম্ভব করেছেন। কেউ তো ত্রেতা যুগের কবির প্রতি দোষারোপ করেন নি। আর এই কলি যুগের কবির মাথায় হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষই একই শ্রেণীর অপরাধ চাপিয়ে যদি তার অখ্যাতিকে দুর্ভর ক'রে তোলেন, তবে কি এই বাংলা দেশের পঙ্কিল

মাটিকেই দায়ী করব? প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া কোনো রকম নৈতিক কাবণ অনুমান করতেও সাহস করি নে।

কবির উল্লিখিত সাহিত্যিক দুর্ঘটনাটা মনে পড়িতেছে বোধ হয়। যিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামী খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহারই পিতার কোন নাটক থেকে সীতাসম্বন্ধীয় কিছু দুর্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।

'মোহাম্মদী'র লেখকের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে সমুদয় মুসলমানের প্রতি প্রযুক্ত ও প্রযোজ্য নহে, তিনি তাহা বলিয়া জবাবটি শেষ করিয়াছেন।

সবশেষে একটি কথা ব'লে বিদায় নেব। আমার কোনো কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ পেয়েছিল। বলেছিলেম, আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছিলেন। পাঠ্য নির্ব্বাচনের মুসলমান সভ্য এটাকে সমস্ত মুসলমানের নিন্দা ব'লেই গণ্য করেছিলেন, নইলে এ লাইনটাকেও বর্জ্জন করতে আদেশ দিতেন না। তাই স্পষ্ট করে ব'লে রাখি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি মোহাম্মদীর প্রবন্ধ-লেখকের অদ্ভুত উক্তি নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটাও এক জনের সম্বন্ধেই। সেটাতে সমগ্র বা অধিকাংশ মুসলমানের বিচারবুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, এ দুর্দ্দিনে এত বড়ো নিন্দার কথা কেউ যেন কল্পনা না করেন। আমি অনেক মুসলমানকে জানি, তাঁদের শ্রদ্ধা করি। অনেকেই তাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা রসজ্ঞ, তাঁরা উদার, তাঁরা মননশীল, নানা ভাষার সাহিত্যে তাঁরা অভিজ্ঞ। অপক্ষপাত সদ্বিবেচনায় তাঁরা কোনো সদাশয় ব্যক্তির চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নন। তাঁরা হিন্দু কি মুসলমান, এ তর্ক মনে ওঠেই না; জানি তাঁরা মানুষের মতো মানুষ।

১৩৪৩ চৈত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বার্ষিক কন্‌ভোকেশ্যনে অর্থাৎ (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়) পদবী-সম্মান-বিতরণ-সভায় কবিসার্ব্বভৌম বাংলায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা এই প্রথম হইল।

কবি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—

দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়।"

বঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় কনভোকেশ্যনের বক্তৃতাকে যে একটি গৌরবের বিষয় বলিয়া সাংবাদিকদিগকে ও অন্য কাহাকেও কাহাকেও বলিতে হইয়াছে, "বিরোধের কণ্ঠে" সে সম্বন্ধে এই টিপ্পনী করিতে হইতেছে, যে, বঙ্গের যে-কোন সভায় বাংলার ব্যবহার যে কর্ত্তব্য তাহা একটি স্বতঃস্বীকার্য্য সত্য, সুতরাং সেই সত্যের অনুসরণ জয়ধ্বনির সহিত ঘোষিত হওয়া "দুভার্গ্য দিনের" একটি "দুঃসহ লক্ষণ"। তথাপি, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে, যে, যাহা স্বতঃস্বীকার্য্য, যে বাধাবশতঃ তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয় নাই, সেই বাধা অতিক্রান্ত হওয়া গৌরবের বিষয় এবং প্রধানতঃ

যাঁহাদের চেষ্টায় তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে তাঁহারা ধন্যবাদভাজন।

আর একটি স্বতঃস্বীকার্য্য সত্য এবার কনভোকেশ্যনে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে— বাঙালী ছাত্রেরা ধুতি পরিয়া পদবী-সম্মান লইতে পারিয়াছে। গাউনের পরিবর্ত্তে দেশী কোন রকম শোভন পরিচ্ছদ ব্যবহৃত হইতে পারিলে পরিবর্ত্তনটি পূর্ণাঙ্গ হইবে। কাগজে বাহির হইয়াছিল যে, কবি এই কারণে গাউন পরিতে রাজী হন নাই যে, উহাতে একটা অবাস্তবতা (unreality) আছে। তাহা সত্য।

কবি এই বলিয়া তাহার বক্তব্য আরম্ভ করেন—

এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তাবিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা যে-বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ সুযোগপ্রাপ্ত সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলঙ্কারপ্রসাধনের সামগ্রী ব'লেই আদরণীয় হয় নি, নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে শ্রী দেবে ব'লেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এই জন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার ক'রে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে সেই শিক্ষার প্রসারসাধন-চেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশ মাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা— ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি, জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটী মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্য্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারা-মরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটী ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশে রাষ্ট্রশাসন এক কিন্তু শিক্ষার সঙ্কোচবশত চিত্তশাসন এক হ'তে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্য-জাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

বলা বাহুল্য, তাহার কারণ সেই সব দেশ স্বাধীন, আমাদের দেশ পরাধীন।

তাঁহার বক্তৃতার শেষে এই প্রার্থনাটি ছিল—

হে বিধাতা,

দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।

টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হ'তে
সবলে ধিক্কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্য্যাদা-বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসঙ্কোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে,
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে॥

ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ভালো হইয়াছিল।

চ্যান্সেলার-রূপী গবর্ণর সর্ জন এণ্ডার্সন একটি ছোট রাজনৈতিক বক্তৃতায় লোককে ইহা জানাইতে চাহিয়াছিলেন, যে, নূতন আইন অনুসারে দেশের লোক নিজেদের স্বদেশী মন্ত্রীদের নিকট হইতেই সব কিছু প্রাপ্তব্য পাইতে পারিবেন—ইংরেজরা এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন! অর্থাৎ এ অবস্থায় যদি দেশের লোকেরা প্রাপ্তব্য না পান, তাহা মন্ত্রীদের দোষ, লোক-প্রতিনিধিদের দোষ এবং নির্ব্বাচক দেশী লোকদের দোষ! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

লাটসাহেবের বক্তৃতাটি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য মার্চ মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে সবিস্তার বলিয়াছি।

১৩৪৪ বৈশাখ

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক বিশ্বভারতী। ১৩৪৩। মূল্য ৩ৢ পৃঃ ৪৯২। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়েও পাওয়া যায়।

'রবীন্দ্র-জীবনী'র বর্ত্তমান খণ্ডে, ১৩১৯ সালে ৫১ বৎসব বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিলাত-যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪৩ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদসভায় তাঁহার সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী কর্ম্মাবলী বিবৃত হইয়াছে। দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন (সাময়িক এমন কি রূঢ় সমালোচনার সহিত অংশতঃ একাত্ম হইয়া থাকিলেও যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি—নিবিড়, সত্য ও একান্ত)—শুধু সার্ব্বভৌম কবির নিকট তাহা নিবেদিত হয় নাই, সর্ব্ববিধ' দৈন্য ভয় ও বন্ধন হইতে যিনি আমাদের মুক্তি চাহিয়াছেন, ও তাহার সাধনকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেও তাহা নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা যথোচিত না হউক কথঞ্চিৎ হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম ও মনীষার আলোচনা এখনও সম্যকরূপে কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সে-বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, নিষ্ঠা ও বহুশ্রম-প্রসূত এই তথ্য-গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিকট সমাদর পাইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, গ্রন্থকার তথ্য-সংগ্রহে যেরূপ প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের গঠনসৌষ্ঠবে 'সেরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে

পারেন নাই; তথ্যের দিক দিয়াও মুখ ও গৌণ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বিষয়ের পরিবর্জ্জনে সেরূপ পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। এই বহি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কোন ভাবমূর্ত্তি পাঠকের মনে জাগ্রত ও বদ্ধমূল হয় না। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ইতিহাস বলা যায় না, বলা উচিত ক্রনিকেল। পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র কর্ম্মময়, কাব্যময় জীবনের ঘটনাগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু মাত্র ক্রনিকেল কি "জীবনী" হইতে পারে? পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে ও দ্রুতগতি বিবরণ-প্রণালীতে আলোচ্য বিষয়ের সত্য পরিচয়ের ধারা গ্রন্থের বহু স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। ক্রনিকেল-রূপে বিচার করিলেও ঘটনাগুলি যথোচিত নৈপুণ্যের সহিত "সাজাইয়া" দেওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ; কেবল ঘটনার পারম্পর্য্যরক্ষাকেই "সাজাইয়া" দেওয়া বলা চলে কি? আলোচ্য বিষয়ের সহিত মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক সময় দূরে সরিয়া গিয়াছেন, বহু সামান্য ও অবান্তর বিষয়েও প্রবেশ করিয়াছেন—তাহাতে মূল বিষয়ের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের আনুকূল্য হয় নাই।

আর একটি কথা। সমব্রতী জীবিত পূর্ব্বতন সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে অপর এক জন সহকর্ম্মীকে সত্যের অনুরোধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত করিতে হইলেও, তাহা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত করা বাঞ্ছনীয়। এই পুস্তকের অনেকস্থানে এই গুণটি লক্ষিত হয় না।

গ্রন্থখানি মূল্যবান বলিয়াই ইহার ত্রুটিগুলি তুচ্ছ করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধারণতঃ বিস্মৃত ও অপরিজ্ঞাত বহু ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এরূপ শ্রম ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ইতিপূর্ব্বে একত্র সঙ্কলিত হয় নাই, গ্রন্থকারই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাংলা শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা। সুতরাং ইহার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, বাংলা ব্যাকরণ। বাংলা চলিত ভাষার অর্থাৎ কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত লোকের ভাষায় সংস্কৃত শাসনের সীমা কত দূর স্বাভাবিক ভাবে আছে এবং কত দূর জোর করিয়া চালানো হইতেছে তাহা এই বইখানির সাহায্য ভাল করিয়া বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় কথা আমরা সকলেই বলি, বাংলায় লিখিও আমরা অনেকে; কিন্তু এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার অবসর আমাদের অল্প লোকেরই আছে। আমরা বাংলার নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ চালাই আবার বাংলার নামে কখনও স্বরচিত ভাষাও চালাই কোন আইন আমরা মানি না। চল্‌তি বাংলা আজকাল সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজের ইচ্ছামত মাতৃভাষাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া সাহিত্যের দরবারে দাঁড় করাইতেছেন। ইহাতে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। কাহার ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া যে তাহারা গ্রহণ করিবে ভাবিয়া পাইবে না। রবীন্দ্রনাথের "বাংলা শব্দতত্ত্ব" বাঙালী প্রত্যেক সাহিত্যিকের পড়া উচিত এবং তাঁহার সপক্ষে বা বিপক্ষে যাহার যাহা বলিবার আছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

এই বইখানিতে বাংলা ব্যাকরণের সমগ্র রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা বৈয়াকরিণকদের বাংলা ব্যাকরণ রচনায় বিশেষ সহায় হইবার অধিকারী।

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' 'ভাষার ইঙ্গিত' ও 'অনুবাদ-চর্চ্চা' এই প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিকদের অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। অন্যগুলিতেও অবশ্য আছে, তবে, সবগুলির নাম এখানে করার প্রয়োজন নাই।

সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান, মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক্ কিছুই আসে যায় না। মানুষ কল্পনার জগতে হোতে চায় নানা খানা, রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমতো হোতে পারলেই খুসি।''

এই কথাগুলিই বার-বার নানা রকমে তিনি এই পুস্তকে বলিয়াছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরও যা বলিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম বলা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। ভূমিকার শেষে তিনি যাহা বলিয়াছেন শুধু সেইটুকুই তুলিয়া দিই, "মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাৎলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দ সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছবিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ ওই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্দ্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশী, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়...তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ ক'রে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।"

এই বইখানিতে ১২৯৮ বইতে ১৩৪১ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য বিষয়ক রচনা আছে। সকল সাহিত্যরসপিপাসু ও সাহিত্যব্যবসায়ীর ইহা পড়িয়া দেখা দরকার।

শ্রীশান্তা দেবী

১৩৪৪ ভাদ্র

"লোকশিক্ষা-সংসদ"

মৌলবী আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী থাকিবার সময় যে "শিক্ষাসপ্তাহ" হইয়াছিল, তাহার সংস্রবে রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে 'পুনশ্চ' শিরোনাম দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি ও অন্য কিছু কথা মুদ্রিত হইয়াছিল।

দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্য্যন্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকা দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।

কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

একদা আমাদেব দেশে কাশী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতিরক্ষা ও শিক্ষাচর্চা নানা প্রণালীতে

পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিককালের শিক্ষাকে কোনো উপায়ে এদেশে তেমন ক'রে যদি প্রসারিত ক'রে না দেওয়া যায় তবে এ যুগের মানবসমাজে আমরা নিজের বিদ্যাগত যোগ রক্ষা করতে পারব না; এবং না পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে এ কথা বলা বাহুল্য।

এই সমুদয় কথায় ব্যক্ত কবির অভিপ্রায় অনুসারে বিশ্বভারতী "লোকশিক্ষা-সংসদ" গঠন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন হইতে লিখিয়াছেন—

দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্যবিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। যথেষ্ট মনোযোগপূর্বক পাঠ্যবিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কিনা এই প্রদেশব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন, তাঁহারা আপন অভিমতসহ পত্র লিখিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাইলে উপকৃত হইব।

পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম—আদ্য, দ্বিতীয়—মধ্য, তৃতীয়—উপাধি। প্রথমতঃ আদ্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহার বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ভারতশাসনপদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞান, পাটীগণিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গৃহস্থালী। প্রশ্নপত্রের সংখ্যা আট। পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষেরা উৎসাহী হইয়া বিশ্বভারতীর এই মহতী প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

১৩৪৪ ফাল্গুন

শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা

মিঃ সী. এফ. এণ্ডরুজের পৌরোহিত্যে সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে যে হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, নানা কারণে তাহা উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে বাঙালীদের মনে ঔৎসুক্যের ও একাত্মবোধের অভাব, এই অপবাদ সর্ব্বাংশে সত্য না হইলেও অনেকাংশে সত্য, একথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। অন্যপ্রদেশীয়েরা বাঙালীর প্রতি সদয়মনোভাবসম্পন্ন কি না, সে আলোচনা এখানে করিয়া লাভ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অখণ্ড ঐক্যের কথা বিস্মৃত হইয়া আমাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক অতীতে অ-বাঙালীদের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়াছি, একথা ঠিক। রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনা ও কর্ম্মে, সামাজিক উন্নতি-প্রচেষ্টায়, শিল্পকলায় ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই আধুনিককালে অগ্রণী হইয়াছে; ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ; এই শ্রেষ্ঠতাভিমান আমাদিগকে অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে উদাসীন করিয়া

রাখিয়াছে। গত কয়েক বৎসর সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে কোণঠাসা হইয়া থাকায় এই অভিমান এখন বাহিরে সর্ব্বদা প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু ইহার মূল নষ্ট হয় নাই। সর্ব্বভারতীয় ব্যাপারে অন্যপ্রদেশীয়গণ কর্ত্তৃক বাঙালীদের কোণঠাসা করিয়া রাখিবার চেষ্টার অন্যতম কারণও আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ববোধ।

সাহিত্যের কথা ধরা যাক। বাংলা সাহিত্য শ্রেষ্ঠ, অতএব অন্য প্রদেশের লোকেরা ইহা পড়িবেই, আমাদের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু অন্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের যেন কোন খোঁজও লইবার দরকার নাই; তাহাতে ভালমন্দ কি আছে না আছে, সে-সম্বন্ধে আমাদের কোন কৌতূহলবোধ পর্য্যন্ত নাই। বাঙালী গ্রন্থকারদের বহু রচনা ভারতীয় অন্যান্য বহুভাষায় অনূদিত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় অন্য প্রদেশের আধুনিক গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কোন আলোচনা তেমন হয় নাই। এমন হইতে পারে, যে, অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ বা সংকলনের যোগ্য আধুনিক গ্রন্থাদি আলোচনাদ্বারা পরখ করিয়া ততটা দেখিয়াছি কি না সন্দেহ, যতটা অনুমান করিয়া বা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

তার পর বিভিন্ন প্রদেশের বিচিত্র আচার-ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতি-অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও আমাদের ঔদাসীন্য যথেষ্ট।

একটি সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ আমাদের অজ্ঞতা সামান্য বিষয় ও দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়াও পরিস্ফুট। বিভিন্ন স্থানের ভাষাপার্থক্য অনুসারে কংগ্রেসের স্বকীয় নির্ব্বাচন-ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতবর্ষেব প্রদেশসমূহ বিভক্ত, এবং ভবিষ্যতে সরকারী বিভাগেও এই ভাষাপার্থক্য অনুসারে প্রদেশসমূহের বিভাগ অনেকে চান। কিন্তু আমাদের মধ্যে সুশিক্ষিত অনেকেও অবগতই নহেন, যে দক্ষিণ-ভারতে তেলুগু, তামিল, কানাড়ী, মলয়ালম প্রভৃতি বিভিন্ন স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত এবং ঐ সমস্ত ভাষাগতভাবে তাঁহারা অভিহিত হইতে ইচ্ছা করেন; আমাদের অনেকের কথায় মনে হয়, তাঁহারা সকলেই 'মান্দ্রাজী' এবং তাঁহাদের সকলের ভাষাও 'মান্দ্রাজী', যদিও মান্দ্রাজী বলিয়া কোন ভাষা নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে আসন দিয়াছেন এবং ভারতীয় ভাষাসমূহে এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিয়া কোন কোন বাঙালী প্রতি বৎসর উত্তীর্ণও হইয়া থাকেন। অন্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বিশেষ উদ্যোগী দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন অন্য প্রদেশের ভক্তদের বাণী ও জীবন সম্বন্ধে বাংলায় আলোচনা করিয়া ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাত্মা গান্ধীর পুস্তকাবলী বাংলায় অনুবাদ করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত যোগাভিলাষীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তুলসীকৃত রামায়ণের কয়েকটি অনুবাদ আগেই হইয়াছিল, শিখদিগের 'জপজী' প্রভৃতির অনুবাদও হইয়াছিল।

বাঙালীরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখুন, ইহা আমরা নিশ্চয়ই কাম্য মনে করি। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে উদাসীন ও অবজ্ঞাশীল থাকিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন কখনও সম্ভব নহে। বাংলাকে অন্য প্রদেশের নেতৃত্ব করিতে হইলে ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারাই তাহা সম্ভব

হইবে, শ্রেষ্ঠত্ববোধের দ্বারা নহে।

হিন্দীকে আমরা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মানিয়া লই বা না-লই, হিন্দী সাহিত্য উন্নত হউক বা না-হউক, একথা ত সত্য যে হিন্দী ভারতবর্ষের একটি প্রধান লোকসমষ্টির ভাষা। এজন্য হিন্দীভবন সুপরিচালিত হইলে, এবং ইহার কার্য্যক্রম বাঙালী শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সুপরিব্যাপ্ত হইলে ইহা দ্বারা এই পারস্পরিক যোগরক্ষার কাজ অংশতও সুস্পন্ন হইতে পারে।

—স

"বিশ্বপরিচয়"

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈজ্ঞানিক পুস্তক "বিশ্বপরিচয়" প্রথম প্রকাশিত হয় গত আশ্বিন মাসে। পৌষে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। চারি মাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাংলা দেশে সাধারণতঃ হয় না। এই বহিখানির যে তাহা হইয়াছে, তাহা ইহার উৎকর্ষের পরিচায়ক। ইহার প্রথম সংস্করণের পরিচয় দিবার সময় ইহার বিষয়বস্তুর বিবরণ দিয়াছিলাম। এবারেও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত পত্রের আকারে ভূমিকা আছে এবং তদ্ভিন্ন, পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ভূলোক ও উপসংহার, এই ছয়টি অধ্যায় আছে। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকটি আগাগোড়া সংশোধিত হইয়াছে। ইহা বালকবালিকাদের জন্য লিখিত হইলেও আমরা ইহা হইতে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে "গোল্ডেন বুক অব্ টাগোর" নামক ইংরেজী স্মারক গ্রন্থটির জন্য অনেক বিখ্যাত লোকের রচনা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল এবং সংগৃহীতও হইয়াছিল। মনে পড়ে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তখন এই দুঃখ করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অন্য বহু বিষয়ে পুস্তকাদি লিখিয়াছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নাই। বৈজ্ঞানিক কিছুও এখন তিনি লিখিয়াছেন।

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র"

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে রেডিয়োর কর্ত্তৃপক্ষ অনুরোধ করায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পনর মিনিটে ত সব কথা সংক্ষেপেও বলা যায় না। তাই বিবিধ প্রসঙ্গের অন্যত্র অধিকন্তু কিছু বলিয়াছি। আর একটু গল্প-জানা কথাও বলি;

কারণ কলিকাতার অনেক কাগজওয়ালাই কিছু-না-কিছু বলিতেছেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

"From the start the child enters the Siksha-Satra as an apprentice in handicraft as well as housecraft In the workshop, as a trained producer and a potential creator, it will acquire skill and win freedom for its hands, whilst as an inmate of the house, which it helps to construct and furnish and maintain, it will gain expanse of spirit and win freedom as a citizen of the small community."

তাৎপর্য্য। প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীস রূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জ্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জ্জন করিবে।

বিশ্বভারতী ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাহাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়া বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যাইতে পারে, তাহার তালিকা আছে। লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁহারা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান, তাঁহারা বিশ্বভাবতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখিবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে, শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হইয়াছে, তাহা, এবং ইহার মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালস্বভাব মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তাহা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন ইহার আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তাহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের, দু-একটা অনুমান লিখিতেছি।

প্রথম অনুমান এই, যে, ইহার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই;—ইহাতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাইবে ও দেশ স্বাধীন হইবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওঅর্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে—যেমন তাহার চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হইবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে। শিক্ষাসত্রের আদর্শের ও প্রসারের জন্য অনুমিত বাধা বৈয়ক্তিক, বহুমনুষ্যঘটিত। তাহার আলোচনা করিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের নাই। নিরপেক্ষভাবে তাহা করাও সাতিশয় কঠিন।

১৩৪৫ পৌষ

কলিকাতায় শ্রীনিকেতন পণ্যভাণ্ডারের উদ্বোধন-উৎসব

বিশ্বভারতীর পল্লীসংস্কার বিভাগ, শ্রীনিকেতনে পল্লীস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার, কৃষির উন্নতি, লুপ্ত শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন, ও নূতন শিল্পের প্রচলন সম্বন্ধে যে-বহুবিধ আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার পরিচয় পূর্বে একাধিকবার প্রবাসীতে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় ২১০ নং কর্ণয়ালিশ স্ট্রীটে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সংলগ্ন কক্ষে, শ্রীনিকেতনের গৃহশিল্পজাত নানা প্রয়োজনীয় ও মনোরম দ্রব্যাদির একটি ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। বর্তমানে দেশে পল্লী সংস্কারের যে উদ্যোগ চলিতেছে, চিন্তায় ও কর্ম্মে রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম প্রধান ও প্রথম পথপ্রবর্ত্তক। সুভাষচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ও তাঁহার কয়েক জন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশসেবার বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। নানা রূপ ভাবধারার তখন দেশে চলিতেছে, কবির নিকট হইতেও কবিজনোচিত উদ্দীপনাময়ী বাণীই তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শুধু গ্রামসংগঠনের কথা—এই নীরস কথা শুনিয়া সেই তরুণ বয়সে তাঁহার মোটেই প্রীত হন নাই। কিন্তু যত দিন যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম্ম তিনি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য চব্বিশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল হইতেই রচনায় ও ভাষণে পল্লীসংস্কারের একান্তকর্ত্তব্যতার কথা বলিয়া আসিতেছেন। শুধু কথা নয়, গত ১৬ বৎসর যাবৎ, শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়া বিস্তৃত ভাবে এ বিষয়ে নানা আয়োজনও করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও খণ্ড খণ্ড ভাবে পল্লীসংস্কারের চেষ্টা অন্যত্র করিয়াছিলেন। কবি হইয়াও তিনি এই নীরস কর্ত্তব্যের ভার কেন গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে, এবং পল্লীগঠন সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তার, সুন্দর একটি বিবরণ আছে, এই ভাণ্ডার-উদ্বোধন-উপলক্ষ্যে রচিত তাঁহার অভিভাষণে :—

...কর্ম উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত ক'রে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কী রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে, অগ্রসর হবার আশায় চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।...সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবি-কল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েক জন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায় নি। সে কথার আলোচনা এখন যাক।

...বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে

যে প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না বলেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেক বার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়? যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব। বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করি নি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হোত।...

..প্ল্যান ছিল না বটে কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উল্টো পথ দিয়ে এমনতর বিড়ম্বনা আর হ'তে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হ'তে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না।

পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্যবিধানে . প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক্ এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরিপরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ উৎসেরও সেই দশা। সেই জন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরাও যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না—একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নর বীরেরা জীবনের আনন্দ প্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি ক'রে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানা দিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশ্যে।...

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করি নি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে

মনে করি নি। আমরা জানি যে গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেকে আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ ক'রে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে পরিমাণ দয়া সে পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। সচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারি, তাঁরা প্রায় ব'লে থাকেন যে আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায় পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে শিখ্য বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

এই অভিভাষণের পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে উদ্দেশ কবিয়া লিখিয়াছেন :—

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই ব'লে আস্ফালন করে যে শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি, পরীক্ষা ক'রে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের এই অংশের উল্লেখ করিয়া সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভাষণে যাহা বলেন, সে-সম্বন্ধে একটি কথা না-বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি বলেন, যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্ত্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়ত ইহার বর্ত্তমান আকার (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন) স্থায়ী না-হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ ভিন্ন আকারে চিরস্থায়ী হইবে।

কোনও প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে যদি শাশ্বত সত্য থাকে, তবে সেই সত্যটি যে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে চিরস্থায়ী, এবং যে মূল প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া সেই সত্যটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবে বিনষ্ট হইলেও পরে অন্য প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া যে সে-সত্যটি প্রকাশিত হইতে পারে, এই টুকু তত্ত্বগতভাবে বুঝিবার মত দার্শনিকতা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতার পক্ষে শুধু এই তত্ত্বটি সব সময়ে যথেষ্ট সান্ত্বনাদায়ক নহে। সত্যের এই

অবিনশ্বরতার তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথেরও জানা আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছে; এবং পরীক্ষা দ্বারা তাঁহার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে "সত্য" খুঁজিয়া পাইলে, তিনি রাষ্ট্রশক্তিকে ও রাষ্ট্রপ্রধানকে তাহার বাস্তব স্থায়িত্বের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দেশের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তত্ত্বকথার পরিবর্ত্তে তাঁহার বাঞ্ছিত আশ্বাস দিতে পারিলে ভাল হইত— অবশ্য সুভাষচন্দ্র ইহাতে "শাশ্বত সত্যের" সন্ধান পাইলে। আর্থিক দিক্ দিয়া শ্রীনিকেতন এখনও এক জন বিদেশীর দানেই প্রধানতঃ পরিচালিত হইতেছে।

কলিকাতায় শ্রীনিকেতনের পণ্যভাণ্ডারে প্রাপ্তব্য আবশ্যক দ্রব্য ক্রয় করা আমাদের কর্ত্তব্য।

১৩৪৫ চৈত্র

বেহুলার স্মৃতিসভা

"বাংলাভাষা পরিচয়" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"মঙ্গলকাব্যের ভূমিকাতেই দেখি কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোন ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেচ্ছাচারী। নিজের জীবনে মুকুন্দরাম রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সব চেয়ে প্রবল ক'রে অনুভব করেছেন অন্যায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা। বিদেশে উপবাসের পর স্নান ক'রে তিনি যখন ঘুমোলেন দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্যে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন ন্যায়ধর্মহীন ঈর্ষাপরায়ণ ক্রূরতার জয়কীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে-শিবকে কল্যাণময় ব'লে ভক্তি করা যায়, তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই, যে, অন্যায়কারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি ব'লেই।

"মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর ন্যায়ধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা প্রচারের অহংকারে সব দুষ্কর্মই সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে ধর্মকে অস্বীকার ক'রে তবেই ভীরুর পরিত্রাণ, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।"

আমরা যে বিষয়ে লিখিতে যাইতেছি, উপরের প্যারাগ্রাফ দুইটি তাহার যথেষ্ট উপক্রমণিকা। কিন্তু আমাদের দেশের অতীত কালের সাহিত্যে এবং বিদেশী সাহিত্যে যে অন্য রকম চিত্রও আছে, কবি যে তাহাও দেখাইয়াছেন তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তাঁহার গ্রন্থখানি হইতে আরও কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"অপর দিকে আমাদের পুরাণ কথা সাহিত্যে দেখো প্রহ্লাদ চরিত্র। যাঁরা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব ব'লে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যাগণনা ক'রে তাঁরা মানব সত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল যে কালের কাছে বীর্যবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য

থেকেই তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

"আর এক কবিকে দেখো, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এক পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অন্যায়শক্তির কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সব চেয়ে বড় সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচরিতের অপরাজিত বীর্য।"

কলিকাতায় একখানি ইংরেজী দৈনিকে ৩১শে জানুআরি ১৭ই মাঘ তারিখের বর্দ্ধমানের চিঠিতে দেখি বর্দ্ধমান শহর থেকে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী কসবা-চম্পাইনগর গ্রামে বেহুলার স্মৃতিসভা হইয়া গিয়াছে। ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তেই এ-বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু লেখা হয় নাই। এবার লিখিতে বসিয়া, রবীন্দ্রনাথ মনসামঙ্গাল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা সংগত ও আবশ্যক মনে হইল; কেন তাহা পরে বুঝা যাইবে।

মনসামঙ্গালে আছে, তাহার প্রধান পুরুষচরিত্র চাঁদসদাগরের বাড়ী ছিল চম্পাইনগরে। চাঁদসদাগর ঐতিহাসিক পুরুষ কিনা, ঐতিহাসিক পুরুষ হইলে তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার চম্পাইনগরেই ছিল কিনা, তাহার আলোচনা করিব না।

অনেক কবিকল্পিত চরিত্র অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা আমাদের কাছে স্পষ্টতর। তাহাদের দ্বারা আমাদের হৃদয়মান অনেক ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবিত হয়, এবং তাহাতে আমাদের মনুষ্যত্ব পূর্ণতর হয়। সুতরাং কবিকল্পিত হইলেও এই সব চরিত্রকে আমরা বাস্তবের আসন দিয়া থাকি, ছায়া মনে করি না।

মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগরের চরিত্রে আমরা ঠিক্ "অত্যাচারিতের অপরাজিত বীর্য্য" বা অপরাজেয় বীর্য্যের দৃষ্টান্ত পাই না বটে, কিন্তু যাহা পাই তাহাও দৃঢ় মনুষ্যত্বের মহনীয় দৃষ্টান্ত। এই মানুষটি মনসাদেবীর কাছে সহজে মাথা হেঁট করে নাই।

কিন্তু কসবা-চম্পাইনগরে স্মৃতিসভা চাঁদসদাগরের উদ্দেশে হয় নাই; হইয়াছিল সতী বেহুলাকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিবার নিমিত্ত। যাঁহারা এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

আমাদের দেশে কাব্যে পুরাণে সতীর দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মনসামঙ্গালের বেহুলা-চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাঙালী কবির মনোভাব, এবং ইহা বিশেষ করিয়া বঙ্গের সেই সকল শ্রেণীর লোকের হৃদয়মনের উপর ছাপ দিয়াছে যাহারা বনে জঙ্গালে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, চাষের মাঠে, খালে বিলে ঘাটে জীবনের অনেকটা সময় কাটায় এবং যাহাদিগকে সাপ ও সাপের দেবতাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই জন্য মনসামঙ্গাল বঙ্গীয় পল্লীজনের মহাকাব্য। ইহার শুচিশুভ্র বেহুলাচরিত্র বহুযুগ ধরিয়া অগণিত পল্লীকন্যার ও পল্লীবধূর হৃদয়মনকে পূত করিয়াছে, পবিত্র রাখিয়াছে। এই নিষ্কলুষ সতীর চিত্ত কোন ভয়ের, কোন বিপদের নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই, মৃত্যুর কাছে হার মানে নাই। এক দিকে বজ্রের দৃঢ়তা, অন্য দিকে কুসুমের কোমলতা এই চরিত্রে বিদ্যমান।

চম্পাইনগরে যে সভায় গদ্যে পদ্যে বেহুলার বন্দনা হইয়াছিল, তাহাতে সেই গ্রামের লোক ছাড়া বর্দ্ধমানের অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার নাগরিকদিগের মধ্যে কেবল অধ্যাপক সুকুমার সেন ও বণিক হরিশঙ্কর পালের নাম বর্দ্ধমান হইতে লিখিত পূর্ব্বোক্ত চিঠিতে পাইতেছি। স্বৈরিণী, বহুচারিণী ও বারবিলাসিনীদিগের মাহাত্ম্য কীর্তন 'প্রগতি'র অন্যতম লক্ষণ। মনসামঙ্গালে তাহা নাই। সুতরাং মনসামঙ্গালের কোন চরিত্রে আকৃষ্ট

হইয়া বহু 'প্রগতি'পন্থী নাগরিক হুড়াহুড়ি করিয়া কলিকাতা হইতে চম্পাইনগরে হাজির হইবেন, ইহা কাহারও আশা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ চম্পাইনগরে যে বেহুলার স্মারক একটি সভা হইবে, এ সংবাদও আমরা কাগজে প্রকাশিত হইতে দেখি নাই।

সভার উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষ্যে একটি মেলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর এই মেলা হওয়া উচিত। সেই সঙ্গে মনসামঙ্গলের পালার বন্দোবস্ত হইলেও বেশ হয়। আমরা বাল্যকালে এইরূপ যাত্রা দেখিয়াছি শুনিয়াছি। একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে বেহুলার মর্মর মূর্তি রাখিবার প্রস্তাবও হইয়াছি। তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া মূর্তিটিকে বেহুলার চরিত্রের দ্যোতক করিতে পারিবেন, এমন শিল্পী আগে খুঁজিয়া পাওয়া দরকার। নতুবা মানসী মূর্তিই শ্রেষ্ঠ।

১৩৪৬ মাঘ

লোকশিক্ষা-পাঠ্য-গ্রন্থাবলী

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোক-শিক্ষাপাঠ্য-গ্রন্থমালার নিম্নমুদ্রিত সাধারণ ভূমিকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"আমরা পর্যায়ক্রমে লোকশিক্ষা পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছি। শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনই মুক্তির পথে অগ্রসর হোতে পারে না। যত সহজে যত দ্রুত এবং যত ব্যাপক ভাবে এই ভার লাঘব করা যায় সেজন্যে তৎপর হওয়া কর্তব্য। গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব জ্ঞানের সেই পরিবেষণকার্যে পাণ্ডিত্য যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ লোক অনেক আছেন। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সহজ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার অভ্যাস অধিকাংশ স্থলেই দুর্লভ। এই কারণে আমাদের গ্রন্থগুলিতে ভাষার আদর্শ সর্বত্র সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারা যাবে ব'লে আশা করি নে কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পথ-সঞ্চয়" এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "প্রাচীন হিন্দুস্থান" প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটির

পরিচয় 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টির পরিচয় আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে। আরও চারিখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। যথা—

ভূ-বিবরণ—শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত,
ভূ-গঠন—শ্রীক্ষিতিনাথ ঘোষ,
উদ্ভিদ বিবরণ—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন,
জীব বিবরণ—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, "গল্প এবং কবিতা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটাবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে। এর প্রতিকারের জন্যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা অচিরাৎ অত্যাবশ্যক। বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান-চর্চার," ইহা অতি সত্য কথা।

১৩৪৬ চৈত্র

মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বভারতী

রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বেও গান্ধীজী বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ফলও হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তরে গান্ধীজী যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বভারতী ভবিষ্যতে আরও আর্থিক আনুকূল্য পাইবে। তিনি বিশ্বভারতী- দর্শনকে তীর্থদর্শন বলিয়াছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের ও তাহার প্রতিষ্ঠাতার স্বাজাত্য ও সর্ব্বজাতীয়ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিষ্ঠানটি শুধু বাংলা দেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্থাপিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের কল্যাণার্থ পরিচালিত হইতেছে—সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গল ইহার উদ্দেশ্য বলিলে ভুল হয় না। সুতরাং যে-কোন স্থান, যে-কোন দিক্ হইতে ইহার পুষ্টিসাধনার্থ আনুকূল্য আসিতে পারে, তাহার আশা করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান যে দেশ প্রদেশ বা অঞ্চলে অবস্থিত, তথাকার লোকেরাই স্বভাবতঃ তদ্দ্বারা অধিকতর সংখ্যায় ও অধিকতর উপকৃত হয়। তাহার সুবিধা তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ না করিলে তাহার জন্য তাহারা দায়ী। কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যাহা আদর্শ তদনুসারে তাহা চালাইতে হইলে আধুনিক কালে বহু অর্থের আবশ্যক। তাহা, প্রতিষ্ঠানটি যে প্রদেশে অবস্থিত, তথাকার লোকদেরই অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত ও আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিশ্বভারতী বাংলা দেশে অবস্থিত হইলেও এবং ইহার প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা বেশী হইলেও, মহর্ষি ও কবিকে ছাড়িয়া দিয়া ইহা আর্থিক আনুকূল্য পাইয়াছে প্রধানতঃ অ-বাঙালীদের নিকট হইতে। ইহা বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। বাঙালী কেহই কিছু টাকা বিশ্বভারতীকে দেন নাই, এমন নয়; কিন্তু বাঙালীদের দান সামান্য। আমরা অহঙ্কার করিবার সময়

বিশ্বভারতীকে বাঙালী জাতির কীর্ত্তির ফর্দে ধরি; তাহার কারণ তাহাতে কোন খরচ হয় না—প্রশংসা খুব সস্তা দান, বিশেষতঃ যখন তাহা আত্মপ্রশংসার রূপান্তর।

যে-সকল বাঙালী ও অন্য অধ্যাপক অল্প বেতনে বিশ্বভারতীর আন্তরিক সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের সেবা মূল্যবান।

রবীন্দ্রনাথ একদা সুভাষবাবুকেও বিশ্বভারতীর পার্শ্বে ও পশ্চাতে দাঁড়াইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তখন সুভাষবাবু কবিকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, বিশ্বভারতীর মধ্যে সত্য যাহা তাহা অবশ্যই টিকিবে। কবি বোধ হয় এই তত্ত্ব অনবগত ছিলেন না।

১৩৪৭ ভাদ্র

রবীন্দ্রনাথের নূতন 'সম্মান'

উক্ষতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় (Oxford University) রবীন্দ্রনাথকে সম্মানার্থ সাহিত্যাচার্য (Doctor of Literature, *honoris causa*) উপাধি দিয়া যে স্বয়ং সম্মানিত হইয়াছেন, তাঃ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদাতা প্রতিনিধি ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সর্ মরিস গোয়াইয়ার (Sir Maurice Gwyer) তাঁহার বক্তৃতায় স্বয়ং বলিয়াছেন ("the Univesity whose representative I am has, in honouring you, done honour to itself")। ইহাও সত্য যে, এই সম্মান রবীন্দ্রনাথ না পাইলে তাঁহার কিছুই অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও গৌরব বাড়িল না। তথাপি ইহা তুচ্ছ নহে। উক্ষতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার জ্ঞানগৌরব আছে। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতির প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়াও ইহার একটা লৌকিক প্রতিষ্ঠা আছে। তাহার পক্ষে পরাধীন ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভারতীয় কবিকে সম্মান প্রদান দ্বারা রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্বিশেষে মানব সম্পর্ক স্বীকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। বিদ্যা সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক প্রতিভায় শ্রেষ্ঠতা অন্য দিকে শ্রেষ্ঠতর অস্তিত্বের অন্ততঃ পরোক্ষ প্রমাণ, ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা না-মানিতে পারে, কিন্তু উক্ষতীর্থের মত রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় যখন এ-সকল বিষয়ে যোগ্যতার আদর করিয়াছেন, তখন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রেও এই উৎকর্ষ মানিয়া-লওয়ার প্রভাব পড়িবেই।

কবির ব্যক্তিত্বে ও জীবনে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার সহিত তাঁহার স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক মত ও কার্য্যের যোগ যে মধ্যে মধ্যে হইয়াছে তাহা বিচারপতি হেণ্ডার্সন স্বরচিত ও স্বকথিত কবিসার্বভৌমের সত্য প্রশস্তিতে বলিয়াছেন। *

* "Let it also be said that he has not valued a sheltered life so far above the public good as to held himself wholly aloof from the dust and heat of the world outside; for there have been times when he has not scorned to step down into the market-place; when if he thought that a wrong had been done, he has not feared to challenge the British raj itself and the authority of its magistrates: and when he has boldly corrected the faults of his own fellow-citizens."

রবীন্দ্রনাথকে সম্মান লাভের নিমিত্ত উক্ষতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি সর্ মরিস গোয়াইয়ারের সমক্ষে উপস্থিত করা উপলক্ষ্যে লাটিন ভাষায় লিখিত এই প্রশস্তিটি পঠিত হয়। ইংরেজী অনুবাদে ইহার উৎকর্ষ কতকটা বুঝা যায়। মূল লাটিনে বোধ হয় ইহা আরও উৎকৃষ্ট। কিন্তু বিচারপতি হেণ্ডার্সন যেরূপ গড়গড় করিয়া লাটিন পড়িয়া গেলেন, তাহাতে কোন বাগ্মিতা না-থাকায় শুনিয়া রচনাটির বিষয়গৌরব বা ভাষার উৎকর্ষ কিছুই বুঝা যায় নাই। সর্ মরিস গোয়াইয়ারের বক্তৃতা এবং কবির প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যক্তিগত আচবণ ও ভঙ্গী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সংস্কৃত, লাটিন ও ইংরেজীর ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া ভাষাতাত্ত্বিকেরা না-মানিলেও তাহাতে সত্য আছে এবং তাহাতে বক্তার বিজেতৃজাতিসুলভ দম্ভের অভাব সূচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথকে উক্ষতীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্যাচার্য' পদবীসম্মান দিবার কথা অনেক বৎসর পূর্বে উঠিয়াছিল। তখন তাহা দেওয়া হয় নাই। এখন দিবার রাজনৈতিক কারণ হয়ত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও প্রতীচ্য এক প্রভুজাতির রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ দ্বারা প্রাচ্যের এক পরাধীন দেশের কবিঋষিকে সম্মান প্রদান স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া থাকিবে।

১৩৪৭ আশ্বিন

পুস্তক-পরিচয়

রাশিয়ার চিঠি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিতীয় মুদ্রণ। প্রবাসীর অর্ধেক আকারের ২১৮ পৃষ্ঠা। তা ছাড়া আলাদা ভাল কাগজে ছাপা ১২ খানি ছবি আছে। মূল্য এক আনা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সাতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ চিঠিগুলি প্রথমে প্রবাসীতে বাহির হয়। তখন এগুলি অগণিত লোক পড়িয়াছিল। তাহার পর প্রথম মুদ্রণের ৩১০০ পুস্তক বিক্রী হইয়াছে। তাহাও অগণিত লোক পড়িয়াছে। কারণ, আমাদের দেশে এক একখানা মাসিক ও বহি অনেক হাত ফেরে, এবং তাহার অনেক হাত কপর্দকশূন্যও নহে। তখন এদেশী সরকার তাহাতে মন্দ কিছু দেখেন নাই, দেখিবার কথাও নয়। কিন্তু ইহার একটি মাত্র চিঠির ইংরেজী অনুবাদ মডার্ন রিভিয়ুতে বাহির হওয়ায় তৎক্ষণাৎ সরকারী হুকুম আসিল, খবরদার, সম্পাদক যেন অন্য চিঠিগুলির অনুবাদ না ছাপেন! এ রকম হুকুমের কারণ পার্লেমেণ্টে জিজ্ঞাসা করায় ভারতসচিবের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হয় যে, বাংলায় চিঠিগুলি কম লোকেই পড়িয়াছে বা পড়িতে পারে, ইংরেজী অনুবাদ হইলে বহুৎ বেশী লোকে পড়ে। তাহা অবাঞ্ছনীয়!! ইতি।

১৩৪৭ অগ্রহায়ণ
রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি"

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া যে অগণিত চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি নির্বাচন করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি একটি চিত্রসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আঠারোখানি ছবি আছে। গ্রন্থারম্ভে কবির ভূমিকা ও গ্রন্থের শেষে কবির স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত বাংলা ও ইংরেজি ১৮টি কাব্যকণিকা, ছবিগুলি সম্বন্ধে কবির মন্তব্য স্বরূপ সংযুক্ত হইয়াছে। এই লেখাগুলির দু-একটি উদ্ধৃত হইল।

"প্রতি দিবসের যত ক্ষতি যত লাভ
পশ্চাতে ফেলি প্রকাশে সহসা পরম আবির্ভাব।
ভাসিয়া চলে সে কোথায় কেহ না জানে।
আঁধার হইতে সহসা আলোর পানে॥"

"পসরাতে কী আছে তা নাই বা জানিলাম
চিরকালের তুমি বিদেশিনী,
ধ্যানের পটে ধরা দিলে শুনালে না নাম,
চিনি তবু নাই বা তোমায় চিনি।"

এই "চিত্রলিপি" সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পরসিক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ আগামী ডিসেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউতে প্রকাশিত হইবে। প্রবাসীতেও বিশেষজ্ঞলিখিত একটি প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রসকাশে চীন শুভেচ্ছা-দূত

ভারতের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক চীন দৌত্যের নেতা মনীষী তাই চী-তাও সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে ও তাঁহাকে চীনরাষ্ট্রপতি চিয়াংকাই-শেকের চিঠি দিতে গিয়াছিলেন। চিঠিতে চিয়াংকাই-শেক কবির পীড়ার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার উপায় সম্বন্ধে কবির উপদেশ চাহিয়াছেন। কবি ভারতবর্ষ ও চীনের প্রাচীন যোগ পুনঃস্থাপন করিয়া তাহার রক্ষার উপায়ও করিয়াছেন। তিনি এই উপদেশ দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি।

১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ

"সভ্যতার সংকট"

ইংরেজ জাতির মহত্ত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার উপর এক সময়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের কিরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের ১লা বৈশাখের "সভ্যতার সংকট" নামক অভিভাষণে তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। সেই বিশ্বাস যে নষ্ট হইয়াছে এবং কেমন করিয়া নষ্ট হইয়াছে, তাহাও অভিভাষণটিতে আছে। তিনি বলিয়াছেন, "আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।"

দাদাভাই নওরোজী তাঁহার দীর্ঘ জীবন ভরিয়া ইংরেজ জাতির ন্যায়বুদ্ধির প্রতি আবেদন ("appeal to the sense of justice of the British nation") করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর আশাভঙ্গের দিনের জন্য তিনি বাঁচিয়া ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের সেই দুঃখকর দিন আসা সত্ত্বেও তিনি লিখিয়াছেন :

"আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রনাথের এই অভিভাষণটি প্রথমতঃ যে আকারে লিখিত ও দৈনিক কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং নূতন কিছু বাক্যও ইহাতে যোগ করিয়াছেন। "প্রবাসী"র এই সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা এই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ভাষণ। ইহা আলাদা পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করিয়া বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে বিক্রীর জন্য রাখা হইয়াছে।

ইহার যে ইংরেজী অনুবাদ "Crisis of Civilization" নাম দিয়া দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল, কবি তাহারও সংশোধন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন। সেই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পাঠ মে মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে তাহাও বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে কিনিতে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে "গীতালি"র গান

রবীন্দ্রনাথের গান শিখাইবার নিমিত্ত কলিকাতায় "গীতালি" নামক একটি সমিতি আছে। তাহার কার্যস্থান ৯০ নিউ পার্ক স্ট্রীট্। ইহা গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে স্থাপিত হয়। তাহার কিছু কাল পূর্বে কবি স্বয়ং "বিচিত্রা" ভবনে তাহার উদ্বোধন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে নিজের গান সম্বন্ধে কিছু বলেন। তার মধ্যে তাঁহার এই একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল যে অনেক সময় স্বরচিত সঙ্গীত পরের মুখে শুনিয়া তিনি নিজের গান বলিয়া চিনিতেই পারেন না। সম্প্রতি কবির অশীতি পূর্তি উপলক্ষ্যে "গীতালি" যে রবীন্দ্র-গীতোৎসব করিয়াছেন, তাহাতে গীত গানগুলি পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার ভূমিকায় বলা হইয়াছে :—

"কবিবরের এই অভিযোগের নিষ্পত্তি, অর্থাৎ তাঁর গান যথাসম্ভব নির্ভুল ভাবে শেখাবার উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ গীতালির প্রতিষ্ঠা। এই পথে বাধাবিঘ্ন অনেক তা' যাঁরা এ কাজে হাত দিয়েছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন। কারণ মুখে মুখে গান রচনার ও শেখাবার পদ্ধতি এ দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত থাকায়, কোন এক স্বরলিপিকে অভ্রান্ত বলে' প্রতিপন্ন করা কঠিন। কবির নিজের দেওয়া সুরের যাথার্থ্য সম্বন্ধে চরম নিষ্পত্তি তাঁর নিজেরই করবার কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এ বিষয়ে শ্রুতিধর কোনকালেই নন; সুর রচনা করেই খালাস।

'ইতিপূর্বে তাঁর গানের ভাণ্ডারী ও কাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথের উপর তাঁর সুর লিপিবদ্ধ করবার ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। এবং এই অফুরন্ত গানের অধিকাংশ সম্বন্ধেই দিনেন্দ্রনাথ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে গেছেন। তথাপি যেখানে বিবাদের কারণ রয়ে গেছে, যে গান লিপিবদ্ধ করা বাকি আছে বা নতুন যে গান এখনো রচিত হচ্ছে--সে-সব সম্বন্ধে তাঁর পরবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীত-ভক্তগণ তাঁদের কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করবেন না, এ আশা করা যেতে পারে না কি!

"সেই রকম সঙ্গীতভক্তের একটি কেন্দ্র হওয়াই গীতালির অন্যতম লক্ষ্য। আমরা উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা রবীন্দ্র-সঙ্গীত শেখাবার ব্যবস্থা করেছি এবং কবিবরের নূতনতম সঙ্গীত শেখবার ও শেখাবার জন্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার আশা রাখি। বলা বাহুল্য, সাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি ভিন্ন এ রকম প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়, উন্নতি ত দূরের কথা। কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা দিবার প্রতিষ্ঠান বোধ হয় কলকাতা সহরে এইটিই প্রথম।"

"গীতালি"র মত একটি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মফঃস্বলেও যাঁহারা শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথের গান ভাল করিয়া শিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এইরূপ গান শিখাইবার কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের নানা রকমের শত শত গান যে, বাংলা দেশকে তাঁহার কত বড় দান, তাহা একটু চিন্তা করিলে কিছু বুঝা যায়। ইয়োরোপে সকলের চেয়ে বেশী গান লিখিয়া গিয়াছেন জার্মেনীর শূর্বার্ট (Schubert)। তাঁহার রচিত গানের সংখ্যা ছয় শত। রবীন্দ্রনাথের রচিত গানের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। তাহা বাড়িয়া চলিতেছে। তৎসমুদয়ের ভাবের বৈচিত্র্য, গভীরতা, ও সূক্ষ্মতা অসাধারণ। ঠিক্ সুরে গাওয়া না হইলে গানগুলির রস অনুভূত হয় না এবং তাহা হইতে যে অনুপ্রাণনা পাইবার কথা, তাহা পাওয়া যায় না। বিকৃত সুরে গাওয়া গান শুনিলে বিরক্তিই জন্মে—যেমন নানা স্থানের "বন্দে মাতরম্" গানের ভেংচান শুনিবার দুঃখকর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বুঝিতে পারিযাছি।

১৩৪৮ আষাঢ়

তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত

কয়েক দিন আগে একখানি মাসিক কাগজে অন্য এক মাসিকের একটা গল্পের সমালোচনা চোখে পড়িল। সমালোচনাতে ঐ গল্পের কোন কোন অংশের যে চুম্বক দেওয়া হইয়াছে ও যে সকল বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইলাম, বাঙালী শিক্ষিত সমাজে কেমন করিয়া এরূপ গল্প স্থান পায়। ঐ রকম গল্প বোধ হয় তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্যের নমুনা।

গত ডিসেম্বর মাসে জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহার নিমিত্ত আমরা "সাহিত্যে 'প্রগতি' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টে একটি সাহিত্য-সম্মেলনে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাতে নূতন কিছু জিনিস যোগ করিয়া ঐ প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। উক্ত বক্তৃতা ও উক্ত প্রবন্ধে এই কথা বলা হইয়াছিল যে, "প্রগতি"— সাহিত্য যদি কোনও প্রকার দুর্গতিগ্রস্ত লোকদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতির ফল হয়, তাহা হইলে সেই সহানুভূতির ফলে দুর্গতদের উন্নতির জন্য নানা সমিতি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে দেখা যাইত। তাহা ত দেখা যায় না। আমরা বলিয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম—

যদি এই সমস্ত সাহিত্যিকরা বাস্তবিকই দরদী হন, তা হলে [তাঁরা এবং] তাঁদের রচনা পড়ে অন্য লোকেরা দুঃখীর দুঃখমোচনে ব্রতী হবেন। ...এঁদের রচনার ফলে পতিতদের দুঃখ দুর্দশামোচনের জন্যে ক'টা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও চলছে, সন্ধান আবশ্যক। এঁদের রচনা পড়ে গরীব লোকদের জন্যে যদি কারো প্রাণ কাঁদে, তা হ'লে তাঁরা ধন্য। আন্তরিকতা ও হৃদয়স্পর্শী আবেদন যদি এঁদের রচনায় থাকে, তা হ'লে এঁদের সাহিত্য হবে সত্য। কিন্তু তা [নিকৃষ্ট] প্রবৃত্তিপ্রসূত আর বণিগ্‌বৃত্তি থেকে প্রসূত হ'লে কারো লেখা সত্য হবে না। প্রকৃত করুণাপূর্ণ সহানুভূতি দেখান হলেও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যাতে বড হতে পারে সে চেষ্টা না কর্‌লে সবই ব্যর্থ।

আমরা কবি নহি, গল্প ও উপন্যাসও লিখিতে পারি না। সেই জন্য আমাদের কথা উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকায় আমরা আমাদের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থ হইতে নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম :—

সাহিত্য মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালোমন্দে দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তার শুভবুদ্ধি, যে-বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হ'তে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জ্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হ'য়ে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে, তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে। সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেই রকম কোন জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে।

তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহঙ্কার করে, তারা মানুষের শত্রু।

কেন না, সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র ক'রতে থাকতে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হ'য়ে আত্মশ্লাঘা ক'রে বেড়াবে তা নয়, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্য্যবান হ'য়ে সকল প্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হল।

এই মাসের প্রবাসীতে "সাহিত্য, গান, ছবি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত "প্রগতি" সাহিত্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

বিধাতা মানুষকে গড়লেন একটু লাবণ্য, একটু সৌন্দর্য দিয়ে, বললেন এই তো আমি দিলুম, এবার নিজেকে সম্পূর্ণ করো। সেই নিজেকে সম্পূর্ণ করার সাধনাই মানুষের আর্ট। আর্ট যেখানে বড়ো সেখানে মহৎকে, সুন্দরকেই সে এঁকেছে। তোমরা আজকাল এ সব আদর্শ মানতে চাও না। তোমরা উঠে পড়ে লেগেছ জীবনের সমস্ত মলিনতা সমস্ত দারিদ্র্য নিয়ে সাহিত্য গড়তে। কিন্তু মানুষের দুঃখে মানুষের দারিদ্র্যে সত্যি যদি তোমাদের মন টল্‌তো, তাহলে তোমরা তা নিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কবিতা লিখতে না, ত্রৈমাসিকী বার্ষিকী বের করতে না, কোমর বেঁধে লেগে যেতে কাজে। তোমাদের কাজ সাহিত্য। হয় তোমরা ভালো করে সাহিত্য গড়ো, নয় তো এসব ছেড়ে দিয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো। শিল্পের ক্ষেত্র আর কর্মের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। মানুষের দুঃখমোচনে প্রাণপাত করেছেন যাঁরা তাঁরা তো শিল্পী নন, কবি নন, কিন্তু তাঁরা মহাপ্রাণ, আমাদের প্রণম্য। তুমি কি বলবে আজ আমাদের জীবনে এত দুঃখ-দারিদ্র্য বলে আকাশে চাঁদ ওঠে না, মানুষ ভালবাসে না? কাব্যকে বিকৃত করে লাভ কী? তাতে তো কোনো মানুষের কোনো উপকার হবে না; কারো পেট ভরবে না, অথচ সাহিত্যের ও নিজেদের ক্ষতি করবে।

রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছে যে, "তাতে তো...কারো পেট ভরবে না," তাহার অর্থ আমরা এইরূপ বুঝিয়াছি যে, কাব্যকে বিকৃত করিলে দেশের অন্নাভাব সমস্যার সমাধান হইবে না। "প্রগতি"— সাহিত্যিকের পেট অবশ্য ভরিতে পারে।

১৩৪৮ ভাদ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার।"

রবীন্দ্রনাথ।

"Thy voice is on the rolling air;
I hear thee where the waters run;
Thou standest in the rising sun,
And in the setting thou art fair.
What art thou then? I cannot guess;
But though I seem in star and flower

To feel thee some diffusive power.
I do not therefore love thee less :
My love involves the love before;
My love is vaster passion now;
Though mix'd with God and Nature thou,
I seem to love thee more and more.
Far off thou art, but ever night;
I have thee still, and rejoice;
I labour, circled with thy voice;
I shall not lose thee though I die."
—Tennyson.

১৭৮৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১২৬৮ সালে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর পৈতৃক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ১৮৬৩ শকাব্দে, বাংলা সন ১৩৪৮ সালে ২২শে শ্রাবণ তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

তাঁর এই দীর্ঘ জীবন মানবজাতির পরম সৌভাগ্যের বিষয়। সত্য বটে, কোন মানুষের জীবন যদি শুধু দীর্ঘই হয়, তা হ'লে শুধু সেই কারণেই তাকে মূল্যবান্ মনে করা যেতে পারে না। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে আছে :—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

"গাছপালাও বেঁচে থাকে, পশুপক্ষী বেঁচে থাকে, কিন্তু তাঁর বেঁচে থাকাই সত্য বেঁচে থাকা যাঁর মন মননের দ্বাবা জীবিত।"

মনন ও আনন্দানুভূতি এবং সাহিত্যে ও কাজে তার জীবনব্যাপী প্রকাশ লোকোত্তর বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটি অংশ মাত্র। তাঁর সঙ্গে খুব দীর্ঘকালের পরিচয় সত্ত্বেও তাঁকে ভাল ক'রে চিনেছি বুঝেছি, এ অহংকার আমাদের নেই। যে নিজেই জানে না, সে কেমন ক'রে অন্যকে জ্ঞান দিবে? এই প্রবন্ধে তাঁর "নানাবিধ কৃতির সামান্য পরিচয় দেওয়া হচ্ছে বটে; কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব কৃতিগুলির সমষ্টি নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব সে-সকলের উর্ধ্বে অবস্থিত একটি অখণ্ড সত্তা, এই কথা মনে রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে খুব দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন, তা নয়; তিনি তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ কর্মশক্তির দ্বারা মানুষকে আনন্দ দিয়েছেন এবং নানা প্রকারে মানুষের কল্যাণ করেছেন। তাঁর অন্য কাজ ছেড়ে দিলেও, তিনি যে ৯ (ন') বৎসর বয়সে শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ অনুবাদ ক'রেছিলেন তা ছেড়ে দিলেও, তিনি লিখেছেনই তো ৬৭/৬৮ বৎসরের অধিক কাল। লিখেছেন আনুমানিক মুদ্রিত বৃহৎ রয়্যাল আটপেজি আকারের ১৭/১৮ হাজার পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্রনাথের কবি-পরিচয়ই শ্রেষ্ঠ পরিচয় হ'লেও তিনি কাব্য ছাড়া অন্য রকম পুস্তকও লিখেছেন বিস্তর। তাঁর কবিত্বের উন্মেষ হয় প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে, তাঁর শৈশবে বললেও চলে। পদ্যে তিনি যে-সব কবিতা ও কাব্য-গ্রন্থ লিখেছেন, তা ছাড়া তাঁর গদ্য কবিতা গদ্য কাব্যও বহুসংখ্যক আছে। তাঁর উপন্যাস, নাটক ও গল্প—সবগুলিই কাব্য।

কাব্য ভিন্ন তিনি ধর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, দর্শন, ছন্দ, গ্রন্থসমালোচনা, বিদেশভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে এত প্রবন্ধাদি লিখেছেন ও বক্তৃতা ক'রেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলির নাম করাও সোজা নয়। তা ছাড়া, তাঁর পত্রাবলী আছে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুক-পরিহাসআত্মক লেখা আছে, হেঁয়ালী নাট্য আছে, গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য আছে, "পঞ্চভূতের ডায়ারী" নামক পুস্তক আছে যাকে কোন শ্রেণীতে ফেলা সুকঠিন। তিনি যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের, জন্যে লিখেছেন, তেমনি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যেও গল্প,

উপন্যাস, কবিতা, ছড়া—এমন কি বর্ণপরিচয়ের বহিও, লিখেছেন। বাস্তবিক, বই লিখে, গল্প ব'লে, গান বেঁধে, গান গেয়ে, ছবি এঁকে, অভিনয় ক'রে এবং আরও নানা রকমে ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ তিনি যত দিয়ে গেছেন, এবং ভবিষ্যতেও দেবার উপায় ক'রে রেখে গেছেন, এমন আর কেও নয়। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তো তাদিগকে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যালয়ের প্রথম অবস্থায় তিনি তাদের জন্যে কত নূতন খেলার সৃষ্টি ক'রে তাদের খেলার সঙ্গী হয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিকদের তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে একটি নালিশ ছিল, যে তিনি বৈজ্ঞানিক কিছু লেখেন নি। চার বৎসর পূর্বে "বিশ্বপরিচয়" লিখে তিনি তাঁদের সে ক্ষোভ দূর ক'রে গেছেন। এসব ছাড়া তাঁর নিজের লেখা ইংরেজী বইও অনেকগুলি আছে যেগুলি তাঁর বাংলা বইয়ের অনুবাদ নয়। তাঁর বাংলা অনেক বইয়ের অনুবাদ পৃথিবীর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যত অধিক ভাষায় হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোন লেখকের তা ত হয়ই নাই, অন্য কোন দেশেরও আধুনিক কোনও লেখকের হয়েছে ব'লে আমি জানি না। তাঁর কোন কোন বইয়ের জার্ম্যান অনুবাদ এত বেশী বিক্রী হয়েছিল যে, মার্কের দর বিষম প'ড়ে না গেলে তিনি বহু বহু লক্ষ টাকা প্রকাশকদের কাছ থেকে পেতে পারতেন এবং বিশ্বভারতীর জন্যে তাঁকে কোন উদ্বেগ সহ্য করতে হ'ত না।

ইয়োরোপের অনেক বিখ্যাত লোকের লেখা পত্রাবলী আছে। আমরা যতটা জানি, তাঁদের কারোও পত্রাবলী সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীকে অতিক্রম করে নাই। তাঁর লেখা একখানা পোস্টকার্ডও সাহিত্যরসাপ্লুত।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কবি ও দার্শনিক দুই পৃথক্ শ্রেণীর মানুষ ব'লে পরিগণিত হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে একই মানুষকে কবি ও দার্শনিক রূপে— এমন কি, বৈজ্ঞানিক ও কবি রূপে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় সেই প্রাচীন ধারা বক্ষিত হয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম-ভারতীয়-দার্শনিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এবং পরে বিলাতে হিবার্ট লেক্‌চার্স্ দিতে আহূত হওয়ায় তাঁর দার্শনিকত্ব প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়।

তিনি অনেক মাসিকের সম্পাদকের কাজ ও সাংবাদিকের কাজ দীর্ঘকাল অসামান্য প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত করেছিলেন, এবং ভবিষ্যতে-প্রসিদ্ধ অনেক লেখকের লেখা সংশোধন ক'রে তাঁদিকে সাহিত্যিক কৃতিত্ব লাভে সমর্থ করেছিলেন।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রশংসা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

টেনিসন ভিক্টর হিউগোকে বলেছেন,—

"Victor in Drama, Victor in Romance. Cloud-weaver of phantasmal hopes and fears," "Lord of human tears," "Child-lover,"

"Weird Titan by thy winter weight of years as yet unbroken."

আমরা রবীন্দ্রনাথকে এই সব এবং আরও অনেক বিশেষণে ভূষিত ক'রে সত্য বিজয়শ্রীমণ্ডিত ব'লে অনুভব ক'রতে পারি।

তিনি কোনো মহাকাব্য রচনা করেন নাই। মহাকাব্য সাধারণতঃ কোনো প্রসিদ্ধ রাজবংশ কোনো মহাযুদ্ধ কোনো বড় রাজা মহারাজা সম্রাটকে অবলম্বন ক'রে লিখবার রীতি সর্বদেশপ্রচলিত। কিন্তু রাজতন্ত্রের ও রাজা মহারাজা সম্রাটদের যুগ চলে গেছে, যুদ্ধ ঘৃণ্য বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর অতিকায়

জীবজন্তুর যুগ যেমন এখন আর নাই, মহাকাব্যের যুগও তেমনি অতীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা গীতিকবিতাতেই সমধিক ভাস্বর হয়েছে। তিনি "ক্ষণিকা"য় রহস্য ক'রে লিখেছেন .—

"আমি নাব্ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—
ঠেক্‌ল কখন তোমার কাঁকন-
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।
আমি নাব্ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।
পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন খড্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী কেলে
কীর্তি কলাপ।
হায় বে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্ন মত।

তাঁর গান ও গীতরচনা তাঁর প্রতিভা ও শক্তির আর একটি দিক। ধর্ম, দেশভক্তি, প্রেম. প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি দু-হাজার বা আরো বেশী বহু বিচিত্রভাবোদ্দীপক গান বেঁধেছেন ও তাতে সুর দিয়েছেন। ছয় শত গানের রচয়িতা শুবার্টকে পাশ্চাত্য মহাদেশের লোকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক গানেব রচয়িতা মনে কবে। রবীন্দ্রনাথ তার প্রায় চারগুণ গান বেঁধেছেন। বয়সকালে তাঁর গলাও ছিল চিত্তহারী, চমৎকার ও বিস্ময়কর। তিনি চলতি অর্থে ওস্তাদ নন— যদিও ওস্তাদী গানের শিক্ষা তাঁর হয়েছিল ও ওস্তাদী তিনি বুঝেন। গানের কথা সৃষ্টি, সুর সৃষ্টি, এবং কণ্ঠে কথা ও সুরের সাহায্যে বহু বিচিত্র ধ্বনিরূপের সৃষ্টি— এই ত্রিবিধ কৃতিত্বের সমাবেশে এদেশে তাঁকে অদ্বিতীয় সংগীতস্রষ্টা ব'লে মনে করি।

আমরা অনেকেই কেবল নয়নগোচর রূপ দেখি, রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু শ্রবণগোচররূপও দেখেন। তাঁর গানগুলির দ্বারা তিনি বাংলা দেশকে বহুপরিমাণে গ'ড়েছেন। তাঁর অনেক গানে ভগবদ্ভক্তি ও দেশপ্রীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়; যেমন নিম্নলিখিত গীতাংশে।

"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী
হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে,
সংকটদুঃখত্রাতা!
জনগণদুঃখ-ত্রায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!

তিনি ছিলেন সুনিপুণ অভিনেতা এবং অভিনয়ের সুদক্ষ শিক্ষক। কবিতার আবৃত্তিতে এবং প্রবন্ধ গল্প নাটক ও উপন্যাসের পঠনে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। সাধারণ কথাবার্ত্তায় তিনি সুরসিক ছিলেন। তাঁর সাধারণ কথাবার্ত্তাও ছিল সাহিত্যধর্মী ও সুরসাল। ভাব ও চিন্তার ব্যঞ্জক বহুবিধ সুরুচিপূর্ণ কলাসম্মত মনোজ্ঞ নৃত্যের তিনি স্রষ্টা ও শিক্ষক। দৈহিক সামর্থ্য যত দিন ছিল. নিজেও নৃত্যনিপুণ ছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তাঁর প্রতিভার একটা নূতন দিক্ খুলে যায়। তা চিত্রাঙ্কন। তাঁর চিত্র পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য কোন শ্রেণীতে পড়ে না, কারো কাছে শেখা নয়। এ তাঁর নিজস্ব। তাঁর চিত্রাবলী সাধারণতঃ কোন গল্প বলে না ব'লে সর্বসাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য না-হ'লেও বিদেশে ও এদেশে সমঝদারেরা এর অসাধারণ গুণ মানেন।

বঙ্গের আধুনিক চিত্রকলার উৎপত্তি যে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনা থেকে, সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বাংলার কবি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত কল্লেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চল্লো কত দিন।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্যে তিনি যা করেছেন, অন্য কোন লেখক তা করেন নি। তাঁর লেখায় বাংলা সাহিত্য প্রাদেশিকতা ও দেশিকতা অতিক্রম ক'রে সমগ্র বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সমগ্রজাগতিক ভাব ও চিন্তার ধারা খেলছে, অথচ যা একান্ত বঙ্গের ও ভারতের, তাও তাতে আছে।

যদি কোন বিদেশী কেবল তাঁর লেখা পড়বার জন্যেই বাংলা শেখেন, তা হ'লেও তাঁর শ্রম সার্থক হবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্ম্মী রূপে নেমেছিলেন। যখন সন্ত্রাসনবাদ মূর্ত্ত হ'ল, তখন তিনি তার প্রকাশ্য প্রতিবাদ ক'রলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কর্মী তিনি বেশী দিন থাকেন নাই, কিন্তু তাতে বরাবর অন্যতম চিন্তানায়ক ছিলেন— এ বৎসরও মৃত্যুর কিছুদিন আগেও ছিলেন। জালিয়ানওয়ালা-বাগের কাণ্ডের প্রতিবাদ তিনিই প্রথমে করেন এবং তার কার্যতঃ প্রতিবাদস্বরূপ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। যে-সব সভায় তাঁর অধিনায়কত্বের প্রয়োজন হয়েছে, তাতে অল্প দিন আগেও তিনি সভাপতি হয়েছেন। সম্প্রতিও তাঁর বাণী, উপলক্ষ্য ঘটলেই, সকল দেশভক্তকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে।

রাষ্ট্রকে অবস্থাবিশেষে কর দেওয়া বা না-দেওয়ার প্রজাদের অধিকার এবং স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব ও বন্ধন বরণ এবং তার গৌরব ও আনন্দ, তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রথম এবং পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে "পরিত্রাণ" নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে ব্যক্ত করেন। "মুক্তধারা" নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগী এই রকম কথা ব'লেছেন।

তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক তাঁর "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত উপন্যাসের গল্প অবলম্বন ক'রে লিখিত। এই নাটকটির বিজ্ঞাপনের তারিখ ৩১শে বৈশাখ, সন ১৩১৬ সাল।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটক থেকে কিছু উদ্ধৃত কচ্ছি।

পথপার্শ্বে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও মাধবপুরের এক দল প্রজা।

তৃতীয় প্রজা। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বল্‌ব?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, আমরা খাজনা দেব না।

তৃ প্র। যদি শুধোয়, কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বল্‌ব, ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই, তা হ'লে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে, সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়, তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

চতুর্থ প্রজা। বাবা, একথা রাজা শুন্‌বে না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য

কথা শুনতে দেবেন না। ওরে, জোর করে শুনিয়ে আসব।

পঞ্চম প্রজা। ও ঠাকুর, তাঁর জোর যে আমাদের চেয়ে বেশি—তাঁরই জিত হবে।

ধনঞ্জয়। দূর বাঁদর, এই বুঝি তোদের বুদ্ধি! যে হারে তার বুঝি জোর নেই! তার জোর যে একেবারে বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছয় তা জানিস্!

ষষ্ঠ প্রজা। কিন্তু ঠাকুর, আমরা দূরে ছিলুম, লুকিয়ে বাঁচতুম—একেবারে রাজার দরজার গিয়ে পড়্‌ব, শেযে দায়ে ঠেক্‌লে আর পালাবার পথ থাকবে না।

ধনঞ্জয়। দেখ পাঁচকড়ি, অমন চাপাচুপি দিয়ে রাখলে ভাল হয় না। যত দূর পর্য্যন্ত হবার তা হতে দে, নইলে কিছুই শেষ হতে চায় না। যখন চূড়ান্ত হয়; তখনি শান্তি হয়।

আর এক অঙ্কের আর একটি দৃশ্য থেকে কিছু উদ্ধৃত করি।

প্রতাপাদিত্য। দেখ বৈরাগী, তুমি অমন পাগ্‌লামি ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক্। মাধবপুরের প্রায় দু-বছরের খাজনা বাকি—দেবে কি না বল।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপ। দেবে না! এত বড় আস্পর্দ্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপ। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কি ব'লে!

প্রতাপ। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে!

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই ত বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা ত'বোঝে না— পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে এমন কাজ কর্‌তে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি—তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস্ নে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন বললেন তিনিই প্রজাদিগকে খাজনা দিতে বারণ করেছেন, তখন প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, "দেখ ধনঞ্জয়, তোমার কপালে দুঃখ আছে।" ধনঞ্জয় যথাযোগ্য উত্তর দিবার পর—

প্রতাপ। দেখ বৈরাগী তোমার চাল নেই চুলো নেই—কিন্তু এরা সব গৃহস্থ মানুষ, এদের কেন বিপদে ফেলতে চাচ্চ? (প্রজাদের প্রতি) দেখ বেটারা, আমি বলচি তোরা সব মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে। (ধনঞ্জয় বন্দী হইলেন)

আগুন লেগে কারাগার ভস্মসাৎ হওয়ায় ধনঞ্জয় বৈরাগী বাইরে এসেছেন।

ধনঞ্জয়। জয় হোক্ মহারাজ। আপনি ত আমাকে ছাড়তেই চান না; কিন্তু কোথা থেকে আগুন ছুটীর পরোয়ানা নিয়ে হাজির। কিন্তু না বলে যাই কি ক'রে? তাই হুকুম নিতে এলুম।

প্রতাপ। ক'দিন কাট্‌ল কেমন?

ধনঞ্জয়। সুখে কেটেছে—কোন ভাবনা ছিল না। এ সব তার লুকোচুরি খেলা—ভেবেছিল গারদে লুকবে, ধরতে পারব না—কিন্তু ধরেছি, চেপে ধরেছি, তার পর খুব হাসি, খুব গান। বড় আনন্দে গেছে—আমার গারদ ভাইকে মনে থাকবে!

(গান)

(ওরে) শিকল, তোমায় কোলে করে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
(তুমি) আনন্দে ভাই রেখেছিলে ভেঙে অহঙ্কার।
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাটল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিলে বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার!
তোমার পরে করি নে রোধ,

দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর!
অন্ধকারে সারা রাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায়
করি নমস্কার।

প্রতাপ। বল কি বৈরাগী, গারদে তোমার এত আনন্দ কিসের?

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজ্যে তোমাব যেমন আনন্দ, তেমনি আনন্দ, অভাব কিসের? তোমায় সুখ দিতে পারেন, আর আমাকে সুখ দিতে পারেন না?

"অস্পৃশ্যতা"র বিরুদ্ধে আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের জাতিভেদবিরোধী আন্দোলনের অন্তর্গত। এই প্রেরণা স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে ত্রিশ বৎসর পূর্বে রচিত "গীতাঞ্জলি"র অন্তর্গত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হোতে হবে তাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হোতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

"গীতাঞ্জলি"র ইংরেজি অনুবাদ দ্বারাই তিনি বিশ্বসাহিত্যিকবাঞ্ছিত নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এত বড় ইংরেজি লেখক তিনি ছিলেন এবং ইংরেজি লেখার জন্যে ১৭/১৮ বৎসর বয়সেই বিখ্যাত অধ্যাপক হেনরি মর্লির ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রশংসা পেয়েছিলেন; কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত নিজের ইংরেজি লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কী অলোকসামান্য নম্রতা!

দীনদরিদ্র নিরক্ষর লোকদের প্রতি তাঁর প্রীতি শ্রদ্ধা সমবেদনা করুণা যে তাঁর কত রচনাতে আছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ করাও কঠিন। ঐ "গীতাঞ্জলি"তেই আছে,

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব হারাদের মাঝে।"

আরো আছে,

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।"

গত ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে প্রকাশিত তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ "ঐকতান" কবিতাতে আছে :—

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে জেলে ফেলে জাল,
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত
সংসার।"

সাধারণ লোকদের সম্বন্ধে তাঁর এই রকম নানা কথা শুধু পুঁথিগত নয়। "অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ" ইত্যাদি লম্বাচোড়া রব দেশে উঠবার অনেক আগে থেকেই তাঁর পরিবারে ও শান্তিনিকেতনে "অস্পৃশ্য" পাচক ও অন্যান্য ভৃত্য ববাবব নিযুক্ত হয়ে আসছে অবাধে।

যে-সকল নারীকে সমাজ পতিতা বলে (কিন্তু দুশ্চরিত্র পুরুষকে পতিত বলে না) তাদের প্রতি কবির করুণার অন্ত নাই। তার পরিচয় তাঁর "চতুরঙ্গ" গ্রন্থের ননীবালার কাহিনীতে পাই, আর পাই "কাহিনী" গ্রন্থের 'পতিতা' কবিতায় এবং "চৈতালী"র 'করুণা' ও 'সতী' কবিতা দুটিতে। আরো দৃষ্টান্ত আছে।

রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য ও পরিচালনা নিরপেক্ষ ভাবে দেশের—বিশেষ ক'রে পল্লীব, হিতকর কাজ করবাব প্রয়োজন ও পদ্ধতি তিনি অসহযোগ

আন্দোলনের বহু পূর্বে নির্দেশ ক'রে নিজের জমিদারীতে ও সুবুলে তদনুসারে কাজ করিয়ে এসেছিলেন। সরকারী রিপোর্টে পর্যন্ত তাঁর জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা বেরিয়েছিল। তিনি রেয়ৎ প্রজাদের খুব প্রিয় ছিলেন। তার একটা সত্যি গল্প বলি। একবার এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট্ তাঁর সঙ্গে তাঁর জমিদারী দেখতে যান। তাঁর যে প্রজার উপরে তাঁদের যানবাহনের ব্যবস্থা করবার ভার ছিল, সে একখানি মাত্র পাল্কি এনে হাজির করে! তার ধারণা তাদের রাজার সঙ্গে যে যাবে সে হেঁটে যাবে, হোক্ না কেন সে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট! রবীন্দ্রনাথ অনেক বলা-কওয়ায় সেই প্রজা সাহেবের জন্য শেষ পর্যন্ত একটা বেতো ঘোড়া এনেছিল!

পাবনার যে প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তিনি সভাপতির কাজ করেন এবং বাংলা ভাষায় সভাপতির অভিভাষণ রচনা ও পাঠের প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান, তাতে তাঁর কর্মপদ্ধতি তিনি সভার সম্মুখে উপস্থিত করেন। তার পরও তাঁর অনেক বক্তৃতায় ও প্রবন্ধে তিনি এই সব কথা বলেছেন। বিশ্বভারতীর একটি প্রধান বিভাগ শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। কৃষি, পল্লীস্বাস্থ্য, পল্লীশিল্প, গ্রামে দরকারমত কৃষকদের মূলধন সরবরাহ, ইত্যাদি কাজ এই বিভাগ ক'রে থাকেন।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনের, এবং ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জনের সমর্থন কখনও করেন নি।

আন্তর্জাতিকতা নামে অভিহিত তাঁর বিশ্বমানবপ্রেমের আভাস তাঁর অনেক আগের রচনাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় "প্রবাসী"র প্রথম সংখ্যার জন্যে প্রায় এক চল্লিশ বৎসর আগে লিখিত সেই কবিতায় যার গোড়ায় আছে,

"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া,
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।"

তিনি তাঁহার "ন্যাশন্যালিজ্‌ম্" নামক ইংরেজী গ্রন্থে সেই স্বাজাতিকতাই গর্হিত বলেছেন যা বিদেশ ও বিজাতির ধন গ্রাস করতে ও তাদের উপর প্রভুত্ব করতে চায়। সব সাম্রাজ্যবাদ এর অন্তর্গত এবং নাৎসিবাদ সর্বাধম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। পরদেশদ্রোহিতা না-ক'রে যে স্বাজাতিকতা স্বদেশের কল্যাণ করতে চায়, কথায়, কাব্যে, বক্তৃতায়, গানে ও কাজে চিরদিনই তিনি তার সমর্থক ও অন্যতম প্রধান অনুপ্রাণক। তাই তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে "নৈবেদ্য" গ্রন্থে প্রার্থনা করতে পেরেছিলেন,

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

তিনি ভারতকে সেই স্বর্গে জাগরিত দেখার আনন্দ সম্ভোগ ক'রে যেতে পান নাই, একথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।

বাহ্য রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধন হ'তে মুক্তি তাঁর স্বাধীনতার আদর্শের নিশ্চয়ই অন্তর্গত; কিন্তু

সামাজিক ও আন্তরিক সর্ববিধ দাসত্ব হ'তে মুক্তি এর অস্থিমজ্জা। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি সর্বান্তঃকরণে চাইতেন।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের যে যে ব্যবহার নিন্দনীয় তিনি তার তীব্র নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইংলণ্ডের ও ইংরেজ জাতির গুণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশসমূহের এবং তাদের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির নিন্দনীয় দিক্‌গুলির নিন্দা তিনি করেছেন, কিন্তু তাদের বিজ্ঞানের ও জিজ্ঞাসুতার, জনসেবার ও সংস্কৃতির এবং মনুষ্যত্বকে সম্মানদানের যথাযোগ্য গুণগ্রাহীও তিনি ছিলেন।

পাশ্চাত্যের নিকট হ'তে তিনি নিতে রাজী—ভিক্ষুকের মত নয়, কিন্তু মিত্রের মত—ভারতবর্ষ তাদিগকেও কিছু দিতে পারে ব'লে।

পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' সম্বন্ধে তাঁর শেষ উক্তি গত ১লা বৈশাখের অভিভাষণ "সভ্যতার সংকট" সাতিশয় বেদনাপূর্ণ; কিন্তু তিনি তাতেও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কথা বলেন নাই। তাতে বলেছেন :—

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা এক দিন না এক দিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একটি দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,.

"অধর্মেণৈ—ধতে তাভৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

তিনি ছিলেন সমুদয় বিদেশীবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। তাঁর এই উদার ভাব তাঁর নানা রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে তাঁর "ভারত-তীর্থ" নামক কবিতাটি সুবিদিত। তার দুটি কলি উদ্ধৃত ক'রব।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হোল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,
শক হুন-দল পাঠান মোগল

এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

*　　*　　*　　*

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত
সব অপমান ভার
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা।
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।

তিনি চীন জাপান জাভা বালী ও ভারত-মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা কায়মনো-বাক্যে ক'রে গেছেন।

অনেক বৎসর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম স্থাপন করেন, তাই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হ'য়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রমসমূহের আদর্শের ভিত্তির উপর এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষালাভ আনন্দে হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা সরল, অনলস, বিলাসিতাবিহীন জীবন যাপন করবেন; অধ্যাপকদের প্রভাব বিদ্যার্থীদের উপর ও বিদ্যার্থীদের প্রভাব অধ্যাপকদের উপর পড়বে; সকল ঋতুতে প্রকৃতির প্রভাব তাঁরা অনুভব করবেন; ভারতের ও অন্য সকল দেশের জ্ঞানের ও ভাবের নানা প্রবাহ এখানে অবাধে প্রবাহিত হবে; সকলে শ্রদ্ধাবান্ ও শুচি থাক্‌বেন এক অসীমের চরণে মাথা নত ক'রে; এখানকার শিক্ষা শুধু পণ্ডিত প্রস্তুত করবে না, আত্মনির্ভরশীল উপার্জ্জকও প্রস্তুত করবে; শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা এখানে হবে না, সঙ্গীত-চিত্রকলা-আদি সুকুমার কলার অনুশীলনও হবে; আবার, বস্ত্রবয়ন-আদি নানাবিধ কারুশিল্প ও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্যে সচ্ছলতায় সৌন্দর্যে আবার আনন্দের নিলয় করবার চেষ্টা হবে; অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা কেবল জ্ঞাতা ও জিজ্ঞাসু হবেন না, কর্ম্মী ও স্রষ্টাও হবেন; বিদ্যার্থীরা ব্যষ্টি-ও-সমষ্টি-গত ভাবে যথাসম্ভব স্বশাসক হবেন;—সংক্ষেপে বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এইরূপ।

এখানে ছাত্রছাত্রীরা পৃথক্ পৃথক্ আবাসে থেকে শিক্ষা লাভ করেন একত্র। ভারতবর্ষের সকল প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্কৃতির অনুশীলন এখানে হয়, চীন তিব্বত প্রভৃতি বিদেশের সংস্কৃতির অনুশীলনও হ'য়ে থাকে। এখানে ছাত্রছাত্রীদের নানা রকম ব্যায়াম ও খেলার ব্যবস্থা আছে, গ্রামসেবার সুযোগ আছে।

১৯২৪ সালে বিশ্বভারতীর অন্যতম অঙ্গ রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষাসত্র" নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র—

প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীশ রূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত-উৎপাদক ও সম্ভাব্য-স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জ্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে

সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপে ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনেব অধিকারও সে অর্জ্জন করিবে। (অনুবাদ)

বিশ্বভারতীর ৯-সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কি কি শিল্প শিখান যেতে পারে, তার তালিকা আছে। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, ছুতরের কাজ, প্রভৃতি তার অন্তর্গত। লেখাপড়া শিখাবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁরা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানতে চান, তাঁরা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখবেন।

বিশ্বভারতীর বুলেটিন দুটিতে, শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হ'য়েছে, তা, এবং এর মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যা লিখিত হ'য়েছে, তাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালস্বভাব ও মানব-মন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন এর আদর্শ বহু স্থানে অনুসৃত হয় নাই, তা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমান লিখছি।

এর পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোন রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই;—এতে বলা হয় নাই, যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাবে ও দেশ স্বাধীন হবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওআর্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে— যেমন তাঁর চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক অর্থনৈতিক যুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে!

বিশ্বভারতীতে ছাত্র ও ছাত্রীরা কেন গীতবাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় করে এবং সেখানে এইগুলি শিখাবার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, সে-বিষয়ে অনেকের স্পষ্ট ধারণা নাই। এ বিষয়ে কবি চীনদেশের অন্যতম প্রধান নেতা মহামান্য তাই চি তাও মহাশয়কে একটি পত্রে লিখেছিলেন —

Tonight we shall present before you another aspect of our ideal where we seek to express our inner self through song and dance. Wisdom, you will agree, is the pursuit of completeness; it is in blending life's diverse work with the joy of living. We must never allow our enjoyment to gather wrong associations by detachment from educational life; in Santiniketan, therefore, we provide our own entertainment, and we consider it a part of education to collaborate in perfecting beauty. We belive in the discipline of a regulated existence to make our entertainment richly creative.

In this we are following the ancient wisdom of China and India; the *Tau,* or the True Path, was the golden road uniting arduous service with music and merriment. Thus in the hardest hours of trial you have never lost the dower of spiritual gaiety which has refreshed your manhood and attended upon your great flowerings of civilisation. Song and laughter and dance have marched along with rare loveliness of Art for centuries of China's history In India Sarasvati sits on her lotus throne, the goddess of Learning and also of Music.

with the Golden lyre—the *Veena*—on her lap. In both countries, the areanea of light have fallen on divinity of human achievements. And that is Wisdom.

দৈহিক আত্মরক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা এবং পরোক্ষ ভাবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কেরাও যাতে অন্য যে-কোন দেশের লোকদের সমকক্ষ হয়, রবীন্দ্রনাথের সে দিকে দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বয়ং ছেলেবেলা ও কৈশোরে বাড়ীর পালোয়ানদের সঙ্গে কুস্তি করতেন। বিশ্বভারতীতে ছেলেমেয়েদের জাপানী জিউজিৎসু শেখাবার জন্যে তিনি জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক জন জিউজিৎসু-ওস্তাদ আনিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক ছেলেমেয়ে বেশ জিউজিৎসু শিখেছিল। অধ্যাপকেরাও ২/১ জন, যেমন স্বর্গগত গৌরগোপাল ঘোষ, বেশ শিখেছিলেন। আমরা কবিকে দুঃখ করতে শুনেছি যে, বিশ্বভারতীর বাইরে স্বদেশবাসীরা এত বড় জাপানী জিউজিৎসুবিদের কাছে আত্মরক্ষার নানা কৌশল শিখতে আগ্রহ দেখান নাই।

লাঠি খেলা, ছোরা থেকে আত্মরক্ষা, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদির কৌশল কবির সামনে ছাত্রছাত্রীদিগকে দেখাতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনই তাদের এ সকলের শিক্ষার স্থান। বিশ্বভারতীর কোন কোন ছাত্রকে সার্কাসের শক্ত শক্ত ব্যায়াম ও দুঃসাহসের কাজ করতে আমরা দেখেছি। শান্তিনিকেতনের ফুটবল খেলোয়াড়রা মফস্বলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের অন্যতম। শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক খেলাধূলার মধ্যে নানা রকম দৌড় এবং তীর দিয়ে লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা হ'য়ে থাকে।

আগে আগে কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের থাকবার ঘরে তাঁদিগকে গল্প বলতেন; তা ছাড়া কিছু দূরের খোলা মাঠে বা স্বাভাবিক কোন কুঞ্জেও বলতেন। সেখান থেকে ফিরবার সময় ছেলেরা কখন কখন তাঁকে দৌড়ের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করত। এ ৩০/৩৫ বৎসর আগেকার কথা। দৌড়ে তিনিই সব বারেই জিততেন। তিনি তখন বলিষ্ঠ, কর্মিষ্ঠ পুরুষ; বোলপুর স্টেশন থেকে হেঁটে শান্তিনিকেতন যাতায়াত করতেন।

ছাত্রদের মধ্যে স্বশাসন তিনি প্রবর্তিত করেন। তাদের নিজেদের নায়ক ও অধিনায়ক এবং তাদের দোষত্রুটির বিচারের জন্যে তাদেরই দ্বারা তাদেরই মধ্য থেকে বিচারক নির্বাচন প্রথা তিনি প্রবর্তিত করেন। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময় তাদের উপর কোন পাহারা না রেখে তাদের সততা ও আত্মসম্মানের উপর নির্ভর করার প্রথাও তিনি প্রবর্তিত করেন।

ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রভাব অনুভব সম্বন্ধে সকলকে জাগরিত করবার জন্যে কবি ঋতু-উৎসবগুলি প্রবর্তন করেন:—যেমন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্ত-উৎসব।

আর্তের সেবা, রোগীর সেবাশুশ্রূষা তিনি শুধু বাক্যে প্রচার ক'রে ক্ষান্ত হন নি, কাজেও ক'রেছেন। তার একটি অনুপ্রাণনাপূর্ণ আখ্যান এই মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে দেওয়া হয়েছে।

তাঁকে "গুরুদেব" সম্বোধন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় আরম্ভ করান, ও সতীশচন্দ্র রায় প্রচলিত করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রত্যহ একা একা ১৫ মিনিট ধ্যানের এবং সকালসন্ধ্যা সম্মিলিত স্তবগান দ্বারা উপাসনা রবীন্দ্রনাথ নিজের বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করেন।

বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য কবি "লোকশিক্ষা-সংসদ" স্থাপন ক'রে গেছেন। এর জন্যে কয়েক

খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। এর অশেষ সম্ভাব্যতা আছে।

কবি বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা শুধু এ অর্থে নয়, যে, এর আদর্শ ও পরিকল্পনা তাঁর, এবং তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য টাকা দিয়েছেন, টাকা সংগ্রহ করেছেন, ঘরবাড়ী বানিয়েছেন; পরন্তু এই অর্থেও যে, তিনি এর জন্যে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রম করেছেন; এর কেরানীগিরি পর্যন্ত ক'রেছেন; স্বয়ং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে অসাধারণ নৈপুণ্য ও ধৈর্য সহকারে পড়িয়েছেন; কিছু দিন আগেও নিজের কবিতা ব্যাখ্যা করেছেন; গান, অভিনয়, নৃত্য শিখিয়েছেন; তাদের সভায় সভাপতিত্ব করেছেন; তাদের গল্প ব'লে চিত্তবিনোদন করেছেন; তাদের সঙ্গে খেলা করেছেন; মন্দিরে উপাসনা ও ভাষণ দ্বারা অনুপ্রাণনা দিয়েছেন; তাঁর স্বর্গগতা সহধর্মিণী প্রথম অবস্থায় নিজের অলঙ্কার এই প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছেন এবং অধ্যাপক ও ছাত্রদেরকে দিনের পর দিন পরম সমাদরে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়েছেন। দেহমনের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের অধিকারী কবির অন্য ব্যসন তো ছিলই না; পান তামাকের অভ্যাস পর্যন্ত না-থাকায় তিনি সকলের আদর্শ 'গুরুদেব' ছিলেন।

কবি দ্বাদশ বার পৃথিবীর নানা দেশে বেড়িয়ে ভারতের লোকদের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকদের যোগ স্থাপন ও বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর জাতিসমূহের অন্যতম আন্তর বন্ধনরজ্জু এবং উদ্যোগী জগৎশান্তিকামী।

তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে; তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত, কত রকমের কত বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্বখ্যাতি না থাক্‌লে পাণ্ডিত্যখ্যাতি র'টত। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া কত বিষয়ের বই তিনি শুধু ইংরেজীতেই পড়েছিলেন. ইংরেজীতে তার একটা ফর্দ দিচ্ছি।

Farming; philology; history; medicine; astrophysics; geology; bio-chemistry; ento-mology; co-operative banking; sericulture, indoor decorations; production of hides, manures, sugarcane, and oil; pottery; weaving looms; lacquer work; tractors; village economics; recipes for cooking; lighting; drainage; calligraphy; plant-grafting; meteorology: synthetic dyes; parlour-games: Egyptology; road-making; incubators; wood-blocks; elocution; stall-feeding; jiu-jitsu; printing; etc.

এ সকল ছাড়া সাহিত্য বলতে সাধারণতঃ যা বুঝায়, তা ত পড়তেনই। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনাতে তিনি যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়তে দেখেছিলাম, বলতে পারি না।

উপরে তাঁর অধীত নানা বিষয়ের যে ইংরেজী তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে চিকিৎসা-বিদ্যা একটি। হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই তিনি দস্তুরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক্যাল চিকিৎসাও ভাল জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভাল। কখন কখন রহস্য ক'রে বল্‌তেন, "আমি ফী নেই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার হয় নি।"

ইংরেজি ফর্দটির মধ্যে রান্নার পাঁতি ও "সুন্দর হস্তাক্ষর" (calligraphy) এর উল্লেখ আছে। তিনি নানা রকম রান্নার পরীক্ষা কবতেন। নানান্ খাদ্যের গুণাগুণ পরীক্ষাও করতেন। এক সময়ে নিমপাতা তাঁব একটি প্রধান খাদ্য ছিল। চিনির চেয়ে গুড় তিনি বরাবর ভাল বাসতেন। ভাতের ফেন ফেলে দেওয়ার নিন্দা করতেন। এক সময় রেড়ির তেলের ময়েন দেওয়া রুটি খেতেন। তাঁর অতি সুন্দর বাংলা ও ইংরেজী হাতের

লেখার কথা কোন্ বাঙালী না জানে?

প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ীর সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে, এক দিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো আমার শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারাণ্ডায় উপাসনায় বসেছেন নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখি নি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর শ্রমশীলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্দ্ধক্যে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধীজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর অসামান্য মেধার ও প্রতিভার পরিচয়ও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

ঋষিদের যে আধ্যাত্মিক সত্য দৃষ্টির শক্তি ছিল ব'লে আমরা পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল। তাঁর বহু ধর্মোপদেশে, কবিতায় ও সঙ্গীতে তার পরিচয় আছে। বিলাসী তিনি ছিলেন না, আবার কৃচ্ছ্রসাধকও বরাবর ছিলেন না—যদিও নিজের আহার সম্বন্ধে কখন কখন অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা করতেন। জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। তিনি বলেছেন,

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি মাতৃহস্তের মতই স্নেহময় ও নির্ভরযোগ্য মনে করতেন; তাই মৃত্যুর সম্বন্ধে বলেছেন :—

"সে যে মাতৃপাণি,
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

ইহলোক ও পরলোক বিশ্বজননীর দুই স্তন। মৃত্যুরূপ হাত দিয়ে তিনি মানুষকে ইহলোক-রূপ এক স্তনের পীযূষের পর পরলোক-রূপ অন্য স্তনের পীযূষ পান করান।

কবিকে আমি সাধক ব'লে জানতাম। কিন্তু বৈরাগ্য তাঁর সাধনার পথ ছিল না। তিনি লিখেছেন :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।"

কবি নারীকুলের---বিশেষ ক'রে বঙ্গনারীদের, দরদী যে কত বেশি ছিলেন, তা বলতে পারি না। তিনি তাদের জন্যে যা ক'রেছেন ও করতে চেয়েছিলেন, তা সংক্ষেপে বলা যায় না। কেবল নারীদের জন্যেই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলবার ইচ্ছা

তাঁর ছিল; অর্থাভাবে তা ঘটে ওঠে নি। বিশ্বভাবতীর আর্থিক অসচ্ছলতায় তিনি যখন বড় বেশি উদ্বিগ্ন হ'তেন, তখন তাঁকে বলতে শুনেছি, আর সব তুলে দিয়ে কেবল কলাভবন, সঙ্গীত-ভবন ও নারীদের জন্যে শিক্ষণব্যবস্থা-সমেত শ্রীভবনটি রাখবেন।

নারীদের সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ কি ছিল? তাঁর বহু কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্পে এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সাধারণত "চিত্রাঙ্গাদা"র, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে।

"আমি চিত্রাঙ্গাদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

"মহুয়া"র 'সবলা' কবিতায় অন্য সুরের ঝঙ্কার পাই। ঐ গ্রন্থের 'নাম্নী' কবিতাবলীতে ১৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নারীচিত্র আছে।

"আরোগ্য" গ্রন্থে 'নারী তুমি ধন্যা' কবিতায় সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অন্তঃপুরিকাদের মহনীয় বহু স্বরূপের বন্দনা কবি ক'রেছেন।

কবি তাঁর সহধর্মিণীর পরলোকযাত্রার পর "স্মরণ"-শীর্ষক কবিতাগুলি লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থেও তা নাই। তাঁর কথাবার্তাতেও তিনি এ বিষয়ে নির্বাক্ থাকতেন। ১৩৪৬ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী 'সংসারী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে এই বিষয়ে আলোকপাত ক'রেছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই, সহধর্মিণীর প্রতি কবির প্রেম কী গভীর ছিল। কবির সন্তানস্নেহ, ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রভৃতির সন্ধানও তাতে আছে। কবিকে যাঁরা বুঝতে চান, তাঁদের এই প্রবন্ধটি পড়া একান্ত আবশ্যক। এর থেকে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"বিদ্যালয়-স্থাপনার পরে ছাত্রদের মধ্যে থাকবেন ব'লে শান্তিনিকেতনের বর্তমান লাইব্রেরী-বাড়ীর এক পাশের একটি ঘরে কবি বাস করেছেন অনেক দিন, খেতেন ছাত্রদের খাওয়ার সারে বসে—এক সঙ্গে একই খাদ্য।

"কবি-পত্নী স্বভাবত অতিরিক্ত সাজসজ্জার আদৌ অনুরাগী ছিলেন না, গহনা পরতেন নিতান্ত সামান্য। বড় ঘরের বৌ, তার তুলনায় তিনি সাধারণ বেশেই থাকতে ভালবাসতেন। উপরন্তু কবির উন্নত রুচির প্রভাব তাঁকে আরো সাদাসিধা ক'রে তুলেছিল।"

"কবি-পত্নী এক বার সাধ ক'রে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন ব'লে। কবি দেখে বলেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে—লজ্জার কথা।"

"কবি-পত্নীর রান্নার হাত ছিল চমৎকার।"

"নূতন নূতন রান্না আবিষ্কারের সখ কম ছিল না কবিরও। বোধ হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতা এ-সম্বন্ধে তাঁর সখ বাড়িয়ে দিত বেশী। রন্ধনরতা পত্নীর পাশে মোড়া নিয়ে ব'সে নূতন রান্নার ফরমাস করছেন কবি, দেখা গেছে অনেক বার। শুধু ফরমাস ক'রেই ক্ষান্ত হতেন না, নূতন মালমসলা দিয়ে নূতন প্রণালীতে পত্নীকে নূতন রান্না শিখিয়ে কবি সখ মেটাতেন। শেষে তাঁকে রাগাবার জন্যে গৌরব ক'রে বলতেন, 'দেখলে তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে

দিলুম।' তিনি চটে গিয়ে বলতেন, 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেই আছ সকল বিষয়ে'।"

"সংসারে এক উপদ্রব বাধাতেন কবি নিজের খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। থেকে থেকে খাওয়া এত কমিয়ে ফেলতেন যে, কাছের লোকে চিন্তিত না হয়ে থাকতে পারত না। করো চিন্তা, বলো যা খুশি,—কবি নিজের ইচ্ছায় ভর ক'রেই চলেছেন। জন্ম হ'তে অটুট স্বাস্থ্য পাওয়ায় ও বয়সের জোর থাকায় শরীর তখন এই সব উপদ্রব সহ্য করেছে অনেকটা অনায়াসে। ঘরের লোকের ধারণা, খেয়ালের বশে কবি স্বল্পাহারে শরীর নষ্ট করছেন, কাজেই এই ব্যাপার তাঁরা উপদ্রব ব'লেই গণ্য করতেন। কবি যে শরীরের উপযোগী খাদ্য না খুঁজে মনের উপযোগী খাদ্য খুঁজে নিচ্ছেন, এ-কথা বোঝা যেত না তখন স্পষ্ট ক'রে। ঘরের মানুষ—যাঁদের লক্ষ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি, তাঁরা এমনতরো ঝোঁকালো লোক নিয়ে বেগ পেতেন সর্বদা।"

"ভৃত্যরা খুশী মনে সহজ ভাবে কবির সামনে কথা বলে, কবি সেটা ভালবাসেন চিরদিন। ভয় পেয়ে ভৃত্য কাজ করবে তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।"

"সেই সময়কার আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কন্যা রাজবাড়ী যাবে—নিতান্ত সাধারণ বেশে কবি পাঠিয়েছেন তাকে সেখানে। আত্মীয়েরা বলেছেন, এমন সাজে কবি রাজবাড়ী কন্যা পাঠান যে দেখে লজ্জা করে। কবির উত্তর, 'এই বেশে কন্যা আমার স্নেহসম্মান যদি না পায়, তবে তেমন সম্মানে কাজ নাই। বেশভূষা যে-সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ করে, সে-সম্মান না পাওয়াই শ্রেয়।' "

"সন্তান-স্নেহ কবির অপরিমেয়। প্রথম সন্তান, কন্যাটিকে পিতা হয়েও তিনি মাতৃস্নেহে পালন করেছিলেন ধাত্রীরূপে। পত্নীর বয়স ছিল কম, কবি যেন ভরসা পেতেন না প্রথম সন্তানের সম্যক্ যত্ন পাছে তিনি করতে না পারেন ভেবে। শিশুকে দুধ খাওয়ানো, কাপড় পরানো, বিছানা বদলানো কবি সব করতেন নিজের হাতে, এ-সবই আমাদের চোখে দেখা।"

শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এর পর কবি কর্তৃক পত্নীর সেবার যে পবিত্র চিত্রটি দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যদি মহাপুরুষ না হ'তেন তা হ'লেও তারই জন্যে তিনি জগজ্জনের চির-আরাধ্য হয়ে থাকতেন।

"শিক্ষাব্রতী কবি আদর্শ-শিক্ষালয় গঠনে যখন প্রবৃত্ত, কবির সহধর্মিণী তখন সহকর্মিণী হয়েছিলেন তাঁর সে কাজে। ছাত্রদের জলখাবার তৈরীর ভার নিয়েছিলেন তিনি নিজের হাতে। স্নেহ দিয়ে গড়তে চেয়েছিলেন ছাত্রগুলিকে। বিদ্যালয় আরম্ভের একটি বৎসর শেষ না হ'তেই বিদ্যালয়ের জননী কবি-পত্নীর আয়ু হ'ল শেষ। কবির সংসার ভেঙে দিয়ে তিনি চলে গেলেন অকালে। মৃত্যুশয্যায় কবি নিজের হাতে তাঁর যে শুশ্রূষা করেছিলেন, তার ছাপটি মুদ্রিত হয়ে রয়েছে পরিবারের সকলের মনে আজও। প্রায় দু-মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন; ভাড়া করা নার্সদের হাতে পত্নীর শুশ্রূষার ভার কবি এক দিনের জন্যও দেন নাই।

"স্বামীর সেবা পাওয়া কত সৌভাগ্যের, সাধ্বী নারী মাত্রই জানেন। পত্নীর প্রতি স্নেহ কবির প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শেষ শয্যায় চূড়ান্ত রূপে। তখন ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের সৃষ্টি হয় নাই দেশে। হাতপাখা হাতে ধ'রে দিনের পর দিন রাতের পর রাত পত্নীকে কবি বাতাস দিতেন, এক মুহূর্ত হাতের পাখা না ফেলে। ভাড়াটে শুশ্রূষাকারিণীর প্রচলন তখন ঘরে ঘরে; কবির

ঘরে তার ব্যত্যয় ঘটল প্রথম।"

কবি অন্যান্য বিষয়ে যেমন অসাধারণ, শোকও পেয়েছেন সেইরূপ অত্যধিক, এবং সহ্য করেছেন সেইরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত। পত্নীর মহাপ্রয়াণে তিনি মর্ম্মন্তুদ বেদনায় "স্মরণ" গ্রন্থের প্রথম কবিতায় প্রার্থনা ক'রেছিলেন :—

"আজি মোর কাছে প্রভাত তোমার
কর গো আড়াল কর'।
এ খেলা এ মেলা এ আলো এ গীত
আজি হেথা হ'তে হ'র;
প্রভাত-জগত হতে মোরে ছিঁড়ি,
করুণ আঁধারে লহ মোরে ঘিরি',
উদাস হিয়ারে তুলিয়া বাঁধুক
তব স্নেহ বাহু ডোর।"

ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে ব্যবধানসত্ত্বেও এই দম্পতি অভিন্নাত্মা হয়েছিলেন। কবি স্বর্গগতা পত্নীকে সম্বোধন ব'লেছিলেন :—

"আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।
যেন আমি বুঝি মনে
অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমারি জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ।"

আকাঙ্ক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে। চোখ কান যাই বলুক, বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নাই। এখনো মনে হচ্ছে, শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্দ্ধক্যের সেই শুচিশুভ্র সুন্দর রূপ দেখতে পাব যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হোতো। "ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,"—যদিও বুদ্ধি বলছে তিনি আছেন।

তাঁর কামনা ছিল—

"এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক,
চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
ভেদ করি' কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।
সংসারের ক্ষুব্ধতার স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নিরর্থক,
মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের কৃত্রিম মূল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা
দূরে ঠেলে দিয়ে
এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরবার আগে।"

"এ জন্মের সত্য অর্থ" তিনি জেনে গেছেন।

তিনি বিশ্বজনকে এত দিয়েও তৃপ্ত হন নাই। আরো কিছু দিতে চেয়েছিলেন—নিশ্চয় দিয়েও গেছেন, নেবার যোগ্য হ'লেই, নিতে জান্‌লেই পাব :—

"আমি কিছু দিতে চাই, তা না হোলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কি করিয়া, আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে,
ভয় হয় রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্ব পরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
র'বে না সম্মান, তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হ'তে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,—
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনার ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বনি।"

এই "শুভ শঙ্খধ্বনি" শুনবার আশায় আছি—এ তো আকাশে বাতাসে মিলিয়ে যাবার নয়। ধ্বনি শুনে কবির—

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি?"

এই প্রশ্নের উত্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলতে পারব, "সকল প্রভাতেই কবি তুমি আছ";

"সকল খেলায় ক'র্‌বে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনের সেই আমি।"

দিব্যধামবাসীদের মধ্যে কবির শুভ আগমনের উৎসবকলরোল মিশ্রিত সেই শঙ্খধ্বনি শুনে তখন তাঁর ঐ কথাগুলির অর্থও হৃদয়ঙ্গম হবে। তখন আর এখনকার মত বলতে হবে না,

"ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে।"

বিশ্বকবির মহানির্বাণ

কুমার শ্রীজয়ন্তনাথ রায়

মানুষের জীবনে এমন একটি সময় আসে যখন মনে হয় বেঁচে থাকার যেন আর কোনও প্রয়োজন নেই। এ জীবনের হিসাব নিকাশ এখন চুকে যাওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই প্রশ্নের উদয় কিছু দিন থেকে হয়েছিল তা তাঁর গত কয়েক বৎসরের রচনাভঙ্গী ও কথাবার্ত্তা থেকে বোঝা যায়। মনে পড়ে বছর দুই আগে বৈশাখের এক বৈকালে বেলঘরিয়ার বাসভবনে এই সম্বন্ধে একবার কথা হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করা হ'ল, "মৃত্যুকে আপনি ভয় করেন?" উত্তর হ'ল, "শান্তিপূর্ণ মৃত্যুকে বিন্দুমাত্র ভয় করি না; ভয় করি অপঘাত মৃত্যুকে। যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে হাসিমুখে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি, তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা করি না।" সেদিন তিনি হয়ত কল্পনাও করতে পারেন নি যে, মৃত্যু তাঁকে পৃথিবীর কাছে হাসিমুখে বিদায় নিতে দিবে না।

আর এক দিনের কথা। বছর দেড়েক আগে জোড়াসাঁকোর বাসভবনে এক সন্ধ্যায়। মংপু যাত্রাপথে কবি কলকাতায় এসেছেন দু-দিনের জন্য। দেখা করতে গেছি—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী ও আমি। কবি তখন চোখের অসুখে ভুগ্‌ছেন। চিকিৎসকের নির্দ্দেশ যে চোখে আলো লাগানো হবে না, যত দূর সম্ভব আলোক পরিহার করতে হবে। কবির কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত বাবু সে কথা কবিকে মনে করিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি নিবিয়ে দেবার আদেশ চাইলেন। সে কথা শুনে কবি যেন মুহূর্ত্তের জন্য অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সংবরণ ক'রে অতি মৃদু হেসে বললেন, "আলো? আচ্ছা, তা আলো নিবিয়ে দে।" এই "আলো নিবিয়ে দে" কথাটার মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গী ছিল যে, কেন জানি না আমার সমস্ত চেতনা যেন মুহূর্ত্তের জন্য অসাড় হয়ে গেল। হঠাৎ যেন মনে হ'ল যে এবার সত্যই বুঝি আলো নেবার সময় এসেছে। ঘরের আলো নয়, বাংলার আলো নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের আলো। আলো নিবিয়ে দিয়ে সুধাকান্ত চলে গেলেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরীও কি কাজে কিছুক্ষণের জন্য ঘরের বাইরে গেলেন। অন্ধকার ঘরের ভিতর কেবল মাত্র কবি—আর আমি। তার পরের ঘটনা জীবনে কখনো ভুলব না। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি। আর কবি আপন মনে বহু দিন পূর্ব্বেকার রচিত একটি গানের একটি পংক্তি অতি মৃদুস্বরে আত্মসমাহিত

হয়ে গাইছেন—

"জানি হে যবে, প্রভাত হবে, তোমার কৃপা তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর কিনারে"

এ গান সেদিন তিনি যে কেন গেয়েছিলেন তা সেদিনও বুঝতে পারি নি—আজও বুঝতে পারি না। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই অল্প সময়টুকুতে, সেই নির্জ্জন অন্ধকার ঘর ও সেই অতি মৃদু সঙ্গীতধ্বনি আমার মনে কিছুক্ষণের জন্য যে অপার্থিব মায়ালোকের সৃষ্টি করেছিল, তার স্মৃতি আমার অন্তর থেকে কখনো মুছে যাবে না।

আগের ও পরের কথা বাদ দিয়ে এবার শেষের ক'দিনের কথা সংক্ষেপে ব'লে আমার কথা শেষ করি। তারিখ ঠিক মনে নেই। বোধ হয় ১লা কি ২রা জুলাই হবে শান্তিনিকেতন থেকে সুধাকান্তবাবুর চিঠি পেলাম যে, কবির শরীর গত বৈশাখে যা দেখে এসেছিলাম তার থেকেও খারাপ হয়েছে। তখনো কল্পনা করতে পারি নি যে তাঁর "জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা" এত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। ২৫শে জুলাই কবি কলকাতায় এলেন অস্ত্রোপচারের জন্য। ২৯শে জুলাই বৈকালে প্রণাম ক'রে একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ কেমন আছেন?" ক্লান্ত চক্ষু দুটি তুলে মৃদু হেসে বললেন, "ভাল আছি বল্‌লে মিথ্যা কথা বলা হবে। তবে আছি এক রকম।" তার পর ৩০শে জুলাই বেলা সাড়ে দশটার সময় কলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা কবিকে অস্ত্রোপচার করলেন। বৈকালের অবস্থা দেখে সকলের মনে হ'ল যে, এবারের মত মেঘ বোধ হয় কেটে যাবে, আবার সূর্য্যালোক দেখা দেবে। কিন্তু অলক্ষ্যে যে কখন আবার ঘন-মেঘ-সঞ্চার আরম্ভ হয়েছিল তা হয়ত কেউ লক্ষ্য করে নি; ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট, নিরুপদ্রবে কাট্‌লো কিন্তু রোগের গতি পথ পরিবর্ত্তন করলে ২রা আগষ্ট থেকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য হিক্কা শুরু হ'ল ও সেই সঙ্গে আহারে বিরাগ। চিকিৎসকেরা গ্লুকোজ ইন্‌জেকশান দিতে সুরু করলেন উপায়ান্তর না দেখে। তার পর থেকে আরম্ভ হ'ল জীবন নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ। এই সময় দেখেছি কবিকে সেবা করছেন তাঁর দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা, শ্রীমতী রাণী চন্দ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ ও শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তাঁরা মুহূর্ত্তের বিশ্রাম না নিয়েও যে অক্লান্ত সেবা এই কয়দিন করেছেন তা বর্ণনা করার শক্তি আমার ভাষায় নেই। মানুষ যে মানুষের এই রকম সেবা করতে পারে, তা এই সর্ব্বপ্রথম দেখতে পেলাম। কবিকে দেখে সবচেয়ে অসহ্য মনে হ'ত তখন যখন দুই চোখ খুলে ভাষাহীন শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। যে-চোখের দিকে একবার তাকালে অতিবড় শক্তিশালীরও মাথা মুহূর্ত্তের মধ্যে নত হয়ে পড়ে, সেই চোখ যখন অসহায় শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকায় তখন তা কল্পনা করাও অসহ্য মনে হয়। সোমবার থেকেই চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হ'তে শুরু করল। মঙ্গলবার রাত্রে অবস্থা চরমে গিয়ে পৌঁছল। সে রাত্রে ঘরের বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির উন্মত্ত গর্জ্জন ও ঘরের ভিতর জীবন- প্রদীপের স্তিমিত শিখা— এই দুয়ে মিলে যেন কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের চরম দুঃসংবাদের সূচনা বহন ক'রে আনছিল। কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল। সমস্ত রাত্রি ধ'রে টেলিফোনে কবির অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ নেওয়ার বিরাম ছিল না। সকাল থেকে তা দ্বিগুণ ক'রে শুরু হ'ল। টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখার সময় পাওয়া ভার, এমনি অবস্থা।

অবস্থা তো ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছিল, সকাল থেকে আরও খারাপের দিকে চল্‌তে শুরু করলে। বেলা ১০॥ টার সময় ডাঃ ললিত বাঁড়ুজ্যে এলেন কবিকে পরীক্ষা করতে। বাহিরের বারান্দার ও বসবার ঘরের সমস্ত লোক রুদ্ধ নিঃশ্বাসে উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করছিল ডাক্তারের অভিমত শোনবার জন্য। পরীক্ষা-শেষে ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পর যখন কবির অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তখন ম্লানমুখে মৃদুস্বরে বললেন যে, "We are not happy, এ কথা আগে থেকে জানিয়ে রাখাই ভাল।" শেষ আশার রেশটুকুও

মিলিয়ে গেল। সকলের বুকের উদ্গত নিঃশ্বাস একসঙ্গে বেরিয়ে এল। তাব পর সমস্ত দিন টেলিফোনের বিরামহীন ধ্বনি— প্রেস থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় কবির অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ইত্যাদি মিলিয়ে সমস্ত দিন কোথা দিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যা না-হতেই বাহিরের ঘর লোকে ভরে গেল। অত বড় ঘরটিতে এতগুলি লোক; কিন্তু তবুও সমস্ত ঘর যেন মৃত্যুর মত স্তব্ধ।

রাত্রি এল। পূর্ণিমার রাত্রি। এই রাত্রে যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কাছে এটি চিরস্মরণীয় রাত্রি। ঠিক বারটার সময় একটি সঙ্কট-অবস্থা দেখা দিল কিন্তু তা কেটে গেল। আমরা ডাক্তার নই। সেই জন্যই হয়ত মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে বাত্রি ৩টার সঙ্কট-অবস্থা যদি কেটে যায় তাহ'লে হয়ত পূর্ণিমা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত কেটে যেতে পারে, আর যদি পূর্ণিমা কেটে যায় তাহলে হয়ত—, এই হয়ত পর্য্যন্তই মনে হচ্ছিল, তার পর আর কোন আশার কথা ভাবতে সাহস হচ্ছিল না। অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে কয়েকটি প্রাণী ব'সে আছি। কখন ৩টা বাজবে। ৩টা বাজলো। আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেউ বুঝতে পারা গেল অবস্থার নিম্নাভিমুখ দ্রুত পরিবর্ত্তন। ডাক্তারের কথা শুনেও অ-ডাক্তার হয়ে যে ক্ষীণ আশাটুকু মনে ধরে রাখা হয়েছিল তা মুহূর্ত্তের ভিতব শেষ হয়ে গেল। পূর্ণিমার নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। পবিপূর্ণ চন্দ্রমাব আলো সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে অভিষিক্ত কবছে। বাজপথ থেকে কদাচিৎ দু-একটি গাড়ীর শব্দ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে। আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আর কানে আসছে পাশের ঘর থেকে মুমূর্ষু পুরুষসিংহের অন্তিম নিঃশ্বাসধ্বনি। রাত্রি প্রভাত হবার পূর্ব্বেই অগণিত জনস্রোত রাজপথ থেকে বাড়ীর অঙ্গন ভরিয়ে ফেলেছিল। ৭টার সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বামানন্দ বাবু কবিব অন্তিম শয্যাপার্শ্বে শেষবারের মত উপাসনা করলেন আর তার পর বেলা ১২টা ১০ মিনিটের সময় একাশী বৎসরের লক্ষ সুখ-দুঃখ-সমন্বিত জীবন-নাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে নূতন ক'রে বলবার ত কিছু নেই। কেন না, আমাদের যা-কিছু বলবার ছিল, তা তিনি একাই সমস্ত ব'লে গেছেন। তবে এ দেশে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবার একটি রীতি আছে, এই কথা স্মরণ ক'রে আমিও মহাকবির ভাষায় তাঁর পূজা শেষ করি—

"এনেছিলে সঙ্গে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
ক'রে গেলে দান।"

মৃত্যু

[মৃত্যুর অল্প কয়েক দিন পূর্বে রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে।
এক মাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভাল, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত,
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।

যত বার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস,
তত বাব হয়েছে অনর্থ পরাজয়।
এই হা'র-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,
শিশুকাল হ'তে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।

রবীন্দ্রনাথের অন্তিম স্বরচিত প্রার্থনা

গান

সমুখে শান্তি-পারাবার,
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও, লও হে, ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জ্বলিবে
জ্যোতির ধ্রুব তারকা।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা অজানার।

[কবি তাঁহার অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার সময় গীত হইবার নিমিত্ত এই গানটি কয়েক মাস পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন। ২২শে শ্রাবণ কলিকাতায় যখন নিমতলায় শেষ অনুষ্ঠান হইতেছিল তখন শান্তিনিকেতন মন্দিরের উপাসনায় ইহা গীত হয়। ইহা "বিশ্বভারতী নিউজ" নামক মাসিকের আগষ্ট সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে গৃহীত হইল।]

১৩৪৮ আশ্বিন

প্রবাসীর রবীন্দ্র-সংখ্যা একটি নয়

প্রবাসীর একটি রবীন্দ্র-সংখ্যা দেখবার অভিলাষ যাঁরা সম্পাদককে মৌখিক জানিয়েছেন, তাঁদের সকলকে শত ধন্যবাদ।

আমরা বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রসংখ্যা নাম দিয়ে প্রবাসীর কোন সংখ্যা প্রকাশ করি নি, ভবিষ্যতেও করতে পারব না। এই রকম সংখ্যাতে যে-সকল রচনা ও যে-সকল চিত্র প্রকাশিত হবার যোগ্য, আমাদের হাতে সেরূপ রচনা এত সঞ্চিত হয়ে আছে ও আরো জমছে, যে, সেই সবগুলি একটি সংখ্যায় মুদ্রিত করা দুঃসাধ্য। এই জন্যে আমরা প্রত্যেক সংখ্যাতেই কিছু ছাপছি এবং ভবিষ্যতেও কিছু কাল ছাপব। বস্তুতঃ, যে চল্লিশ বৎসর ছয় মাস ধ'রে প্রবাসী প্রকাশিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে কোন্ বৎসর কোন্ সংখ্যায় যে তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয় নি, তা বলতে হলে গবেষণা করতে হবে। আর তার ছবির কথা বলতে গেলে তিনি প্রবাসীর পরলোকগত সহকারী সম্পাদক চারুবাবুকে একবার যা লিখেছিলেন, সেই কথাই মনে পড়ে যায়। একটা কি উপলক্ষ্যে চারুবাবু তাঁর কাছে তাঁর তৎকালে আধুনিক একখানি ফোটোগ্রাফ প্রবাসীতে ছাপাবার জন্যে চেয়েছিলেন। তিনি তার উত্তরে লিখেছিলেন, "চারু, তোমরা আমার এত রকম ছবি ছেপেছ যে আয়নায় মুখ দেখা ছেড়ে দিয়েছি—সব ভঙ্গীর ছবিই তো তোমরা ছেপেছ।"

"রবি-বকুল"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজেকে চিরস্মরণীয় ক'রে রেখে গেছেন। তবু, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে এবং যা দেখলেই তাঁকে মনে পড়ে এ রকম কিছু স্মারক চিহ্ন রাখবার জন্যে নানা উপায় চিন্তিত হচ্ছে এবং অবলম্বিত হবে। যত রকম উপায় আলোচিত হয়েছে, তার থেকে পৃথক্ একটি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ উপায় নিউ দিল্লীর বাঙালী সমাজ অবলম্বন করেছেন। তাঁরা যথাবিধি অনুষ্ঠানসহকারে একটি বকুল বৃক্ষ রোপণ করেছেন এবং তার নাম রেখেছেন "রবি-বকুল"। তাঁদের অনুষ্ঠানটির বৃত্তান্ত পড়ে "ফাল্গুনী" নাটকে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি মনে পড়ে গেল :—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরবো না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কে গো তুমি?—আমি বকুল।
কে গো তুমি?—আমি পারুল।
তোমরা কে বা?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।।
এবার যখন ঝ'রবো মোরা
ধরার বুকে
ঝ'রবো তখন হাসি মুখে।
অফুরানের আঁচল ভ'রে
ম'রবো মোরা প্রাণের সুরে।
তুমি কে গো?—আমি শিমুল।
তুমি কে গো?—কামিনী ফুল।
তোমরা কে বা—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে।"

নিউ দিল্লীতে যাঁরা এই সুন্দর স্মারকোপায়টি অবলম্বন করেছেন তাঁদের কাছে একটি আবেদন জানাচ্ছি। তাঁরা বকুল গাছটির সন্নিকটে একটি মর্মর পাথরের ফলকে কবির ঐ গানটি যদি উৎকীর্ণ করিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করেন, তবে আমাদের বিবেচনায় তাঁদের কাজটির সুষমা আরো বাড়বে।

কল্‌কাতার টাউন হলে শোকসভা ও স্মৃতিসভা

বাংলা দেশের ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ উপলক্ষ্যে শোকসভা ও স্মৃতিসভা হয়েছে। তার মধ্যে কল্‌কাতার টাউন হলের সভার মত এত বড় সভা বোধ করি আর কোথাও হয় নি। সভা আরম্ভ হবার অনেক আগেই দোতলার হল একেবারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল; নীচের তলাতেও জায়গা ছিল না। উপরে উঠবার সিঁড়ি, বড় রাস্তার উপরের সোপানশ্রেণী, হলের সম্মুখের ও পাশের সব রাস্তা লোকে লোকারণ্য। বৃষ্টি সত্ত্বেও এই রকম ভীড় হয়েছিল। সভাস্থলে প্রস্তাব উপস্থাপন করবার বা তার সম্পর্কে বক্তৃতা করবার কথা ছিল, এ রকম কোন কোন বিশিষ্ট লোকও সিঁড়ি বেয়ে ভীড় ঠেলে উপরে উঠতে পারেন নি—যেমন

বড়লাটের শাসনপরিষদের মনোনীত সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সর্ আজিজুল হক্ ইত্যাদি।

প্রথমটা সভাস্থলে বড় গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা হয়েছিল। এরূপ গোলমাল করা অত্যন্ত লজ্জাকর ও শোচনীয়। যা হোক্, তার পর বেশ ভাল ভাবে সভানেত্রী শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা এবং কয়েকটি প্রস্তাব সম্পর্কীয় বক্তৃতাগুলি হয়েছিল। বাঙালী অবাঙালী অনেকে বক্তৃতা ক'রেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩৩৬ কার্ত্তিক

বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সংকলিত]

[ডাঃ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালীদের মধ্যে তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ ইংরেজী লেখক। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রসিদ্ধ সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনি শিষ্য। কৃষ্ণদাস পাল যখন 'পেট্রিয়টে'র কর্ণধার শম্ভুচন্দ্র তখন সেই পত্রের নিয়মিত লেখক। সম্পাদকীয় কাজও তিনি কিছু কিছু করিতেন। পুস্তকাদি সমালোচনার ভার তাঁহার উপরই ছিল। এই রসজ্ঞ ইংরেজী লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার একজন প্রকৃত সমঝদার। এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন ইঁহার উজ্জ্বল এবং সরস ইংরেজী রচনার ভক্ত। ১৮৬১ সালে শম্ভুচন্দ্র প্রথম পর্য্যায় 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' বাহির করেন। পাঁচ সংখ্যা মাত্র বাহির হয়, তাহার পর বন্ধ হইয়া যায়। এই পাঁচমাসেই কিন্তু ইহা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৮৭২ সালে তিনি 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন' পুনর্জীবিত করিবার সঙ্কল্প করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই সময় 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার আয়োজনে ব্যস্ত। নিম্নলিখিত পত্রাবলী এই সময়ের লেখা।

দু'জনেই দু'জনের লেখার অনুরাগী, কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় বিশেষ কিছু নাই। শম্ভুচন্দ্র তাঁহার ম্যাগাজিনের জন্য বঙ্কিমের কাছে সাহিত্যিক সহযোগিতার প্রার্থী। বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, তাহার উপর নামজাদা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বিদেশী ভাষায় বেশী না লিখিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী লেখার খ্যাতি ছিল। শোনা যায় তাঁহার প্রথম উপন্যাস ইংরেজীতে রচিত হইয়াছিল। অতএব সেই বিখ্যাত বাংলা লেখকের কাছে 'ম্যাগাজিন সম্পাদক' যে ইংরেজী লেখা-চাহিয়া পাঠাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। বঙ্গ দর্শন প্রকাশ করিবার উদ্যোগে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতে রাজী হইলেন। 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে' তাঁহার দুটি লেখা বাহির হয়। প্রথমটির নাম, 'The Confessions of a Young Bengal', দ্বিতীয়টি এক দার্শনিক প্রবন্ধ, 'The Study of Hindu Philosophy'. প্রথমটি হাল্‌কা লেখা—সরস; দ্বিতীয়টি গুরু, তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। পত্রাবলী হইতে জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছাড়াও সাংখ্য সম্বন্ধে 'Calcutta Review' পত্রে এক প্রবন্ধ লেখেন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখক বাংলার সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজী-নবীশের কাছে পত্র লিখিতেছেন। উভয়েই এক রসের রসিক। পত্রের মধ্য দিয়া দুইটি সাহিত্যরসজ্ঞ হৃদয় পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত হইতেছে। দুইজনেই পরস্পরকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উন্মুখ। ইংরেজী হউক বাংলা হউক, লেখা চিনিতে দুইজনেই শ্যেনদৃষ্টি। বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রথম বৎসর। উৎসাহের আর অন্ত নাই। বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি সেই সময়ের উপর কিছু আলোক সম্পাদিত করিবে।

'Bengal Past and Present' (1914, Vol. VIII) এ Secretary's Notes এর মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের উদ্দেশে ইংরেজীতে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্রাবলী দেখিতে পাই। বন্ধুবর ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রগুলির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিম্নে অনুবাদ প্রদত্ত হইল।]

বহরমপুর
১৪ই মার্চ্চ (১৮৭২)

প্রিয় মহাশয়,

১১ই তারিখে লিখিত আপনার পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে বড়ই আনন্দানুভব করিতেছি। আমাকে একেবারে অপরিচিত ভাবিলে ভুল হইবে। আপনার সহিত পূর্ব্ব পরিচয়ের দাবি রাখি। একাধিক বার উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে।

আমার সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া যে-সব প্রীতিকর, মিষ্ট কথা বলিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাকে কেমন করিয়া ধন্যবাদ জানাইব, তাহা ত জানি না। তবে জানি যে এই অনুগ্রহেব দেনা বহুদিনের, তাই এত দেরীতে ধন্যবাদ পাঠাইয়া সেই ঋণভারের গুরুত্ব আর কমাইতে চাই না।

আমি আপনার সঙ্কল্পের সাফল্য কামনা করি। আমি নিজে একখানি বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়াছি। উদ্দেশ্য উহার দ্বারা শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে সহানুভূতি ও সংযোগ স্থাপনের অবকাশ ঘটিবে। আপনি যে কথা বলেন তাহা সত্য। ভালর জন্যই হোক মন্দর জন্যই হোক, ইংরেজী আমাদের স্বদেশী ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই হেতু উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানও দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা ত ঠিক নয়। আমি মনে করি অন্তত কতকটা ইংরেজীয়ানা পরিহার করিয়া সর্ব্ববোধ্য ভাষায় জনসাধারণকে সম্বোধন করা আমাদের দরকার। তাই একখানি বাংলা সাময়িক পত্র বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি! কিন্তু আমাদের যাহা করিবার আছে ইহা তাহার অর্দ্ধেক মাত্র। কেবল দেশীয় ভাষায় লিখিত কোন পত্রিকাই বর্ত্তমান বঙ্গীয় সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সমাচার দিতে পারে না। নিজের জাতি ও দেশের জনসাধারণকে সম্বোধন কবা যেমন প্রয়োজন, ভারতীয় অপর জাতিসমূহের এবং শাসক-সম্প্রদায়ের নিকটও আমাদের কথা বোধগম্য হওয়া তেমনই দরকার। বাঙালী ও পাঞ্জাবী যে-পর্য্যন্ত পরস্পরকে বুঝিতে ও প্রভাবিত করিতে না পারিবে, এবং উভয়ের মিলিত প্রভাব ইংরেজের উপর প্রয়োগ করিতে যতদিন না সমর্থ হইবে, ততদিন আর ভারতবর্ষের আশা নাই। ইহা তবু ইংরেজী ভাষার সাহায্যেই সম্ভব। তাই আপনার কল্পিত পত্রকে সাদরাভিনন্দন জানাইতেছি। ইঙ্গ-বঙ্গ সাহিত্যপত্র সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত বিস্তার করিয়া আপনার কাছে খুলিয়া বলা দরকার মনে করিতেছি, কেন জানেন? হয়ত অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখিবেন আমি ভিন্ন সুরে গাহিতে সুরু করিয়াছি। তার কারণ আর কিছু নয়, শুধু এই,—লোকপ্রিয় কোন মতের বিরুদ্ধে যুঝিতে হইলে, অত্যুজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে প্রশ্নের প্রতি দিকটি সুস্পষ্ট করিয়া দেখানো চাই।

আপনার সহিত সহযোগিতা করিবার ইচ্ছার অভাব যে আমার নাই, এর পর বোধ হয় সে কথা আর খুলিয়া বলিতে হইবে না। যদি সত্যই আমার সাহিত্যিক সাহায্য আপনার কোন কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তাহা আপনার প্রয়োজনেই নিয়োজিত হইবে। সাহিত্য সম্পর্কে নয়, স্থানীয় আপিসের কর্ম্মচারী কমাইয়া দেওয়াতে, আমার খাটুনী কিছু বেশী পড়িয়াছে বটে, তৎসত্ত্বেও আপনার ও আমার দুজনের কাগজের জন্যই সময় করিয়া লইব। যদি আমার নাম আপনার পত্রের লেখকশ্রেণীভুক্ত করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আশা করি কুশলে আছেন।

একান্ত আপনাব
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
মার্চ্চ ২৭, —৭২

প্রিয় মহাশয়,

আমার মাসিকপত্রখানির সম্পর্কে আপনি যে সহায়তা করিতে চাহিয়াছেন, তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। আপনার মত সহকর্ম্মী পাওয়া পরম লাভ। আর এ সম্বন্ধে যদি 'আপনার মত লোকের কোন আগ্রহ বা অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আমি যে সাফল্য-লাভ করিব তাহাতে সন্দেহ নাই।

আপনার ইংরেজী পত্রে গল্প উপন্যাস নক্সা ও বিদ্রূপাত্মক রচনা যোগাইবার ভার গ্রহণ করিতে রাজী আছি। ভাগ্যদেবীর কোপে আমাকে সব রকম জিনিষেরই ব্যাপারী সাজিতে হইয়াছে, তাই অতীন্দ্রিয় দর্শন হইতে পদ্য-রচনা পর্য্যন্ত অনেক কাজই করিতে পারি। অবশ্য সেগুলি খুব উঁচুদরের জিনিষ হইবে বলিয়া আশা করিতে পারেন না। তবে সাধ্যে যাহা কুলায় আপনার জন্য তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে নভেল-লেখা সব চেয়ে শক্ত কাজ, কারণ—মূলভাবটির অনুগত করিয়া চরিত্র ও ঘটনা-পরম্পরা সাজানো এবং পরিকল্পনার পুষ্টিসাধন করা একান্ত অভিনিবেশ ও অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ।

পত্রখানিকে ত্রৈমাসিক করিবার জন্য তারাপ্রসাদ যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহা আমি অনুমোদন করি না। আমি মাসিক প্রকাশ পছন্দ করি।

বর্ষা না আসা অবধি, অন্ততপক্ষে, যতদিন না কিছু ঠাণ্ডা পড়ে এবং রেলভ্রমণ সম্ভবপর হয় ততদিন পর্য্যন্ত, কলিকাতায় যাইব বলিয়া মনে করি না। যখন যাইব, তখন নিশ্চয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আশা করি কুশলে আছেন।

একান্ত আপনার
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
মে ১৩, ১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

পরস্পরকে 'বাবু' ডাকিবার প্রয়োজন দেখি না। অতএব, দোহাই তোমার, ভবিষ্যতে আমাকে সাদাসিধে 'বঙ্কিম' বলিয়া ডাকিও।

আমার মাসিকপত্র সম্বন্ধে তোমার সহৃদয় অভিমতের জন্য ধন্যবাদ, প্রকাশককে অনুরোধ করিয়াছিলাম, সম্পাদকদের মধ্যে শুধু তোমাকেই যেন উপহার সংখ্যা প্রেরণ করে; তাই 'পেট্রিয়টে' কোন সমালোচনা না দেখিয়া হতাশ হইলাম। দেখিতেছি প্রকাশক আমার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী কাজ করেন নাই।

আমার পুস্তক-সমালোচনা সম্পর্কে অন্যান্য বারের মত এবারও সেই নাদা-পেটা সমালোচকটি [সোমপ্রকাশ সম্পাদক?] বে-নামা সংবাদ-দাতার ছদ্মরূপে, স্বপ্রকাশ। যাহা হউক এবার লেখকটির পক্ষে আসল খবরের কাগজের সংবাদদাতা হওয়াই সম্ভব, কেন-না সমালোচনাটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ কোন নাবালকের লেখার ধরণেই রচিত। জানি—পেট্রিয়টের স্তম্ভে উত্তর দিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পার ইহা এমন কিছু নয়, তবুও তোমার কাছে কাগজখানা পাঠাইতে প্রকাশককে বলিয়াছি শুধু এই কারণে যে, সাময়িক সাহিত্যের পক্ষে কলঙ্ককর প্রেরিত সংবাদ পত্রস্থ করা কতখানি যে অনুচিত সে সম্বন্ধে তুমি সম্পাদককে বেশ একটু শিক্ষা দিতে পারিবে।

ইংরেজীয়ানার বিরুদ্ধে লেখা প্রবন্ধটি লইয়া তুমি সহজে আমাকে অপরাধী করিতে পারিবে না। তোমার অনুরূপ যুক্তি যাহারা প্রয়োগ করে, বুদ্ধিমানের মত তাহাদিগকে ব্যতিক্রম-স্থল করিয়াছি। সারা ভারত ও শাসক-সম্প্রদায়কে যাহারা কথা শোনায় এবং যাহারা নিজের জাতিটিকে মাত্র সম্বোধন করে, সযত্নে এই উভয় পক্ষের প্রভেদ করিয়াছি। আর তোমার মনে আছে বোধ হয় —আমি বলিয়াছিলাম, আমাকে অন্যত্র অন্য সুরে গাহিতে দেখিবে এই হেতু যে, প্ররোচিত করিতে যে চায়, তাহাকে তদ্বিষয়ে নিজের দিকটা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেই হইবে।

বঙ্গদর্শনের সজা-সজ্জা সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য কর্ম্মাধ্যক্ষকে জানাইয়াছি। তাহাকে এ বিষয়ে উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। আমাদের বেশভূষা বিষয়ক ক্ষীণ-প্রাণ প্রবন্ধটির জন্য বেচারা দীনবন্ধু দায়ী নয়। ও আর একটি খ্যাতিমানের লেখা তাহাকে তুষ্ট রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।

তোমার প্রথম সংখ্যা কবে বাহির করিতেছ? অনুষ্ঠান-পত্র আমি পাইয়াছি। আমার লেখকেরা আন্তরিক আগ্রহ সহকারে কাজে লাগিয়াছেন বুঝিতে পারিলেই আমি তোমার পত্রে একটি গল্প-লেখা সুরু করিব বলিয়া মনে করিয়াছি। আশা করি দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিতে পারিব। যে সব যুবকের উপর যথেষ্ট আশা রাখিতে পারা যায়, হাইকোর্টের উকিল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেই-সব উদীয়মানদের মধ্যে অন্যতম। তাহাকে লেখকশ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা করিও। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট গুরুচরণ দাস তোমার কাজে লাগিতে পারে, যদি তাহাকে লিখিতে বল। আর লিখিবার জায়গা নাই।

একান্ত তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
জুলাই ২২, ১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

অবশেষে তুমি বাহির হইয়াছ। প্রথমেই তোমার পত্রিকার সজ্জা-পারিপাট্যের প্রশংসা করি। সকল প্রবন্ধ এখনও পড়ি নাই, তবে সবগুলির উপর একবার চোখ বুলাইয়া গিয়াছি। যেটুকু পড়িয়াছি তাহাতেই নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি, পত্রিকাখানি সাফল্য লাভ করিবে। আমার পরলোকগত বন্ধু গিরিশের [হিন্দু-পেট্রিয়ট ও বেঙ্গালী-প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ] উদ্দেশে যে বাগ্মিতা সহকৃত স্নেহমধুর শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছ তজ্জন্য আমি বিশেষ আনন্দিত। বাসবিহারীর [রাসবিহারী বসু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যশোহর] বানান লজ্জাজনক, যথা, Jasohar-এর স্থানে Jasahar, Pratap-এর স্থানে Protap ইত্যাদি। কতকগুলি হাস্যকর ভুলও আছে, 'বেতাল পঁচিশী'র স্থলে 'বত্রিশ সিংহাসনে'র নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। "বৈদ্যনাথ" অতি সুলিখিত প্রবন্ধ [The Travels of a Hindu প্রণেতা ভোলানাথচন্দ্রের লেখা]। Infant Marriages (শিশু-বিবাহ) রেভারেন্ড কে-এম-ব্যানার্জ্জির কলমের যোগ্য নয়। 'লবে'র উপর প্রবন্ধটি [Mr. Lobb on the Calcutta University] বোধ হয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের [প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার] লেখা, নয় কি? যতটা পড়িয়াছি. রচনাটি সুনিপুণ বলিয়া মনে হইল। সংস্কৃত হইতে একটি মাত্র epigram—'Epigrams' বলিয়া

অভিহিত হইল কেন? উদ্ভটটি মোটেই উদ্ভট বলিয়া বোধ হইল না। তবে এটি এক জীবন্ত রাজার [মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর] রচনা। উপাধিটি বদান্যতার মত বহু দুষ্কৃতি ঢাকা দিতে পারে। অবশ্য রাজেন্দ্রর (রাজেন্দ্রলাল মিত্র) প্রবন্ধ অতুলনীয়। সে যদি আরো খানিক লিখিত! 'তামাকু'র সম্বন্ধে তোমার রঙ্গ-রচনাটিও চমৎকার। যেমন আরম্ভ করিয়াছ, সেইভাবেই চালাইও।

বোধ হয়, তুমি আমার 'বঙ্গদর্শন' পাইতেছ। যদি তাই হয়, তবে তোমার কাগজের বিনিময়ে আর এক কপি করিয়া তোমাকে পাঠাইবার সম্ভবত প্রয়োজন নাই।

তোমার পত্রিকায় আমার সামান্য সামর্থ্যানুযায়ী লেখা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা ভুলি নাই।

আশা করি শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
সেপ্টেম্বর ৪,১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

উত্তর দিবার দীর্ঘ বিলম্ব ক্ষমা করিও। প্রথমে এটা ওটা করিয়া লেখা ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। তারপর আসিল দীর্ঘস্থায়ী দারুণ পীড়া। সম্প্রতি মাত্র সারিয়া উঠিয়াছি।

অসুখ না হইলে এতদিনে তোমার পত্রিকায় আমার ক্ষুদ্র শক্তি-অনুযায়ী লেখা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতাম। বর্ত্তমানে কোনরূপ মাথার কাজ নিষিদ্ধ, এমন কি আমার নিজের পত্র সাময়িকভাবে এক বন্ধুর হাতে দিয়াছি।

ভাল কথা, তোমার দ্বিতীয় সংখ্যা কি বাহির হইয়াছে? বোধ হয়—নয়। যদি তাই হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি তোমার সময়নিষ্ঠার একান্ত অভাব। অবশ্য, যথাসময়ে কাগজ বাহির করিবে কখনো এমন অঙ্গীকার তুমি কর নাই। তবু পিছাইয়া আছ।

সহায়োৎসুক নাগরিকতা বিষয়ে তোমার প্রশংসা পাইবার যোগ্য সত্যই আমি নই, অন্তত, বহুদিন সে যোগ্যতা হারাইয়াছি। দেখিতেছি অপরাধ ক্ষমা কর নাই। তবুও আশা করি—করিবে। *Observer* তোমার প্রতি বিরূপ। যে হেতু *Observer*-এর বিরুদ্ধে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা তোমার আছে, সে হেতু আমার বিবেচনায় ও বিষয়ে বেশী কিছু লিখিয়া শক্তিক্ষয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমি *Bengal Times* কখনো পড়ি না। সে কি বলিয়াছে?

আশা করি সকলই কুশল।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
সেপ্টেম্বর ২৭,১৮৭২

প্রিয় শম্ভু,

তোমার পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। এই সংখ্যাখানি সত্যই চমৎকার। প্রায় সব প্রবন্ধই আমার ভাল লাগিয়াছে, বিশেষতঃ নদীয়া-শীর্যক [পণ্ডিত মাধবচন্দ্র শৰ্ম্মা লিখিত] প্রবন্ধটি। Oviparous Genesis স্পষ্টই রাজেন্দ্রের লেখা, এটিও প্রথমশ্রেণীর রচনা। আমি পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যথাপরিমাণ কাজ করিতে এখনো অক্ষম। ছুটির সময় শহরে থাকিবে কি?

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
২৮ এ ডিসেম্বর [১৮৭২]

প্রিয় শম্ভু,

সত্যই তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া তুলিলে। আমার কাছে তুমি ঋণী না কি? এ বড় শুভ আবিষ্কার। ভাবিয়াছিলাম, চিঠি-পত্র লেখার বিষয়ে আমিই বুঝি পিছাইয়া পড়িয়াছি। যখন স্বীকার করিয়া লইতেছ, এ তোমারই অন্যায়, তখন মনে করি, তোমায় একটি উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা দিবার অধিকার আমার আছে। এই মানসিক কসরৎটি ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম।

'চুয়া'র আশু আমার মানহানি করিতেছে। প্রথমত, আমার স্বাস্থ্য ভাল নাই, যদিও চুয়ায় প্রস্তুত সন্দেশ ও অন্যবিধ অখাদ্যগুলির প্রতি সর্ব্বদাই সুবিচার করিয়া আসিযাছি। দ্বিতীয়ত রাজকোষ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় প্রকৃত রাজভক্তের মত রাষ্ট্র-সেবা করিতেছি, যাহাতে সরকার বাহাদুর করদাতা জনসাধারণের উন্নতি বিধান-কল্পে জাগুর ব্যারাক পুনর্গঠন ও অন্যান্য নানাবিধ জমকাল ধরণের কৌতুকামোদে সময় কাটাইবার অবসর পান। হতভাগা দেশীয় লোকের টাকার দরকার কি? সরকারী তহবিলে তাহারা সর্ব্বস্ব প্রদান করুক। তাহা হইলেই বাসের অযোগ্য ব্যারাক প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং জাঞ্জিবারে দাসত্ব প্রথা নিবারণ করিয়া সরকার তাহাদের অসীম উপকার সাধন করিবেন। দেখিতেছ ত আমার কাজ খাঁটি লোকহিতৈষণা। এই যে বিলাস-সামগ্রী এ ত প্রজাদের নিজেদের হিতার্থেই। বাহিরের লোক তোমরা ইহার যথোচিত গুণগ্রহণ কবিতে পারিতেছ না।

'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিন্' এমনই জাঁকজমকে চলিতেছে যে, আমি ভাবিলাম বুঝি আমার সামান্য সাহায্যের আর দরকার নাই। কিন্তু তোমার যখন ইচ্ছা যে, তোমার ঐ নন্দনে মন্দার এবং পারিজাতের পার্শ্বে (কবিত্ব ক্ষমা কর) কর্ক্কশ এবং নির্গন্ধ ধুতুরাও ফুটিবে, তখন তোমার সে ইচ্ছা কেন-না চরিতার্থ হইবে। কি লিখি বল দেখি? গল্প? দেখিতেছি ও-বস্তু তোমার প্রচুর আছে। "ভুবনেশ্বরী"র মত ধারাবাহিক একটি গল্প [রাসবিহারী বসু লিখিত] একখানি সাময়িক পত্রের পক্ষে যথেষ্ট। সমালোচনা লিখিব না কি? রাজনীতিতে হাত দিব না। দিলে 'মুখার্জ্জি'র বিবুদ্ধে এংলো-স্যাক্সনীয় ক্রোধ যে উদ্দীপিত করিয়া তুলিব, তাহা নিশ্চয়। তাই বঙ্গাদর্শনে রাজনীতির আলোচনা এত অল্প। এ-ও নয় ও ও-নয় এমন হালকা নক্সার মত জিনিষ পাঠাইব

কি? অর্থহীন রচনা কিছু চাও কি? ঐ ধরণের বহুমূল্য মাল যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারি।

চিঠিতে যেরূপ দীর্ঘ ক্ষমাপ্রার্থনা জুড়িয়া দিয়াছ, দেখিলে মনে হয় পূর্ব্বে বুঝি বা নরহত্যা চৌর্য্য ও সতীত্বাপহরণের মিথ্যা অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করিয়া আসিতেছিলে। তুমি বিজ্ঞজনোচিত কথাই বলিয়াছিলে, আর সেগুলি ভাল কথা। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

তোমার পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যা কবে বাহির করিতেছ? জানুয়ারীর শেষে বোধ হয়। এই চিঠি তোমাকে যথারীতি খোস্‌মেজাজী দেখিবে আশা করি।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
৫ই জানুয়ারী ১৮৭৩

প্রিয় শম্ভু,

তোমার ও তোমাব পত্রিকার 'শুভ নববর্ষ' কামনা করি। আমি তোমার জন্য কিছু লিখিতে ব্যস্ত আছি। বাস্তবিকই লেখা প্রস্তুত। পূর্ব্বেই তোমার কাছে ইহা যাইত। দু'একখানি বই মিলাইয়া দেখা দরকার, তাই অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছি।

জানুয়ারির মধ্যভাগে যদি পরের সংখ্যা বাহির কর, তবে তৎপরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।

Confessionটুকু [বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত The Confession of a Young Bengal], ইহা যেন কোথাও বসাইয়া দিও না। ক্যাম্পবেল (ছোটলাট) আর বার্ণার্ড (সেক্রেটারী) আমার সম্বন্ধে এতটাই জানে যে, উহা হইতে এই অনুতাপীটিকে টপ করিয়া চিনিয়া লইতে কষ্ট হইবে না। চিনিলে আমাকে যে ফাঁসী দিবে তা নয়, তবে তাহা বেশ উপাদেয় হইবে না।

'ভুবনেশ্বরী' যতদিন না পথ ছাড়িয়া দেয়, 'মুখার্জ্জি'র জন্য অভিপ্রেত আমার গল্পটি ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুক; 'ভুবনেশ্বরী'র সেই পরিসমাপ্তি আমি অবশ্য কামনা করি না। আশা করি শান্তিতে আছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
১৯ জানুয়ারী [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

বহরমপুরে তিনটি ভাল লাইব্রেরী আছে। যে বইগুলি চাহিতে ছিলাম, সেগুলি পাইয়াছি। কিন্তু সময়াভাবে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পাবি নাই। ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শন' লিখিতে ব্যস্ত আছি। সেই হেতু 'মুখার্জ্জি'র জন্য অভিপ্রেত প্রবন্ধটি শেষ করিতে পারি নাই। যাহা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না, শেষ করিতে গেলে উহা তোমার পত্রিকার পক্ষে বেজায় বড় হইয়া উঠিত। তাই প্রবন্ধটি যেমনকার তেমনি পাঠাইতেছি। কিছু অসম্পূর্ণ হইলেও রচনাটি পাঠযোগ্য-আকারের। আশা করি গ্রহণ করিবে। যদি গ্রহণ কর, আর এক

কিস্তী পাঠাইয়া আমার পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিব।

অবশ্য অসংস্কৃত খসড়াটিই তোমাকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। মুদ্রাকরের পক্ষে এক কঠিন কাজ বটে, কেন না পৃথিবীর মধ্যে আমার হাতে লেখা সব চেয়ে খারাপ। প্রবন্ধটি মনোনীত হইলে একটি প্রুফ পাঠাইতে অনুরোধ করি।

তা ছাড়া প্রবন্ধটি সযত্নে সংশোধন করিতেও পারি নাই। অতএব যদি সময় পাও ত রচনার ব্যাকরণটুকু ভাল করিয়া দেখিও। ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমি যে খুব সতর্ক তা বলিতে পারি না। কোন-কোন ক্ষুদে সমালোচক (শ্বেতকায় অবশ্য) তোমার পত্রিকার ব্যাকরণের খুঁত ধরিতেছে।

তোমার পুস্তিকাখানি পাইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমার কাছে যে পাঠাইয়াছ তজ্জন্য ধন্যবাদ। অবশ্য "The Prince in India" [The Duke of Edinburgh's Visit to India] আমার কাছে নূতন নয়, যদিও সবটা পড়িবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে পাই নাই। এখন পড়িতেছি। পরের-সংখ্যা কবে বাহির করিতেছ? আশা করি শান্তিতে আছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহমরপুর
ফেব্রুয়ারী ৬, [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

আমি যে তোমায় নিরাশ করিয়াছি, তজ্জন্য দুঃখিত। লঘু সাহিত্য বলিয়া যাহা চলে, তাহার চেয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখা এতই সোজা যে, কঠিন পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত আমার মত গরিব বেচারার পক্ষে প্রলোভন প্রবল হইয়া উঠিল। যে প্রবন্ধটি পাঠাইয়াছি, পছন্দ না হইলে সেটি জঞ্জালের ঝোড়ায় সমর্পণ করিও। যত শীঘ্র পারি তোমার মনের মত আরো কিছু পাঠাইব। তবে সেই যত-শীঘ্রের সম্ভাবনা খুব শীঘ্র না হইতে পারে।

লর্ড নর্থব্রুকের সারল্য ও বিশাল সহানুভূতি যাহার আছে এমনধারা প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ানই, 'মুখার্জ্জি' সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সেই কথারই পুনরুক্তি করিবে। একশ্রেণীর সমালোচক আছে, বাঙ্গালীকৃত কোন কিছু ভাল যাহারা সহিতে পারে না। আমি যাহাদের কথা বলিয়াছি, তাহারা এই শ্রেণীর। আর ব্যাকরণের যাহা বিতর্ক-স্থল, ইহাদের সমালোচনা তাহার গণ্ডী পার হইয়া যায় না। এ তুমি ইংরেজী সাপ্তাহিকগুলিতে দেখিতেছ। তুমি এ-সব সমালোচকদের অনায়াসে তুচ্ছ করিতে পার। আমি কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতা জানি বলিয়াই সাবধান হই।

এখনকার মত এত কাজ বুঝি আমার হাতে কখনও ছিল না। আশা করি এই বিনীত সহযোগীর অপেক্ষা জীবনটা উপভোগ করিবার স্বাধীনতার অবসর তোমার আছে।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর
১৬ই মার্চ্চ [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

আমি প্রুফের শেষ অৰ্দ্ধেকটা মাত্র পাইয়াছি। তা-ও পাইয়াছি কাল সন্ধ্যাবেলা। অপরার্দ্ধ এখনও পাই নাই। ডাকঘর আমার বেলা বড় নিয়ম-মাফিক কাজ করে, অতএব ডাকঘরকে গালি পাড়িও না। প্রুফের সমস্তটা যখনই পাইব, তখনই তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। আমার সুকুমার হস্তাক্ষর লইয়া মুদ্রাকর দেখিতেছি অদ্ভুত কৰ্ম্মনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছে। আমাকে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে বলা —বাতাসের কাছে বক্তৃতা দেওয়ার সমান, বৃথা শক্তির অপব্যয়।

আর যাহা লিখিবার আছে, এর পর লিখিব। এখন আমি কিছু অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।

একান্ত তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গদর্শন, সম্পাদকের আপিস,
বহরমপুর [১৮৭৩]

বন্ধু মির্জ্জা শম্ভুচন্দ্র,

আমার পীড়ার গল্প সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। যে-ভদ্রলোকেরা খবরের কাগজে এ কথা প্রকাশ করেন, তাঁহারাই কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে আমার মৃত্যুসংবাদ পাঠান। আত্মীয়দের নিকট প্রেরিত মৃত্যুসংবাদে বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশে পূৰ্ব্বেই 'হালিসহর পত্রিকা'য় আমার পীড়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্পর্কিত মতামতের জন্য কোনো লোককে দণ্ডিত করিবার ইহা সহজ উপায়, এই কথাটা বোধ হয় ভাবিয়া লওয়া হইয়াছিল।

তুমি নিজে তোমার অসুখের যে খবর দিয়াছ, তাহা যদি এই পরিমাণে সত্য হইত! তোমার ত ঐরূপ সত্যনিষ্ঠা নাই, এতএব এ বিষয় আর আলোচনা করিব না।

Shawkari Jawlpawn (সখের জলপান)—আমি কি বানান ঠিক লিখিয়াছি —চমৎকার লোক ['What he sbould not be' Shaukare Jaulpwan, 'মুখার্জ্জি' জুন, ৭৩] শুধু বানান নয় আমি ওর বিপুল কাণ্ডজ্ঞান আর অপূৰ্ব্ব ইংরেজীর যদি অনুকরণ করিতে পারিতাম। তোমার এবং কালা পণ্ডিতটির (রাজেন্দ্রলালের) সঙ্গে একই প্যারায় বেচারা বঙ্কিমের জায়গা যে দিয়াছ, তজ্জন্য আমি এ দুষ্টটির কাছে কৃতজ্ঞ। এই বানান-বীরের ছায়া কখনও খৰ্ব্ব না হোক।

এতক্ষণ বলা উচিত ছিল, তোমার পত্রিকার বিগত যুগ্মসংখ্যাখানি [৯ম ও ১০ম সংখ্যা, জুন ৭৩] অন্য সকল গুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যতদূর জানি যে-কোন সম্পাদক ভারতবর্ষের যে-কোন পত্রিকার যত সংখ্যা বাহির করিয়াছে, ইহা তার মধ্যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ; সব লেখাগুলিই ভাল। 'The Bride of Shambhudas' [কবিতা, রামশৰ্ম্মা অর্থাৎ নবগোপাল ঘোষ] চমৎকার। Commerce উপর প্রবন্ধটি, আমি সাগ্রহে পাঠ করিলাম। ভোলানাথ চন্দ্র লেখক না কি? 'অবতার'-এর [A modern Avatar ছোট লাট সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের বিদ্রূপাত্মক চিত্র।] পরিকল্পনাটিও সুকল্পিত। তবে সহজেই বোঝা যায়, তোমার খোদাইকার প্রথম শ্রেণীর নয়।

মিঃ দে [Bengal Magazine এ

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। কৃত সমালোচনাটি ক্ষীণ প্রশংসা-ঢাকা ভদ্র অবজ্ঞার ভঙ্গীতে লেখা। সমালোচক যে সম্পাদক নিজেই, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Calcutta Review-এ লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, এখন নির্ল্লজ্জভাবে তাহারই বিপরীত কথা বলিতেছেন। রমেশ দত্ত আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি 'পেট্রিয়টে' এই বইখানি সমালোচনা করিতে চান। মহাত্মা সম্পাদক স্বয়ং 'মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে' আমার মস্তক চর্ব্বণ করিতে রাজী আছেন কি?

সোমপ্রকাশের এক অপরূপ সমালোচক—যতটা মনে হয় নাদা-পেটা নিজেই—বলিতেছে, বইখানি অপাঠ্য এবং লেখক আকাট-মূর্খ। এ ত উচ্চ প্রশংসা। ও দিকের সুখ্যাতি বইখানাকে জাহান্নমে পাঠাইত।

'হিন্দুদর্শনে'র অঙ্গীকৃত দ্বিতীয় অধ্যায়, আমার নিজেরই দানবী-সৃষ্টি, ও দেখিতেছি আমাকে না মারিয়া ছাড়িবে না। লেখাটিকে তোমার কাগজের যোগ্য করিবার জন্য পড়িতে হইবে বিপুল পরিমাণের এমন-সব জিনিষ, যার মধ্যে দন্তস্ফুট করা দুরূহ। আমার মত সংস্কৃতানভিজ্ঞ শ্রমপিষ্ট লোকের পক্ষে সত্যই তাহা ভয়ানক। তা ছাড়া Calcutta Reviewএ লিখিত একটি নিবন্ধে এবং বঙ্গদর্শনে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধে সাংখ্য-সম্বন্ধে যা কিছু বলিবার ছিল তা বলিয়া শেষ করিয়াছি। আর দর্শনগুলির মধ্যে একমাত্র সাংখ্যদর্শনই কিছু পডিবার মত পডিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দু-চিন্তাধারার উপর শঙ্করাচার্য্যের প্রভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তোমাকে দিবার ইচ্ছা আছে। চাও ত দিতে পারি। কিন্তু ইহার জন্যও সময় দিতে হইবে। তবে যদি একটা নক্সা—কি ছোট বিদ্রূপাত্মক রচনা তোমার অগ্রহণীয় না হয়, তাহা হইলে ইতিমধ্যে ঐ রকম দু'একটা লেখা ছুটির পর তোমায় পাঠাইতে পারি। ছুটির মধ্যে বোধ করি আমার মিষ্ট মুখখানি দেখাইয়া তোমার তৃষিত চক্ষুর তৃপ্তিবিধান করা সম্ভবপর হইবে না। আমাকে আর এক প্রেমিকের সেবা করিতে হইবে, তিনি হইতেছেন মহামহিমান্বিত রোড-সেস্। ওকে আমি এতই ভালবাসি যে, একপক্ষকালও ছাড়িয়া থাকিতে পারি না, বিশেষত ওর এই দীর্ঘস্থায়ী বার্দ্ধক্যে। কিন্তু এ দেখিতেছি গল্পকে ক্রমাগত টানিয়া বাড়ানো হইতেছে। অতএব শেষ করিব।

আন্তরিকভাবে তোমারই
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—

বহরমপুর
২৭এ নবেম্বর [১৮৭৩]

প্রিয় শম্ভু,

'এমেচার হোমিওপ্যাথ'কে ধন্যবাদ দিবার জন্যই দু'এক লাইন লিখিতেছি [মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে'র ১৮৭৩, অক্টোবর সংখ্যা Amateur Homeopath ছদ্মনামে শম্ভুচন্দ্র স্বয়ং বিষবৃক্ষ সমালোচনাচ্ছলে বঙ্কিমচন্দ্রের আক্রমণকারীদের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন]। 'সখের হোমিওপ্যাথ' সম্পাদক ছাড়া আর কেউ নয়, তা জানি। ভাল কথা, আমাদের সেই প্রকাণ্ড প্রতিভা—'সখের জলপানে'র আর দেখা পাই না কেন? এবার তোমার প্রচ্ছদপটের প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমি সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেলের ভক্ত

নই। কিন্তু আমাব মনে হয় 'জর্জ্জি বাবা', কিম্বা 'জর্জ্জ পীর' সম্বোধনে নামা তোমার উচিত হয় নাই। 'জর্জ্জ নাতু'তে আমার আপত্তি নাই। বয়স এবং খ্যাতি দুয়েতেই আমি তোমার ছোট। রুচি সম্বন্ধে তোমায় কিছু শিখাইতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। তবে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি 'Georgy Baba' প্রভৃতির মত ব্যঙ্গচিত্র বন্ধু 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র পক্ষে শোভন হইলেও আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকাব উপযোগী নয়। তবে প্রচারকার্য্যে এখন ক্ষান্তি দেওয়া যাক। 'কেরাণী' [রায়বাহাদুর শশীচন্দ্র দত্ত লিখিত] আমাব বড় প্রিয় হইয়া উঠিতেছে। তাঁর রেখাচিত্র ও নক্সাগুলি চমৎকার।

আশা করি এই উপভোগ্য ঋতুতে পূর্ণ উপভোগের আনন্দে ভাসিতেছ।

আন্তরিকভাবে তোমারই

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩৪৫ শ্রাবণ

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের এক শত বৎসর পরে বাংলা দেশের রাজধানীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যথাযোগ্য ভাবে শতবার্ষিকী উৎসব সমাপন করিয়াছেন। এই প্রধান উৎসব ব্যতীত কলিকাতায় আরও উৎসব হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গের বহু নগরে ও গ্রামে এবং বঙ্গের বাহিরেও নানা স্থানে উৎসব হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য, বাংলার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের জন্য, বাংলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষের জন্য, বাঙালীদের মধ্যে প্রকৃত স্বাজাতিকতা জাগাইবার জন্য, এবং বিশ্বমানবের মনের সহিত বাঙালীর মনের সেতুর রচনার জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে অমর করিয়াছে। বাঙালী তাঁহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিবে না।

উৎসব যে কেবল গান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধপাঠেই সমাপ্ত হইল না, তাহা সন্তোষের বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শতবার্ষিকী সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাহির করিতেছেন। পরিষৎ তাঁহার কাঁঠালপাড়ার বাড়ীর অধিকারী হইয়া তাহা মেরামত করাইয়া রক্ষা করিবেন এবং তাহাতে তাঁহার গ্রন্থাবলী ও তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত নানা দ্রব্য রাখিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে পরীক্ষা লইয়া তাহাতে উত্তীর্ণ সকলের নাম প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিবেন এবং বিশেষ পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার দিবেন।

আর দুটি কাজ করা আবশ্যক বলিয়া এখন আপাততঃ মনে হইতেছে।

কলিকাতায় ও অন্যত্র এই উৎসব উপলক্ষ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির মূল পাণ্ডুলিপি, বা স্বতন্ত্র মুদ্রিত প্রতিলিপি, বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুদ্রিত টুকরা, সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যে স্থায়ী আকারে

রক্ষণযোগ্যগুলি বাছিয়া যদি পরিষৎ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহা শুধু যে এই উৎসবের উপযুক্ত স্মারক হইয়া থাকিবে, তাহা নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর রসগ্রাহীদিগের ও পাঠকদের কাজে লাগিবে।

দ্বিতীয় কাজটি, বঙ্কিমচন্দ্রের যে-যে গ্রন্থ ভারতীয় ও বৈদেশিক যে-যে ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া অনুবাদগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে এবং কাঁঠালপাড়ায় তাঁহার ভবনে রক্ষা করা। নানা ভাষার তর্জ্জমাগুলির পুরা তালিকা বোধ হয় এখনও কেহ প্রস্তুত করেন নাই। সেদিন ইংরেজী তর্জমাগুলির একটি তালিকা চোখে পড়িল। আমরা এ-বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করি নাই। তথাপি আমাদের নিকটই তালিকাটি অসম্পূর্ণ মনে হইল। তাহাতে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কৃত "The Abbey of Bliss" নামক 'আনন্দমঠে'র অনুবাদের মডার্ণ রিভিয়ুতে (পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত), ডাঃ জে ডি এণ্ডার্সনের ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় প্রভৃতির অনুবাদ, ঐ মাসিকে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অনুবাদ, এবং ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্লি ওরিয়েণ্টে 'চন্দ্রশেখরে'র অনুবাদের উল্লেখ নাই।

রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ পৃথিবীর অনেক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এক একখানি অনুবাদ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রাখা হইয়াছে। এই সংগ্রহ হাল-নাগাদ সম্পূর্ণ কিনা জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের নানা গ্রন্থের নানা ভাষায় অনুবাদের এইরূপ একটি সংগ্রহ পরিষদ্-মন্দিরে এবং কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমভবনে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র

রাজনৈতিক কারণে ইংরেজদের প্রতি আমাদের বিরাগ আছে। কিন্তু এই বিরাগের অধীন হইয়া প্রতীচ্যের সহিত সংস্পর্শে আমাদের যে হিত হইয়াছে ও হইতে পারে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া অনুচিত। হিত যে হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে লিখিত তাঁহার বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে উহা সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। উহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্যে শক্তিহীন, নীচ ও সম্পূর্ণ মূল্যহীন অনেক কিছু যাহা আছে তাহা সত্ত্বেও ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা ইহার ভবিষৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে আশা পোষণ করিতে উৎসাহিত করে তাহার পরিমাণ অল্প নহে।" "ইহা অধিকাংশ স্থলে অনুকারী" ("Its character is for the most part imitative"). "কিন্তু কবে কোন্ সাহিত্য তাহার যৌবনেই স্বাধীন ও মৌলিক ছিল" ("but what literature has ever been independent and original in its youth?")? তিনি এই সব কথা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন নাই, প্রবন্ধটি লিখিবার সময় পর্য্যন্ত আধুনিক যে বাংলা সাহিত্য রচিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন। ইউরোপীয় অনেক অপেক্ষাকৃত

আধুনিক সাহিত্য যে প্রাচীন গ্রীক ও লাটিনের কাছে ঋণী বা তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত, এবং প্রতীচ্য ভাব ও চিন্তা যে বঙ্গসাহিত্যে স্বাঙ্গীকৃত হইতেছে ও হইবে, তাহা বলিয়া তিনি প্রবন্ধ শেষ করেন।*

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ও সংমিশ্রণ সংঘটন সম্বন্ধে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "পূর্ব্ব ও পশ্চিম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিছু লিখিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ তাঁহার "সমাজ" নামক পুস্তকে আছে। তিনি তাহাতে বলিয়াছেন :

"অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন।...

দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূর্বপশ্চিমে সেতু-বন্ধন কার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই স্বজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব, রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল।...

"অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল।...

"একদিন—বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমেব মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন —সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায় যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ, এ সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই

* "It may seem improbable that European ideas will ever really be assimilated by the people of India–that all we can effect here is a superticial varnish of sham intelligence. But everything cannot come in a day, and there was a time when it would have seemed almost equally improbable that the little remnant of intelligence preserved in the Latin Church, and the study of classical antiqnity, would have grown into what we now see among the Celtic and Teutonic peoples of the West. The Bengalis may not seem to have the fibre for doing much in the way of real thought any more than of vigourous action; but it was chiefly among the supple and pliant Italians that the revival of learning in Europe began; and it is possible to imagine that the Bengalis–the Italians of Asis, as the *Spectator* has called them—are now doing a great work, by, so to speak, acclimatizing European ideas and fitting them for reception hereafter by the hardier and more original races of Northern India."

করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্বপশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত সদ্যঃপ্রকাশিত "বাংলা কাব্যপরিচয়" গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

"যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন, তাঁরা নিঃসন্দেহ একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন, যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই।...

"বঙ্কিম এক দিন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলা ভাষাভারতীকে। বলা বাহুল্য, তার ভাব তার ভঙ্গী তার ছাঁচ ইংরেজী সাহিত্যের অনুবর্তী। পণ্ডিতেরা তার ভাষা-রীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজদরদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই ব'লে যে, সামাজিক রীতি পদ্ধতি থেকে এই সব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে তাকে অশুচি ক'রে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল প্রবীণ নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন এই সব বই তাঁদের পড়ে শোনাতে। বটতলার ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশই পথান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদেশী আমদানী ভালো লাগা উচিত নয় ব'লে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মন্তব্য "রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র" নামক নূতন প্রকাশিত পুস্তকে দেখিলাম। গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ছিন্নপত্রে'র একখানি চিঠিতে আছে, "বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে বলেছেন সেখানে কৃতকার্য্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোক হ'তে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতির এবং দেশকালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড-কর্ম্মশীল- পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো ক'রে বলে নি।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান

বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনেক লেখক ও বক্তা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে, বন্দেমাতরম্ গান, আনন্দমঠ, ও রাজসিংহ মুসলমান-বিদ্বেষ বা ইস্‌লাম-বিদ্বেষের পরিচায়ক নহে। আমরা আট নয় মাস পূর্ব্বে গত বৎসর "বন্দে মাতরম" সম্বন্ধীয় আন্দোলনে সময় মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে এবং মহাত্মা গান্ধীকে লিখিত চিঠিতে ইহা দেখাইয়াছিলাম। পুনরুক্তির কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না।

বাংলার কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। যিনি হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সেই কৃষকদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা লিখিয়া গিয়াছেন

তাঁহাকে কেমন করিয়া মুসলমান-বিদ্বেষী মনে করা যাইতে পারে।

তিনি হিন্দুবৎসল ছিলেন, সত্য। কিন্তু যেমন কেহ নিজ পরিবারবর্গকে ভালবাসিলে তাহারা দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, অন্য সকলকে তিনি বিদ্বেষ করেন, তেমনই নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি টান অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' শিক্ষিত বাঙালীর মনকে যে এত বেশী আলোড়িত করিতে পারিয়াছিল, তাঁহার প্রতিভা তাহার কারণ বটে; এবং তখন এরূপ মাসিকপত্রের নূতনত্বও একটি কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। তাহার মধ্যে একটি এই, যে, কাগজ চালান তাঁহার ব্যবসা ছিল না—তিনি পেশাদার সম্পাদক বা সাংবাদিক ছিলেন না। তাঁহাকে কোন ধনী স্বত্বাধিকারী বা কোম্পানীর মুখের দিকে তাকাইয়া বা তাঁহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া কাগজ চালাইতে হয় নাই; কাগজের কাট্‌তির হ্রাসবৃদ্ধির দিকে, বিজ্ঞাপনের হ্রাসবৃদ্ধির দিকে বিশেষ রকম দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে লিখিতে হয় নাই। তাঁহার যাহা ভাল মনে হইয়াছে, তিনি অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে তাহা লিখিতে পারিয়াছিলেন, এবং অন্যের লেখাও এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন।

কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিম শতবার্ষিকী

বাঙ্গালোরের কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ তথাকার বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকীর একটি ইংরেজী বিবরণ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। বাংলায় তাহার চুম্বক দিতেছি। মহীশূরের যুবরাজ এই পরিষদের সভাপতি।

গত ৩০শে জুন শ্রীকৃষ্ণরাজেন্দ্র কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ ভবনে সভার অধিবেশন হয়। উহার উপসভাপতি অধ্যাপক বি এন শ্রী কণ্ঠিয়া, এম্-এ, বি-এল, সভাপতিত্ব করেন। "বন্দে মাতরম" গীত হইয়া সভাবঙ্গ হয়। সুবিদিত কন্নাড লেখক ডি ঈ ভরদ্বাজ বিদ্যাভূষণ বঙ্কিমের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মস্তি ভেঙ্কটেশ আইয়েঙ্গার, এম-এ, মহীশূরের আবগারী কমিশনার, কন্নাড ভাষার বিখ্যাত কবি ও ছোট গল্পলেখক, কন্নাড ভাষায় "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" শীর্ষক গ্রন্থের লেখক, অতঃপর 'ভারতীয় সাহিত্যে বঙ্কিমের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :—

"বঙ্কিম অবশ্য বাঙালীদের জন্য বাংলাতেই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু যে স্বাজাতিকতার প্রাণ তাঁহা:

রচনাবলীতে মূর্ত্ত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে সুদূরে আগুন জ্বালিয়াছে, এবং তিনি আজ আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের পিতা বলিয়া মানিত। ক্ষুদ্র বন্দে মাতরম্ গানটি এখন মাতৃভূমির পূজার প্রতীক হইয়াছে।"

ইহার পর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী-কন্নাড অভিধান কার্য্যালয়ের সাহিত্যিক সহকারী শ্রীযুক্ত এল্ গুণ্ডাপ্পা, এম্-এ বঙ্কিমের লিখনভঙ্গী, তাঁহার জীবন্ত ও স্বাভাবিক চরিত্রচিত্রণ এবং মহৎ ভাব ও চিন্তার নমুনাস্বরূপ তাঁহার উপন্যাসমূহের কন্নাড অনুবাদ হইতে কতকগুলি বাক্য পাঠ করেন। বাঙ্গালোরের সেণ্ট্রাল কলেজের কন্নাডের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ এন্ কৃষ্ণশাস্ত্রী, এম্-এ, 'বঙ্কিমের আধুনিকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্যের, বিশেষতঃ গদ্যসাহিত্যের, অগ্রদূত বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ করেন।

"তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, একটি দুর্লভউৎকর্ষশালী গ্রন্থ, যে-মন 'পৌরাণিক' একটি মহামানবের ঐতিহাসিকতা ও মহত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার আধুনিকতা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করে।"

পরলোকগত বি বেঙ্কটাচার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কন্নাড ভাষায় মনোজ্ঞ অনুবাদ করিয়া লোকপ্রিয় করেন। এই সভায় তাঁহারও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়। শ্রী এস্ শল্লামান্ তাঁহার জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। সভাপতি মহাশয় উপসংহারে বলেন,

বঙ্কিম বঙ্গের যাহা, বেঙ্কাটাচার কর্ণাটকের তাহা। বঙ্গদেশ সর্ব্বপ্রথমে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভারতীয় নবজাগরণে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্য সব প্রদেশের নেতৃত্ব করিয়াছে। তিনি বহু গুণশালী সন্তানের মাতা, ধর্ম্ম সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞানে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির জননী। তাঁহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে কর্ণাটকের প্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র। বেঙ্কাটাচার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কন্নাড সাহিত্য পাঠে রুচির জনয়িতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র ও বেঙ্কাটাচার উভয়েই মাতৃভাষার সাহায্যে জনগণের উন্নতিবিধানের সমর্থক ছিলেন (কথায় ও কাজে)।

সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বাংলা দেশ ভারতে সকলের আগে জাগিয়া অগ্রণী হইয়াছিল, আমাদের পক্ষে মিষ্ট এরূপ কথা শুনিয়া আমরা যদি অহঙ্কৃত হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে নিদ্রিত হইতে ও সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেও বিলম্ব হইবে না।

বঙ্গের সৌভাগ্য, অহঙ্কার-সম্ভাবনা, ও অনিষ্ট-সম্ভাবনা

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় শতবার্ষিকী হইয়াছিল। তাহার পর পরমহংস রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী হয়। বর্ত্তমান বৎসরে হেমচন্দ্র শতবার্ষিকী ও বঙ্কিম শতবার্ষিকী হইয়া গেল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শতবার্ষিকীও এই বৎসরে হইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর তিরোভাব শোকসহকারে-স্মরণীয় গত বৎসরের একটি ঘটনা। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বহু নগরে ও গ্রামে শোকসভা হইয়াছিল। বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বার্ষিক

মহাকবির প্রয়াণ • ভাদ্র ১৩৪৮

অজিতকুমার চক্রবর্তী • মাঘ ১৩২৫

অজিতকুমার চক্রবর্তী-সতীশচন্দ্র রায়-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত • শ্রাবণ ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত • শ্রাবণ ১৩২৯

অক্ষয়কুমার বড়াল • অগ্রহায়ণ ১৩২৬

রম্যাঁ রলাঁ ও ম্যাক্সিম গোর্কি • শ্রাবণ ১৩৪৩

যোগীন্দ্রনাথ সরকার • শ্রাবণ ১৩৪৪
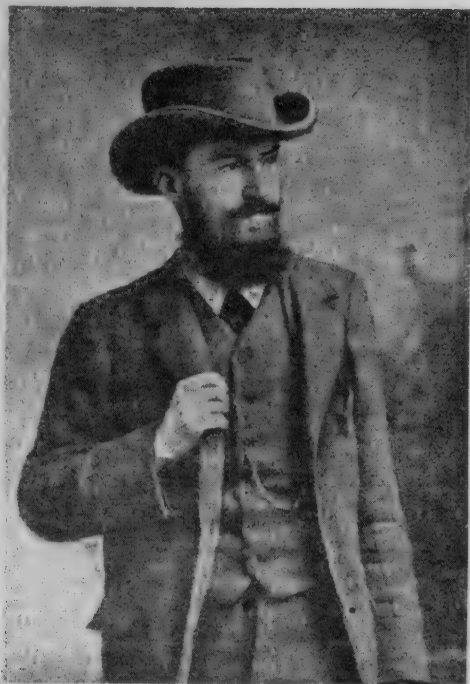
জর্জ বার্নার্ড শ • অগ্রহায়ণ ১৩৩৩
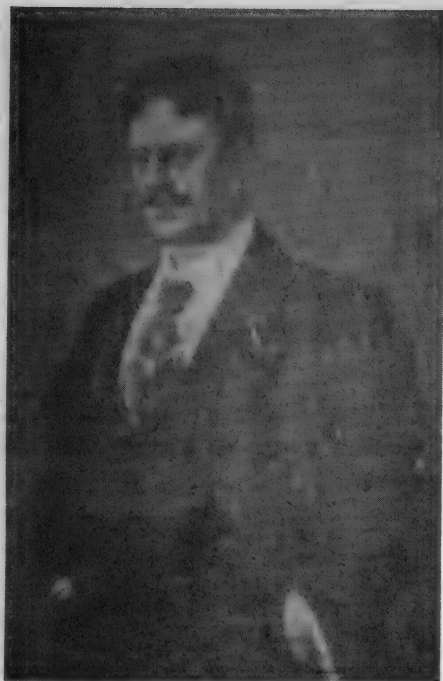
ক্নুটহামসুন • ফাল্গুন ১৩২৭

এইচ জি ওয়েল্‌স • চৈত্র ১৩২৭

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা • মাঘ ১৩৩৪

ইবসেন • পৌষ ১৩৪১
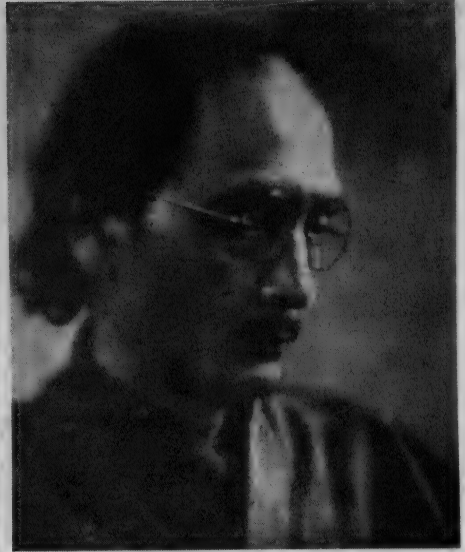
য়োনেজিরো নোগুচি • অগ্রহায়ণ ১৩৪২

হান্‌স আন্ডারসন • অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

পার্ল বাক • মাঘ ১৩৪৫

অতুলপ্রসাদ সেন • আশ্বিন ১৩৪১
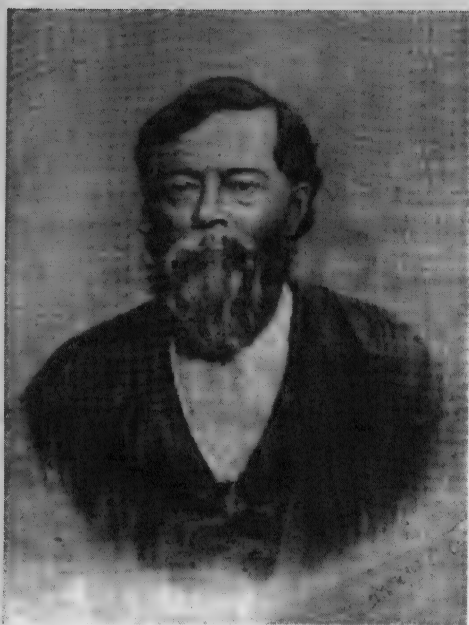
চন্দ্রনাথ বসু • শ্রাবণ ১৩১৭

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় • আষাঢ় ১৩২০

যোগীন্দ্রনাথ বসু • ভাদ্র ১৩৩৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কানু দেশাই অঙ্কিত স্কেচ • ফাল্গুন ১৩৩২
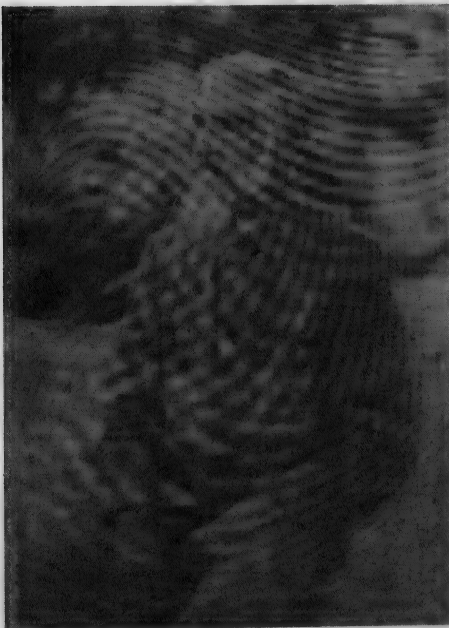
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর • মাঘ ১৩২৯
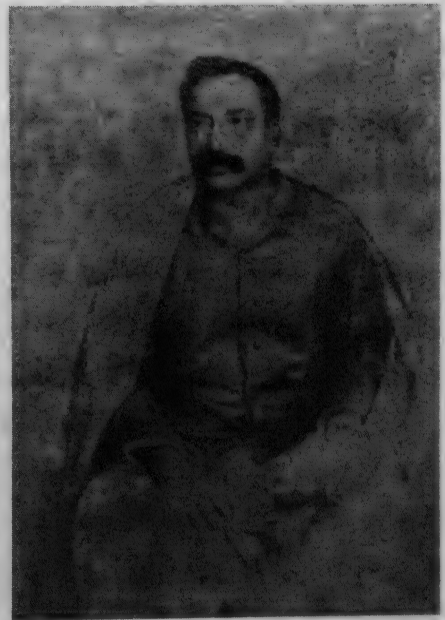
প্রিয়নাথ সেন • পৌষ ১৩২৩

রামনারায়ণ তর্করত্ন • আশ্বিন ১৩৩৮

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী • পৌষ ১৩৪২
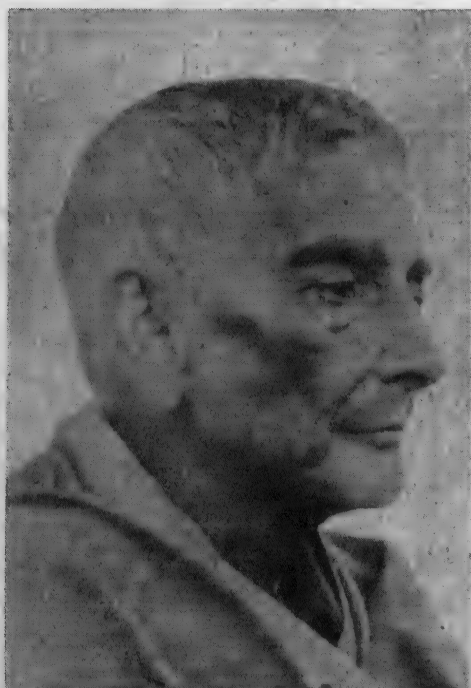
ঈশানচন্দ্র ঘোষ • অগ্রহায়ণ ১৩৪২

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী • আষাঢ় ১৩২৬

স্মৃতিসভা নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর স্মৃতিসভা এ-বৎসর বিশেষ সমারোহে বীরসিংহ গ্রামে ও মেদিনীপুরে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির হইতেছে।

গত বৎসর রবীন্দ্রনাথ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করায় এই বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব বিশেষ উৎসাহ সহকারে অনেক স্থানে হইয়া গিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গে যে-সকল বিখ্যাত লোকের তিরোভাব, বা জন্ম, বা জন্ম ও তিরোভাব হয়, তাঁহাদের সকলের নাম করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—করা হইলও না। কেবল কয়েক জনের নাম করিলাম। ইঁহারা এক শ্রেণীর, এক রকমের মানুষ নহেন, সমান প্রসিদ্ধও নহেন। সকলের জন্য সব বাঙালী গৌরব বোধ করেন নাই। কিন্তু ইঁহাদেব প্রত্যেকের জন্যই অল্প বা অধিকসংখ্যক বাঙালী গৌরব বোধ করিয়াছেন। এবং ইহাও নিশ্চিত, যে, আধুনিক সময়ে এত শক্তিমান ব্যক্তির বঙ্গে জন্মগ্রহণ বাঙালী জাতির পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। এইরূপ সৌভাগ্য অধুনাতন কালে হয়ত ভারতবর্ষের্ অন্য কোন প্রদেশের হয় নাই।

শতবার্ষিকী, স্মৃতিসভা, ও বার্ষিক জন্মোৎসব বাঙালীকে মনে গড়াইয়া দেয়, যে, বঙ্গে কত বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বহুবিধ কৃতিত্ব আমাদিগকে তাঁহাদের শক্তি ও প্রতিভা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়, আমরা গৌরব বোধ করি।

কিন্তু এই গৌরবোধের সঙ্গে অহঙ্কার আসিবার সম্ভাবনা। হয়ত অনেকের, হয়ত খুব বেশীসংখ্যক বাঙালীর অহঙ্কার জন্মিয়াছে—আমরা কি যে-সে জাতি! আমাদের মধ্যে অমুক অমুক অমুক জন্মিয়াছেন!

বঙ্গে প্রকৃত মহৎ লোক যত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্বজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিবার মত জীবন আমরা যাপন করিতেছি কি না, তাহা আমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগকে তাঁহাদের প্রত্যেকের বা সকলের বা কাহারও সমান হইতে হইবে, একথা বলিতেছি না। আমাদের শক্তি তাঁহাদের সমান নহে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের বিধিদত্ত শক্তির সুব্যবহার যতটুকু করিয়াছিলেন, আমাদের সামান্য শক্তির অনুপাতে আমবা তাহার সেইরূপ সুব্যবহার করিতেছি কি না, তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

আর যাহা ভাবিতে হইবে, তাহা ভাবিলে আমাদের উদ্বিগ্ন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু উদ্বেগ সত্ত্বেও আশা পোষণ করিয়া আমাদিগকে উদ্যমশীল হইতে হইবে।

বাংলা দেশে অনেক অসাধারণশক্তিসম্পন্ন মানুষ আধুনিক সময়ে জন্মিয়াছিলেন। একে একে অধিকাংশের তিরোভাব ঘটিয়াছে। অল্পসংখ্যক যাঁহারা বাকী আছেন, তাঁহাদেরও বয়স হইয়াছে, যথাসময়ে তাঁহাদেরও তিরোভাব হইবে।

এই সকল মানুষের দ্বারা যে-কাজ হইয়াছে, সেইরূপ কাজ করিবার মানুষ আর আছে কি না, তাহাই চিন্তার বিষয়। এরূপ অবশ্য কোন দেশেই কোন যুগে সচরাচর ঘটে না, যে, এক জন অসাধারণ মানুষের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবার মত আর একটি মানুষ পাওয়া গেল। কিন্তু অসাধারণ মানুষ এক জনের অভাব হইলেই আর এক জন অসাধারণ মানুষ তাঁহার জায়গায় কাজ করিবার জন্য পাওয়া না-গেলেও, এক জনের কাজ যে-রকমের দশ জনের দ্বারা হইতে পারে, সেই রকম দশ জন অকপট আগ্রহশীল চরিত্রবান্ পরিশ্রমী মানুষ পাওয়া যাইতে পাবে। অসাধারণ এক জন মানুষের

ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে প্রকার, এই রকম দশ জন মানুষের সম্মিলিত প্রভাব সেরূপ না-হইতে পারে।

কিন্তু অসাধারণ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ত তাঁহার প্রভাব লুপ্ত হয় না; তাঁহার জীবনের স্মৃতি তাঁহার প্রভাবকে জীবিত ও সক্রিয় রাখে। তাহার উপর, যদি শ্রদ্ধাবান্ উল্লিখিত প্রকারের দশ জন মানুষ থাকে, তাহা হইলে সমাজ অচল হয় না, পচে না। এবং কালক্রমে আবার অসাধারণ মানুষেরও আবির্ভাব হয়।

এখন আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, ধর্ম্মে. সমাজহিতকর্ম্মে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্পে,...এক এক জন যাঁহারা গিয়াছেন ও যাইবেন, অন্ততঃ তাঁহাদের ভাবধারা, চিন্তাধারা, কর্ম্মধারা,... বজায় রাখিবার মত ও শ্রদ্ধাবান্ দশ দশ জন মানুষের আবির্ভাব বঙ্গে হইয়াছে, হইতেছে কি না।

অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব যে-সব অবস্থার সমবায়ে ঘটে, সেইরূপ অবস্থা ঘটান মানুষের চেষ্টাসাপেক্ষ কি না, তাহার বিচার সহজসাধ্য নহে। কিন্তু যেরূপ দশ দশ জনের কথা বলিলাম, সামাজিক হাওয়ায় শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক আগ্রহ থাকিলে সেই প্রকার দশ দশ জন মানুষ প্রস্তুত হইতে পারে। এই হাওয়া একটা অ-বৈয়ক্তিক (impersonal) জিনিষ নহে, বহু ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও আগ্রহ হইতে ইহার উদ্ভব হয়।

১৩৪৬ ় শ্বিন

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ'

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে শতবার্ষিক-সংস্করণ বাহির করিতেছেন, তাহার মধ্যে আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, সাম্য. ও বিজ্ঞান-রহস্য আগে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সেগুলির পরিচয়ও 'প্রবাসী'তে দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা 'বিবিধ প্রবন্ধ' পাইয়াছি। আগেকার গ্রন্থগুলির মত এই পুস্তকটিও ভাল পুরু কাগজে ভাল অক্ষরে মুদ্রিত। যত্নপূর্ব্বক প্রুফ দেখা হইয়াছে।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র এই সংস্করণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রবন্ধগুলিকে প্রধানতঃ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—সাহিত্য. প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস ও অর্থনীতি, দর্শন ও ধর্ম, এবং বিবিধ। এই শ্রেণী কয়টিতে উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, আর্য্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প, দ্রৌপদী, অনুকরণ, শকুন্তলা. মিরন্দা এবং দেসদিমোনা, বাঙ্গালির বাহুবল, ভালবাসার অত্যাচার, জ্ঞান, সাংখ্যাদর্শন, ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, প্রাচীনা এবং নবীনা, ধর্ম এবং সাহিত্য; চিত্তশুদ্ধি, গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি, কাম, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, ত্রিবেদ সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, সঙ্গীত, বঙ্গদেশের কৃষক, বহুবিবাহ, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার,

বাঙ্গালাশাসনের কল, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর উৎপত্তি, বাহুবল ও বাক্যবল, বাঙ্গালা ভাষা, মনুষ্যত্ব কি? লোকশিক্ষা, এবং রামধন পোদ, এই ৩৮টি প্রবন্ধ আছে। তদ্ভিন্ন পরিশিষ্ট আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী না পড়িলে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঠিক ধারণা জন্মিতে পারে না। কিন্তু তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বলিয়া সাধারণ যে ধারণা আছে, কেবল তাহার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী পড়িলে চলিবে না। অন্য যাহা কিছু তিনি লিখিয়াছেন, তাহাও পড়িতে হইবে। পড়িলে বুঝা যাইবে তাঁহার জ্ঞানের বিস্তার ও গভীরতা কিরূপ ছিল, মননশক্তি কিরূপ বলবতী ছিল, প্রতিভা কিরূপ বহুমুখী ছিল, এবং তাঁহার লেখনীচালনার উদ্দেশ্য কিরূপ উচ্চ ও মহৎ ছিল। তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজক "প্রগতি"-সাহিত্য রচনা করিয়া সাহিত্যসম্রাট্ হন নাই।

১৩৪৬ চৈত্র

বঙ্কিম-ধাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে সমর্পণ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নৈহাটী কাঁটালপাড়ায় তাঁহার যে বৈঠকখানা-গৃহে বসিয়া গ্রন্থাদি রচনা করিতেন গত ২৬শে ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে সেই সুসংস্কৃত বৈঠক খানা বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশে সমর্পিত হয়। বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই উৎসবে পৌরোহিত্য করেন এবং স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোঘাটন করেন। কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শত সাহিত্যিক ও বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

উক্ত বৈঠকখানা-গৃহ সংস্কারের অভাবে ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইলে উক্ত বৈঠকখানা-গৃহের এক-চতুর্থাংশের মালিক বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র শ্রীযুত ব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ অংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদকে দান করেন। কাঁটালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন ইতিপূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের অপর তিন দৌহিত্রের নিকট হইতে যে ত্রিচতুর্থাংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা পরিষদকে দান করেন। পরে সাধারণের অর্থসাহায্যে ঐ বৈঠকখানা-গৃহের আমূল সংস্কার করা হয়।

এই কাজটির দ্বারা বাঙালী জাতির মুখরক্ষা হইয়াছে। পরিষদ্ বা অন্য কেহ যদি এই প্রকারে যথাসময়ে উদ্যোগী হইয়া কলিকাতার বিদ্যাসাগর-ভবনটিকে জাতীয় তীর্থস্থান রূপে রাখিতে পারিতেন, তাহা হইলে উপযুক্ত কাজ হইত। কেন তাহা হয় নাই, তাহা কারণ নির্দেশ ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করিব না।

১৩৪৮ বৈশাখ

বঙ্কিমচন্দ্র এবং সামাজিক মত সম্বন্ধে

পুরুষ ও নারীতে বৈষম্য

১২৮২ সালের কার্ত্তিক মাসের বঙ্গদর্শনে অর্থাৎ প্রায় ৬৬ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক মত ও শাসন বিষয়ে নারী ও পুরুষে নানা বৈষম্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে প্রধান প্রধান সব রকমের বৈষম্যের কথাই ছিল। তাহার মধ্যে একটি বিষয়ের আলোচনার তাঁহার মন্তব্যগুলির কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি। নারীর উপর অত্যাচার নির্ম্মূল করিবার সফল চেষ্টা করিতে হইলে এই বৈষম্য দূর করিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

"স্ত্রীজাতির সতীত্বধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয় তাহার রক্ষার্থ যত বাঁধন বাঁধিতে পার, ততই ভাল কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু পুরুষের উপর কোন কথা নাই কেন? পুরুষ বারস্ত্রী গমন করুক, পরদারনিরত হউক, তাহার কোন শাসন নাই কেন? শাস্ত্রে ভূরি ভূরি নিষেধ আছে; সকলেই বলিবে, পুরুষের পক্ষেও এ সকল অতি মন্দ কর্ম্ম, লোকেও একটু একটু নিন্দা করিবে—কিন্তু এই পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের উপর যেরূপ কঠিন শাসন, পুরুষদিগের উপর সেরূপ কিছুই নাই। কথায় কিছু হয় না; ভ্রষ্ট পুরুষের কোন সামাজিক দণ্ড নাই। এক জন স্ত্রী সতীত্ব সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে * সে আর মুখ দেখাইতে পাবে না; হয়ত আত্মীয় স্বজন তাহাকে বিষ প্রদান করেন; আর এক জন পুরুষ প্রকাশ্যে সেইরূপ কার্য্য করিয়া, রোশনাই করিয়া, জুড়ি হাঁকাইয়া রাত্রিশেষে পত্নীকে চরণরেণু স্পর্শ করাইতে আসেন; পত্নী পুলকিত হয়েন; লোকে কেহ কষ্ট করিয়া অসাধুবাদ করে না; লোকসমাজে তিনি যেরূপ পতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং কেহ তাঁহার সহিত কোন প্রকার ব্যবহারে সঙ্কুচিত হয় না, এবং কোন প্রকার দাবি দাওয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে তিনি দেশের চূড়া বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারেন।"

এ বিষয়ে সামাজিক অবস্থার ও মতের ভালর দিকে পরিবর্ত্তন কতটা হইয়াছে বা মোটেই হইয়াছে কি না, পাঠিকারা ও পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

প্রবন্ধটির শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন .—

"আমরা যে সকল কথা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, তা হইলে আমাদিগের দেশীয়া স্ত্রীগণের দশা বড়ই শোচনীয়। ইহার প্রতিকার জন্য কে কি করিয়াছেন? পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায় অনেক যত্ন করিয়াছেন—তাঁহাদিগের যশঃ অক্ষয় হউক; কিন্তু এই কয়জন ভিন্ন সমাজ হইতে কিছুই হয় নাই। দেশে অনেক এসোশিয়েশন, লীগ, সোসাইটি, সভা, ক্লব ইত্যাদি আছে—কাহারও উদ্দেশ্য রাজনীতি। কাহারও উদ্দেশ্য সমাজনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য ধর্ম্মনীতি, কাহারও উদ্দেশ্য দুর্নীতি, কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কেহ নাই। পশুগণকে কেহ প্রহার না করে, এজন্যও একটি সভা আছে, কিন্তু বাঙ্গালার অর্দ্ধেক অধিবাসী স্ত্রীজাতি—তাহাদিগের উপকারার্থ কেহ নাই। আমরা কয়দিনের ভিতর অনেক পাঠশালা, চিকিৎসাশালা এবং পশুশালার জন্য বিস্তর অর্থব্যয়

* তাহার কোন দোষ না থাকিলেও অন্যে তাহার উপর বলপূর্ব্বক অত্যাচার করিলেও। প্রবাসীর সম্পাদক।

দেখিলাম, কিন্তু এই বঙ্গ-সংসার রূপ পশুশালার সংস্করণার্থ কিছু করা যায় না কি?

"যায় না; কেন না তাহাতে রঙ্‌তামাসা কিছু নাই। কিছু করা যায় না; কেন না, তাহাতে রায়বাহাদুরি, রাজা বাহাদুরি, স্টার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি কিছু নাই। আছে কেবল মূর্খের করতালি। কে অগ্রসর হইবে?"

৬৬ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন তখনকার চেয়ে এখন হিন্দু সমাজের কতক লোক স্ত্রীজাতির উন্নতিতে কিছু বেশি মনোযোগী হইয়াছেন স্বীকার্য্য। কিন্তু এখনও স্ত্রীজাতির অবস্থা এত শোচনীয় এবং হিন্দুসমাজ এত বিশাল ও তাহার সম্ভাবিত সামর্থ্য এত অধিক যে, স্ত্রীজাতির উন্নতিতে বঙ্গের হিন্দু সমাজের মনোযোগের পরিমাণ ও মাত্রা এখনও যথেষ্ট মনে করিতে পারা যায় না। বাঙালী মহিলাদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীর আন্তরিক নারীহিতৈষণা আছে। তাঁহারা বঙ্গের নারীপ্রচেষ্টাকে সুপরিচালিত করুন। সর্ব্বাগ্রে নারীদের নিরক্ষরতা দূর করুন।

১৩৪৮ শ্রাবণ

বঙ্কিমচন্দ্র ও নাৎসি-বাদ

কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কন্‌ফারেন্সের গত অধিবেশনে এক জন বক্তা বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উক্তি প'ড়ে প্রশংসা-সূচক হাততালি পেয়েছিলেন। সন ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যার অন্তর্গত "ভারত কলঙ্ক" প্রবন্ধ থেকে সেই বাক্যগুলি উদ্ধৃত করছি।

হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে, অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গল আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না-হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতি পীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক. আমরা সে-জন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না, পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

'মঙ্গল' ও 'অমঙ্গল' শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থের আলোচনা এখানে করব না; কোনো জা'তের প্রকৃত মঙ্গল বা অমঙ্গালে অন্য কোনো জা'তের প্রকৃত অমঙ্গল বা মঙ্গল হ'তে পারে কি না, তার বিচারও করব না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই সব কথা লিখোছলেন, তখন নাৎসি-মতের উদ্ভব হয় নি, কিন্তু তারি সমতুল্য উৎকট ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ (স্বাজাতিকতা) ছিল। তিনি যদি শুধু ঐ কথাগুলোই লিখতেন তা হলে তাঁকে নাৎসি-বাদের সমর্থক বললে অন্যায় হ'ত না; কারণ, নাৎসিরাও পরের দেশ অধিকার ক'রে, পরের দেশ লুট ক'রে নিজেরা ধনী, সুখী, বড় হ'তে চায়, অন্য জা'তকে পদানত ক'রে

নিজেরা প্রভু হ'তে চায়। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত কথাগুলির ঠিক্ পরেই বঙ্কিম আরো কিছু লিখেছেন—সেগুলি বক্তা কৃষ্ণনগরে সভাস্থলে প'ড়ে দেন নি;—দিলে বোধ করি শ্রোতারা হাততালি দিতেন না। সে কথাগুলি এই :—

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ইউবোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্য অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে; বহু-লোক-ক্ষয়কারী 'সক্সেসন-যুদ্ধ' এই সামাজিক চিত্ত-বিকারের ফল। গত বর্ষের ভয়ঙ্কর ফরাসী-প্রুসীয় যুদ্ধ এই বিষবৃক্ষে জন্মিয়াছিল। অদ্যাপি ইউরোপে অনেক কুসংস্কার এই বিষবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া বাড়িতেছে। যথা—'প্রোটেকশন্।'

(উপরে উদ্ধৃত অংশ দুটি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ডের ১৯-২০ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া)।

বঙ্কিমচন্দ্র এখন জীবিত থাকলে দৃষ্টান্তস্বরূপ হিটলারের দুরাকাঙ্ক্ষারও উল্লেখ করতেন।

বঙ্গদর্শন ভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্বেও তিনি এই বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন এবং আরো স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছেন।

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পর বিরোধী হইবে, তখন কোন দিক গুরু, তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, দেশরক্ষা —জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়; অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বাস্তবিক জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বা স্বজনপ্রীতির বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নেই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত্ত চোরের উদাহরণ দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখনও কাহারও অনিস্ট করিব না। কোন মনুষ্যের করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইস্টসাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর সমাজেরও তেমনি ইস্টসাধন করিব। সাধ্যানুসারে, কেন না, কোন সমাজের অনিষ্ঠসাধন করিয়া অন্য কোন সমাজের ইস্টসাধন করিব না। পরসমাজের অনিস্টসাধন করিয়া আমার সমাজের ইস্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইস্টসাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সমদর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয়দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি, তোমার মনে ইউরোপীয় Patriotism (পেট্রিয়টিজ্ম্) ধর্ম্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ধরের সমাজে আনিব; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতি সকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ স্বদেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় ভাগ, ৩৬৫-৩৬৬ পৃষ্ঠা।)

এখানেও 'ইস্ট' ও 'অনিস্ট' শব্দ দুটির অর্থের

বিচার ইত্যাদি আলোচনা করলাম না।

বঙ্কিম যে বলেছেন, "জাগতিক প্রীতি ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে", ইহা বর্তমান সময়ে অনুধাবনযোগ্য।

কে কে "বঙ্গাদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন"

ন্যাশন্যাল লিটারেচ্যর কোম্পানী বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গাদর্শন পুনর্মুদ্রিত করায় তাঁর এমন কোন কোন ছোট লেখা চোখে পড়ছে যার অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। এই জন্যে উক্ত কোম্পানীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি চার বৎসর বঙ্গাদর্শন চালিয়ে চতুর্থ বৎসরের শেষ সংখ্যার শেষে "বঙ্গাদর্শনের বিদায় গ্রহণ" লিখেছিলেন। তার গোড়ায় অন্য কিছু লিখে তিনি বলছেন :—

বঙ্গাদর্শন সম্পাদনকালে আমি অনেকের কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়াছি। সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার, এই সময়ে আমার প্রধান কার্য্য।

প্রথমতঃ সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট আমি বিশেষ বাধ্য। তাঁহারা যে পরিমাণে বঙ্গাদর্শনের প্রতি আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমার আশার অতীত। আমি এক দিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে আমি এতদিন বঙ্গাদর্শন রাখিতাম কি না সন্দেহ।

এর পর তিনি লিখছেন :

তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গাদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে।

এখানে যাঁদের নাম আছে, তাঁদের সংখ্যা খুব কম। শেষে বঙ্কিম লিখছেন :—

তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গাদশনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ। ইহাতেও আমার একটি স্পর্দ্ধার কথা আছে। উচ্চ শ্রেণীর দেশী সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গাদর্শনের অনুকূল ছিলেন; অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্নশ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না। কিন্তু এক্ষণ গতাসু ইণ্ডিয়ান অবজর্বর বঙ্গাদর্শনের বিশেষ সহায়তা করিতেন। আমি ইণ্ডিয়ান অবজর্বর এবং ইণ্ডিয়ান মিররের নিকট যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এরূপ আর কোন ইংরেজি পত্রের নিকট প্রাপ্ত হই নাই। অবর্জবর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ মিরর অদ্যাপি উন্নত ভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। এবং ঈশ্বরচ্ছায় বহুকাল তদ্রূপ মঙ্গল সাধন করিবেন; তাঁহাকে আমার শত সহস্র ধন্যবাদ; বঙ্গাদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে তাঁহার মতভেদ থাকাতেও তিনি যে এই রূপ সহৃদয়তা প্রকাশ পূর্ব্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারতা সামান্য পরিচয় নহে।

সহৃদয়তা এবং বল, আমি কেবল অবর্জবর ও মিররের কাছে প্রাপ্ত হইয়াছি এমত নহে। দেশী সম্বাদপত্রের অগ্রগণ্য হিন্দু পেট্রিয়ট এবং স্থিরবুদ্ধি ও দেশবৎসল সহচরের দ্বারা আমি তদ্রূপ উপকৃত

এবং তাঁহাদের কাছে আমি সেইরূপ কৃতজ্ঞ। নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান এবং যথার্থবাদী ভারত সংস্কারক, বিজ্ঞ এডুকেশন গেজেট, ও তেজস্বিনী ও তীক্ষ্মদৃষ্টিশালিনী সাধারণী এবং সত্যপ্রিয় সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্রকে বহুবিধ আনুকূল্যের জন্য আমি শত শত ধন্যবাদ করি।

"সাধারণ পাঠকশ্রেণীর নিকট" বঙ্কিম যে রকম কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, প্রত্যেক সম্পাদক তা অনুভব করেন; কেন না "সাধারণ পাঠকের এই উৎসাহ ও যত্ন না দেখিলে" কোন সম্পাদকই তাঁর পত্রিকা চালাতে পারেন না। "কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই" কাগজ চালান যায়—বিশেষতঃ মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্র। সুতরাং তাঁদের কাছেও সম্পাদকের ঋণ অপরিশোধনীয়।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "তৃতীয়, যে সকল সহযোগিবর্গ বঙ্গাদর্শনকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার শত শত ধন্যবাদ।" অন্য মাসিকগুলির কথা আমরা বলতে পারি না, যদিও ছোট বড় যত মাসিক আমরা দেখি সবগুলিতেই এমন কিছু থাকে যা পড়বার যোগ্য এবং যার জন্যে সেগুলি উৎসাহ পাবার যোগ্য; —আমরা কেবল "প্রবাসী"র কথাই এখানে বলব। অবশ্য বঙ্গাদর্শনের সঙ্গে "প্রবাসী"র তুলনা করবার কোন অভিপ্রায় থেকে যে তা বলব এমন নয়, "প্রবাসী"র কথাই অধিক জানি ব'লে বলব। "প্রবাসী"কে যে-কাগজ যখন উৎসাহিত করেছেন, তাঁকে শত শত ধন্যবাদ। কিন্তু এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে "একটি স্পর্দ্ধার কথা" বলেছেন, "প্রবাসী" তা বলতে পারে না। বঙ্কিম লিখেছেন "উচ্চ শ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই বঙ্গাদর্শনের অনুকূল ছিলেন।" এ কথা বলা যায় না যে "উচ্চ শ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রই" প্রবাসীব "অনুকূল", বস্তুতঃ হয়ত এই কথা বললেই অনেকটা ঠিক্ বলা হবে যে, উচ্চ বা নিম্ন সব শ্রেণীর "সম্বাদপত্র মাত্রই" "প্রবাসী" সম্বন্ধে সাধারণতঃ কেহ বা নির্বাক্ কেহ বা প্রায় নির্বাক্। বঙ্কিম তার পর বলেছেন, "অধিকতর স্পর্দ্ধার কথা এই যে নিম্ন শ্রেণীর সম্বাদপত্র মাত্রেই ইহার প্রতিকূলতা করিয়াছিলেন।" আমাদের এ "স্পর্দ্ধা" করবারও জো নাই, যদিও প্রতিকূলতার দৃষ্টান্ত আগেও পাওয়া যেত মাসিক পত্রিকা মহলে, এখনও সেখানে পাওয়া যায়—ব্যাধিরূপে। কিন্তু পত্রিকাগুলিকে উচ্চ ও নিম্ন দুটা শ্রেণীতে ভাগ করবার যে অধিকার অসাধারণ-প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, তার দাবী আমরা করতে পারি না।

এ প্রশ্ন হ'তে পারে যে, "বঙ্গাদর্শন সম্বন্ধে তখনকার খবরের কাগজগুলি যা করত, কেন মনে কর যে প্রবাসী সম্বন্ধে তা এখনকার কাগজগুলির করা উচিত?" আগেই বলেছি, বঙ্গাদর্শনের সঙ্গে প্রবাসীর তুলনা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়; সেই কথাই আবার বলে প্রশ্নটার একটা উত্তর দিচ্ছি। বঙ্গাদর্শনেব যুগে বঙ্কিম ছিলেন শ্রেষ্ঠ লেখক, আর এখনকার কালে রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ লেখক। বঙ্কিমের রচনাবলী বেরত বলে যদি তখনকার কালে বঙ্গাদর্শন সকলের আলোচনার যোগ্য ছিল, তা হলে যে মাসিকে রবীন্দ্রনাথের সকলের চেয়ে বেশী রচনা চল্লিশ বৎসর ধরে বেরিয়েছে এবং এখনও বেরুচ্ছে, তা কেন আলোচনার যোগ্য হবে না?

রবীন্দ্রনাথের রচনা কোন্ কোন্ কাগজে বেরুচ্ছে, সংবাদপত্রগুলি তার উল্লেখ বা আলোচনা না-করলে তাতে তাঁব কৃতিত্বের ও যশের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না; কিন্তু সাধারণ পাঠকরা তাঁর নবতম রচনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হবার এবং তার দ্বারা আনন্দিত ও উপকৃত হবার যথেষ্ট

সুযোগ পান না।

আমরা যে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নাম কচ্ছি তার মানে এ নয় যে, "প্রবাসী"তে প্রকাশিত অন্য সকল লেখকের ও সম্পাদকের লেখার কোন মূল্য নাই। ববীন্দ্রনাথের লেখার উল্লেখ করলাম এই জন্যে, যে. তিনি জগদ্বিখ্যাত লেখক এবং তাঁর স্বভাষাভাষীরা তাঁর জয়ন্তী অনুষ্ঠান করা আবশ্যক মনে করেছেন। তাঁব জয়ন্তী অনুষ্ঠান করা খুব দরকার কিন্তু তাঁর নবতম রচনার খবর রাখা ও দেওয়া খুব অনুচিত, এ-রকম ধারণা অসঙ্গত। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, শুধু এসোসিয়েটেড প্রেস ও য়ুনাইটেড প্রেসের মারফৎ প্রচারিত তাঁর বাণীগুলিই যে আলোচনার যোগ্য তা নয়, তাঁর উপন্যাস নাটক গল্প প্রবন্ধ কবিতা গান ভাষণ পত্রাবলী কথাবার্তা ইত্যাদি তার চেয়ে অনেক বেশী অনুধাবনের ও আলোচনার যোগ্য। তাঁর এই সকল রকম অনেক লেখাই "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়ে আসছে।

আমরা "প্রবাসী"র কথা বেশি করে জানি বলে তার কথাই এ-পর্যন্ত বলেছি। কিন্তু বাস্তবিক আজকালকার সংবাদপত্রগুলি সাধারণতঃ মাসিকপত্রগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন, শুধু "প্রবাসী"কে নয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমস্থলও আছে। যে মাসিকের পক্ষ থেকে তদ্বিরতাগিদাদি হয়ে থাকে, খবরের কাগজে তার কোন কোন বা অনেক সংখ্যার উল্লেখ হয়। নতুবা উপেক্ষাটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। এ-বিষয়ে আমাদের আরো যা বলবার আছে. তার কিছু পরে বলছি। তার আগে একটা কথা বলে রাখি। দৈনিক মশায়রা মাসিকগুলিকে বাস্তবিক মনে মনে উপেক্ষা করেন না। অনুকরণ সমাদরের অকপটতম বাহ্য লক্ষণ। দৈনিকদেব বাহ্য ব্যবহার যেমনই হোক, তাঁরা মাসিকগুলির মনোরঞ্জক ও আবশ্যক বিশেষত্ব অনেকগুলি স্বাঙ্গীকৃত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সব কাগজের কাছ থেকে সহৃদয়তা, বল ও উৎসাহ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি ছিল ইংরেজি —ইণ্ডিয়ান অবর্জবর, ইণ্ডিয়ান মিরর ও হিন্দু পেট্রিয়ট। তখনকার মত এখনও "ইংরেজেরা বাংলা সাময়িক পত্রের বড় খবর রাখেন না।" সেই জন্যে, ইণ্ডিয়ান অবর্জবর যে বঙ্গদর্শনের সহায়তা করতেন, এটি তাঁর খুবই প্রশংসার কথা। দেশী ইণ্ডিয়ান মিরর ও হিন্দু পেট্রিয়ট এ বিষয়ে যা করতেন, এখনকার কোনো ইংরেজি কাগজই, শুধু "প্রবাসী"র জন্যে নয়, কোন মাসিকের জন্যই তা করেন না, "প্রবাসী"র জন্যে ত মোটেই নয়। মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার মত অন্য কোন কোন মাসিকের সম্বন্ধে তাঁদের দু-চার কথা ছেপে দেওয়া ধতর্ব্যের মধ্যে নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের বাংলা অনেকগুলি সম্বাদপত্রকেই ধন্যবাদ দিয়েছেন। এঁরা আলোচ্য বিষয়ে এখনকার সম্বাদপত্রগুলির চেয়ে ন্যায়বান্ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখেছেন, ইণ্ডিয়ান মিররের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের অনেক গুরুতর বিষয়ে মতভেদ ছিল, তা সত্ত্বেও মিরর তাঁকে বল প্রদান করতেন। আজকালকার দিনে মতভেদ সত্ত্বেও এমন "বলপ্রদান" কল্পনাই করা যায় না। মতভেদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক ও সমাজবিষয়ক মতভেদ থাকা বিচিত্র নয়; কারণ ইণ্ডিয়ান মিরর তখন ব্রাহ্মদের কাগজ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্ম ছিলেন না। আর তিনি যে ভারত সংস্কারককে নিরপেক্ষ সদ্বিদ্বান ও যথার্থবাদী বলেছেন, সেই কাগজটিও ছিল ব্রাহ্মদের এবং তার অধ্যক্ষ ছিলেন ভক্ত ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্র দত্ত। তখনকার 'উচ্চ শ্রেণীর' খবরের কাগজের সম্পাদকের মতিগতি কর্তব্যবোধ বোধ

করি এখনকার অনেক সম্পাদকদের থেকে ভিন্ন রকমের ছিল। যাঁরা মতভেদ সত্ত্বেও সমদর্শী ছিলেন, তাঁরা ধর্মবিষয়ক ও রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন।

সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র

অনেক দিন আগে চেম্বার্সের এন্সাইক্লোপীডিয়াতে বিলাতী অনেক সাময়িক পত্র সম্বন্ধে পড়েছিলাম, তাতে "critical comments on public events and literature" ("সার্বজনিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে ও সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য") থাকে। সে রকম মন্তব্য বাংলা কোন মাসিকেই বেরোয় না, এমন নয়। ঐ মহাকোষে তার পর আছে :

Their sales are not large but they are influential, and these publication are much quoted in the Press". — (Article PERIODICALS, *Chamber's Encyclopaedia*, Vol VIII, p. 23)

তাৎপর্য। তাদের বিক্রী বেশী নয় কিন্তু তারা প্রভাবশালী এবং খবরের কাগজে তাদের থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত হয়।

সাময়িক পত্রসমূহ সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমাদের দেশের খবরের কাগজগুলিব তুষ্ণীম্ভাব দেখে মনে হতে পারে যে, তাঁদের বিবেচনায় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথেরও কোন মন্তব্য উদ্ধার ও আলোচনার যোগ্য নয়। আমাদের কিন্তু ধারণা এই যে, ছোট ছোট কাগজেও এমন অনেক জিনিস থাকে যা জ্ঞানগর্ভ, শিক্ষাপ্রদ ও আলোচনার যোগ্য।

বঙ্কিম লিখেছেন, "আমি একদিনের তরেও ব্যক্তিবিশেষের আদর ও উৎসাহের কামনা করি নাই।" তিনি যদি তা না লিখতেন তা হলেও কেও কল্পনা করতে পারত না যে, তিনি ধরনা দিয়ে তদ্বিরতাগিদ করে কতকগুলি সম্পাদকের কাছ থেকে সহৃদয়তা, উৎসাহ ও বল আদায় করেছেন। তাঁর আত্মসম্মান তাঁর কাছে যেমন মূল্যবান ছিল, ক্ষুদ্রতর সম্পাদকদের ও লেখকদের আত্মসম্মানও তাঁদের নিজের নিজের কাছে সেইরূপ মূল্যবান।

খবরের কাগজগুলি যদি বিনা তদ্বিরে বিনা তাগিদে সাময়িক পত্রসমূহের এবং পুস্তকসমূহেরও, সমালোচনা একটি নিয়মিত কর্তব্য মনে করেন, তা হলে সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের ও গ্রন্থকারদের আত্মসম্মান বজায় থাকে, তদ্বির-তাগিদের পঙ্কতিলক তাঁদের কপালে পড়ে না। এটা যে একটা কর্তব্য বলে গণ্য হতে পারে, তা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বাক্যকে উপলক্ষ্য করে বলছি।

বঙ্গদর্শনকে "আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন"

বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র "পত্র সূচনা"য় লিখেছিলেন :—

এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক্।

বার্তার একটি অর্থ সংবাদ, খবর। বার্তাবহ মানে যে খবর নিয়ে যায় বা এনে দেয়। সাধারণতঃ খবর বলতে বাইরের খবরই বুঝায়; যেমন যুদ্ধসংবাদ, আদালতের নানা রকম মোকদ্দমার খবর, সত্যাগ্রহ সংবাদ, 'ছাত্রসংবাদ', দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর, নেতা-উপনেতাদের দেড়গজী বিবৃতি, সভাসমিতির বৃত্তান্ত, ইত্যাদি। যা ঘটে, তা-ই খবর। কিন্তু বাইরে যা ঘটে, তা-ই একমাত্র ঘটনা নয়। মানুষের অন্তরে যা ঘটে, তাও ঘটনা। সুতরাং তার বিবৃতিও খবর। বঙ্কিমচন্দ্র এই খবর দেবার জন্যে বঙ্গাদর্শনকে বার্তাবহ রূপে ব্যবহার করতে বাঙালি কৃতবিদ্যা সম্প্রদায়কে অনুরোধ করেছিলেন। নূতন চিন্তা, নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মত, নূতন ভাবধারা, নূতন আদর্শ, নবকল্পিত সৌন্দর্য— শ্রেয় ও শোভন যা কিছু মানুষের মনে উদিত হয়, সমস্তই এই রকম খবর। তার থেকে সমাজের চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বোধহয়, আজকাল যাকে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি বলা হয়, তাকে বঙ্গাদর্শনে 'চিত্তোৎকর্ষ' নাম দেওয়া হয়েছিল।

বাংলা ছোট ছোট সাময়িক পত্রেও, ছোট ছোট বইয়েতেও মানুষের অন্তরের এই রকম নানা খবর পাওয়া যায়। সেই জন্যে খবরের কাগজে যেমন বাইরের খবর থাকে, সেই রকম মনোরাজ্যের এই সব খবরও থাকলে তবে কাগজগুলি পূর্ণাঙ্গ হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৩৩৪ চৈত্র
সুরমা সাহিত্য-সম্মেলনে "পথের দাবী"

সুরমা সাহিত্য-সম্মেলনে আমাকে এবৎসর সভাপতির কাজ করিতে হইয়াছিল। বাংলা গবর্মেণ্ট যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব সম্মেলনের বিষয় নির্ব্বাচন কমিটিতে উপস্থিত করা হয় এবং তর্কবিতর্কের পর প্রস্তাবকেরা তাহা প্রত্যাহার করেন; আমি এইরূপ অবগত হই। পরে দশজন প্রতিনিধি সম্মেলনেব প্রকাশ্য সভায় উহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত একটি আবেদন করেন। এবিষয়ে আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি, তাহার বিরুদ্ধে এবং আমার "অদ্ভুত মনোবৃত্তির" বিরুদ্ধে একটি চিঠি দুখানি বাংলা দৈনিক কাগজে দেখিলাম। আমি যে-যে কারণে প্রস্তাবটি সম্মেলনের নিকট উপস্থিত করিতে দি নাই, তাহা বলিতেছি। সম্মেলনটি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নহে। নানা রাজনৈতিক মতের লোক ইহার সভ্য; সরকারী কর্ম্মচারীরাও ইহার সভ্য। রাজনৈতিক বিষয় সাহিত্যিক সম্মেলনে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই, আলোচ্য সাহিত্যিক বিষয়ের অভাব নাই, বরং খুব প্রাচুর্য্যই আছে। সাহিত্যিক সম্মেলনে রাজনীতি ঢুকাইলে তাহা হইতে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পরোক্ষভাবে কার্য্যতঃ তাড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লাভ নাই, ক্ষতি আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সাহিত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া, গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারীরাও যদি রাজনৈতিক কর্ম্মীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দেশের এক রকম সেবা করিবার সুযোগ পান, তাহাতে উপকার বই অপকার নাই ; বঙ্কিমবাবুর নাম উল্লেখও আমি করিয়াছিলাম।

আমি এইরূপ নানা কারণে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইতে দি নাই। শরৎবাবুর বহিটি-সম্বন্ধে আমার কথা বিকৃত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যতদূর মনে পড়িতেছে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই :— "ধারাবাহিক রূপে যখন শরৎবাবুর বহি একখানি মাসিকে বাহির হয়, তখন উহা পড়িবার অবসর আমার হয় নাই—বস্তুতঃ সে প্রকারে প্রকাশিত কম জিনিষেরই পাঠ আমার ভাগ্যে ঘটে। যখন উহা পুস্তকাকারে বাহির হয়, তখন উহা আমার হস্তগত না হওয়ায় উহা দেখিতে পাই নাই। সুতরাং ঐ বহিটি সম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করিতেছি না, করিতে পারি না।"

যে কোন কারণেই হউক, গবর্ম্মেণ্ট কর্ত্তৃক সরকারি কোন পুস্তক বাজেয়াপ্ত করার আমি যে বিরোধী তাহা বুঝাইবার জন্য আমার অভিভাষণের নিম্নমুদ্রিত শেষ বাক্যটির প্রতি আমি সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম :—

"পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মানুষের অন্তরের পূর্ণ বাহ্য প্রকাশ বলিয়া, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে।"

তাহা করিয়া আমি নিম্নলিখিত মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলাম, ইংরেজীতে একটি লাটিন প্রবাদ-বাক্য *Verbum sap* এইরূপ সংক্ষিপ্ত আকারে চলিত আছে। তাহার মানে, বিজ্ঞদের কাছে একটা শব্দ, একটা সঙ্কেতই যথেষ্ট। আমার শ্রোতাদের বুদ্ধিমত্তার উপর আমার শ্রদ্ধা থাকায় আমি আমার অভিভাষণের এই শেষ বাক্যটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করি নাই। ঐ বাক্যটি হইতেই

সভাস্থ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়েরা পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার মত বুঝিতে পারিবেন।

কেহ যদি বলেন, যে, তাঁহার বুদ্ধিমত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আমার মূঢ়তার ও "অদ্ভুত মনোবৃত্তির" পরিচায়ক, তাহা হইলে আমি সে দোষ স্বীকার করিতেছি।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে দেখিলাম, "ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বাহির হইয়া চলিয়া যাইবেন।" ইহা এই প্রথম জানিলাম। শিলচরে এইরূপ কিছু শুনি নাই। কথাটি-সত্য কি না, বলিতে পারি না।

যে-প্রস্তাব সভায় করিতে দেওয়া হইবে না, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে দিবার রীতি কোথাও চলিত আছে বলিয়া আমি অবগত নহি। এইজন্য শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রাযকে বক্তৃতা করিতে দি নাই। কিন্তু তাঁহাকে বক্তৃতা না করিতে অনুরোধ বিনীত ও শিষ্ট ভাষায় করিয়াছিলাম, আমার মুখে যে কথা দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

আমার বিবেচনায় সুরমা সাহিত্য-সম্মেলনে "আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রতি" বিন্দুমাত্রও "অবমাননা" হয় নাই।

"রামানন্দবাবুর অদ্ভুত আচরণ" প্রভৃতি শিরোনাম দিয়া চিঠি লিখিলে চটক্‌দার লেখা হয় বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তির "অনদ্ভুত" আচরণেরও কোন কোন দৃষ্টান্ত বোধ হয় "সংবাদদাতা" লিখিতে পারিতেন। "সংবাদদাতার" তাহা কি কর্ত্তব্য নহে? আমার মতে সংবাদ দেওয়া সংবাদদাতার মুখ্য কাজ, সমালোচনা গৌণ কাজ।

পরিশেষে বক্তব্য, সম্মেলন প্রভৃতির উদ্যোক্তাগণ সত্বর এক একটি কার্য্যবিবরণ খবরের কাগজে আগেই পাঠাইয়া দিলে পাঠকদের সত্যনির্দ্ধারণের সুবিধা হয়।

১৩৩৫ আষাঢ়

সম্পাদকের চিঠি

কয়েক দিন হইল, আমার বয়স আরও এক বৎসর বাড়িয়াছে এবং আমি মৃত্যুর দিকে আরও একটু অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন জীবনের অতীত কালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ শিলচরে সুরমা সাহিত্যসম্মিলনীতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচিত হইতে দি নাই, তাহার বিষয় মনে পড়িল। মনে হইল, সাহিত্যবিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক কোন প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণতঃ অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সাহিত্যের অবশ্যই থাকা উচিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' রাজনৈতিক বহি বটে কি না, জানি না, তাহার আলোচনারও প্রয়োজন নাই. কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক উহা রাজনৈতিক কারণেই বাজেয়াপ্ত হইয়াছে. সাহিত্যের উপর গবর্ন্মেণ্টের

এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্যসম্মিলনীতে প্রতিবাদটি আলোচিত হইতে দি নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই; সাহিত্যসভায় রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনা হওয়া অনাবশ্যক ও অযৌক্তিক, এই সাধারণ নীতি অনুসারেই আমি প্রশ্নটির মীমাংসা করিয়াছিলাম। এখন যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তখন তাহা মনে আসিলে এই মীমাংসা করিতাম, যে, প্রতিবাদটির আলোচনা সম্মিলনীর সভায় হইতে পারিবে, আলোচনা বা ভোটপ্রদানের সময় সরকারী কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে সভা হইতে অনুপস্থিত থাকিতে বা ভোট না দিতে পারেন। এখন আমি যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে আমার ভ্রম হইয়াছিল মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য এখন আমার নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে আমার বর্ত্তমান মত প্রকাশ করিলাম।

১৩৩৫ শ্রাবণ

শরৎবাবুর উপর আক্রমণ

১৯২৬-২৭ সালের বঙ্গীয় শাসন রিপোর্টে ঔপন্যাসিক বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে ২৪৮ পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে :--

The most popular novelist, Babu Sarat Chandra Chatterjee, found a new vent for his morbid sentimentalism in a bitterly virulent attack on the alleged land-grabbing propensities of the European powers and the suspected political aim of the various Christian missions in Asia.

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অন্যজাতির ভূমি দখল করিবার প্রবৃত্তি অতি সত্য কথা, ইহা মিথ্যা আরোপিত ("alleged") দোষ নহে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। তদ্ভিন্ন, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বলিতে শুধু ইংরেজ জাতিকে বুঝায় না। অন্য ইউরোপীয় জাতির দোষ ক্ষালনে আলোচ্য রিপোর্টে এত উৎসাহ কেন প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা একটি বাংলা প্রবাদ বাক্য হইতে অনুমিত হইতে পারে। খৃষ্টিয়ান মিশন সম্বন্ধে শরৎবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তিনি প্রথমে বলেন নাই; বাইবেল, বোতল ও ব্যাটালিয়নের পরে পরে আবির্ভাব সম্বন্ধে ইংরেজীতেই উক্তি আছে।

১৩৩৮ আশ্বিন

শরৎচন্দ্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নর্ম্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হ'ল। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েচি। পাস করে থাকব কিন্তু পারিতোষিক পাইনি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা সওদাগরী আপিস পার হয়ে আজ পেন্‌সন্ ভোগ করচেন।

এমন সময় বঙ্গদর্শন বাহির হ'ল। তাতে নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল—তখনকার মননশীল পাঠকেরা আশা করি তার মর্য্যাদা বুঝেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে তখন যে বেশি ছিল তা নয়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, তখনকার পাঠকেরা এখনকার মতো এত বেশি প্রশ্রয় পান নি। মাসিক পত্রিকা, বলতে গেলে, ঐ একখানিই ছিল। কাজেই সাধারণ পাঠকের মুখরোচক সামগ্রীর বরাদ্দ অপরিমিত ছিল না। তাই পড়বার মনটা অতিমাত্র বিলাসী হয়ে যায় নি। সামনে পাত সাজিয়ে যা-কিছু দেওয়া যেত তার কিছুই প্রায় ফেলা যেত না। পাঠকদের আপন ফরমাসের জোর তখন ছিল না বললেই হয়।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতাবশতই এটা বেশি বলা হ'ল। বঙ্গদর্শনের প্রাঙ্গণে পাঠকেরা যে এত বেশি ভিড় করে এল, তার প্রধান কারণ, ওর ভাষাতে তাদের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব ঐ পত্রিকায়। এর পূর্ব্বে বাঙালীর আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নি। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে দেখলে তখন সাহিত্য ছিল ভাসুরের বৈঠক, ভাদ্রবৌ ঘোমটা টেনে তাকে দূরে বাঁচিয়ে চলত, তার জায়গা ছিল অন্দর মহলে। বাংলা দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা যেমন ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কী থেকে অল্পে অল্পে বেরিয়ে আসচে ভাষার স্বাধীনতাও তেমনি। বঙ্গদর্শনে সব প্রথম ঘেরাটোপ তোলা হয়েছিল। তখনকার সাহিত্যিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতরা সেই দুঃসাহসকে গঞ্জনা দিয়ে তাকে গুরুচণ্ডালী ব'লে জাতে ঠেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়ে সেই যে বাংলা ভাষার সহাস্য মুখ প্রথম একটুখানি দেখা গেল, তাতে ধিক্কার যতই উঠুক এক মুহূর্ত্তেই বাঙালী পাঠকের মন ভুলেছিল। তারপর থেকে দরজা ফাঁক হয়েই চলেচে।

প্রবন্ধের কথা থাক্। বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্চে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূরদিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্ব্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্যছবির প্রধান গুণ হচ্চে তার রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তার সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনীতে সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙীন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তার রস আছে।

কিন্তু নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্য্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি এক দামের জিনিষ নয়। সৌন্দর্য্যলোক থেকে এদের কাউকেই বর্জ্জন করা চলে না, তবু বলতে হবে ঐ জনপদের চেহারায় আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে কাহিনী ও কথা উভয়ের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো—নাও যদি থাকে তবে বস্তুপদার্থটার অভাব ঘটলে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছ্বাসটা চোখে দেখতে মানায়, কিন্তু সেটা ভোগে লাগে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী

যেন দৃঢ় অবলম্বন পায়নি—তাদের সাজসজ্জা আছে, কিন্তু পরিচয়পত্র নেই। তাবা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেচে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা, তারা বর্ত্তমানের সামগ্রী নয়, তারা যে-অতীতে বিরাজ করে, সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল-জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েযা জগৎসিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রভৃতিরা যা-খুশী তাই করতে পারে। কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চলতে হয় যে, পাঠকদের মনোরঞ্জনে ত্রুটি না ঘটে।

আরব্য উপন্যাসও কাহিনী, কিন্তু সে হ'ল বিশুদ্ধ কাহিনী। সম্ভবপরতার জবাবদিহি তার একেবারেই নেই। যাদুকর গোড়া থেকে স্পষ্ট করেই বলচে, এ আমার অসম্ভবের ইন্দ্রজাল, সত্য মিথ্যা যাচাই করার দায় সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের খুশী করব—যেখানে সবই ঘটতে পারে সেখানে এমন কিছু ঘটাব, যাতে তোমরা শাহাবজাদীকে বলবে, থেমো না, রাত্রের পর রাত্রি যাবে কেটে। কিন্তু যে-সব কাহিনীর কথা পূর্ব্বে বলেচি সেগুলি দো-আঁস্‌লা, তারা খুশী করতে চায়, সেই সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাস করাতেও চায়। বিশ্বাস করতে পারলে মন যে নির্ভর পায় তার একটি গভীর আরাম আছে। কিন্তু যে-গল্পগুলি বিশুদ্ধ কাহিনী নয় কাহিনীপ্রায়, তাদের মধ্যে মনটা ডুব-জলে সঞ্চরণ করে, তলায় কোথাও মাটি আছে কি নেই সে কথাটা স্পষ্ট হয় না, ধরে নিই যে মাটি আছে বইকি।

বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দ্দা উঠে গেল—ক্লাসিকাল অস্পষ্টতা বা রোমাণ্টিক অস্পষ্টতা অর্থাৎ ধ্রুপদী বা খেয়ালী দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুতকাহিনীর ছাঁদ। মনে পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা। তখন চোখে কম দেখতুম অথচ জানতুম না যে কম দেখি। ঐ কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক ব'লে জানতুম, কোনো নালিশ ছিল না। এমন সময় হঠাৎ চশমা পরে জগতটা যখন স্পষ্টতর হ'ল তখন ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয়বসন্তেও একদিন বাঙালী পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তারপরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভুতপূর্ব্ব দান। কিন্তু তখনও ঠিক চশমাটি সে পায়নি, তবু দুঃখ ছিল না, কেননা, জানত না যে সে পায়নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল। কৃষ্ণকান্তের উইল সেই জাতেরই, সে যেন আরও স্পষ্ট।

তারপরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্যে নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরবগর্ব্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার ক'রে বসল।

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যরসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক-এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক বা ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হয়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্য্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুঁট্‌কি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তাহ'লে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ঐ জিনিষটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চল্‌তি সেন্টিমেন্ট, সাহিত্যের পক্ষে কচুরি পানার মতই, তাদের জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন ক'রে দেয়।

আধুনিক য়ুরোপে এই দশা ঘটেচে,—সেখানে আর্থিক সমস্যা, স্ত্রী-পুরুষের সমস্যা, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব-সমস্যায় সমাজে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড চল্‌চে। লোকের মন তাতে এত বেশি প্রবলভাবে ব্যাপৃত যে, সাহিত্যে তাদের অনধিকারপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা দায়, নভেলগুলি গল্পেব মালমসলামাখা প্রবন্ধ

হয়ে উঠ্‌ল। এতে ক'বে সাহিত্যে যে স্তূপাকার আবর্জ্জনা জমে উঠেচে সেটা আজকের পাঠকদের উপলব্ধিতে পৌঁচচ্চে না, কেননা, আজ সাহিত্যের বাহিরের মাল নিয়ে তাদের মন ষোল-আনা ভর্ত্তি হয়ে রয়েচে। আরেক যুগে এই সব আবর্জ্জনা বিদায় করবার জন্যে গাড়িতে যমের বাহন মহিষ অনেকগুলো জুৎতে হবে।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টিস্টের, সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হচ্চে দেখানো, বিশ্বরসের পরিচয়ে আবরণ যত কিছু আছে তাকে অপসারণ করা। রসের জগতকে স্পষ্ট ক'রে মানুষের কাছে এনে দেওয়া, মানুষের একান্ত আপন ক'রে তোলা। সীতার বনবাস ইস্কুলে পড়েছিলেম। সেটা ইস্কুলেরই সামগ্রী। বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম ঘরে, সেটা ঘরেরই জিনিষ। সাহিত্যটা ইস্কুলের নয়—ওটা ঘরের। বিশ্বে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যেই সাহিত্য।

বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলের পর অনেক দিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প-সাহিত্যে আর একটা যুগ এসেচে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দ্দা উঠল। সেদিন যেমন ভিড় ক'রে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেচে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্ত্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় ক'রে জুগিয়েচেন সে হচ্চে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পূর্ব্বের চেয়ে পাঠকের আরও অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেচেন বিস্তৃত ক'রে, স্পষ্ট ক'রে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্ঘাটিত করেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চল্‌চে। একদিন তারা হয়ত সে কথা ভুল্‌বে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভোলে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয় তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে সেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি-পাওনা মাত্র; না জুটলেও নালিশ না করাই ভাল। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সব শেষে যাঁর পালা তিনি যদি-বা দলিলগুলোকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতরণীর ওপারে। *

২৭শে শ্রাবণ ১৩৩৮

---

* এই প্রবন্ধটি প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির অনুরোধে লেখা এবং তাঁহারা শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার আসন্ন জন্মদিনে যে পুস্তকখানি বাহির করিতেছেন তাহাতে প্রকাশিত হইবে।

১৩৪৪ ফাল্গুন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার বয়স মোটে ৬২ হইয়াছিল। সুতরাং আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া তিনি আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, বাঙালী পাঠকদের এই আশা ছিল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন সাহিত্যাচার্য্য উপাধি পান, তাহার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে অতঃপর তিনি বাঙালী মুসলমান সমাজকে অবলম্বন করিয়া কিছু উপন্যাস লিখিবেন। অনেকের সেইরূপ

উপন্যাস দেখিবার আগ্রহ ছিল।

তাঁহার ঔপন্যাসিক খ্যাতি যে ইউরোপে পৌঁছিয়াছে, তাহা এগার বৎসর পূর্ব্বে এদেশে জানা ছিল না। সেই সংবাদ প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে বাহির হয়।

১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রসিদ্ধ ফরাসী গ্রন্থকার রমাঁ্যা রলাঁর সহিত জেনিভার নিকটবর্ত্তী ভিল্‌নভ্ গ্রামে প্রবাসী-সম্পাদকের সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত মডার্ণ রিভিয়ুতে ইংরেজী "লেটার্স ফ্রম দি এডিটার"এ এবং প্রবাসীতে "সম্পাদকের চিঠি"তে বাহির হয়। ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত সম্পাদকের ৮ নং চিঠিতে লেখা হইয়াছিল, "আমরা অবগত হইলাম, রলাঁ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের ইটালীয় অনুবাদ পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, শরৎচন্দ্র এক জন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তিনি আর কি কি বহি লিখিয়াছেন। আমি বলিলাম।" (প্রবাসী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২৫০)।

শরৎবাবুর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় কখন হয় নাই, কিন্তু আমি তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিতও ছিলাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসম্মান লইবার জন্য যখন তিনি ঢাকা যান, আমাকে তখন একটি কাজে ঢাকা যাইতে হইযাছিল। সেই সময় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার ছাত্র অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ছিলেন। ঐ বাড়ীতে এক দিন অনেকের নিমন্ত্রণ হয়। আচার্য্য রায় ও শরৎবাবু উপস্থিত ছিলেন। আমিও ছিলাম। শরৎবাবু প্রথম কি প্রকারে আচার্য্য রায়ের নিকট পরিচিত হন, তখন গল্প কবিয়াছিলেন। তাহা আমার অস্পষ্ট মনে আছে। শরৎবাবু বলিলেন, অনেক বৎসর আগে (যখন বোধ হয় তাঁহার চুল পাকে নাই এবং বয়স বাস্তবিক যাহা তাহা অপেক্ষা কম দেখাইত), তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে আচার্য্য মহাশয়ের নিকট লইয়া যান। রায় মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পড়াশুনা কি কর?" (আচার্য্য মহাশয় বোধ হয় তাঁহাকে পোস্ট-গ্রাডুয়েট কোন ক্লাসের ছাত্র মনে কবিয়াছিলেন)। এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎবাবু জানাইলেন যে তিনি পড়াশুনা কিছুই করেন না। তাহাতে আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "এর মধ্যেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ?" তখন শরৎবাবুর যে বন্ধু তাঁহাকে আচার্য্য মহাশয়ের নিকট লইযা গিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ইনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" তাহা শুনিয়া আচার্য্য রায় তাঁহার যে যে বহি পড়িয়াছেন তাহার সম্বন্ধে নিজের মত বলিতে লাগিলেন।

শরৎবাবুর সহিত আমার এক বার মাত্র কিছু দীর্ঘ কথোপকথন হইয়াছিল। তাহা লিখিয়া রাখি নাই, এবং আমার স্মৃতিশক্তি আগেকার মত নাই। সামান্য কিছু মনে আছে। তিনি ঢাকা হইতে উপাধি লইয়া ফিরিবার পথে যে ষ্টীমারে আসিতেছিলেন, আমিও সেই ষ্টীমারে আসিতেছিলাম। তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন হইতে গল্প করিতে আসিলেন। একটি যুবক তাঁহার মাকে সঙ্গে লইযা কলিকাতায় তাঁহার ভাইয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন। ভাইটির কোন বৈপ্লবিক অভিযোগে কারাদণ্ড হইয়াছিল। শরৎবাবু বৈপ্লবিক সহিংস কার্য্যে সংশ্লিস্ট যুবকদের খুব একটা বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের জন্য খুব উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহারা যাহাতে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের নদী বাহিয়া সেই অঞ্চলের অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ লক্ষ্য করিতে করিতে চিন্তাশীল

হিন্দুরা আসিলে তথায় হিন্দুর আপেক্ষিক সংখ্যা যে কমিতেছে তাহা স্বতই মনে হয়। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন চিন্তা হইতে কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু যুবক-যুবতীদের বিবাহ কঠিনতর হইতেছে, এই কথাও উঠে। তাহা হইতে কথাটা এই দিকে গড়ায় যে আজকাল বিবাহিত দম্পতিদের আগেকার মত বহু সন্তানসন্ততি হয় না। তাহার নানা কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিলাম, 'সভ্য' সমাজে সন্তানসংখ্যা হ্রাসের কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ও বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা তাহার প্রচার শরৎচন্দ্র নিন্দনীয় মনে করিতেন।

জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানার স্বতন্ত্র অট্টালিকা বিচিত্রা নামে পরিচিত। সেখানে আগে মধ্যে মধ্যে সাহিত্যিক আলোচনা হইত। একবার মুসলমানী বাংলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহাতে শরৎবাবুও তাকিয়ার উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় এক পায়ের উপর এক পা তুলিয়া দিয়া দু'একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা কি, সামান্য মনে আছে। কিন্তু ঠিক মনে-না থাকায় লিখিলাম না।

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাদির সমালোচনা

জনৈক ভদ্রলোক (তাঁহার নামধাম বর্ত্তমান নিবাস বলিব না) আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের পাপসাহিত্যের পাপরহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়া কতকগুলি ধারাবাহিক সমালোচনা যদি লিখি তবে আপনি আপনার প্রবাসী পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন কিনা দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।" তাঁহার মতে এরূপ সমালোচনা লেখা কেন আবশ্যক, সে-বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিব না। তিনি আত্মপরিচয়দান-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে আছে যে, "ব্রহ্মবিদ্যা" পত্রিকায় তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছে, এবং "ভারতবর্ষ" ও "বসুমতী"তেও তাঁহার লেখা বাহির হইয়াছে।

পত্রলেখক মহাশয় আমার পরিচিত নহেন। তাঁহার চিঠি হইতে বুঝিলাম তিনি হিন্দু সমাজের লোক। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি মাসিকের কোনটিতে তিনি শরৎ-সাহিত্যের প্রতিকূল সমালোচনা পাঠাইলে তাহার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার লেখা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপ্রসূত মনে করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহার চিঠির উত্তরে চিঠি লিখিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা না করিয়া "প্রবাসী"তেই এ বিষয়ে আমার বক্তব্য জানাইতেছি; কারণ তাহাতে এরূপ বিষয়ে আমার মত সমালোচনেচ্ছু অন্য লেখকেরাও জানিতে পারিবেন।

শরৎবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহা আমরা ছাপি নাই। ছাপিলে, আমরা সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার নিন্দা রটাইতেছি, এই অপবাদ রটিত, এবং সমালোচনার সত্যতা-অসত্যতা নির্দ্ধারণে তাহাতে

বাধা জন্মিত। সেই কারণে এখনও প্রতিকূল সমালোচনা ছাপিব না। উল্লিখিত পত্রলেখক মহাশয় যখন তিনটি মাসিকে লিখিয়া থাকেন, তখন তাঁহার অভিপ্রেত ধারাবাহিক সমালোচনা ঐ কাগজগুলির কোনটিতে প্রকাশ করিলে, যদি তাঁহার সমালোচনা সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা বাস্তবিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পাঠকদের সেরূপ বাধা জন্মিবে না যেরূপ বাধা জন্মিবে "প্রবাসী"তে প্রকাশ করিলে।

শরৎবাবুর কোন কোন বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের না-ছাপিবার আর একটি কারণ এই যে, তাঁহার যে-যে বহির নিন্দা আমরা শুনিয়াছি সে বহিগুলি বাস্তবিক নিন্দনীয় কি না প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাহা বলিতে পারি না, কারণ সেগুলি আমরা পড়ি নাই।

১৩৪৪ সালের ২০শে চৈত্র তারিখের "যুগান্তর" কাগজে শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটির প্রধান বিষয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাহার শেষ অনুচ্ছেদ এই :—

"কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না, তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছেই পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারল না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনাশোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয় নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজ বৌ, রামের সুমতি, বড়ো দিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা এই কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে শরৎ বাবুর যে-যে বহির নিন্দা শোনা যায়, কবি তাহার একখানাও পড়েন নাই।

আমাদের মনে হয়, শরৎ বাবুর গ্রন্থগুলির ঠিক্ সমালোচনার সময় এখনও আসে নাই। তাঁহার কোন একখানা বহি সম্বন্ধেও আমাদের কোন জ্ঞান নাই, এমন নয়। কিন্তু আমরা স্বয়ং তাহার কোন সমালোচনা করিব না, অন্যের সমালোচনাও ছাপিব না।

অবশ্য, তিনি কিংবা তাঁহার প্রকাশকেরা তাঁহার কোন বহি সমালোচনার জন্য যদি পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহা সমালোচিত হইত।

কষ্টিপাথর—শরৎচন্দ্র

১৩৩৫ পৌষ

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের মধ্যে এখনও অনেকের মনে হয়—বাংলা কথা-সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবটা যেন একটু আকস্মিক। এক বিষয়ে যে আকস্মিক তাতে সন্দেহ নেই, সে বিষয়ে তিনি অনন্যসাধারণ। একান্ত নিভৃত-নির্জ্জনে তাঁর সাধনা শেষ করে, তিনি একেবারে তাঁর পূর্ণসিদ্ধির ফলটি আমাদের হাতে তুলে দিলেন। সে যে কত বড় বিস্ময় তা, যাঁরা সেদিনের লোক, তাঁরা আজও স্মরণ

কর্‌বেন। কিন্তু আর একটা বিস্ময়ের কারণ আজও রয়েছে। একথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, তাঁর উপন্যাসগুলিতে জীবনের যে দিকটি যেমন করে' ফুটে উঠেছে, তাতে ভাব ও চিন্তার যে বৈশিষ্ট্য আছে—বাঙ্গালীর পক্ষে যে কঠোর আত্মজিজ্ঞাসার তাগিদ আছে, তাতে আমাদের হৃদয় যেমন উন্মুখ হয়ে ওঠে, মন তেমনি সঙ্কুচিত হয়; আমাদের চিরদিনের সংস্কারে আঘাত লাগে, নিরুদ্বেগ আত্মপ্রসাদের হানি হয়। যাঁরা রসিক তাঁরা এত বিচলিত হন না, তাঁরা সেটুকু পরম আগ্রহে দ্বিধাশূন্য হয়ে উপভোগ করেন, বাস্তবের দিকটা অনায়াসে অতিক্রম করে' যান। কিন্তু যাঁদের মধ্যে শাস্ত্রসংস্কার প্রবল হয়ে রয়েছে, সেই সংসারপ্রবীণ জনমণ্ডলী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পড়ে' যতটা অভিভূত হন, ঠিক ততটাই লেখকের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন। বাংলা-সাহিত্যে এতদিন যে ধরণের ভাবকল্পনা ও আদর্শের চর্চ্চা হয়ে আসছিল, এ যেন তার বিপরীত। এ বিপ্লবের কি প্রয়োজন ছিল? জীবনের বাস্তব দিকটা নিয়ে এমন নাড়াচাড়া করবার —তাকে আবার এমন রসোজ্জ্বল করে তোলবার এই দুর্ম্মতি কেন? শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এই মৌলিক প্রবৃত্তি এখনও সন্দেহ ও সংশয়ের হেতু হয়ে রয়েছে। আমাদের জীবনের জীর্ণভিত্তির তলদেশে, অন্ধকার গহ্বরে, যে সকল প্রেতমূর্ত্তি পিপাসার্ত্ত হয়ে এক বিন্দু জল প্রার্থনা কর্‌ছিল, শরৎচন্দ্র তাদেরই সেই রুদ্ধ আর্ত্তনাদ আমাদের কর্ণগোচর করে' দিয়েছেন; আমরা এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখন কতকটা বুঝতে পারছি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটি যেন একটা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হয়েছে। এই আপাতবৈষম্যের মূলে কোনও সত্য আছে কি না, আমাদের সাহিত্যের ভাবধারার ক্রমবিকাশে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় স্বাভাবিক কিনা, তারি কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

বঙ্কিমের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কথা-সাহিত্য ভাবপ্রধান; অর্থাৎ কল্পনা ও ব্যক্তিগত ভাবদৃষ্টির প্রসারই যেন এ সাহিত্যে বেশি। বঙ্কিম খাঁটি আদর্শবাদী, তাঁর উপন্যাসগুলিতে অতি সাধারণ জীবনযাত্রার উপরেও একটি অবাস্তবরমণীয় কল্পনার ছায়াপাত হয়েছে। কতকগুলি চরিত্র, ঘটনা ও অবস্থান (Situation)কে সেই কল্পনার উপযোগী করে তার মধ্যে লেখক নিজের মনোমত আদর্শ ও সাহিত্যিক রসপিপাসা চরিতার্থ করেছেন। এজন্য তাঁর উপন্যাসের প্লটরচনায় কৃতিত্বের পরিচয় আছে। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি ঠিক নভেল নয়—গদ্য-রোমান্স; ভাষা, ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে পাঠককে স্বপ্নাতুর করে' তোলে। তাঁর উপন্যাসগুলি পড়বার সময় মনের রাশ একটু আল্‌গা করে' রাখতে হয়; কেবল মাত্র সেই রস উপভোগ করার জন্যেই যদি সেগুলি পড়া যায় তবে তার ভিতরকার সেই গভীর সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, passion ও emotion-এর আবেগ এবং একটি অপ্রাকৃত কল্পনার মোহে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। বঙ্কিমের এই Idealism বাঙ্গালীর মনোহরণ করেছিল, Shakespeare-এর নাটক ও Scott-এর Romance পড়ে এককালে বাঙ্গালীর প্রাণে যে রসের ক্ষুধা জেগেছিল তা' বঙ্কিমই কতকটা তৃপ্ত করেছিলেন। সে-কালের কাব্যগুলিতেও এমন খাঁটি সাহিত্যরস ছিল না —কাব্য, নাটক ও উপন্যাস, এই ত্রিবিধ সাহিত্যের রস ওই একজনই এক পাত্রে পরিবেশন করেছিলেন।

এই ধরণের রুচি ও রস পুরানো হয়ে না আস্‌তেই—বরং, যখন পুরোমাত্রায় বঙ্কিমের যুগই চল্‌ছে—সেই সময় এলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় গোড়া থেকেই ভাবকল্পনার একটা নূতন অভিব্যক্তি দেখা গেল। এখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির উল্লেখ না করে', বাংলা কথা সাহিত্যে যেগুলি তাঁর প্রতিভার সবচেয়ে সুন্দর ও মৌলিক সৃষ্টি, সেই 'গল্পগুচ্ছে'র কথা মনে রাখলেই হবে। বঙ্কিমের ভাবুকতা যে বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে রসের সন্ধান করেছিল, রবীন্দ্রনাথের Idealism সেই বাস্তবকেই

এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত করেছে। যে কল্পনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা Subjective সে কল্পনার রঙে যা অতিশয় সাধারণ ও সুপরিচিত, এমন কি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র —তা'ই অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে, বাস্তবের মধ্যেই লোকোত্তর চমৎকার বিস্ময়রসের সঞ্চার হয়েছে। বাস্তবের সেই অতি-পরিচয়ের আবরণখানি তুলে ধরে বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করাই তাঁর কল্পনার মূল প্রবৃত্তি। সে কল্পনা বস্তুকে একেবারে রূপান্তরিত করে, অথচ মনে হয় সেইটিই যেন তাঁর একমাত্র সত্যকার রূপ। যে আনন্দে কবি এই অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করেছেন তার মূলে কোন্ প্রেরণা ছিল তা কবিই বলেছেন—

মাথাটি করিয়া নীচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে',
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে'।
ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্ত্তির ধূলা
কত ভাব কত ভয় ভুল—
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মত—
ক্ষণ অশ্রু ক্ষণ হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমিষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ নিশার।

এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল প্রেরণা। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, এ Idealism কত বড় —কত দুরূহ! পৃথিবীর ধূলামাটিকে সোনা করে' তোলা, মানুষের সাধারণ সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে, বিশ্বসৃষ্টির যে রহস্য তারি অন্তর্ভুক্ত করে' দেখা এ ত' সোজা Idealism নয়। এ কল্পনার সঙ্গে দেশের লোকের এখনও ভালো করে' পরিচয় হয় নি। এর প্রভাব আকস্মিক হতে পারে না —রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছে খুব ধীরে। বঙ্কিমের কল্পনা সূর্য্যাস্তশেষ বর্ণগরিমার মত আমাদের মনের আকাশে যে সৌন্দর্য্যরাগের আয়োজন করেছিল, তারই অন্তরালে, শুক্লসন্ধ্যার অস্ফুট চন্দ্রালোকের মত রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অলক্ষিতে আমাদের মনকে অধিকার করেছে। এ আলোক যে কখন কেমন করে' গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠল, কখন যে সে আলোকে পথের উপর আমাদের ছায়া গভীর হয়ে উঠল, সে আমরা জানতেই পারিনি! এ রূপের মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই, কোনো উত্তেজনা নেই—নিশীথরাতের দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্নার সঙ্গে শুধু একটি স্বপ্নের ঘোর ঘনিয়ে ওঠে। বাস্তবের সঙ্গে যেন কোথাও কোনো বিরোধ নেই —সকল কর্কশতা ও রূঢ়তা একটি গভীরতর চেতনার আশ্বাসে যেন লুপ্ত হয়ে যায়। বাস্তবের মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য্য রয়েছে সেইটুকুই সত্য, অথবা তার যতটুকু সত্য ততটুকুই সুন্দর —বাকিটুকু মিথ্যা, মিথ্যা ব'লেই দুঃখকর। এই ভাবদৃষ্টি, এই আনন্দবাদ, এই সত্যসন্ধান বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় দান। কিন্তু এ ত' সকলের পক্ষে সহজ নয়। যে কল্পনায়, ছোট-বড়, সুন্দর-কুৎসিত, সুখ-দুঃখ—সবই একটা নিগূঢ় ঐক্যবোধের আনন্দে সমান হয়ে দেখা দেয়, তাকে আত্মসাৎ করা একটা বিশেষ Culture বা সাধনার অপেক্ষা রাখে। তবু এই কল্পনার জাদুশক্তি সজ্ঞানে স্বীকার না করলেও অনেকের প্রাণে একটা নূতনতর স্বপ্নের আবেশ লেগেছে। মানুষের সম্বন্ধে কোনো কিছুই উপেক্ষার যোগ্য নয়, সত্যকার জগৎকে

অস্বীকার করে' বৈরাগ্য সাধন বা কোনো অপ্রাকৃত কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যে ঠিক নয়, এমনি একটা ভাব মানুষের মনে ক্রমশই স্থান পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের দূরারোহিনী কল্পনার ঊর্দ্ধশাখায় যে ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটে উঠল তার সবটুকু শোভা সকলের চোখে ধরল না বটে, কিন্তু সেই ফুলের বীজ নিম্ন ভূমিতে একটি নূতন রূপে অঙ্কুরিত হ'ল। শরৎচন্দ্রের সুনিভৃত সাধনার পরিচয় আগে কেউ পায়নি, তাই হঠাৎ যখন দেখা গেল, একেবারে পথের ধারেই লতাগুল্মের বেড়াগুলি এক নতুন ধরণের ফুলে ভরে' উঠেছে। তার বর্ণ ও গন্ধ যেমন চমক লাগায়, তেমনি অতি সহজে প্রাণমন অভিভূত করে—তখন আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ যেন ভাবকল্পনার বস্তু নয়, একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব; এ যেন চিরদিনের দেখা জিনিষ, অথচ এমন করে কখনো দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন সাহিত্যগগনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করেছে, তখন সেই রবীন্দ্রালোকিত মহাদেশের একপ্রান্তে একটা নতুন আলো বিচ্ছুরিত হ'ল, নিথর নিবিড় জ্যোৎস্নাকাশের এক কোণে বিদ্যুৎ-শিহরণ শুরু হ'ল।

যে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিব্যবস্থার বশে, বাঙালীর জীবনে আত্মত্যাগের মহিমা ও স্বার্থরক্ষার দৈন্য, এই দুয়েরই বেদনা করুণ হয়ে উঠেছে—যে tragedy কোনো অতিমানুষ নাটকীয় tragedyর থেকে কিছুমাত্র কম নয়, তাকেই তিনি সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত করলেন। তিনি জীবনকে খুব বিস্তৃত করে' দেখেননি, কিন্তু যেটুকু দেখেছেন গভীর করে'ই দেখেছেন—সে গভীরতা ততটা কল্পনার নয়, যতটা অনুভূতির। এই সহানুভূতি যেখানে যতটুকু, পৌঁছতে পেরেছে ততটুকুই তাঁর কল্পনার প্রসার। সমাজ যে পাপে জর্জ্জরিত হয়েও তাকে স্বীকার করে না —আত্মঘাতীর সেই ব্যথাকে শরৎচন্দ্র তাঁর নিজেরই হৃদয়ের রঙে রঞ্জিত করেছেন। তিনি যা দেখেছেন বিনা সঙ্কোচে তার সবটুকুই প্রকাশ করেছেন; সবটুকু প্রকাশ না করলে যে সে ব্যথার পরিমাণ করা যাবে না। অসহায় শক্তিহীন সমাজের এই ব্যথাকেই তিনি বড় করে' দেখেছেন, তাদের মতন অসহায় ভাবে তিনি নিজেও সেই ব্যথা ভোগ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তা, অনেক ভাবনা করেছেন বটে, কিন্তু কোথাও বিচার করতে বসেন নি। তিনি দুঃখের কোনো দার্শনিক মীমাংসা করতে চাননি, তার বাস্তব রূপটির ধ্যান করেছেন—চোখে দেখা এবং গভীর করে' অনুভব করা, এই হ'ল তাঁর কল্পনার উৎস।

রবীন্দ্রনাথ যে বাস্তবকে অন্তরের আলোকে উজ্জ্বল করে' তুলেছেন শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবকে বাইরের দিক থেকেই হৃদয়ের নিকটতর করে' দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় যে ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের পরিধি সীমাহীন হয়ে আনন্দঘন শান্তরসের উদ্বোধন করে, শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক কল্পনায় সুখ দুঃখের সেই সীমারেখা কোথাও হারিয়ে যায় না—ব্যথার ব্যথাটুকু শেষ পর্য্যন্ত জেগেই থাকে। এই অনুভূতির সঙ্গেই তাঁর মানসবৃত্তি জেগে ওঠে, কিন্তু তাঁর সেই চিন্তাগুলিকে কোথাও বস্তুনিরপেক্ষ, abstract ideaর ভাবনা বলে মনে হয় না। অমাবস্যার রাত্রে নির্জন শ্মশানে বসে শ্রীকান্তের সেই ধ্যান—'অন্ধকারের একটা রূপ আছে'—পড়তে পড়তে মনে হয়, এখানে শরৎচন্দ্র বুঝি নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছেন; কিন্তু তার মধ্যে নিছক ভাবকল্পনা নেই, একটা অত্যন্ত বাস্তব অনুভূতির emotion আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সৃষ্টির মর্ম্মস্থলে একটা অব্যভিচারী রসবস্তুর সন্ধান করেছে—সে কল্পনা সকল বস্তুরই সেই এক রসপরিণাম উপলব্ধি করেছে। এই ভাবকল্পনার প্রভাবে শরৎচন্দ্রের অনুভূতিকল্পনাও যেন একটু জোর পেয়েছে; তাই নীলাম্বরের মত নিরক্ষর গাঁজাখোর পল্লীসন্তানের মধ্যেও রসের উৎকৃষ্ট উপকরণ সন্ধান করতে তাঁর সাহসের অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর ভাষার মধ্যেও রয়েছে। তথাপি তাঁর ষ্টাইল যেমন মৌলিক তাঁর কল্পনাও তেমনি নিজস্ব। এইজন্যই তাঁদের দুজনের দুই বিভিন্ন কল্পনা প্রকৃতি তুলনা করে' দেখাবার মত ঠিক একই ধরণের গল্প খুঁজে পাওয়া শক্ত। তবু আমি

যতটা সম্ভব চেষ্টা করে' দেখব। শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গল্পের সেই মেয়েটির অবস্থা রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের রতনের অবস্থার সঙ্গে যেন একটু মেলে। রতনের দুঃখ যেন সমস্ত আকাশে বাতাসে ব্যাপ্ত হয়ে গেল, তার মধ্যে মানব ভাগ্যের চিরন্তন tragedyর ছায়া পড়েছে। সে দুঃখ যেন ভাবের শাশ্বত-লোকে একটি পরম পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। অরক্ষণীয়ার মধ্যে সে ধরণের ভাবুকতা নেই; তার মধ্যে যে দুঃখের বর্ণনা আছে, সে ঠিক সেই ব্যক্তি ও সেই অবস্থার মধ্যেই কঠিন ও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে জেগে রইল, কোনো একটি ভাবলোকে সমাপ্তি লাভ করলে না। এখানে কাব্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতিই তাঁকে উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছে। চন্দ্রনাথ উপন্যাসের সেই 'কৈলাসখুড়া' ও 'দাদু'র কথা বাংলার গল্প-সাহিত্যে অতুলনীয়। ঐ উপন্যাসখানির শেষের দিকে এই যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে, তার প্রভায় মূল-কাহিনী ম্লান হয়ে গেছে। একি শুধুই বাস্তবের তীব্র অনুভূতি? কত বড় রস-কল্পনার প্রমাণ এই চিত্রটি! এর সঙ্গে একদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটির তুলনা করা যায়। কাবুলিওয়ালার ব্যথা বিশ্বজনীন হয়ে এক অপূর্ব্ব রসের সৃষ্টি করেছে বটে, তবু মনে হয় শরৎচন্দ্রের করুণ রস যেন আরও গভীর, আরও উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয়ী ভাবকল্পনা বাঙালীকে রসের অতি উর্দ্ধলোকে বিচরণ করবার অধিকার দিয়েছে। এই সত্যকে তিনি পৃথিবীর ধুলামাটির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সীমাকে অসীমের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র এই ধরণী ও ধরণীর ধূলামাটিকে তেমন করে দেখেননি—তিনি বিশ্ব বা প্রকৃতি, কাউকেই ভক্তি করবার অবকাশ পান নি। তাঁর নিজের সমাজে তিনি যে জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই তিনি গভীর বর্ণে চিত্রিত করেছেন, আর কিছুর ভাবনা তিনি করেননি। তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবতাটুকুই গ্রহণ করেছেন, বিশ্বমানবতা বা বিশ্বপ্রাণতার দিক দিয়েও তিনি যাননি।

কিন্তু তাই বলে' শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক বা Realist নন! তিনিও একজন বড় দরের Idealist। অতি নিম্নশ্রেণীর জীবন-যাত্রা, এমন কি সমাজ-বহির্ভূত জীবনকে তিনি তাঁর কল্পনায় স্থান দিয়েছেন অথবা অনেক বাস্তব দুঃখের চিত্র এঁকেছেন বলে'ই তিনি Realist নন। বরং তাঁর হৃদয়ের আবেগ এতই বেশি যে, কোন কিছুকেই তিনি ঠিক তার মতনটি করে' দেখতে পারেননি—ঢের বড় করে' দেখেছেন।

মানুষের দুঃখ তিনি যেটুকু দেখেছেন তার চেয়ে বেশি করে' উপলব্ধি করেছেন—এই উপলব্ধি করার মধ্যে যে শক্তি আছে সেইটাই তাঁর কল্পনাশক্তি। যিনি প্রকৃত Realist তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করেন, এজন্যে, সুন্দরের চেয়ে কুৎসিত দিকটা, ভাবের চেয়ে অভাবের দিকটা, আত্মার চেয়ে অনাত্মার দিকটাই তাতে বেশি করে' ফুটে ওঠে। তার মধ্যে লেখকের নিজের কোনও অভিপ্রায় বা ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে না। এইটি মনে রাখলেই শরৎচন্দ্রকেই কেউ Realist বলবেন না। প্রমাণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রগুলিই ধরা যাক। শরৎচন্দ্রের যত কিছু নিন্দা-প্রশংসা এই গুলিকে নিয়েই। এই নারী-চরিত্রই বাংলার সকল বড় বড় ঔপন্যাসিকের একটি শক্তি-পরীক্ষার স্থল। বাংলা উপন্যাসে নারী-চরিত্রগুলিই যা একটু বৈচিত্র্যময়, পুরুষ-চরিত্রগুলা নাকি তেমন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির সম্বন্ধেও Thompson সাহেব এই কথাই বলেছেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের দেশে নারীর মধ্যেই একটু শক্তির পরিচয় আছে, তাই গল্পে উপন্যাসে নারী-চরিত্রের একটু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তবু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই উভয়ের মধ্যে, এ বিষয়ে, বরং বঙ্কিমের কল্পনাই একটু বাস্তব-ঘেঁসা; রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্র সর্ব্বত্রই একটা আদর্শ কল্পনায় অনুরঞ্জিত, তাদের সম্বন্ধে তাঁরই কথায় বলা যেতে পারে—"অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।" আমাদের সমাজে নারীর যে শক্তির কথা বলেছি, শরৎচন্দ্র ঠিক সেইটির সন্ধান পেয়েছেন, তাই তাঁর

কল্পনাও বাস্তবের অনুকূল হয়েছে। তিনি আমাদের মেয়েদের মধ্যে সেই একটি মহিমা লক্ষ্য করেছেন—দুঃখ সহ্য করিবার অসাধারণ শক্তি। 'অন্নদাদিদি'কে দেখে নারীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যে এক বিষয়ে নিঃসংশয় হন,—সেটা উপন্যাস নয়, খুব সত্য কথা। কিন্তু একথা ত শুধুই আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধেই খাটে না, নারীমাত্রেরই প্রকৃতিতে এই passive শক্তি নিহিত রয়েছে। নারী-বিদ্বেষী Schopenhauerও বলেছেন, "She pays the debt of life not by what she does but by what she suffers." নারী-জীবনে এই নিয়তি শরৎচন্দ্রকে বিশেষ করে' অভিভূত করেছে, তার কারণ আমাদের সমাজের নারীর এই নিয়তি সর্ব্বত্র জাজ্জ্বল্যমান। যে সমাজে পুরুষের পৌরুষ প্রায় নির্ব্বাপিত, ভীরু দুর্ব্বল স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাই বেশী, সেখানে নারীকেই যে পুরুষের সকল অত্যাচার, সকল পাপের বোঝা বইতে হয়। এই সমাজের অন্ধতম গহ্বরে শরৎচন্দ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন—সেখানে নারীর সেই ক্রুশবিদ্ধ অবস্থা তাঁর প্রাণে অপরিসীম সহানুভূতির উদ্রেক করেছে, তাই তিনি Son of Manএর পরিবর্ত্তে Daughter of Womanএর মহিমা এমন করে কীর্ত্তন করেছেন।

আমার মনে হয়, যে-অপূর্ব্ব ভাবুকতা ও Lyric sentiment শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে একটি গীতি-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেছে নারী-জীবনের এই দুঃখ-কল্পনাতেই তার জন্ম। এব থেকেই তাঁর কল্পনা গভীর ও ব্যাপক হয়ে উঠেছে। কিন্তু নারীচরিত্রের এই একটি দিক তিনি বিশেষ করে' দেখেছেন বলে', এবং সেইটিকেই কেন্দ্র করে তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস গড়ে' উঠেছে বলে', তাঁর কল্পনার মণ্ডলটি কিছু সংকীর্ণ। প্রত্যক্ষ বাস্তব অনুভূতির দ্বারাই তাঁর কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে' তাঁর দৃষ্টি যেমন গভীর, সৃষ্টিশক্তি তেমন প্রচুর নয়। বাস্তব অনুভূতি ও Subjective কল্পনা এই দুয়ের পূর্ণ মিলন হয়েছে বলে'ই, তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে তাঁর শক্তির এমন পবিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। এই উপন্যাসখানির গঠনে ও পরিকল্পনায় অতিশয় স্বাধীন আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটেছে, বাস্তব অনুভূতি ও স্বকীয় কল্পনার বিরোধ এখানে নেই। তাই এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের Idealism এমন অপূর্ব্ব কাব্য সৃষ্টি করেছে।

আমাদের কথাসাহিত্যে এ পর্য্যন্ত Idealismই জয়ী হয়ে এসেছে। বঙ্কিমের কল্পনায় ছিল একটা বড় Idealএর sentiment, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real ও Idealএর সমন্বয় চেষ্টা আছে। শরৎচন্দ্রের কল্পনায় আছে Realএর একটা Emotional প্রতিরূপ। বঙ্কিমের কল্পনায় Real একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, সে ছিল সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ; রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় Real রূপান্তরিত হয়েছে, তার Realityই যেন লোপ পেয়েছে; শরৎচন্দ্রের কল্পনায় এই Realএর সমস্যা ঘোরালো হয়ে উঠেছে—Realএর জন্যে একটা প্রবল আবেগের সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্রিধারায় আমাদের সাহিত্যের Idealism বোধ হয় নিঃশেষ হয়ে এল। অতঃপর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, শাদা চোখে Realএর সঙ্গে বোঝাপড়া করাই হবে তাব একমাত্র প্রেরণা।

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৩৫

[এটি মোহিতলাল মজুমদারের লেখা
—সংকলন-সম্পাদক]

১৩৪৬ শ্রাবণ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব প্রণীত "সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ৭৯ ও ৮০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দেখিলাম।

" 'প্রবাসী' পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র প্রবাসীতে লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে, তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক ক'রে যেন পূর্ব্বাহ্নে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত করলে তবেই সে উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হবে,—এ সর্ত্তে শরৎচন্দ্র নিজেকে অপমানিত করতে রাজী হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে 'প্রবাসী'তে রচনা পাঠাতে তাঁকে বারংবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই 'প্রবাসী'তে কখন কোন রচনা দেন নি।"

ইতিপূর্ব্বে (১৩৪৬ সালের ২৩শে আষাঢ়ের পূর্ব্বে) এই বহিখানি ও ইহাতে লিখিত এই কথাগুলি আমি দেখি নাই। এই জন্য ইতিপূর্ব্বে এগুলির প্রতিবাদ করি নাই। ২৩শে আষাঢ় ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎ বাবুকে কস্মিন্ কালেও 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশও করি নাই। সুতরাং, "তিনি যা লিখবেন আর একটি চুম্বক ক'রে পূর্ব্বাহ্নে" আমাকে পাঠাইতেও কখনও বলি নাই।

রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পরে বারংবার নিষেধ করেন, ইহা আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। সেই জন্য, এই খবর সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কবিকে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিত তাঁহার চিঠিটি নীচে মুদ্রিত হইল।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমাব আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?

৯।৭।৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই কাল্পনিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, 'প্রবাসী'তে শরৎবাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহারা উপন্যাসের চুম্বক পূর্ব্বাহ্নে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিত বোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষুণ্ণ হওয়া, এবং শরৎবাবুকে রবীন্দ্রনাথের, একবার নয়, "বারংবার" 'প্রবাসী'তে লিখিতে নিষেধ করা—সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব, এইখানেই ইতি।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা
১৩৪৬ ভাদ্র
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও "প্রবাসী"

স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রচনা কেন যে প্রবাসী পত্রিকায় কখনও প্রকাশিত হয় নাই, এ সম্বন্ধে আমার 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখিলাম আপনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং পূজনীয় কবি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত একখানি পত্রও উহার সমর্থনে (১) মুদ্রিত করিয়াছেন। 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক হিসাবে এ বিষয়ে আমার একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, সুসাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুত হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মারফৎ এক খণ্ড পুস্তক প্রবাসীতে সমালোচনার জন্য আপনাকে পাঠানো হইয়াছিল। (২) কিন্তু উহার কোনও সমালোচনা বা প্রতিবাদ সে সময়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় নাই। হইলে একটা সুবিধা আমার এই হইত যে, প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী বন্ধুবর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে কিছু সত্যের আলোকপাত করিতে পারিতেন। কারণ, প্রবাসীর পক্ষ হইতে লেখার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করা এবং রচনার চুম্বক চাওয়া সম্পর্কে আমি শরৎচন্দ্রের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, চারুচন্দ্রের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইয়াছিল। শরৎচন্দ্রের জীবনীতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু সত্য এবং প্রকৃত ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। প্রবাসী-সংক্রান্ত এই ব্যাপার যে শরৎচন্দ্রের আরও একাধিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আত্মীয় ও অন্তরঙ্গগণও তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলেন, এই সঙ্গে প্রেরিত প্রমাণপত্রখানি হইতে আপনি তাহা নিঃসন্দেহ রূপে অবগত হইতে পারিবেন। (৩) এবং ইহাও বুঝিতে আপনার অসুবিধা হইবে না যে 'শরৎচন্দ্র ও প্রবাসী' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া জানিয়া ও বুঝিয়াই লিখিয়াছি। 'সর্ব্বৈব মিথ্যা' বা 'কাল্পনিক' কিছুই

লিখি নাই।

কিন্তু, শ্রাবণের প্রবাসীতে আপনি যাহা বলিয়াছেন এবং পূজনীয় কবি যাহা লিখিয়াছেন, উহা পড়িয়া স্বতঃই মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, তবে কি আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কোথাও কিছু গলদ আছে? জীবনীকারের কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমি এ-সম্বন্ধে যাঁহাদের নিকট হইতে সত্যনিরূপক তথ্য কিছু পাওয়া সম্ভব এরূপ কয়েক জনের সহিত ইতিমধ্যেই সাক্ষাৎ করিয়াছি। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল এবং তাঁহার প্রথম ও শেষ জীবনের দুঃখসুখের সঙ্গী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যিনি শরৎচন্দ্রের একখানি সুবৃহৎ জীবনী রচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তিনি বলেন প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষ চুম্বক দেখিতে চাহেন বলিয়া শরৎকে চারুচন্দ্র যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং শরৎ এই ঘটনা কবিকে জানাইলে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া শরৎকে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, এই দুইখানি চিঠিই তিনি স্বয়ং দেখিয়াছিলেন। তবে, তাঁহার মনে হয় ইহা হয়ত চারুচন্দ্র নিজের দায়িত্বে করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আপনি এ-সম্বন্ধে কিছু না জানিতেও পারেন। (৪)

আমি কিন্তু চারুচন্দ্রের জামাতা শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাবাজীবনের নিকট সংবাদ লইয়া জানিলাম যে তিনি এবং চারুচন্দ্রের পুত্রকন্যাও চারুচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছেন যে শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসীর কর্ত্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। (৫)

অতঃপর আমি শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট যাই। তিনি বলেন, প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে এই সেদিনও পর্য্যন্ত একাধিক বার দাদাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। (৬) কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সামতাবেড়ের বাড়ীতে রামানন্দবাবুর পুত্র অশোকবাবু, জামাতা কালিদাস নাগ মহাশয় এবং প্রবাসীর তদানীন্তন এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় দাদার নিকট প্রবাসীর জন্য লেখা চাহিতে আসিয়াছিলেন। (৭) দীর্ঘকাল আমাদের উঁহারা প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু কাগজ দুইখানি বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক দাদাকে লিখিত অনেক পত্রই আমাদের সামতাবেড়ের বাড়ীতে আছে। আমি এক দিন সময়মত সেখানে গিয়া সেগুলি খুঁজিয়া দেখিব। এ সম্পর্কে লিখিত কবির পত্রখানি যদি পাই, আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম-এ, যিনি ভূতপূর্ব্ব 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কর্ণধারস্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বঙ্গবাণীতে দীর্ঘকাল ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনিও এ-ঘটনা সমর্থন করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠিতে'ও এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। সুতরাং এ-সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা নির্ণয় একটা জটিল ও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূজনীয় কবির চিঠির মধ্যেও একটি লাইনে একটু যেন গোল রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যাপারটা যে সময়ের, শরতের সঙ্গে তখন আমার আলাপ ছিল না।" কিন্তু ব্যাপারটা যে কোন্ সময়ের আমার গ্রন্থে তাহার কোথাও কোন উল্লেখ নাই। কারণ, শরৎচন্দ্র কোন সন তারিখ বা নির্দ্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া আমাদের কাছে উহা বলেন নাই। তাই মনে হয় আপনার পত্র পড়িয়া কবি সম্ভবতঃ কোথাও কিছু বুঝিতে ভুল করিয়া থাকিবেন। কবিকে লিখিত আপনার পত্রখানি এই প্রতিবাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিলে এ সমস্যার হয়ত কতকটা নিরসন হইতে পারিত। (৮) যাহা হউক, এ-সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য আমি শীঘ্রই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিব। বহুদিন পূর্ব্বের এই এক তুচ্ছ ঘটনা বহুকার্য্যে-ব্যাপৃত কবির স্মৃতি হইতে অপসৃত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এবং ইহাও আমি অসম্ভব মনে করি না যে প্রবাসী-সংক্রান্ত এ-ব্যাপারটা হয়ত আপনার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান আবশ্যক। উহার পরে যদি

সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ রূপে জানিতে পারি যে এ ব্যাপার প্রকৃতই সত্য নহে, তবে নিশ্চিত জানিবেন, 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহা স্থান পাইবে না। আপনার মন্তব্যের মধ্যে দেখিলাম আপনি এ সম্বন্ধে কিছু সত্য পরিজ্ঞাত আছেন এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ পরলোকগত বলিয়া তাহা বলিতে বিরত হইয়াছেন। আমার মনে হয় আপনার এ-যুক্তি ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণের সত্যসন্ধানে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। উহা প্রকাশ করিয়া বলাই বোধ হয় সঙ্গত। (৯) ইতি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসী পত্রিকার স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রচনা কখনও প্রকাশিত হয় নাই কেন, এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব-প্রণীত 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, শরৎচন্দ্রের মুখ হইতে এই ঘটনার অবিকল (১০) এইরূপ ইতিহাস আমরাও শুনিয়াছিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ (অধ্যাপক, গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুল)

সুধীরচন্দ্র সরকার (সম্পাদক, মৌচাক)

শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক, 'বিচিত্রা')

শ্রীঅবিনাশ ঘোষাল (সম্পাদক, 'বাতায়ন')

এই পাঁচ জন ভদ্রলোকই স্বর্গীয় শরৎচন্দ্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের প্রতিবাদটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে লিখিবার সুবিধার নিমিত্ত আমি উহার কোন কোন স্থানে একাদি সংখ্যা বসাইয়া ছাপিয়াছি। সংখ্যাগুলি মূল প্রতিবাদে নাই।

গোড়াতেই একটি কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানি এই প্রসঙ্গে শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপিয়াছি, তাহার এই বাক্যটি তিনি পরে বাদ দিতে লিখিয়াছিলেন : "ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না।" কিন্তু তাঁহার সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দের এতদ্বিষয়ক পত্র যখন আমার হস্তগত হয়, তখন শ্রাবণের প্রবাসী বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহা বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথের সেই আদেশের উল্লেখ করিলাম।

(১) নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের যে প্যারাগ্রাফটিতে আলোচ্য বিষয়টির বিবৃতি আছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষ ভাবে লিখিত থাকায় আমাকে তাঁহার চিঠি তাঁহার অনুমতি লইয়া ছাপিতে হইয়াছে। নতুবা তাঁহার নাম এরূপ ব্যাপারে আমি জড়িত হইতে দিতাম না।

(২) নরেন্দ্র বাবুর এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ আমি পাই নাই ও দেখি নাই। প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক মহাশয়েরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ বহি তাঁহাদিগকে কেহ দিয়াছিলেন বা তাঁহারা উহা দেখিয়াছিলেন বলিয়া

তাঁহাদের মনে পড়ে না। নরেন্দ্র বাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইবার পর আমি উহার দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি বহি কিনাইয়া আনাইযাছিলাম।

(৩) নরেন্দ্র বাবু যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন, কল্পনা করিয়া বা বানাইয়া কিছু লেখেন নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে কোনই বাধা নাই। সাক্ষীদিগকে ও আমাকেও অবিশ্বাস করি না!

(৪) চারু বাবু শরৎবাবুকে কিছু লিখিয়াছিলেন কি না, সে-বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ও বলিতে পারি না। যদি তিনি চুম্বক চাহিয়া থাকেন, নিজের দায়িত্বে চাহিয়া থাকিবেন; "প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ" অর্থাৎ সম্পাদক কখনও চুম্বক চান নাই।

এখানে আর একটি কথা বলা অনাবশ্যক হইবে না। চারুবাবুর যথেষ্ট সৌজন্য ও শিষ্টাচার বোধ ছিল। কাহাকেও নিজেই লিখিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকেই আবার আগাম চুম্বক পাঠাইতে বলা খুব শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া মনে করিবার মানুষ চারুবাবু ছিলেন না, তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণা এইরূপ।

(৫) "শরৎচন্দ্রের রচনা প্রবাসীতে প্রকাশের সমস্ত ব্যবস্থাই তিনি [চারুবাবু] করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবাসীর কর্তৃপক্ষের জন্য তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়", একথা আমি এই প্রথম শুনিলাম; আগে জানিতাম না। প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ ও মডার্ণ রিভিয়ুর কর্তৃপক্ষ এক। মডার্ণ রিভিয়ুতে সেই কর্তৃপক্ষ "বিন্দুর ছেলে"র অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিল, অথচ প্রবাসীতে শরৎবাবুর কোন লেখা, পাইবার সব বন্দোবস্ত হওয়া সত্ত্বেও, সেই কর্তৃপক্ষই ছাপিতে রাজী হয় নাই, ইহা তথ্য বলিয়া মানিতে হইবে দেখিতেছি।

এই কর্তৃপক্ষ আরও দুই একটা কাজ করিয়াছিল। যেমন—

যখন শরৎ বাবুর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়, তখন মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাহার প্রতিবাদ যুক্তিসহকারে করা হইয়াছিল। এই প্রতিবাদের শেষ প্যারাগ্রাফে ছিল :—

"It will help our readers to understand the position of Babu Sarat Chandra as an author if we tell them that at Villeneuve, Switzerland, M. Romain Rolland told us in the course of our conversation with him that he had read the Italian translation of the English translation of Sarat Chandra's *Srikanta*, and he observed that the author was a novelist of the first order. As M. Rolland does not read or speak English, he had to form his judgment of Sarat Chandra's quality as a novelist from a translation of a translation; yet that was his opinion. But some underling of the Bengal Government has scented sedition in one of Sarat Chandra's works and so it is a book dangerous to society! Or is it to the bureaucracy?" — *The Modern Review* for February, 1927, p. 261.

ফরাসী মনীষীর সহিত আমার কথোপকথনের এই অংশ জেনিভা হইতে প্রেরিত ও ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত সম্পাদকের চিঠিতেও বাহির হইয়াছিল। সেই প্রসিদ্ধ বিদেশীর কাছে শরৎবাবুর কোন গ্রন্থের এই আদরের কথা ইহার আগে বঙ্গে বোধ হয় কেহ জানিত না।

কোন লোকের কাছে লেখা চাওয়া দোষের বা লজ্জার বিষয় নহে। আমি শরৎবাবুর কাছে লেখা চাহিয়া থাকিলে তাহা অস্বীকার করিতাম না।

শরৎবাবুর মৃত্যুর কিছু পরে চারুবাবু তাঁহার সম্বন্ধে প্রবাসীতে একটি প্রবন্ধ দেন এবং তাহার প্রুফও তিনি দেখেন। (শরৎ বাবুর বন্ধু ও ভক্তদের মতে) বিশেষ গুরুত্ববিশিষ্ট এই বিষয়টির কোনই উল্লেখ ঐ প্রবন্ধে নাই। "বিশেষগুরুত্ববিশিষ্ট" এই জন্য বলিতেছি যে, তাঁহারা বলিতেছেন তাঁহারা অনেকেই জানিতে চাহিয়াছিলেন শরৎবাবুর লেখা প্রবাসীতে কেন বাহির হয় নাই।

(৬) "প্রবাসীতে লিখিবার জন্য চারুচন্দ্রের আমোল হইতে" শরৎবাবুকে একাধিক বার অনুরোধ যদি একাধিক ব্যক্তি করিয়া থাকেন, তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। আমি কখনও তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই, অন্যের দ্বারাও অনুরোধ করাই নাই।

(৭) নরেন্দ্র বাবু শরৎবাবুর ভ্রাতা প্রকাশবাবুর কথা উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমান্ কালিদাস নাগ প্রভৃতির সামতাবেড়ে শরৎবাবুর বাড়ী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা গিয়াছিলেন ইহা ঠিক্। কখন্ ও কি জন্য গিয়াছিলেন, তাহা আমি তাঁহাদের যাইবার আগে ও ফিরিয়া আসিবার পরেও জানিতে পারি নাই। সুতরাং তাঁহারা আমার কোন শিষ্টাচারসম্মত নমস্কারসম্ভাষণাদি লইয়া যাইতে পারেন নাই, কোন অনুরোধ ত লইয়া যানই নাই।

১৯২৭ সালের জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে শরৎবাবুর সহিত কালিদাস প্রভৃতির সাক্ষাৎকারের একটি সচিত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে, কিন্তু সাক্ষাৎকারের তারিখ নাই। তাহাতে শরৎবাবুকে কোন প্রকার অনুরোধ করার কথা নাই। লেখাটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১লা প্রকাশিত জানুয়ারী সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে থাকায় বোধ হইতেছে সাক্ষাৎকার ১৯২৬ সালের কোন সময়ে হইয়া থাকিবে। নবেম্বরে হইয়া থাকিলে আমি তখন ভারতবর্ষে ছিলাম না। লীগ অব নেশ্যন্স দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া যে জেনিভা গিয়াছিলাম, সেই বিদেশযাত্রা হইতে ১৯২৬ সালের ৩০শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসি।

শ্রীমান্ কালিদাসকে এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, এক যুগ কাটিয়া যাওয়ার পর সেই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা সম্ভবপর নহে —যতটা তাঁহার মনে পড়ে তিনি জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা গোকুলচন্দ্র ও তিনি অনেক দিন হইতে শরৎচন্দ্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। কালিদাস ১৯২৩ সালের শেষে বিলাত হইতে ফিরিবার পর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে শরৎচন্দ্র দুঃখ প্রকাশ করেন যে, তাঁহার গ্রন্থাদির ভাল অনুবাদ না হওয়ায় পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে তাঁহার যথোচিত আদর হইল না। ১৯২১-২৩ সালে ইটালী ভ্রমণকালে কালিদাস অধ্যাপক জি. তুচ্চি ও অধ্যাপক বি. ফিল্লিপীর সহিত শরচ্চন্দ্রের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং 'বলাকা'র ফরাসী অনুবাদ শেষ হইলে ফিল্লিপী কালিদাসকে তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়া শরৎবাবুর কিছু গল্প অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু নানা কারণে কালিদাস ইহার ভার লইতে পারেন নাই। কিন্তু শরৎবাবু তাঁহার সঙ্গে এই অনুবাদ-প্রসঙ্গ একাধিক বার করিয়াছিলেন এবং তিনি শরৎবাবুকে জানান যে শ্রীমান্ অশোক অনুবাদ ভাল করেন ও তৎকৃত অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে ছাপা হইতে পারে, এবং এই কাগজের মারফতে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের বাহিরে বহু সাহিত্যসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। কালিদাস প্রভৃতি সামতাবেড়ে গেলে শরৎচন্দ্রের সৌজন্যে ও আতিথ্যে যে মুগ্ধ হন তাহার প্রমাণ মডার্ণ

রিভিয়ুতে প্রকাশিত ও উপরে উল্লিখিত এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধে আছে। শরৎবাবু অশোককে 'বিন্দুর ছেলে' অনুবাদ করিতে বলেন। কালিদাস আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন যে প্রবাসীতে লেখা দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সাহিত্যাচার্য্য শরচ্চন্দ্রের কোন কথা হয় নাই।

মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসী যে দীর্ঘকাল শরৎবাবুকে নমস্কার করিতে যাইত, তাহার কারণ 'বিন্দুর ছেলে'র অনুবাদ তিনি 'মর্ডাণ-রিভিয়ু'তে প্রকাশ করিতে দিয়াছিলেন, এবং আমি তাহার কোন আর্থিক প্রতিদান করি নাই।

(৮) রবীন্দ্রনাথকে আমি যে চিঠি লিখিয়াছিলাম তাহাতে নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকের আলোচ্য প্যারাগ্রাফটি উদ্ধৃত করিয়া আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে কবি কখনও শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কি না, এবং ঐ প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত কারণে তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া শরৎবাবুকে প্রবাসীতে লিখিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন কি না। তাঁহার উত্তর আদ্যোপান্ত শ্রাবণের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে।

তিনি যে চিঠিখানি দ্বারা উক্ত পত্র ছাপিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, নীচে তাহাও প্রকাশ করিতেছি।

ওঁ

"Uttarayan"
Santiniketan,
Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার চিঠি ছাপতে পারেন, আপত্তি নেই। জানাতে পারেন শরৎ কখনো কোনো বিষয়েই আমার পরামর্শ চান নি, আমিও তাঁকে উপদেশ দিই নি। ইতি ১১/৭/৩৯

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৯) আমি "জনশ্রুতি"টির উৎপত্তি সম্বন্ধে আগে যে কারণে কিছু লিখি নাই, এখনও সেই কারণে কিছু লিখিব না।

(১০) নরেন্দ্রবাবু কতকগুলি ভদ্রলোকের সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। কারণ, আমি আসামী, আমার কথা নির্ভরযোগ্য না হওয়াই বোধ করি আইনসঙ্গত।

কিন্তু অনেকের ইহা জানিবার কৌতূহল হইতে পারে যে, সাক্ষীরা দল বাঁধিয়া কোন এক দিন কোন এক সময়ে নরেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে করিয়া সকলে একত্র শরৎবাবুর নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে নরেন্দ্রবাবুর পুস্তকে নিবদ্ধ কথাগুলি "অবিকল" বলিয়াছিলেন; না, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একা একা গিয়া "অবিকল" ঐ কথাগুলি শুনিয়াছিলেন। ইহাও জানিতে কৌতূহল হইতে পারে যে, তাঁহারা শরৎবাবুর কথাগুলি শুনিবামাত্র "অবিকল" টুকিয়া রাখিয়াছিলেন কি না। আমি দেখিয়াছি, অনেক রিপোর্টার যে-বক্তৃতা, শুনিতে শুনিতে, তৎক্ষণাৎ লিখিয়া লন, তাহার রিপোর্টও ক্বচিৎ "অবিকল" ঠিক হয়, ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টারের রিপোর্ট কিছু ভিন্ন ভিন্ন হয়, "অবিকল" এক হয় না, এবং আমরা প্রতিভাহীন লোকেরা একই ঘটনার বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করিলে বর্ণনার খুঁটিনাটি ও ভাষায় কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

আমার পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতি

কার্য্যতঃ ইহাই বলা হইতেছে—যদিও তিনি এখনও নিজের জীবনের বহু কথা বলিতেছেন, এবং জড়বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ বহি লিখিতেছেন। ভুলিয়া যাওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কিন্তু বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই তাহা সম্ভব অথবা নিশ্চিত—নরেন্দ্রবাবু সম্ভবতঃ ইহা বলিবেন না, কিন্তু তাঁহার প্রতিবাদ পড়িলে এরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

অবশ্য, আসামী ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর সকলের কথাই যে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, ইহা সন্তোষের বিষয়। কারণ, আমাদের দেশে যাঁহাদের কথা নিঃসংশয়ে মানিয়া লওয়া যায় এবং যাঁহাদের স্মৃতিশক্তি সাতিশয় বলবতী, তাঁহাদের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষ্যে কিছু বলা অনাবশ্যক। তিনি জানেন, ইহা গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী যুগ। এখন পাটীগণিতের প্রাধান্য যতটা স্বীকৃত হয়, কোন প্রকার বৈয়ক্তিক বৈশিষ্ট্য ও অসাম্য সেরূপ স্বীকৃত হয় না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৬।

পুঃ। প্রবাসীর নিয়ম অনুসারে এ বিষয়ে আর কোন বাদপ্রতিবাদ প্রবাসীতে ছাপা হইবে না।

র. চ.

অন্য সাহিত্যিকগণ

১৩১১ ফাল্গুন

অক্ষয়কুমার দত্ত

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার পিতৃদেবে*র প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। এক সময়ে তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের বিবিধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে পিতৃদেব মেদিনীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় যাত্রা করিলে তাঁহার সহিত অক্ষয় বাবুর সর্ব্বদাই পত্রব্যবহার চলিত। অক্ষয়কুমার পিতৃদেবকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহার অনেকগুলি অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ঐ সকল পত্র হইতে অক্ষয়কুমারের জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায়, তাহাই এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত হইল।

বন্ধুত্ব।

আমার পিতৃদেব অসাধারণরূপে বন্ধুপরায়ণ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে যত লোকের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রায় তাঁহাদের সকলকেই তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় পরলোকগত বন্ধুগণের একটী তালিকা করিয়াছিলেন; মধ্যে মধ্যে তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহাদিগের সকল কথা চেষ্টা পূর্ব্বক স্মৃতিপথে আনয়ন করিয়া গতজীবনে অনুভূত বন্ধুত্বজনিত আনন্দে মগ্ন হইতেন। কলিকাতায় অবস্থিতি কালে, একজন বন্ধুর সহিত চল্লিশ বৎসর বিচ্ছেদের পর শুনিলেন তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন, পূর্ব্ব আলাপ পরিচয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্তু সে লোকটীর সে সকল কথা কিছুই স্মরণ হইল না। পিতৃদেব তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ক্ষুব্ধ মনে চলিয়া আসিলেন। বন্ধুর সহবাসে তিনি অপরিসীম আনন্দলাভ করিতেন। অনুপস্থিত বন্ধুগণের সহিত পত্রযোগে আলাপ করিয়া পরম সুখী হইতেন। বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তৎসমস্ত পাঠ করিতেন। যাঁহার এরূপ গভীর বন্ধুত্ব ভাব ছিল, যৌবন কালে অক্ষয়কুমারের ন্যায় গুণবান, সুধী বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া তিনি যে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অক্ষয়বাবুর পত্রগুলি দেখিলে বোধ হয় পিতৃদেব তাঁহাকে যেসমস্ত পত্র লিখিতেন যে সকল পত্র প্রণয়, শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব ভাব পূর্ণ। উত্তরে অক্ষয়কুমার গভীর বন্ধুত্ব ভাবব্যঞ্জক যে সকল পত্র লিখিতেন, উদাহরণ স্বরূপ সে সকল পত্রের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—"মধ্যে মধ্যে আপনাকে স্মরণ হইয়া অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অনেক দিন আর আপনার সহিত সদালাপ করিতে পারি নাই। আপনার তপস্যার কুশল, শরীরের কুশল, আশ্রমের কুশল, ব্যবসায়ের কুশল লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার 'ছোট্ট খাট্ট' ব্রাহ্মসমাজটি কেমন আছে? আপনার চতুষ্পাঠীর শিষ্যগুলি কেমন শিখিতেছে? গত দুই মাসের পত্রিকা তো পাঠ করিয়াছেন? তাহা আপনার মনোগত হইয়াছে কি না? আপনার মনঃপূত হইয়াছে কি না? এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্র রহিলাম।"

"আপনকার প্রেমার্দ্র পত্র প্রাপ্ত হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম এবং অমনি আপনকার আনন্দোৎফুল্ল উৎসাহকর মুখশ্রী এবং ত্রিভঙ্গাভঙ্গিম কোমল কলেবর আমার অন্তঃকরণে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল। যেন আপনি সমাজের সোপান দ্বারা আগমন পূর্ব্বক সহসা আমাকে দর্শন দিলেন। দূর হইতে প্রণয় পবিত্র মিত্রের স্বহস্তলিখিত কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষা অধিকতর মধুর ব্যাপার আর কি আছে? যতক্ষণ আপনকার পত্র বাবস্মার

* স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু।

পাঠ করিলাম, ততক্ষণ আপনার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম।"

"আপনকার প্রণয়রসাভিষিক্ত সানুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হইলাম এবং তন্মধ্যে আপনকার প্রেমময় ভাব মূর্ত্তিমান দেখিয়া আর্দ্র হইলাম।"

"বহুদিবসের পর আপনার অনুগ্রহসূচক পত্র প্রাপ্ত হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম। আপনকার সহিত সাক্ষাৎ হইবার বিষয় স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। এতদিন তো আপনকার সাক্ষাৎকার ঘটিল না, কতদিন পরে কিরূপে ঘটিবে তাহাও বলিতে পারি না। এ সংসারের বিষম ব্যাপার মনে হইলে সংসারের প্রতি ঐকান্তিক বিরক্তি উপস্থিত হয়।"

"গত বৎসর কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, তথাপি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সুখী হইতে পারি নাই। এ বৎসর তো আসাই হইবে না, সুতরাং আশাই রহিল না। ইহাতে যে পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম তাহা বলিবার নহে। আর কত বৎসর পর্য্যন্ত যে আপনার সহিত সহবাস ও সদালাপজনিত অতুল আনন্দ অনুভব করিবার উপায় হইবে না তাহা কি বলা যায়? সংসারে কখন্ কি প্রকার ক্লেশ ঘটনা না হইতে পারে?"

"কি কথাই লিখিয়াছেন, আপনার সহিত কত কালই সাক্ষাৎ হয় নাই। আরও কত কাল হইবে না কি বলিতে পারি! এ কথা স্মরণ হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির করা যায় না।"

"আপনার লিখিত ২৯ অগ্রহায়ণের অনুগ্রহপত্র পাইয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইলাম। আপনি তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে যে অনুপম, অনির্ব্বচনীয় বন্ধুবাৎসল্য রস প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপমা দিবার স্থল নাই। অবনিমণ্ডলে এতাদৃশ বন্ধু একজন থাকিলেও সকল সন্তাপ শীতল হইয়া যায়।"

পিতৃদেবকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্রগুলির প্রারম্ভে বন্ধুতাব্যঞ্জক যে সকল পাঠ দেখা যায় তাহা হইতেও উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা উপলব্ধি হয়। "পরম প্রণয়াস্পদ মিত্র বরেষু" "প্রিয়তমেষু" "সোদরপ্রতিমেষু" "প্রণয়াম্বিত বিনয়সম্বলিত নিবেদনমিদং" "সপ্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন," প্রভৃতি বিভিন্ন প্রণয়সূচক সম্বোধনে তাহার সমস্তগুলিই আরব্ধ হইয়াছে।

নম্রতা।

লেখক ও গ্রন্থরচয়িতাদিগের একটা মানসিক ক্ষীণতা এই যে, তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের রচনা অতি উৎকৃষ্ট। স্বীয় সন্তান সন্ততি কুৎসিৎ হইলেও যেমন পিতা বা মাতা তাহাদিগকে সুন্দর দেখেন, অনেক গ্রন্থকারও তেমনি স্বরচিত গ্রন্থের দোষ দেখিতে পান না। আত্মম্ভরিতা গ্রন্থকারের একটা অবশ্যম্ভাবী দোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যাঁহারা স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন, যাঁহারা বিনয়গুণালঙ্কৃত, তাঁহারা লেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেও তাঁহাদিগকে এই অহঙ্কার স্পর্শ করিতে পারে না। অক্ষয়কুমার বঙ্গের বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যকারদিগের নেতাশ্রেণীভুক্ত হইয়াও অহঙ্কারী ছিলেন না; এ সম্বন্ধে তাঁহার যে সরল, বিনয়ভাব তাহা তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৮৫৪ সালের ১৪ই ফাল্গুনে লিখিত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন;—"আপনার স্নেহময় প্রীতিপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। এবারের সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা যে আপনার মনঃপূত হইয়াছে ইহা আমার শ্লাঘার বিষয়। আমার কোন রচনায় যাবৎ আপনারা সন্তোষ প্রকাশ না করেন, তাবৎ তাহা বিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতেই প্রত্যয় জন্মে না। "আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং।" পরন্তু অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও স্বদেশের দুববস্থা পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে স্থির থাকিতে পারে না। সে সময়ে মনের বেদনাসূচক দুই চারিটী ভাব কাহার হৃদয় হইতে উদ্গীর্ণ না হয়? এবং তদনুরূপ দুই চারিটী শব্দও বা কাহার রচনা দ্বারা উচ্চারিত না হইতে পারে?" এই বিনম্রতা অনেক গ্রন্থকারের আত্মম্ভরিতা ভাবের সহিত তুলনা করিলে কেমন সুমধুর বোধ হয়।

অক্ষয়কুমারের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি হইতেও

আমরা তাঁহার মহৎজনসুলভ বিনম্র ভাবের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই;—"পদার্থ বিদ্যা" সমাপ্ত হইলে, আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্র বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই, একে নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সঙ্কলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যা সাধ্য যত তাহা আপনার অবিদিত নাই; আবার এ দেশের যে প্রকার স্বভাব এবং আমাদের যেরূপ বলবীর্য্যহীন প্রকৃতি, তাহাতে এ সকল বিষয়ে কোন মতেই সাহস করা যায় না। সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, মনোমত কোন কার্য্য হইয়া উঠিল না।"

সহৃদয়তা।

অর্থহীন কিন্তু প্রীতিপ্রবণ, সহৃদয় লোকদিগের প্রধান কষ্ট এই যে, তাঁহারা অর্থাভাবে তাঁহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি ও দয়া সম্যক চরিতার্থ করিতে পারেন না। অক্ষয়কুমার এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। একটি পত্রের এক স্থলে তাঁহার এই কষ্ট এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন;—"আপনি দরিদ্র প্রজাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল হওয়া ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা। এ যাত্রা এইরূপ করিয়াই পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে হইল।"

মাতৃভক্তি।

অক্ষয়কুমার তাঁহার মাতৃ দেবীর মৃত্যুকাল-সন্নিকট প্রতীতি করিয়া লিখিয়াছিলেন;—"আমি শারীরিক এক প্রকার সুস্থ আছি। কিন্তু পরমারাধ্যা মাতা ঠাকুরাণীর চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে। বোধ হয় তাঁহার স্নেহময় মুখমণ্ডল আর অধিক দিন দেখিতে পাইব না। বোধ হয় এত দিন পরে আমার একান্ত অকৃত্রিম স্নেহ প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মূলিত হইল। যদিই তাহাই ঘটে, আপনকার রচিত, মধুরময়, শোকসংহারক প্রস্তাবটি পাঠ করিব।" এই "শোকসংহারক প্রস্তাব" আমার পিতৃদেবের রচিত ব্রাহ্মসমাজে পঠিত একটী বক্তৃতা। ঐ বক্তৃতা সংসারের অনিত্যতা ও ঈশ্বর প্রীতি বিষয়ক। ঐ বক্তৃতা রচনাপারিপাট্য ও হৃদয়স্পর্শীতা গুণে তৎকালে ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম অনেকের মধ্যে সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল।

রামমোহন-ভক্তি।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের যে গভীর শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি ছিল, তাহা তৎপ্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উক্ত মহাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি পাঠ করিলেই সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয়। ১২৮৫ সালের মাঘমাসের ৭ই তারিখে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণচিহ্ন স্থাপন উদ্দেশে কলিকাতায় এক মহতী সভা হয়। ঐ সভা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলে তাঁহার রামমোহন-ভক্তির অনুপমত্ব উপলব্ধি করিয়া মোহিত হইতে হয়;—"৭ই মাঘের সভার বিষয় পূর্ব্বে কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, সবিশেষ জানিবার উদ্দেশে আপনাকে পত্র লিখি লিখি মনে করিতেছি; আমার কর্ম্মচারীটি এখানে না থাকাতে লেখাইতে পারি নাই। ইতিমধ্যে আপনার অনুগ্রহপত্র পাইয়া যেন অমৃতাভিষিক্ত হইলাম। রামমোহন রায়ের একটি পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইবে শুনিয়া যত আহ্লাদিত হইলাম, আমার স্বসম্বন্ধীয় কোন প্রকার সম্পদেই আমাকে তত আহ্লাদিত করিতে পারিত না। খোলা তপ্ত থাকিতে থাকিতেই এ বিষয়ের উদ্যোগ করা হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক আর কিছু মাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। আপনি তদর্থে তৎপর আছেন সন্দেহ নাই। এবার এ বিষয়ের জন্য যে সভা হইবে তাহাতেই চাঁদার পুস্তক উপস্থিত করা হয় এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা। বাঙ্গালাদেশের কার্য্য বলিয়াই এত আশঙ্কা ও বিবেচনা করিতে হইতেছে। রামমোহন রায় সমগ্র ভারতবর্ষেরই পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। অতএব যদি এখানে উপস্থিত বিষয়ের জন্য আবশ্যকমত অর্থসংগ্রহ না হইয়া উঠে, তাহা হইলে

বোম্বাই প্রভৃতি অন্য অন্য প্রদেশেও তদর্থে চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ কি না ভাবিয়া দেখিবেন।"

"আমি ৭ই মাঘের সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, ইহাতে আপনি অত্যন্ত ক্ষোভ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই। কোন জনতাস্থলে গমন করিলে আমার মূর্চ্ছা ঘটিবার সম্ভাবনা, এই নিমিত্তই কোন সভাতে ও অন্য কোনরূপ জনতাস্থলে যাইতে পারি না। সভাস্থ হইব কি, গৃহমধ্যে নির্জ্জনে থাকিয়া উপস্থিত বিষয়ে আমার বারম্বার আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জন্মিয়া যেরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে, তাহা সহ্য ও সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।"

অক্ষয়কুমার যদি শেষ জীবনে সুস্থদেহে কর্ম্মঠ অবস্থায় থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রামমোহন রায়ের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য যে প্রাণপণ করিতেন, উপরোক্ত পত্র পাঠ করিলে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

অধ্যয়নশীলতা।

অক্ষয়কুমার সাতিশয় অধ্যয়নশীল ছিলেন। তিনি তাৎকালীন ইংরাজী ধর্ম্মসাহিত্য যে বহুলরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাঁহার এক পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়;—"আপনি যে যে ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তদ্ভিন্ন Leigh Hunt's Religion of the Heart, Fox on the Religious Ideas, Dick's Philosophy of Religion, Dick's Christian Philosophy, Turton's Natural Theology, Blair's Sermons, এই সমুদায় পুস্তকেও অনেক সদভিপ্রায় আছে। আমার বোধ হয় আপনি এ সমুদায় পাঠ করিয়া থাকিবেন।"

সুরসিকতা।

অক্ষয়কুমারের পত্রাবলীর নানা স্থলে তাঁহার সুরসিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিলাম। ১২৫৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় বহুদিবসব্যাপী প্রচণ্ড উত্তাপের পর বারিবর্ষণ হইলে, অক্ষয়কুমার সেই সংবাদটী প্রেরণ করিতেছেন;—"এবার অতিশয় স্নিগ্ধ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি। বৃত্রাসুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬, ৭ বৈশাখে রজনীযোগে অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা মেদিনী সুশীতল হইয়াছে। বৃত্রকে পরাভূত দেখিয়া পবনরাজও দেবরাজের সহকারী হইয়া সকল বায়ু সুস্থ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্রাসুর এখানে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে* গিয়া উদয় হয় এই আমার শঙ্কা হইতেছে। আপনি তাহার তথ্য সংবাদ লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আমার নিতান্ত প্রার্থনা সেখানেও ইন্দ্রদেবের জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হয় এবং অবিলম্বে আপনার শরীর সুস্নিগ্ধ হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হই।"

কোন বিষয়ের জন্য ছয়টী টাকা দানের অনুরোধ অক্ষয়কুমার এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন;—"আপনাকে মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য মুখচন্দ্রিমা পরিত্যাগ করিতে হইবেক।"

স্বপ্রণীত "উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন;—"আপনি উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা ভাগ সমগ্র পাঠ করিয়া উঠিয়াছেন শুনিয়া চমকিত হইলাম! ভাগ্যে তাহার মধ্যে দুই একটি oasis আছে, তাহা না হইলে আপনার কি উপায় হইত তাহা বলিতে পারি না।"

পিতৃদেব গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত হইয়া শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করাতে অক্ষয়কুমার তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,- "আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন লিখিবেন। শুনিলাম তথায় † মাথাঘোরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিছু মন্ত্র তন্ত্র করিবেন, যেন আপনার বাটীর ত্রিসীমায় না আসিতে পারে। ভয় কি? "বিষস্য বিষমৌষধং।" বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির উপর নির্ভর করিয়া বড় বাবু* আপনাকে অভয়দান দিয়া গিয়াছেন।

---

* অর্থাৎ মেদিনীপুরে।

† মেদিনীপুর।

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আপনি প্রাতঃস্নান করিবেন, ফলের জল পান করিবেন, ঊষা ও সায়ংকালের বায়ু সেবন করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন। আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন না।"

"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থ।

অক্ষয়কুমার প্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" পুস্তক অনুবাদ বলিয়া অনেকে উহার যথেষ্ট সমাদর করেন না, কিন্তু উহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের সেই প্রথমাবস্থার একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ মার্জ্জিত ভাষায় লিখিত হওয়াতে এবং বিবিধ সার উপদেশ ও তত্ত্বে পূর্ণ থাকাতে উহা বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর চরিত্র গঠনে সেকালে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তজ্জন্য উহা চিরদিন বাঙ্গালীর চক্ষে এক বিশেষ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া থাকিবে। অক্ষয়কুমার ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই; George Combe's Constitution of Man গ্রন্থের সারবত্তা এবং বঙ্গদেশে লোকশিক্ষা সম্বন্ধে উহার উপযোগীতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি উহা বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি আমার ৺পিতৃদেবকে লিখিয়াছিলেন;— "আপনি আমার পুস্তক প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম এবং মনে মনে আপনাকে সাধুবাদ করিলাম। ফলতঃ কুম্ব সাহেবের উক্ত গ্রন্থ যে যে ভাষায় লিখিত হউক না কেন, যে যে দেশে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপিত হইবে, সেই সেই দেশেরই বিশিষ্টরূপ উপকাব দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই।"

এই পুস্তক সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের পত্রাবলীতে আরও যে সকল কথা পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি,—"আমি আপনাকে বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ বিচার বিষয়ক যে পুস্তক খানি উপহার দিয়াছি তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। মেদিনীপুরস্থ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত কয়েকখান ঐ পুস্তক ক্রীত হইতে পারে কি না তাহার চেষ্টা দেখিলে যথেষ্ট উপকৃত হইব। যদি কোন সাহেবের নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব করিতে হয় তবে ২৩ মার্চ্চের Citizen পত্রে এ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই তাঁহাকে দেখাইবেন।" ইহার পরে লিখিত একখানি পত্রে লিখিত হইয়াছিল;—"শখ্ সাহেব এবং বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের নিমিত্ত দুই খানি "বাহ্যবস্তু" ডাকযোগে প্রেরণ করিলাম। আপনি অনেকগুলি পুস্তক উঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে যতগুলি পুস্তক মেদিনীপুরে প্রেরিত হইয়াছে, তৎসমুদায়েরই মূল্য প্রত্যেকে ২ দুই টাকা। কেবল শখ্ সাহেবের পুস্তকখানির মূল্য ১ ০ [এক টাকা বারো আনা]। বেলি সাহেবের পত্রে লিখিত ছিল, মেদিনীপুরস্থ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত যে কয়েক খানা বাহ্যবস্তু ক্রীত হয়, কার্ত্তিক বাবু তাহার মূল্য প্রদান করিবেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে এ কথা স্মরণ করিয়া দিবেন।" ইংরাজী ১৮৫২ সালের জুলাই মাসে লিখিত একখানি পত্রে লিখিত হইয়াছিল;—"মানব প্রকৃতি দ্বিতীয়ভাগ অল্পে অল্পে বিক্রয় হইতেছে। যাঁহারা প্রথমভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে অদ্যাপি দ্বিতীয়ভাগ ক্রয় করেন নাই। অনেকে প্রথমভাগ গ্রহণ করণার্থে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিয়দ্দিবস হইল বেলি সাহেব লিখিয়াছিলেন, মেদিনীপুরস্থ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত দ্বিতীয়ভাগ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় পত্র লিখিব। বোধ হয় বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।"

নিরামিষ ও আমিষ ভোজন।

নিরামিষ ভোজনের পক্ষে অক্ষয়কুমার স্বপ্রণীত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা তৎকালে মহা আন্দোলন উত্থিত করিয়াছিল এবং শুনা যায় অনেকেই নিরামিষভোজী হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে

অক্ষয়কুমারের একখানি পত্রে দেখিতে পাই;—"দুই তিন মাস হইল আমি মৎস্য মাংস গ্রহণ করি নাই, কিন্তু অদ্যাপি পরীক্ষার অবস্থা যাইতেছে। সুরাপান করা ত অভ্যাস নাই, কিন্তু সে বিষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হই নাই। আর শুনিয়াছেন এ তরঙ্গ অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্দ্ধমানের রাজা প্রায় তিন দিন পর্য্যন্ত মৎস্য মাংস ভক্ষণ করেন নাই লিখিয়াছেন। এক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, যদি তাহা আহার না করিলে কোন বিঘ্ন ঘটনা না হয়, তবে একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন। বিধবাদিগেরই জয়, কেবল আতপতণ্ডুল অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু আমাদের বড় বাবু সে ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ মৎস্য মাংস বর্জ্জিত না হইলে উপচিকীর্ষা বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ করা হয় না।"

যাঁহারা এই সময়ে মাংসাহার বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ অভ্যাস রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই পূর্ব্ব অভ্যাসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অক্ষয়কুমারই পবে পীড়িত হইয়া মাংসের ক্বাথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। উপরের উদ্ধৃত অংশ যে পত্র হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ১৮৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত হয়। ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে লিখিত একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার বলিতেছেন;—"আমি কি অশুভক্ষণে রোগের হস্তে পতিত হইয়াছি, কিছুতেই ইহার নিষ্কৃতি হইবার পথ দেখিতেছি না। আমি এমনি অসমর্থ যে হৃদয়াধিক প্রিয়তর মিত্রকেও পত্র খানি লেখাও আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দের ব্যবস্থানুসারে চলিতেছি। দুই বেলাই অন্ন ভোজন করি, তাহার মধ্যে এক বেলা মাংসের ক্বাথ ভক্ষণ করিয়া থাকি।" ইংরাজী ১৮৬৬ সালে বালি হইতে লিখিয়াছিলেন;—"আমি যত প্রকার ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে Exshaw's Brandy No 1, মকরধ্বজ, চতুর্ম্মুখ এই তিন প্রকার ঔষধ ও মাংসের ক্বাথ ব্যবহার করিযা কিছু উপকার বোধ হয়।" অপর এক পত্রে লিখিয়াছিলেন;—"আহারের বিষয়ে আমাব এক্ষণে অন্য কোন নিয়ম নাই, যাহা উপকারী বোধ হয় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। মৎস্য প্রত্যহই ব্যবহার করিয়া থাকি। আমার পীড়া উপস্থিত হইবার পর ২০/২৫ দিবস ক্রমাগত মাংস ভোজন করিয়াছিলাম, তাহাতে কিছু মাত্র উপকার বোধ না হইয়া শরীরের উষ্ণ ভাবই অনুভূত হইতে লাগিল। পরে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, উহা আহার করিবার পর দিবস উপকার বোধ না হইয়া শরীর গরমই বোধ হইত। এই নিমিত্ত উহা ত্যাগ করিয়াছি এবং এক্ষণে সেবন করিতেও শঙ্কিত হইতেছি।"

হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা।

অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইলেও, প্রতিভাশালী গ্রন্থকার ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি কলিকাতার হিন্দুসমাজভুক্ত অনেক প্রধান লোকের পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সে সময়কার হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন; তাঁহারই পৌত্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব যে অক্ষয়কুমারের একজন ভক্ত ছিলেন তাহা আমার পিতৃদেবকে লিখিত নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে জানা যাইতেছে;—"সোদরপ্রতিম। সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদনমিদং; শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের পৌত্র শ্রীযুক্ত কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া চলিলেন। ইনি আমার পরমাত্মীয় ও পরম স্নেহাস্পদ। আপনি ইঁহার প্রতি স্নেহ রাখিবেন ও প্রয়োজনানুসারে অনুকূলতা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। অধিক আর কি লিখিব।"

কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব মেদিনীপুরে প্রবাসকালে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত সম্বন্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয়কুমারের অত্যন্ত আত্মীয়তা ছিল। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের একদিকে শিষ্যস্থানীয় ছিলেন, অপর দিকে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার প্রতিভা গৌরবে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, অক্ষয়কুমার শিষ্য হইয়াও তাঁহার গুরুতুল্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "প্রভাকর" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। "প্রভাকর" সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার ১২৫৭ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে আমার পিতৃদেবকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—"প্রভাকর সম্পাদক আপনাকে একটী প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের সংবাদগুলি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ হইবেন, এবং আপনার নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকিবেন। ঝক্ড়া, মারামারি, ডাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি যত প্রকার সর্ব্বনাশের ব্যাপার আছে সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন, লিখিতে হইলে মনুষ্যের অমঙ্গল সমাচারই অধিক লিখিতে হইবে। এই সকলই লোকের কার্য্য। ইহাই মর্ত্ত্যলোকের স্বরূপ! এ লোকে আবার নিরবচ্ছিন্ন সুখের প্রত্যাশা!"

মোক্ষমূলারের সহিত পত্রব্যবহার।

১২৯১ সালের ভাদ্রমাসে অক্ষয়কুমার অধ্যাপক মোক্ষমূলারের নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পত্রে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। রাজা রামমোহন রায়কৃত তোহফতুল্ মোহদীন্ নামক পারসীক গ্রন্থের এক প্রতিলিপিও প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। পিতৃদেবের সহিত এই বিষয় লইয়া অক্ষয়কুমারের পত্রব্যবহার হইতে থাকে। ইহা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে;—"আপনার অনুগ্রহপত্র ও তোহাফতুল্ মোহদীনের শেষ প্রুফ এক দিবসেই প্রাপ্ত হইয়া প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি, ঐ প্রুফ শ্রীমান্ মূলরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার বন্ধুর লোকের দ্বারা উল্লিখিত পার্সী গ্রন্থের প্রতিলিপি করাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে তাহাও আমি ভট্টজির নিকট যত্নপূর্ব্বক প্রেরণ করিব। উক্ত তোহফ্তুল্ মোহদীন্ নামক পারসীক পুস্তক খানি কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে প্রকাশিত হয়, আপনি যদি কিছু জানেন লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন।"

কতকগুলি বিষয়ে অভিমত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি দেশের পক্ষে হিতকর ইহা অক্ষয়কুমারের দৃঢ় ধারণা ছিল। ইংরাজী ১৮৫১ সালে লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই;—"তথাকার বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকালয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহা অতি শুভসূচক বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তদর্থে নূতন নূতন গ্রন্থ অনুবাদিত বা রচিত হইলে বহু উপকার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বেলি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন তাহা লিখিতে অবশ্য বহু পরিশ্রম হইবে, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের বিস্তর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। এক্ষণে এই সকল কার্য্য দ্বারাই এ দেশের যথার্থ হিত হইতে পারে।"

বিধবাবিবাহ প্রচলন।

বিধবাবিবাহ প্রচলন সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার উৎসাহবান ছিলেন। এই বিষয় লইয়া বঙ্গদেশে যখন ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল, তখন অক্ষয়কুমার আমার পিতৃদেবকে লিখিয়াছিলেন;—"আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবাবিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্টিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আলস্য করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেও ত্রুটি করিবেন না। জয়োস্তু! জয়োস্তু!"

শিক্ষাপ্রণালী।

গবর্ণমেন্ট ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি অক্ষয়কুমারের শ্রদ্ধা ছিল কি না তাহা অনেকেরই জানিবার কৌতূহল হইতে পারে। পিতৃদেব প্রচলিত-শিক্ষা প্রণালীর কোন কোন পরিবর্ত্তন বা সংস্কারের প্রস্তাব করেন, এবং মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সেই সকল প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার প্রস্তাব সমূহ অগ্রাহ্য করেন। অক্ষয়বাবুর লিখিত একখানি পত্রপাঠে জানা যায় যে, পিতৃদেব অক্ষয়বাবুকে ঐ সকল প্রস্তাবের মর্ম্ম অবগত করান এবং তাঁহার প্রস্তাব সমূহ যে অগ্রাহ্য হইয়াছে তাহাও জানান। অক্ষয়কুমার এই বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই; "আপনি ছাত্রদিগের পাঠপরিবর্ত্তন বিষয়ে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষেরা স্বয়ং শিক্ষাদানের উত্তম প্রণালী সংস্থাপন করিবেন না এবং অন্য কোন পরহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি তদ্বিষয়ে কোন উত্তম প্রস্তাব উত্থাপন করিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। বড়ই দুঃখের বিষয়!"

ব্রাহ্ম বিবাহ ও যৌন বিবাহ।

পিতৃদেব তাঁহার কোন আত্মীয়ার সহিত অক্ষয়কুমারের পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; "আপনি যে মনোহর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু এ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যেরূপ নিগ্রহভোগ করিবার সম্ভাবনা তাহা এক্ষণে আমার এই অশক্ত শরীরে সহ্য করা নিতান্ত অসাধ্য বোধ হইতেছে। আর আমার পুত্রের ক্ষমতাদির বিষয় যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে এক্ষণে তাহার বিবাহ দেওয়া কোনরূপে শ্রেয়স্কর নহে। এই দুই কারণে আমি আপনকার মনোহর প্রস্তাবে সম্মত হইতে অসমর্থ হইলাম।"

অক্ষয়কুমারের এই কথাগুলি পাঠে মনে হয় যে, তিনি ব্রাহ্মমতে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এবং ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইলে তাহার বিবাহ দেওয়া অবিধেয়, এই মত তিনি দৃঢ়রূপে পোষণ করিতেন।

নব্যসম্প্রদায় ও প্রাচীনসম্প্রদায়।

নব্য সম্প্রদায় ও প্রাচীন সম্প্রদায় সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার লিখিয়া ছিলেন;— "আপনার প্রতি যে তথাকার* লোকের অনুরাগ হ্রাস হইতেছে ইহার আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানেব সহিত কি অজ্ঞানের যোগ হইতে পারে? সত্যের সহিত কি মিথ্যার মিলন হইতে পারে? জ্যোতির সহিত কি অন্ধকার মিশ্রিত হইতে পারে? সদ্বিদ্যাশালি নব্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ের ঐক্য হইবার হইবার সম্ভাবনা নাই (কেবল রাজপুরের মদন মজুমদার এক exception.)।"

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত আমার পিতৃদেবের ধর্ম্মোপদেশগুলি সে কালের ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইত। তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; —"আপনার সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা পাঠ করিয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম। কি মধুর ভাব! কি পরিশুদ্ধ অভিপ্রায়! আপনার রচনার স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্য ও লালিত্য প্রসিদ্ধই আছে। ঐ বক্তৃতাতে আমাদের ধর্ম্ম অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ উহা মেদিনীপুরের সুন্দররূপে উপযোগী হইয়াছে। এখান হইতে আমার বোধ হইতেছে আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছেন।"

পিতৃদেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার একখণ্ড অক্ষয়কুমারকে প্রেরণ করেন। তিনি পুস্তকপ্রাপ্তি স্বীকারকালে লিখিয়াছিলেন;—"একান্ত

* মেদিনীপুরের।

মনে প্রার্থনা করিতেছি আপনকার পরমার্থরসপুবিত সুরচিত্ পুস্তক পাঠে সর্ব্বসাধারণের প্রবৃত্তি হউক। উহা অধ্যয়ন করিবার সময় পাষাণ সদৃশ কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হয় তাহার সন্দেহ নাই।"

"সেকাল আর একাল।"

অক্ষয়কুমারের পরামর্শে পিতৃদেব "সেকাল আর একাল" বিষয়ক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তাহার এক কাপি তাঁহাকে প্রেরণ করা হয়। অক্ষয়কুমার তখন স্বহস্তে আর কাহাকেও পত্রাদি লিখিতেন না। অপরের হস্তলিখিত পত্রে তিনি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন;—"আপনার "সেকাল আর একাল" প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। অন্যেও উহা পাঠ করিয়া যথেষ্ট আমোদ পাইতেছেন।"

ব্রাহ্মসমাজ।

অক্ষয়কুমার দত্তের পত্রাবলীতে তাৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ পাওয়া যায়। দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। ইংরাজী ১৮৫২ সালের জুন মাসে লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই; —"এখানে সভা* ও সমাজের † কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সকলেই স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। সংপ্রতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী বাবু এক জন গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সমাজে বিলক্ষণ লোক সমাগম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গালা ভাষ্য প্রস্তুত হইতেছে। বড় বাবু তাহার কিঞ্চিৎ আপনার দৃষ্ট্যর্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি না বলিতে পারিলাম না। এ ভাষ্য বিশিষ্টরূপ উপকারী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। বারাসতের পূর্ব্বঅংশে নিবাঁধই গ্রামের পাঠশালার বালকেরা বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যয়ন করিতেছে; বড় বাবু গত দিবস তথায় পরীক্ষা লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।"

* তত্ত্ববোধিনী সভা।

† ব্রাহ্মসমাজ।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন;—"তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা কোন তারিখে উঠিয়া যায়, যদি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনার একটি বক্তৃতা সংক্রান্ত মোকদ্দমাই উহা উঠিয়া যাইবার কারণ। অতএব আপনি সহজে জানিতে পারিবেন বোধ হয়।"

১৮৫২ সালের জুলাই মাসে লিখিত একখানি পত্রে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল;—"সংপ্রতি কাশীশ্বর বাবু আর দুই একজন জ্ঞানোৎসাহী বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া ভবানীপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন। উন্নতির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই লোকেরও দ্বেষোৎপত্তি হইয়াছে।"

তৎকালে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কগণের সহিত খ্রীষ্টীয়ানদিগের বাদানুবাদ চলিত। দেখা যাইতেছে খ্রীষ্টায়ানদিগের পক্ষে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসরে নামিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালের মার্চ্চমাসের একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার লিখিতেছেন;—"আপনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর উত্তর দিয়া এখানে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা শীঘ্র নির্ব্বাণ হইবার নহে। "সুধাংশু" পত্রে তাহার প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছিল, প্রভাকরে তাহার উত্তর প্রকাশ হইয়াছে এবং ১০ই মার্চ্চের Intilligencer ও Citizen পত্রে তাহার অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে। Christian Advocate পত্রে বন্দ্যোর পক্ষে ও আপনার প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। তাহারও উত্তর প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় আগামী সোমবারের Intiligencer পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবেক।"

ইংরাজী ১৮৫২ সালের মে মাসে লিখিয়াছিলেন;—"ইওয়ার্ট সাহেবের খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রামাণিকত্ব বিষয়ক বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যদি তাহা না পাইয়া থাকেন আমাকে লিখিবেন; আমি একখানা আপনাকে পাঠাইয়া দিব। আপনকার অনুরোধক্রমে কাশী বাবু তাহার প্রত্যুত্তর লিখিতেছেন।"

শিরোরোগ।

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য অক্ষয়কুমারের স্বাস্থ্য অকালে ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি দারুণ শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই রোগের সূচনার অবস্থায় তিনি লিখিয়াছিলেন;—"আমার অভিনব পদপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শরীর এরূপ বিনষ্ট হইতেছে যে, তাহাতে উভয় কর্ম্ম সম্পাদন করা কোন রূপেই সম্ভবে না। আপাততঃ সভার কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার সহকারীস্বরূপ নিযুক্ত করা হইয়াছে।* যদবধি আমার শরীর কিঞ্চিৎ সবল ও সুস্থ না হয়, তদবধি সভার কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা সুকঠিন হইবে। শুশ্রূষাদি করিতেছি। হে বন্ধু! এ সংসারের ভাব কি বলিব! ভাগ্য যদি সানুকূল হইলেন, শরীর আবার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইলেন। দুর্গাচরণ বাবুর † মতে কিছুদিন সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আমার পক্ষে উত্তম কল্পনা।"

অপর এক পত্রে অক্ষয়কুমার তাঁহার শিরোরোগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—"আমার শরীর এতাদৃশ অপটু হইয়াছে যে, পত্রখানি লেখাও সমধিক ক্লেশকর বোধ হয়। আমার শিরোদেশ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে। পথে চলিবার সময়ে গা মাথা টলিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া আইসে, এ কারণ পদব্রজে গমনাগমন এক প্রকার রহিত হইয়াছে। শারীরিক মানসিক কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে পারি না। লিখন পঠন একেবারে বন্ধ হইয়াছে। কোন ক্রমে যোগেযাগে নর্ম্ম্যাল স্কুলের কর্ম্মটি এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছি। যে দিবস আমার ঐ রোগের প্রথম সঞ্চার হয়, সে দিবস শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইয়া মোহ গিয়াছিলাম। যখন রোগের বৃদ্ধি হয়, তখন মস্তক শূন্য বোধ হয়। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ হইয়াছে, কিছুতেই সর্দ্দি বোধ হয় না।"

* এই সময়ে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন।

† ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্মে অক্ষমতা জন্য মনঃপীড়া।

অক্ষয়কুমার শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া কিছুকাল মানসিক পরিশ্রম এককালে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ইহা তাঁহার সাতিশয় মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালে লিখিত একখানি পত্রে এই বিলাপোক্তি দেখিতে পাওয়া যায়; —"আপনি ধর্ম্মতত্ত্ববিচার বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন তাহা কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। আমা কর্ত্তৃক পৃথিবীর যে কিছু কর্ম্ম হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে; এইক্ষণে যে কয়েকদিন জীবিত থাকি আপনাদিগের দ্বারা স্বদেশের শুভোন্নতি হইবার লক্ষণ যত দেখি ততই মন প্রফুল্ল হয়।"

উদ্যানপালন।

অক্ষয়কুমার শেষ জীবনে উদ্যানপালনে সবিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন। তাঁহার একখানি পত্রে দেখিতে পাই;—"রোগ ও বয়স উভয়ের প্রভাবে আমার শারীরিক অবস্থার হ্রাস বই আর উন্নতি হইবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা পাই। যাহা হউক, আমার আশ্রম-বৃক্ষগুলি বড়ই ভাল আছে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া ও লালন পালন করিয়া সমধিক সুখী হই।"

ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন।

শুনা যায় অক্ষয়কুমার শেষজীবনে সংশয়বাদী হইয়া ছিলেন। এ কথা কতদূর সত্য জানি না; তবে দেখিতে পাই যে, জীবনের শেষ ভাগে তিনি আমার পিতৃদেবকে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার শীর্ষদেশে ভগবানের কোন নামোল্লেখ নাই, কিন্তু পূর্ব্বে লিখিত অধিকাংশ পত্রের আরম্ভে "জগদীশ সহায়" এবং কতকগুলি পত্রের শীর্ষে "জগদীশ্বর" লিখিত আছে।

বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

১৩১৩ আষাঢ়
[মাইকেল ডেভিড, হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্]

গত মাসে দু'জন বিভিন্ন ছাঁচের পাশ্চাত্য প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। একজন বিখ্যাত আইরিশ নেতা মাইকেল ডেভিট্, আর একজন নরওয়ের বিখ্যাত লেখক হেন্‌রিক্ ইব্‌সেন্। মাইকেল ডেভিট্ অনেকবার দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাস করিয়াছেন, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজেরাও তাঁহার সাহস, স্বদেশভক্তি ও চরিত্রের নিষ্কলঙ্কতায় মুগ্ধ। তিনি আইরিশ ল্যাণ্ড লীগের স্থাপনকর্ত্তা। তিনি কেনিয়ান ছিলেন। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, ভারতেও এইরূপ ছাঁচের লোক হয়ত জন্মগ্রহণ করিবেন। "সম্ভবামি যুগে যুগে" অনেক অর্থে গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ইউরোপের নানা ভাষায় ইব্‌সেনের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ হইয়াছে। ভারতের কোন ভাষায় বোধহয় তাঁহার কোন বহির অনুবাদ হয় নাই। আমাদের মানসিক কূপমণ্ডুকতা একেবারে ঘুচে নাই, এমন নয়; কিন্তু বড় কম ঘুচিয়াছে। জগতের চিন্তামন্দাকিনী নানা দেশোদ্ভবা স্রোতস্বতী দ্বারা পুষ্টা। আমাদের এই মন্দাকিনীতে অবগাহন প্রয়োজন। ইবসেনের প্রতিভার স্থান নির্ণয়ের হয়ত এখন সময় হয় নাই, হয়ত ইহা টলষ্টয়ের সমজাতীয় নহে। কিন্তু বাঙ্গালায় ইঁহার কিছু পরিচয় কেহ দিবেন না? ইঁহার নাটকগুলিতে সাহসের সহিত নরনারীর সম্বন্ধের নানা অভিনব সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে। অনেকে বলেন, ইহাই ইঁহার গ্রন্থাবলীর বিশেষত্ব।

১৩১৭ শ্রাবণ
চন্দ্রনাথ বসু

জন্ম—হুগলী জেলাধীন কৈকালা গ্রাম; ১২৫১ সাল, ১৭ই ভাদ্র।
মৃত্যু—কলিকাতা; ১৩১৭ সাল, ৬ই আষাঢ়।

অতীতের ভাবকে আশ্রয় করিয়া যে সকল মহাত্মা প্রাচীনের আদর্শে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, মনস্বী লেখক চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একতম। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া যেদিন শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাতৃভাষাকে তুচ্ছ "অশিক্ষিতের ভাষা" বলিয়া পরিহার করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ কতিপয় সাহিত্যরথীর সহযোগিতায় চন্দ্রনাথ সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হ'ন। সেই একদিন গিয়াছে—যেদিন বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই পাশ্চাত্য ভাষাকে সভ্যের ভাষা ও ইংরেজী চর্চ্চাকে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন,—তখন কেইবা পড়িত বাংলা আর কেইবা করিত বাংলার আদর!—ইংরেজী লেখা, ইংরেজী বক্তৃতা দেওয়া তখন এদেশে, দুরন্ত ব্যাধির ন্যায়, সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছিল।

দেশের তদানীন্তন অপরাপর শিক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় চন্দ্রনাথও যৌবনে ইংরেজী সাহিত্যে অনুরাগী হইয়া ইংরেজী রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। এবং কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ও নানা পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দ হোসেন বেলগ্রামির সহায়তায় পঠদ্দশায় তিনি 'য়্যুনিভার্সিটি ম্যাগাজিন্' নামে একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। এই পত্রখানির জীবনকাল ক্ষণস্থায়ী হইলেও উহাতে প্রকাশিত চন্দ্রনাথের লিখিত গবেষণামূলক কয়েকটি প্রবন্ধের সম্পর্কে উহার নাম স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বান চন্দ্রনাথকে বাংলা রচনায় প্রবৃত্ত করে। ইতঃপূর্ব্বে তিনি 'কাল্‌কাটা রিভিয়ু' নামক ত্রৈমাসিক ইংরেজী পত্রে বাংলা বহির সমালোচনা করিতেন। ঐ সমালোচনা পাঠে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রনাথের প্রতিভা ও বিচারশক্তির পরিচয় পান এবং বঙ্গদর্শনে সাহিত্যচর্চ্চা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করেন।

পাঠ্যাবস্থায় চন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। সুতরাং শকুন্তলার সমালোচনা লিখিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত-সাহিত্য আয়ত্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর ৺হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রথমাবধি তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ তাঁহারই সহায়তায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

চন্দ্রনাথকৃত শকুন্তলার সমালোচনা পরে "শকুন্তলাতত্ত্ব" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ্। ইহাতে একাধারে গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা, বিচারশক্তি ও লিপিকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। "শকুন্তলাতত্ত্ব" সাহিত্যদেবীর চরণে প্রদত্ত চন্দ্রনাথের প্রথম অঞ্জলি হইলেও দেবী ইহাকে ভক্তের শ্রেষ্ঠ দান স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

শকুন্তলা-তত্ত্ব প্রকাশের পর চন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, নবজীবন, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রে কতকগুলি নূতন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রবন্ধ ও অপরাপর নব নিবন্ধের গ্রন্থনে তিনি অতঃপর সাবিত্রীতত্ত্ব, হিন্দুত্ব, ত্রিধারা, ফুল ও ফল, সংযম শিক্ষা, কঃ পন্থা, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, বেতালে বহুরহস্য ও পৃথিবীর সুখ দুঃখ নামক আরো নয়খানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকগুলি সমস্তই তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচায়ক।

শকুন্তলা-তত্ত্ব ও সাবিত্রী-তত্ত্বে গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্য্য উন্মোচিত করিয়া প্রাচ্য আদর্শকে মহিমোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুত্ব, ত্রিধারা, ফুল ও ফল, কঃ পন্থা প্রভৃতি পুস্তকে তিনি হিন্দুআদর্শ ও হিন্দুশিক্ষার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহার কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্ম্মানুরাগ ও দেশ হিতৈষণার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যদিও বহু স্থলে তাঁহার চিন্তাপ্রণালী গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণ পথেই পরিচালিত, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাঙ্গালী কায়মনোবাক্যে, আচার ব্যবহার অনুষ্ঠানে পবিত্র শুচি হউক ইহাই তাঁহার আন্তরিক কামনা ও সাহিত্যশ্রমের মূলসূত্র ছিল।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম জীবনে চন্দ্রনাথ বিজাতীয় রুচি ও আচারে অভ্যস্ত হইয়া স্বদেশীয় রীতি নীতিতে শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। সাহিত্য-ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণির সংসর্গে আসিয়া পরিণত জীবনে পুনরায় স্বদেশীতন্ত্রে অনুরাগী হ'ন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনকল্পে নবজীবন পত্রে তিনি 'জাতীয় চরিত্র ও বর্ণভেদ প্রণালী' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার দ্বারা তাঁহার মত পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রথম পাওয়া যায়।

সমাজে ও সাহিত্যে চন্দ্রনাথ একনিষ্ঠ সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর জীবনে ও সাহিত্যে তিনি আর্যজ্ঞান, সনাতন ধর্ম্ম

ও আর্য্য-রীতিনীতি প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। বাহ্যিক আচার আচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে রক্ষণশীলতার মধ্য দিয়া এক দিকে যেমন তাঁহার সামাজিক জীবন তাঁহার মতেরই পরিপোষক হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে প্রাচীনের আদর্শে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতানুসারিণী করিতে প্রয়াস পাইয়া তিনি তাঁহার সাহিত্য-জীবনকেও স্বীয় মতের অনুবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অপূর্ব্ব ধীশক্তি ও অসাধারণ প্রতিভা লইয়া চন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভূদেবের উপদেশ ও বঙ্কিমের সাহচর্য্য, সর্ব্বোপরি নিজ চরিত্রবল, তাঁহার এই শক্তিকে বিকশিত ও সর্ব্বতোমুখী করিবার পক্ষে সহায় হইয়াছিল। বিনয়, সৌজন্য, নিরহঙ্কার ও অমায়িকতা একদিকে যেমন তাঁহার চরিত্রকে কুসুম-পেলব করিয়া রাখিয়াছিল, অন্যদিকে সেই চরিত্রই স্বাধীনচিত্ততায় বজ্রাদপি কঠিন ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া এম্-এ, বি-এল্ উপাধিধারী চন্দ্রনাথ যখন সংসার-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অর্থোপার্জ্জনের কত-না পন্থা প্রলোভনের বাহু বিস্তার করিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। হাইকোর্টের ওকালতী, গভর্ণমেন্টের ডেপুটীগিরির প্রলোভন বিবেকীবীরের চরিত্রবলকে পরাভূত করিতে পারিল না— ঐ কার্য্যে ব্রতী হওয়ার অল্পদিন পরেই তিনি তাহা ত্যাগ করিয়া জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। মাতৃভূমির প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাঁহার ঐস্থানে অধিকদিন থাকিবার পক্ষেও বাধা জন্মাইল—কয়েকমাস পরেই তিনি পুনরায় জয়পুরের কার্য্যত্যাগ করিয়া বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের কার্য্য অবলম্বন করেন। ততঃপর চন্দ্রনাথেব বন্ধু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তদধিষ্ঠিত বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অনুবাদকের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হ'ন। এবং বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত এই কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অনুবাদকের কার্য্য অত্যন্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য হইলেও ধর্ম্ম বোধে বরাবর তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতেন। অধিকন্তু এই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিশেষের প্রশ্ন প্রস্তুত ও সাহিত্য-চর্চ্চার কঠোর সাধনায় আপনার সমস্ত জীবন ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন।

সংসারক্ষেত্রে চন্দ্রনাথ কর্ম্মঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ধর্ম্মানুরাগী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাহিত্য-লক্ষ্মী তাঁহাকে সমালোচকের বিজয়-মাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের দেশ একজন প্রবীণ সাহিত্যসেবী সুধীকে হারাইল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

১৩১৭ ভাদ্র

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

জন্ম—শ্রাবণ, ১২৫০ বঙ্গাব্দে, ঢাকা জেলান্তর্গত ভরাকর গ্রামে।

মৃত্যু—১৩ই শ্রাবণ, ১৩১৭, ঢাকা নগরীতে।

পিতা—৺শিবনাথ ঘোষ; মাতা—৺উমাতারা দাসী।

পশ্চিমে ভাগীরথী-তীরে চন্দ্রনাথের চিতা নিভিতে-না-নিভিতে পূর্ব্বে বুড়ীগঙ্গাতীরে কালীপ্রসন্নের চিতা প্রজ্বলনের সংবাদ বাংলার সাহিত্যিক-সমাজে গভীর শোকের ছায়াপাত করিয়াছে।

কালীপ্রসন্ন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক।

প্রবন্ধ রচনায় উভয়েই সিদ্ধহস্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধমালায় যেমন তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ও সারগ্রহণের শক্তি দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয় তেমনি কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধাবলীতে ভাবের গভীরতা ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া পাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয়। যথার্থভাবে জীবনব্যাপী জ্ঞান-সাধনের ফলে যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার ও মাইকেল মধুসূদনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য; তাহার পরে কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দুয়ারে নিতান্ত দীন শিষ্যের ন্যায় যিনি তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন তিনিই একথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন। কালীপ্রসন্ন প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই সত্য কিন্তু উক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানে ও অধ্যয়নে তিনি কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না *। সকলের পথ এক নয় এই জন্য তিনি প্রধানতঃ স্বীয় দর্শন কাব্য ও ইতিহাস-চর্চ্চার ফল বাংলা সাহিত্যকে দান করিয়া গিয়াছেন।

শৈশবে কালীপ্রসন্ন মক্‌তবে ফারসী পড়েন। যখন পাঁচ বৎসরের শিশু তখনই তিনি ভারতবর্ষের অমর গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। গ্রামস্থ টোলে তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা হয়। বরিশালে তাঁহার ইংরাজি শিক্ষার হাতে-খড়ি হয়। বিদ্যালয়ে তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন; ঢাকা কলিজিয়েট্ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া জনৈক পণ্ডিতের সাহচর্য্য লাভে তিনি হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলির প্রতি নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়িলেন, ফলে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ হইল না। মনের ক্ষোভে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। তখন কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার প্রবল আদর। বাংলা ভাষার কথা তখন কেহ বলিত না,—বাংলা সাহিত্যের আদরও তখন কেহ করিত না; স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলেন* তখন লোকে বাংলা জানে না এ কথা বলিতে গৌরব অনুভব করিত। সেই যুগে কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীনভাবে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। লেখাপড়া বলিতে তখনকার লোকে ইংরাজী লেখাপড়াই বুঝিত—কালীপ্রসন্ন সেই লেখাপড়াতেই ডুবিয়া গেলেন। সে কি অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা! তিনি দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ছয় ঘণ্টার অধিক বিশ্রাম করিতেন না। সাত বৎসরকাল এইরূপ কঠোর তপশ্চরণের পর সহসা তাঁহার দৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। পাদ্রী ডাল সাহেব একদিন তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি স্বদেশীয় সাহিত্যের সাধনা কর, তাহাতে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে—তোমার প্রতিভা সত্যই অসাধারণ!" ইহাতেই তাঁহার দৃষ্টি ফিরিল। তিনি বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবার শক্তি উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল বই কখনো ক্ষীণ হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, মাত্র তের বৎসর পূর্ব্বে রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলী উপলক্ষে আহূত ঢাকার বিরাট সভায় অধিনায়করূপে কালীপ্রসন্ন ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া ঢাকার তদানীন্তন কমিশনর মিঃ টয়নবি প্রকাশ্যভাবেই বলিয়াছিলেন, "আমি ইটালিয়ান্ মিউজিক বড় ভালবাসি; কিন্তু কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় যে অপূর্ব্ব ও অসাধারণ মাধুরী আছে, ইটালিয়ান মিউজিকেও তাহা নাই।"

কলিকাতা হইতে ঢাকায় ফিরিয়া তিনি সেখানকার ছোট আদালতের ক্লার্ক-অফ্-দি-কোর্ট পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ঢাকার মধ্যে তাঁহার বক্তৃতা হইত; এই সকল বক্তৃতার অধিকাংশই বাংলায় হইত। তখনো কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার বিজয়-দুন্দুভী বাজিয়া উঠে নাই; বাংলা ভাষার শক্তিও তখন অপরীক্ষিত। কালীপ্রসন্ন সেই তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব সত্য প্রচার করিলেন। বাংলা ভাষার শক্তি দেখিয়া নট-কবি দীনবন্ধু পর্য্যন্ত সবিস্ময়ে

* "ভক্তির জয়" প্রভৃতি গ্রন্থের পাদটীকা দেখুন। লেখক।

* "সেকাল আর একাল" দ্রষ্টব্য।

বলিয়াছিলেন, "বাংলা ভাষার এত শক্তি আছে এ কথা কল্পনা করিতে পারিতাম না।" ১৩১০ সালে কলিকাতায় অবস্থানকালে কালীপ্রসন্ন উপর্য্যুপরি যে কয়েকটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা অনেকের মনে থাকিতে পারে। সে সময়ে কলিকাতায় একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর দুইমাস পূর্ব্বেও তিনি ঢাকায় প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

১২৮১ বঙ্গাব্দে কালীপ্রসন্ন "বান্ধব" প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন" ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। "বান্ধবের" উপাদেযতা ও লোকসমাজে উহার প্রতিষ্ঠাতা দেখিয়া বঙ্কিম সুখী হইয়াছিলেন; শুধু তাই নয়, সাহিত্য সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার এদিকে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "সাধারণী" আপনার স্বাতন্ত্র্য-গৌরব লইয়া তখন আসরে দেখা দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তখনকার সেই প্রতিযোগিতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান তিনজন পত্র-সম্পাদক অপ্রীতিকে ত্রিসীমানায় আসিতে দেন নাই-- তাঁহাদের সাহিত্য-সেবার নিষ্ঠা ও একাগ্রতা এমনি গভীর ছিল।

এগার বৎসর আদালতের কাজ করিবার পর কালীপ্রসন্ন ভাওয়াল ষ্টেটের চিফ্ ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। এ কাজের জন্য তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হয় নাই, কাজই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। ভাওয়াল রাজের কর্ম্মচারী হইয়াও তিনি রাজার নিকট যে সমাদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তাহা অন্যের পক্ষে দুর্লভ।

বঙ্গদর্শন হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, "বঙ্গদর্শন যাহা করে নাই, বান্ধব তাহা করিবে।" সেই বান্ধবও কিছু দিন পরে বন্ধ হইল—কালীপ্রসন্নের মনে শোকের ছায়া পড়িল। কয়েক বৎসর হইল বিস্মৃত বেদনাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্যই বোধ হয় বান্ধব আবার নূতন বেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল। নব পর্য্যায়ের বান্ধবও বেশি দিন চলে নাই।

কালীপ্রসন্নের বন্ধু-প্রীতি অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় ছিল। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, গঙ্গাচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত তখন শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রীতির সূত্রপাত হয়। উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যাসাগর-জীবনী প্রকাশিত হইলে সেই প্রীতি প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বন্ধুমাত্রেরই প্রতি তাঁহার অসীম নির্ভর ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন ঘোষকে ঢাকা হইতে শিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় পাঠাইয়া তাঁহার শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার সম্পূর্ণ ভার এই বন্ধুর উপর ন্যস্ত রাখিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। বিদ্যাসাগর-চরিতাখ্যায়ক যখন তাঁহার রচিত "কমলকুমার" নামক উপন্যাস কালীপ্রসন্নের নামে উৎসর্গ করেন তখন তিনি সেই গ্রন্থের প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনার স্নেহ ও প্রীতির সহিত আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। কারণ আর কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনার বংশধরেরা আমার কথাটা একবার পুস্তকাবলী পাঠের সময়ে জিজ্ঞাসা করিবে।" কালীপ্রসন্নের এই অভয়বাণী ও এ অকিঞ্চনের প্রতি তাঁহার স্নেহ আজ আমাকে বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় উদ্বোধিত করিয়াছে।

কালীপ্রসন্নের জীবিকা তাঁহার গ্রন্থের আয়ের উপর নির্ভর করিত না; যে দেশের লোক উপন্যাস-পাঠের আনন্দ ও শিক্ষাকে এখনো চরম সামগ্রী বলিয়া ঠিক দিয়া রাখিয়াছে সে দেশে যে প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত-চিন্তা, নিশীথ-চিন্তা, প্রমোদ লহরী, ভক্তির জয় প্রভৃতি সাগরর্ভ, গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য। স্বীয় গ্রন্থাদির প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুগ্রহদৃষ্টির অভাব দেখিয়া বিদ্যাসাগর-চরিতাখ্যায়ককে তিনি লিখিয়াছিলেন, "কেবল যদি অনুরোধ উপরোধ ভিন্ন সাহিত্যের বিচার-স্থান না থাকে, তাহা হইলে দেশীয় সাহিত্য বিকাশের উপযুক্ত পথ পায় না।" সৌভাগ্যের বিষয় তাঁহাকে উপরোধের

ডালি বহিয়া বেড়াইতে হয় নাই। আর একবার মনের ক্ষোভে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের মতি গতি এবং রুচি ও বিচারের ভঙ্গি দেখিয়া আপনা হইতেই বন-ভূমির অন্ধকারে আশ্রয় লইয়াছি।...আমি ভগবানের ইচ্ছায় বনবাসী।" কালীপ্রসন্ন নিজে সঙ্গতিপন্ন হইলেও দরিদ্র বন্ধুকে সমাদর করিতে জানিতেন। তেমন সমাদর আর কয়জন কয়জনকে করিতে পারিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। দরিদ্র বিদ্যাসাগর-জীবনীকার ঢাকায় গেলে তিনি যেন স্বর্গ হাতে পাইতেন; সে আনন্দ মুখের নয়, প্রাণের; সে আদর অভ্যর্থনা শুধু সুখাদ্য ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাদানেই পরিসমাপ্ত হইত না। উক্ত গ্রন্থকার যে কয়দিন সেখানে থাকিতেন সে কয়দিন উভয়েরই হৃদয়ে একটা আনন্দোৎসব চলিত; —সাহিত্যের আলোচনা, মহৎ চরিত্রের অনুশীলন ও ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের কথায় তাঁহাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইত। ধনীর সহিত তাঁহাকে মিশিতে হইত বলিয়া দরিদ্রের প্রতি তাঁহার কোনো অবজ্ঞা বা উপেক্ষার ভাব ছিল না। একবার তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি ত ভাই ধনী নহি। আমি আপনার মত কাঙ্গাল,—এবং সাহিত্যসেবী কাঙ্গালের সংসর্গই আমার জন্য পার্থিব স্বর্গ।" পনরো বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় একবার খুব ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সেই সময়ে তাঁহার সুহৃদ ঢাকায় যাইবার আয়োজন করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিলে তিনি তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন, "অন্তঃপুরে আপনার সহ-ধর্ম্মিণীর প্রফুল্ল অনুমতি পাইতে চেষ্টা করিবেন।" বন্ধুকে বিপদের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য তাঁহার এ কৌশল ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার বন্ধু-প্রীতি কিরূপ গভীর ছিল তাহা দেখাইবার জন্য যে সকল পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি বর্ত্তমান প্রবন্ধের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসাগর-জীবনীকারের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রগুলি সুসম্বদ্ধভাবে একত্রে পাঠ করিলে বন্ধুর প্রতি স্নেহ-প্রবণ একটী সরস মধুর হৃদয়ের নিখুঁত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

কালীপ্রসন্নের প্রধান গ্রন্থাবলীর তালিকা দেওয়া গেল। (১) পার্কারের জীবনচরিত ও আমেরিকার সভ্যতা (অপ্রকাশিত), (২) নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব (৩) প্রভাত-চিন্তা, (৪) নিশীথ-চিন্তা, (৫) নিভৃত-চিন্তা, (৬) প্রমোদ-লহরী, (৭) ভক্তির জয়, (৮) ভ্রান্তি বিনোদ, (৯) মা না মহাশক্তি, (১০) জানকীর অগ্নিপরীক্ষা, (৯১) ছায়াদর্শন প্রভৃতি। কালীপ্রসন্ন কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল,—তাঁহার রচিত সঙ্গীত এখনো ব্রহ্মসঙ্গীত-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতা সংখ্যায় অল্প এবং সেজন্য আমরা ক্ষোভ করি না। ছন্দে গ্রথিত কবিতায় তিনি স্বীয় শক্তির পরিচয় দিতে না পারিলেও গদ্য-কাব্যে তিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যিনি তাঁহার 'অশ্রুজল," "অভিমান," "নীরব কবি," "অমৃত," "লোকারণ্য," প্রভৃতি নিবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তিনি এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী (style) সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন; কেহ বলেন শুধু বিভক্তি বসাইলেই তাঁহার বাংলা সংস্কৃত হইয়া যায়,—কেহ বলেন তাঁহার বাংলা নিতান্ত সেকেলে পণ্ডিতি ধরণের। যিনি স্থিরভাবে তাঁহার গ্রন্থাবলী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তিনি কখনই এ সকল মতকে প্রশ্রয় দিতে পারিবেন না। তাঁহার পত্রাবলী হইতে আমি যে সামান্য অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে তিনি যে সকল খাঁটি বাংলা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বিভক্তি চলে কি? আর না পড়িয়া মত প্রকাশ করা যাঁহাদের ব্যবসায় তাঁহারাই কালীপ্রসন্নের রচনাভঙ্গীকে "সেকেলে পণ্ডিতি ধরণের" বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারেন। স্থান ও সময়ের সঙ্কুলান হইলে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের রচনা হইতে তাঁহার রচনা কত আধুনিক তাহা নমুনা দিয়া দেখাইতে পারিতাম। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের যেমন এক একটী নিজস্ব বচনাভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়—কালীপ্রসন্নের রচনাভঙ্গীও তেমনি তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, এ বিষয়ে আর ভুল নাই। শুধু কি তাঁহার রচনাভঙ্গী স্বতন্ত্র? তাঁহার ভাষা, তাঁহার ভাব সকলই তাঁহার

নিজস্ব; এই স্বতন্ত্র পথে তাঁহার আর কোনো উপযুক্ত দোসর মিলে নাই—বোধ হয় মিলিবেও না। তাঁহার রচনাভঙ্গী স্বতন্ত্র বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিলে সুবিচার হইবে না; স্বাতন্ত্র্যই অনেক সময়ে মহত্ত্বের পবিচায়ক। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে গৌববান্বিত, কালীপ্রসন্নও তেমনি স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে গৌরবান্বিত। কেহ তাঁহাকে "বঙ্গের কার্লাইল," কেহবা "বঙ্গের এমার্সন" বলিয়া সম্মান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে "বঙ্গের কালীপ্রসন্ন" বলিলে যেরূপ সম্মান করা হয় এমন আর কিছুতেই হইতে পারে না, 'তেঁতুলের আমসত্ত্ব' নিতান্তই অপ্রাকৃত বস্তু, কল্পনার সামগ্রী। যে এমার্সনের নাম-গৌরব লোকে তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছে সেই এমার্সনই একস্থানে বলিয়াছেন—"He is great who is what he is from nature, and who never reminds us of others."

কালীপ্রসন্নের রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়াছি; তাঁহার রচনার বিষয় সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা কঠিন। তিনি কোন্ বিষয়ে সফলতার সহিত লেখনী চালনা করেন নাই? নিশীথ-চিন্তায় তিনি যে প্রগাঢ় জ্যোতির্ব্বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যেমন অতুলনীয়, তাঁহার "ভক্তির জয়" গ্রন্থে ভক্তির যে অমৃত-রস-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে তাহাও তেমনি অপূর্ব্ব, অপার্থিব! "প্রমোদলহরী"তে একদিকে যেমন তিনি সমাজ-বিজ্ঞানতত্ত্ব ঢালিয়া দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি কৌতুক-রসে গ্রন্থখানিকে সিক্ত ও সুমধুর করিয়া তুলিয়াছেন। "প্রভাত-চিন্তা" ও "নিভৃত-চিন্তা'র সকল মত অপ্রতিবাদে গ্রহণীয় না হইলেও তাঁহার প্রত্যেকটী প্রবন্ধ বর্ষা-জলসিক্ত স্নিগ্ধ, শুভ্র, সৌরভময়ী যূথিকার ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র। তাঁহার গ্রন্থপাঠে মন পবিত্র ও উন্নত হয়, প্রাণে নূতন শক্তির সঞ্চার হয়; যে গ্রন্থের এ শক্তি আছে সে গ্রন্থ শ্রদ্ধার সামগ্রী আর সেই গ্রন্থের রচয়িতা মানবজাতির চিরন্তন সুহৃদরূপে গণ্য হইবার অধিকারী। শেষ জীবনে কালীপ্রসন্ন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় ডুবিয়াছিলেন; তাহার ফলে "ছায়াদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বে টেকচাঁদ, শিবচন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে তিনিই এ বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নের "লোকারণ্য" (নিভৃত-চিন্তার অন্তর্গত একটী প্রবন্ধ) যখন পাঠ করি দেশে স্বদেশ-প্রেমের বন্যা ছুটে নাই, দেশ তখন নীরব, শান্ত। তখন এদেশে লোকারণ্যের অনির্ব্বচনীয় শোভা কল্পনাও করিতে পারিতাম না; মনে করিতাম বুঝি উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড সে শোভা-সন্দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু "লোকারণ্য" পাঠের কিছুদিন পরে যখন সত্য সত্য এ দেশে লোকারণ্য দেখিলাম, তাহার বিরাট গাম্ভীর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইলাম, তখন শুনিতে পাইলাম "লোকারণ্যে"র কবি স্বদেশ-প্রেম-প্রণোদিত জনমণ্ডলীর সম্মিলন-শোভায় আর মুগ্ধ নহেন, কল্পনার লোকারণ্যের প্রতি তিনি যে গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সত্যকার লোকারণ্য তাঁহার সে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সাত বৎসর হইল বিক্রমপুরের অন্তর্গত স্বর্ণগ্রামে কবি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ছিলাম। সেখান হইতে ঢাকায় যাইব বলিয়া কালীপ্রসন্নকে এক পত্র লিখি; সেই পত্রের উত্তরে তিনি যে মধুমাখা পত্র লিখিয়া ছিলেন সেরূপ পত্র আর কাহারো নিকট হইতে পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। পত্রশেষে লিখিয়াছিলেন, "এখানে আসিয়া কার্ড পাঠাইও না—সরাসর উপরে চলিয়া আসিবে, দেখি আমি তোমাকে চিনিয়া লইতে পারি কি না।" আমি তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, তাঁহার ছবিও বাড়ীতে ছিল; কিন্তু তিনি আমাকে কখনো দেখেন নাই; অকস্মাৎ একদিন আমি বিনা সংবাদে ঢাকায় গিয়া তাঁহার বাড়ীর দ্বারবানকে এড়াইয়া সটান উপরে তাঁহাব বসিবার ঘরে গিয়া

উপস্থিত হইলাম। কালীপ্রসন্ন তখন জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিলেন; আমি গৃহে প্রবেশ করিলেও তিনি আমাকে দেখিতে পান নাই। যেই আমি প্রণাম করিয়াছি অমনি তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া আসন হইতে নিমেষের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর মুহূর্তেই আমাকে আলিঙ্গান-পাশে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "যে ভয় করিয়াছিলাম তাই ঘটিল, ব্রাহ্মণ হইয়া আমাকে প্রণাম!" আলিঙ্গান-মুক্ত করিয়া আমাকে সাদরে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কেমন? আমি চিনিতে পারিয়াছি কি না?" আগন্তুক ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভৃত্যকে ডাকিয়া আমার হস্ত মুখ প্রক্ষালনের ব্যবস্থা করিতে বলায় আমি বলিলাম, "সূত্রাপুরে জনৈক ব্রাহ্মবন্ধুর বাড়ীতে উঠিয়াছি।" সে কথা শুনিয়া তিনি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিলেন, "তা' হ'লে এখানে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? পিতা যাহা করিতে সাহস পান না পুত্র হইয়া তুমি সেই দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছ।" অনেক কষ্টেও তাঁহার সে অভিমান দূর করিতে পারি নাই।

ঢাকায় যে কয়দিন ছিলাম অনেকটা সময় তাঁহার কাছেই কাটাইতাম। অধ্যয়ন তখনো তাঁহার জীবনের ব্রতস্বরূপ। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, শকটযোগে কোনো ধনী পথের খোলা হাওয়ায় বাহির হইয়াছেন; কোনো ধনীর গৃহে সঙ্গীত-তরঙ্গ ছুটিয়াছে; কোনো ধনী পারিষদবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া কুৎসিৎ জল্পনায় নিযুক্ত আছেন অথবা চাটুকারের চাটুবাণীতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিজেকে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মনে করিতেছেন, কিন্তু সেই সময়ে বান্ধব-কুটীরের একটী কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতাম বেদীর উপরে সমাসীন কালীপ্রসন্ন অধ্যয়ন সুখে নিমগ্ন রহিয়াছেন! বেদীর পার্শ্বে তাঁহার একটী নাতিনী ধূপ জ্বালিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর জ্ঞান-মন্দিরের পুরোহিত ধ্যান-স্তিমিত লোচনে পূজার মন্ত্র পাঠ করিতেছেন! তিনি তাঁহার অধ্যয়ন-মন্দিরকে দেবমন্দিরের ন্যায় ভক্তি করিতেন। পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়া শুদ্ধ সংযত হইয়া পাঠে বসিতেন। বিদায় লইবার সময়ও প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেন। সে দৃশ্য দেখিলে মন পবিত্র হইত। সাহিত্য সম্পর্কে তিনি সে যাত্রায় যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর দীর্ঘতর হইবে এই আশঙ্কায় আজ এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। ভবিষ্যতে তাঁহার গ্রন্থাদি সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিবার বাসনা রহিল। আমি তাঁহার জীবনচরিত লিখিতে বসি নাই সুতরাং তাঁহার জীবনের সব দিক আমি দেখাইব বা দেখাইতে পারিব এরূপ মনে করি না। জীবনচরিত লেখা বড় কঠিন কাজ, সে কাজে "many are called, but few are chosen."

কালীপ্রসন্ন অনেকগুলি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; তিনি গিয়াছেন, তাঁহার উপাধি গিয়াছে কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাবলী অমর হইবে আর সেই গ্রন্থাবলীর পুণ্যে তিনিও অমর হইয়া থাকিবেন। সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কল্পিত "পুরাতন জ্যোতিষ্ক-দলের" * শেষ উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক কালীপ্রসন্ন †। এই পুরাতন অথচ প্রখর দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্কের আকস্মিক তিরোধানে বাংলাদেশের অনেকটা অংশ জুড়িয়া ঘন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে; —এ ছায়া অপসারিত হইতে কত দিন লাগিবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* "জ্যোতির্মণ্ডল," মানসী, ফাল্গুন, ১৩১৬।

† রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটী যুগের প্রবর্ত্তক, সুতরাং এ দলে গণ্য নহেন।—লেখক।

১৩১৮ চৈত্র

বীরেশ্বর পাঁড়ে

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মানবতত্ত্ব নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বহিও আছে। তিনি কয়েকখানি সাময়িক পত্র স্থাপন ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বোধ হয় একখানিও এখন বর্ত্তমান নাই।

[মনোমোহন বসু]

মনোমোহন বসু মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ নাটককার ছিলেন। আমরা বাল্যকালে দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বাঁকুড়া সহরে প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক ও যুবকদের দ্বারা তাঁহার সতীনাটক, প্রণয়পরীক্ষা নাটক এবং নলদময়ন্তী নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। তখন বেশ ভাল লাগিয়াছিল। বসু মহাশয়ের দুইভাগ পদ্যমালা সুন্দর শিশুপাঠ্য কবিতা-পুস্তক। ইহার অনেক কবিতা শিশুদের ও শিশুজননীদের কণ্ঠে বিহার করে।

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়

উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একজন প্রধান প্রচারক ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত, কেশবচন্দ্র সেনের জীবনচরিত, ধর্ম্মতত্ত্ব নামক পাক্ষিক পত্র সম্পাদন প্রভৃতি দ্বারা পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার গীতার সমন্বয়ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর আদরের যোগ্য।

[গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

সম্প্রতি বঙ্গের অনেকগুলি সাহিত্যিকের দেহান্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ একজন সুপরিজ্ঞাত নাটককার ও অভিনেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার কোনো নাটক পড়ি নাই, বাংলা নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য কোনো থিয়েটারেও কখনও যাই নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না।

১৩১৯ পৌষ

[মহেন্দ্রনাথ রায়]

পরলোকগত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি "জন্মভূমি"র সম্পাদক ছিলেন, এবং অনেক মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত এবং আর্য্যনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। দত্ত মহাশয়ের আর কোনও জীবনচরিত এপর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই; এবং আর্য্যনারীগণের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে বোধ হয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের গ্রন্থই প্রথম লিখিত হয়।

[সখারাম গণেশ দেউস্কর]

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্করের নাম হইতেই বুঝা যায় যে তিনি মহারাষ্ট্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত আসিয়া সাঁওতাল পরগণায় স্থায়ী ভাবে বাস করেন। বাঙ্গালী শিশুদের মত তিনিও শৈশব হইতেই বাঙ্গালা জানিতেন। মরাঠী ভাষা বড় হইয়া পুস্তক পড়িয়া শিখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচিত বাঙ্গালা পুস্তকাদি পড়িয়া লোকে যে আশ্চর্য্যান্বিত হন, তাহার কোন কারণ নাই। বাঙ্গালা দেশে অনেক ত্রিবেদী, শুকুল, পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধিধারী কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ আছেন, সিংহ উপাধিধারী অনেক রাজপুত আছেন, যাঁহারা ভাষায় এবং অন্যান্য বিষয়ে বাস্তবিকই বাঙ্গালী। মহারাষ্ট্রীয় হইয়াও দেউস্কর মহাশয় সেইরূপ বাঙ্গালী ছিলেন। এই জন্য তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বদেশী প্রচেষ্টা, জাতীয় শিক্ষাদান প্রচেষ্টা প্রভৃতি বাঙ্গালীর অন্যান্য সমুদয় জাতীয় আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন। তিনি অনেক মাসিক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তকও আছে। তন্মধ্যে ঝাঁসীর রাণী, ঝাঁসীর রাজকুমার, বাজীরাও ও আনন্দীবাঈ যোশী,উৎকৃষ্ট জীবনচরিত গ্রন্থ। 'দেশের কথা' পুস্তকে ভারতবর্ষীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির অধোগতির ইতিহাস বিবৃত আছে। এই গ্রন্থ হিন্দী ও মরাঠীতে অনুবাদিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হওয়ায় ইহার প্রচার বন্ধ আছে। তিনি গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, উহার শুনানি হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। দেউস্কর মহাশয়ের ভাষা বেশ বিশদ ও বিশুদ্ধ ছিল। তাঁহার ইতিহাসচর্চ্চায় খুব অনুরাগ ছিল। তিনি দীর্ঘকাল জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বহুকাল "হিতবাদী"র সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অকালে মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ আরও বাড়িত।

[বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর]

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যয়-নির্ব্বাহক ছিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যস্থান তাঁহার বাটীতেই ছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং নিজেও লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত একখানি ইংরাজী কলিকাতার ইতিহাস আছে। তাঁহার স্থাপিত শোভাবাজার দাতব্য সভা দ্বারা অনেক দরিদ্র ব্যক্তি উপকৃত হইয়াছে। কিছুদিন তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম রাজনৈতিক অনুচর ছিলেন। সমুদ্রযাত্রায় যে হিন্দুর জাতি যায় না, ইহা দেখাইবার জন্য তিনি একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যসভা হইতে সাহিত্য-সংহিতা নামক একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়।

১৩২০ আষাঢ়

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অক্ষয় সাহিত্য-কীর্ত্তির সহিত পাঠকেবা সুপরিচিত; কাজেই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার সেই কীর্ত্তির অনুশীলন কিংবা সুদীর্ঘ সমালোচনা উপযোগী বলিয়া মনে হইতেছে না। বিশেষতঃ এই প্রবাসীতে ১৩১৫ সালে তাঁহার বহু পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া চুকিয়াছি। সাহিত্যে তাঁহার যথার্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার সময় এখনো উপস্থিত হয় নাই; এ সময়ে অনুরাগ-বিরাগের উত্তেজনা পরিহার করিয়া নিঃস্বার্থ সমালোচনা করা বড় কঠিন। যাঁহার স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনাময় সঙ্গীত বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে গীত হইতেছে, সুখে-দুঃখে সকলে যাঁহার হাসির জ্যোৎস্না সম্ভোগ করিয়া অফুরন্ত প্রফুল্লতা লাভ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহার দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় দর্শনে অসংখ্য লোক প্রতিনিয়ত চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, আশা করি তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই আজ তাঁহার কথা সস্নেহে স্মরণ করিতেছেন।

সর্ব্ব প্রথমেই কবির মৃত্যুর দিনের কথা মনে পড়িতেছে। যাঁহাকে অপরাহ্ন ৪টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে এবং প্রফুল্ল মনে অবস্থিত দেখিয়াছিলাম, তিনি সেই অপরাহ্নেই সহসা ৫টার সময় সংজ্ঞা হারাইয়া, রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। এ সংবাদে গভীর শোকের মধ্যেও যে একটুখানি তৃপ্তির কারণ ছিল, তাহা চারি পাঁচ দিন পরে অনুভব করিয়াছিলাম। অপরিহার্য্য মৃত্যু "দুদিন আগে, দুদিন পিছে" ত আসিবেই; তবে সে যদি ভীতির ছায়া বিস্তার না করিয়া, অবসানের যন্ত্রণা না বহিয়া আসে, তবে তাহার নির্ম্মমতার মধ্যেও একটুখানি করুণার রেখা প্রতিভাত হয়। কবির মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে আমি যখন চিকিৎসকের দ্বারা আমার চক্ষু পরীক্ষা করাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা দেখাইয়াছিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি যদি নিজে বুঝিতে পারিতেছ যে তোমার অসুখ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই, তবে পরীক্ষা করাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? এই দেখ, আমি নিজে বুঝিতে পারিতেছি, বেশ ভাল আছি; কাজেই শরীর পরীক্ষার জন্য অনেক দিন ডাক্তার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না।" মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যিনি প্রসন্ন মনে এবং সুস্থ শরীরে ছিলেন, এই শোকের দিনে তাঁহার সৌভাগ্য স্মরণ করিতেছি।

তাহার পর মনে পড়িতেছে ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যিনি এ যুগে হাস্যরসে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃতি হইয়াছেন, তাঁহার যে বিন্দুমাত্র পরিহাস করিবার প্রবৃত্তি ছিল, কিম্বা দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া হাসিয়া সামাজিকতার সুখ বাড়াইবার দিকে ঝোঁক ছিল, তাহা হয়ত তাঁহার বাল্যকালে কেহ লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। যে ছাত্রেরা ক্লাসে বসিয়া হাসিত বা গল্প করিত, তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন না; সকলেই তাঁহাকে সুশীল, মিতভাষী এবং বিদ্যাশিক্ষায় অনুরাগী বলিয়া জানিতেন। যে সচ্চরিত্রতা এবং সাধুতার জন্য বাল্যকালে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাহা যে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, একথা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই জানেন। তিনি যে কত বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনের অনেক ছোট বড় কথার আলোচনায় দেশের লোক জানিয়া সুখী হইতে পারিবে।

পত্নীর চির বিদায়ের পর, ৮ বৎসর পূর্ব্বে, তিনি করুণ স্বরে অশ্রুসিক্ত নয়নে গাহিয়াছিলেন—"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে, দুদিন আগে, দুদিন পিছে।" তাহার পর আবার পত্নীবৎসল দ্বিজেন্দ্রলাল

সৈনিকের স্বদেশপ্রত্যাগমনেব কথার ছল করিয়া কাঁদিয়া গাহিয়াছিলেন—

"বহুদিন পরে হইব আবার
আপন কুটীর বাসী,
দেখিব বিরহ-বিধুর অধরে
মিলন-মধুর হাসি,
শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে
মিলন-মুখর বাণী,—
আমার কুটীর-রাণী সে যে গো,
আমাব হৃদয়-রাণী।"

"বহুদিন পরে" না হইয়া কবির এই পরপারে যাত্রা যে তাঁহার প্রথম গানের অনুরূপ "দুদিন পিছে'ই হইল, ইহাই আমাদের গভীর দুঃখ। তাঁহার পত্নীর বক্ষ হইতে মাতৃ-স্নেহটুকু কুড়াইয়া লইয়া তিনি মাতৃহারা দুইটি শিশুকে যেভাবে মানুষ করিতেছিলেন, কবির চরিত্র অনুধাবনের জন্য সে কথার ইতিহাস ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে।

সকলেই বলিতেন এবং এখনও বলিতেছেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসে অদ্বিতীয়, বহুশ্রেণীর চরিত্র অঙ্কনে সুপটু, এবং সঙ্গীতের সুরে ছোট বড সকলকেই স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত করিতে সুদক্ষ ছিলেন। এ কথাগুলি যে সত্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু যাহা কবির জীবনের নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল, যে ভিত্তির উপরে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রতি সঙ্গীতে এবং প্রতি চিত্রে তাঁহার যে ভাব ফুটিয়া উঠিত, অনেকে হয়ত সেই মৌলিক ভাবটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন নাই, অথবা লক্ষ্য করিয়াও অনেক সময়ে হাসির ঘটায় অথবা চিত্রের ছটায় ভুলিয়া গিয়াছেন। যাহাতে সমাজ উন্নত এবং পবিত্র হয় তাহাই তাঁহার লক্ষ্য এবং ব্রত ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাঁহার কাব্য-সমালোচনা ভবিষ্যতে হইবে। আমি এখন কবি-চরিত্রের এই মূল দিক্‌টির প্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ঠিক্ ২৭ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি যথার্থতঃ সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করেন। তাহাব পূর্ব্বে অনেক গান এবং কবিতা লিখিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে-সকল রচনা সৌন্দর্য্যের ক্ষণিক অনুভূতির অভিব্যক্তি মাত্র। ইউবোপ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর দ্বিজেন্দ্রলাল "একঘরে" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বচনা করেন। ঐ গ্রন্থে যে তীব্র ভাষায় সামাজিক অনেক ভণ্ডামির পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন, তাহা প্রথম-যৌবনসুলভ চপলতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবির অনেক রক্ষণশীল আত্মীয়-বন্ধু প্রচাব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ঐ কথায় স্থিতিশীল সমাজের লোকদিগের নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের আদর ও প্রতিপত্তি থাকিবে। দ্বিজেন্দ্রলাল সকল শ্রেণীব লোকের সহিত মিশিতেন, এবং স্বাভাবিক সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ করিতেন বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই বুঝি কালের প্রভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের মতের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহা বুঝিতে পারিয়া ২৭ বৎসব পূর্ব্বে প্রকাশিত "একঘরে" পুস্তিকাখানি এই প্রকার ভূমিকা লিখিয়া পুনর্মুদ্রিত করিলেন যে বহুকাল পূর্ব্বে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনও যে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, এই পুনর্মুদ্রণ হইতেই পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন।

"একঘরে" গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার পর প্রায় ঐ সময়েই কবি "ভারতী" পত্রিকায় "নূতন-পুরাতন" নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সমাজকে উন্নতির পথে চালাইবার জন্য তাঁহার কত আগ্রহ ছিল, তাহা ঐ প্রবন্ধে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। যেখানে গম্ভীর বিচার নিষ্ফল হয়, সেখানে তামাসায় বেশী কাজ দেখে বলিয়া তিনি হাসির গানে অনেক সামাজিক ভণ্ডামি এবং উপহাসাস্পদ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার হাসির গানের এই বিশেষত্বের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না।

কবি তাঁহার "প্রতাপসিংহ" নাটকে মুখ্যতঃ এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যদি আদর্শ উচ্চ না হয়, তবে প্রতাপসিংহের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা

এবং বীরত্বও ফলদায়ক হইতে পারে না। প্রতাপসিংহ যত বড় দেবতা হউন না কেন, তিনি "বংশগৌরব" প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। বংশগৌরব অপেক্ষা যে স্বদেশ অনেক গুণে বড়, এবং স্বদেশ বলিতে যে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বুঝায় না, এ কথাও নাটকের দুইতিন স্থলে কবি বুঝাইয়া গিয়াছেন। যাঁহার আদর্শ কেবল বংশগৌরব রক্ষা, তিনি যবনী-বিবাহের অপরাধে শক্তসিংহের মত ভাইকে পরিত্যাগ করিয়া হঠিয়া গেলেন। প্রতাপ বলিলেন—"শক্ত! তুমি আমার ভাই নও; কেননা তুমি যবনী-বিবাহ করিয়াছিলে।" কবি দেখাইলেন যে প্রতাপের মত মহাত্মাও মনের সঙ্কীর্ণতার ফলে ক্ষুদ্র হইয়া গেলেন, এবং প্রতাপ-প্রত্যাখ্যাত শক্তসিংহ সকল ক্ষুদ্র গণ্ডী এড়াইয়া বিশ্বজনের ভাই হইয়া দাঁড়াইলেন।

স্বদেশ-ভক্তিতে কবির প্রাণ পরিপূর্ণ ছিল, এবং তিনি স্বদেশকে সকল প্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত করিয়া খাঁটি গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "আমাদের দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" যখন সর্ব্বত্র গীত হইতেছিল, তখন তিনি লক্ষ্য করিতে ভুলেন নাই যে, অনেকে স্বদেশপ্রেমের নামে যাহা পরিত্যাজ্য এবং হেয়, তাহাও প্রাচীনতার নামে গ্রহণ করিতেছিল। যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রকার অন্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-সঙ্গীতের পার্শ্বে "আবার তোরা মানুষ হ" গীতটিকে স্থান দিয়াছিলেন। নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ না করিলে, কেবল স্বদেশ স্বদেশ করিয়া চেঁচাইলে যে ফল হইবে না, একথা হয়ত অনেকের কাছে রুচিকর নহে বলিয়াই ঐ "আবার তোরা মানুষ হ" গীতটি মাহাত্ম্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও বড় বেশী লোকপ্রিয় হইতে পারে নাই। স্বদেশের যে কল্যাণসাধনের জন্য তিনি দেশবাসীদিগকে স্বদেশপ্রেমে উত্তেজিত করিতেছিলেন, দেশের সেই কল্যাণ সাধিত হউক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। আমার প্রার্থনা এই যে, কবি-রচিত উদ্দীপনাপূর্ণ "ভারতবর্ষ-বন্দনা" গীতটি গাহিবার সময় সকলেই যেন একবার মনে করেন—"গিয়াছে দেশ, দুঃখ নাই; আবার তোরা মানুষ হ।" আমাদের সামাজিক পবিত্রতা এবং সুশিক্ষাই যে আমাদের যথার্থ উন্নতি, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া লইয়া যদি স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হই, তাহা হইলেই কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পবিত্র স্মৃতি অক্ষয় করিতে পারিব।

১৩২১ আষাঢ়

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

"বঙ্গদর্শন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইলাম। তিনি বসন্ত রোগে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি "ইন্দু" নামক উপন্যাস এবং "চিত্রবিচিত্র" নামক ছোট গল্পের বহি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; "প্রদীপ" মাসিকপত্রে তিনি "কলিকাল" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "নীলকণ্ঠ" প্রভৃতি দুই একখানি উপন্যাস আরম্ভ করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। "চিত্র-বিচিত্র" বহিখানিতে উকিল, উমেদার, সম্পাদক, ব্যারিষ্টার, হাতুড়ে ডাক্তার প্রভৃতির চিত্র বেশ সুন্দর হইয়াছে। শৈলেশবাবু

পরিহাসরসিক ছিলেন। এই রসিকতা "চিত্র-বিচিত্র" বহিখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে।

শৈলেশবাবু বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায়ে প্রথমে রবীন্দ্রনাথের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে রবিবাবু উহার সম্পাদকতা ত্যাগ করিলে তিনিই সম্পাদক হন। কিছুকাল "সমালোচনী" সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি "সাহিত্যসম্মিলনী" নামে একটি সাহিত্য আলোচনার সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার যে কয়টি অধিবেশন হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনীকান্ত সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যোগ দিয়া প্রবন্ধ পাঠ, গান, গল্প, আলোচনা করিতেন, এবং নব্য লেখকদিগের সঙ্গে পরিচয় করিতেন। রবিবাবুর শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এই সভায় পঠিত হয়।

শৈলেশবাবু বেশ অমায়িক ও মিশুক লোক ছিলেন।

১৩২১ অগ্রহায়ণ

বেলজিয়মের প্রধান কবি

বেলজিয়মের প্রধান কবি মরিস্ মাত্যারলিঙ্ক্ ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত যে-সকল নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পেলেয়াস্ এ মেলিসান্দ্ (Pelleas et Melisande) নাটকের অভিনয়ই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। তাঁহার রচনার কিছু কিছু অনুবাদ আমরা পূর্ব্বে ছাপিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় এই নাটকটির অনুবাদ ছাপিতে আরম্ভ করিলাম। মাত্যারলিঙ্ক ও তাঁহার পত্নীর চিত্র আমরা পূর্ব্বে প্রবাসীতে প্রকাশ করিয়াছি।

তিনি কবিতা ও নাটক ব্যতীত দার্শনিক পুস্তকও লিখিয়াছেন। তাঁহার দার্শনিক রচনাবলীতে নোবালিস্, এমার্সন, হেলা এবং ফ্লেমিশ কাথলিক মর্ম্মীদিগের (mystics) শিষ্য বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরে উপরে দেখিলে মানুষের সাধারণ দৈনিক জীবন এক রকম দেখায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিতে জানিলে, যাহা সহজে চোখে পড়ে না, এমন অনেক রহস্য উহার মধ্যে আছে, বুঝিতে পারা যায়। দর্শন, নাটক, গীতিকবিতা, মাত্যারলিঙ্ক যাহা কিছু লেখেন, সকলের মধ্যেই তিনি মানবজীবনের এই প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় মর্ম্মস্থল, পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া, দেখাইতে চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তিনি খুব সোজা ভাষায় লেখেন, এবং এ প্রকার রূপক ব্যবহার করেন যে মনে হয়, যেন তিনি জীবনের কোন বাস্তব চিত্র আঁকিতেছেন, তাহার উপর কোন অলঙ্কারের আবরণ নাই। জীবনকে তিনি এমন করিয়া আঁকেন যে উহার অদ্ভুতত্ব ও উহার ব্যাখ্যাতীত উপাদানগুলি আমাদিগকে চমকিত করে। তাঁহার অনেকগুলি নাটক মানবহৃদয়ের অপ্রত্যক্ষ ভাবসমূহের অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী লিপি। তাহাতে মানবাত্মাই নায়কনায়িকা। উহারই আধ্যাত্মিক

শোকহর্ষ বিপদসম্পদ ও অবদানপরম্পরা তিনি বর্ণন করেন। তাঁহার নাটকগুলির পাত্রপাত্রীর কার্য্যকলাপের উপর সাধারণ দেশকালের ব্যাপারসমূহের কোন প্রভাব নাই। এই-সব পিতৃমাতৃহারা রাজনন্দিনী, এই-সব অন্ধ, এই-সব নির্জ্জন দুর্গের বৃদ্ধ বক্ষী, এই-সব সন্ধ্যার ধূসর আলোতে আচ্ছন্ন প্রদেশ,—কে ইহারা, কোথায় ইহারা, কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়, আমরা জানিতে পাই না। তাহাদের মধ্যে বাহ্যবস্তুতন্ত্র কিছুই নাই। তাহাদের জীবন প্রগাঢ় তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব ও শক্তিতে পূর্ণ। সবই কিন্তু আধ্যাত্মিক। আত্মার জোয়ার ভাটা, চলাফেরা, পরিবর্ত্তনের গতিবিধির যে রহস্য, সেই রহস্যে সমস্তই আচ্ছন্ন।

১৩২২ মাঘ

উপেন্দ্রকিশোর রায়

[শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত]

জন্ম—মসূয়া, ময়মনসিংহ; ২৮শে বৈশাখ, ১২৭০।

মৃত্যু—কলিকাতা, ৪ঠা পৌষ, ১৩২২

তাঁহার পিতামহ সাধক ও সুপণ্ডিত ৺লোকনাথ রায় অল্প বয়সেই সংসারাসক্তির বন্ধনমুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একবারমাত্র সকলের অনুরোধে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন জমীদার তাঁহাকে উৎকোচ গ্রহণে প্রলুব্ধ করায় তিনি অচিরে সেই কর্ম্ম ত্যাগ করেন। এরূপ একাগ্রভাবে তিনি তন্ত্রোক্ত শক্তি সাধনায় নিবিষ্ট হ'ন যে তাঁহার পিতা, পুত্রের সংসার ত্যাগের আশঙ্কায়, ডামরগ্রন্থ নরকপাল মহাশঙ্খমালা প্রভৃতি সাধনের উপকরণাদি ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জ্জন করেন। এই শোকে লোকনাথ তিনদিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর মাত্র।

লোকনাথের পুত্র উদার তেজস্বী স্বাধীন-চেতা কালীনাথ রায় লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সংস্কৃত ও পার্শীভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাত্যহিক দেবার্চ্চনাদিতে তিনি স্বরচিত স্তোত্রাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার কাব্যকুশলতার যে-সকল পরিচয় তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহার সমস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থ হইয়াও তিনি পাণ্ডিত্যগুণে ব্রাহ্মণের বিচার-সভায় মধ্যস্থের আসন লাভ করিতেন। কথিত আছে, তিনি বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে শূদ্রের অনধিকারচর্চ্চায় ব্রাহ্মণসমাজ সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে নিষেধ জানাইবার জন্য এক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। সেই প্রতিনিধি অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আন্দোলনকারীগণ তাহাতেই নিরুৎসাহ হ'ন।

একবার বিধবাবিবাহসম্পর্কে-জাতিচ্যুত কোন দরিদ্রের গৃহে তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও সমাজহিতৈষীগণ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সমাজের বাধা নিষেধ ও শাসন অনুশাসনাদি উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। বলা বাহুল্য "মুন্সী শ্যামসুন্দর"কে জাতিচ্যুত করিতে কাহারও সাহসে কুলায় নাই।

শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র স্বনামখ্যাত সারদারঞ্জন রায় বর্ত্তমানে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন পাঁচবৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকীল ও জমীদার স্বধর্ম্মনিরত আচারনিষ্ট হরিকিশোর রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। তদবধি তিনি উপেন্দ্রকিশোর নামেই পরিচিত।

বালক উপেন্দ্রকিশোর ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া প্রতিদিন সুসজ্জিত সমারোহে গাড়ীতে চড়িয়া স্কুলে যাইতেন—কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বয়স্ক সঙ্গীগণ দেখিতেন যে ক্ষুব্ধ মনের অভিমান সর্ব্বদাই তাঁহার মুখশ্রীতে বিষাদ-রেখায় অঙ্কিত হইয়া থাকিত। তারপর, ক্রমে তিনি স্কুলে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন; নানা বন্ধুসংসর্গে, খেলা ধূলার উৎসাহে, বাঁশী বাজাইয়া ও ছবি আঁকিয়া, তাঁহার মুকুল জীবন নব নব আনন্দে বিকশিত হইতে লাগিল। ক্রমে কোন্ অলক্ষ্য সূত্রাবলম্বনে শিল্প ও সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁহার হৃদয়কে অল্পে অল্পে একেবারে অধিকার করিয়া বসিল।

অতি অল্প বয়সেই কেবল নিজের আগ্রহে বিনাশিক্ষা ও বিনাসাহায্যে, তিনি শিল্পসাধনায় কৃতিত্বলাভ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। একবার সার এস্‌লি ইডেন স্কুল পরিদর্শনের কালে তাঁহার খাতায় দৈবাৎ আপনার প্রতিকৃতি দেখিয়া তরুণ শিল্পীকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া বলেন, "তুমি ইহারই চর্চ্চায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিও।"

শিক্ষকগণ বলিতেন, উপেন্দ্রকিশোর প্রতিদিন ক্লাসে অত্যুচ্চ স্থান লাভ করেন, তিনি অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু জ্ঞানলিপ্সা সত্ত্বেও স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁহার মন নাই। রাত্রে তিনি আদৌ পড়েন না; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন. "শরৎকাকা পাশের ঘরে পাঠাভ্যাস করেন, তাহাতেই আমার পড়া হয়। দুইজনে পড়িতে গেলে অনর্থক গণ্ডগোল বাড়ে।" ইহার মধ্যে একদিন তিনি বাসায় আসিয়াই বলিলেন "গুপীদা এখনই আমার জন্য একটা বেহালা কিনিয়া আন। একটা গৎ শুনিয়াছি, দেরী করিলে ভুলিয়া যাইব।" সেই উৎসাহে সেই দিনই বেহালা বাদনের সূত্রপাত হইল।

সহৃদয় ছাত্রবৎসল শরৎচন্দ্র রায় তখন ময়মনসিংহের একজন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁহার স্নেহদৃষ্টি এই প্রতিভাবান বালকের উপর পড়িল। তিনি বলিলেন "এই উপেন্দ্রকিশোর কালে একজন মানুষের মত মানুষ হইবে। শিল্প ও সঙ্গীতের ঝোঁক তাহার যতই প্রবল হউক, সে পরীক্ষায় কৃতিত্ব লাভ করিবেই। পিতা হরিকিশোর রায় হিন্দু সমাজের নেতা হউন, হিন্দুধর্ম্মজ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভাপতি হউন, উপেন্দ্রকিশোরকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতেই হইবে।"

তখন ব্রাহ্মভীতির যুগ। ব্রাহ্মসমাজ কখন্ কাহার সন্তানকে গ্রাস করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় বঙ্গের অভিভাবকগণ সন্ত্রস্ত। শরৎচন্দ্র নামজাদা ব্রাহ্ম—হিন্দু সন্তানমাত্রেই তাঁহার সংসর্গবর্জ্জনে বিশেষভাবে উপদিষ্ট— তাঁহার এ সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা কোথায়? তিনি ব্রাহ্ম ছাত্রগণকে এবং বিশেষভাবে উপেন্দ্রকিশোরের সহাধ্যায়ী সুহৃদ্ ও আত্মীয় গগনচন্দ্র হোমকে উৎসাহ দিয়া এই কার্য্যে ব্রতী করিলেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে বালকের মনে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে যে জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইল তাহা সন্ত্রস্ত অভিভাবকগণের শত বাধা নিষেধ শাসন নির্য্যাতন সত্ত্বেও ক্রমে ঐকান্তিক আগ্রহ ও ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে চলিল।

এদিকে প্রবেশিকা পরীক্ষা আসন্নপ্রায়। শরৎবাবু ব্যাকুল হইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক রত্নমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন—কই, তাঁহার প্রিয়ছাত্র যে এখনও বেহালা ও তুলিকাব মোহ ত্যাগ করিল না; এখনও যে সে পড়ায় মন দিল না! শিক্ষক মহাশয় ছাত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখিয়াছি; দেখিও, তুমি যেন আমাদের নিরাশ করিও না।" অনুতপ্ত বালক সেইদিনই গৃহে আসিয়া আপনার সাধের বেহালাটি ভাঙিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে পরীক্ষান্তে ১৫ টাকা বৃত্তি

পাইয়া তিনি মহা সমারোহে "ব্রাহ্ম দোকানে" এক ভোজ দিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মদলে মিশিয়া, ব্রাহ্মছাত্রাবাসে বাস করিয়া এবং ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়া বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট আত্মীয়স্বজনকে আরও শঙ্কিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার সতের বৎসর বয়সে তিনি যে ডায়ারি রাখিতেন তাহাতে তাঁহার সেই সময়কার জীবন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় অনেক সময়ে সঙ্গীতচর্চ্চায় ও চিত্রানুশীলনে তাঁহার অবসর সময় এবং অনবসর কালও, কাটিয়া যাইত। নানা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র লইয়া নানা শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য লইতে আসিত। যন্ত্রের জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হইলে লোকে তাঁহার শরণাপন্ন হইত।

সেই সময় হইতেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থাদি রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়াছিল; শিশুদিগের জন্য একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বাভাষ তাঁহার ডায়ারির মধ্যে স্পষ্টই দেখা যায়। আর দেখা যায়, তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা। কলাবিদ্যার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার বিজ্ঞানমুখী প্রতিভা তাঁহাকে নানা সুযোগে নানা বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিত। এই জ্ঞানানুরাগ উত্তরকালে তাঁহাকে বিশেষভাবে নানাক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সক্ষম করিয়াছিল।

বিশ বৎসর বয়সে, তাঁহার পিতা হরিকিশোর রায়ের লোকান্তর প্রাপ্তিতে তাঁহার জীবনে এক বিষম পরীক্ষাসঙ্কট উপস্থিত হইল। নিষ্ঠাবান ও প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজনেতার শ্রাদ্ধে যত প্রকার সমারোহ দান দক্ষিণাদির ব্যবস্থা হওয়া স্বাভাবিক তাহার আয়োজন হইয়াছে, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় স্বাধীনচেতা অকুতোভয় যুবক উপেন্দ্রকিশোর বলিয়া বসিলেন, "আমি প্রচলিত দেশাচারমতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিব না।" ক্ষুদ্ধ রুষ্ট আত্মীয়স্বজন ঘোর বিরুদ্ধাচারণ করিতে লাগিলেন, সমাজ তাঁহার নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই একনিষ্ঠ আত্মস্থ মহাপুরুষ সকল নির্য্যাতন ও ভ্রূকুটিভঙ্গিকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অশান্তির মধ্যে অবিচলিত প্রশান্তভাবে আপন বিশ্বাসনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিলেন, এবং সামাজিক উৎপীড়নের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেন।

ইহার অনতিকাল পরেই দেশবিশ্রুত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহসঙ্কল্পের সংবাদ দেশে গিয়া পৌঁছিল। এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অনাচার হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু প্রতিবাদের তপ্ত নিঃশ্বাস কোন দিনই তাঁহার চিত্তের অটল স্থৈর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোনরূপ বাদবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত না হইয়াও তাঁহার চিরপ্রসন্ন স্বভাবের অনিন্দ্যসুন্দর মাধুর্য্যে তিনি এমন অক্লেশে বিরুদ্ধাচারীর হৃদয়ে আসন লাভ করিলেন যে, প্রতিবাদের কোলাহল আপনা হইতেই সসম্ভ্রমে থামিয়া গেল। এই সময় হইতেই, অথবা ইহার পূর্ব্বেই, তিনি শিশু-সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হ'ন। যে সময়ে মানুষ অসম্ভব রকমের উচ্চকথার আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া শিশুদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত একরূপ ভুলিতে বসিয়াছিল, সেই সময়ে প্রমদাচরণ সেন প্রভৃতির সহযোগে তিনি শিশুসাহিত্যে যুগান্তর আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিশুচিত্ত বিনোদনের এই ঐকান্তিক আগ্রহের উৎসকে যখন অন্বেষণ করি, তখন দেখি যে শিশুজীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহার সহিত আনন্দের আদানপ্রদানে তাঁহার হৃদয়ের প্রেম যে কি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, এমন ভাষা পাইনা যাহাতে তাহার সম্যক্ বর্ণনা করিতে পারি। শিশুর শিশুত্বের মধ্যে তিনি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহার আনন্দযজ্ঞে আপনাকে এমন যথার্থভাবে বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার প্রথম শিশুপাঠ্য গ্রন্থ "ছেলেদের রামায়ণ" মুদ্রণকালে তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্রগুলি

উড্এন্গ্রেভারের হস্তে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহারই ফলে এদেশে বিজ্ঞানসম্মত চিত্রশিল্পের প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি উৎসুক হইয়া পড়েন। লঘুভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল,—যখন যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন তাহারই সাধনায় একেবারে নিমগ্ন থাকিতেন। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যক্তিক্রম হয় নাই। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি শক্তি অর্থ স্বাস্থ্য ও সময় অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন এবং গুরুতর মানসিক শ্রমের ফলে অকালে আয়ুক্ষয়কর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। "হাফটোন" শিল্প তখন সবেমাত্র প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—তখনও তাহার মূলসূত্রাদি সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই; মতসঙ্কুল অস্থিরতার মধ্যে তাহার কার্য্যপ্রণালীর সঙ্কেতাদি তখনও সুসঙ্গতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তিনি স্বাধীনভাবে এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার যে প্রকার সমাধান করেন, তাহাই বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। হাফটোনের যে-সকল প্রণালী পাশ্চাত্যদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে তাহাতে বহুল পরিমাণে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থাই অনুসৃত হইয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার কৃতিত্ব নানাদেশে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে।

আজ বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা উপেন্দ্রকিশোর রায় বলিতে কেবল কৃতী শিল্পীকেই দেখিলেন, সাহিত্য-কলাকুশল সঙ্গীত-রসজ্ঞকে দেখিলেন, তাঁহারা জানেন না কোন্ মনস্বী আত্মা আপনাকে এই সকল পরিচয়ের অন্তরালে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা জানেন না, যে, সেই কীর্ত্তিমান পুরুষ যতই কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকুন না কেন, কিছুতেই তাঁহার নিরহঙ্কার বিনয়নম্রতাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হয় নাই।

সংসারে স্বার্থব্যবসায়ী প্রবঞ্চক তিনি কম দেখেন নাই, নিজে ব্যবসায় সম্পর্কে ও সংসারের নানাক্ষেত্রে শতবার প্রতারিত হইয়াছেন—কিন্তু তবু মানুষের উপর তাঁহার কি গভীর বিশ্বাস! মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মনুষ্যত্বের প্রতি কি আশ্চর্য্য শ্রদ্ধা! অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাংসারিক ক্ষতি অকুণ্ঠিত চিত্তে বহন করিয়াছেন, কিন্তু এক দিনের জন্যও অকারণ সন্দেহকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের প্রসন্নতা নষ্ট করিতে সম্মত হয়েন নাই।

তাঁহার অন্তরের সংস্পর্শে যে আসে নাই, সে জানে না তাঁহার জীবনের প্রত্যেক সাধনার মধ্যে তিনি কি আনন্দরস সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যখন যাহাতে হাত দিতেন তদর্পিতপ্রাণ হইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইতেন। শিশুদের জন্য লিখিতে বসিয়াছেন, চিত্ররচনার জন্য হস্তে তুলিকা লইয়াছেন—মনে হইত সংসারে তাঁহার অন্য কোন চিন্তা নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই; উপস্থিত কর্ত্তব্যের আনন্দে তিনি আর-সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। রোগযন্ত্রণা ও সাংসারিক সকল দুর্ভাবনার মধ্যে যেমন বেহালাখানি হাতে লইয়াছেন—আমি তন্ময়! আর কোথায় দুঃখ, কোথায় বিপদ—মনে হয় এমন শান্তি এমন সান্ত্বনা বুঝি আর কিছুতে মিলে না। সত্যকে যিনি পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখিতে পান, কর্ত্তব্য তাঁহার কাছে শুষ্ক কর্ত্তব্যমাত্র থাকিতে পারে না — মনে হয় জীবনের সামান্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যেও তিনি আনন্দরস লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই।

দুরন্ত রোগনির্য্যাতনের মধ্যে আপনার চিত্তের স্থৈর্য্যকে রক্ষা করিয়া চিকিৎসকের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে রোগ যখন সহসা নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেহকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তিনি চিকিৎসকদিগের শত আশ্বাস সত্ত্বেও তাহার মধ্যে কালের আহ্বান শুনিয়া অটল বিশ্বাসে, প্রশান্ত চিত্তে, পরম আনন্দে লোকান্তর প্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি পরকালের কথা বলিয়া গেলেন; মৃত্যুর বিভীষিকা কি অপরূপ আনন্দময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল! "আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি, আনন্দেই থাকিব"— একি আশ্চর্য্য সান্ত্বনার কথা। যেমন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে

শিশু এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি আনন্দের আহ্বানে অমর আত্মা লোকান্তর প্রাপ্ত হয়, এই সাক্ষ্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

গিরিডি থাকিতে দুই দিন রোগাচ্ছন্ন দেহে তন্দ্রাগতবৎ পড়িয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সেই সময়ের কথা বিশেষ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। "এই সময়ে সকল যন্ত্রণাবিমুক্ত হইয়া আমি কি আনন্দে বাস করিয়াছি, কি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছি—তোমরা তাহা জান না। তোমরা আমাকে ঔষধ পথ্যাদি যাহা দিয়াছ তাহার কি অপূর্ব্ব স্বাদ—আমি অমৃত জ্ঞানে তাহা পান করিয়াছি। আমার সকল ভয় ভাবনা দূর হইয়াছে—আমি সেই জ্যোতির রেখা দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম, আমি এ দেহ নই, কিন্তু আমার এই দেহের জন্য তোমাদের কত যত্ন, তোমরা ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা কতরূপে তাহার সেবা করিতেছ। দেহবিমুক্ত হইয়া মৃত্যুর অতীত লোকে মানুষ কি ভাবে অবস্থান করে, দয়াময়ের কৃপায় আমি তাহা স্পষ্ট দেখিলাম। দয়াল আমায় বুঝাইয়া দিলেন, তোমাকে এইরূপ বিদেহী অবস্থায় থাকিতে হইবে।" দয়া কি জিনিষ! দয়া যে কল্পনা নয়, দয়াময় নাম যে শুধু আপাত তৃপ্তিপ্রদ নামমাত্র নয়, জীবন্ত জাগ্রত করুণা যে জীবনবেদের ছত্রে ছত্রে আপনার পরিচয় দিয়া যাইতেছে, অন্তিম সময়ে তাহার সাক্ষ্য এমন করিয়া কয়জনে দেয়?

গিরিডিতে যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার সুব্যবস্থার কথা বারবার বলিতেন. "আমি রোগযন্ত্রণার সময়ে যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যেন এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।" গিরিডির দারুণ শীতের উপশমজন্য গরম কাপড় আনান হইল। কিন্তু দরজি কই? সেই উদ্বেগ ও ব্যস্ততার মধ্যে জামা প্রস্তুত করে কে? গুরুতর কর্ম্মের তাড়নায় কাহারও অবসর আর ঘটিয়া উঠে না। এমন সময় অযাচিতভাবে কোথা হইতে দরজি আসিয়া উপস্থিত! তখন ভক্তের আনন্দ দেখে কে! "দেখ ভগবানের দয়া!" ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানের চিরজাগ্রত ইচ্ছা সৃষ্টি তোলপাড় করিয়া অঘটন ঘটাইতে পারে, একথা আজ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করাইলে তিনি সুস্থতা লাভ করিবেন, এরূপ কথা তিনি বলিতে দিতেন না। বলিতেন—"ওরূপ ভাবিতে নাই। ভগবান যেরূপ বিধান করেন তাহার জন্যই যেন প্রস্তুত থাকিতে পার।"

মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে ভক্তিভাজন দাদামহাশয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে তিনি প্রার্থনা করিতে বলেন। দাদামহাশয় প্রার্থনায় সময় বলেন "তুমি ইঁহার জীবনের অপরাধ সমুদয় মার্জ্জনা কর।" এ প্রার্থনায় তৃপ্ত হইলেন না। আবার তিনি নিজেই আকুলভাবে প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন "আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, এ প্রার্থনা আমি করি না। যদি দণ্ডদান আবশ্যক হয়, দণ্ডই দাও। কিন্তু আমায় পরিত্যাগ করিও না।"

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, রবিবার ঊষার প্রাক্কালে পাখীর কাকলী শুনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "পাখীরা এমন করিয়া ডাকে কেন?" বলা হইল, এখন সকাল হইয়া আসিতেছে। ইহাতে অত্যন্ত মৃদুভাবে যেন আপনমনে তিনি কি বলিলেন, ভাল বোঝা গেল না; কেবল শোনা গেল, "পাখীরা কি জানে? তারা বুঝতে পারে?" দুটি ছোট পাখী জানালার কাছে আসিয়া কিচিরমিচির করিয়া উড়িয়া গেল। তিনি বিস্মিত ভাবে তাকাইয়া বলিলেন "ও কী পাখী! ও কী বলিয়া গেল, শুনিলে না? পাখী বলিল 'পথ পা' 'পথ পা'।" রবিবার দিবাবসানের সঙ্গে যখন সকলের আশারও অবসান হইয়া আসিল, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আত্মীয়স্বজন সকলে সমবেত হইলেন। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করিতেছিলেন, হয়ত অন্তিমে, তাঁহাকে ক্ষয়রোগের যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। কিন্তু তিনি অজাতশত্রু, মৃত্যুও তাঁহার পরম মিত্ররূপে অবতীর্ণ হইল। মৃত্যুর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের মধ্যে দয়ালের শেষ দয়ার সাক্ষ্য রাখিয়া তিনি পরম শান্তিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত চিরশান্তিময় সুখের দেশে প্রস্থান করিলেন।

কি শান্তি! কি শান্তি! ভয়াবহ মৃত্যুর কি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি! তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমার রোগক্লিস্ট দেহকে দেখিতেছ; আমার অন্তরে কি আরাম, কি শান্তি, তাহা যদি দেখিতে, তোমাদের আর দুঃখ থাকিত না। আমার জন্য তোমরা শোক করিও না—আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব। মৃত্যুর সময়ে ক্রন্দন করিয়া আমাকে অস্থির করিও না। আমার কাছে বসিয়া সকলে ভগবানের নাম গান করিও।" প্রয়াণকালে উষালোকে সঙ্গীত হইতেছিল—যখন গান আরম্ভ হইল "জানিহে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে" তখনও তাঁহার মৃদুকম্পিত ওষ্ঠ যেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়াছিল। তারপর আপনা হইতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্বাস থামিয়া গেল—অস্তমিত জীবনসূর্য্য কোন্ নূতন লোকে নূতন প্রভাতের নব আনন্দে উদিত হইল জানি না।

মৃত্যুর অতীত লোকের পাথেয়রূপে জীবনের সঞ্চিত পুণ্য আজ তাঁহার সম্বল রহিয়াছে। কায়মনোবাক্যে যিনি কোন দিন সত্যকে লঙ্ঘন করেন নাই, শাশ্বত চিরজাগ্রত সত্য আজ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। যে দয়ার সাক্ষ্য তিনি আজীবন বহন করিয়া গেলেন, সে দয়া আজও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। যে আনন্দের আস্বাদনে বিভোর হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমি আনন্দে আছি আনন্দেই থাকিব" সেই আনন্দ তাঁহার অনন্ত জীবনপথের শাশ্বত সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং
প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।

[উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় হাফ্‌টোন খোদাই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন এবং যেসব প্রক্রিয়া ও যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাহা ইউরোপ আমেরিকায় নূতন ও মূল্যবান্ বলিয়া আদৃত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের অভাবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাংলায় লেখা সহজ নয়; সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইংরেজীতে জানুয়ারী মাসের মডার্ণ-রিভিউ কাগজে দেওয়া হইয়াছে।

তিনি চিত্রাঙ্কনে সুদক্ষ ছিলেন, বিশেষতঃ প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে। শিশুদের মাসিক-পত্র ও বহির জন্য ছবি আঁকিতে, তাহাদের জন্য ব্যঙ্গাচিত্র বা কৌতুকজনক ছবি আঁকিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। বৈজ্ঞানিক ছবিও তিনি বেশ আঁকিতে পারিতেন। তাঁহার "সেকালের কথা"য়, মানুষের সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং অতি প্রাচীন মানুষদের সমকালে, পৃথিবীতে যে-সব জীবজন্তু ছিল, তাহাদের কতকগুলির ছবি ও বৃত্তান্ত আছে। এইসব ছবি তাঁহার নিজের আঁকা। এই ছবিগুলি দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্‌টর হল্যাণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন, ছবিগুলি এখানে ছোট-ছেলেদের চিত্তরঞ্জক বহিতে দেওয়া হইতেছে, কিন্তু এরূপ চিত্র বিলাতী প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইতে পারে। "সন্দেশে"র জন্য তিনি অণুবীক্ষণের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র নানা প্রকার ফুলের যে রঙীন ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহা বড় সুন্দর।

উপেন্দ্রবাবু পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রত্ন-জীববিজ্ঞান, প্রভৃতি নানা বিজ্ঞান জানিতেন। অনেক বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। এগুলি পল্লবগ্রাহীর মত এক আধটা বিলাতী সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ দেখিয়া লেখা নয়, বিশেষজ্ঞের মত লেখা। তাঁহার "আকাশের কথা"র অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সম্ভবতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুকুমার সম্পূর্ণ করিয়া বাহির করিবেন। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি প্রবাসীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আরও একটি কতকদূর লেখা আছে। তাহা মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে।

কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং দক্ষতার সহিত উহা শিখাইতে পারিতেন। সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। তিনি যে স্বরলিপি ব্যবহার করিতেন, তাহা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝিতে পারিত। হারমোনিয়ম শিখাইবার জন্য তিনি একখানি বহি লিখিয়াছিলেন। উহার বেশ কাট্‌তি ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে হারমোনিয়মের দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের বড় অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। এই জন্য তিনি ঐ বহির প্রকাশকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আর নূতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই।

তিনি শিশুদের জন্য রামায়ণ মহাভারত অবলম্বনে যে সব বহি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সমকক্ষ বহি বাংলা শিশুসাহিত্যে নাই। তিনি রামায়ণ মহাভারত পৌরাণিক গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, উপকথা, বা আর যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা ছেলেদের জন্যই হউক বা বুড়োদের জন্যই হউক, তাঁহার বিমল রসিকতার মৃদু ও স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। লিখিতে তিনি যে আনন্দ পাইতেন, অপরে পড়িয়া সেই আনন্দ পাইত বলিয়া তাঁহার রচনা সাহিত্য নামের যোগ্য হইয়াছে।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সমুদয় পুরাণে দেবদেবী সংপৃক্ত এক একটি আখ্যায়িকা কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া একটি বহি লিখিবেন; কিন্তু পীড়িত হইয়া পড়ায় তাহা করিতে পারেন নাই। বাংলা ছাপার অক্ষর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিলে হরফ ঢালাইয়ের কাজ, এবং ছাপাখানার কম্পোজ করার কাজ, অনেক সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য হয়; এবং ইংরেজী যেমন টাইপ-রাইটার কল আছে, বাংলারও তেমনি হইতে পারে। কিরূপ অক্ষর করিলে ইহা হইতে পারে, তাহা আঁকিয়া, এবং প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহাও করিয়া যাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার মত্ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার অনেকটা জানেন।

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের নানাবিষয়িণী প্রতিভার কথা লিখিয়া মানুষটির পরিচয় দেওয়া যায় না। তাঁহার সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি, তাঁহার বিনয়নম্র সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার, তাঁহার সরস বাক্যালাপ তাঁহার অন্তরের কতকটা সাক্ষ্য দিত। তিনি যেমন নম্র, তেমনি স্বাধীনচিত্ত ছিলেন। এই স্বাধীনচিত্ততায় রূঢ়তা রুক্ষতা ছিল না। তাঁহার চরিত্রে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের সুন্দর সংমিশ্রণ হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সঙ্গ ছেলে বুড়ো সকলেরই ভাল লাগিত। তিনি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, যদিও ভক্তির কথা তাঁহার মুখে বড় শুনা যাইত না। সম্পাদক।]

১৩২২ চৈত্র

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

ভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ছিলেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ কয়েক বৎসর হইল কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন, এবং ভক্তিপূর্ণ বিস্তর গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল। গীতরত্নাবলী, বিধানভারত পথের সম্বল, ব্রহ্মগীতা, নববৃন্দাবন যুগলমিলন, ঈশাচরিত, ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা, কেশবচরিত, সাধু অঘোরনাথ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, জগতের বাল্যইতিহাস, বিংশ শতাব্দী, গরলে অমৃত, ইহকাল পরকাল, বাল্যসখা, যৌবনসখা, প্রভৃতি তাঁহার সাহিত্যিক শক্তি ও কর্ম্মভাবের পরিচালক।

১৩২৩ আশ্বিন

মুকুন্দ দাসের যাত্রা।

বড় বড় কবি ও অন্য লেখকেরা যাহা লেখেন, অনেক সময় তাহা পুস্তকে এবং অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। দেশে শিক্ষা উচ্চতম সীমা পর্য্যন্ত বহু বিস্তৃত হইলে কবি ও অন্যান্য লেখকদের ভাব চিন্তা আদর্শ সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার সামান্যই হইয়াছে। এইজন্য, এক দিকে যেমন পুস্তকাদির দ্বারা লেখাপড়া সকলকেই শিখাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি যাত্রা, কথকতা, প্রভৃতি প্রাচীন প্রথা, এবং ম্যাজিক লণ্ঠন এবং বায়োস্কোপ প্রভৃতি নূতন উপায় দ্বারাও লোককে শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাত্রার পালা কেবল রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। এই-সকল প্রাচীন গ্রন্থে লোকশিক্ষার প্রভূত উপাদান বিদ্যমান। কিন্তু কালক্রমে পৃথিবীর ও ভারতবর্ষের যে-সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে, তদুপযোগী নূতন নূতন শিক্ষারও প্রয়োজন আছে। কিরূপ ভাব চিন্তা ও আদর্শ প্রচারিত হইলে, সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানাদি কিরূপ হইলে, আধুনিক পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যে আমরা উন্নতি, শক্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারি, তাহা নানা পুস্তকে, মাসিকপত্রে ও সংবাদপত্রে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে উক্ত ও আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। এইগুলিকে যাত্রার পালার ভিতর দিয়া শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার প্রয়োজন আছে। বরিশালের প্রসিদ্ধ যাত্রাওলা মুকুন্দদাস এই কার্য্য করিয়া সমাজসেবা এবং নিজের শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। গান ও অভিনয় করিবার

শক্তি তাঁহার আছে। তাঁহার পালাগুলিতে কোন কোন প্রসিদ্ধ লেখকের রচনার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, এবং কাহারও কাহারও কবিতার ঠিক্ এক একটি পংক্তি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়; কিন্তু ইহা বলিলে তাঁহার নিজের শক্তির কোন লাঘব করা হয় না। একজন গ্রীক মনস্বী সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি দর্শনশাস্ত্রকে স্বর্গ হইতে আনিয়া হাটে বাজারে পথে ঘাটে জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়াছিলেন। এটা সামান্য কাজ নয়।

অনেক দুর্লক্ষণ সত্ত্বেও বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-সব কারণে আমরা নিরাশ হইতে পারি না, আধুনিক আদর্শে অনুপ্রাণিত যাত্রার আবির্ভাব তাহার মধ্যে একটি। এরূপ যাত্রা সমাজে আদর পাইলে আশার দীপ আরও উজ্জ্বল হয়।

১৩৪১ আষাঢ়

যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস

যাত্রা ও গানের ভিতর দিয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশহিতৈষণা প্রচারের জন্য বিখ্যাত বরিশালের মুকুন্দ দাসের পরলোকগমনে বাংলা দেশ তাঁহার যাত্রা হইতে আনন্দ ও অনুপ্রাণনা আর সাক্ষাৎভাবে পাইবে না। তাঁহার পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। তাঁহার গুরু অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহাকে মুকুন্দ দাস নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার জন্য তাঁহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল।

১৩২৩ পৌষ

প্রিয়নাথ সেন।

খ্যাতিমান্ সাহিত্যরসিক ও সমালোচক প্রিয়নাথ সেন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যোগ্য পুত্র মন্মথনাথ সেনের অকালমৃত্যুর শোক পাইয়াছিলেন, নিজেও বৃদ্ধ পিতাকে কাঁদাইয়া গেলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এইসকল ভাষার বিস্তর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "সুবর্ণবণিকসমাচার" পাঠে অবগত হইলাম, তিনি কলিকাতা আহিরীটোলা-নিবাসী স্বনামধন্য মথুরমোহন সেনের বংশধর...তিনি বাণীপূজার একজন নির্ব্বাক সাধক ছিলেন। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে সঞ্চিত তাঁহার পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সযত্নে সংগৃহীত আছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসেও তিনি ত্রিশ টাকার পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করেন।

প্রথমে "প্রবাসী"তে মুদ্রিত এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের

"জীবনস্মৃতি"তে প্রিয়নাথ সেন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষায় সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন— তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস— এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

সাহিত্যরসিকের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ এখন সুদূরে। দেশে থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সেন মহাশয় সম্বন্ধে আরও কত কথা জানিতে পারা যাইত। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন।

প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ দরিদ্র হইল।

১৩২৩ মাঘ

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-লেখক

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া ল্যুসিটেনিয়া জাহাজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে জার্মেনিরা ঐ জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। যোগ্য পুত্রের এই আকস্মিক অপমৃত্যুতে চণ্ডীবাবু অত্যন্ত শোক পান। ইন্দুপ্রকাশ আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বেই সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার পিতামাতার শোকে সমবেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর চণ্ডীবাবুর জামাতা বিজ্ঞানকলেজের অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ শেঠ গবর্ণমেন্ট-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন; কারণ জানা যায় নাই। ইহাতে তাঁহাদের পারিবারিক ক্লেশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই নিরপরাধ জামাতা কেমন করিয়া মুক্তি পাইতে পারেন, সেই চেষ্টায় চণ্ডীবাবু ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ফিরিবার সময় ট্রাম গাড়িতে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যান. এবং তাঁহার দেহের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া

যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহারও এইরূপে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পরিবারবর্গ যে কিরূপ শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

চণ্ডীবাবু "মা ও ছেলে", "কমলকুমার", প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত-রচয়িতা বলিয়াই তিনি পরিচিত। ইহা বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এইরূপ পুণ্য-শ্লোক পুরুষের জীবনচরিত লিখিবার সুযোগ অল্প লোকেরাই ভাগ্যে ঘটে। এ-বিষয়ে চণ্ডীবাবু ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার লিখিত জীবনচরিতের হিন্দী অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

চণ্ডীবাবুর বাগ্মিতা ছিল। তিনি মজলিশে বেশ গল্প জমাইতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিস্তর গল্প তিনি জানিতেন, এবং তাহা বলিতে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল।

১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ

পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম্ এ, বি এল, নবদ্বীপের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্রদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন; কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন পঞ্চম। জ্ঞানেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসী, পতাকা, ও নবপ্রভার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, প্রভৃতিতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পুস্তক রচনাও তিনি করিয়াছিলেন। গরীব-সেবক দল গঠনের চেষ্টা তাঁহার জীবনের অন্যতম কাজ। তাঁহার রচনায় চিন্তাশীলতা ও দেশহিতৈষীতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

১৩২৪ মাঘ

সাহিত্যিকের দেহান্ত।

[গোবিন্দচন্দ্র রায়]

"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও!"
এবং
"কতকাল পরে বল, ভারত রে,
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।"
ইত্যাদি প্রাণস্পর্শী জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতা কবি

গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী মীরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের বহু বৎসর আগ্রা শহরে যাপিত হয়। সেখানে তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেন। আগ্রায় অবস্থানকালেই তিনি তাজমহলের "ধবল সৌধছবি"র ছায়াতলে বসিয়া "যমুনালহরী" রচনা করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে ভারতের অতীত ইতিহাসের কত সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা দেখিলে অকবিরও হৃদয় উদ্বেলিত হয়! আগ্রায় থাকিয়া প্রবাসী কবি যে মর্ম্মস্পর্শী বহু সঙ্গীত রচনা করিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবনচরিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গ্রন্থে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন।

[হেমেন্দ্রনাথ সিংহ]

"প্রেম", "আমি", "বনফুল", "নির্ব্বাণ", প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, পঞ্চাশবৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। "প্রেম" গ্রন্থ বহুসমালোচক কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে, ইহার একটি ইংরেজী অনুবাদ লংম্যান্স কোম্পানী কর্ত্তৃক বিলাতে প্রকাশিত করাইবার জন্য হেমেন্দ্রবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ আমাদের যৌবনের বন্ধু ছিলেন। পঠদ্দশায় আমরা বহুবৎসর এক বাসায় বাস করিয়াছি। তাহার পরও বহুবৎসর ধরিয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের সহিত আমাদের পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছে। অতীত জীবনের অনেক সুখদুঃখের স্মৃতি তাঁহার সহিত জড়িত। তিনি বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের বিখ্যাত জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে ও অন্যত্র সুখ্যাতির সহিত উচ্চ কাজ করিয়াছিলেন।

১৩২৫ মাঘ

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

যৌবনে, কিঞ্চিদধিক ৩২ বৎসর বয়সে, শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উৎকৃষ্ট বহিখানি তাঁহার নাম রাখিবে। তিনি বৎসারাধিক কাল ধরিয়া রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচারত লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। তজ্জন্য তিনি

রাজার গ্রন্থাবলী দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রকারেও তিনি শীল মহাশয়ের সাহায্য পাইতেছিলেন। উপাদান সংগ্রহ শেষ হইয়াছিল, এবং সংকল্পিত গ্রন্থের বিষয়সূচীও রচিত হইয়াছিল। অজিতকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে শিক্ষিত বিদ্বান রচনানিপুণ কয়েকজন যুবক আছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহার সংগৃহীত উপাদান এবং শীলমহাশয়ের উপদেশের সাহায্যে রামমোহন রায়ের জীবনচরিতটি লিখিয়া প্রকাশ করিলে তাঁহার পরিশ্রম কতকটা সফল হয়।

মানুষের সকল কার্য্যক্ষেত্রে কূপমণ্ডুকতা একটি প্রধান ব্যাধি ও শত্রু। সাহিত্য ইহার আক্রমণের বাহিরে নয়। একদল লোক আছেন, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যকে একটা আজগুবী চীজ মনে করেন;—যেন ইহা সৃষ্টিছাড়া কিছু একটা, এবং যেন ইহার উপর বিদেশী কোন সাহিত্যের প্রভাব আগেও পড়ে নাই, এখনও পড়িতেছে না, এবং পড়া উচিত নয়। অথচ প্রকৃত কথা এই যে, যে-জাতির জীবনস্রোতের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির জীবনস্রোতের যোগ হয় নাই, সে জাতি যেমন কখন বড় হইতে পারে না, তদ্রূপ যে-সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সহিত সংস্পর্শশূন্য, তাহাও বড় হইতে পারে না, স্বাভাবিক হইতে পারে না, জীবিত থাকিতে পারে না। বাংলার অনেক সমালোচক ইহা ভুলিয়া যান। অনেকেই বিদেশী অনেক সাহিত্যের, এমন কি, ইংরেজীসাহিত্যেরও, মর্ম্মস্থলে পৌঁছেন নাই। সমালোচক অজিতকুমারের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যের গুণগ্রাহী ও রসজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজী সাহিত্যেরও তদ্রূপ রসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে তিনি পাশ্চাত্য নানা দেশের সাহিত্যের রস ও শক্তির আস্বাদ ও পরিচয় পাইয়াছিলেন। এইজন্য বাংলা সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ নিমিত্ত তিনি বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্যের গতি ঠিক দিকে হইতেছে কি না, তাহা বুঝিবার মত শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল;—যদিও এ কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয় যে এ বিষয়ে তাঁহার বা আর কেন সাহিত্যিকের অভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর নানা সাহিত্যের সহিত সাক্ষাৎভাবে বা অনুবাদের সাহায্যে যেমন অজিতকুমারের পরিচয় ছিল, তদ্রূপ নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ধর্ম্মের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই হেতু, বাংলা সাহিত্যের মত, উদার ধর্ম্মালোচনার প্রচেষ্টাও তাঁহার মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

১৩২৬ অগ্রহায়ণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

সত্তর বৎসরের উপর বয়সে কলিকাতার মিউজিয়মের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জীবন নানা বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। বাল্যে ও যৌবনে তিনি অনাহারের কষ্ট পাইয়াছিলেন, এন্ট্রেন্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর উপরের শিক্ষা পাইবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই; কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তা, পরিশ্রম, অদ্যবসায় ও উৎসাহের বলে তিনি ইংরেজী, ওড়িয়া, হিন্দী, পারসী, উর্দ্দূ, ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন, এবং ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৮ টাকা বেতনের শিক্ষকতা হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০০ টাকা বেতনের মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব অর্থোপার্জ্জনে নয়। যৌবনে রাণীগঞ্জ অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাহাতে স্বয়ং অনশনের কষ্ট অনুভব করিয়া তিনি সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, "যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে আমার মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেইদিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক, শিখিতে লাগিলাম।" তাহার পর তিনি কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় নানাবিধ শিল্পদ্রব্যের ইউরোপীয়গণের নিকট আদর তাঁহার চেষ্টায় অনেক বাড়িয়াছিল, এবং কাটতিও বাড়িয়াছিল। ইহাতে অনেক প্রাচীন শিল্প বাঁচিয়া গিয়াছে, এবং বিদেশ হইতে ভারতে ধন আসিয়াছে। ভারতবর্ষে কি কি শিল্পদ্রব্য হয়, এই-সব দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়, এবং কি দামে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে তিনি একটি ছোট বহি লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ইউরোপীয়দেব চোখ ফুটে, এবং ইউরোপ-আমেরিকায় বিস্তর টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য বিক্রী হইতে থাকে। ঐ বহিটি ছাড়া তিনি গবর্ণমেন্টের অনুরোধে "Art Manu-tactures of India" নামক একখানি বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে দেশের অনেক শিল্পীর খুব উপকার হইয়াছে। তাঁহার "Visit to Europe" পুস্তকে তাঁহার ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী ভ্রমণের বৃত্তান্ত আছে।

"বিশ্বকোষ" অভিধান প্রথমে তিনি ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ই প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। Wealth of India প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকা, এবং 'জন্মভূমি' পরিচালনে তিনি সাহায্য করিতেন। সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে তাঁহার সোনা, লোহা, পাথুরে কয়লা, এড়ির চাষ, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিদ্যালয়পাঠ্য বহিও অনেক লিখিয়াছিলেন। অল্পবয়স্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তিনি "কঙ্কাবতী", "ভূত ও মানুষ", প্রভৃতি গল্পের বহির লেখক বলিয়া পরিচিত।

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গ-ভাষার লেখক" গ্রন্থে তাঁহার বিস্তৃততর জীবনবৃত্তান্ত আছে।

দেবেন্দ্রবিজয় বসু।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু সরকারী প্রাদেশিক বিচার বিভাগে বিচারকের কার্য্য করিতেন এবং অবসরগ্রহণ কালে সবজজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিদ্বান ও চিন্তাশীল বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামাজিক, দার্শনিক ও শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে তাঁহার অনেক চিন্তা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইত। ভগবদ্গীতা তিনি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থের ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। উহা তাঁহার এরূপ প্রিয় ছিল যে মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বেও তিনি উহার ভাষ্য বলিয়া যাইতেছিলেন এবং একজন পণ্ডিত লিখিয়া যাইতেছিলেন; কারণ কিছু দিন হইতে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির খুব হ্রাস হইয়াছিল। এরূপ একনিষ্ঠতা বিরল।

অক্ষয়কুমার বড়াল।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল বহু কবিতা লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা অনেক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত। "এষা" তাঁহার শেষ কবিতা-পুস্তক। তৎপূর্ব্বে তিনি কনকাঞ্জলি, প্রদীপ ও শঙ্খ লিখিয়াছিলেন।

১৩২৭ কার্ত্তিক

কর্ম্মী দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী।

নব্যভারত সম্পাদক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ষাটের উপর হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় নিঃসম্বল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নিজের পবিশ্রম ও বৈষয়িক কার্য্যদক্ষতাগুণে সম্পন্ন গৃহস্থ হইয়াছিলেন। কলিকাতা, পুরী, দেওঘর এবং জন্মগ্রাম গুলপুরে অনেকগুলি বাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার বিশেষত্ব নহে। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ এই লক্ষ্য করিয়াছি, যে, তিনি কোন প্রকার শ্রমকে অবজ্ঞা করিতেন না, যে-সব কাজ গৃহস্থরা অন্য লোক দিয়া করান, তিনি তাহা অনেক সময় স্বয়ং করিতেন। গত বৎসরও পুরীতে দেখিয়াছি, তিনি স্বহস্তে বাড়ীর কপাটে রং দিতেছেন, এবং মই দিয়া একটি বাড়ীর ছাতে উঠিয়া রাজমিস্ত্রীর কাজ

করিতেছেন। শিক্ষিত লোকে কথায় শ্রমের গৌরব প্রচার করেন, তিনি কথায় ও কাজে সেই গৌরব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নব্যভারতের সম্পাদকীয় ও ব্যবসাসম্বন্ধীয় সমুদয় কাজ তিনি ৩৮ বৎসর কাল ধরিয়া একা করিয়া গিয়াছেন, কখন কোন সহকারী সম্পাদক বা কেরানী রাখেন নাই। তিনি তাঁহার বন্ধু ও আশ্রিত লোকদিগের বহু উপকার করিতেন। অন্য অনেক লোককেও অন্ন দিতেন। শুনিয়াছি, তাঁহার জন্মগ্রামে তাঁহার একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। দুর্ভিক্ষ হইলে, বিশেষতঃ তাঁহার নিজের জেলা ফরিদপুরে দুর্ভিক্ষ হইলে, তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া নিজের সময় ও শক্তি দিয়া সাহায্য বিতরণ জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিতেন। ফরিদপুর জেলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে তিনি বরাবর পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বদেশীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি সাহস ও উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা ছিল।

১৩২৭ পৌষ

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন।

"অশোক-গুচ্ছ" প্রভৃতি প্রণেতা কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল গাজীপুরে। তিনি এলাহাবাদে কিছুকাল ওকালতী প্রথমে করিয়াছিলেন। "সাহিত্যে" তাঁহার রচিত কবিতা পড়িয়া লোকে প্রথমে তাঁহাকে খাঁটি কবি বলিয়া চিনিতে পারে। পরে "ভারতী"তেও তাঁহার পদ্য ও গদ্য অনেক রচনা বাহির হইয়াছিল। যখন এলাহাবাদ হইতে "প্রবাসী" প্রকাশিত হয়, তখন তিনি গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিব। ইদানীং তিনি দেরাদূনে বাস করিতেন।

১৩২৭ মাঘ

সাহিত্যাচার্য্য জেম্‌স্ ড্রামণ্ড্ এণ্ডার্সন

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লণ্ডন হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে যে চিঠি লিখিয়াছেন, নীচে তাহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইল।

"পরিষদের পক্ষে একটি শোকের সংবাদ আছে। গত ২৪শে নভেম্বর, জেম্‌স্ ড্রামণ্ড্ এণ্ডার্‌সন্ ডি,-লিট্, মহোদয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি কেম্ব্রিজে বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের এরূপ অকৃত্রিম

সুহৃৎ আর কেহই দৃষ্টিগোচর হন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি এখানকার লেখকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাধারণের নিকট প্রচার করিতে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। টাইম্‌স্ পত্রিকার জন্য ইনি বহু বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা করেন,—বাঙ্গালার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে পূর্ণ ইঁহার সমালোচনাগুলি আমাদেব ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি ইনি বাঙ্গালা ভাষার একখানি ছোট ব্যাকরণ ও পাঠমালা ইংরেজ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় A Manual of the Bengali Language নাম দিয়া Cambridge Guides to Modern Languages গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঐ পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই বইয়ে ও তাঁহার Peoples of India নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় (কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত) তিনি আমাদের পরিষদের নাম উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ প্রশংসার সহিত ইহার কার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে, ইহা প্রাচ্যভাষার মধ্যে অন্যতম মাত্র, ইহাতে আধুনিকত্ব, জীবন ও গতি বিশেষ কিছুই নাই, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশে পড়িয়া ইউরোপে জনসমাজের কাছে অজ্ঞাত অনাদৃত না হয়, যাহাতে খালি Oriental Language নহে, Modern Language হিসাবেও সমাদৃত হয়, তজ্জন্য তিনি খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি ছিল বাঙ্গালা দেশ; এই সূত্রে তিনি আপনাকে 'বাঙ্গালী' বলিয়া দাবী করিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্য-চেষ্টার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি স্থাপন করিয়া আনন্দ পাইতেন। বাঙ্গালার ইঁহার সাহিত্যবন্ধু অনেক আছেন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মধ্যে বোধ হয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় সাহেব ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইহাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। রাজকর্ম্ম উপলক্ষে আসাম ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইনি বড ভাষার ব্যাকরণ ও বড-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া সরকারের তরফ হইতে প্রকাশিত করেন। জার্ণ্যাল অভ দি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে বাঙ্গালা-উচ্চারণ-রীতি, বাঙ্গালার কর্ম্মবাচ্য ও বাঙ্গালা ভাষায় ভোট-বম্র (বড) প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। পরিষদের সহিত সম্পর্ক ইনি অতি গৌরবের সহিত প্রকাশ করিতেন। ইঁহার হাতের বাঙ্গালা অক্ষর সুন্দর। অনেক সময় তাঁহার পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে বাঙ্গালাতেই পত্রব্যবহার করিতেন। ইঁহার পরলোকগমনে পরিষদের এক আন্তরিক হিতৈষীর অভাব ঘটিল, সন্দেহ নাই। ইঁহার মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিয়া ইঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান কর্ত্তব্য। আমার প্রতি ইহাঁর বিশেষ স্নেহ ছিল। ইঁহার সমাধির উপর অর্পণ করিবার জন্য কিছু ফুল পাঠাইয়া ইহাঁর দেহত্যাগে ব্যক্তিগতভাবে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার যৎকিঞ্চিৎ অর্ঘ্য প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি। যুদ্ধে ইঁহার এক পুত্র নিহত হন। ইনি সদানন্দ, মিষ্টালাপী, কোমলপ্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং ইঁহার সারল্য ও বিনয় ইঁহার কথাবার্ত্তায় ও পত্রাদিতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিত।"

১৩২৭ চৈত্র

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ এক সময় কলিকাতায় রেজিস্ট্রারের কার্য্য করিতেন। তাঁহার নিবাস এই সহরে বারাণসী ঘোষের স্ট্রীটে। তিনি যেরূপ বিদ্বান্ ছিলেন, জনসমাজে তাঁহার তদ্রূপ প্রসিদ্ধি হয় নাই। "বঙ্গাধিপপরাজয়" নামক উপন্যাস তাঁহার লিখিত। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, পালি, তিব্বতীয় প্রভৃতি ভাষা জানিতেন, এবং নানা বিষয়ে অমুদ্রিত বিস্তর লেখা রাখিয়া গিয়াছেন। পেন্‌শ্যন্ লইবার পর তিনি বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বোধ হয় আশীর উপর হইয়াছিল। বারাণসী ঘোষের স্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীটি একটি দেখিবার জিনিষ। বাহিরে বাহিরে দেখিলে উহা চমৎকার মনে হয় না। কিন্তু উহাতে নানাবিধ পাথরের কাজ এবং পাথরের খোদিত নানা পৌরাণিক মূর্ত্তি আছে। তৎসমুদয়ের ফোটোগ্রাফ ছাপাইবার যোগ্য।

১৩২৮ চৈত্র

পরলোকগত বিহারীলাল সরকার

বঙ্গবাসীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গবাসীর সংশ্রবে কাজ করিয়া কাজ করিয়া সংবাদপত্র পরিচালন কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজের জয়, শকুন্তলারহস্য, বিদ্যাসাগর-চরিত, প্রভৃতি বহি তাঁহার লিখিত। শুনিয়াছি. অন্ধকূপহত্যার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তিনিই প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করেন, এবং কালিদাসের শকুন্তলার মূল যে মহাভারতে ও পদ্মপুরাণে, তাহাও তিনি প্রথম নির্দ্দেশ করেন। তিনি অনেক গানও রচনা করিয়াছিলেন।

১৩২৯ শ্রাবণ

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁহাদিগকে নবীন বলা যাইতে পারে. তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত চিন্তা ভাব ও ভাষার সম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। বিদেশী কবিতার অনুবাদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

তাঁহার অনুবাদগুলি মূল কবিতা বলিয়া মনে হয়। সকল প্রকার রস ও সকল প্রকার ভাবের চিন্তার ও ঘটনার অনুরূপ ছন্দের সৃষ্টি ও ব্যবহারে, এবং শব্দচয়ন ও শব্দবিন্যাসে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কবিতায় তাঁহার অনাড়ম্বর নির্ভীক মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গদ্য রচনাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তিনি যত বড় কবি ছিলেন, মানুষ ছিলেন তাহা অপেক্ষাও বড়। শান্ত সংযত পৌরুষ তাঁহার প্রকৃতিতে নিহিত ছিল। যশের জন্য ভীড় ঠেলিয়া জনতার সাম্‌নে দাঁড়াইবার প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না; আত্মগোপন তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। কিন্তু যশ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি যে বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা অল্প লোকেই জানিত। তাঁহার জাতি স্বাধীন হয়, মানুষের সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়, সোজা হইয়া মাথা উঁচু করিয়া মানব-সমাজে দাঁড়াইতে পারে, ইহা তাঁহার হৃদগত বাসনা ছিল। তাঁহার জীবিতকালে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। কিন্তু তাঁহার কবিতায় যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির সাহায্য হইবে।

তাঁহার প্রবল স্বাজাতিকতা তাঁহাকে সংকীর্ণমনা করে নাই; তাঁহার নানা দেশের কবিতার অনুবাদেই বুঝা যায়, যে, তিনি সকল দেশের লোকের সহিত কিরূপ আত্মীয়তা অনুভব করিতেন!

তাঁহার অকালমৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ মর্ম্মাহত হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্বদেশবাসীগণ ব্যথিত হইয়াছেন।

মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে তাঁর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের তোলা সত্যেন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থার শেষ ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত একটি ছবি আমরা এখানে মুদ্রিত করিলাম।

১৩২৯ মাঘ

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোক-যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়া ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে সিবিল্ সার্বিসে প্রবেশ করেন। তখন বিলাত যাওয়া এখনকার মত একটা সাধারণ জিনিষ হইয়া উঠে নাই। তাঁহার জীবনের রাজসেবার সমস্ত সময় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যাপিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি ঐ প্রদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে তাঁহার প্রণীত "বোম্বাইচিত্র" নামক উপাদেয় পুস্তকে সঞ্চিত আছে। ইহা সাধারণ ভ্রমণবৃত্তান্তের মত বহি নহে। ইহাতে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, প্রভৃতি নানাবিষয়ক তথ্য নিবদ্ধ আছে। সত্যেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত ছিলেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত পুস্তক আছে। তদ্ভিন্ন তিনি গীতা ও মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ভক্ত ও স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট

ব্রহ্মসঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত আছে। তাহার অনেকগুলি প্রায়ই গীত হইয়া থাকে, কিন্তু অনেকেই জানেন না, যে, সেগুলি তাঁহার রচনা। কবিতা, নাটক ও অন্যবিধ রচনার যথোপযুক্ত ভাব ও স্বরভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি যেমন আনন্দদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ। আমাদের দেশে বেশী লোকে ইহা অভ্যাস করেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ইহা সযত্নে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

তিনি কিছুকাল মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইণ্ডিয়ান্ মিরর্ কাগজের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক তিনি আগে ও মধ্যে মধ্যে হইয়াছিলেন; মৃত্যুর সময়ও ইহার সম্পাদক ছিলেন। "ভারতী"তে তাঁহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। পেন্সান্ লইবার পর তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন তাঁহার মত লোকের ভাল না লাগিবারই কথা। সেইজন্য তাহার পর আর তিনি উহাতে যোগ দেন নাই। তিনি যৌবন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নারীহিতৈষী ছিলেন এবং নারী জাতির স্বাধীনতা ও অধিকার-বর্দ্ধন জন্য বহু সফল চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি ভদ্র, নিরহঙ্কার, বিনয়ী ও অমায়িক লোক ছিলেন। তিনি নিজের নাম জাহির করিবার চেষ্টা কখন করেন নাই। কতকটা এই কারণে এই নানা গুণসম্পন্ন ধার্ম্মিক পুরুষ আশী বৎসরেরও অধিক কাল জীবিত থাকা সত্ত্বেও অনেকে তাঁহার বিষয় অবগত নহেন। তাঁহার একটি জীবনচরিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাঁহার পুত্র, কন্যা ও জামাতা সকলেই সুলেখক। তাঁহারা যে-কেহ কিম্বা সকলে মিলিয়া এই কাজটি করিলে বাংলা সাহিত্য পুষ্ট ও দেশ উপকৃত হইবে।

১৩৩০ শ্রাবণ

"কাসিমুদ্দীনের মার্কা ও নব-পিকুইক্"

বিল্ ষ্টাম্প্স নামক একজন প্রায় নিরক্ষর লোক একটা পাথরে

+
B I L S T
U M
P S H I
S. M.
A R K

এইরূপ কয়েকটা অক্ষর খুদিয়া রাখিয়াছিল। আসলে সে খুদিয়াছিল "Bill Stumps His Mark" অর্থাৎ "বিল ষ্টাম্প্সের মার্কা", অশিক্ষিত বলিয়া নিজের নামের একটা এল্ অক্ষর খুদে নাই। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের পিকুইক পেপার্সে বর্ণিত আছে, যে, এই কল্পিত বিল্ ষ্টাম্প্সের কল্পিত কীর্ত্তি উপন্যাসের নায়ক মিষ্টার পিকুইকের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, তিনি কি প্রকার গভীর ও গম্ভীর গবেষণা করিয়াছিলেন, এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে ৯৬ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা লিখিয়া খোদিত অক্ষরগুলির ২৭ রকম পাঠ

উদ্ধার করিয়াছিলেন, ও তাহার বলে ১৭টা দেশী ও বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ব্রুটন্ নামক একজন বেরসিক লোক সব কথাটা ফাঁস করিয়া দেওয়ায়, পরে কি ঘটিল, তাহাও ঐ উপন্যাসের একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ডিকেন্স্ যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবিক সেইরূপ একটি কাণ্ড ঘটিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত "কাসিমুদ্দীনের মার্কা ও নব পিকুইক্" শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে অধ্যাপক দেবদত্ত ভণ্ডারকর পিকুইকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি গত মহাযুদ্ধের সময় একজন জার্ম্যান্ প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্ক্রিয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করেন, এবং তাহা মডার্ন্ রিভিউ ও প্রবাসীতে ধরিয়া দেওয়া হয়।

১৩৩০ আশ্বিন

শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়

স্বর্গীয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় আড়াই বৎসর কালাজ্বরে ভুগিতেছিলেন। তাঁহার জীবনীশক্তি এত দীর্ঘকাল রোগের সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, এবং তাঁহার মন দমে নাই, প্রফুল্ল ছিল, —রোগশয্যাতেও তিনি চিত্র অঙ্কন ও কবিতা রচনা আদি করিতেছিলেন—দেখিয়া বরাবরই আমাদের আশা ছিল, যে, তাঁহার জীবনীশক্তিরই জয় হইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। তিনি মাতা, পত্নী, শিশু পুত্র, ভগিনী, ভ্রাতা এবং সমুদয় গুরুজনকে, স্নেহভাজন সকলকে, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে, শোকে নিমগ্ন করিয়া অমর ধামে যাত্রা করিলেন।

বাল্যকাল হইতে সুকুমার সাতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন, এবং এই প্রতিভা নানা দিকে প্রকাশ পাইত। তিনি দুই বিষয়ে সম্মানের সহিত বি-এস্‌সি পাস্ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ পরিচায়ক নহে। পাস্ করিবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করিয়া ম্যাঞ্চেস্টার-শিল্প-কলেজে ফোটোগ্রাফী এবং ফোটোগ্রাফিক প্রক্রিয়া অনুসারে ছবির ব্লক প্রস্তুত করিবার প্রণালী সম্বন্ধে নিজ জ্ঞানবৃদ্ধি ও গবেষণা করিতে গমন করেন। তিনি এদেশে থাকিতেই তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই-সকল বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়া গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। এই-সকল বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কোন সমসাময়িক ভারতীয় লোক ছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ফোটোগ্রাফিক শিল্পবিষয়ক বার্ষিক কোন কোন বিখ্যাত কাগজে বাহির হইয়াছিল, এবং তাঁহার গবেষণার বলে তিনি রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। বিলাত হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়া ব্লক প্রস্তুত করিবার ও ছবি ছাপিবার ব্যবসার নানাদিকে উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্কল্প ও চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি সাংঘাতিক

পীড়ায় আক্রান্ত হন।

সুকুমারের স্বভাবে গাম্ভীর্য্য বিনয় ও সৌজন্যের একত্র সমাবেশ লক্ষিত হইত। তিনি খুব দৃঢ়চিত্ত, স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষও ছিলেন। স্বাধীনচিত্ততা ও তেজস্বিতা বিষয়ে, মনে হয়, তাঁহার পিতার ও মাতামহের গুণ তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার সৌজন্যও তাঁহার পিতার মত স্বভাবসিদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ তিনি নানা দিকে তাঁহার পিতার প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

সুকুমার বিমল হাসির কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি, যাহাকে ইংরেজীতে nonsense rhymes (নন্‌সেন্স্ রাইম্‌স্) বলে, 'আবোল্ তাবোল্' নাম দিয়া বাংলায় তাহার একরূপ প্রবর্ত্তক ও সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন বলিলেও চলে। হাস্যকৌতুকের অভিনয়ে ও গানে তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। দ্বেষবিদ্রূপহীন হাসির কবিতা লিখিতে তিনি যেমন পারিতেন, তেমনি দ্বেষবিদ্রূপহীন হাস্যকর ছবি আঁকিতেও তিনি সুনিপুণ ছিলেন।

এই তাঁহার চরিত্রের ও প্রতিভার এক দিক্; আবার অন্যদিকে তিনি গম্ভীর বিষয়ে প্রগাঢ় ভাব ও গভীর চিন্তাপূর্ণ বাংলা ও ইংরেজী গদ্য রচনাও বেশ করিতে পারিতেন। বিলাতী ত্রৈমাসিক কোয়েস্ট্ (The Quest) কাগজে তিনি একবার একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের নিকট উহার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। ওজনকরা ও সুপ্রযুক্ত অল্পসংখ্যক কথার মধ্যে প্রগাঢ় ভাব ও গভীর চিন্তা সন্নিবিষ্ট করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

তিনি গম্ভীর বিষয়েও কবিতা লিখিতে পারিতেন। রোগশয্যায় এইরূপ একটি দীর্ঘ উৎকৃষ্ট কবিতা তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাপাইয়া অনেককে উপহার দিয়াছিলেন, এবং তাহা তাঁহার সম্পাদিত তাঁহার অতি প্রিয় "সন্দেশে" ছাপা হইয়াছিল।

নাচার হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে ভগবানের বিধান কেহ কেহ মানিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু রোগশয্যায় সুকুমার যে সর্ব্বদা ইহপরলোক উভয়ের জন্যই প্রফুল্লচিত্তে সমান প্রস্তুত ছিলেন, তাহা সে-জাতীয় নহে। তাহা তাঁহার গভীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি হইতে উদ্ভূত। এই হাস্যরসিক যুবকের চরিত্রকে ভগবদ্ভক্তি অনুপম সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছিল। সুকুমার নানাগুণ-সন্নিবেশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের স্বভাবনেতা ছিলেন। যুবকেরা কি হারাইলেন, সমাজ কি হারাইলেন, দেশ কি হারাইলেন, মানবসমাজ কি হারাইলেন, তাহা পরে স্থিরচিত্তে বিচার করিলে বুঝা যাইবে। এখন লিখিতে পারিলাম না।

১৩৩০ পৌষ
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রলেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব লিপিদক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী তিন ভাষায় কাগজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম কাগজের সম্পাদকতা তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদন ও তাহাতে লেখা ছাড়া তিনি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। বাংলাভাষায় একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উৎপাদন করিবে, এই অজুহাতে গবর্ণ্মেণ্ট্ তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

১৩৩১ চৈত্র
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক কালে বাংলা দেশে স্বাদেশিকতার প্রথম যুগে যাঁহারা ইহার সূত্রপাত করেন, তাঁহাদের একজন মহামনা অগ্রণী পরলোক গমন করিয়াছেন—আনুমানিক ৭৫ বৎসর বয়সে রাঁচীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"র "স্বাদেশিকতা" শীর্ষক অধ্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার কিছু বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। কেবল গোড়ার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি।

"জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়ীতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত তাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল।"

অতঃপর এই গোপনীয় সভার আরও কিছু বর্ণনা করিয়া রবি-বাবু লিখিতেছেন :—

"ভারতবর্ষের একটা সর্ব্বজনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানা-প্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মাল কোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্ব্বজনীন পোষাকের নমুনা সর্ব্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়ীতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক্ হইয়া তাকাইত, তিনি

ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, এমন বীর পুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে, এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

ইহার পর আছে জ্যোতিবাবুর রক্তপাত-শূন্য শিকারের বর্ণনা, এবং স্বদেশে দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপনের চেষ্টা, কাপড়ের কল নির্ম্মাণে উৎসাহ দান, প্রভৃতির বৃত্তান্ত।

"এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতি দাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল।"

"কাগজে কি-একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতি দাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

দেশের লোকেরা কলম চালায়, রসনা চালায়, কিন্তু জাহাজ চালায় না, বোধ করি এই ক্ষোভ তাঁহার মনে ছিল! দেশে দেশলাই কাঠি জ্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশলাই কাঠি অনেক ঘর্ষণেও জ্বলে নাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল, কিন্তু সেই তাঁতের কল একটি মাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তব্ধ হইয়া আছে। তাহার পর স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন, সে খোল একদা ভর্ত্তি হইয়া উঠিল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে এইসকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে এক্‌লা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বে-হিসাবী অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে-বন্যা হঠাৎ আসে এবং সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে— তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে, তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

"একদিকে বিলাতী কোম্পানী আর এক দিকে তিনি একলা—এই দুই পক্ষে বাণিজ্য নৌ-যুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরী হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে-হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা বিলুপ্ত হইয়া গেল—বরিশাল খুলনার ষ্টিমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিল তাহা নহে তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহার উপরে বরিশালের ভলান্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশ-হিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না;—কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নাম্‌তা ভুলিতে পারিল না—সুতরাং তিন ত্রিক্‌খে-নয় ঠিক তালে-তালে ফড়িংয়ের মত লাফ দিতে-দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল!

"অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুগ্রহ এই যে লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং

সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহ জীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল, তখন জ্যোতি দাদার কর্ম্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব-ক্ষতি-স্বীকার।

"তখন খুলনা বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আমাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে এক দিন খবর আসিল, তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রীজে ঠেকিয়া ডুবিয়াছে। এইরূপে যখন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকী রাখিলেন না, তখনি তাঁহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেল।"

আমরা বাল্যকালে জ্যোতি-বাবুকে একজন বিখ্যাত নাটক রচয়িতা বলিয়াই জানিতাম—জানিতাম তিনি অশ্রুমতী, সরোজিনী ও পুরুবিক্রম নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার অন্য কোন পরিচয় আমাদের জানা ছিল না। "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" গানটি তখন অনেকবার শুনিয়াছি। আমরা যখন ইস্কুলে পড়ি তখন বাঁকুড়ার উপকণ্ঠ লোকপুরে র অভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে যতদূর মনে পড়ে আমার বড়দাদা পুরু সাজিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহপাঠী বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় ঐলবিলা সাজিয়াছিলেন।

বড় হইয়া জ্যোতি-বাবুর অন্য অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম। তখন তিনি নিজে কিছু বহি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন—যদিও সেদিকে তাঁহার প্রতিভা ও ক্ষমতার অভাব ছিল না; তিনি তখন অনুবাদ করিতেই নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত হইতে, ফরাসী ভাষা হইতে, ইংরেজী হইতে, মারাঠী হইতে কত বহিরই না তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। এবং সে-অনুবাদ সরল ঝর্‌ঝরে, পড়িলে মৌলিক রচনার মতই বোধ হয়। অবিরাম অক্লান্ত ধীরগতিতে তাঁহার অনুবাদ কার্য্য চলিতেছিল, —গত সংখ্যাতেও তাঁহার কিছু অনুবাদ আমরা ছাপিয়াছিলাম।

তিনি দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যাহা-যাহা করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা এখানে করা চলিবে না। কোন-কোন বিষয়ের উল্লেখ আগে করিয়াছি। নীলের চাষও তিনি করিয়াছিলেন এবং এক সময় পাটের আড়তও খুলিয়াছিলেন।

শিক্ষাদান রীতির সংস্কারে তাঁহার উৎসাহ ছিল এবং তাঁহাদের বাড়ীর কয়েকটি শিশুকে নিজের প্রণালী-অনুসারে তিনি কিছুকাল শিক্ষা দিয়াছিলেন।

নাটক-রচনায় যেমন, অভিনয়েও তেম্‌নি তাঁহার উৎসাহ ছিল।

তিনি পাশ্চাত্য ও দেশী সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, এবং দেশে সঙ্গীতচর্চ্চা বৃদ্ধির জন্য নানা-প্রকারে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ভারত সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠার মূলে তিনি ছিলেন। এইপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়িল। আমরা একবার ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যা-সম্বন্ধে একটি ইংরেজী বহি মডার্ন রিভিয়ুর জন্য সমালোচনা করিয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আগেই আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন, তিনি ইংরেজীতে সমালোচনা করিবেন না, বাংলায় করিবেন। করিলেনও তাই। তাহাতে আমরা অনুমান করিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যাহা কিছু লিখিবেন, মাতৃভাষাতেই লিখিবেন। মাতৃভাষার প্রতি এই অনুরাগ তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি। রবি-বাবুর জীবনস্মৃতিতে আছে—

"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশ প্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ সে সময়টা স্বদেশ প্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দুরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

গার্হস্থ্য-সংস্কারে এবং সমাজ সংস্কারেও জ্যোতি-বাবুর খুব উৎসাহ ছিল। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে" এ বিষয়ের অনেক বৃত্তান্ত আছে। তাহা হইতে জ্যোতি-বাবুর কথিত একটি প্যারাগ্রাফ উদ্ধৃত করিতেছি।

"স্ত্রী স্বাধীনতার শেষে আমি এত বড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারের কোন বাগান বাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থান কালে আমরা নিজেই অশ্বারোহণ পর্য্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিয়া, দুইটি আরব ঘোড়ায় দুই জনে পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুই জনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবাসীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত। রাস্তার লোকেরা কৌতূহলে ও বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া চাহিয়া, হতভম্ব হইয়া থাকিত। দারোয়ানরা আমাদের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত। সেসব দিকে আমার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমি তখন উদ্দাম নব্যভাবের নেশায় উন্মত্ত!"

মাথা দেখিয়া চরিত্রানুমান ও চরিত্র বর্ণনা করিবার অভ্যাস জ্যোতি-বাবুর ছিল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত অনেক লোকের রেখাচিত্র তিনি আঁকিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকর রোটেন্‌ষ্টাইন্ সাহেবের মতে এগুলি উৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায়, তিনি একটি ভূমিকা লিখিয়া সেগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঃ—

শ্রদ্ধেয় জ্যোতি-বাবু আজ ধরাধামে নাই, চৈত্র মাসের প্রবাসীতে এই সংবাদ পাঠ করিয়া নিতান্ত সময়াভাব-সত্ত্বেও কয়েকটি কথা না লিখিয়া পারিতেছি না।

রবি-বাবুর বন্ধু ৺অক্ষয়কুমার চৌধুরী [যাঁহার কথা "জীবনস্মৃতি"তে বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে] মহাশয়ের পত্নী "শুভ-বিবাহ"-প্রণেত্রী পরলোকগতা শরৎকুমারী চৌধুরাণী মহাশয়াকে আমি মাতার ন্যায় ভক্তি করিতাম। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, তিনি জ্যোতি-বাবুর গভীর পাণ্ডিত্য, নানাবিষয়িণী প্রতিভা ও বালকোচিত শুভ্র সরলতায় পুনঃপুনঃ প্রশংসা করেন। বাল্যকালে 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় খুলনা-বরিশালে স্বদেশী জাহাজ-চালানো-সম্বন্ধে কতকগুলি উদ্দীপনাপূর্ণ

পত্রে, ও অশ্রুমতী প্রভৃতি নাটকে জ্যোতি-বাবুর কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে নাই। একবার "প্রবাসী" পত্রিকায় আমি "কুকী-পুঞ্জী" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। ত্রিপুরা-রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে জনৈক সামন্ত কুকীরাজার বাড়ীতে ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত করিয়া ঐ-প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল। উহা পড়িয়া জ্যোতি-বাবু চৌধুরাণী মহাশয়ার নিকট আমার প্রশংসা করেন এবং তাঁহার অনুরোধে বালিগঞ্জে ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে জ্যোতি-বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি আমাকে ম্যাঙ্গোপার্ক, লিভিংষ্টোন্, শরচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতির ন্যায় একজন বীর ভ্রমণকারী বলিয়া ঠাওরাইয়া লইয়াছেন। তাঁহার বিনয়, সৌজন্য ও সরলতা দেখিয়া বস্তুতঃ আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ইহার বহুকাল পরে, ১৯১৫ কি ১৯১৬ সালে, ফরাসী পণ্ডিত সেনা (Senart) প্রণীত ভারতবর্ষীয় জাতিভেদ-প্রথা-সম্বন্ধীয় পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করিবার জন্য ঐ-পুস্তকের একখণ্ড জ্যোতি-বাবুকে পাঠাইয়া দিই। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার কৃত অনুবাদ "প্রবাসী"তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ-পুস্তকের বিনিময়ে তিনি তাঁহার আত্মজীবনী ও প্রবন্ধাবলী আমাকে উপহার দেন। ঐ সময় হইতে মধ্যে-মধ্যে উঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার চলে। পত্র লেখার একটি বিশেষত্ব এই দেখিতাম যে, খামের উপরের ঠিকানাও তিনি কখনও ইংরেজীতে লিখিতেন না। একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার দুঃখ হয়,...আমাদের বঙ্গসাহিত্য আপনার লেখা হইতে বঞ্চিত।" ১৯১৮ কি ১৯১৯ সালে পূজার ছুটিতে আমি একবার রাঁচি বেড়াইতে যাই এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। তিনি তাঁহার ছবির খাতায় আমার মুখের প্রতিকৃতি আঁকিয়া রাখেন এবং এই বৃদ্ধবয়সেও আমার সহিত দেখা করিতে আমার বাসায় আসেন। আমি যে বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি একসময় জ্যোতি-বাবুর বাড়ী "শান্তিধামে"র নিকটেই থাকিতেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যে, গভীর সন্ধ্যায়, যখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, এবং অতি প্রত্যুষে তিনি জ্যোতি-বাবুকে লেখা-পড়ায় নিমগ্ন দেখিয়াছেন। তাঁহার চেহারায়, পোষাকে কিংবা কথাবার্ত্তায়, তিনি যে কত বড় গুণী লোক ছিলেন, তাহার কিছুই প্রকাশ পাইত না।

জ্যোতি-বাবুর কয়েকখানি চিঠি আমার নিকট আছে, তাহা হইতে নমুনাস্বরূপ কিছু-কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমাদের সভ্যতার যাহা ভালো তাহা বজায় রাখিতে হইবে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতার যাহা ভালো তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই মধ্যপন্থাই সমাজ-সংস্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা।"

"এখনকার লোকের ধর্ম্মভয় অপেক্ষা ধর্ম্মবুদ্ধি বেশী জাগ্রত হইয়াছে। এই-হিসাবে আমরা বেশী moral man"

"অন্ধ সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি আমাদের হাড়ে-হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। সুশিক্ষিত বি-এ, এম্-এ-রাও তাহা অতিক্রম করিতে পারেন না। একবার এখান [রাঁচি] হইতে কলিকাতায় যাত্রা করিবার সময় এখানকার একজন দিগ্‌গজ সাহিত্যিক ও এম্-এ আমাদের বলিলেন—'আজ যাত্রা করিবেন না—আজ অশ্লেষা, মঘা, দিক্‌শূল—ভয়ানক অযাত্রা'—তথাপি আমরা গেলাম—এমন সুযাত্রা আর কখন হয় নাই। আমরা যে-আধ্যাত্মিকতার অভিমান করি সেটাও আমাদের বৃথা অভিমান-মাত্র। আমরা কতকগুলি অভ্যস্ত অর্থহীন অনুষ্ঠানকে আধ্যাত্মিকতা মনে করি। অবশ্য আমাদের দেশে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁদের প্রকৃত রূপে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক পুরাকালেও যেমন, এখন তেম্‌নি বৈষয়িক।"

"আমাদের মধ্যে এখনও democratic spirit সাম্যবুদ্ধি প্রবেশ লাভ করে নাই। তা যদি করিত, তা হইলে আমাদের সমাজের মধ্যেও তার পরিচয় পাইতাম। অধিকার কেহ ছাড়িতে চাহে না—কেবলই

অধিকার অর্জ্জন করিতে চায়। ইংরাজেরা প্রভুত্ব ছাড়িবে, আমরা প্রভুত্ব করিব। কিন্তু সমাজে আমরা নীচের লোকদের আমাদের পায়ের তলায় রাখিব, আমরা চিরকাল তাহাদের প্রভু হইয়া থাকিব। ইহাই আমাদের মনোভাব। এই মনোভাব লইয়া যদি আমরা রাজনৈতিক প্রভুত্ব পাই, আমরা ইংরাজের চেয়েও bureaucrat ও autocrat হইয়া দাঁড়াইব।"

"এখন হিন্দুধর্ম্ম ছোঁয়াছুঁয়ির ধর্ম্ম—casteএর ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু caste ত্যাগ করিলেই যে অহিন্দু হইবে এমন কোন কথা নাই—তার সাক্ষী, চৈতন্যদেব ত মুসলমানকে দীক্ষিত করিয়া আপনার দলের মধ্যে লইয়াছিলেন। আজও ত জগন্নাথ-ক্ষেত্রে আহারাদিতে জা'তের কোন বাধা নাই। আসল কথা, হিন্দু ভাব ও হিন্দু tradition রক্ষা করিয়া যদি কেহ জা'তের উচ্ছেদ করে তা'তে লোকের চক্ষে তেমন খারাপ লাগে না। কেশব-বাবুর "সমাজ" ও "সাধারণ সমাজ" হিন্দু tradition ও শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া বিদেশী tradition ও শাস্ত্রের দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়ায় হিন্দু ব্রাহ্মদিগকে আপনার বলিয়া আর গ্রহণ করিতে পারিল না। রামমোহন রায় যদিও সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়াই একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একমাত্র উপনিষদ্ শাস্ত্রের উপরেই সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন। অবশ্য আদি ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ কার্য্যতঃ এখনো ত্যাগ করে নাই। তবে, সাধারণতঃ জাতিভেদের বন্ধন হিন্দুসমাজেও অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে—এখন অনেকটা বিবাহের আদান-প্রদানের মধ্যেই বদ্ধ রহিয়াছে। Patelএর মতো বিল যদি কখনও pass হয়, তা হইলে আরও একটু শিথিল হইয়া পড়িবে। এরূপে হিন্দুসমাজেও ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ সহিয়া যাইবে। এখন কেবল কালের অপেক্ষা। চৈতন্যদেবের মতো কোনও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া যদি জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করেন, তা হইলে জাতিভেদ হিন্দুসমাজ হইতেও ক্রমে উঠিয়া যাইতে পারে। কিন্তু একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। যে-সে লোকের কর্ম্ম নয়।"

"তখন [মহাভারতের যুগে] আচার-ব্যবহার ও মতামতে কতটা উদারতা ছিল! আমরা কোথায় আরও অগ্রসর হইব—না আরও পিছাইয়া পড়িয়াছি।"

"আমাদের দেশ পূর্ব্বে ধ্যানের জন্যই বিখ্যাত ছিল। আজকাল ধ্যানের বদলে কর্ম্মই প্রবল হয়েছে। একদল ধ্যানী ও একদল কর্ম্মী চিরকালই আছে ও চিরকালই থাক্‌বে। কর্ম্মের গোড়ায় ধ্যান থাকা আবশ্যক—ধ্যানের অভাবে কর্ম্ম সুপথে চালিত হয় না—পথভ্রষ্ট হয়। আবার কর্ম্মের অভাবে শুধু ধ্যান নিরর্থক হয়। দুয়ের সমন্বয় আবশ্যক।"

এই শেষ চিঠিখানি ১৮২৩ সালের ৭ই জুলাই তারিখে লিখিত। যখন আমি এই অকপট, সৌম্যদর্শন, ঋষিকল্প, ওজস্বী, মহামনা, স্বদেশপ্রাণ, বহুগুণান্বিত মনীষী ও মেধাবী বিপত্নীক বাঙ্গালীসন্তানের কথা স্মরণ কবি, তখন মনে হয় যে-জাতির উচ্চস্তরে ঈদৃশ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে তাহার ভবিষ্যৎ কখনও অনুজ্জ্বল হইতে পারে না—ইঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্ত সমগ্র জাতিকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে লইয়া যাইবে, এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই।

১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী স্বর্ণকুমারী দেবী

আমার পূজ্যপাদ দাদামহাশয় ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় সভাপতি হইয়া আজ কিছু বলিতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এজন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। কোনো প্রিয়জনকে হারাইবার পর কত কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়! যে-সকল সুখময় স্মৃতি এখন মনের মধ্যে সারাদিন উথলিত আবেগে বহিতেছে, সেইসকল স্মৃতি বাহিরে প্রকাশ করিতে কত না আকুলতা জন্মায়! আমার দাদামহাশয়ের গুণগান করিবার কথা অনেকেই আছে, কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ, এবং অবসাদগ্রস্ত বলিয়া আমি আমার বাসনাকে সংযত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কেবল দু'একটা মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব।

সাহিত্য-জগৎ তাঁহার নিকট কিরূপ ঋণী এ প্রবন্ধে তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। তিনি নিজে বেশ বড়-একজন লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'পুরুবিক্রম', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি নাটক ন্যাশানাল থিয়েটার প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন নাট্যালয়ে বহুবার অভিনীত হইয়াছে। তাহার পর গিরীশ ঘোষ নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নূতনদাদা এরূপ গুণগ্রাহী ও অমায়িক-চিত্ত ছিলেন যে, গিরীশ ঘোষের খ্যাতিতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। প্রহসন-রচনাতেও তিনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ", "দায়ে প'ড়ে দারপরিগ্রহ" প্রভৃতি প্রহসন-রচনাগুলি নবীন পাঠকদের পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ঐসকল গ্রন্থে হাস্যকৌতুক প্রচুর আছে, কিন্তু এরূপ সুরুচি-সঙ্গত লেখা আধুনিক কোনো প্রহসন-রচনাতেও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না;—অন্ততঃ আমি দেখি নাই। এতদ্ব্যতীত ফরাসী, সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, এমন আর কেহই করেন নাই। কিন্তু তিনি কেবল সাহিত্যিকই ছিলেন না; চিত্রবিদ্যা এবং সঙ্গীতবিদ্যাতেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। এই উভয় বিদ্যা তিনি বিনা শিক্ষাতেই লাভ করিয়া ছিলেন। যাঁহারই সহিত তাঁহার আলাপ হইত, তাঁহারই প্রতিকৃতি তিনি অতি অল্পায়াসে আঁকিয়া রাখিতেন এবং যে-কোনো গায়ক গোলকধাঁধাযুক্ত ঘূর্ণ্যমান তানলয়ে গাহিয়া গেলেও, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রে তাহা বাজাইয়া লইতে পারিতেন। প্রথম যখন কলিকাতায় হার্‌মোনিয়াম আম্‌দানি হয়, তখন আমাদের বাড়ী একটি বড় হার্‌মোনিয়াম্ আনা হইয়াছিল। নূতনদাদা সেই যন্ত্রটি প্রতিদিন প্রত্যূষে বাজাইতেন। আমি তখন অতি ছোটো ছিলাম, —মনে পড়ে, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাঁহার বাজ্‌না শুনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতাম। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তখন সঙ্গীতচর্চ্চা যথেষ্ট-পরিমাণে হইত। তখনকার সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণু আমাদের বাড়ীতে গায়কতা করিতেন এবং দেশ বা বিদেশ হইতে যে-কোনো বড় গায়ক আসিলেই এখানে অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হইতেন। সেই আব্‌হাওয়ার মধ্যে থাকিয়া নূতনদাদার স্বাভাবিক সঙ্গীতক্ষমতা আরো বিকাশপ্রাপ্ত হয়। এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে লালিত-পালিত হইয়া স্নেহাস্পদ রবীন্দ্রনাথও এতবড় সঙ্গীতজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বাল্যকালে কিছু দিন বিষ্ণুর নিকট গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। নূতনদাদা কিন্তু সেরূপভাবে কাহারও নিকট শিক্ষালাভ না করিয়াও বিচক্ষণ গায়কের মতনই সুরজ্ঞ হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এবং আমার বহু গানে তিনি সুর বসাইয়া দিয়াছেন।

তিনি কিরূপ গুণের আদর করিতে জানিতেন, এ-প্রসঙ্গে তাহার একটি গল্প বলি। তাঁহার এক

সামান্য বাজার সরকারের বালিকা-স্ত্রী গান গাহিতে পারিত। কেমন করিয়া একথা তাঁহার কানে গিয়াছিল জানি না, কিন্তু ইহা শুনিবামাত্র তিনি সেই মেয়েটিকে কাছে ডাকিয়া বাড়ীর অন্য মেয়েদের সহিত সমান আদরে তাহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তাঁহার মতন উদার-প্রকৃতির লোক অতি দুর্লভ। তাঁহার রাঁচি-প্রবাসকালে লাট-সাহেব দু'একবার তাঁহার মন্দির-প্রাসাদ দেখিতে যান। নূতনদাদা তাঁহাকে যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, কোনো দীন দুঃখী তাঁহার মন্দির দেখিতে গেলেও তাহাকে সেইরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিয়া লইতেন। যিনি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার স্বভাব-মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়াছেন।

পারিবারিক স্নেহ-প্রীতিও তাঁহাতে কম ছিল না। আমাদের বাল্যকালে যখন প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাহির হয়, তখন তিনি সেখানি হাতে করিয়া ভিতরে যাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। ইংরেজী পুস্তকেরও তর্জ্জমা করিয়া তিনি অবসরকালে আমাদের শোনাইতেন। পরে যখন তিনি নিজে রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন এক-একখানি বই শেষ হইলেই আমাদিগকে লইয়া বেশ-একটা মজলিশ জমাইয়া বসিতেন। আমরা মুগ্ধভাবে তাঁহার পাঠ শুনিতে-শুনিতে যে-সকল টীকা-টিপ্পনী করিতাম, তাহা তিনি বেশ খুসী হইয়াই শুনিতেন; এবং তদনুসারে স্থল-বিশেষে তাঁহার লেখার মধ্যে কিছু-কিছু বাড়াইতে-কমাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে তিনি আমাদের অন্তঃপুরেও সাহিত্যের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন।

আমি যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তিনি তখন আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। আমার লেখা 'দীপ-নির্ব্বাণ' পড়িয়া তাঁহার এতদূর ভালো লাগিল যে, তাঁহার পরম বন্ধু সাহিত্য-বিশারদ ও কবি ৺অক্ষয় চৌধুরীকে ইহা না পড়াইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। অন্য ঘরে আমার স্বামী ও তিনি এই লেখা পড়িয়া ইহার গুণাগুণ আলোচনা করিতেন। আমি ও নূতন-দাদার স্ত্রী, আমার প্রিয়সখী বৌ-ঠাকুরাণী পাশের ঘরে থাকিয়া অন্তরাল হইতে শুনিতাম। কিছুদিন পরে চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী যখন সুদূর পিত্রালয় হইতে কলিকাতায় আসিলেন, তখন এই সূত্র অবলম্বনেই আমাদের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ উপাদেয় আত্মীয়তা-সম্পর্ক সৃষ্ট হয়; এবং আমাদের পর্দ্দা-প্রথা উঠিয়া যায়।

তাঁহার কিরূপ অপরিসীম দেশ-প্রীতি ছিল, তাহারও পরিচয় তিনি নানা কাজে দেখাইয়া গিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় না হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হইবে না, তাই তিনি প্রথম নীলের চাষ আরম্ভ করেন। পরে, এই চাষে তাঁহার যাহা কিছু লাভ হইয়াছিল সমস্ত খরচ করিয়া তদানীন্তন প্রধান ইংরেজ কোম্পানী প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বরিশালে ফেরি-ষ্টিমার খুলিলেন। কিন্তু দেশের লোকের সাহায্য সহানুভূতি-সত্ত্বেও এই ব্যবসা অধিক কাল স্থায়ী রাখিতে পারেন নাই। প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করিয়া পরে সেই ষ্টিমার ইংরেজ কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় তাঁহার দেশ-প্রীতি ও সৎসাহসের চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার জীবনের অনেক কথাই বসন্ত-বাবুর প্রণীত তাঁহার "জীবনস্মৃতি"তে গাঁথা রহিয়াছে। আপনারা এখন সেইসকল স্মৃতির আলোচনা করিয়া তাঁহার গুণ-গৌরব রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনীয়। এরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তির যেরূপ অভ্যর্থনা পাওয়া উচিত ছিল, তাহা তিনি পান নাই। ইহাতে আমাদেরই জাতীয় দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে। আশা করি সাহিত্য-সমাজ এইবার তাঁহাকে যথাপ্রাপ্য গৌরবাসন প্রদান করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।*

* আশুতোষ-কলেজের বাংলা-সাহিত্য-সম্মিলনীর উদ্যোগে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতি-সভায় পঠিত।

১৩৩২ কার্ত্তিক
গোকুলচন্দ্র নাগ

একত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র নাগের যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্যের ও চিত্রকলার ক্ষতি হইল।

বাল্যকাল হইতে সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা চিত্রকলায় তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। তিনি তিন বৎসর কলিকাতাস্থ সর্‌কারী আর্টস্কুলে মিঃ পার্সি ব্রাউন্‌ ও শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ, আনি বেসান্ট্‌ প্রভৃতির ছবি আঁকিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিবার দিকেই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল।

তিনি ১৯১৮-১৯ সালে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম চক্রে কাজ করেন ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন।

১৯২০-২১ সালে ফোর্‌ আর্টস্‌ ক্লাবের (Four Arts Clubএর) সংস্রবে সুনীতি দেবী, মণীন্দ্রলাল বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ ও তিনি "ঝড়ের দোলা"-নামক গল্পের বহি প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী বৎসর তাঁহার ছোট গল্পের বহি "সোনার ফুল", এবং টেনিসনের "দি প্রিন্সেস্‌" কাব্য অবলম্বনে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য "রাজকন্যা" প্রকাশিত হয়।

১৯২২ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত তিনি দীনেশরঞ্জন দাশের সহিত "কল্লোল" নামক মাসিক পত্র সম্পাদন ও পরিচালন করেন। এই সময়ে "পথিক" নামক সামাজিক উপন্যাসের রচনা আরব্ধ হয়। ইহা কিছুদিন হইল ইণ্ডিয়ান্‌ পাব্লিশিং হাউস্‌ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রোগশয্যার ইহার প্রুফ দেখিয়াছিলেন। তিনি মেটার্‌লিঙ্কের ব্লু-বার্ডের বঙ্গানুবাদ "পরীস্থান" নাম দিয়া রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার "মায়ামুকুল" নামক ছোট গল্প যন্ত্রস্থ, ও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

১৩৩২ ফাল্গুন
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২৪৬ সালের ২৯শে ফাল্গুন তারিখে কলিকাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয়। বর্ত্তমান ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি হইবার পর হইতে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চা অবিরাম গতিতে চলিয়াছিল। ৪ঠা মাঘ রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়; সেদিন প্রাতেও তিনি একটি স্বরচিত নূতন কবিতা অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে নূতন আকার প্রদান করেন। তাহা এ মাসের প্রবাসীর প্রথম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

বাল্যকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল তা

ছাড়া তাঁহাদের বাড়ীর এক বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তিনি প্রত্যহ রামায়ণ মহাভারতের গল্প আগ্রহের সহিত শুনিতেন। সাত আট বৎসর বয়সেই তাঁহার বাংলা লেখার ঝোঁক চাপে। তখন যাহা কিছু মনে আসিত, তাহাই গদ্যে বা পদ্যে লিখিয়া ফেলিতেন।

তিনি প্রথমে বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখানে কয়েক বৎসর পড়িয়া ইংরেজী সেন্টপল্‌স স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বাংলা শিখিবার ও লিখিবার তাঁহার যেরূপ আগ্রহাতিশয় বরাবর ছিল, ইংরেজী শিখিবার ও লিখিবার সেরূপ আগ্রহ তাঁহার কখনও হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ইংরেজী বেশ জানিতেন, এবং শেক্সপিয়্যার, বায়রন্ ও কীট্‌সের গ্রন্থাবলী তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। ইংরেজীতে তিনি দর্শনের বহিও অনেক পড়িয়াছিলেন, বিশেষতঃ জার্ম্যান্ দার্শনিক কান্টের বহির অনুবাদ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ কবি ছিলেন, দার্শনিক ছিলেন; গণিতজ্ঞ ছিলেন;—ভারতবর্ষের লোক ইহাতে কিছু অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। ভারতীয় দার্শনিক সংঘের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"আমাদের ভারতে যাবতীয় বিদ্যা—দর্শন, কাব্য, যাহা হউক—একটি একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভূত। স্বাতন্ত্র্যপ্রসূত অসূয়ার বালাই তাহাদের নাই; সুতরাং পাশ্চাত্যসুলভ দণ্ডবিধির সাহায্যে অনধিকারপ্রবেশকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয় না। দার্শনিকপ্রবর প্লেটো তাঁহার আদর্শ গণতন্ত্র রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছে। কারণ, এদেশে দর্শনের চরম লক্ষ্য সাধারণের জীবনকে অধিকার করা, পণ্ডিতমণ্ডলীর বুদ্ধদ্বার খাস্-কামরা আশ্রয় করা নহে।...আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধী-শক্তি শ্রদ্ধার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন ও রচনাবলী এইসকল কথার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "জীবন-স্মৃতি" পুস্তকে তাঁহার বড়দাদার কাব্যরচনার কিছু-কিছু আভাস দিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একটা কিম্ভূত কৌতুকনাট্য (burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাহ্নে গুণদাদার বড় বৈঠকখানা ঘরে তাহার রিহার্স্যাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়াইয়া খোলা জানালার ভিতর দিয়া অট্টহাস্যের সহিত মিশ্রিত অদ্ভুত গানের কিছু-কিছু পদ শুনিতে পাইতাম এবং অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের উদ্দাম নৃত্যের কিছু কিছু দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনও মনে আছে—

ও কথা আর বোলো না আর বোলো না,
বল্‌চ বঁধু কিসের ঝোঁকে—
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাস্‌বে লোকে—
হাঃ হাঃ হাঃ হাস্‌বে লোকে!

এত বড় হাসির কথাটা যে কি তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই—কিন্তু একসময়ে জানিতে পাইব এই আশাতেই মনটা খুব দোলা খাইত।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্য অসাধারণ-রকমের ছিল। ১৩২১ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে গুপ্তনামা কোন লেখক তদ্বিষয়ে লিখিয়াছেন,

"হাস্যরসের সময় যে অট্টহাস্য শুনিয়াছি, সে হাস্য সমস্ত শরীর ও অন্তঃকরণ দিয়া একটি বিরাট সম্পূর্ণ হাস্য। তাহার মধ্যে কার্পণ্যের লেশমাত্র থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বিধা বিভক্ত হইবার উপক্রম হইত এবং করতলনিম্নস্থ টেবিলের কাষ্ঠখণ্ডের আয়ুঃশেষ হইবার উপক্রম হইত। এ হাসি গ্রামোফোনে তুলিয়া রাখিবার মত হাসি—সরস উচ্ছ্বসিত আনন্দের প্রাচুর্য্যে দীপ্তিময় হাসি।"

তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন পরমবন্ধু

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের হাসিও এইরকমের ছিল।

রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"তে তাঁহার বড় দাদার "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যের উল্লেখ দুজায়গায় আছে। এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন,

"বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সাম্‌নে একটি ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্ত বাতাসের মত কাজ করিত। বড় দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন-ঘন উচ্চ হাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেম্‌নি স্বপ্নপ্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া তোলা যাইত।

"তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল আবডালে হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি যাইত যে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুখে তখন ছন্দের ভাষার কল্পনার একেবারে কোটালের জোয়ার—বান ডাকিয়া আসিত, নব-নব অশ্রান্ত তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কূল উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রয়াণের সব কি আমরা বুঝিতাম? কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লাভ করিবার জন্য পূরাপূরা বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুদ্রের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও তাহার মূল্য বুঝিতাম না; কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ খাইতাম---তাহারই আনন্দ-আঘাতে শিরা-উপশিরায় জীবনস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিত!"

অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,

"সাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে—তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চায় আমি অংশী ছিলাম।

"স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের উপরে তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাল লাগিত। বিশেষতঃ আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার মধ্যেই ছিলাম, তাই ইহার সৌন্দর্য্য সহজেই আমার হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অনুসরণের অতীত ছিল। কখনো মনেও হয় নাই এইরকমের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

"স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্ত্তি ও কারুনৈপুণ্য! তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগান বাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথের মত কবি এবং অন্য অনেক সমজ্‌দার ব্যক্তি স্বপ্নপ্রয়াণের প্রশংসা করিলেও দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমার যথার্থ কবিতার মূড় যখন ছিল—অর্থাৎ সেই কালে—তখন আমি একাব্য লিখি নাই বলিয়া ইহা আমার মনোমত হয় নাই; ইহার রচনার সময়ে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় মস্‌গুল ছিলুম, তাই জন্য উহাতে মেটাফিজিক্‌স্ ঢুকিয়াছে।" তাঁহার পক্ষে একথা বলা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কারণ তিনি নিজের লেখার কঠোর সমালোচক ছিলেন; নিজে কিছু লিখিয়া সহজে সন্তুষ্ট হইতেন না। বার বার সংশোধন, এমন কি

পুনর্লিখন চলিত।

স্বপ্নপ্রয়াণের আগে এবং পরেও তিনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পদ্যানুবাদ তাহার মধ্যে অন্যতম। তাঁহার মেঘদূতের অনুবাদ বাল্যকালের রচনা বলিলেও চলে। অথচ অনুবাদটি উৎকৃষ্ট। উহার কতকগুলি পংক্তি বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও পরিচিত; যথা—

"কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ী
গিয়া তুমি দেখিবে তথায়—"
"তাহারে নাচাত প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া
রণ রণ বাজে তায় বালা।"

হাস্যরসাত্মক কবিতা তিনি অল্পবয়সে লিখিয়াছিলেন, জীবিতকালের শেষ দুই তিন বৎসরেও লিখিয়াছিলেন। আগেকার হাস্যরসাত্মক কবিতার মধ্যে "গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য" তাঁহার পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। উহার শেষে এইরূপ ফলশ্রুতি আছে :—

"শুনিলে সুশ্রাব্য, এই কাব্য কবিকুল-অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্টসিদ্ধি, গোঁপবৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি,
কালো কি কটা॥
পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁফের সেবা করি,
সুখে বিচরে॥"

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা দ্বিজেন্দ্রনাথকে অধীর করিয়া তুলিত। এক সময়ে তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইল, কেন? ঐ সুদূর আকাশের বর্ণমাধুরী আমার চিত্তকে এমন নাড়া দেয় কেন? আমার মন এবং আকাশের সহিত কি সম্বন্ধ? অতঃপর তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার ফলস্বরূপ "তত্ত্ববিদ্যা" পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়।

"আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।" রবীন্দ্রনাথ এই বাক্যে যে প্রজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ সেই প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। পরলোকগত কবি শান্তিনিকেতনের অন্যতম শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিজের এক বন্ধুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন,

"মাটর্‌লিংকের 'প্রজ্ঞা ও নিয়তি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম—পড়িয়া দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্যা মাটর্‌লিংক করিয়াছেন। অত্যন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, মেঘের মত প্রেমী, নিশীথের ন্যায় শান্ত নিরহঙ্কার অথচ অতি উদার, সমস্ত বিশ্বজগতের রহস্যের মুখামুখি শয়ান, অভিভূতব্য (?) চিত্তের একটি ভাব, তাহাকেই বলে প্রজ্ঞা বা উইজ্‌ডম্‌। সেই প্রজ্ঞা দ্বিজেন্দ্র বাবুর আছে।"

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছিলেন—

"সংসারে লোকের অনেক দিক্‌ থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক্‌ থাকে, যদি তিনি সমগ্র জীবনে কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা এক মাত্র জ্ঞান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আর একজনকেও দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি নাই। এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও কি দিন, কি রাত্রি, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ গভীর জ্ঞানচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্ন যুবকের ক্লান্তি আছে, কিন্তু শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচিন্তায় দ্বিজেন্দ্রনাথের কখন ক্লান্তি দেখিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধিবাসিগণ গভীর নিশীথ সময়ে সুষুপ্ত, শালসমীরণ তাহাদের ললাট স্পর্শ

করিয়া দিবসের ক্লান্তিখেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশ্রমলক্ষ্মী শান্ত-স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানকার আমলক কুঞ্জের অধিদেবতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনও জাগিয়া রহিয়াছেন; ভৃত্য মুনীশ্বর দুই ধারে মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়াছে, আর তাঁহার লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন লোহিত রাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! দ্বিজেন্দ্রনাথের এ নিশাকাহিনী পিতামহীর কাহিনী নহে।"

প্রবাসীর যে সংখ্যায় এই বাক্যগুলি বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই গুপ্তনামা পূর্ব্বোক্ত লেখকও বলিয়াছিলেন,

"পূর্ব্বে দেখিয়াছি লিখিতে লিখিতে ভোর হইয়া গেল, চাকরকে ডাকিয়া শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন, প্রভাতের বিহঙ্গম বৈতালিকগণ তাহাদের গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আর শয়ন করা হইল না, স্নান করিয়া দৈনিক দুই মাইল পর্য্যটন সমাপ্ত করিয়া চা পান করিয়া আবার খাতা লইয়া লিখিতে বসিলেন।"

তিনি দর্শনশাস্ত্রের একান্ত অনুবাগী ছিলেন। উহার চর্চ্চা ও চিন্তাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপিত হইত। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে তিনি উচ্চাঙ্গের গণিতের অনুশীলন করিতেন। তাঁহার রেখাক্ষর বর্ণমালা বিশ্রামকালে লিখিত। একান্ত বিশ্রাম করিতে চাহিলে তিনি সূতা বা আঠার সাহায্য না লইয়া বিচিত্র কৌশলে কেবল ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া কাগজের নানা-রকম খাতা, খাপ, ব্যাগ, পেটিকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। তিনি প্রবাসীতে যে অগণিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সমুদয় এইরূপ খাতায় লেখা। তাঁহার চিঠিও খামেব মধ্যে পুরিয়া পাঠাইতেন না, সুকৌশলে তাহা ভাঁজা হইয়া আসিত। তিনি যাহাদিগকে স্নেহ করিতেন, তাহারা কলম পেন্সিল লেফাফা প্রভৃতি রাখিবার এক একটি কাগজের পেটিকা উপহার পাইত। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও একটির অধিকারী!

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে খুব বেশী বহি পড়িতেন, তাহা নহে; কিন্তু পাঠ অপেক্ষা চিন্তা করিতেন বেশী। তিনি গীতার ও উপনিষদাদি হিন্দু শাস্ত্রের যে-সকল ব্যাখ্যা স্বদেশবাসীদিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার অসাধারণ চিন্তাশক্তির ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিভার বলে অন্যে যে-সকল সত্যের অস্তিত্ব অনুমান করে না, তিনি শাস্ত্রবচন হইতে তাহা পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হইতেন।

ইউরোপ হইতে রবীন্দ্রনাথ একবার তাঁহার বড় দাদাকে একখানি চিঠি লেখেন, তাহাতে এইরূপ মর্ম্মের কথা ছিল, যে, তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ভারতীয় দর্শনে ও জ্ঞানে সামান্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও যাহা বলিতেছেন, তাহাতে ইউরোপীয়েরা বিস্মিত হইতেছে। এই জন্য তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন ইংরেজীতে ভারতীয় জ্ঞানসম্ভার ইউরোপীয়দিগের নিকট উপস্থিত করেন; তাহা হইলে তাহারা উপকৃত ও মুগ্ধ হইবে। এই চিঠি যখন আসে, তখন আমরা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি আমাদিগকে পড়িতে দেন; তাহার পর নিজের ইংরেজী লেখার অনভ্যাস প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, পরোক্ষভাবে, কেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাহা জানান। প্রসঙ্গক্রমে সেই সময়ে তিনি আমাদিগকে বলেন, "রবির wonderfull literary powers (আশ্চর্য্য সাহিত্যিক শক্তি) আছে," অর্থাৎ কিনা "রবি" যাহা পারে সকলের পক্ষে কি তাহা সুসাধ্য? রবীন্দ্রনাথও প্রৌঢ় বয়সে ইংরেজী লিখিতে আরম্ভ করেন। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রনাথ যদি ইংরেজী লেখার অভ্যাস করিতেন, তাহা

হইলে তদ্দ্বারা জগৎ উপকৃত হইত।

দর্শনের প্রসঙ্গে আমাদের একটি আখ্যান মনে পড়িতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাতিশয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, এবং ভারতীয় দর্শনের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাংলার তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড্ রোনাল্ড্‌শে আমাদের যুবকদিগের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা কিম্বা পাশ্চাত্য দর্শনের পূর্ব্বে ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করেন, তখন আমরা তাঁহার প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যে, আমাদের লেখায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে তাঁহার রিক্‌শাটি আরোহণ করিয়া আমাদের তখনকার শান্তিনিকেতনের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সহিত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহার দেশাভিমানে ও ভারতীয় দর্শনের প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের যে কোনও অশ্রদ্ধা নাই, তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আর একবার, প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে, বর্ত্তমান অবস্থায় যে স্বাধীনতা লাভার্থ ক্ষাত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অসমর্থ, এইরূপ কিছু লিখিবার কথা উত্থাপিত হয়। তাহাতে, ওরূপ কোন কথা লিখিলে ভারতবর্ষের অপমান করা হইবে, এই মত তিনি প্রকাশ করেন।

এণ্ড্রুজ্ সাহেব শান্তিনিকেতনে থাকিতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া ও চা খাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত যাপন করিতেন। তিনিও এণ্ড্রুজ সাহেবকে স্নেহ করিতেন। তথাপি, একদিন দেশে কি একটা অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে পড়িয়া উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদিগকে (অর্থাৎ ইংরাজদের মধ্যে অত্যাচারীদিগকে) তাড়াইয়া না দিলে আর শান্তি নাই" (ইংরেজী কথাগুলা ইহা অপেক্ষা জোরাল ছিল; তাহা লিখিলাম না)। তাহাতে এণ্ড্রুজ সাহেব দ্বিজেন্দ্রনাথের এক পৌত্রকে বলিয়াছিলেন, "I say.—, your grand-father is a terrible—." তাঁহার স্বদেশপ্রেম কিরূপ ছিল, তাহার আভাস দিবার জন্যই এই কথাগুলি লিখিলাম; নতুবা ধীর শান্ত (যদিও বীর্য্যবান্) দ্বিজেন্দ্রনাথ যে হিংসামূলক কোন হঠকারিতার সমর্থন করিতেন না, তাহা তাঁহার ভক্তমাত্রেই জানেন।

ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ তাঁহার জীবনের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিবার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া তিনি ম্রিয়মাণ থাকিতেন ও তজ্জন্য ক্ষোভ লইয়া মরিবেন, এই কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত প্রচেষ্টায় তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও আশার সঞ্চার হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ইহার পর তাঁহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্যের ভাব চলিয়া যায়। তিনি মহাত্মা গান্ধীকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন, এবং আমাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীর বলিতে শুনিয়াছি।

"ব্রহ্মানন্দ যে জানে সার,
ভয় নাই আর কিছুতে তার॥"

তিনি এই আনন্দের অন্বেষণে অন্তিম বৎসরগুলি ব্যাপৃত ছিলেন। তাহার অধিকারী হইয়া অনেক দিন জীবিত থাকিয়া তিনি শান্তিতে

পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। "দ্বিজের ত্রিজত্ব" কবিতাটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্রপৌত্র ধনজনবিভব সবই ছিল, কিন্তু তিনি অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। অথচ তিনি যে আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। তাঁহার অনেক কথায় তাহাদের প্রতি স্নেহের পরিচয় অনেক বার পাইয়াছি।

তাঁহার বাসভবনসংলগ্ন আমলক-কুঞ্জের জীবগুলির প্রতি তাঁহার স্নেহকরুণা দেখিলে প্রাচীনকালের শান্তরসাস্পদ তপোবনের কথা মনে পড়িত। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, এবং আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি :—

"তিনি নিরুপদ্রবে একাকী বসিয়া জ্ঞানসমুদ্রের রত্নগুলি আহরণ করিতেছেন, আর সম্মুখের আমলক-তরু হইতে পাখী নিজের মনে তাঁহার গায়ে মাথায় আসিয়া বসিতেছে, খেলা করিতেছে, আবার খাবার খাইতেছে; কাঠবিড়ালগুলিও লাফাইয়া লাফাইয়া এইরূপ খেলা করিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভৃত্যকে দিয়া ইহাদের উপযুক্ত আহার প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়া নীরব চিন্তায় বসিয়া আছেন। কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা নাই সকলেই যেন বলিতেছে, সর্ব্বা আশশা মম মিত্রং ভবন্তু—সমস্ত দিক্ আমার মিত্র হউক! মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে—মিত্রের চক্ষুতে আমরা দর্শন করি! একদিন একটি পাখী তাঁহার কাঁধে বসিয়া খেলিতে খেলিতে সহসা ঠোঁট দিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে। চোখটি ইহাতে অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে। সংবাদ পাইয়া আমরা একটু চিন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং আমাদের নিকট উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোখে বেশ আঘাত লাগিয়াছে। কিন্তু তিনি বলিলেন—'না, ও বিশেষ কিছু নহে, এখনই সারিয়া যাইবে। ও তো আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই!' দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্ঞানচর্চ্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়া নীরস হইয়া যান নাই, তাঁহার 'ভূতদয়া' এইরূপই পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"

এই বিষয়ে প্রবাসীর পূর্ব্বোক্ত গুপ্তনামা লেখকও লিখিয়াছিলেন :—

"শালিক চড়াই কাঠবিড়ালী আসিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, গায়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তচিত্তে বিচরণ করিতেছে। লেখার ব্যাঘাত হইলে মাঝে মাঝে 'আঃ বড় জ্বালাতন কর্‌চে' বলিয়া বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহারা ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া যাহারা যেমন ছিল তেমনি রহিল, কেবল কাঠবিড়াল ভদ্রতার অনুরোধে লেখার টেবিল ছাড়িয়া পার্শ্বস্থিত পাথরের টেবিলে লাফাইয়া চড়িয়া লেজে ভর করিয়া বসিল।"

চোখের ভিতরে পূর্ব্বোক্ত পাখীটি ঠোক্‌রাইয়া দেওয়ায় তাঁহাকে পনের দিন চোখ বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল।

"রাগিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত নাই, তখন ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'আহা, তাড়াতে বল্‌লেই কি তাড়াতে হয়! যা তাকে ডেকে নিয়ে আয়।' ডাকিয়া আনিতে হইল না, সে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।"

"দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া দেখিলেন একটি শীর্ণদেহ কুকুর বারাণ্ডায় শুইয়া শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং কুঁই কুঁই করিয়া কাঁপিতেছে। তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে ডাকিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিলেন, বলিলেন, 'তোদের কি কোনও মায়া দয়া নেই! আহা, কুকুরটা এইরকম ক'রে কাঁদ্‌চে, আর তোরা দরজা বন্ধ ক'রে ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে ঘুমুচ্ছিস্?' এই বলিয়া আপনার একখানি নূতন লালরঙের কম্বল আনিয়া কুকুরের গায়ের উপর তাহা চাপা দিয়া যখন দেখিলেন যে সে কতকটা সুস্থ হইয়াছে, তখন আবার ফিরিয়া গিয়া আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন।"

কোন মানুষ তাঁহার কথায় বা আচরণে ক্লেশ পাইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিলে তিনি ব্যথা পাইতেন এবং তাহার যথাসম্ভব প্রতিকার

করিতেন। তাঁহার কোন কথায় কেহ হয়ত রাগ করিয়াছে এরূপ ভ্রমও তাঁহার কখন কখন হইত। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একটি কি বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য শেষ হইবার পরেই আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া আসি। আমি বোধ হয় একটু হঠাৎ আসিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়, যে, আমি বুঝি বা কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। সেই জন্য কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'বাবু মহাশয় আপনাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন'। আমি গেলে তিনি নিজের সন্দেহের কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলাম, যে, তাঁহার কথা শেষ হওয়ায় ও আমার অনেক কাজ থাকায় আমি চলিয়া আসিয়াছিলাম, অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি আমাদের সকলের এরূপ পূজনীয় ও ভক্তিভাজন ছিলেন, এবং সকলকে এরূপ স্নেহ করিতেন, যে, তিনি তিরস্কার করিলেও (আমাদিগকে তাহা কখনও করেন নাই) আমাদের অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া, সেদিন তিনি, অন্য কোন কোন দিনের মত, বম্‌ওয়েচ্‌ নামক জার্ম্মান মিশনারীর বাংলা কথাবার্ত্তা ও বাংলা কবিতা পাঠের হাস্যকর অনুকরণ করিতেছিলেন; এবং অন্যবিধ লঘু কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহাকে যে চিনিত না, এরূপ লোকেরও সেদিনকার কথাবার্ত্তায় কোন বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। মানুষের সহিত ব্যবহারে তাঁহার শিষ্টতার ও কোমলহৃদয়ের পরিচয় এইরূপ সামান্য সামান্য ঘটনাতেও পাওয়া যাইত। আপন আপন অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অনেকেও এইরূপ ঘটনার বৃত্তান্ত দিতে পারিবেন।

কোনপ্রকার অহমিকা প্রকাশ তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। পরোক্ষভাবেও যাহাতে নিজের বা নিজ পরিবারের কোন বড়াই করা না হয়, সে-বিষয়ে তিনি এরূপ সতর্ক ছিলেন, যে, উহা স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। আমি একবার তাঁহাকে বলি, যে, তাঁহার বাল্য ও যৌবন কালে বঙ্গের সামাজিক ও অন্য নানাবিধ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যদি কিছু লেখেন, ত, তাহা উপাদেয় হইবে ও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তাহাতে সেরূপ কিছু না লিখিবার দুটি কারণের তিনি উল্লেখ করেন। একটি এই, যে, তাঁহার স্মৃতি দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, অনেক কথা ভাল করিয়া মনে নাই। দ্বিতীয় কারণ এই বলেন যে, উহা লিখিতে গেলে তাঁহাদের নিজেদের পরিবারের কথা এত বলিতে হইবে, যে, তাহা আত্মম্ভরিতা মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ, তিনি এই দ্বিতীয় কারণটি যত গুরুতর মনে করিতেন, উহা তাহা নহে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার স্বভাবনম্রতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার অন্তরে যেমন একটি সহজ সরল দর্পহীন তেজস্বিতা ছিল, বাহিরের পরিচ্ছদেও তিনি তেমনি, অন্যের মতামতের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, নিজের অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুসারে চলিতেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় ঠিক্‌ই লিখিয়াছেন,

"তাঁহার আচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন অনুসারে, প্রচলিত প্রথা বলিয়া তাঁহার নিকটে কিছু নাই। চশমার যে-যে স্থান শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে, কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব হয় বলিয়া তিনি চশমার সেই সেই স্থানে তুলা জড়াইয়া লইবেন। বেড়াইবার সময় চাপকান ঝুলিয়া থাকায় অসুবিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্কন্ধে মোটা ফিতা দিয়া তাহা বাঁধিয়া চলিবেন। চটি জুতার বুড়ো আঙ্গুলে লাগে, তিনি তজ্জন্য জুতার সেই স্থানটুকু গোল করিয়া কাটিয়া লইবেন। | তিনি শীতকালে গরম মোজার ভিতর হাত ঢুকাইয়া সূতা দিয়া মোজা ও জামার

আস্তিন হাত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতেন, যেমন বাইসিক্‌ল্‌ আরোহীরা মোজা ও পাত্‌লুন পায়ে জড়াইয়া বাঁধে; ইহাও শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতে পারিতেন।] যতটুকু প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা যে কোন বিষয়েই হউক; আহার-বিহার বসন-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সর্ব্বত্রই তাঁহার এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। প্রয়োজনের অতিবিক্ত তিনি কিছুই করেন না।"

একবার এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁহাকে একটি গরম ওভারকোট্‌ উপহার দেন। তিনি উহা লইয়াছিলেন, কিন্তু গায়ে না দিয়া উহার দ্বারা তাঁহার কেদারাটি মুড়িয়া তাহাতে বসিতেন।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু না করার যে নিয়ম, শব্দপ্রয়োগসম্বন্ধেও তিনি তাহা রক্ষা করিতেন। সকল-রকম লেখাতেই তিনি বিশেষ বিবেচনা ও ওজন করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতেন। এই জন্য তাঁহার লেখায় তাঁহার চিন্তা ও ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হইত।

তিনি বড় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মানুষ বুঝিয়া চতুরতাপূর্ব্বক মত বা মনের ভাব গোপন করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। এই জন্য কখন কখন তাঁহার অজ্ঞাতসারে হাস্যকর অবস্থা ঘটিত। একদিন মিঃ এণ্ড্রুজ্‌ ও আমি তাঁহার সহিত সন্ধ্যায় দেখা করিতে গিয়াছি। সেদিন তিনি, আমাদের দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যেও অনেক সময় কেমন উচ্চ ধর্ম্মভাব ও দার্শনিক চিন্তা লক্ষিত হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে, খৃষ্টিয়ান্‌ মিশনারীরা যে আমাদের দেশের লোককে পুতুলপূজক বলিয়া ভুল বুঝে ও অবজ্ঞা করে, এই মর্ম্মের নানা কথা খুব উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন। শ্রোতা দুজনের মধ্যে এক জন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহী, তাহা তিনি ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। আমরা যখন বিদায় লইয়া নিজ নিজ আবাসে চলিলাম, তখন এণ্ড্রুজ্‌ আমাকে ইংরেজীতে বলিলেন, "আজ বড় দাদার কথোপকথন খুব ইন্টারেস্টিং হইয়াছিল।" আমি চুপ্‌ করিয়া এই মন্তব্যের রসটুকু উপভোগ করিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের ছাপ্‌কে মোটেই মূল্যবান্‌ মনে করিতেন না; এই জন্য বহুবার আমাদের সাক্ষাতে বি-এ এম্‌-এ-দের সম্বন্ধে এরূপ অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিতেন যাহা শুনিলে তাঁহারা খুশি হইবেন না। তাঁহার শ্রোতাও বিশ্ববিদ্যালয়ের দাগী লোক, তাহা তাঁহার মনে থাকিত না; অথবা হয়ত তাঁহার স্নেহগুণে তিনি তাহাকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ, শিক্ষিতা মহিলাদের সম্বন্ধেও তাঁহার কতকগুলি প্রতিকূল ধারণা ছিল। কিন্তু তাহার জন্য, ঐরূপ যেসব মহিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইতেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতি কম ভক্তিমতী ছিলেন না। আজকালকার মেয়েরা যে সেকেলে ভাল ভাল রান্না ভুলিয়া যাইতেছেন, এটা তাঁহার একটা অভিযোগ ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যেমন বিস্তর সত্য আখ্যানমালা সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহা হওয়া উচিত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের চিন্তাশক্তি বিস্ময়কর ছিল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন,

"শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা-প্রভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া দৃঢ়তরভাবে বলিয়াছেন, যে, ইহা এইরূপ হইতেই হইবে। আনন্দের বিষয় বস্তুতও তাহা সেইরূপই শাস্ত্রে দেখা গিয়াছে।" "তাঁহার শাস্ত্রচিন্তায় জ্ঞানচর্চ্চায় সফলতা লাভের একটি প্রধান কারণ তাঁহার সত্যনিষ্ঠা। তাঁহার হৃদয় কোন সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে।...হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায়, তিনি কাহারও প্রতি কোন অনুচিত আরোপ সহ্য করেন না। একটি ঘটনার উল্লেখ করি। একদিন এক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে প্রকাশ করেন, যে, হিন্দুগণের শ্রীকৃষ্ণের

যে কৃষ্ণরূপ, তাহা কুৎসিত; এবং ইহা অসভ্য বর্ব্বর জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে। কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিজেন্দ্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌঁছে। দিবা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্র, বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী ধীরপদক্ষেপে উপস্থিত হইয়া মৃদুতীব্র ভাষার তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া উপসংহার করিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের কুৎসিত রূপের কথা কোথায় আছে? সর্ব্বত্রই ত তাঁহাকে 'শ্যামসুন্দর' 'মদনমোহন' বলা হইয়াছে!"

যুবা সতীশচন্দ্র রায় দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রকৃত আইডিয়ালিষ্টের প্রতিকৃতি এতদিনে আমি দেখিলাম। ইঁহাদের একটি লক্ষণ এই, যে, ইঁহারা যে কথাই বলুন, তাহা নিজের অন্তরাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে থাকেন—বাইরের লোক সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। ভাবিয়া দেখ দেখি—জাগ্রত অন্তরাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা যদি কথাবার্ত্তা সব বলি, তাহা হইলে আমাদের বাক্যে কি সত্য, কী তীব্রতা, কি তেজ প্রেরিত হইতে বাধ্য!...দ্বিজেন্দ্রবাবু মুখে সরল ভাব তো আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় একটি বড় জোরের অথবা বীর্য্যের ভাব আছে। এইসকল জ্যোতির স্পর্শে অন্তরাত্মা জাগে।"

১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবী

যে-সকল বাঙালী ভদ্রলোক ও মহিলা স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাংলা দেশের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করেন এবং তাহাকে সমৃদ্ধ করেন, প্রবাসী বাঙালীদের মোট সংখ্যা ধরিলে তাঁহাদের সংখ্যা কম বলা যায় না। বঙ্গের বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা বাঙালীর আন্তরিক জীবনস্রোতের সহিত এই প্রকারে যোগ রক্ষা করিতেন, শ্রীযুক্তা সরোজকুমারী দেবী তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ইং ১৮৭৫ সালের ৪ঠা নবেম্বর ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান ১৯২৬ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সম্বলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার স্বামী। ইং ১৮৮৬ সালে তাঁহাদের বিবাহ হয়। এইরূপ অল্প বয়সে বিবাহিত হইবার পর সরোজকুমারী নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এবং ভারতীয় সাংবাদিকদিগের মধ্যে সুপরিচিত।

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবীর নানা প্রকারের অনেক বাংলা লেখা প্রধান-প্রধান মাসিক পত্রে বাহির হইত। তাঁহার কতকগুলি কবিতা ও গল্প পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। কবিতার বহিগুলির নাম 'হাসি ও অশ্রু', 'অশোকা' ও 'শতদল'। গল্পের বহিগুলির নাম 'অদৃষ্টলিপি', 'ফুলদানি' এবং 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প'। মাসিক পত্রের ভাষায় যাহাকে ছোট গল্প বলে, তাঁহার অনেকগুলি গল্প সেরূপ নয়, তাহা অপেক্ষা বড়। সেগুলি ছোট উপন্যাস আখ্যা পাইবার যোগ্য। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁহার 'কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্পে'র ভূমিকায় অনেক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন :—

"কোরকের মধুরতা ফুটন্ত ফুলকে পরাস্ত করে। যে নবেল লিখিতে পারে, সেই নবেলেট লিখিতে পারে না। ক্ষুদ্র গল্পে সরোজকুমারী নিপুণতা দেখাইয়াছেন, পূর্ণবিকশিত নবেল রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হইবেন, আশা করা যায়।"

শেযোক্তরূপ কোন গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়া থাকিলে তাঁহার স্বামী তাহা নিশ্চয়ই প্রকাশিত কবিবেন।

১৩৩৩ কার্ত্তিক
প্রবাসী-সম্পাদক ও রম্যা রলাঁ

সম্পাদক-মহাশয় জেনিভায় কাজ করিতে করিতে ইউরোপের ভাবুক-শিরোমণি মহাত্মা রম্যা রলাঁর নিমন্ত্রণ পান; জেনিভা হইতে দুই ঘন্টা রেল-পথে যাইয়া ভিল্ন্যভ্ (Villeneuve) পৌছাইয়া সম্পাদক Villa Olga ভবন রলাঁদেব অতিথি হন। রলাঁর পিতার বয়স ৯০ বৎসর; তিনি এখনও সুস্থ শরীরে কাজ-কর্ম্ম করেন এবং বাগানে গাছপালা লইয়া ব্যস্ত থাকেন; তিনি, তাঁর একমাত্র কন্যা বিদুষী মাদলেন রলাঁ ও স্বয়ং রলাঁ, সম্পাদককে তাঁহাদের উদ্যান-বাটিকায় অভ্যর্থনা করেন; রলাঁর ভগ্নী ইংরেজী বেশ জানেন এবং রলাঁর সহিত সম্পাদক-মহাশয়ের কথা-বার্ত্তায় দোভাষীর কাজ করেন; নানা আন্তর্জাতিক সমস্যা ও অন্য গভীর প্রসঙ্গ লইয়া সম্পাদকের সহিত রলাঁ মহোদয়ের আলাপ হয়। পরস্পরের মধ্যে অনুভূতির যোগ সহজেই স্থাপিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে জেনিভা হইতে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে রলাঁ সম্পাদক-মহাশয়কে অনুরোধ করেন। রলাঁ তাঁর লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখাইয়া বাগানে তাঁর পিতা ও ভগ্নীর সহিত সম্পাদকের কতকগুলি ফোটো তুলিয়া লন। তার মধ্যে তিনখানি ছবি প্রবাসীর পাঠকদের উপহার দেওয়া গেল। ডক্টর্ রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী সযত্নে সম্পাদক-মহাশয়কে শ্রীযুক্ত রলাঁর নিকট লইয়া যান।

১৩৪২ আশ্বিন
রোম্যাঁ রোলাঁর মত

ভারতবর্ষে রোম্যাঁ রোলাঁর নাম অজ্ঞাত নহে। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক ও অন্য নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, এবং আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে তাঁহার মত মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে। তিনি জীবিত ভারতীয়দের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা

গান্ধী এবং পরলোকগত ব্যক্তিদের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সে বিষয়ে সুভাষবাবুর লিখিত একটি প্রবন্ধ সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা লিখিত হইবার পর সুভাষবাবু তাহা ফরাসী মনস্বীকে দেখান ও তাঁহার দ্বারা অনুমোদিত করান। তাহার পর ছাপা হইয়াছে। সুভাষবাবুর সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি নিজের একখানি ও রবীন্দ্রনাথের সহিত একত্র তোলা একখানি ফোটোগ্রাফ উপহার দেন। দ্বিতীয়টির তিনি নাম দিয়াছেন, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন।" এই ছবিটি প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

সুভাষ বাবুর সহিত সাক্ষাৎকারের সময়, ভারতবর্ষে স্বরাজলাভ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলেন। তাহার তাৎপর্য্য সুভাষবাবুর প্রবন্ধে নিবদ্ধ হইয়াছে। পৃথিবীর সব দেশে ধনী ও নির্ধন, ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাহীন শ্রেণীসমূহের মধ্যে তাহাদের অধিকার ও পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন উঠিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে রোম্যাঁ রোলাঁ মহাশয়ের মত সুভাষবাবুর প্রবন্ধটি হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল :—

I asked Mon Rolland if he would be good enough to put in a nutshell the main principles for which he had stood and fought all his life. "Those fundamental principles" he said. "are (1) Internationalism (including equal rights for ali races without distinction), (2) Justice for the exploited workers—implying thereby that we should fight for a society in which there will be no exploiters and no exploited—but all will be workers for the entire community, (3) Freedom for all suppressed nationalities and (4) Equal right for women as for men"

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ

জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ

এ বৎসর সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ্ সাহিত্যিক জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ পাইয়াছেন। তিনি সত্তর বৎসর বয়সে এই সম্মান লাভ করিলেন! বহুপূর্ব্বেই তাঁহার এ পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, কারণ তাঁহা অপেক্ষা কম প্রতিভাশালী কোনো-কোনো সাহিত্যিক তাঁহার পূর্ব্বেই এই সম্মানে ভূষিত হন।

আইরিশ্‌দিগের মধ্যেও কবি ইয়েটস্ ইতিপূর্ব্বে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। দ্বিতীয় একজন আইরিশ্ সাহিত্যিক উক্ত সম্মান লাভ করিলেন। আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ পান।

বার্ণার্ড্ শ স্কান্দিনেভীয় নাট্যকার ইব্‌সেনের শিষ্যস্থানীয়। ইব্‌সেন ভিন্ন আর কোনো নাট্যসাহিত্যিক এমন পৃথিবীব্যাপী যশ আজকালকার দিনে অর্জ্জন করেন নাই।

বার্ণার্ড্ 'জনবুল্‌স্ আদার আইল্যাণ্ড' নামক প্রসিদ্ধ নাটক লিখিয়া বহুখ্যাতি প্রতিপত্তি ও পুরস্কার

ও তিরস্কার অর্জ্জন করেন। এই নাটক ইংরেজদের শ্লেষ ও ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত। আইরিশ্‌দের ইংরাজপ্রীতি যে অসাধারণ নয় তাহা বলাই বাহুল্য। শ্লেষরচনাতেই শ'র খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বর্ত্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের যত পাপ, অবিচার ও ভীরুতাকে এই শ্লেষের তীব্র কশাঘাতে তিনি জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি সোসিয়ালিস্ট দলভুক্ত ও Fabian সোসাইটির সভ্য। সুতরাং সমাজের কল্যাণ-কামনায় তাঁহার অধিকাংশ রচনা উদ্দেশ্যমূলক হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক সভ্যতার কোনো গ্লানিকে তিনি ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। ইনি দীর্ঘজীবন-কাল ধরিয়া বহু নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। সংখ্যায় হয়ত পঞ্চাশের অধিক হইবে। ইঁহার শেষ নাটক 'সেন্ট্ জোয়ান্' রসিক-সমাজে আদৃত হইয়াছে।

—শ

১৩৩৯ মাঘ

বোম্বাইয়ে বার্ণার্ড শ

বিখ্যাত লেখক জর্জ বার্ণার্ড্ শ দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বোম্বাই বন্দর পৌঁছিয়াছেন, জাহাজেই আছেন, ডাঙায় নামেন নাই। সেখানে খবরের কাগজের লোকেরা তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিয়াছে এবং তিনিও রসিকতা ও ব্যঙ্গের সহিত উত্তর দিয়াছেন। তাঁহাব উত্তরগুলির রস অনুবাদে রাখা কঠিন। এখানে কেবল দুটি উত্তরের দুটি অংশের উল্লেখ করিব।

"যদি ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের সহিত আপনাদের বিরোধ হয়, আশা করিবেন না যে, ফ্রান্স, জার্মেনী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা আমেরিকা তৎক্ষণাৎ সাহার্য্যার্থ দৌড়িয়া আসিবে। তাহারা আপনাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একটি আঙুলও তুলিবে না। ভারতের সব কাজ ভারতীয়দিগকেই করিতে হইবে, বিদেশীদিগকে নহে।"

সত্য কথা, এবং আগে হইতেই আমাদের জানা কথা।

"গান্ধী যদি ষাট লক্ষ মানুষ মারিতে পারিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কথা শিরোধার্য্য হইত।"

ইহা ব্যঙ্গের সুরে বলা হইলেও সত্য কথা। অবশ্য, মহাত্মা গান্ধীর এক জন মানুষকেও বধ করিবার ইচ্ছা নাই, কাহারও সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে তিনি বরং তাহাকে নিবৃত্ত করিতেই চেষ্টা করিবেন। বার্ণার্ড্ শ কেবল সভ্য মানুষের যেরূপ মনোবৃত্তি এখনও আছে, তাহাই যথাযথ বলিয়াছেন। জ্ঞানে সাত্ত্বিকতায় কোনো জাতি বড় হইলেও যতক্ষণ তাহার যুদ্ধশক্তি ভয়াবহ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে অন্য কোন জাতি গ্রাহ্যই করে না।

১৩৩৪ শ্রাবণ
পণ্ডিত ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

পণ্ডিত ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়া রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপকতা করিতেন। পরে ঔপন্যাসিক ও নাটককার হয়েন। তাঁহার অনেক নাটক রঙ্গামঞ্চে বহুদিন ধরিযা বারবার অভিনীত হইত। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি হইল। শিক্ষা একরূপ এবং জীবনের প্রধান কাজ অন্যরূপ, বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ ব্যাপারের তিনি একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল নহেন। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কলেজে শিখিয়াছিলেন প্রধানতঃ বিজ্ঞান, এবং জীবনের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত রসায়নীবিদ্যার অধ্যাপকও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম থাকিবে সাহিত্যিক বলিয়া।

১৩৩৪ ভাদ্র
যোগীন্দ্রনাথ বসু

স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লেখক বলিয়াই বাংলা দেশে সমধিক পরিচিত, যদিও তিনি আরও অনেক বহি লিখিয়াছেন। এই ভাবে পরিচিত হইবার কারণ এই, যে, তাঁহার লেখা এই জীবনচরিতটিই পাশ্চাত্য অনেক জীবনচরিতের সহিত তুলনীয় প্রথম উৎকৃস্ট বাংলা জীবনচরিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

আমার সহিত যোগীন্দ্রবাবুর পরিচয় হয় এই পুস্তক লিখিত হইবার পূর্ব্বে। তিনি তখন বৈদ্যনাথ-দেওঘর বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিলেন। হনোলুলুতে ফাদার (পাদরী) ডামিয়েন কুষ্ঠরোগীদের সেবা করিতে গিয়া নিজে ঐ রোগে আক্রান্ত হন, এবং তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মহাত্মার আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হইয়া যোগীন্দ্রবাবু তাঁহার সমনামা বন্ধু (রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পুত্র) যোগীন্দ্রনাথ বসুর সহিত মিলিত হইয়া "অমরকীর্ত্তি" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা ফাদার ডামিয়েনের জীবনচরিত। পরে আমি যখন দেওঘরে তাঁহার বাড়ীতে একবার অতিথি হই, তখন তাঁহার নিকট ডামিয়েনের সমাধিপার্শ্বস্থ গাছের কয়েকটি পাতা তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম। তিনি তাহা হনোলুলু হইতে আনাইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথে তখন বিস্তর কুষ্ঠরোগী যাইত, এখনও গিয়া থাকে। উহা তীর্থস্থান এবং তথায় শিবের মন্দির আছে। মহাদেবের কৃপায় রোগমুক্ত হইবার আশা তাহাদের সেখানে যাইবার কারণ। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বৈদ্যনাথে তাহাদের কোন আশ্রয়স্থান ছিল না যত্ন করিবার লোক ছিল না; পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দিরে তাহারা থাকিত, রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইত, অনেক সময় যথেস্ট ভিক্ষা না পাওয়ায় উপবাসী থাকিত, এবং

কখন মৃত্যুর পূর্ব্বেই শৃগালকুক্কুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। ইহাদের এইরূপ নানা দুর্দ্দশা দেখিয়া যোগীন্দ্রবাবুর দয়ালু হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হয়। তিনি স্বয়ং কুষ্ঠরোগীদের সাহায্য করিতেন, কখন কখন তাহাদের ক্ষত ধুইয়া ঔষধ লাগাইয়াও দিতেন, কিন্তু তাহাতে সকলের যথেষ্ট সাহায্য বা কষ্টের লাঘব হইত না। এই জন্য তিনি, রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ও বৈদ্যনাথের অন্যতম পাণ্ডা শিক্ষিত, সদাশয় ও সাধুচরিত্র গিরিজানন্দ দত্ত ওঝা মহাশয়ের সহযোগে, বৈদ্যনাথে একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনে উদ্যোগী হন। ইহার জন্য টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত খবরের কাগজে সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন প্রকাশ করিয়া ভিক্ষা চাওয়া হয়। সেই উপলক্ষে আমি যোগীন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখি ও তখন হইতে তাঁহার সহিত পরিচিত হই। প্রধানতঃ স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের অর্থসাহায্যে কুষ্ঠাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার পত্নীর নামে উহার নাম রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম রাখা হয়।

যোগীন্দ্রবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত লিখিতেছিলেন, তখন কিছুদিন বৈদ্যনাথ কলেজের ছুটির সময় তাঁহার বাড়ীতে ছিলাম। তখন উনবিংশ শতাব্দী নব্বইয়ের কোঠায় চলিতেছে। সেই সময় তাঁহার শ্রমশীলতা, সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিবার রীতি, এবং নানা শ্রেণীর লোকের উপকার করিবার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তখন বৈদ্যনাথে কলিকাতার ও বঙ্গের অন্য অনেক জায়গায় অনেক বাঙালী বাড়ী তৈয়ার করাইতেছিলেন। কেহ কেহ তাহার ভার দিয়াছিলেন বসু মহাশয়ের উপর। তিনি প্রত্যেকের হিসাব আলাদা আলাদা করিয়া রাখিতেন, এবং রোজকার হিসাব এমন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিতেন, যে, যে-কোন সময়ে কেহ হিসাব চাহিলে আধপয়সাটির পর্য্যন্ত হিসাব দেখাইতে পারিতেন।

মধুসূদনের জীবনচরিতের অনেক উপাদান তখন তাঁহার নিকট দেখিয়াছিলাম। কাহারও জীবনচরিতের জন্য যত উপাদান সংগৃহীত হয়, সমস্ত প্রকাশিত হয় না; কারণ পুস্তকের কলেবর একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিতে হয়, এবং তদ্ভিন্ন এমন অনেক জিনিষ থাকতে পারে যাহা মৃত ও জীবিত অনেকের গ্লানিকর। যাঁহারা উপকরণ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদনের বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাক অন্যতম। ইঁহার বন্ধুপ্রীতিতে বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইনি যখন মধুসূদনের সহিত হিন্দুস্কুলের নীচের ক্লাসে একত্র পড়িতেন, তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তারিখ অনুসারে পর পর তাড়া বাঁধা সমুদয় চিঠিপত্র তিনি যোগীন্দ্রবাবুকে দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে লেফাফার কোণছেঁড়া চীরকুটে ক্লাসে বসিয়া লেখা দুই বন্ধুর ইয়ারকিও ছিল। ইহা হইতে যেমন বসাক মহাশয়ের বন্ধুপ্রীতির ও কর্ম্মশৃঙ্খলার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি ইহাও বুঝা যায়, যে, মধুসূদনের প্রকৃতিতে এমন কিছু ছিল যাহাতে নানা ভিন্নপ্রকৃতির লোকে তাঁহার গুণমুগ্ধ অকপট বন্ধু হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন।

যোগীন্দ্রবাবু গদ্যে রাণী অহল্যাবাঈর জীবন-চরিত, তুকারামের জীবনচরিত এবং কয়েকটি বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। বিদ্যালয়পাঠ্য কবিতার পুস্তকও তিনি কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ, শিবাজী ও মানবগীতা তাঁহার রচিত বৃহৎ তিনখানি কাব্য। প্রথম দুইখানির একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। কবিতার পুস্তক রচনা করিয়া তিনি কবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। এই

সকল কবিতার বহি ছাড়া "একাদশ অবতার" নামক তাঁহার একটি ব্যঙ্গাকাব্য আছে। তাহা যৌবনকালে রচিত।

তিনি রিপন কলেজে, দেওঘর স্কুলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগের বাংলার ক্লাসে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই সকল কাজ ভিন্ন অন্য একদিকেও কৃতী বলিয়া তিনি পরিচিত হন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্নেহের সহিত এই কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন। পরে প্রফুল্লনাথের বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধান কার্য্যও তিনি নিপুণতার সহিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মবিশ্বাসে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দু সামাজিক রীতি অনুসারে করিতেন। স্বদেশপ্রীতি তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল।

জ্যোতিভূষণ সেন

জ্যোতিভূষণ সেনের নাম বাংলা দেশে অল্প লোকেই জানে। তিনি একজন প্রকৃত অকপট ও উৎসাহী দেশসেবক ছিলেন। তিনি এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর গোখলে-প্রতিষ্ঠিত ভারতভৃত্য সমিতির (The Servant of India Societyর) শিক্ষাধীন সভ্য হন। এক বৎসব শিক্ষাধীন থাকিবার পর সমিতি তাঁহাকে পাকা সভ্য করিতে চান। কিন্তু তিনি আরো দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবেচনা করিবার অনুমতি চান। তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয়। চারি বৎসর পরে যখন আবার তাঁহাকে সভ্য করিবার কথা উঠে, তখন তিনি বলেন, যে, সমিতির সভ্যদিগকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, তাহা তাঁহার পক্ষে ভয়োৎপাদক; এবং সেই জন্য তিনি সমিতির সভ্য না হইয়াও সেবক থাকিতে চান। সমিতি তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধার সহিত পূর্ণ করেন, যদিও উহার সকল সভ্যই জানিতেন, যে, জ্যোতিভূষণ অপেক্ষা সমিতির সভ্য হইবার যোগ্যতর যুবক অল্পই আছেন। একবার একজন সভ্য এইরূপ অনুমান প্রকাশ করেন, যে, সমিতির আর্থিক অবস্থা ভাল নহে বলিয়া জ্যোতিভূষণ উহার সভ্য হইতে চাহিতেছেন না। তাহাতে তিনি এই ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যথা পান, যে, এরূপ সন্দেহ দ্বারা তাঁহার উপর বড় অবিচার করা হইতেছে। বাস্তবিকও টাকাকড়ির সম্বন্ধে তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর বৈরাগ্য কাহারও ছিল না। তাঁহার বেশ লোভজনক চাকরী অনেক জুটিয়াছিল, তাহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তিনি ভারতভৃত্য সমিতির সভ্য না হইয়াও ততদিন উহার কাজ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যতদিন সমিতি করিতে দিবেন, কিম্বা যে-পর্য্যন্ত-না তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তাঁহার মতের আর পরিবর্ত্তন হইবে না সুতরাং তিনি অসঙ্কোচে সমিতির সভ্য হইতে পারেন। তথাপি সমিতির সভ্যেরা তাঁহাকে নিজেদের একজন এবং সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও নিকটতম মনে করিতেন। তাঁহাদের মুখপত্র সার্ভ্যাণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া কাগজে

লেখা হইয়াছে, যে, তাঁহা অপেক্ষা প্রেমিক ও প্রীতির যোগ্য মানুষ কেহ জন্মে নাই ("A more loving and lovable soul never breathed")। সমিতির লাইব্রেরী উহার একটি গৌরবের জিনিষ। আমাদের নিকট কেহ ভারতীয় বা অন্য রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ভাল ভাল পুস্তকের তালিকা চাহিলে আমরা ভারতভৃত্য সমিতির লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা দেখিতে বা উহার পুস্তকাধ্যক্ষকে চিঠি লিখিতে বলিয়া থাকি। গত চারি বৎসর জ্যোতিবাবু এই লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে উহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তৎসমুদয় একমাত্র জ্যোতিবাবুর কাজ। সার্ভ্যান্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিকে তিনি অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সমিতির দুই লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি আর্য্যাভূষণ ছাপাখানা পুড়িয়া যাওয়ার পর টাকা তুলিবার জন্য জ্যোতিভূষণ ও ভারতভৃত্যসমিতির অন্য কেহ কেহ ভারতভ্রমণে বাহির হন। তখন কলিকাতায় তাঁহার সহিত পরিচিত হই। তাঁহার বিনয়নম্র মূর্ত্তি, সাদাসিধা পরিচ্ছদ, অমায়িক ব্যবহার কখনও ভুলিবার নহে। যৌবনকালে তাঁহার অকালমৃত্যুতে ভারতবর্ষ ও বঙ্গাদেশ একটি খাঁটি সন্তান ও সেবকের ভক্তি ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইল।

১৩৩৪ কার্ত্তিক
ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্ত

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন কৃতী লেখক হারাইল। তিনি রিয়াজ্ উস্ সালাতিনের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি কয়েকখানি বহি লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাগজে এবং আরও অনেক পত্রিকায় তিনি আগে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইদানীং তাঁহার লেখা কাগজে বেশী দেখা যাইত না। আমাদের কাগজে তিনি যে-সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মুসলমান প্রথম খলিফা কয়েকজনের ইতিবৃত্ত বিশেষত উল্লেখযোগ্য। তাঁহার লেখার প্রসাদগুণবশতঃ উহা সকলের সহজবোধ্য হইত। তিনি অকপট স্বদেশানুরাগী ও সমাজসংস্কারক এবং অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন।

১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

৫৪ বৎসর বয়সে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি জীবনে কোনদিন খ্যাতির জন্য উদ্‌গ্রীব হন নাই। একান্ত নিভৃতে নীরবে তিনি সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। ক্বচিৎ তিনি মাসিক পত্রাদিতে কবিতা লিখিতেন। অথচ তাঁহার 'একতারা' কাব্যখানি সাহিত্য-রসিকদিগকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে এবং বাংলা সাহিত্যে সেই কাব্যের স্থান অতিশয় উচ্চে। তাঁহার প্রবন্ধ রচনা সুনিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও উচ্চ ভাবুকতার পরিচায়ক।

ব্যবহারিক জীবনে তিনি নিরহঙ্কার অমায়িক ও উদার ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম অকৃত্রিম ছিল। Servant পত্রিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তিনি উহার ডিরেক্টার ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্সের তিনি যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি হইয়াছিলেন। সৎসাহিত্যের আলোচনা ও বিশ্লেষণে এবং দেশহিতমূলক প্রতিষ্ঠান-সমূহের উন্নতি-বিধানে তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

১৩৩৪ মাঘ

গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা

১৯২৬ সালের সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার ইতালীয় উপন্যাসলেখিকা গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দাকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯২৭ সালের সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান স্থগিত আছে। ইহাঁর পূর্ব্বেও মহিলারা সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। অনেকের মতে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক "মা" (La Madre বা "The Mother")। আমেরিকার ম্যাকমিলান কোম্পানী ১৯২৩ সালে উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার বয়স এখন ৫৫ বৎসর। ইতালী রাজ্যের অন্তর্গত সার্দ্দিনিয়া দ্বীপ তাঁহার জন্মভূমি। তথাকার নুওরো নামক ছোট সহরটির কৃষক ও মেষপালকদের মধ্যে তাঁহার বাল্য ও যৌবনকাল অতিবাহিত হয়। তাঁহার বহিগুলিতে ঐ সকল শ্রেণীর লোকদের কথা অনেক আছে। তিনি গত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বহি লিখিতেছেন। "মা" ছাড়া তাঁহার "ভস্ম" ("Ashes") এবং "বাতাসে নলখাগড়া" ("Reeds in the Wind") নামক দুখানি বহির অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইতালীর সমঝদার লোকেরা তাঁহাকে এরূপ উচ্চ শ্রেণীর লেখিকা মনে করেন, যে, ১৯২৬ সালে মুসোলিনী যে ইতালীয় অমর-পরিষদ স্থাপন করেন, দেলেদ্দা ও আর দুইজন মহিলা তাহাতে স্থান প্রাপ্ত

হয়েন।

সার্দ্দিনিয়ার জীবজন্তু গাছপালা যেমন ইতালী হইতে কতকটা ভিন্ন, রীতিনীতিও তেমনি কতকটা ভিন্ন। নরহত্যার প্রতিশোধে নরহত্যা সার্দ্দিনিয়াদের প্রকৃতিগত। তাহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ের সমান নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। কোন নারী ব্যভিচারিণী হইলে যেমন তাহার প্রাণবধ করা হয়, কোন পুরুষ ব্যভিচারী হইলে তাহাকে তেমনি মারিয়া ফেলা হয়। দেলেদ্দা তাঁহার নানা বহিতে সার্দ্দিনিয়ার রীতিনীতি ও প্রকৃতি জগতের গোচর করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ডে হ্যারী হ্যান্সেন্ এই সব কথা বলিয়া "মা" সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে ইহা দেলেদ্দার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। একজন রোমান কাথলিক পুরোহিত ইহার নায়ক। রোমান কাথলিক পুরোহিতেরা চিরকুমার থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এই পুরোহিতটি নারীর প্রেমের আকর্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা হইতে চ্যুত হন। মা প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন তাঁহার পুত্র ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া সন্ন্যাসী পুরোহিত হয়। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, যে, নারীর কুহক তাহার স্খলনের কারণ হইবে। কিন্তু তাহাই ঘটিল; পুত্র পৌরোহিত্য ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে নিরাশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া মা পুত্রের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, যেন কোন অমঙ্গল তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে। তাঁহার বিবেচনায় সাংসারিক জীবনটা অমঙ্গলময়, এবং তাঁহার পুত্রের অবলম্বিত আধ্যাত্মিক কার্য্যই পরম শুভ। পুত্র যখন পৌরোহিত্য ত্যাগ করিবার জন্য বেদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন মা তাহার নিকটে মূর্চ্ছিত ও গতপ্রাণ হইয়া পড়িলেন। পিরান্দেলো বলেন, দেলেদ্দার এই গ্রন্থ ইতালীতে আধুনিক কালে লিখিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী।

নেপল্‌সের এক নাগরিকের সহিত প্রাৎসিয়া দেলেদ্দার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পর হইতে তিনি রোম নগরে বাস করিতেছেন।

১৩৩৬ শ্রাবণ

অমৃতলাল বসু

৭৭ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন প্রাচীন ও প্রবীণ লোক হারাইল। তিনি দক্ষ অভিনেতা, প্রহসন ও কবিতা রচয়িতা, স্বদেশী যুগের বক্তা ও কর্ম্মী, বৃদ্ধ বয়সেও রসিক বক্তা, এবং বিদ্যালয়ের জন্য সাহায্য-সংগ্রাহক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পৌত্র, দার্শনিক সাধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে বঙ্গাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা "সাধনা" তিনি কিছু কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। ছোটগল্প লেখায় এবং নানাবিধ প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার সাহিত্যিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অতি নিরহঙ্কার অমায়িক সরল ও সাধু স্বভাবের লোক ছিলেন। নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তিনি পরিশ্রম দ্বারা সহায়তা করিতেন।

চট্টগ্রামের সতীশচন্দ্র ঘোষ

চট্টগ্রাম জেলার সতীশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন সাহিত্যিক কর্ম্মীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। তিনি অনেক কষ্টস্বীকার করিয়া চাক্‌মা জাতির বৃত্তান্ত রচনা ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের বিবরণী তাঁহার অন্যতম পুস্তক। তিনি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। বঙ্গের নানা অঞ্চল হইতে তিনি কথাবার্ত্তায় চলিত প্রায় ছয় হাজার শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপ চলিত শব্দের একটি অভিধান লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

১৩৩৬ পৌষ

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য তাঁহার উত্তমরূপে জানা ছিল। তিনি ৪০ বৎসর কাল যোগ্যতার সহিত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাই বেশ লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ সরস রচনায় পূর্ণ। তিনি অনেক বার সরকারী চাকরী পাইয়াছিলেন. কিন্তু তাহা না লইয়া বেসরকারী কলেজেই বরাবর কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনে তিনি অনেক শোক পাইয়াছিলেন। শেষ শোক পান তাঁহার একটি কন্যার ও স্ত্রীর মৃত্যুতে। তাহাতে অভিভূত হইয়া রোগে শয্যাশায়ী হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩৩৭ চৈত্র

উমা দেবী

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে, অকালে উমা দেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাংলা দেশেব সাহিত্যের ক্ষতি হইল। তাঁহার পিতা পরলোকগত অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন দর্শন-শাস্ত্রে যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি সাহিত্যরসিকও ছিলেন। অধিকন্তু তিনি নির্ম্মল চরিত্র ও সৌজন্যের জন্য সুবিদিত ছিলেন। কল্যাণীয়া উমা তাঁহার পিতার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন।

তিনি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লেখা কেবল দুটি বহি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক "বাতায়ন" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—

তোমার "ছায়াছবি"গুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে, তার কারণ ওর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। ভাবুকতার কবিতা অনেক সময়ে রঙ্গীন মেঘের মতো; তা'র মধ্যে যদি বা স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয়, সে সুনির্দ্দিষ্ট নয়; বাষ্পরেখায় রূপ যদি বা আঁকা পড়ে, মনে হতে থাকে এর ধ্রুবত্ব নেই। কিন্তু যে জিনিষকে তুমি হৃদয় দিয়ে দেখেছ, এই ছোট ছোট কবিতায় তা'কেই সহজ ক'রে দেখিয়েছ; এই মনে ক'রে তৃপ্তি হয়, এগুলি প্রত্যক্ষ বিষয়। হৃদয়ের উড়ো হাওয়ায় যে-সকল বেদনার খেয়াল ভেসে বেড়ায়, তা'কে পাঠকের মনে অনুভাবিত করা, সে আর এক জিনিষ। সেখানে প্রায় দেখা যায় ঠিক্ সুরটি লাগে না অত্যুক্তি এসে পড়ে, সর্ব্বদা কাব্যে ব্যবহৃত বাক্য ও বাক্যরীতি জমাট বেঁধে ভাবের আন্তরিক লঘুতা ঢাকা দেয়, এক রকম প্রথাসম্মত চলনসই জিনিস দাঁড়িয়ে যায়, তা'র চেয়ে বেশী কিছু নয়। কিন্তু এই "ছাযাছবি"র বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয় এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। তোমার ঘরের কাছে মজুররা কাজ করে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপর কারো চোখ পড়ে না; তোমার দৃষ্টিতে তা'রা উপেক্ষিত হয়নি, তোমার রচনায় তারা সমাদর পেয়েছে,—এইটি আমার ভালো লাগল।

"ছায়াছবি" নামটি সঙ্গত হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। এই লেখাগুলিতে ছায়ার অস্পষ্টতা নেই।

মনে এই আশা রইলো, তোমার বাতায়নের ঠিক্ সম্মুখবর্ত্তী দৃশ্যের বাইরেও তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হবে, এবং তোমার অভিজ্ঞতাক্ষেত্রের সকল দিক্ থেকেই প্রত্যক্ষ-দেখা ছবিগুলিকে সংগ্রহ করে এম্‌নি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় তোমার কবিতায় তাদের সজ্জিত ক'রে তুল্‌বে।

কবির এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অনেকের এই আশা ফলবতী হইল না। এখন কেবল সান্ত্বনা এই,

" যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
* * *
জানি গো জানি তাও
হয় নি হারা।"

উমা দেবী কোন কোন মাসিক কাগজেও লিখিতেন। "বিচিত্রা"য় তাঁহার "কাজলী" নামক উপন্যাস বাহির হইয়াছিল। ছোট গল্প রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল, "প্রবাসী"তে তাঁহার "ছায়াছবি"গুলি পড়িয়া আমাদের পাঠকেরা প্রীত হইয়াছেন।

উমা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ বাসরে রবীন্দ্রনাথের

এই আশীর্ব্বচন পঠিত হইয়াছিল,—

"বীণার তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে গান যদি অকালে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, তবে তার অন্তঃপ্রবাহ শ্রোতার মনে নীরবে সমাপ্তির মুখে চল্‌তে থাকে। উমার অসম্পূর্ণ জীবন তেমনি ক'রে অকালমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার প্রিয়জনদের মনের মধ্যে একটি অন্তরতর গতি লাভ করেছে। সংসারে স্নেহ দেবার এবং স্নেহ পাবার ইচ্ছা তা'র জীবনের সব চেয়ে একান্ত ছিল। ফুল যেমন আলো চায় এবং গন্ধ দেয়, সে তা'র অল্পায়ু জীবলীলায় তেমনি ক'রেই প্রীতি দিয়েছে এবং নিয়েছে। এই দেওয়া-নেওয়ার অবসান হ'ল, এখন একথা মনে ক'রে যেন বিলাপ না-করি। জীবিতকালেই সে অনুভব ক'রেছিল যে, তার স্পর্শশক্তি মৃত্যুর অন্তরাল অতিক্রম ক'রেছে; আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন মনে করি যে, তা'র আত্মিক শক্তি ইহলোক পরলোকের মাঝখানে আত্মীয়তার সেতু রচনা ক'রে আছে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে শোকস্মৃতির অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে এই মুহূর্ত্তেই তা'র হৃদয় স্নিগ্ধ হ'ল। তা'র আত্মা শান্তি লাভ করুক, তৃপ্তিলাভ করুক, মর্ত্ত্যজীবনের সমস্ত অপূর্ণতা থেকে মুক্তিলাভ করুক, এই কামনা করি।"

১৩৩৮ শ্রাবণ

সতীশচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া পদাবলীর—বিশেষ চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাহার সংগ্রহও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং পাঠের উদ্ধারও করিয়াছিলেন।

১৩৩৮ ভাদ্র

মুনশী আবদুর রহিম

৭২ বৎসর বয়সে মুনশী আবদুর রহিমের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি "মিহির ও সুধাকর" এবং পরে "মুসলিম হিতৈষী" কাগজের সম্পাদকরূপে মুসলমান সাংবাদিকদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ইসলাম ধর্ম্ম ও তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বাংলায় অনেক বহি রচনা ও সংকলন করিয়াছিলেন। এই প্রকার কর্ম্মীদের দৃষ্টান্তে, বাংলা যে বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা, এই বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ় হইতেছে।

মৌলানা ইস্মাইল হোসেন শিরাজী

মৌলানা ইস্মাইল হোসেন শিরাজী অকালে ৫২ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমিক, এবং গদ্যে ও পদ্যে সুলেখক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিতে ও আচরণে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না। ১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশীর স্বপক্ষে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তিনি তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে বাল্কান যুদ্ধে ডাক্তার আন্সারী যে চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীর দল ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন, শিরাজী মহাশয় তাহার মধ্যে ছিলেন। তাহার দ্বারা তুরস্ক ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধুতা দৃঢ়ীভূত হয়। তিনি সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া কারারুদ্ধ হন। অন্যান্য কর্ম্মীর সহিত তিনি বাল্কান যুদ্ধে তুরস্কের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহা স্মরণ করিয়া তুরস্কের দেশনায়ক মুস্তফা কামাল পাশা তাঁহার পুত্রকে নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন।

"আমার পুরাতন বন্ধু মৌলানা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর মৃত্যুতে আমি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তিনি কেবল যে ভারতের গৌরব ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি ইসলাম সমাজের নেতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইসলাম-জগতে এক বিখ্যাত ব্যক্তির অভাব হইল। তুর্কীগণ আপনার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। আপনার মত উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া যাওয়াই তাঁহার গৌরব। আমরা আপনার শক্তি অবগত আছি এবং এখানে আপনার উপস্থিতি ইচ্ছা করি। শোকে ধৈর্য্য ধারণ করুন।"

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার

রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সরকার লোকসমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন না। তিনি বিশেষ যোগ্যতা ও সততার সহিত দীর্ঘকাল বিহারে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গিরিডির স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় নহে। তিনি ও প্রবাসীর সম্পাদক সতীর্থ, এক সঙ্গে এম্ এ পাস করিয়াছিলেন। আমরা যৌবন কাল হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখনই বাংলা উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য লিখিতে পারিতেন। সেই অল্প বয়সেই কিংবা তাহার অল্পকাল পরেই "প্রকৃতি-চর্চ্চা" নামক একটি ভাবুকতাপূর্ণ গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেকালে "ধর্ম্মবন্ধু" নামক একটি ছোট ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্র বাহির হইত। তাহার গোড়ায় প্রতি সংখ্যায় একটি কবিতা থাকিত। সেই কবিতাগুলি প্রায়ই সুরেশবাবু লিখিতেন। নানা বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সুরেশচন্দ্র ইংরেজী গদ্য এবং কবিতাও বেশ লিখিতে পারিতেন। ইংরেজী পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ করি তাহা মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার বিনয়নম্রতার আতিশয্য, লোকচক্ষুর সম্মুখীন হইতে সঙ্কোচ বোধ, এবং বাংলা ও ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে খুঁৎখুঁতেপনা

তাঁহার সাহিত্যিক শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত হইতে এবং জনসমাজে অধিক পরিচিত হইতে দেয় নাই। কেবল তাঁহার স্বভাবের সৌরভ আত্মীয়-বন্ধুগণের স্মৃতিতে রহিয়াছে।

১৩৩৯ বৈশাখ
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ঊনষাট বৎসর দুই মাস বয়সে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি প্রায় এক বৎসর কঠিন পীড়ায় ভুগিতেছিলেন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি আরও কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকিলে ছোট গল্প লিখিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিতেন।

আমরা যতদূর জানি, মাসিকপত্রে তাঁহার লেখা প্রবাসী-সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "দাসী" পত্রিকায় প্রথমে বাহির হইয়াছিল। তাহা প্রায় চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। তখন তাঁহার লেখা দিলদারনগর হইতে আসিত। তাঁহার সেকালের একটি লেখার কথা এখন মনে পড়িতেছে। উহা "একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত", ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের "দাসী" পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তাহার পর প্রবাসীর সম্পাদক কর্ত্তৃক যখন "প্রদীপ" প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতেও প্রভাতবাবু লিখিতেন। প্রবাসী-সম্পাদকের সম্পাদিত "প্রদীপে" তাঁহার অনেকগুলি কবিতা (সেকালে তিনি কবিতা লিখিতেন) এবং সিমলা শৈলের একটি সচিত্র বর্ণনা বাহির হইয়াছিল। তাঁহার একটি কবিতার নাম এখনও মনে আছে—"আকাশ কেন নীল?" উহা প্রদীপে বা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল, মনে নাই। উহা শেলীর একটি কবিতার অনুবাদ বলিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, এই রূপ মনে পড়িতেছে। প্রবাসী বাহির হইবার পর প্রভাতবাবু তাহাতে অনেক ছোট গল্প এবং একটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। আমাদের ধারণা, উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প রচনাতেই তাঁহার কৃতিত্ব বেশী। তিনি ইংরেজীতেও গল্পের অনুবাদ উত্তমরূপে করিতে পারিতেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বিস্তর গদ্য ও পদ্য রচনার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সকলের আগে যে অনুবাদটি ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে উক্ত পত্রিকায় বাহির হয় তাহা প্রভাতবাবুর কৃত। উহা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্পের অনুবাদ, নাম "দি রিড়ল্ সল্ভ্ড্।" প্রভাতবাবুর নিজের দু একটি ছোট গল্পের অনুবাদও মর্ডাণ রিভিউ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস, ও প্রবন্ধ রচনা ভিন্ন তিনি অনেক বৎসর নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর তিনি গয়া ও অন্য দু-এক জায়গায় ব্যবহারাজীবের কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কাজে তাঁহার মন বসিত না। সেই জন্য তিনি উহা ছাড়িয়া দেন। কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার সহিত আইনের এই সম্পর্ক

ছিল, যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অধ্যাপক ছিলেন, যদিও পীড়াবশতঃ দীর্ঘকাল ছুটিতে ছিলেন।

প্রভাতবাবু সাধারণ যে-সব চিঠিপত্র লিখিতেন, তাহাতেও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইত।

১৩৩৯ শ্রাবণ

স্বর্ণকুমারী দেবী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতমা কন্যা, কবি রবীন্দ্রনাথের অন্যতমা জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বহু গ্রন্থের লেখিকা এবং নারীদের কল্যাণবিধায়ক নানা কার্য্যের অনুষ্ঠাত্রী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী জীবনের ৭৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়িণী প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, কবিতা ও গান, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক, প্রবন্ধ, এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বঙ্গে বোধ হয় তিনিই প্রথমে ভূতত্ত্ববিষয়ক, "পৃথিবী" নামক, গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুস্তকাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা সম্মুখে নাই—হয়ত কোন কোন নাম বাদ পড়িবে। সম্ভবতঃ অধিকাংশের নাম নীচের তালিকায় পাওয়া যাইবে।

উপন্যাস—দীপনির্ব্বাণ, স্নেহলতা, ছিন্নমুকুল, ফুলের মালা, হুগলীর ইমামবাড়ী, বিদ্রোহ, মেবার-রাজ, কাহাকে?, বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী, মিলন-রাত্রি। ছোট গল্পের বহি—নব কাহিনী, মালতী ও অন্যান্য গল্প। নাটক—রাজকন্যা, দিব্য কমল, ক'নে বদল, পাকচক্র, কৌতুক-নাট্য, দেব-কৌতুক। কবিতা ও গানের বহি—কবিতা ও গান, বসন্ত-উৎসব, গাথা ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক পুস্তক—পৃথিবী। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক—বর্ণবোধ, ব্যাকরণ, গল্পস্বল্প, বাল্যবিনোদ, কীর্ত্তিকলাপ, সাহিত্যস্রোত।

তাঁহার "ফুলের মালা" ও "কাহাকে?" উপন্যাস দুটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। "ফুলের মালা"র অনুবাদ "ফেট্যাল গার্ল্যাণ্ড" নাম দিয়া প্রথমে মডার্ন রিভিউ কাগজে বাহির হয়। "কাহাকে?" উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের নাম "দি আন্‌ফিনিষ্ট সং।" মান্দ্রাজের গণেশ কোম্পানী তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। "কল্যাণী" নাম দিয়া তাঁহার "দিব্য কমল" নাটকের একটি জার্ম্ম্যান অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৫ সাল পর্য্যন্ত এবং পরে আবার ১৯০৬ হইতে ১৯২০ পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদন করেন। বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনের কাজ তিনিই প্রথমে করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম তাঁহাকেই ১৯২৬ সালে জগৎতারিণী পদক প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ২৯শ অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কার্য্যও মহিলাদের মধ্যে

তিনিই প্রথমে করিয়াছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বে তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ও অন্য ব্রাহ্ম মহিলাদের এই চেষ্টার সুফল এখন বাঙালী সমাজ ভোগ করিতেছেন, বিদ্রূপ ও মিথ্যা নিন্দা তাঁহারা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। নারীদের কল্যাণার্থ তিনি ১৮৮৬ সালে "সখি-সমিতি" স্থাপন করেন। ভারতীয়া মহিলাদের মধ্যে বন্ধুভাবে মিলামিশায় উৎসাহপ্রদান, তাঁহাদের মনে দেশের কল্যাণচিন্তা ও হিতৈষণার উদ্রেক, দরিদ্র হিন্দু বালিকাদের জন্য একটি নিকেতন স্থাপন করিয়া তাহাতে তাহাদিগকে শিক্ষাদান ও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে আত্মনির্ভরশীল ও সমাজসেবায় সমর্থ করা, তাহারা যোগ্যতা লাভ করিলে তাহাদের কাজ জুটাইয়া দেওয়া ও তাহাদিগকে অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া নারীশিক্ষার বিস্তারসাধন, এবং ভারতীয় কলা ও পণ্যশিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করা, এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সমিতির শুভপ্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় আগে আগে প্রতি বৎসর মহিলা-শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হইত। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহিলারা চালাইতেন, কেবল মহিলাদেরই ইহাতে প্রবেশের অধিকার ছিল। সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা হইত।

স্বর্ণকুমারী দেবী কিছুকাল বঙ্গীয় থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর মহিলা-বিভাগের সভানেত্রী ছিলেন। ১৮৮৪ সালে ফিরোজশাহ মেহতা মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন।

তাঁহার শেষ গ্রন্থ সাহিত্যস্রোতের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ইন্টারমীডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক মনোনীত হইয়াছে। শেষ পীড়ার সময় তিনি উহার দ্বিতীয় খণ্ড রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

১৩৩৯ ভাদ্র

দুর্গাদাস লাহিড়ী

বাঙালী শিক্ষিত সমাজে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় প্রধানতঃ বেদের অনুবাদক এবং "পৃথিবীর ইতিহাস" গ্রন্থের লেখক বলিয়া পরিচিত। তিনি আরও অনেক বহি লিখিয়াছিলেন, "অনুসন্ধান" পত্র তিনি ১২৯৪ সালে প্রকাশ করেন। উহা প্রায় ১৮ বৎসর চলিয়াছিল। সম্প্রতি প্রায় আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

১৩৩৯ অগ্রহায়ণ
নিখিলনাথ রায়

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি গত ১৮ই কার্ত্তিক দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্যবহারজীব হইলেও আইন-ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই, কৈশোর হইতেই বঙ্গসাহিত্যের ও বাংলা দেশের ইতিহাসের আলোচনায় নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ নিখিলনাথ সবিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি ও মুর্শিদাবাদের নিজামৎ দপ্তর অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বাঙালী জাতির ভাবধারা এবং হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বাঙালী জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনায় তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল।

"মুর্শিদাবাদের ইতিহাস", "মুর্শিদাবাদ কাহিনী", "সোনার বাঙ্গালা", "জগৎ শেঠ", "প্রতাপাদিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ নিখিলনাথের গবেষণার পরিচায়ক।

২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত "পুঁড়া" গ্রামে নিখিলনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসিরহাট মহকুমা হইতে একখানি মাসিকপত্র প্রচারে সুকবি শ্রীযুত ভুজঙ্গধর রায়-চৌধুরী ও নিখিলনাথ অগ্রণী ছিলেন। "পল্লীবাণী" মাসিকপত্র নিখিল বাবুর সম্পাদনায় দুই বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একখানি পত্রিকাও তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৩৩৯ চৈত্র
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বাংলা দেশে আর একজন কর্ম্মীর মৃত্যু হইয়াছে। রংপুরের রবীন্দ্রনাথ মৈত্র কবি, সাংবাদিক, সহৃদয় গল্পলেখক এবং নাট্যকার রূপে পরিচিত ছিলেন। অনুন্নত জাতিসমূহের লোকদিগকে শিক্ষাদান দ্বারা সমাজে সম্মানিত স্থান দিবার জন্য তিনি প্রভূত পরিশ্রম করিতেন।

১৩৪০ শ্রাবণ

পরলোকগত জগদানন্দ রায়

শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনে অতীতের সহিত ঐ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম বন্ধনসূত্র ছিন্ন হইল। তিনি উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পকাল পর হইতেই উহাতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, এবং কিছুদিন পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ কবিবার পরও একটি শ্রেণীতে শিক্ষা দিতেন। গণিত ও বিজ্ঞান শিখাইতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্য এবং ছাত্রহিতৈষণার গুণে তিনি ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার নিকট বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ছাড়া অনেক বেশী সংখ্যক বাঙালী বালক-বালিকাকে তাঁহার ছাত্র বলিতে পারা যায়। নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তিনি সহজ ও সরস ভাষায় অনেক বাংলা বহি লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা পড়িয়া ঐ সকল বালক-বালিকার এবং তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদেরও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও তিনি এইরূপ পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কার্য্যক্ষম ছিলেন, বয়সও বোধ করি বাটের বড় বেশী হয় নাই। সেই জন্য আমরা আশা করিয়াছিলাম, তিনি আরও অনেক সহজ বৈজ্ঞানিক বহি লিখিয়া যাইতে পারিবেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধনার্থ একটি কার্য্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। জগদানন্দ বাবু তাহার সভ্য ছিলেন।

শিশুরা নানা প্রাকৃতিক বিষয়ে ক্রমাগত "কেন", "কেন" প্রশ্ন করে। তাহার উত্তরে তাহারা মনঃকল্পিত বাজে কথা শুনিতে পায়, কিংবা ধমক খায়। আমরা জগদানন্দ বাবুকে এইরূপ অনেক প্রশ্ন যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক উত্তরপূর্ণ একখানি বাংলা বহি লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি এই কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

জগদানন্দ বাবু বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন এবং তাঁহার রসবোধও ছিল। তিনি একজন দক্ষ অভিনেতা ছিলেন।

১৩৪০ অগ্রহায়ণ

কামিনী রায়

বঙ্গীয় মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া শ্রীমতী কামিনী রায় মহোদয়া ৬৯ বৎসর বয়সে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। অল্প কয়েক দিনের জ্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ২৩শে সেপ্টেম্বরেও তিনি, রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহিলাদের যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। তিনি প্রধানতঃ কবি বলিয়াই

প্রসিদ্ধি লাভ করেন; কিন্তু দেশহিতকর নানা কাজের সঙ্গে—বিশেষতঃ নারীদের ও নারী শ্রমিকদের হিতকর নানা প্রচেষ্টার সঙ্গে—তাঁহার যোগ ছিল। তিনি প্রমুখতার ও প্রসিদ্ধির প্রয়াসী ছিলেন না বলিয়া, বরং তাহাতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন বলিয়া, হয়ত তাঁহার দ্বারা জনসেবা যতটা হইতে পারিত, ততটা হয় নাই। তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রীতি এবং দলিত জনগণের প্রতি সহানুভূতি অনেক কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে সন্দিহানতা বশতঃ 'আলো ও ছায়া' রচিত হইবার অনেক পরে বাহির হয়—তাহাও লেখিকার নাম না দিয়া—সেই সন্দিহানতা বরাবর ছিল। এবারকার 'প্রবাসী'র প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কবিতাটিতে এই বিনয়নম্রতার মাধুর্য্য লক্ষিত হইবে। এই সন্দিহানতা না থাকিলে হয়ত তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরও অনেক কবিতা দিয়া যাইতে পারিতেন।

তিনি মহিলা কবি বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও পুরুষ ও মহিলা সকল বাঙালী কবির মধ্যে তাঁহার স্থান উচ্চে। বাহ্য সৌষ্ঠব, লালিত্য ও ঝঙ্কার অপেক্ষা তিনি তাঁহার কবিতায় আন্তরিকতা, সরলতা, শুচিতা, সংযম এবং চিন্তা ও ভাবের প্রগাঢ়তার দিকে বেশী মনোযোগী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার কবিতা পড়িয়া কাহারও মনে হইবে না, যে নারী পুরুষের ক্রীড়নক।

১৩৪১ আশ্বিন

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত জলধব সেন প্রথমতঃ হিমালয়ে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা যখন তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর কথা, "চড়াই উৎরাই" প্রভৃতির কথা, আগ্রহের সহিত "সাহিত্যে" পড়িতাম, সেদিন এখনও মনে পড়ে। পরে তিনি অন্যান্য রচনার দ্বারা খ্যাতিলাভ করেন। সম্পাদকের কাজও তিনি বহু বৎসর করিতেছেন। তাঁহার পঁচাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় যথাযোগ্যভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিকই হইয়াছে। গর্ভমেন্টও তাঁহার সমাদর করিতে ত্রুটি করেন নাই—তাঁহাকে রায়-বাহাদুর খেতাব দিয়াছেন।

১৩৪৬ বৈশাখ

জলধর সেন

যাঁহাকে বিস্তর বাঙালী সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী “জলধর-দা” বলিয়া আন্তরিক প্রীতির সহিত সম্বোধন করিতেন ও “জলধর-দা” বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করিতেন, এবং যিনি তাঁহাদের সহিত দাদার মত সস্নেহ ব্যবহার করিতেন, সেই জলধর সেন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু নহে, এবং তিনি অনেকগুলি পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কিছুকাল পূর্ব্বেই পরলোক যাত্রা করেন। সুতরাং তাঁহাকে বৈধব্য সহ্য করিতে হইল না।

সচরাচর যে-সকল কারণে মানুষের মৃত্যু শোকাবহ হয়, জলধরবাবুর মৃত্যুতে শোকের সেরূপ কোন কারণ নাই। তথাপি যিনি এত আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার তিরোভাবে আন্তরিক বেদনা অনুভূত হইবে।

তিনি অল্প বয়স হইতেই সংবাদপত্রের সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন “সোমপ্রকাশে” ও “গ্রামবার্ত্তা”য় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইত। পরে তিনি “বসুমতী” ও “হিতবাদী”র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালনকার্য্যে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা ছিল। শেষ বয়সে তিনি বহু বৎসর ধরিয়া মাসিক “ভারতবর্ষ” সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

লেখক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁহার হিমালয়-ভ্রমণের বৃত্তান্ত লিখিয়া। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যখন “সাহিত্য” পত্রিকায় মাসে মাসে বাহির হইত, তখন আমাদের মত বহু পাঠক তাহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিত। পরে এই প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে বাহির হয়।

তিনি অনেক মনোরঞ্জক ছোট গল্প এবং কয়েকটি উপন্যাসের লেখক।

সাহিত্যিকদের “রবিবাসর” নামক সমিতি ও মিলনক্ষেত্রের তিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। নিতান্ত উত্থানশক্তিরহিত না হইলে তিনি “রবিবাসরে”র কোন অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিতেন না। ইহার পুরোধা রবীন্দ্রনাথ ইহাকে যখন শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেন, তখন তিনি পরম উৎসাহে ও আনন্দে দলবলসহ সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি রাণাঘাটে পাল চৌধুরী মহাশয়দিগের প্রাসাদে রবিবাসরের অধিবেশনে ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ-প্রণালীকে পরিহাস করিয়া ‘দাদাতন্ত্র’ বলিয়াছিলেন। ইহা কিন্তু সত্য কথা। সাহিত্যের সহিত কোন-না-কোন রকমের সম্পর্ক রাখেন ভিন্ন ভিন্ন বয়সের ও প্রকৃতির এরূপ অনেকগুলি মানুষকে সংঘবদ্ধ রাখিয়াছিল তাঁহার আন্তরিক দাদাত্ব। “রবিবাসর” হইতে এবং বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বহু ব্যক্তির এই “দাদা”র তিরোভাব হইল। সাহিত্যক্ষেত্রে ও সাংবাদিক মহলে তাঁহা অপেক্ষা প্রতিভাশালী ও খ্যাতনামা লোক আছেন, কিন্তু “দাদা” হইবার মত আপাততঃ কাহাকেও দেখিতেছি না। তাঁহার আসনটি কত দিন খালি থাকিবে, কেহ বলিতে পারে না।

১৩৪১ আশ্বিন

অতুলপ্রসাদ সেন

লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে অযোধ্যা, আগ্রা-অযোধ্যা, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষালাভ করিয়া পরে ব্যারিস্টার হইবার জন্য বিলাত যান। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পর দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করেন। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ চীফ কোর্টে ব্যারিস্টারী করিতে যান। কালক্রমে তিনি তথাকার প্রধান আইনজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন, এবং সেখানকার বার-এসোসিয়েশ্যনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। লক্ষ্ণৌতেই তিনি স্থায়ী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। যে রাস্তায় তিনি বাড়ি করেন, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপালিটি তাঁহার সম্মানার্থ তাহার নাম রাখেন অতুলপ্রসাদ রোড্। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, দানও তদ্রূপ করিতেন। কোনও সৎকর্ম্মের আবেদন, কোন বিপন্নের প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি ধনী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন নাই।

আইনজ্ঞান ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনের জন্যই যে তিনি লক্ষ্ণৌয়ে সম্মান পাইতেন তাহা নহে, তিনি লক্ষ্ণৌয়ের প্রধান নাগরিক ("First Citizen") বলিয়া স্বীকৃত হইতেন (এবং মৃত্যুর পর বহু শোকসভায় ঐ নামে অভিহিত হইয়াছেন) এই জন্য, যে, তিনি মানুষটি অতি সহৃদয়, অমায়িক, সজ্জন, বিদ্বান, সমুদয় হিতপ্রচেষ্টার ও সকল সদনুষ্ঠানের সহায় এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর অভাব ছিল না, শত্রু কেহ ছিল না। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে উদারনৈতিক ছিলেন, এবং সমগ্রভারতীয় উদারনৈতিক সংঘের এক অধিবেশনের সভাপতি, আগ্রা-অযোধ্যার প্রাদেশিক উদারনৈতিক সভার সভাপতি এবং উক্ত প্রদেশের উদারনৈতিক কন্‌ফারেন্সের দুই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি খাঁটি "স্বদেশী" ছিলেন এবং স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন।

শিক্ষাবিস্তারকার্য্য তাঁহার প্রিয় ছিল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহাকে উহার ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদ দিবার প্রস্তাব হয়। তিনি তাহা গ্রহণ না-করিয়া ডক্টর রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যেকে উহা দিতে বলেন। তদনুসারে পরাঞ্জপ্যে মহাশয় উহাতে নিযুক্ত হন।

তিনি যেমন আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে নিজের বাসভূমি করিয়াছিলেন, তথাকার লোকেরাও তেমনি তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্য দিকে তিনি আবার সেই প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের এক জন নেতা ও লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালীদের নেতা ছিলেন। তাঁহাদের সব সামাজিক কাজে, সব সংস্কৃতিমূলক কাজে, বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদে, শিক্ষায় তাঁহারা সহযোগিতা লাভ করিতেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং ইহার দুই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রবাসী বাঙালীদের মাসিকপত্র 'উত্তরা'র তিনি প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক থাকিবে গানরচয়িতা, সুগায়ক, এবং কবি বলিয়া। তিনি প্রাণের গভীর

আবেগে গান ও কবিতা রচনা করিতেন, এবং তিনি যে গান করিতেন তাহাতে তাঁহার প্রাণের ও মর্ম্মবেদনার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার গান ও কবিতার "কাকলী" "কয়েকটি গান" ও "গীতিকুঞ্জ" এই তিনখানি বহি মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনেকগুলি গান বাঙালী সমাজে সুপরিচিত। তাহার দুই একটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এগুলি "জাতীয়-সঙ্গীত"-শ্রেণীর। একটি এই :—

হও ধরমেতে বীর, হও করমেতে ধীর,
হও উন্নতশির, নাহি ভয়
ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
তেত্রিশ কোটি মোরা, নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন,
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন;
ঐ দেখ প্রভাত উদয়।
নানা ভাব, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান, জগজন মানিবে বিস্ময়।
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে,
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে, সত্যের নাহি পরাজয়।

আর একটি এইরূপ—

বল বল বল সবে, শত বীণা বেণু-রবে,
ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে,
কর্ম্মে মহান হবে, ধর্ম্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।
আজো গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী,
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদারবী,
এখনো অমৃতবাহিনী,
প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন, প্রতি জনপদ,
তীর্থ অগণন,
বহিছে গৌববকাহিনী।
বিদুষী মৈত্রেয়ী, ক্ষণা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা, অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্রপ্রসূতি,
আমরা তাদেরি সন্ততি,
অনলে দহিয়া যারা রাখে মান,
পতিপুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাদেরি সন্ততি।

নিম্নোদ্ধৃত তৃতীয় গানটি খুব বেশী সভাসমিতিতে গীত হইয়া থাকে।

উঠগো ভারতলক্ষ্মী, উঠ আদি জগতজনপূজ্যা,
দুঃখদৈন্য সব নাশি কর দূরিত ভারতলজ্জা,
ছাড়গো ছাড় শোকশয্যা, কর সজ্জা,
পুনঃ কনককমলধনধান্যে,
জননীগো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বনাবাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণতলে,
ত্রিংশতি কোটি নরনারীগো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা
দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী,
কালসাগরকম্পন দর্শে,
তোমার অভয়পদস্পর্শে, নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী সুখলক্ষ্যে;
জননীগো ইত্যাদি।
ভারতশ্মশান কর পূর্ণ,
পুনঃ কোকিলকূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ,
কর পূরিত প্রেম অলিগুঞ্জে,
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপঃতুঞ্জে
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যেঃ,
জননীগো ইত্যাদি।

"জাতীয়-সঙ্গীত" এবং অন্য সাধারণ সঙ্গীত ছাড়া তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত অনেকগুলি আছে। তাহার মধ্যে একটি উদ্ধৃত করিব। তাঁহার

ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে, কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কোন্‌টি বলা কঠিন, কিন্তু এই বলিয়া, যে, তিনি, ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসারে, উপেক্ষিত অনাদৃত অনুন্নত লোকদের সেবা বহুপূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন যখন হরিজনদের সেবার আধুনিক আন্দোল·· আবদ্ধ হয় নাই, এবং এই গানটিতে তাঁহার দীনসেবক হৃদয়ের ছাপ পড়িয়াছে।

নীচুর কাছে নীচু হ'তে শিখলি না রে মন!
(তুই) সুখী জনের করিস্ পূজা, দুখীর অযতন,
(মূঢ় মন)!
লাগেনি যার পায়ে ধূলি, কি নিবি তার চরণধূলি,
নয়রে সোনায়, বনের কাঠেই হয়রে চন্দন,
(মূঢ় মন)!
প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন,
এই ধনেতে ধনী যে জন, সেই ত মহাজন, (মূঢ় মন)!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্র সাধন, সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন!
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ, (মূঢ় মন)!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভু'লে পরম সত্য,
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নিরঞ্জন, (মূঢ় মন)!

এই গানটি অতুলপ্রসাদের "কাকলী" নামক গ্রন্থে আছে। বাউলের সুর, দাদ্‌রা।

১৩৪১ কার্ত্তিক

কবি ও কর্ম্মী অতুলপ্রসাদ

ডক্টর শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ

যে গভীর শোকে শুধু বাঙালী নহে লক্ষ্ণৌবাসী সকলে মুহ্যমান, তাহা পাছে ভাষাকে শ্লথ ও রুদ্ধ করে সেইজন্য আমার এই লিখিত অভিভাষণ। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ব্যক্তিত্ব উদার ও বিশাল ছিল। তিনি যেমন বাঙালীর, তেমনি এদেশবাসীরও নেতা ছিলেন। এদেশবাসীর সঙ্গে নিবিড় সামাজিক প্রীতির নিগড়ে তিনি যাবজ্জীবন আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রাজনীতিও বাঙালীর রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন। তিনি ছিলেন উদার লিবারাল। মনোমোহন ঘোষের মত গোখলেও ছিলেন তাঁহার রাজনৈতিক গুরু। বাঙালীর প্রাদেশিকিতা ভুলিয়া তিনি কি রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, একটা সমগ্র আদর্শ অনুধাবন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এদেশের জননায়কত্বের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইজনাই আমাদের বড় শোক যে তাঁহার মৃত্যুতে আমরা শুধু যে তাঁহাকে হারাইলাম তাহা নহে। তাঁহার জীবন এদেশবাসীর কৃষ্টি, রাষ্ট্র ও সমাজনীতির সহিত একটা মিলন-গ্রন্থি ছিল। এই মিলন-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাওয়াতে আমরা প্রবাসের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন হইতে অনেকটা বিচ্যুত হইব। আমি কিন্তু এ-সম্বন্ধে একেবারে আশা ত্যাগ করিতে পারি না। কারণ বাঙালীর ব্যাপকতর জীবনের এই প্রতিভূ, অতুলপ্রসাদ সেনের সমগ্র জীবনের দান ও ত্যাগধর্ম্ম ও তাঁহার পরিশীলনের প্রসারতা আমাদিগকে সঙ্কীর্ণতা হইতে অনেকটা রক্ষা করিবে, সন্দেহ নাই।

১৮৭১ সালে ঢাকা শহরে ডাঃ রমাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র অতুলপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। ডাঃ সেনের সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। শিশু অতুলপ্রসাদ বাড়িতে অহরহ তাঁহার সুললিত সংস্কৃত কাব্য আবৃত্তি শুনিতেন। তখন হইতেই একটা ছন্দের নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। এদিকে তাঁহার দাদামহাশয় শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্তের প্রভাব তাঁহার উপর কম হয় নাই। তিনি সে-সময়কার একজন প্রসিদ্ধ বাউলগান-রচয়িতা ছিলেন। প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় যে নিজেকে বাংলা-সাহিত্যের বাউল বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন, সত্যই ইহাতে তাঁহার উত্তরাধিকার।

স্কুল ছাড়িয়া অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে যান। ইংলণ্ডে অরবিন্দ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, লোকেন পালিত, চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার দেশী বিলাতী কাব্যের রসাস্বাদনে দিন কাটিত। বিখ্যাত ঘোষ-ভ্রাতাদ্বয় তখন বিলাতে কাব্যরচনায় খ্যাতিলাভ করিতেছিলেন। সে-সময় আরভিঙের শেক্সপীয়রের নাটকগুলির অভিনয় বিলাতে এক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় বহুদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য নাট্যকলারও সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য উপভোগ করিতেছিলেন। বিলাতে চিত্রকলার চর্চ্চাও তিনি কিছু দিন অধ্যবসায়ের সহিত করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধেও একটি গবেষণাপূর্ণ, রসাবিষ্ট প্রবন্ধ ইংলণ্ডে পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে প্রথম তাঁহার দেশীয় সঙ্গীতের স্বতন্ত্র ধারা সম্বন্ধে মত পরিস্ফুট হইয়াছিল।

অথচ নেপলস বন্দরে যখন জাহাজ থামিয়াছে তখন গণ্ডোলা-বিহারী ভিখারীদিগের মুখে ফাউষ্টের গান শুনিয়া তিনি ভাঙা ইটালীর সুরে নূতন গান রচনা করিয়াছিলেন। যে-গানে বাংলার গান-রচনায় এক রকম প্রথম দেশী-বিদেশী সুরের মিশ্রণ ঘটিয়াছিল, সেই গানটি হইতেছে :

উঠগো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আজি জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!

১৮৯৫ সালে তিনি দেশে ফিরেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গগনেন্দ্র ঠাকুর, সুরেশ সমাজপতি, লোকেন্দ্র পালিত, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মিলিয়া একটা মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন। সে বৈঠকটির নাম ছিল 'খেয়ালী'। সেখানে অতুলপ্রসাদ সেন তাঁহার অনেক নূতন রচিত গান গাহিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আযৌবন বন্ধুত্ব তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কম সম্পদ ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান অতুলপ্রসাদ এতই ভাল গাহিতেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই আসরে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'নন্দলাল', যে 'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ।'

এই যুগে ক্রমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের প্রভাব এতই বেশী হইয়াছিল যে, অতুলপ্রসাদ সেনের অনেক সুললিত গান রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই লোকে গাহিত। অতুলপ্রসাদও সাত বৎসর পরে তখন প্রবাসী হইলেন। সুদূর প্রবাসে তাঁহার কাব্য ও গানের নিবিড় রসসঞ্চার হইতে লাগিল। উত্তর-ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। যে উদার প্রাণে অতুলপ্রসাদ সেন এদেশের সামাজিক মিষ্টালাপে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া এদেশবাসীর সহিত নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার কবি-জীবনের রসপ্রেরণা হইয়াছিল। অতুলপ্রসাদ সেন যেমন তুলসীদাস ও কবীরের ভাব ও সাহিত্যে মাতিয়া গেলেন, তেমনই মুসলমানের গীতিকবিতাও তাঁহাকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল। তাই বাঙালী কবির পদাবলী উত্তর-ভারতে একটু নূতন ছাঁদ পাইয়াছে, যাহা বাংলা-সাহিত্যে একেবারে নূতন জিনিষ। যে-দেশে তুলসীদাস কবি, সেখানে সাহিত্য সার্ব্বজনীন। সাহিত্যিক বলিয়া

নূতন কোন জীব এদেশে দেখা দেয় নাই, কারণ সাহিত্যে সকলের সমান অধিকার, সাহিত্যের অনুভূতি সহজ সরল লৌকিক অনুভূতি। কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাই কবি হইয়াও নিজের সঙ্গে অপরের কোন ব্যবধান সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কবিতার সহজ লৌকিক আবেদন ও তাহার সরল ভাব প্রকাশের মূলসূত্র এইখানে। যে-সমাজে তিনি কবি সে-সমাজে গায়ক, দোঁহা ও গজল রচয়িতার ভাব প্রকাশ বাংলা দেশ অপেক্ষা উদারতর ও আভিজাত্যহীন বলিয়া তাঁহার গান ও ছন্দ বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে, এমন কি নিরক্ষর অশিক্ষিতকেও এত আকৃষ্ট করিয়াছে।

উর্দ্দু ভাব ও সাহিত্য তাঁহার গান ও ছন্দকেও কম ভূষিত করে নাই। তাঁহার গানে ও ছন্দে আছে আরব মরুভূমির তৃষ্ণার জ্বালা, অপর দিকে আছে একটা কঠোব বৈরাগ্য। এক দিকে আছে ওয়েসিসের ভোগের চঞ্চল-চরণ-ভঙ্গা, অপর দিকে মায়ামরীচিকার পরপারে চিরশান্তি। প্রকৃতি ও জীবন তাঁহাকে যত দান করিয়াছিল তাহাদের সম্পদ, তাহা অপেক্ষা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল অধিক,—মরুজীবনের বিফলতা আনিয়া দিয়া, তৃষ্ণার জলের পরিবর্ত্তে গরলের পেয়ালা বার-বার তাঁহার শুষ্ক ওষ্ঠপুটে ধরিয়া,—

প্রেম-নীরে ভরি, আশার কলসী
কত না যতনে সেচিনু তায়!
ফুলদল আসি কহে পরিহাসি,
কোথায়, তব বঁধু কোথায়?

কিন্তু জীবনের এই নিদারুণ পরিহাস তাঁহার অন্তরকে তিক্ত না করিয়া বরং মধুর, স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়াছিল। কবি স্বল্পভাষী ছিলেন। উর্দ্দু-মার্শীয়া ও গজল গানের মর্ম্মন্তুদ দুঃখের আড়ালে একটা সহজ বিশ্বাস যেমন তাঁহাকে মুগ্ধ করিত তেমনই তাহাদের সহজ প্রকাশভঙ্গিও তিনি আপনার রচনায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গীতিকবিতার এ ছাঁদ বাংলায় আর নাই। এমন ছন্দেরও বৈচিত্র্য নাই। শুধু ছন্দের দিক হইতে

(পিলু)
বাদল রুম ঝুম বোলে,
না জানি কি বলে।
বুঝিতে পারি না কথা
তবু নয়ন উছলে।
কাহার নূপুরধ্বনি
শুনাইছে আগমনী?
বিরহীপরাণ তারে যাচে;
আশা-ময়ূরগুলি পুছ মেলি নাচে;
রাখিব পরাণ-খানি তার চরণতলে।

(সাওয়ন)
ঝরিছে ঝর ঝর
গরজে গর গর,
স্বনিছে সর সর
শ্রাবণ মাঃ।

এই গানগুলির সুর বাঙালীর প্রাণকে কাড়িয়া লইয়াছে তাহাদের গতির চঞ্চলতা ও কমনীয়তার জন্য। কিন্তু বাংলার গ্রামে ও শহরে এই গানগুলি গাহিতে গাহিতে দূর ভবিষ্যতে কবে কোন্ বাঙালী মনে করিবে টেরাইয়ের সেই নিঝুম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাত্রি, উদাস কবি যখন বারেইচের ডাক-বাংলার বারাণ্ডার রেলিঙে ভর দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বর্ষাপ্রকৃতির বিরহবেদন ভোগ করিতেন, অন্তর বাহির দুই ভরিয়া একটা ঘন অন্ধকার দামিনীর গুরুভাষে যখন তাঁহাকে অসীমের প্রেম-সম্ভাষণ জানাইত? তেমনই

চাঁদিনীরাতে কে গো আসিলে

বাংলা অপেক্ষা উত্তর-ভারতের তীব্রতর জ্যোৎস্নারাত্রির রূপালি ছটা এই গানে নূতন ছন্দের সমাবেশ আনিয়াছিল। বাস্তবিক উত্তর-ভারতের লৌকিক হোলি, কাজরী, চৈতী, শাওয়নী, লাউনী, ভজন, রামায়ণী ও গজলের সুর তাঁহার অন্তরে নিগূঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। ইহাদের ছন্দ ও তাল অতুলপ্রসাদের গীতি-কবিতায় ললিত নূতন রূপ পাইয়াছে। এই সংযোজনাতেই তাঁহার প্রতিভার কৃতিত্ব। বলা বাহুল্য, দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও কনক দাস তাঁহার নিকট হইতে গান লইয়া বাংলা

দেশকে তাঁহার সুর ও তালের সহিত নিবিড় পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলা দেশে তাঁহার গান অনেক সময়ই পরিবর্ত্তিত, এমন কি বিকৃত হইয়াও গীত হয়।

কিন্তু সুর ও তালের আবেদন অপেক্ষা তাঁহার গীতি-কবিতার আকর্ষণ হইতেছে তাঁহার নিদারুণ ব্যথা, শেলীর সেই নির্দ্দেশ Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts জীবন-মরুতে তাঁহার গানগুলি যেন বাসরার গোলাপ, কাকটাস-বনের রক্তকুসুম। কাঁটার বনে বৈরাগী একতারা লইয়া যখন ব্যথাভরে গান গায়

সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে মোরে—
শুধু কি ফুটাও কাঁটা? ফুটাও না কি মুকুল?

তখন যিনি ব্যথার ব্যথী তিনি চরণের ব্যথা দূর করিয়া অন্তর কুসুমের গন্ধে ভরপূর করিয়া দেন। এই যে আমাদের বাউল, অতুলপ্রসাদ, যাঁহার 'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে তাইরে নাইরে না', তিনি কিন্তু বাংলা দেশের মত বাউল নহেন। তিনি যেন উত্তর-ভারতের পল্লীবাটের দরবেশ। উত্তর-ভারতের মাঠে মাঠে শিমুল পলাশের রক্তিম শোভা তাঁহার হৃদয়কে রাঙ্গিয়া দিয়াছে। রাজপুতানার মার্ত্তণ্ড-পীড়িত ধূসর মাঠ তাঁহার হৃদয়কে বিদগ্ধ করিয়াছে। যমুনার দুকূল-প্লাবন কত প্রেমে কত গানে এই দরবেশকে টানিয়াছে। গঙ্গা-সরযূর উদার শ্যামল অঙ্গে চৈত, কাজরী, ঝুলন ও হোলী উৎসব ঋতুপর্য্যায়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে। বিন্ধ্যগিরির পর্ব্বতগাত্রে ও রামগড়ের উপত্যকায় যে বীর্য্য ও স্বাধীনতা প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। সেই স্বাধীনতার দুঃসাহসের গান আজ কলিকাতার হাজার কর্পোরেশন স্কুলে ছাত্রদের মুখে প্রতিধ্বনিত, "বল, বল, বল সবে শত বীণা বেণু রবে, ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" কিন্তু এই দরবেশের গানের উন্মাদনা একটানা দুঃখ হইলেও তিনি গানগুলি বাজাইয়াছেন ভাষার সূক্ষ্ম চুম্‌কির কাজে, সুর ও ছন্দের লীলাবৈচিত্র্যে। এদেশের ঘরে ঘরেই যে সুন্দর কারুশিল্প। উত্তর-ভারতের পল্লীবধূর কেশবিন্যাসে ও নানাবর্ণ বিভূষণে, তাহার চিকণের শোভন বয়নে, যে সুষমা তাহার অন্দরের আনন্দকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই এই দরবেশ আপনার গানে ধরিয়াছেন। তাই তাঁহার এক-একটি গান যেন গেরুয়া জমিনের উপর চিকণের কাজ-করা এক একখানি রুমালের মত। দুঃখময় ভগবানের দিকে বিপদের ঝটিকায় উদ্বেল হইয়া তাঁহার গানগুলি কত না লীলাতরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

কিন্তু আজ আমরা এই প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ সেনের গান ও কবিতার আর আলোচনা করিব না। শুধু প্রবাস নহে, বাংলা দেশ হইতেও তাঁহার গীতি-কবিতার যথোচিত সমাদর আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকিব। তাহা ছাড়া আমরা যাঁহাকে হারাইয়াছি তিনি শুধু যদি কবিই হইতেন, তাহা হইলে আমাদের শোক এত আন্তরিক ও দুর্ব্বহ হইত না। তিনি আমাদের প্রবাসী সমাজের নায়ক ছিলেন। আজীবন তিনি বাঙালী ইয়ং মেন্‌স্ য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। সম্মিলিত বাঙালী ইয়ং মেন্‌স্ য়্যাসেসিয়েশনের ও বেঙ্গলী ক্লাবেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। সামাজিক হিসাবে তিনি লক্ষ্ণৌবাসী বাঙালীর সঙ্গে এত নিবিড় ভাবে মিশিতেন যে, প্রত্যেক বাঙালী তাঁহার মৃত্যুতে ব্যক্তিগত শোক অনুভব করিতেছে। সেদিনকার বিরাট বিষাদযাত্রায় কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বাঙালী, কি অবাঙালী যে শোকে তাঁহার শবানুগমন করিয়াছে, তাহাও তাঁহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন। তিনি প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের এক জন জন্মদাতা। উহার প্রথম অধিবেশন কানপুরে এবং গত অধিবেশন গোরক্ষপুরে সভাপতি হইয়া তিনি প্রবাসী বাঙালীর সংহতির উপদেশ দেন। এমন কোন বাঙালী অনুষ্ঠান এ প্রদেশে নাই যাহা তাঁহার নিকট ঋণী নহে। তাঁহার দান কিন্তু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষ ছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া অযোধ্যা সেবাসমিতির সভাপতি ছিলেন এবং নানা লোকহিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-আন্দোলনেও তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক

বার চামারবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে দেখিয়াছি। এ-সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ পল্লীর সংস্কারে, তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। গোখলে ভ্রাতৃ-সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। দূর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে কৃষকগণের নিকট দেশের বাণী পৌঁছাইয়া দিতেন। কবি ও ভাবুক হইয়াও তিনি এক জন অধ্যবসায়শীল কর্ম্মী ছিলেন। লোকশিক্ষাপ্রচার, পল্লীগঠন, অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা প্লাবন-পীড়িতের জন্য কল্যাণ কর্ম্ম—সব, উদ্যোগে সর্ব্বদাই অগ্রণী হইয়া তিনি দেশের লোককে আহ্বান করিতে জানিতেন। সে আহ্বান এদেশবাসী শুনিত। তিনি রাজনীতিতে গঠনবাদী ছিলেন এবং দুইবার যুক্ত-প্রদেশের প্রাদেশিক উদারনৈতিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়া গঠনের দিকের প্রতিই বিশেষ জোর দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে রাজনৈতিক নেতা বলিয়া চিনে, কিন্তু তিনি যে গান রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন এ-খবর বাংলার বাহিরে অবিদিত। লিবারাল-নেতা হইয়াও তাঁহার একটা বহুদর্শিতা সাহস ও ত্যাগ ছিল যাহা পুরাতন নেতাশ্রেণীর মধ্যে বিরল। তিনি আপনা ভুলিয়া দান করিতে জানিতেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বাভাবিক, অভ্যাসগত দানধর্ম্মের ব্যত্যয় পাছে ঘটে এইজন্য নীরোগ না-হওয়া সত্ত্বেও অর্থোপার্জ্জন তাঁহার মৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর তিনি যে দানপত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতেও তাঁহার উদারতা, জাতীয়তা, ও নিঃস্বার্থ দান প্রকাশ পাইয়াছে। এমন একটি সুরসিক অথচ বৈরাগী, ভাবুক অথচ কর্ম্মপ্রাণ, উদার অথচ সাহসী, ক্ষমতাশীল অথচ মৃদুকুসুম লোক পৃথিবীতে বিরল। এই মৃদুকুসুম লোকটির অন্তর হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর যে সুবাস ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের প্রবাস-জীবনকে ধন্য করিবে। যিনি গন্ধ বিতরণ করিয়া গেলেন তাঁহার জীবনের যে সার্থকতাই এই অযাচিত, অফুরন্ত দানে। তিনি নিজেই গাহিয়াছেন

ফুলটি ফোটে যবে, ভাবে কি কাল কি হবে,
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ। *

* লক্ষ্ণৌবাসী বাঙালীর শোকসভায় সভাপতির অভিভাষণ।

১৩৪৩ শ্রাবণ

ম্যাক্সিম গর্কি

বিখ্যাত রাশিয়ান্ লেখক ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার আসল নাম ম্যাক্সিম গর্কি নয়, আসল নাম "আলেক্সেয়, ম্যাক্সিমোভিচ্ পেস্কভ্"। তিনি টিফ্লিস শহরের রেলওয়ের কারখানায় অন্যতম মিস্ত্রীর কাজ করিবার সময় স্থানীয় একটি দৈনিক কাগজে ম্যাক্সিম গর্কি ছদ্ম নামে একটি গল্প প্রকাশ করেন। পরে তিনি ঐ নামেই বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তাঁহার কতকগুলি গল্প পুস্তকাকারে প্রথম বাহির হয় ১৮৯৭ সালে। তাহাতে তিনি এরূপ যশস্বী হন যে লোকমত তাঁহাকে টলষ্টয়ের সমকক্ষ বলিয়া ঘোষণা করে।

গর্কি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন গালিচা, পরদা ইত্যাদির দ্বারা গৃহসজ্জাকারী। গর্কি ৫ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাহার পর তাঁহার মাতা আবার বিবাহ করেন ও তিনি মাতামহের বাড়ীতে মানুষ হন।

মাতামহ ছিলেন রঞ্জক বা রংরেজ। তাঁহাকে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। তিনি গর্কিকে ৯ বৎসর বয়স হইতেই অন্ন অর্জ্জনের কাজে নিযুক্ত করেন, এবং বালকটিকে পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর এক পেশার পর আর এক পেশা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রাশিয়ার সকল অঞ্চলে ও জর্জিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এই প্রকার পরিশ্রমের ও অনিশ্চিত আয়ের জীবন যাপন করিতে হওয়া সত্ত্বেও গর্কি নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন, জ্ঞানক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য বিস্তর বহি পড়েন, এবং অল্প বয়সেই লিখিতে আরম্ভ করেন।

সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক ও সাহিত্য-সমালোচকেরা গর্কির গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও তৎসমুদয়ের আলোচনা করিবেন। আমাদের সমাজ এবং আমাদের বালক ও যুবকেরা তাঁহার বংশ ও জীবন হইতে যাহা শিখিতে পারেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

কোন দেশেই বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা সমাজের কোন একটা শ্রেণীতে, স্তরে ও জা'তে আবদ্ধ নহে। কিন্তু আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সুবিধা ও সুযোগের অভাবে এবং সামাজিক ব্যবস্থার দোষে প্রায়ই বুদ্ধির বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ হইতে বঞ্চিত থাকে। গর্কির পিতৃকুল ও মাতৃকুল যাহা ছিল, তাহার অনুরূপ কুলে জন্মিলে আমাদের দেশে বালকেরা প্রায়ই মাথা তুলিতে পারে না। অতএব, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা প্রথার এরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক যাহার দ্বারা দেশ কোনও প্রতিভাশালী বালকের ভবিষ্যৎ কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত না হয়।

আমাদের বালক ও যুবকেরাও যেন আটপিটে, চিরআশাশীল ও চিরউদ্যমশীল হন। কোন প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতেই যেন তাঁহারা পরাজয় স্বীকার না করেন। এক জন সপ্ততিপর বৃদ্ধ সংগ্রামাতীত অবস্থায় পৌঁছিয়া আমাদের উপর বক্তৃতা ঝাড়িতেছেন, তাঁহারা যেন এরূপ মনে না-করেন। বৃদ্ধদেরও সংগ্রাম আছে এবং বাহির হইতে লোকে যাহাকে নিশ্চিন্ত আরামের অবস্থা মনে করে তাহা বস্তুতঃ আরামের অবস্থা না-হইতে পারে। বৃদ্ধেরা অন্যকে যাহা করিতে বলে, অনেক সময় তাহা নিজেও যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করে।

বিখ্যাত ফ্রাঞ্চ মনীষী রম্যাঁ রলাঁর সহিত গর্কির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রলাঁর মতো তিনিও পৃথিবীব্যাপী শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন।

১৩৪৩ ভাদ্র

ধন গোপাল মুখোপাধ্যায়

আমেরিকাপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থকার ধন গোপাল মুখোপাধ্যায় ৪৬ বৎসর বয়সে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই শোকাবহ ঘটনা আরও শোকাবহ হইয়াছে এই কারণে, যে, তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, এই রূপ অবস্থায় তাঁহার আমেরিকান পত্নী তাঁহাকে একটি

কক্ষে দেখিতে পান, রয়টারের তারের খবর এই রূপ আসে। তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা তাঁহার কোন প্রকার মানসিক অসুস্থতার কথা ইতিপূর্ব্বে সন্দেহও করেন নাই। গত ১৮ই জুন তিনি তাঁহার গুরু স্বামী অখণ্ডানন্দকে আমেরিকা হইতে যে চিঠি লেখেন তাহা দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তাঁহার মানসিক অশান্তির কিছু প্রমাণ নিহিত আছে বটে। কিন্তু এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা হইতে স্বামীজী এরূপ কল্পনাও করেন নাই।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধন গোপাল কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমান ১৯৩৬ সালে জুলাই মাসে নিউইয়র্কে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পিতামাতার অজ্ঞাতসারে জাপানে কোন শিল্প শিখিতে যান। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি ইয়োকোহামার কোন কোন ভারতীয় বণিকের সাহায্যে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে শস্যক্ষেত্রে ও ফলের বাগানে খাটিয়া, হোটেলে ও গৃহস্থের বাড়ীতে বাসন ধুইয়া, এবং এই প্রকার অন্যান্য কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, এবং আমেরিকার কালিফর্ণিয়া রাষ্ট্রের লেলাণ্ড ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া গ্রাজুয়েট হন। তখন হইতে তিনি ইংরেজীতে নানা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন ও মধ্যে মধ্যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নানা নগরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ও অন্য কোন কোন দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করেন। উভয় কার্য্যক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব লাভ করেন ও বিশেষ যশস্বী হন। গদ্যে ও পদ্যে লিখিত তাঁহার ইংরেজী বহিগুলির সংখ্যা কুড়ির অধিক। তন্মধ্যে দশখানি বালকবালিকাদের জন্য লিখিত। তৎসমুদয় আমেরিকার শিশুদের বিশেষ প্রিয় বলিয়া বিদিত। এইগুলির মধ্যে গে নেক্ (Gay-Neck) বহিখানি ১৯২৭ সালের "সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সম্পন্ন বালকবালিকাদের পাঠ্যপুস্তক" ("the most distinguished children's book") বলিয়া জন্ নিউবেরি পদক প্রাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "চিত্রগ্রীব" নাম দিয়া ইহার একটি উৎকৃষ্ট বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ধন গোপালের কোন কোন বহি তাহাদের প্রকাশের বৎসরের সর্ব্বাধিক বিক্রীত পুস্তকসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবীর একটি জীবনচরিত লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম দূতস্বরূপ ছিলেন। তিনি বোধ হয় ভারতীয়দের মধ্যে আমেরিকানদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ভারত-গবর্ম্মেণ্ট আমেরিকার ব্রিটিশ কন্সালের দ্বারা ধন গোপালের মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য নিরূপণ করাইয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

১৩৪৪ শ্রাবণ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শিশুদের বন্ধু, শিশুদের আনন্দদাতা, বহু বাল্যপাঠ্য সচিত্র পুস্তকের প্রণেতা, সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তিনি ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ ও জ্ঞান দিবার নিমিত্ত প্রায় চল্লিশখানি বহি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সিটিবুক সোসাইটী নামক পুস্তকের দোকান তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পূর্ব্বে অন্নদাচরণ সেন "সখা" নামক মাসিক পত্র ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় শিশুদের জন্য অন্য বড় কিছু তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। যোগীন্দ্রনাথ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনিই উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বালক-বালিকাদের জন্য "মুকুল" নামক মাসিক পত্র স্থাপন করান। তিনি ইহার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রবন্ধ গল্প কবিতা ছবি সংগ্রহ করিতে তিনি দক্ষতম ছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভগিনী পরলোকগতা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকারও মুকুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আমাদেরও এই কাগজটির সহিত যোগ ছিল। কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় আরও একখানি মাসিক যোগীন্দ্রনাথ কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। তাহার নাম এখন মনে পড়িতেছে না। আমরা যখন প্রথম সিটি-কলেজে অধ্যাপকতায় প্রবৃত্ত হই, সেই সময়ে যোগীন্দ্রনাথ আমাদের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

তিনি হাস্যকৌতুকপ্রিয়, নির্ব্বিবাদ, ঈর্ষাদ্বেষশূন্য মানুষ ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বালকের মত ছিল বলিয়াই তাহাদের মনোরঞ্জনে তিনি এরূপ সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার বহিগুলি এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি "বন্দেমাতরম্" নাম দিয়া "স্বদেশী" ও "জাতীয়" সংগীতের একটি সংগ্রহপুস্তক প্রকাশ করেন। তাহা খুব সমাদৃত হইয়াছিল। মূল্য খুব কম রাখায় উহার বিক্রী বেশ হইত। কিন্তু পুলিসের নজর উহার উপর পড়ায় যোগীন্দ্র বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার বিক্রী বন্ধ করিয়া দেন।

কলিকাতা তাঁহার ভাল লাগিত না। গিরিডিতে তিনি বাড়ীঘর, বাগান, পুকুর করিয়াছিলেন।

তিনি প্রায় ১৪ বৎসর পক্ষাঘাতে ভুগিয়াছেন। তাহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় কাজ করিতেন। অন্য নানা ব্যাধিও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও মানসিক বল অপরাজিত ছিল। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচনা

১৩৪৪ ভাদ্র

শ্রাবণের প্রবাসীতে বিবিধ-প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে লিখিত বিষয়ে দুই একটি ভুল রহিয়াছে। মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮০০ শকে সর্ব্বপ্রথম 'বালকবন্ধু' নামে শিশুদের জন্য একখানা পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রায় ১২ বৎসর পরে উহা মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। 'সখা' নামক ছেলেদের মাসিকপত্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রমদাবাবু মাত্র দুই বৎসর উহার সম্পাদকতা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ এই দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। অন্নদাচরণ সেন মহাশয় ১৮৮৭-১৮৯২ সন পর্য্যন্ত 'সখা' সম্পাদনা করেন। শিশু-সাহিত্যের পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদন সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

[আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে "ভুল" কিছু আছে মনে করি না। তবে, উহা বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, এবং পরলোকগত যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গিয়া শিশু-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা আমাদের অভিপ্রেতও ছিল না, এবং তাহা লিখিবার প্রয়োজনও ছিল না। যোগীন্দ্র বাবুর ঠিক্ আগে কে কি করিয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখমাত্র আমরা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বালকবন্ধু' পত্রিকা সম্বন্ধে আমরা অনেক বার অনেক কথা বলিয়াছি।—প্রবাসীর সম্পাদক] [আলোচনা]

ওয়াল্ট হুইটম্যান স্মৃতিসভা

গত ৩২শে আষাঢ় কলিকাতার সিটি কলেজ হলে প্রবাসীর সম্পাদকের সভাপতিত্বে আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু বিদ্বজ্জনের ও ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অনেকে চিঠি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন .—

কল্যাণীয়েষু,

শরীর ক্লান্ত দুর্বল তার উপরে কাজের ভিড়—চিঠি লেখার কর্তব্যে সর্বদাই ত্রুটি হচ্ছে।

তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্ এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে, এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই

আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম, ছন্দোবন্ধ সব লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক-একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোন যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। একদৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হ'লে মরিয়া হওয়ার দরকার। ইতি—৩০ আষাঢ় ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও অন্যান্য পত্র পঠিত হইবার পর,

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় হুইটম্যানের কোন কোন কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সমাদ্দার ও অধ্যাপক মণিমোহন ঘোষ কবির বিখ্যাত কবিতা "Oh Captain, My Captain..." আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত একটি গীত গান করেন। গানটি বিশেষভাবে এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতঃপর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ওয়াল্ট হুইটম্যান—বিদ্রোহী ও গণতান্ত্রিক" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা "চারণ কবি হুইটম্যান" নামক পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অতঃপর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধপত্রের কিয়দংশ পঠিত হয়।

ইহার পর সভাপতি কিছু বলেন। তাঁহার কোন কোন কথার তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল।

কবি হুইটম্যানকে বুঝা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন খনির মত; তাঁর মধ্যে সব রকমই আছে মিশিয়ে। সেই জন্য কেহ হয়ত এক জিনিষ পাবেন, অপর কেহ হয়ত ঠিক তার উল্টো জিনিষ পাবেন। তিনি ছিলেন পায়োনীয়র। পায়োনীয়রের কাজ হচ্ছে যে-পথ দিয়ে সৈন্যেরা অভিযান করবে তার রাস্তা তৈরি করা। হুইটম্যান সাহিত্যে এই রকম পায়োনীয়রের কাজ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে কবিতা তার মধ্যে ধুলো, মাটি, এবড়ো-খেবড়ো নানা রকম জিনিষ আছে— তার মধ্যে সব সময় লালিত্য পাওয়া যায় না; সেই জন্য সেই লালিত্যের সন্ধানে যদি কেহ তাঁর কবিতা পড়তে চান, তা পাবেন না।

তিনি ছিলেন ভবিষ্যতের অগ্রদূত; সেই জন্য তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা পাই আগমনীর ধ্বনি। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের কবি। তিনি বলেছেন, সমান সুযোগ সব মানুষকে পেতে হবে এবং দিতে হবে; তা দেবার জন্য বা পাবার জন্য যদি কিছু ভাঙতে হয়, ভাঙতে হবে। তিনি বলেছেন—আমি সে রকম কিছুই চাই না যার মত আর কিছু অন্য লোক না পেতে পারে। ন্যায়বিচার, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, এই ভাবটাই তিনি প্রচার করেছেন। তিনি ষড়যন্ত্র চাল প্রভৃতিকে পৃথিবীর শান্তি ও অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করতেন। রাজনীতির তলায় যে নৈতিক শক্তি রয়েছে তার উপরই তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, যে, সমস্ত গবর্ন্মেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার ইচ্ছা ও আত্মসম্মানের গর্ব্ব যাতে বিকশিত হয় তার পথ ক'রে দেওয়া। তিনি নারীকে পুরুষের সমান ব'লে মনে করতেন। তিনি বলতেন,—It is as great to be a woman, as to be a man, তিনি আরও বলেছেন যে, —Nothing is greater than to be the mother of men তিনি মনে করতেন যে—The best of every man is his mother তিনি বলতেন—বড় শহর তাকেই বলে. যেখানে বড় পুরুষ ও বড় মহিলা থাকেন এবং তাঁরা যদি গ্রামের মধ্যে থাকেন, তবে সেই হবে মহানগরী। মনের স্বাধীনতাকে তিনি খুব বড় ব'লে মনে করতেন। তিনি বলতেন,—Without emancipation of mind political freedom is more than useless

হুইটম্যান চলেছিলেন একটা আদর্শ লক্ষ্য করে। আমাদেরও উচিত হবে আদর্শ লক্ষ্য ক'রে নিরলস গতিতে চলা—এই রকম যদি একটা কিছু আমরা করতে পারি, তবেই হুইটম্যান স্মৃতিসভা করা সার্থক হবে।

কাশীপ্রসাদ জয়স্‌বাল

সুপণ্ডিত ডক্টর কাশীপ্রসাদ জয়স্‌বালের মৃত্যুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এক জন বিদ্বান বুদ্ধিমান সুনিপুণ কর্ম্মীর তিরোভাব হইল। তাঁহার বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টরী করিতেন। তাহাতে তাঁহার পসারও খুব ছিল। হিন্দু আইন ও ইন্‌কম-ট্যাক্সের আইনে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় কাজ ছিল ঐতিহাসিক গবেষণা। তাঁহার গবেষণা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির ফলে প্রাচীন ভারতেতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন যুগে আলোক পড়িয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁহার "হিন্দু পলিটি" নামক গ্রন্থ অপূর্ব্ব। তাহা পড়িলে বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে সব রকম শাসন প্রণালীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক কথা তিনি প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে প্রকাশ করেন। বিহার এণ্ড্‌ উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটিজ জার্ণ্যালের তিনি সম্পাদক ও প্রাণ ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া ভিক্ষু রাহুল সংস্কৃত্যায়নকে তিব্বতে পাঠান। তিনি নবীন গবেষকদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন এবং তাঁহাদের গবেষণায় মূল্যবান কিছু দেখিলে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

১৩৪৪ পৌষ

যতীন্দ্রমোহন সিংহ

রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ বিখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে "উড়িষ্যার চিত্র" লিখিয়া তিনি প্রথম যশস্বী হন। তাহার পর তিনি ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্কের বহি এবং উপন্যাসাদি লিখিয়াও খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ধর্ম্মমতবিষয়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ভিন্নমত-অসহিষ্ণু ছিলেন না। তাঁহার "সন্ধি" উপন্যাসটি পড়িলে বুঝা যায়, তিনি সুব্যবস্থিত ও সুনীতি নিয়ন্ত্রিত নারীপ্রগতি চাহিতেন। তাঁহার জন্ম নদীয়া জেলায়, কিন্তু তিনি বাস করিতেন ফরিদপুরে। সেখানকার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতিরূপে তিনি তথাকার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন ও তাহার উন্নতির চেষ্টা করিতেন।

১৩৪৪ মাঘ

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে জগত্তারিণী পদক প্রদান

সর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতার নামে এই স্বর্ণপদক দানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং তদর্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যথেষ্ট টাকা দিয়া গিয়াছেন।

"বাংলা ভাষায় সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতাকে" দুই বৎসর অন্তর এই পদক দেওয়া হয়। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা এই পদক পাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাহিত্যিক গ্রন্থের রচয়িতা, বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিয়া এ-পর্য্যন্ত কেহ এই পদক পান নাই। ১৯৩৭ সালের জন্য শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীকে এই পদক দেওয়া হইবে। তিনিও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক নহেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাঙালীদের মধ্যে কয়েক জন বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া থাকিলেও কোন বাঙালী বৈজ্ঞানিক নিজের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ এরূপ বাংলা বহি লিখেন নাই যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে পদকপ্রাপ্তি সম্মানের যোগ্য। প্রমথ বাবু এই পদক পাইবার যোগ্য। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহা দিলে অন্যায় হইত না।

১৩৪৫ বৈশাখ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকী

"সদ্ভাবশতক" প্রণেতা কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেনহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বগ্রামবাসীরা গত মাসে তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৪১ সালে। সুতরাং উৎসব ঠিক্ শত বর্ষ পরে না-হইয়া ১০৩ বৎসর পরে হইয়াছে। তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। উৎসবের প্রধান উদ্যোগকর্ত্রী ছিলেন সেনহাটীর মহিলা-সমিতির নেত্রী শ্রীমতী লীলা দাশগুপ্তা। তাঁহার এবং মহিলা সমিতির আন্তরিক উৎসাহ ও পরিশ্রম অতীব প্রশংসনীয়। সেনহাটীর লোকেরা কৃষ্ণচন্দ্রের একটি স্মৃতিস্তম্ভ ভৈরব নদের তীরে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উৎসবের দিন তাহা পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হয়। সভাস্থলে কবির একটি আলেখ্যের আবরণ উন্মোচিত হয়, কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়, এবং সভাপতির ও অন্য বক্তৃতা হয়।

আমরা বাল্যকালে, বোধ হয় দশ বৎসর বয়সে "সদ্ভাবশতক" পড়িয়াছিলাম। তাহার কতকগুলি কবিতা এখনও আমাদের মনে আছে। যেমন—"একদা ছিল না 'জুতো' চরণযুগলে," "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন," "যে-জন দিবসে মনের হরষে"। "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ"। কৃষ্ণচন্দ্রের "সদ্ভাবশতক" পারসীক কবি হাফেজের কবিতাবলীর অনুবাদ নহে; ইহার কতকগুলি কবিতা হাফেজের কবিতার ভাব লইয়া রচিত, কতকগুলি অন্য কবিদের রচনার ভাব

লইয়া রচিত, কতকগুলি সম্পূর্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের নিজ প্রতিভার ফল। তিনি মহাকবি না-হইলেও নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয় কবি। তদ্ভিন্ন, মানুষের হিসাবেও তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁহার মত সত্যসন্ধ, নির্লোভ, স্বাধীনচিত্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ভক্ত মানুষ বিরল। শিক্ষাদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। মাসিক ৮।৫ [আট টাকা ছয় আনা পাঁচ পয়সা] পেন্সন পাইবার পরও তিনি বিনা-পারিশ্রমিকে বহু ছাত্রকে প্রতিদিন নিয়মিত রূপে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

দৌলতপুরের কলেজের কয়েক জন অধ্যাপক ও অন্য কেহ কেহ বাহির হইতে আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ

সর্ মোহম্মদ ইকবাল

পরলোকগত ডক্টর সর্ মোহম্মদ ইকবাল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ উর্দু ও ফারসী কবি ছিলেন। "পারসীক চিন্তার ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি জার্মেনীর মিউনিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর পদবী লাভ করেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ হইবার পর কিছু দিন লাহোর গবর্ন্মেণ্ট কলেজে ইতিহাস, দর্শন ও ইংবেজী সাহিত্যের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। বিলাত গিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং লাহোরে ব্যারিষ্টরী করিতেন। লণ্ডনে থাকিবার সময় তিনি ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি সাবেক পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন, কিছু কাল মোস্লেম লীগের সভাপতি ছিলেন, এবং গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে "প্রতিনিধি" রূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি কবি ও দার্শনিক বলিয়াই সুবিদিত। তাঁহার অনেক কবিতা ইউরোপের কয়েকটি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তাহাতেই বুঝা যায়, যে, তাঁহার ঐ-সকল কবিতায় এমন কিছু আছে যাহাতে দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সর্ব্বত্র মানুষের হৃদয় সাড়া দেয়। তিনি "হিন্দুস্থান হমারা" প্রভৃতি কয়েকটি জনপ্রিয় জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত জানিতেন এবং উর্দুতে গায়ত্রীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যোগ দিয়া থাকিলেও সকল মানুষের একত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং বিশ্বমানবহৃদয়ের কবি বলিয়াই ভবিষ্যতে বিখ্যাত থাকিবেন বলিয়া মনে করি।

১৩৪৫ মাঘ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ এক জন প্রতিভাবান সুলেখক এবং বাংলা ভাষায় পণ্ডিত দক্ষ শিক্ষক হারাইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় ৬২র অধিক হয় নাই। এই বয়সে মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলিতে হইবে। প্রবাসীর লেখকরূপে তাঁহার সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তাহার পর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় যখন তিনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের বাংলা সাহিত্য বিভাগে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া এলাহাবাদ যান। তখন তিনি প্রবাসী সম্পাদকের বাসাতেই অতিথি হন। তখনকার একটি বৃত্তান্ত তিনি আমাদিগকে বৎসরাধিক পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। তাহা এখনও অমুদ্রিত আছে। তিনি ইণ্ডিয়ান প্রেসের জন্য ছেলেমেয়েদের পাঠ্য কয়েকটি ভাল বাংলা বহি লিখিয়া দিয়াছিলেন। প্রেসের অধ্যক্ষ পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষ মহাশয় তাঁহার কাজে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। চিন্তামণি বাবু তাঁহাকে আর একটি কাজে নিযুক্ত করেন। তাহা একটি বৃহৎ প্রামাণিক বাংলা অভিধান সংকলন। সম্প্রতি পরলোকগত বীরভূমের শিবরতন মিত্র মহাশয় চারুবাবুর সহকর্ম্মী ছিলেন। সুকিয়াস্ ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে এই কাজের আফিস ছিল। এই অভিধানের শব্দসঙ্কলন কতক দূর অগ্রসর হইয়াছিল। উহা কি কারণে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা এখন আমাদের ঠিক্ মনে পড়িতেছে না। চারুবাবুর বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং শব্দ-সম্পদের অধিকারিত্ব এই অভিধান-সংকলনের কাজ হইতে আংশিক ভাবে ঘটিয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান প্রেসের কাজের পরই তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত হন। এই দুটি কাগজের কাজ অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় একাধিক সহকারী আবশ্যক হইয়াছিল। চারুবাবু ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সুশৃঙ্খল ভাবে কাজ করিতে পারিতেন। কখন কখন উপন্যাস, ছোট গল্প, বা প্রবন্ধ ছাড়া, তিনি 'মুদ্রারাক্ষস' নাম লইয়া পুস্তক সমালোচনা করিতেন। 'কষ্টিপাথর', 'বেতালের বৈঠক' ও কখন কখন 'পঞ্চশস্য' বিভাগের ভার তাঁহার উপর থাকিত।

প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতে করিতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই কাজে দক্ষতার প্রভাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত হন। তখন তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী'র কাজ ছাড়িয়া যান। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরও তিনি 'প্রবাসী'তে কয়েকটি লেখা দিয়াছিলেন। এই মাসিকেব প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। ঢাকায় অধ্যাপকের কাজে দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের পুরস্কার-স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক এম-এ উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার বয়স ৬০ হওয়ার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর পাইয়া জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপক হন।

তিনি প্রায় চল্লিশখানি উপন্যাসের ও বহু ছোট গল্পের লেখক। চণ্ডীকাব্য, শূন্যপুরাণ, এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীর তিনি বিস্তৃত টীকাকার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর

"রবিরশ্মি" নামক টীকা গ্রন্থের প্রথম ভল্যুম প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভল্যুমেরও প্রকাশ দেখিয়া যাইবার অভিলাষ তাঁহার ছিল। সে অভিলাষ পূর্ণ হইল না। অধ্যাপক ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা কবিতার একটি চয়নিকা গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তিনি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহার সমুদয় প্রসিদ্ধ তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দেখিয়াছিলেন। তাঁহার সরস ভ্রমণবৃত্তান্ত 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার নানাবিধ রচনা অনুরাগের সহিত পঠিত হইত।

তাঁহার ধর্ম্মমত ও সামাজিক মত উদার ছিল। প্রধানতঃ নামজপ সাধনা করিয়া তিনি কিরূপ আনন্দ ও ভগবদনুগ্রহ লাভ করেন, তাহা তিনি অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন।

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্য বহি এবং বিদ্যালয়পাঠ্য বহি কয়েকখানি লিখিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা ও বহু টীকাটিপ্পনী সম্বলিত একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চান, সেই প্রকার জিজ্ঞাসু লোকদের নিমিত্ত "ইব্রীয় ধর্ম্ম" নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবাসী ও বঙ্গদেশবাসী বাঙালীদিগের নিকট তিনি সবিশেষ পরিচিত হন "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক গ্রন্থ রচনা দ্বারা। এই গ্রন্থে অল্পসংখ্যক খ্যাতনামা প্রবাসী বাঙালীর এবং বহুসংখ্যক অজ্ঞাতনামা প্রবাসী বাঙালীর জীবনচরিত ও তাঁহাদের কৃত জনহিতকর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বহি লিখিয়াছেন, খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, খবরের কাগজ সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সকল কাজের বৃত্তান্তও তিনি দিয়াছেন। যাঁহাদের ফোটোগ্রাফ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের ছবিও এই গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থের উৎপত্তি আমাদের এখনও মনে আছে। আমরা যখন এলাহাবাদে চাকরী করিতে যাই, তখন তাঁহার সহিত পরিচয় হয়। তখন তাঁহার বয়স ২৩/২৪ হইবে। তিনি গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টভাষী সুপুরুষ ছিলেন। তিনি তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনার‍্যালের আফিসে কাজ করিতেন। সেই সময়ে কিংবা তাহার কিছু পরে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনার‍্যালের গোপনীয় পত্র ব্যবহারাদির ভারপ্রাপ্ত কেরানী (confidential clerk) ছিলেন। ইহা তাঁহার কাজ ছিল বলিয়া তাঁহাকে ইন্সপেক্টর জেনার‍্যালের সঙ্গে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সকল জেলায় সফর করিতে হইত। ঐ সকল জেলার নানা স্থানে যে

সকল বাঙালী তখন কাজ করিতেন বা আগে কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে তাঁহার অনেক তথ্য জানা ছিল। কতক তাঁহার মুখে, কতক এলাহাবাদের অন্য কোন কোন বাঙালীর মুখে প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে যাহা শুনি তাহাতে আমার এই ধারণা হয় যে, বঙ্গের বাহিরে অপ্রসিদ্ধ বাঙালীরাও শুধু কেবল টাকা রোজগার ও দিন গুজরান করেন নাই, এমন অনেক কাজ করিয়াছেন যাহাতে তত্রত্য বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতি হয় এবং সামাজিক সংহতি বাড়ে।

ঠিক মনে নাই, কিন্তু বোধ হয় ঐ ধারণার বশে প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতম ৪টি প্রবন্ধের নিমিত্ত ৪টি স্বর্ণপদক পুরস্কার ঘোষণা করি। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি এই স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তাঁহার লেখাটি প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল। সেই সময় হইতে বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রবাসীতে বঙ্গের বাহিরের অনেক বাঙালীর বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত এবং অন্য বহু বৃত্তান্ত, যাহা প্রবাসীতে বা অন্য কোন কাগজে কখন বাহির হয় নাই, "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গের বাহিরে যে অনেক বাঙালী থাকেন, তাহা যে বাংলা দেশের বাঙালীরা জানিতেন না, তাহা নহে। কিন্তু বঙ্গদেশবাসী বাঙালীদের সেকালে কতকটা এইরূপ ধারণা ছিল, যে, প্রবাসী এই বাঙালীরা অনেকটা "ছাতুখোর" "মেড়ুআ" শ্রেণীভুক্ত। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর একটি প্রধান কীর্ত্তি এই যে, তিনি বঙ্গের বাঙালীদিগকে প্রথম জানান বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা এরূপ আত্মীয় কুটুম্ব যাঁহাদিগকে নিজের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার, কোন কারণ নাই—অনেক স্থলে বিশেষ গৌরব বোধ করিবার কারণ আছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের মধ্যেও জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চেষ্টায় আত্মসম্মানবোধ নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়া থাকিবে।

তিনি যে কেবল আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের বাঙালীদের সম্বন্ধেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা নহে; ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের ও দেশী রাজ্যের, সিংহলের ও ভারতবর্ষের বাহিরের নানা দেশের বাঙালীদের খবরও তিনি সংকলন করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন। তিনি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে এই সকল উপকরণের সাহায্যে "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" পুস্তকের নূতন সংস্করণ বা নূতন খণ্ড বাহির হইত। কিন্তু তিনি ইহা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

আমার এলাহাবাদ প্রবাসের তের বৎসরের জীবনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর জীবনের কিছু কিছু সংস্পর্শ ছিল—ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শও ছিল তাহা এখানে বর্ণনীয় নহে।

সে কারণে নহে, কিন্তু সার্বজনিক (public) কারণেও আমি এখনও এলাহাবাদে থাকিলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের স্মৃতিসভার উদ্যোগ করিতাম। তথাকার পুস্তকালয়, পাঠাগার, সাহিত্যসভা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাব খুব যোগ ছিল।

আগে বলিয়াছি, তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনার‍্যালের কনফিডেন্‌শ্যাল কেরানী ছিলেন। এই সূত্রে তিনি গবর্ন্মেণ্টের অতি গোপনীয় অনেক ব্যাপার জানিতে পারিতেন। সেই সমস্ত তাঁহার একাধিক ডায়েরী বা অন্য খাতায় টুকা ছিল। তাঁহার পিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন। তাহা হইতে অবসর গ্রহণের পরেও তিনি এলাহাবাদে পরলোকগত চিন্তামণি ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্রেব গৃহশিক্ষক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর

পিতার নিবাস এলাহাবাদে ছিল না, ছিল বাংলা দেশে। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর জন্ম হয় কলিকাতায়। তাঁহার পিতা কর্ত্তব্যপরায়ণ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি যখন অবগত হইলেন যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন গবর্ন্মেণ্টের বহু অতি গোপনীয় ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তখন তাঁহার মনে হইল পুত্র হয়ত পরে এগুলি প্রকাশ করিতে পারে। এই সন্দেহ হওয়ায় তিনি পুত্রকে বলেন, গবর্ন্মেণ্ট তোমাকে সরকারী কাজ করিবার জন্য বেতন দিয়া থাকেন; সেই উপলক্ষ্যে তুমি যাহা জানিতে পারিয়াছ তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্য ত সরকার তোমাকে বেতন দেন না এবং সে-সব কথা জানিবার সুযোগ দেন নাই; অতএব তোমার এ সব জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। পিতার কথা অনুসারে জ্ঞানবাবু সেগুলি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলেন!

তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি অল্প বয়সেই পেন্স্যন গ্রহণ করেন। বোধ হয় তখনই ডায়াবেটিসের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং তাহাতেই ৬৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। পেন্স্যন লইবার পর তিনি অনেক বহি লেখেন। চিন্তামণিবাবু তাহার অধিকাংশ প্রকাশ করেন।

"বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গ্রন্থের কথা আগে লিখিয়াছি। ভবিষ্যতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাংলা-শিক্ষার্থী সমাজে, শিক্ষিত সমাজে, বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট পরিচিত থাকিবেন তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" দ্বারা। এ-পর্য্যন্ত বাংলা বর্ণমালার শেষ বর্ণের শেষ শব্দ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ প্রকাশিত বাংলা অভিধানগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ এই অভিধানটি। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর ইহার বিশেষত্বগুলির পরিচয় দিয়াছিলাম। বাংলা ভাষার ও এই অভিধানের শব্দসমৃদ্ধি ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, এই অভিধানে প্রায় এক লক্ষ পনর হাজার শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত হিন্দী শব্দসাগরে ১,০২,৫৭৫টি শব্দের অর্থ আছে। ইয়োরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় অনেক ভাষার এক একটি অভিধান পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। জ্ঞানবাবুর অভিধানটি তাঁহার একার কৃতি বলিলে অন্যায় হয় না। তাহার প্রুফও তিনি আদ্যোপান্ত দেখিয়াছিলেন। চিন্তামণিবাবু ও তাঁহার ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রকাশক না হইলে এত বড় গ্রন্থের দুই সংস্করণ বাহির হইতে পারিত না। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময়ে ও পরে তিনি অসুস্থ ও দুর্ব্বল ছিলেন। বুঝিয়াছিলেন তৃতীয় সংস্করণ বাহির করিতে তিনি বাঁচিবেন না। কিন্তু অবিরাম অক্লান্তভাবে শব্দ সংগ্রহ করিতেছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে অভিধানের অন্ততঃ একটি পরিশিষ্ট বাহির করিয়া যাইবেন এই উদ্দেশ্য। অভিধানখানি ন্যূনকল্পে তাঁহার ২০ বৎসর পরিশ্রমের ফল। এরূপ পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী মানুষ বিরল।

এই রকম একটি মানুষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সরকার বাহাদুরের কথা অ-কথ্য) কেন "সম্মানিত" করেন নাই, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান করিতে পারি। হয়ত তাঁহার চরিত্রের কোন কোন সদ্‌গুণই তাঁহাকে "সম্মানে" বঞ্চিত রাখিয়াছিল।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও প্রবাসী

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় সম্বন্ধে আগে কিছু লিখিয়াছি, আরও কিছু লিখিতেছি, পরেও লেখা হইবে।

তিনি প্রবাসীতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার তালিকা এখানে দিব না। প্রবাসীর প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই ইহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল। প্রথম সংখ্যাতেই তিনি চিতোরের রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন প্রথম বৎসরের প্রবাসীতে "উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ, "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী" শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ, "বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য" বিষয়ে চারিটি প্রবন্ধ, এবং "বঙ্গভাষা ও বাংলা অভিধান" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত প্রবন্ধটি হইতে বুঝা যায়, তৎকালপ্রচলিত বাংলা অভিধানগুলির দোষ ও অপূর্ণতা তিনি ১৩০৮ সালেই অর্থাৎ ৩৮ বৎসর পূর্ব্বেই বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি এখনও আলোচনা ও অধ্যয়নের যোগ্য।

আমরা তাঁহার স্বর্ণপদক প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছি। পদকটা উপলক্ষ্য মাত্র, বিশেষ কিছু নয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন যেরূপ দীর্ঘ, তথ্যবহুল ও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় একটা স্বর্ণপদক অকিঞ্চিৎকর। ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে, (ক) বিহারে বাঙালী, (খ) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙালী, (গ) মধ্যভারতে বাঙালী, ও (ঘ) ব্রহ্মদেশে বাঙালী, এই চারটি বিষযে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চারিটি প্রবন্ধের জন্য চারিটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রবন্ধগুলিতে কি কি বিষয় থাকা চাই, তাহা বিজ্ঞাপনে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যথা :—

"যে প্রদেশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হইবে, সেন্সস্ অনুসারে তথায় বাঙালীর বর্ত্তমান লোকসংখ্যা, (সম্ভব হইলে) তথায় বাঙালীদের আগমন ও বসবাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তথায় বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা, তথাকার মৃত ও জীবিত প্রসিদ্ধ বাঙালীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাঙালীদের বর্ত্তমান সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা এবং তাহার উন্নতির উপায়, বাঙালীর কার্য্যক্ষেত্র, প্রদেশের মূল অধিবাসীদিগের সহিত বাঙালীর সদ্ভাব রক্ষা ও বর্দ্ধনের উপায়, তাহাদের সাহিত্য, চরিত্র, আচার ব্যবহার প্রভৃতি হইতে বাঙালীর কি শিখিবার আছে, ইত্যাদি প্রবন্ধে যথাসম্ভব প্রমাণ সহ লিখিতে হইবে।"

তখন আগ্রা-অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা বলা হইত।

প্রথম বৎসরের প্রবাসীর ৩৫৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়, যে, প্রবাসী পদকের জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাব সম্বন্ধে দুটি, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে দুটি, ও বেহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। এই পাঁচটির মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহনবাবুর লেখাটি উৎকৃষ্ট ও পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছিল। উহা এরূপ দীর্ঘ ছিল যে, প্রবাসীর সাতটি সংখ্যায় উহা ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে লিখিত এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে এবং জ্ঞানেন্দ্রবাবুর লেখা এতদ্বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে তাঁহার এই একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয় যে, তিনি মানুষের দোষ অপেক্ষা গুণ দেখিতেই বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন।

১৩৪৬ শ্রাবণ

সুধাকৃষ্ণ বাগচী

"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন", "পুণ্যের জয়", "লণ্ডন কাহিনী" প্রভৃতি পুস্তকের লেখক এবং মাসিক "জাহ্নবী" ও শান্তিপুরের সাপ্তাহিক "বঙ্গলক্ষ্মী"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচী দীর্ঘকাল দুরারোগ্য রোগে ভুগিয়া ৫২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শৈশবকাল হইতে রুগ্ন থাকায় বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। তথাপি তিনি সাহিত্যসেবার প্রবল উৎসাহের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ষীয়সী মাতা শ্রীযুক্তা রাজলক্ষ্মী দেবীর সাহিত্যিক প্রভাব তাঁহাকে সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত করিয়া থাকিবে।

১৩৪৬ আশ্বিন

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা প্রধানতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের প্রিয় কবিতার লেখক বলিয়াই জানিতাম বলিয়া যখন কাগজে দেখিলাম মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী পার হইয়াছিল, তখন বুঝিলাম তিনি আমাদের চেয়েও অনেক বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। আগে তাহা অনুমান করি নাই। তিনি এক সময়ে সেকালের বালকবালিকাদের প্রসিদ্ধ মাসিক "সখা"র অস্থায়ী সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই তিনি এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, নববিভাকর প্রভৃতিতে কবিতা লিখিতেন। তিনি "পুষ্পাঞ্জলি", "ছেলেখেলা", "শিশুরঞ্জন রামায়ণ", "টুকটুকে রামায়ণ" প্রভৃতি বহি লিখিয়াছিলেন।

১৩৪৬ পৌষ

দীনেশচন্দ্র সেন

দীনেশচন্দ্র সেন অকালে পরলোকযাত্রা করিয়াছেন বয়স হিসাবে এরূপ বলা যায় না: —তাঁহার বয়স মৃত্যুকালে ৭২/৭৩ হইয়া থাকিবে। কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুকেও তখন অকালমৃত্যু বলিতে হয় যখন কোন প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হয় কার্যক্ষম থাকিতে থাকিতে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও বঙ্গে পুরনারী সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বাঁচিয়া থাকিলে আরও

বহি লিখিতেন। এই জন্য তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া প্রথম যশস্বী হন। তাঁহার বহি এই বিষয়ে প্রথম রচনা নহে। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থখানির বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাহা কেবল মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হয় নাই, বহু পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা সংগৃহীত অপ্রকাশিত অনেক পুঁথীও অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ইহা ক্রমশ বৃহদায়তন হইয়াছে। যাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেন, তাঁহারা দীনেশবাবুর সকল মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করেন না, এবং তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা এখন ও অতঃপর যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগের দীনেশবাবুর বহি না পড়িলে চলিবে না। ইহা তাঁহার পুস্তকের গুরুত্বের প্রমাণ।

তিনি সতী, ফুল্লরা, বেহুলা প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ নারীচরিত্র নূতন করিয়া বাঙালীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সংগ্রাহিত ময়মনসিংহের লোকগাথাসমূহ সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়া এবং ইংরেজীতেও তাহার অনুবাদ ছাপাইয়া তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত একটি দিক্ শিক্ষিত বাঙালীর ও জগদ্বাসীর গোচর করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে। বৃহত্তর বঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার বৃহৎ পুস্তক বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির নানা দিকের প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি উপন্যাস ও গল্পও কিছু লিখিয়াছিলেন। বঙ্গের চিত্র ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিতকলার তিনি অনুরাগী ছিলেন। তাহার নিদর্শন সংগ্রহার্থ তাঁহার বেহালার বাড়ীতে নিজের একটি ম্যুজিয়ম ছিল। তাঁহার সংগ্রহ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়া গিয়াছেন।

১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

নগেন্দ্রনাথ সোম

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোমের বয়স মৃত্যুকালে ৭০এর উপর হইয়াছিল। তিনি কবিতা কিছু লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিশেষ করিয়া স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্বন্ধে তৎপ্রণীত বৃহৎ গ্রন্থের জন্য। ইহা রচনা করিতে তিনি বিস্তর অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি তাহা করায় মধুসূদনের জীবনের অনেক অজ্ঞাত কথা বাঙালী শিক্ষিত সমাজের গোচর হয়।
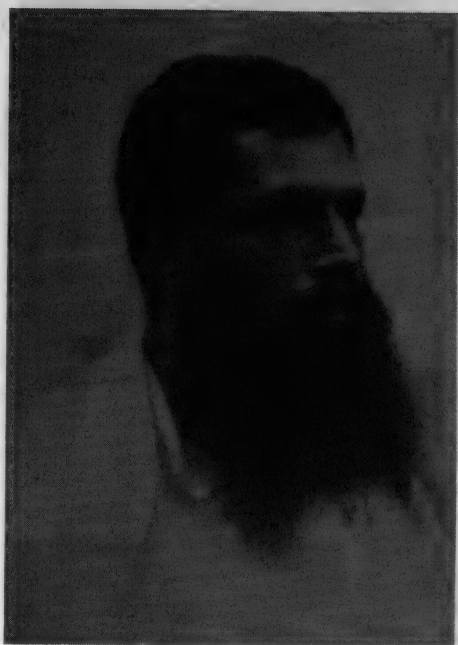
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী • মাঘ ১৩২২

সৈয়দ মুজতবা আলি • শ্রাবণ ১৩৪৩
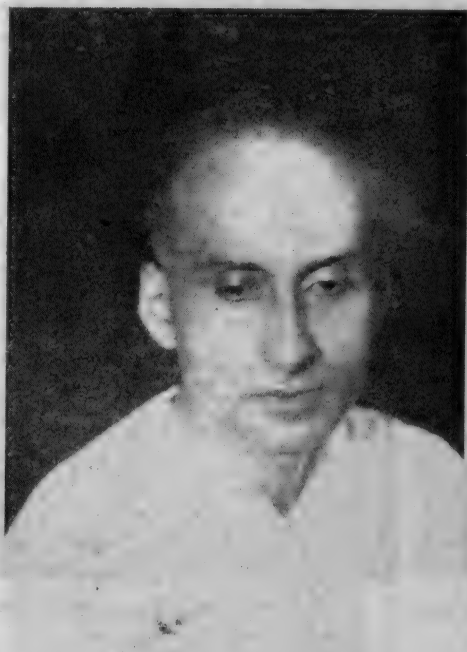
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় • পৌষ ১৩৪২
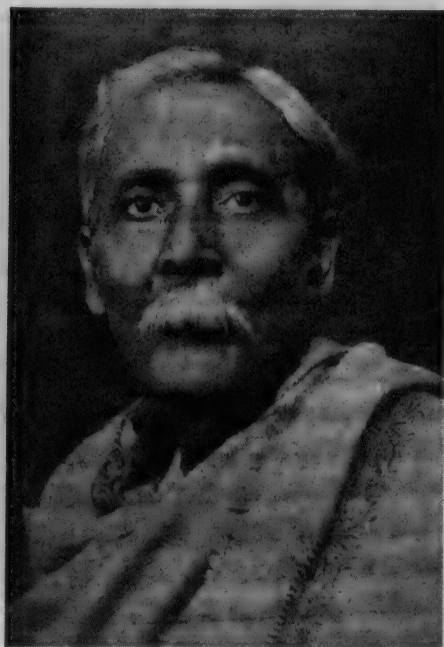
দীনেশচন্দ্র সেন • পৌষ ১৩৪৬
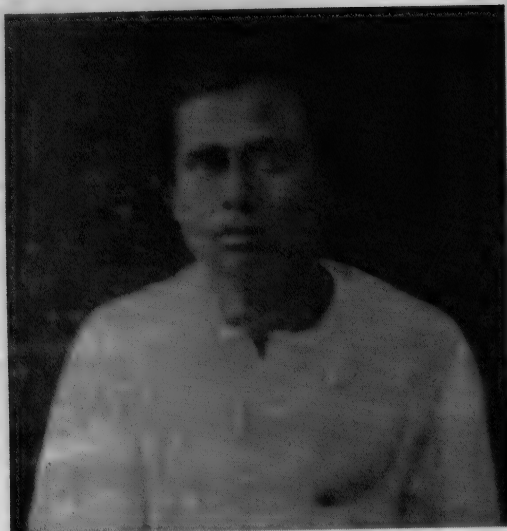
রবীন্দ্রনাথ মৈত্র • চৈত্র ১৩৩৯
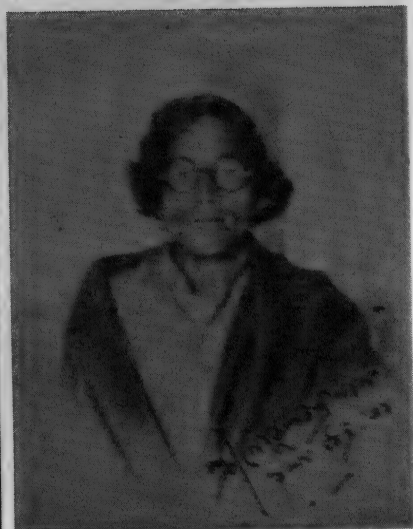
গোকুলচন্দ্র নাগ • কার্তিক ১৩৩২
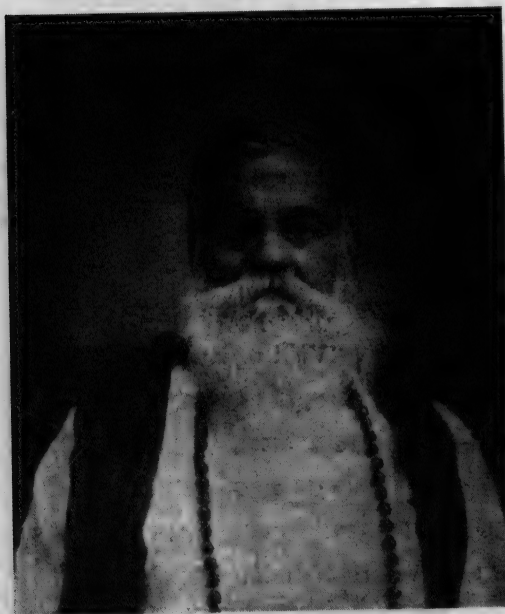
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় • অগ্রহায়ণ ১৩২৬

সুকুমার রায় • আশ্বিন ১৩৩০
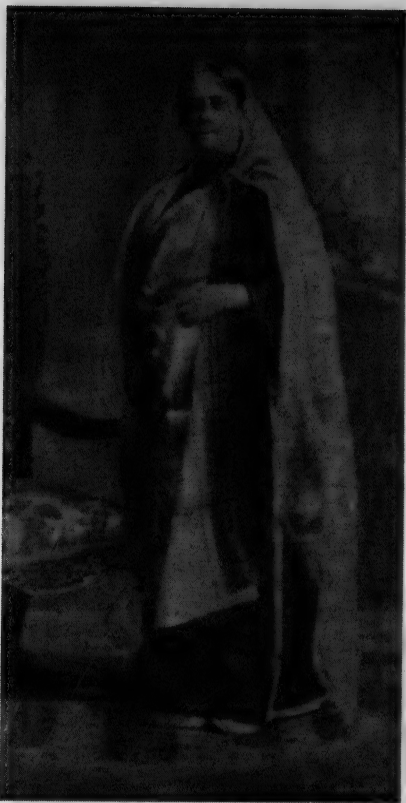
স্বর্ণকুমারী দেবী • শ্রাবণ ১৩৩৯

অনুরূপা দেবী • পৌষ ১৩৪৩

সরোজকুমারী দেবী • আষাঢ় ১৩৪৩
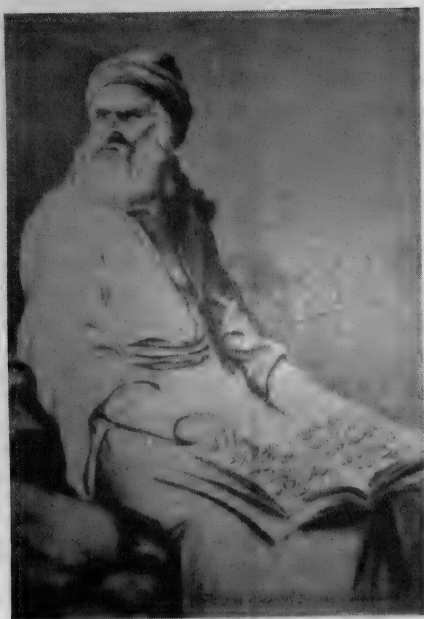
ফিরদৌসী • কার্তিক ১৩৪১

পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্মা • জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০
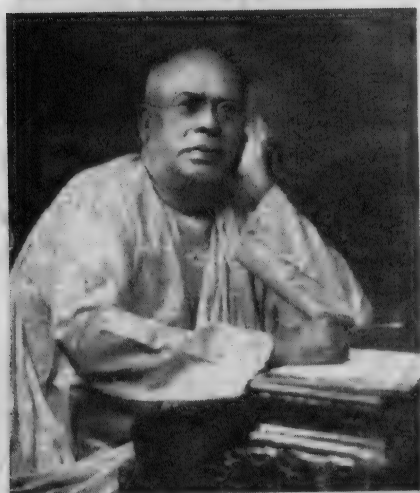
যতীন্দ্রমোহন বাগচী • জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫

জলধর সেন • বৈশাখ ১৩৪৬
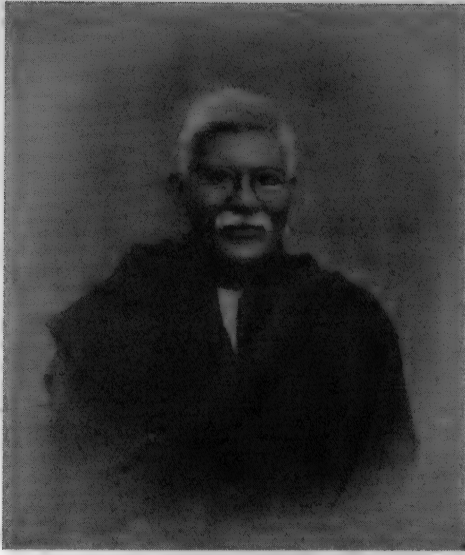
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় • পৌষ ১৩৪১

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় • বৈশাখ ১৩৩৯

শিশুসাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম • ফাল্গুন ১৩৪২
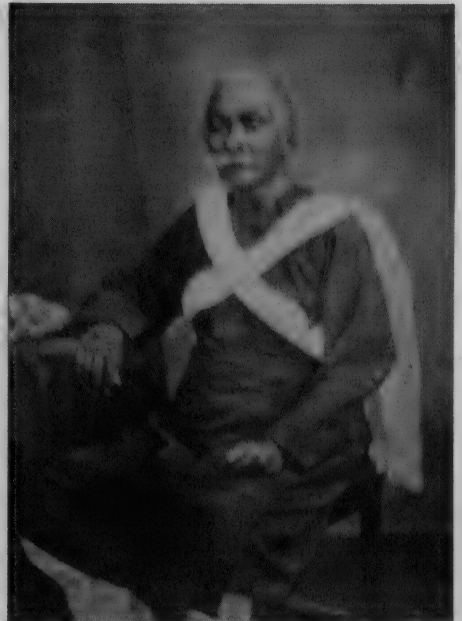
প্যারীচাঁদ মিত্র • শ্রাবণ ১৩০৮

পরশুরাম লিখিত • শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত

পুনর্মিলন

মহাকবি ভাস রচিত 'মধ্যম' নাটিকার আখ্যানভাগ কিঞ্চিৎ অদলবদল করিয়া বলিতেছি।

পঞ্চপাণ্ডব বিন্ধ্যাটবীতে মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। মধ্যমপাণ্ডব একটু বেশী চঞ্চল ও দুঃসাহসিক, তাই দল হইতে ছিটকাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সহসা একটি রাক্ষস আসিয়া বলিল—'যুদ্ধং দেহি।'

রাক্ষসটি তরুণ, আষাঢ়ের সজল-জলদতুল্য তাহার কান্তি, কণ্ঠস্বরে বাল্যের মধুরতা যৌবনের গাম্ভীর্য এখনও দ্বন্দ্ব করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া ভীমের মনে যুগপৎ বীর ও বাৎসল্য রসের সঞ্চার হইল। বলিলেন—'অয়ে বালক, তোমার সঙ্গে আমি লড়িব না, বরং তোমার পিতাকে ডাক।'

রাক্ষস ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'চালাকি চলিবে না। হয় যুদ্ধ কর নতুবা পরাজয় স্বীকার করিয়া আমার সঙ্গে চল। আমার জননী ব্রতপালন করিয়া অভুক্তা আছেন, আজ তাঁহার পারণা। একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য আনিতে বলিয়াছেন। তোমাকে বেশ স্থূলকায় দেখিতেছি, তোমার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে।'

ভীমের কৌতূহল হইল। বলিলেন—'বেশ, চল।'

অনেক বনজঙ্গল গিরি নদী অতিক্রম করিয়া রাক্ষস ভীমকে একটি প্রকাণ্ড গুহার দ্বারদেশে আনিল। ডাকিল—'মাতঃ, আহার্য্য উপস্থিত।'

ভিতর হইতে রাক্ষসী বলিল—'চিরজীবী হও বৎস, তোমাকে গর্ভে ধারণ করা সার্থক হইল।'

অতঃপর ভীম রোমাঞ্চিত হইয়া শুনিলেন রাক্ষসী

'ছি ছি লজ্জায় মরি!'

তাহার এক চেটীকে বলিতেছে—'হঞ্জে, মনুষ্যটিকে বড়-বড় করিয়া কর্তন কর। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে কিঞ্চিৎ [illegible]

গল্পিকা : পরশুরাম লিখিত ও যতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত • আশ্বিন ১৩৩৬

লন্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতারত জগদীশচন্দ্র

অপূর্ব সাড়া : জগদীশচন্দ্রের কার্টুন :
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
• আষাঢ় ১৩২৮

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!"

এস বজ্র মহাসনে, মাতৃ-আশীর্বচনে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে!
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জয় শক্তিসম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এস জ্ঞানী, এস কর্মী,
নাশ ভারতলাজ হে!
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয় পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল
কীর্তি অম্বর মাঝ হে!
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজ হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে!
জয় হে, জয় হে, জয় হে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪ অগ্রহায়ণ
১৩২৪

বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'আবাহন' কবিতা
• পৌষ ১৩২৪

১৩৪৮ শ্রাবণ

দীনেশরঞ্জন দাস

স্বর্গত দীনেশরঞ্জন দাস যখন অধুনালুপ্ত "কল্লোল" নামক মাসিকের সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তিনি তাঁর কাগজটিতে লিখবার নূতন ধারা, ব্যঙ্গ চিত্রেরও নূতন ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এমন কোন কোন নূতন লেখককে তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন যারা এখন খ্যাতনামা হয়েছেন। "কল্লোল" সম্বন্ধে এ কথা খুব কম লোকই জানেন যে, প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রলাঁর ভগ্নী শ্রীমতী মাদলীন রল্যাঁ "কল্লোল" পড়তেন। দীনেশ বাবু মিষ্ট প্রকৃতির বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। "কল্লোল" বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি একটি সিনেমার পরিচালক হয়েছিলেন এবং এই কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

সাহিত্যের নানা কথা

সাহিত্যের শ্রেয় রূপ ও প্রবাসী প্রসঙ্গ

১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ

[প্রবাসীতে প্রেরিতব্য কবিতার উচিত চরিত্র]

আমরা প্রবাসীতে ছাপিবার জন্য যত কবিতা পাই, তাহার অতি অল্প অংশই ছাপিতে পারি। প্রকাশযোগ্য কবিতাও অনেক সময় স্থানাভাবে বাহির হয় না। তদ্ভিন্ন আর একটি কথা আছে।

অনেক প্রেমের কবিতা আসে। লেখকগণ অনেকেই যুবা,—বিবাহিত কিম্বা অবিবাহিত। তাঁহাদের প্রেম কথার কথা, না সত্য, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। টাকার জন্য যাহারা বিবাহ করিয়াছে বা করিবে, তাহাদিগকে প্রেমিক বলিতে পারি না; সুতরাং তাহাদের কবিতাও কেবল বাক্যের শ্রাদ্ধ মাত্র। এই জন্য আমাদের এইরূপ একটা নিয়ম করিবার ইচ্ছা হইতেছে :—

"১। যে সকল বিবাহিত ব্যক্তি প্রেমের কবিতা পাঠাইবেন, তাঁহারা তৎসঙ্গে লিখিয়া পাঠাইবেন যে বিবাহের পূর্ব্বে, তাঁহাদের, শ্বশুরের ধন ও শ্বশুরের কন্যা, কাহার প্রতি কতটা প্রেম জন্মিয়াছিল, এবং তাঁহারা কি পরিমাণে নিজের শ্বশুরকে ঋণগ্রস্ত, সর্ব্বস্বান্ত বা পথের ভিখারী করিয়াছেন।

"২। যে সকল অবিবাহিত ব্যক্তি প্রেমের কবিতা পাঠাইবেন, তাঁহারা লিখিবেন যে তাঁহারা হৃদয়ের কতটুকু স্থান ভাবী শ্বশুরের ধনের প্রতি প্রেমে ও কতটুকু শ্বশুরকন্যার প্রেমে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা শ্বশুরকে কি পরিমাণে ঋণগ্রস্ত, সর্ব্বস্বান্ত বা পথের ভিখারী করিতে অভিলাষী।

"বিশেষ দ্রষ্টব্য। কেহ যদি বলেন যে তাঁহার (বর্ত্তমান বা ভাবী) শ্বশুরের ধনের প্রতি লোভ নাই, তাহা হইলে তাঁহাকে কোন চিন্তাপাঠকের (thought-reader এর) সার্টিফিকেট দিতে হইবে।"

যে দেশে বর ও কন্যা বিক্রী হয়, সে দেশে লোকে কেন প্রেমের নাম করে?

১৩১৬ অগ্রহায়ণ

[বঙ্গসাহিত্যে একটি কুলক্ষণ]

বঙ্গসাহিত্যে আমরা অনেক দিন হইতে একটি কুলক্ষণ দেখিয়া আসিতেছি। হয় ত একজন লেখক অসঙ্কোচে প্রাণের সত্য কথাগুলি একখানি পুস্তকে লিখিলেন, অথচ বেআইনী কিছুই লিখিলেন না। কিন্তু তাঁহার অর্থাভাব আছে; পুস্তক আশানুরূপ বিক্রয় না হওয়ায় তাঁহার অর্থপ্রাপ্তি হইল না। তখন তিনি সরকারী শিক্ষাবিভাগের শরণ লইতে বাধ্য হইলেন। অবশ্য এই সরকারী শিক্ষাবিভাগের সহকারী পাঠ্যপুস্তকনির্ব্বাচক কমিটি বেশ গোবেচারী গোছের বহি না হইলে কখনও পছন্দ করিতে পারেন না; সুতরাং যে বহিখানি মানুষের মত ছিল, তাহাকে গাধা কিম্বা ভেড়া বানাইতে

হইল। এরূপ পুস্তকের দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি; কিন্তু লেখকদের কিম্বা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রাণে অকারণ ক্লেশ দিতে আমাদের ইচ্ছা না থাকায় আমরা কোনও পুস্তকের নাম উল্লেখ করিলাম না।

এরূপ স্থলে আমরা দুই পক্ষের দোষ দেখিতেছি। প্রথমতঃ, দেশবাসী আমরা, আমাদের দোষ। আমরা ভাল বহি যদি ক্রয় না করি, তাহা হইলে সকল গ্রন্থকার কেবল পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বা লিপিকণ্ডুয়ণ নিবারণের জন্য বহি লিখিবেন, আমাদের এরূপ আশা করা উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থকারদের দোষ। দেশবাসী আমাদের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও আমরা আশা করি যে এমন গ্রন্থকার আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিবেন, যাঁহারা অর্থের জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে খাট করিবেন না।

উপরে যে কুলক্ষণের উল্লেখ করিলাম, তাহার, সাহিত্যের সকলস্তরেই বিস্তৃতি লাভ করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কারণ আগে কেবল বিদ্যালয়সমূহেই বাঙ্গালা বহি পড়ান হইত। এখন কলেজেও বাঙ্গালা বহির প্রয়োজন হইতেছে। যাঁহারা পূর্ব্বে "ভয়ে ভয়ে লিখি"তেন না, এখনও তাঁহাদের সেইরূপ মানসিক অবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৩১৮ আশ্বিন

[সমালোচনার আকাঙ্ক্ষিত প্রকৃতি]

কবি বা অন্য প্রকার লেখকের চেয়ে সমালোচক যে সকল স্থলেই কম দরের লোক, তাহা সত্য নহে। বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনে অনেক পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির লেখকেরা বঙ্কিম বাবুর চেয়ে প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন না। রবিবাবু যাঁহাদের পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে রবিবাবুর চেয়ে উৎকৃষ্ট লেখক নহেন। জন্‌সন্ তাঁহার Lives of the English Poets এ এমন অনেক কবির কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার অপেক্ষা অধিক কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন না।

কিন্তু এরূপ ব্যতিক্রম স্থল সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে কিছু একটা করার চেয়ে কৃত কার্য্যের সমালোচনা করা সহজ। কাব্য বা চিত্র রচনা করা শক্ত, কিন্তু তাহার দোষ দেখান অপেক্ষাকৃত সহজ। রাফেলের কোন কোন ছবির দোষ আমরাও দেখাইতে পারি। কিন্তু তাঁহাব নিকৃষ্টতম ছবির মত একখানা ছবিও আমরা আঁকিতে পারি না।

মানুষের জীবনের ও কার্য্যক্ষেত্রের অন্যান্য বিভাগেও এই কথা খাটে। বুদ্ধদেব ও যিশু খৃষ্ট কি ভুল করিয়াছিলেন, তাহা আমরাও হয়ত দু একটা বলিয়া দিতে পারি। কিন্তু তাঁহারা যে উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হইয়াছিলেন, অতি অল্পলোকে তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করে বা সমর্থ হয়। রাজ্যশাসন কার্য্যে স্বদেশে বিদেশে কোন্ রাজা বা মন্ত্রী কি ভুল করিয়াছিলেন, সমালোচকেরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু সমালোচকদিগকে রাজ্য শাসন করিতে দিলে

তাঁহারা কতদূর সাফল্য লাভ করিতেন, তাহা বলা যায় না। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিগণ কিরূপ ভাবে যুদ্ধ করিলে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তাহা ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজের সেনানেতৃত্ব সপ্রমাণ হয় না।

আমরা একথা বলিতেছি না যে সমালোচনা সহজ কাজ বা নিষ্প্রয়োজন। সমালোচনা সহজও নয়, ইহার উপকারিতাও আছে। সমালোচনা দ্বারা, অতঃপর যাহারা কিছু করিবে, তাহাদের ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা অনেকটা কম হয়। দুর্নীতি, কুসংস্কার, প্রভৃতির সমালোচনারূপ বিনাশের কাজ আগে না করিলে সুনীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান বিস্তার হইতে পারে না। কিন্তু কেবল সমালোচনা, কেবল বিনাশ, দ্বারা কাজ হয় না। কি ভাল নয়, কি সুন্দর নয়, কি কার্য্যকর নয়, কোন্‌টা ঠিক্ আদর্শ নয়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইল না। শ্রেয়ের, সুন্দরের, কার্য্যকরের, সৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা যে করিতে পারে, তাহার জীবনের সফলতা অধিক।

একজন মানুষের পক্ষে যেমন এই কথা খাটে, কোন জাতির, দেশের, সমাজের, বা সম্প্রদায়ের মানবসমষ্টির পক্ষেও তেমনি এই কথা প্রযুজ্য। কে কি করিল না, তাহার আলোচনা লইয়া দিন কাটাইলে চলিবে কেন? আমরা কি করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন না, বা গবর্ণমেণ্টকৃত কার্য্যের কি দোষ, তাহার আলোচনায় আমরা যতটা সময় ও শক্তি প্রয়োগ করি, তাহার কিয়দংশ, আমাদের নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে সুফলপ্রদ হয়। আমরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনার বিরোধী নহি। ইহা করা আবশ্যক। কঠোর আইন না থাকিলে, এই সমালোচনা কার্য্য স্পষ্টবাদিতা ও নির্ভীকতার সহিত হইতে পারিত, ইহাও ঠিক্। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা ছাড়া আমাদের আর কাজ নাই, বা বেশী কিছু কাজ নাই, ইহা মনে করা ভুল। যে সব দেশের শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র, তাহাদের সহিত আমাদের প্রভেদ ভুলিয়া যাওয়াও ঠিক্ নয়। ইংরাজেরা তাহাদের গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে তাহা নিতান্ত অশোভন হয় না। কারণ আজ যাহারা সমালোচক, কাল তাহারাই বা তাহাদেরই দল পার্লেমেণ্টে ক্ষমতা পাইয়া "গবর্ণমেণ্ট" নামধেয় হইবে ও নিজ জ্ঞানবুদ্ধি আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিবে বা অন্ততঃ কাজ করিবার সুযোগ পাইবে। আমাদের অবস্থা সেরূপ নয়। আমরা আজও সমালোচক কালও সমালোচক। কাল আমরা "গবর্ণমেণ্ট" হইতে পারিব না। সুতরাং আমাদের জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে আমাদিগকে সমালোচনা ছাড়া আরও কিছু করিতে হইবে। এইরূপ কিছু আমরা যে কেহই করি নাই, তাহা নয়; কিন্তু আমাদের কাজে দর (quality), পরিমাণ ও শৃঙ্খলা ক্রমশঃ আরও খুব বাড়া দরকার, এবং ইহাতেই আমাদের শক্তি প্রধানতঃ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ইহা সত্য যে গবর্ণমেণ্টের হাতে যেরূপ টাকা আছে, শক্তি আছে, সুশৃঙ্খল কার্য্যকারকের দল (organisation) আছে, আমাদের তাহা নাই। সত্য বটে, বে-আইনী সমিতির বিরুদ্ধে যে আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সুকার্য্যকারী সমিতির বিনাশ সাধনেও প্রযুক্ত হইতে পারে। সত্য বটে গোয়েন্দা ও গুপ্ত পুলিশের প্রাদুর্ভাবে নির্দ্দোষ দেশহিতকর কাজ করাও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। কিন্তু সকল সুচেষ্টা অসম্ভব হয় নাই; কোন দেশে রাজনৈতিক ঘোরতর দুর্দিনেও অসম্ভব হইতে

পারে না। বাধা অতিক্রমেই ত মনুষ্যত্বের পরিচয়। আমরা মানুষ কি না, তাহার পরিচয় কি দিতে পারিব না?

গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা এবং ভারতীয় ইংরাজ সম্পাদকগণ বলেন যে ভারতের শিক্ষিত লোকেরা অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের প্রতিনিধি নহে। শিক্ষিতেরা তাহাদের নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ও অন্যবিধ আন্দোলন করে, দাবী দাওয়া করে। তাহারা দেশটাকে জানেই না, দেশের পনের আনা যে অশিক্ষিত গরীব লোক, তাহাদের সঙ্গে উহাদের কোন সংস্পর্শই নাই। ইংরাজ রাজপুরুষেরাই এই পনের আনার মা বাপ ও প্রতিনিধি; তাঁহারাই উহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এবং উহাদের হিতের জন্য দেশ শাসন করেন।

আমরা এই সব ইংরাজদের দাবী দাওয়া হাসিয়া উড়াইয়া দি। কিন্তু আমরা যে দেশটাকে জানি, আমাদের সঙ্গে যে ঐ পনের আনা লোকের সংস্পর্শ আছে, কার্য্য দ্বারা তাহা প্রমাণ করিলে ভাল হয়। দেশটাকে আমরা জানি, কিন্তু সামান্যই জানি। সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আছে, কিন্তু তাহা বেশী নয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক অল্পই আছেন যিনি, ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্, বঙ্গের সমুদয় জেলার সদর শহর দেখিয়াছেন, যিনি নিজের জেলার প্রধান প্রধান গণ্ডগ্রাম ও শহরগুলি দেখিয়াছেন। আমরা নিজের জেলার বিষয় জানিতে চাহিলে ইংরাজের লেখা বা সঙ্কলিত গেজেটীয়ার পড়ি; ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বৃত্তান্ত জানিতে হইলে ইংরাজের লেখা বহি ভিন্ন প্রায় গতি নাই। এ বিষয়ে বেশী যে কৌতূহল আছে, তাহাও বোধ হয় না। এরূপ বহি ইংরাজ ও ইউরোপীয়েরাই বেশী ক্রয় করে; এবং তাহারাও ভারতবাসীর লিখিত বা প্রকাশিত বহি কিনে না, পড়ে না। সুতরাং কোন ভারতবাসী এরূপ বহি লিখিলে তাহার পুণ্যসঞ্চয় হয়, কিন্তু পোকায় কাটা ভিন্ন বোধ করি অন্যরূপ কাট্‌তি বড় বেশী হয় না।

দেশের জ্ঞান ত এই পর্য্যন্ত। দেশের লোকের সহিত সংস্পর্শ কিরূপ তাহাও চিন্তনীয়। এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের পর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে মিলা মিশা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিয়াছিল। এখন সম্ভবতঃ আবার সামান্যরূপে বাড়িতেছে। কিন্তু যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা এখনও খুব কম।

সুতরাং দেশকে দেখিয়া দেশকে জানিয়া নিজের করা, এবং দেশের লোককে জানিয়া তাহাদিগকে নিজের লোক করা, আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা একটা নিতান্ত মামুলি কথাই বলা হইল। কিন্তু ইহা করা তত সহজ নয়। আমরা "সাধারণ" লোকদের উপকার করিতে যাইতেছি, তাহাদিগকে উন্নত করিতে যাইতেছি, এই ভাবে আমরা মনের উপর জোর করিয়া তাহাদের সঙ্গে কতকটা মিশিতে পারি বটে। কিন্তু আমাদের সকলের সাধারণ মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সহজ সহৃদয়তার সহিত সকলের সঙ্গে আত্মীয়তা করা, একাগ্রসাধনার কাজ। অনেকেই সম্মুখে পূজার ছুটি পাইতেছেন। এখনই এই সাধনা আরম্ভ হউক।

১৩১৯ ফাল্গুন
মাসিকপত্রের প্রবন্ধ প্রসঙ্গ]

মাসিকপত্রের পাঠকেরা জানেন, যে, সম্পাদক সমুদয় প্রবন্ধ লেখেন না, কখন কখন একটিও লেখেন না, এবং প্রবন্ধলেখকদের মতের সঙ্গে সম্পাদকের মতের মিল থাকা না থাকা দুইই সম্ভব। কিন্তু সকল পাঠক ইহা জানেন না, যে, সম্পাদক সমালোচনার্থে প্রাপ্ত সমস্ত বহির সমালোচনা করেন না, কখন কখন একখানিরও করেন না, এবং যেসকল বহির সমালোচনা তিনি করেন না, অধিকাংশস্থলে তাহা তিনি না পড়ায় তৎসম্বন্ধে তাঁহার অনুকূল বা প্রতিকূল কোন মতই থাকিতে পারে না। অতএব ইহা বলা বাহুল্যমাত্র যে সমালোচকদিগের মতের সহিত তাঁহার মতের মিল আছে কিনা, এ প্রশ্ন অধিকাংশ স্থলে উঠিতেই পারে না। বস্তুতঃ, প্রবন্ধলেখকগণের মতের সহিত সম্পাদকের মতের মিল না থাকিলেও যেমন অনেক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তেমনি কোন কোন সমালোচনা সম্পাদকের মতের বিপরীত হইলেও তাহা ছাপা হইতে পারে।

সমালোচনা সম্বন্ধে আর একটি কথা বক্তব্য। একসময় ছিল, যখন নারীর লিখিত কোন পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইলে, সমালোচক মুরুব্বি সাজিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আদর্শটা একটু খাটো করিয়া বহিখানির অনুকূল সমালোচনা করিতেন। লেখিকাগণকে এইরূপ কৃপার চক্ষে দেখায় তাঁহাদের অগৌরব হইত। সুখের বিষয়, এখন তাঁহাদের সে অগৌরবের অবস্থা আর নাই; এখন তাঁহাদের পুস্তক সমালোচনায় পুরুষদের বহির তুল্য মাপকাটিই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও কোন কোন মুসলমান লেখক আশা করেন যে তাঁহারা মুসলমান বলিয়া তাঁহাদের বহির সমালোচনায় প্রচলিত মাপকাটি ব্যবহৃত হইবে না, কিছু কৃপা করা হইবে। তাঁহারা আপনাদিগকে এত হীন কেন মনে করেন? বাঙ্গালা তাঁহাদেরও মাতৃভাষা; তাঁহারা অন্য গ্রন্থকারদের মত উচ্চ আদর্শ অনুসারে পরীক্ষিত হইবার দাবী করুন। তাহাই গৌরবজনক ও মঙ্গলকর। ভাল মুসলমান লেখক যে নাই, তাহাও ত নয়।

১৩২২ বৈশাখ
ইতিহাস চর্চ্চার প্রণালী।

আজকাল বাঙ্গালা মাসিক পত্রে, এমন কি সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজে পর্য্যন্ত, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। এখন ইতিহাস চর্চ্চার ও ইতিহাস রচনার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া খুব দরকার। এ বিষয়ে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের যে প্রবন্ধটি আমরা ছাপিলাম, তাহা ঐতিহাসিক লেখকদিগের খুব কাজে লাগিবে।

টডের রাজস্থান সম্বন্ধে যদুবাবু আমাদিগকে

সাবধান করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের অন্য একটি কথা মনে পড়িল। মুসলমান শাসনকালের ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমাদের ভ্রমে পড়িবার অনেক কারণ আছে। কিন্তু মুসলমান-বিজয় ও শাসন সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য বলিবার সময়ও আমরা মুসলমান বিজয়ের ফলে পরোক্ষভাবে দেশের কি উপকার হইয়াছে, তাহাও যেন সব সময়ই বলি। সব ধর্ম্মাবলম্বীকে লইয়া আমাদিগকে ঘর করিতে হইবে। সকলের ন্যায্য পাওনা সকলকে দিতে হইবে। আজকাল আমাদের অরাজনৈতিক সভাসমিতিতেও যেমন রাজভক্তিব্যঞ্জক একটি প্রস্তাব প্রথমে ধার্য্য হয়, তেমনি মুসলমানদের ভারত-আগমনের শুভফল সত্যকে অতিক্রম না করিয়া আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত ভারতবর্ষের সব ইতিহাসে ঘোষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

সমালোচনা।

সমালোচকের যে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার, এটা বলিলে অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবেন। সমালোচনার সময় কিন্তু আমরা অনেকে এরূপ সুবুদ্ধির পরিচয় দি না। যে বহি বা প্রবন্ধের সমালোচনা হইতেছে, তাহার সমালোচক যদি লেখক অপেক্ষা বেশী বিদ্বান্ ও যোগ্য লোক হন, তাহা হইলে ত সমালোচনা বেশ ভালই হইতে পারে। কিন্তু সমালোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান যদি সমালোচকের থাকে, তাহা হইলেও কাজ চলিতে পারে। আরও কোন কোন স্থলে সমালোচনা মন্দ হয় না। মনে করুন একজন লেখক স্পেনদেশের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। সমালোচক স্পেনের ইতিহাস লেখেন নাই, কিন্তু তিনি অন্যের লেখা স্পেনের ইতিহাস পড়িয়াছেন এবং অন্য একদেশের ভাল ইতিহাস লিখিয়াছেন; এক্ষেত্রে তাঁহার সমালোচক হইবার যোগ্যতা আছে বলিতে হইবে। কিম্বা যদি তিনি নিজে কোন ইতিহাস না লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যদি উৎকৃষ্ট ইতিহাস পড়িয়া থাকেন, এবং ইতিহাস রচনার প্রণালী অবগত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার দ্বারা সমালোচনা হইতে পারে। যিনি নিজে কবি নহেন, তিনি নানা কাব্যের রস আস্বাদন করিয়া এবং শ্রেষ্ঠ সমালোচকদিগের কাব্যসমালোচনা অধ্যয়ন করিয়া কাব্যসমালোচনার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন।

এক রকমের সমালোচনা আছে, তাহার নাম মুরুব্বিয়ানা। সমালোচক গ্রন্থকারের পিট চাপড়াইয়া বলিলেন বেশ লিখেছ হে, বেশ লিখেছ। ইহাতে বিজ্ঞাপন দিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে সমালোচনা বলা চলে না। আর এক রকমের সমালোচনা আছে, যাহাকে পণ্ডিতি বলা চলে। এইরূপ সমালোচনায় সমালোচক গ্রন্থকারের বানান, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, প্রচলিত পুস্তকলিখিত নিয়ম অনুযায়ী কিনা, প্রধানতঃ তাহাই দেখেন, এবং উহার সঙ্গে মিল না থাকিলে গ্রন্থকারকে পাস না করিয়া ফেল্ করেন। বানান-ভুল, ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ, ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মভঙ্গ, এইগুলি থাকিলেই

কোন গ্রন্থ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয়, এমন কথা কে বলিবে? কিন্তু অন্যদিকে বিবেচনা করিবার বিষয়ও কিছু আছে। বিদেশের দৃষ্টান্ত লইলে ধীরভাবে বিচারের সুবিধা হয়। ইংরেজের লেখা ইংরেজী ব্যাকরণে আমরা অনেক দুষ্ট প্রয়োগ এবং অনেক ব্যাকরণের ভুলের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যে বাক্যগুলি দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি প্রসিদ্ধ বড় বড় ইংরেজ গ্রন্থকারের লেখা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু ইংরেজ বৈয়াকরণেরা যেগুলিকে ভুল বলেন, তাহা সত্ত্বেও এইসকল লেখক শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন; এমন কি তাঁহাদের লিখন-প্রণালী অনুসারে ইংরেজী ব্যাকরণেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা দেশেও শ্রেষ্ঠ লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহারা যদি বানান, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার আদিতে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ না করেন, এমন কি যদি সত্য সত্যই দু চারটা ভুলও করেন, তাহা হইলেও শিক্ষক মহাশয়েরা ছাত্রদের রচনা যেমন করিয়া কাটেন, কোন সমালোচক তাঁহাদের লেখার উপর সেইরূপ পণ্ডিতি ফলাইলে বড় অবিবেচনার কাজ হয়, এবং অত্যন্ত অশোভন হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি বিদ্যালয়পাঠ্য ব্যাকরণের লেখকদের দ্বারাও নিয়মিত হইবে না, এইসব সমালোচকদের দ্বারাও নিয়মিত হইবে না; নিয়মিত হইবে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখার দ্বারা। সব দেশে যাহা হইয়াছে, বঙ্গেও তাহাই হইবে। বাংলা দেশটা সৃষ্টিছাড়া নয়। অন্যান্য চলিত ভাষার ন্যায় বাংলারও বরাবর পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, পরেও হইবে। সুতরাং ইহার ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার আদি চিরকাল এক রকম থাকিবে না। পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন নিশ্চয়ই হইবে; এবং তাহা শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা অনুসারে হইবে।

কোন কোন সমালোচক কলম চালাইতে চালাইতে চাবুক চালাইবেন বলিয়া ভয় দেখান। শুনা যায়, বঙ্কিমবাবু কখন কখন সমালোচনা করিতে গিয়া কোন কোন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেন যে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ তাঁহার বেত্রাঘাতের উপযুক্ত নয়। কি অবস্থায় কিরূপ গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার বিচার না করিয়া এরূপ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। যাহাই হউক, গ্রন্থকারদের মধ্যে বঙ্কিম বাবুর আসন এরূপ উচ্চে যে তিনি গুরুমহাশয় ও অনেক গ্রন্থকার তাঁহার পাঠশালার পোড়ো, এবং তিনি পোড়োদের পিঠে বেত কষাইয়া দিতেছেন, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা ত আর সবাই বঙ্কিম নই। সুতরাং আমরা কলম ছাড়িয়া চাবুক ধরিলে লোকে হঠাৎ ভাবিতে পারে যে আমাদের রাখালী বা গাড়োয়ানী করাই পেশা, হঠাৎ লেখক হইয়া বসিয়াছি।

সমালোচনার সকলের চেয়ে সোজা পথ, বিজ্ঞভাবে বলা, "লেখক কি যে লিখিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না।" বুঝিতে না পারা দুই কারণে ঘটে। হয় লেখক অসম্বদ্ধ, বা অর্থহীন, বা দুর্ব্বোধ্য, বা প্রলাপবৎ কিছু লিখিয়াছেন, নয় সমালোচকের বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু নিজের শক্তির অভাব কয়জন স্বীকার করে? সুতরাং দোষটা যে লেখকের তাহাই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সমালোচক ধরিয়া লন। গদ্য বা পদ্য যে রচনাটি বুঝিতে হইবে, তাহার প্রত্যেক শব্দের অর্থ, এবং রচনাটি যে ভাষায় লেখা, তাহার ব্যাকরণ আমাদের জানা থাকিতে পারে, অথচ রচনাটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে। বাংলা লেখকের দৃষ্টান্ত দিলে ঝগড়া হইবে। ইংরেজীর কথাই বলি। ব্রাউনিং, সুইন্‌বার্ন, শেলীর অনেক কবিতার শব্দগুলির অর্থ জানিলেও আমরা

কবিতাগুলি বুঝিতে পারি না; শ্রেষ্ঠ সমজ্‌দার কেহ বুঝাইয়া দিলে অর্থগ্রহণ ও রসাস্বাদন করিতে পারি। ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নয় বলিয়াই যে এমন ঘটে, তাহা নয়। বিদ্বান্ ইংরেজদিগকেও অনেক সময় ভাল ভাল সমালোচনা টীকা ভাষ্য পড়িয়া ভাল ভাল ইংরেজী গ্রন্থ বুঝিতে হয়। দার্শনিক ও কবি যে চিন্তার, রসের, ভাবের, আদর্শের কথা বলিতেছেন, আমাদের তাহা উপলব্ধি, আস্বাদন, অনুভব করিবার শক্তি থাকিলে তবে আমরা তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারি। যে যে-স্তরের মানুষ তাহার ভাবগ্রাহিতা ও রসগ্রাহিতা তদ্রূপ। ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেন নিজের নিজের মাতৃভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা সমজ্‌দারদের সাহায্য ব্যতিরেকে বুঝিতে পারেন না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যই কি এত হীন যে তাহার যে-কোন রচনা শিক্ষিত বাঙ্গালীদের প্রত্যেকের নিকটই অতি সহজ বোধ হইবে? অবশ্য, দুর্ব্বোধ্য রচনা মাত্রেই গভীরভাবপূর্ণ, এমন হাস্যকর কথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু, আমি বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়াই কোন রচনা অসার, এমন মনে করাও উচিত নয়।

কোন গ্রন্থে বা রচনায় কি বলা হইয়াছে এবং কেমন করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাই প্রধানতঃ বিচার্য্য। ভিতরের ও বাহিরের জগৎটা পুরাতনও বটে, নূতনও বটে। লেখক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন কি না, অথবা পুরাতন যাহা তাহা স্বয়ং নূতন রকমে অনুভব করিয়া নিজস্ব নূতন প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন কি না, তাহারই আলোচনা করা আগে দরকার।

১৩২৪ অগ্রহায়ণ

প্রবাসীর বয়স।

বাংলায় যে কাগজগুলি রোজ একবার বা সপ্তাহে একবার বাহির হয়, তাহাদিগকে সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ বলা হয়, মাসিক ও ত্রৈমাসিকগুলিকে সাময়িক পত্র বলা হয়। বিলাতী যে-সব সাময়িক পত্র এখনও চলিতেছে, তাহার মধ্যে ওএস্‌লিয়ান ম্যাগাজিন ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ব্ল্যাক্‌উড্‌স্ ম্যাগাজিন ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কাগজ; দ্বিতীয়টি সর্ব্বসাধারণের জন্য এবং সমধিক প্রসিদ্ধ। গত জানুয়ারী মাসে প্রথমটির ১৩৯তম জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। ব্ল্যাক্‌উড্‌সের শতবার্ষিক জন্মোৎসব গত এপ্রিল মাসে হইয়াছিল। যে-সব বিলাতী ত্রৈমাসিক এখনও চলিতেছে, তাহার মধ্যে এডিনবরা রিভিউ ১৮০২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং কোআর্টার্লী রিভিউ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। "দি য়্যানুয়্যাল রেজিষ্টার" নামক বার্ষিক পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও বাগ্মী এড্‌মণ্ড বার্ক ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাহির করেন। উহা এখনও চলিতেছে।

কোন সাময়িক পত্র একশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় নাই।

সুতরাং কোন বাংলা সাময়িক পত্রের একশত বৎসর বয়স হইবার সময় এখনও হয় নাই। কোনটিরই হইবে কি না বলা যায় না। সকলের চেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষেরই জীবন সকলের চেয়ে সার্থক, ইহা যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন সাময়িক পত্র বহু বৎসর বাঁচিয়া থাকিলেই তাহার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু কোন দেশে অনেক লোক দীর্ঘজীবী হইলে, তাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে তথাকার জলবায়ু ভাল; এবং নৈতিক ও আর্থিক অবস্থা, ও সামাজিক ব্যবস্থা ভাল। তদ্রূপ কোন দেশে অনেকগুলি সাময়িক পত্র অনেক বৎসর ধরিয়া সুপরিচালিত হইলে তথাকার লোকদের জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, সাহিত্যিক প্রতিভা, দল বাঁধিবার ও দলবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিবার শক্তি, অধ্যবসায়, প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালীদের মধ্যে এইসব গুণ ও শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি না সন্দেহের বিষয়; কেন না, তাহা হইলে বঙ্গদর্শন ও সাধনার মত কাগজ উঠিয়া যাইত না।

মনে হইতে পারে বটে যে সম্পাদকতা করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী লোক ত বরাবর পাওয়া যাইত না, সুতরাং, অন্য কোন ব্যাঘাত না ঘটিলেও, কেবল উপযুক্ত সম্পাদকের অভাবেই কালক্রমে বঙ্গদর্শন ও সাধনা উঠিয়া যাইত। কিন্তু তাহা ভুল। ইংরেজী যে-সব সাময়িক পত্র বিলাতে বহুবৎসর ধরিয়া, শতবর্ষেরও অধিককাল ধরিয়া, সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ লেখকেরাই ত তাহার সম্পাদকতা করিয়া আসিতেছেন না; যাঁহারা সম্পাদকতা করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ সাহিত্যজগতের সাধারণ লোক। বাস্তবিক সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকিলেও সাময়িক পত্রিকা চালান যায়।

তাহার প্রমাণের জন্য বিলাত যাইবার দরকার নাই। আমাদের দেশের অন্য সম্পাদকের কথা বলিতে পারি না; নিজের কথা বলিতে পারি। বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ সংখ্যা সমেত দুইশত খানি প্রবাসী ১৩০৮ সালের বৈশাখ হইতে নিয়মিতরূপে বাহির হইল। বিলাতী বহু সাময়িক পত্রের সুদীর্ঘকালব্যাপী নিয়মিত প্রকাশের কথা ভাবিলে ইহা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভা এবং রচনানৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রহস্ততা না থাকা সত্ত্বেও, আমরা যে নানাপ্রকার বিঘ্ন বাধার মধ্যে দুই শত মাস ধরিয়া কাগজ চালাইতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রমাণিত হইতেছে, যে, সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভা না থাকিলেও মাসিক পত্র চালান যায়; প্রবাসীর বয়সের উল্লেখের অন্ততঃ এইটুকু প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক শক্তি ও প্রতিভায় বঞ্চিত বলিয়া যাঁহারা আমাদের সমাবস্থাপন্ন, তাঁহারা প্রবাসীর এই ষোল বৎসর সাত মাস ব্যাপী জীবন হইতে এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন যে তাঁহারাও চেষ্টা করিলে সাময়িক-সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু কাজ করিতে পারিবেন। সত্য, আমাদের কাজের মত তাঁহাদেরও কাজ দুদিনের হইবে, স্থায়ী হইবে না; আমাদের লেখার মত তাঁহাদেরও লেখা স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবে না। কিন্তু যাহা দুদিনমাত্র সংসারের কাজে লাগে, তাহারও প্রয়োজন আছে।

বাংলা মাসিক দীর্ঘজীবী হয় না কেন?

যাঁহারা এপর্য্যন্ত বাংলা মাসিকপত্র চালাইয়াছেন, তাঁহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর লোক। একশ্রেণীর লোক মাসিকপত্র হইতে কোন আয়ের আশা রাখেন না, অন্য প্রকারের আয়েই তাঁহাদের সংসার চলিয়া যায়; এমন কি কেহ কেহ লোক্সান দিয়াও কাগজ চালাইতে সমর্থ। কিন্তু যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা এইরূপ, তাঁহারাও চান যে তাঁহাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়, তাঁহারা মাসে-মাসে যাহা বাহির করেন, তাহার আদর হয়, এবং যথেষ্টসংখ্যক লোকে তাহা পড়ে। লোকে যাহা পড়ে না, তাহার জন্য পরিশ্রম করিতে ও টাকা খরচ করিতে খুব ধনী লোকেরও উৎসাহ কতদিন থাকে? সুতরাং যথেষ্ট ক্রেতা না জুটিলে এরূপ পরিচালকদের কাগজও কিছুদিন পরে উঠিয়া যায়। অন্যদিকে কোন মাসিকের যথেষ্ট আদর হইলে ও যথেষ্ট ক্রেতা জুটিলে তাহা আর লোকসানের ব্যাপার থাকে না। যাঁহারা মাসিক কাগজ চালাইয়া কিছু আয়ের আশা রাখেন, তাঁহাদের কাগজেরও স্থায়িত্ব যথেষ্ট ক্রেতার উপর নির্ভর করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে পরিচালকেরা যে শ্রেণীরই লোক হউন, এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা যেরূপই হউক, কাগজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে যথেষ্টসংখ্যক ক্রেতা-পাঠকের উপর। ক্রেতা-পাঠকদের সংখ্যা যথেষ্ট হইতে পারে যদি দেশে শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজনানুরূপ হইয়া থাকে, এবং যদি দেশের লোকদের মধ্যে আবশ্যকমত জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ থাকে। বাংলাদেশে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার হয় নাই: যাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ নাই;—পাশ্চাত্য সভ্য দেশসকলের তুলনায় ত নাই-ই, ভারতবর্ষেরই কোন কোন প্রদেশের তুলনায় বাঙালীর জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ কম। বাংলা মাসিক কাগজ অনেক স্থলে মহিলারাই পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে আরও শিক্ষার বিস্তার হইলে বাংলা মাসিকপত্রগুলির অবস্থা ভাল হইতে পারে।

দেশে খুব বেশী শিক্ষার বিস্তার হইলেও এবং শিক্ষিতদের জ্ঞানানুরাগ ও সাহিত্যানুরাগ থাকিলেও, তাঁহারা যে-সে কাগজ পড়িবেন না। সুতরাং কাগজে ভাল লেখা দিতে পারা চাই। সম্পাদক যদি নিজেই দশ-রকম ভাল লেখা দিয়া কাগজ ভরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে বেশী চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু এরূপ সম্পাদক ক'জন পাওয়া যায়? এবং পাইলেও এক এক জন এরূপ সম্পাদকের পরে পরে তাঁহাদেরই মত শক্তিমান্ লোক বরাবর জুটিবার সম্ভাবনা কম। মোটের উপর সাধারণরকমের সম্পাদকের উপরই নির্ভর কবিতে হইবে। এরূপ সম্পাদককে ভাল লেখা জোগাড় করিতে হইবে। দেশে যথেষ্ট ভাল লেখক না থাকিলে সম্পাদক নিরুপায়। কিন্তু ভাল লেখকের সংখ্যা যথেষ্ট হইলেও লেখা জোগাড় করা সহজ না হইতে পারে। কোন সম্পাদকের পরিশ্রমে দেশের কল্যাণ হইতেছে, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে কেহ কেহ তাঁহার কাগজে লেখা দিয়া থাকেন,—বিশেষতঃ বন্ধুগণ। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের খাতিরেও কখন কখন কোন কোন সম্পাদক লেখা পাইতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ সম্পাদকদের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে অনেক ভাল লেখক থাকিবেই, এমন আশা করা যায় না। লেখকগণকে দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অল্পসংখ্যক লেখকদের লেখা পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা ফেলিলাম আর ভাল লেখা

পাইলাম, বাংলাদেশের অবস্থা এরূপ নহে; এবং নিজের প্রত্যেক ভাল লেখককে নিজের আয় হইতে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতে পারে, বাংলা দেশে এরূপ মাসিক পত্র একখানিও নাই, বোধ হয় কখনও ছিল না। বাস্তবিক, কাগজের দাম, ব্লকের দাম, ছাপাইবার ও বাঁধাইবার খরচ, ডাকমাশুল এবং আফিসের কর্ম্মচারীদের বেতন ও আফিসভাড়া বাদে, যে মাসিকপত্র সম্পাদক, পরিচালক, এবং লেখক ও চিত্রকরদিগকে যথেষ্ট পারিশ্রামিক দিতে না পারে, তাহার স্থায়িত্বের সম্ভাবনা নাই। যিনি কাগজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার ঝোঁকে কাগজ খানা কিছুদিন চলিতে পারে। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ জুড়াইয়া গেলে বা মৃত্যু হইলে কাগজ বন্ধ হইয়া যাইবেই।

কাগজ চালাইয়া যথেষ্ট আয় হইলে ক্রমশঃ শক্তিমান্ শিক্ষিত লোকেরা এই কাজের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। তখন যোগ্য সম্পাদকের অভাবে কাগজ উঠিয়া যাইবে না।

লেখা জোগাড় করিবার আর দুটি উপায় কখন কখন অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা সদুপায় নয়। প্রথম খোসামোদ অনুনয়বিনয়। দ্বিতীয়, সাহিত্যিক গুণ্ডামি; অর্থাৎ তুমি যদি আমার কাগজে না লেখ, তাহা হইলে তোমাকে গালি দিব এবং তোমার নিন্দা কুৎসা করিব।

বিলাতেও এমন অনেক কাগজ আছে বটে যাহারা লেখকদিগকে টাকা দিতে পারে না, কিন্তু ভাল কাগজ মাত্রেই টাকা দেয়।

বিজ্ঞাপনের আয় হইতেও কাগজ চালাইবার পক্ষে সাহায্য হয়। পাশ্চাত্যদেশের অনেক কাগজের লাভ বিজ্ঞাপনের আয়ের উপরই নির্ভর করে; বিজ্ঞাপনের আয় না থাকিলে ঐ কাগজগুলি লোক্সানের ব্যাপার হইত। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গে, বড়-বড় কারবার ইংরেজের হাতে। তাহারা আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন সামান্যই দেয়। আমাদের দেশের লোকে বড় বড় কারখানা ও দোকান চালাইয়া যদি লাভবান হয় ও দেশী কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, তাহা হইলে খবরের কাগজ ও মাসিক কাগজ উভয়েরই সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহা দূরের কথা।

আপাততঃ কাগজ ভাল করিয়া চালাইবার একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা সম্পাদকের প্রকৃত লোকহিতৈষী হওয়া এবং তজ্জন্য খুব পরিশ্রম করা, এবং তদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা পাইবার যোগ্য হওয়া। যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য এবং সমাজ ধর্ম্ম সাহিত্য আদি বিষয়ে মত অনেকটা এক, বাংলাদেশে এখনও এইরূপ এক এক দল লোকের পরস্পরের সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা প্রবল ও অভ্যাস বদ্ধমূল হয় নাই। ক্রমে তাহা হইবে।

মাসিকপত্র চালাইয়া বেশী টাকা রোজগার হইবে, এরূপ আশা লইয়া কাগজ প্রতিষ্ঠিত করা কাহারও পক্ষে ঠিক্ হইবে না। আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষাদান-কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদের পারিশ্রমিক, যোগ্যতার তুলনায়, শিক্ষিত কর্ম্মীদের মধ্যে সকলের চেয়ে কম। মাসিকপত্র পরিচালনের আয় তাহার চেয়েও কম। একজন মানুষ অধ্যাপকতা করিলে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে যত বেতন পাইতে পারিত, একা দুখানা মাসিকপত্র চালাইয়াও তাহার তত আয় হয় নাই দেখা গিয়াছে।

১৩৩৬ পৌষ

অশ্লীল বহির কাটতি

সরকারের ভৃত্যদের মতে যাহা রাজদ্রোহব্যঞ্জক, এরূপ একখানা ইস্তাহারও নিষ্কৃতি পায় না, বহি ত দূরের কথা। কিন্তু অশ্লীল খবরের কাগজ ও বহির কাটতি বাড়িয়া চলিয়াছে। একখানা মাসিক কাগজকে অশ্লীলতার অপরাধে জরিমানা করা হইয়াছিল; তাহার যে-সব প্রবন্ধ অশ্লীল বলা হইয়াছিল তাহা তাই বটে কিনা, জানিনা, কারণ তাহা পড়ি নাই। কিন্তু সেই কাগজেই এবং অন্য কোন কোন কাগজেও যে-সব অশ্লীল গল্প ও উপন্যাস হইতে অতি অভদ্র কথা সমালোচনার্থ উদ্ধৃত হয় বলিয়া শুনিয়াছি, এবং অল্পস্বল্প দেখিয়াছি, সেরকম একটা গল্প বা বহির প্রকাশক বা লেখকের নামে মোকদ্দমা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। রাজদ্রোহব্যঞ্জক কোন কিছু বাজেয়াপ্ত না করিলে বিদ্রোহ হইত না নিশ্চিত; কিন্তু অশ্লীল লেখার অবাধ প্রচারে সামাজিক ক্ষতি নিঃসন্দেহ হইতেছে।

ভাষা প্রসঙ্গ

১৩২০ কার্ত্তিক

বাঙ্‌লা ভাষার আকার

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

গত কয়েকমাসের মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী "ভারতীতে" বাঙলা ভাষার আকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙলা কথাবার্ত্তার ভাষা ও ছাঁদ আরও অধিকভাবে সাহিত্যের মধ্যে প্রচলনের জন্য তিনি এমন অনেক কথা খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন যাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। স্থানে স্থানে তাঁহার অভিমতগুলি কিছু অতিরিক্ত ও অসংলগ্ন বোধ হয়, তবে তিনি যখন নিজেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি 'ওকালতি' করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ মূলে যখন তাঁহার সহিত আমাদের ঐক্য রহিয়াছে, তখন খুঁটিনাটি লইয়া বাদানুবাদ না করিয়া, আমাদের বক্তব্য নিজের ভাবেই বলিতে ইচ্ছা করি।

পণ্ডিতিভাষা ও 'আলালি' ভাষার বিবাদ বঙ্কিমচন্দ্রই একরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সেই বিবাদের ছায়া লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটা বড়রকম বিতর্ক তোলার তেমন সঙ্গত কারণ দেখি না। বঙ্কিমচন্দ্র অভিমত ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে সংস্কৃত-নিষ্পন্ন শব্দের সহিত চলিত কথার যথোপযুক্ত সংমিশ্রণে যে ভাষা, তাহাই যথার্থ সাধুভাষা। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা এই সূত্র অবলম্বনেই লিখিয়া আসিতেছেন, তবে অবশ্য বিষয়, রুচি ও যোগ্যতা ভেদে, ও ভাষার স্বাভাবিক পরিণতির

সঙ্গে, নানা শ্রেণীর রচনার বিকাশ হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষায় নূতন সুর, লয় ও মূর্চ্ছনা দিয়াছেন, এবং কত বিচিত্র শিল্পসম্পদে উহাকে ভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মূল কাঠামো এখনও বজায় আছে। শুধু তাহাই নয়, আমাদের ধারণা, চূর্ণ ও সংহত, গম্ভীর ও সরস, সুষ্ঠু ও সতেজ, এক কথায় সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বাংশে 'কাটাল' গদ্যের যে-আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে, এবং যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দিকে অধিকতর মনোযোগী হই তাহা হইলে আজ-কালকার লেখার দু একটি যে প্রধান দোষ তাহা অনেক পরিমাণে সংশোধিত হইতে পারে।

কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে চলিত শব্দ এবং বিশেষতঃ ক্রিয়াপদগুলি লেখা উচিত কি না? আমাদের বিবেচনায় এই তর্কটি তেমন গুরুতর নয়। প্রমথ বাবু বলেন এইরূপই লেখা উচিত। কিন্তু আমরা অকুণ্ঠিতভাবে এ মতে সায় দিতে পারি না। লিখিতভাষা সকলেই বুঝে, সকলেই ব্যবহার করিতে পারে, কাহারও অভিমানে আঘাত করে না। এরূপ অবস্থায় কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ অনুসারে লিখিত ভাষার অবাধ পরিবর্ত্তন করিলে নাহক্ জবরদস্তি করা হইবে। কথিত ভাষার সহিত লিখিত ভাষার সংযোগ বেশী তফাৎ হইয়া পড়িলে, লিখিত ভাষা কৃত্রিম হইয়া পড়ে যথার্থ কথা। কিন্তু বাঙলাদেশের বারআনা লোক যখন কলিকাতার dialect ব্যবহার করে না, প্রত্যুত এমন বাঙালী বিরল নয় যাহাদের নিকট কলিকাতার dialect বাস্তবিকই কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বোধ, তখন প্রমথবাবু যে কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছেন, যেদিক দিয়াই হউক, তাহার হাত তিনি একেবারে এড়ান্ কি করিয়া?

সৌভাগ্যক্রমে বাঙলা ভাষায় উচ্চারণতত্ত্বের বিশেষ দৌরাত্ম্য নাই। আমাদের সাবধান হওয়া উচিত, আমরা স্ব-ইচ্ছায় সে উৎপাত যেন ডাকিয়া না আনি। স্বরবর্ণের দু-একটী বক্র উচ্চারণ (যেমন 'কেন'র 'এ'কার), ব্যঞ্জনবর্ণের দু-একটি জটিল উচ্চারণ (যেমন S, Z), ইহা ছাড়া আমাদের বিশেষ কিছু অভাব দেখি না। দুই চারিটি সাঙ্কেতিক চিহ্নের সাহায্যে উপস্থিত বর্ণমালার দ্বারাই সে অভাব পূরণ হইতে পারে। আমাদের ভাষায় লুপ্ত অক্ষর প্রায় নাই। অকারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হসন্ত উচ্চারণ একটা ব্যতিক্রম স্থল বটে, তবে উহার নিয়ম সোজা। যুক্ত অক্ষরের কৃত্রিম উচ্চারণও নাই বলিলেই হয়। যা' কিছু গোলযোগ রহিয়াছে চলিত বা প্রাদেশিক শব্দের বানান লইয়া, এবং বাস্তবিক ভাষার যদি কোন আশু সংস্কার আবশ্যক হইয়া থাকে, ত' সে এইখানে। হ্রস্ব, দীর্ঘ, যত্ব, ণত্বের নিয়ম সাধারণতঃ সংস্কৃত-নিষ্পন্ন পদের সম্বন্ধেই খাটে। তদ্ভিন্ন অপর সকল শব্দের বানান যত সরলভাবে হয় তাহাই বাঞ্ছনীয়, এবং সুখের বিষয় আমাদের ভাল লেখকদের ঝোঁকও সেই দিকে। যে-সকল প্রাদেশিক শব্দের বানান ব্যবহারে একরূপ বিধিবদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাদের স্বতন্ত্র কথা। তবে চলিত শব্দ ও প্রত্যয়ের বানান সম্বন্ধে কতকগুলি মূল সূত্র নির্দ্ধারিত হইলে বড় ভাল হয়। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দমালা একেবারে সংগৃহীত ও অভিধানভুক্ত হউক, এরূপ বলি না। তবে সাধারণ চলিত শব্দের ও প্রত্যয়ের গঠন ও উচ্চারণপ্রণালী বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, সাহিত্যের আদর্শে উহাদিগকে যথাযথ বানান করিবার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম থাকিলে সুবিধা হয়। সাহিত্য-পরিষৎ, অথবা সেইরূপ কোন প্রামাণ্য কেন্দ্র হইতে, যথোচিত প্রকাশ্য আলোচনার পর, যদি এইরূপ কতকগুলি সূত্র প্রচারিত হয়, এবং দেশের বিশিষ্ট সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রগুলি যদি সেগুলি মানিয়া চলেন, এবং নিজেদের প্রকাশিত রচনায় উহাদের ব্যতিক্রম ঘটিতে না দেন, তবে অচিরে সাহিত্যের মধ্যে একটা অতি আবশ্যকীয় শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে।

বহিরবয়বগত ঐক্য ভাষার একটা প্রধান জিনিস, সুতরাং ব্যাকরণের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম না থাকিলেও সাহিত্যে যে শিষ্টরীতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহার সহসা ব্যভিচার করা

উচিত নয়। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ যে পরিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেক স্থলে অশুদ্ধ। অশুদ্ধ উচ্চারণের অনুযায়ী বিকৃত বানান সাহিত্যে চালাইতে গেলে, ইষ্টের বদলে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্থল, কলিকাতা অঞ্চলে 'অ'কারান্ত শব্দ মাত্রই 'ও'কারান্ত করিয়া উচ্চারণ করা একটা রোগের মধ্যে। উহা যে প্রাদেশিকতা তাহার আর সন্দেহ নাই, এবং সাহিত্যে কখনই অনুকরণীয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং 'ভালো', 'কালো', 'খাবো', 'যাবো', এইরূপ লেখার আমরা পক্ষপাতী নহি। শুধু 'অ'কারান্তই বা বলি কেন, কলিকাতা অঞ্চলে আদিতে 'অ'কারযুক্ত ও সামান্যতঃ স্বরান্ত পদেরও নানারূপ বিকৃত উচ্চারণ দেখা যায়; যথা, 'প্রিতি' ('প্রতির' স্থানে), 'প্রিসিদ্ধ', বা 'প্রোসিদ্ধ', 'প্রোবাস', 'সত্যি', 'মিথ্যে', 'দিশী', 'বোন', 'মোন', ইত্যাদি। মিশ্র স্বরবর্ণের উচ্চারণ ত একেবারেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে; যেমন, 'দেওয়াল' বা 'দেয়াল' স্থানে 'দেল', 'দোয়াত' স্থানে 'দোত', 'ওয়ালা' স্থানে 'ওলা' ('সন্দেশওলা', 'কাপড়ওলা'), ধোঁয়া স্থানে 'ধোঁ', 'বিয়ে' 'বেহাই' (বা 'বেয়াই'), 'বেহান' (বা 'বেয়ান') স্থানে যথাক্রমে বে', 'বেই' 'বেন্' ইত্যাদি। কয়েকটি এইরূপ অপভ্রষ্ট পদ প্রমথ বাবুর রচনায়ও স্থান পাইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি; যথা, 'হয়তো', 'বোঝানো', 'হিসেব', 'বিদ্যে' (ব্যঙ্গাচ্ছলে?), 'রক্ষে'। এমন কতকগুলি কথা আছে যেগুলি 'ও'কারান্ত করিয়া বানান করা উচিত কি না সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। * সেগুলি না হয় ছাড়িয়া দিই। মোট কথা 'অ'কারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ আমরা সাধারণতঃ হসন্ত ভাবে উচ্চারণ করি। কিন্তু কোন কোন স্থলে, যেমন 'ঐ'কার কি 'ঔ'কার যুক্ত শব্দ হইলে, অথবা উপান্তে 'ত' বা যুক্ত অক্ষর থাকিলে, আমরা স্বরান্ত ভাবে উচ্চারণ করি, যেমন, 'কৃত,' 'পঠিত', 'মৌন', 'শৈল', 'ফৰ্দ্দ', ইত্যাদি। ক্রিয়াপদগুলির অবশ্য স্বরান্ত উচ্চারণই হইয়া থাকে। যেখানে স্বরান্ত উচ্চারণ হয়, কলিকাতা অঞ্চলে সেখানে 'ও'কারের টান থাকে।—অথচ সেখানে লিখিত 'ও'কার ঠিক পূরা উচ্চারণ করিলে বেয়াড়া শুনায়। অনেক সময়ই কলিকাতা অঞ্চলের এইরূপ শব্দের যে উচ্চারণ হয়, তাহা 'অ'কার এবং 'ও'কারের মাঝামাঝি রকমের একটা। এই জন্য 'অ'কাবান্ত শব্দ 'ও'কারান্ত করিয়া বানান করিয়া অনর্থক বৈষম্য সৃষ্টি করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। এইরূপ কৃত্রিম phoneticsএর উত্তম নমুনা 'মতো' ও 'কী' এই দুইটি শব্দ। সৌখীন সাহিত্যের বাজারে আজকাল ইহাদের পূরা কাট্‌তি। অথচ এইরূপ বানানের কোন সার্থকতা দেখি না। 'মত' 'অভিমত' অর্থে, বিশেষ্য শব্দ, উহার উচ্চারণও হসন্ত। 'মত' বিশেষণ অর্থে, ঐ শ্রেণীর অনেকগুলি শব্দের ন্যায় (যেমন, 'এত', 'তত', 'যত', 'কত') স্বরান্ত ভাবে উচ্চারিত হয়। ইহার উপর না-হক্ একটা 'ও'কার জুড়িয়া দিবার কি তাৎপর্য্য? কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিতে হইলে, 'মতো'-তেও ত কুলায় না, 'মোতো' লিখিতে হয়। 'কি'র স্থান ও অর্থভেদে দীর্ঘ উচ্চারণ হয় সত্য। কিন্তু উহা ত মাত্রা বা ঝোঁক বা Emphasis এর কথা। এই নিয়মে বানান পরিবর্ত্তন করিলে, অনেক স্থলেই ত হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ লিখিতে হয়। এ-সব খেয়ালের বেশী প্রাদুর্ভাব সাহিত্যের পক্ষে হিতকর নয়। উচ্চারণ উড়ন্ত, অশরীরী শক্তি, কত সূক্ষ্ম কারণে মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই জন্যই সাহিত্যে বানানের বাঁধ দেওয়া আবশ্যক। নচেৎ এমন বর্ণমালা এপর্য্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই, যাহার দ্বারা মুখের ভাষার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম টান্‌টুন্ সম্যক্‌রূপে লিখিত আকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। করিবার বিশেষ দরকার আছে বলিয়াও মনে হয় না।

এখন কথা রহিল ক্রিয়ার রূপ লইয়া। আমরা স্বীকার করি কতকগুলি লিখিত ক্রিয়াপদ কিছু বেশী

* যেমন, 'উল্টো' 'বেসুরো'। সাবেক রীতি অনুসারে লিখিলে 'উল্টা' 'বেসুরা' এইরূপ লিখিতে হয়। কিন্তু উহা সকলে না পছন্দ করিতে পারেন। এরূপ স্থলে 'উল্ট' 'বেসুর' এইরূপ লিখিয়া 'অ' কারান্ত ভাবে উচ্চারণ করিলে হানি আছে কি?

'লতান' বা লম্বা, এবং অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিবার বিশেষ আবশ্যক বোধ হয়। ভাষার গতি ক্রিয়াতে, সুতরাং ক্রিয়াগুলি 'লড়্‌বড়ে' হইলে ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ হয় না। লিখিত ভাষার একটা অভ্যস্ত লয় আছে, সেজন্য লিখিত ভাষা পড়িবার সময় এ অভাব তত ধরা পড়ে না, কিন্তু যখন আমরা বক্তৃতা করিতে উঠি, তখন উহা সহজে ধরা পড়ে। এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙলায় বক্তৃতার প্রসারের ও কথাবার্ত্তার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে, সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াগুলি লিখিত ভাষায় ক্রমশঃ প্রবেশাধিকার লাভ করিবে। তবে এ সম্বন্ধে আমরা রক্ষণশীল নীতির কিছু পক্ষপাতী। ক্রিয়া-পদগুলি ভাষার currency বা চলিত মুদ্রা। ইহার দ্বারাই দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, বাঙলার সকল প্রদেশের মধ্যেই লিখিত ভাষা সহজবোধ্য ও সুখসেব্য হইয়াছে। ভাষার currency ঠিক রাখিতে পারিলে, ভাষার উপর 'আর্য্য আক্রমণ'ই হউক বা 'মুসলমান আক্রমণ'ই হউক, কিছুতেই তেমন ভীত হইবার কারণ দেখি না। কারণ যে-সকল শব্দই বাঙলা ভাষায় ঢোকাইবার চেষ্টা করা হউক না কেন, যেগুলি বাঙলার প্রকৃতির সহিত মিশ্ খাইবে, সেইগুলিই থাকিয়া যাইবে। অপরগুলি কৃত্রিম উত্তেজনার অবসানে উপযুক্ত রসের অভাবে মরিয়া যাইবে। বর্ত্তমানে ক্রিয়ার রূপগুলি বাঙলা দেশের বিভিন্ন অংশের উচ্চারণ-বৈষম্যের মধ্যে কতকটা মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতবাং-সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার রূপগুলি যাহাতে কতকটা সেই স্থান রক্ষা করিতে পারে এবং কালে সকলের গ্রাহ্য হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আমাদের যাত্রা, কথকতায় (থিয়েটারের কথা ধরিব না. কেননা উহা খাঁটি কলিকাতার জিনিস), এক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত ক্রিয়ার ব্যবহার আছে, যাহা খুব দীর্ঘও নয় অথচ খুব হ্রস্বও নয়। সেইরূপ একটা আদর্শ আমাদের সাম্‌নে থাকিলে ভাল হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত ক্রিয়ার রূপ লিখিত ভাষার অভ্যস্ত লয়ের উপর অনেক দিন আধিপত্য করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং, আপাততঃ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব ক্রিয়ার উভয়বিধ আকারই প্রচলিত থাকুক, ইহার বেশী বোধ হয় আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। লেখকের রুচি ও প্রয়োজন ভেদে যখন যেমন ভাল মনে করিবেন, ব্যবহার করিতে পারিবেন। এইরূপ স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় একটা সামঞ্জস্য হইয়া কালে একপ্রকার আকারই অবশ্য প্রবল ও গ্রাহ্য হইবে। তবে যখন আমরা সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা উচিত মনে করি, তখন যেন তাহার মধ্যে অনাবশ্যক গ্রাম্যতা না ঢোকাই। এ সম্বন্ধে কতকগুলি সুপরিজ্ঞাত নিয়ম * থাকিলে ভাল হয়। প্রমথ বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে কলিকাতা অঞ্চলের 'উম্'-ভাগান্ত ক্রিয়ার রূপ কোন কালে দেশময় গ্রাহ্য হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ তিনি উহা অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে কি কিছু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ

* আমরা ব্যাকরণের সূত্র প্রণয়নের স্পর্দ্ধা রাখি না, তবে সং-ক্রিয়া রূপের একটা সাধারণ খস্‌ড়া দেওয়া যাইতে পারে—

১। অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি—

'ইয়া' স্থানে 'এ' বা 'য়ে'—ক'রে ('কোরে' নয়), খেয়ে। 'অ'কারান্ত ক্রিয়া একারান্ত। ইতে স্থানে তে—'ক'র্‌তে (কোর্‌তে নয়), খেতে, হ'তে ('হোতে' নয়)। 'ইলে' স্থানে 'লে'—ক'র্‌লে (কোর্‌লে নয়), ইঃ।

২। সমাপিকা ক্রিয়া—বর্ত্তমান-কাল—'ইতেছে' 'ইতেছ' 'ইতেছি' প্রভৃতি বিভক্তির 'ই' বা 'ইতে'-র লোপ	কর্‌তেছে (পূর্ব্ববঙ্গ), কর্‌ছে (পশ্চিম বঙ্গ), ইঃ। স্বরান্ত ক্রিয়া, হইলে বিভক্তির 'ছ'-র স্থানে 'চ্ছ'; খাচ্ছে, দিচ্ছি ('খাচ্চে', 'দিচ্চি', নয়)। অন্যথা, খেতেছে যেতেছে, ইঃ (পূ, ব)।

পায় না?

লিখিত ভাষার যে সংকীর্ণতা বা আড়ষ্টভাবের কথা প্রমথ বাবু বলিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ যে মুখের ভাষার সহিত উহার কম সংযোগ এমন নয়, আর একটা গুরুতর কারণ এই যে আমাদের সভ্য সমাজের মুখের ভাষাই বড় দুর্ব্বল। আমাদের কথাবার্ত্তা শিথিল, বিচ্ছিন্ন, এলোমেলো, এবং নানাবিধ ইংরাজির বুক্‌নিতে কণ্টকিত। একজন ভদ্র ইংরাজ কি হিন্দুস্থানীর কথাবার্ত্তার সহিত একজন সমান অবস্থার বাঙ্গালীর কথাবার্ত্তা তুলনা করিলেই আমরা এ প্রভেদ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। যখন প্রকাশ্যসভায় মুখোমুখি করিয়া কিছু বলিতে হয়, তখনই আমাদের এ দারিদ্র্য সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের ভাষার সমস্ত অভাব ও দোষ একমাত্র সাধুভাষার উপর চাপান সঙ্গত নয়। আবার চলিত ভাষার ব্যবহারের মধ্যেও ঢের মেকী চলে। ভাষা ক্ষিপ্র ও চটুল হইলেই জোরাল ও অর্থবোধক হয় না, এবং আস্ফালনপরায়ণ হইলেই স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় না। আমরা যে কথোপকথনের ছাঁদের লেখার সময় সময় এত বড়াই করি, অনেক সময়ই কি উহা ইংরাজদিগের জোর করিয়া কথা বলার যে একটা ধরণ আছে, উহার ক্ষীণ ও কষ্টকর প্রতিধ্বনি নয়? সুতরাং এ দিকেও কোন কৃত্রিমতা না আসিয়া পড়ে, সে বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত।

আর একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। যেমন চলিত শব্দ সাধু শব্দের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসাইতে হইবে, সেইরূপ সাধু শব্দগুলির আরও স্বচ্ছন্দ ব্যবহার দরকার। ব্যবহারের অভাবে আমরা সাধু শব্দগুলিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সাধু ভাষার যে আড়ষ্টভাব ইহাও তাহার এক কারণ। সাধারণ কথাবার্ত্তায় সাধু শব্দ ব্যবহার করা আমরা জেঠামি মনে করি। ইহা নিতান্ত ভুল। শব্দ ব্যবহারেই উজ্জ্বল ও মোলায়েম হইয়া উঠে। প্রমথ বাবু 'সাহিত্যিক' শব্দটি বিশেষণ অর্থে ব্যবহার করিতে নারাজ। কিন্তু যদি সমান অর্থবোধক ঐরূপ একটি শব্দ সহজে না মিলে, তবে উহাই সাহসের সহিত

৩। সমাপিকা ক্রিয়া—অতীতকাল (১) 'ইল', 'ইলে', 'ইলাম' বিভক্তির 'ইকারের লোপ' এবং 'অ'কারান্ত ধাতু 'এ'কারান্ত।	কর্‌ল, খেল ইঃ। কর্‌লাম, কিন্তু 'কোরলাম' বা— 'কোরলুম' নয়।
(২) 'ইয়াছে', 'ইয়াছ', 'ইয়াছি' এই-সকল বিভক্তির স্থানে 'এছে', 'এছ', 'এছি' (ক্রিয়া স্বরান্ত হইলে 'য়ছে' 'য়েছ' 'য়েছি'।)	করেছে, খেয়েছে ইঃ। 'করেচে', 'খেয়েচে' নয়।
(৩) 'ইয়াছিল', ইঃ স্থানে 'এছিল' বা 'য়েছিল'	ক'রেছিল খেয়েছিল ইঃ।
(৪) 'ইতেছিল' প্রভৃতির স্থানে 'ই' বা 'ইতে'র লোপ—	কর্‌তেছিল বা কর্‌ছিল, ইঃ। কিন্তু 'কচ্ছিল' নয়। স্বরান্ত ক্রিয়া—খেতেছিল বা খাচ্ছিল, দিচ্ছিল. ইঃ।
৪। সমাপিকা ক্রিয়া ভবিষ্যৎকাল 'ইব'-র 'ই'র লোপ	ক'র্‌ব, খাব ('কোরবো', 'খাবো' নয়)।

ব্যবহার করা উচিত। ব্যবহার করিতে করিতেই উহা কানে আর তত বেসুর লাগিবে না। এই যে ইংরেজিতে নিত্য নূতন নূতন অভিজ্ঞতা, নূতন নূতন জীবনের অবস্থার সহিত পরিচয়ের ফলে, রাশি রাশি নূতন শব্দ উদ্ভাবিত ও আহৃত হইতেছে. উহার সকলগুলিই কি ব্যাকরণসঙ্গত না সকলগুলিই সাধারণ ইংরাজের জিহ্বা, কর্ণের সহিত পূর্ব্ব হইতে আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসে? অথচ ব্যবহারের গুণেই সে সমুদয় সাহিত্যের সহিত অবাধে মিলিয়া যায়। লোকে কথায় বলে, ব্যবহারের গুণে পরও আপন হয়। ভাষার সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। এইরূপ হয় না বলিয়াই আমাদের বৈজ্ঞানিক শব্দমালা পোষাকি কাপড়ের মত বিশেষজ্ঞের সিন্দুকে তোলা থাকে, এবং অব্যবহারে পোকায় কাটে। মূল কথা, আমাদের ভাষার প্রধান দরকার, উহার আভ্যন্তরীণ পুষ্টি। আমাদের প্রধান দোষ, কৃত্রিম সৌষ্ঠব-প্রয়াস ও বাহুল্য বচসা। আমাদের লেখায়, অনেক সময়, অর্থ কথার ভিড়ে পথ দেখিতে পায় না। সত্য কথা পরিমিত ভাষায় বলার জন্য যে শিক্ষা, সংস্কার ও (প্রমথ বাবু মাপ করিবেন) 'সাহিত্যিক' উপলব্ধির প্রয়োজন সে দিকে আমাদের তেমন আস্থা লক্ষিত হয় না। ভাষা, অন্ততঃ গদ্যভাষা, যেরূপ হওয়া উচিত, প্রায় তাহা হয় না। অর্থাৎ, উহা সাক্ষাৎ প্রয়োজন-মুখে সজোরে নিজেব খাত কাটিয়া লয় না। আমাদের ভাষা, আঁকিয়া বাঁকিয়া, বাধা বিঘ্ন এড়াইয়া, সহজ অথচ ঘুর পথ খুঁজিয়া লইতে চায়। প্রমথ বাবু একস্থানে বলিয়াছেন—"আসল সর্ব্বনেশে ভাষা হচ্ছে 'চন্দ্রাহত' সাহিত্যিকরা ইংরাজি বাক্যের যেমন তেমন করে অনুবাদ করে যে খিচুড়ি ভাষা সৃষ্টি করেছে, সে ভাষা।" * অবশ্য কোন শ্রেণীর রচনা উল্লিখিত-রূপ 'ত্রিদোষ'-আশ্রিত হইলে, তাহার উদ্ধারের আশা বড় অল্প। কিন্তু সাহিত্যিক হইলেই 'চন্দ্রাহত' হইবে এমন নয়, অনুবাদেরও ভাল মন্দ আছে, রান্না ভাল হইলে 'খিচুড়ি'ও সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য। অনুবাদের কথা যদি আসিল, তবে একথা বলিতে হইবে, যে, বর্ত্তমান অবস্থায় অনুবাদ—ভাষা, ভাব ও আদর্শের অনুবাদ—আমাদের একটা প্রধান সম্বল। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সকলের কৃতিত্ব এক বা অপর শ্রেণীর অনুবাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। এ অনুবাদ যে শুধু ইংরাজি ও সংস্কৃতে নিবদ্ধ থাকিবে এমন নয়। আমাদের উপচয়নের ক্ষেত্র যথাসম্ভব প্রশস্ত করিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা সমূহের, বিশেষ হিন্দী ও উর্দ্দুর সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক।

৫। অনুজ্ঞা (ভবিষ্যৎ) 'ইও'-র 'ই'-র লোপে, 'অ'কারান্ত-ধাতু 'এ'কারান্ত।	করিও, ধরিও, খাইও স্থানে ক'রো, ধ'রো, খেয়ো। এ-ক্ষেত্রে 'কোরো', 'ধোরো' এরূপ লেখাও সঙ্গত কিনা বিবেচনার স্থল।

ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে মূল পরিবর্ত্তন অসমাপিকা বিভক্তির 'ই'-কার লইয়া। কোথায় 'ই'-কারের লোপ, কোথায় রূপান্তর হয়। আর সব পরিবর্ত্তন আনুসঙ্গিক ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য। সমাপিকা ক্রিয়াগুলি প্রায়ই অসমাপিকা ক্রিয়া ও 'আছ্' ধাতু লইয়া গঠিত, সুতরাং একই নিয়ম অনুসরণ করে।

আদিতে 'অ'কারযুক্ত ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত আকারে প্রায়ই 'অ'কারের একরূপ 'এড়ান' উচ্চারণ হয়, তাহা 'অ', 'ও', 'ই' লইয়া মিশ্রিত। এরূপ স্থলে 'অ'-কারের পরে (') এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের যে প্রথা আছে তাহা মন্দ না; যেমন ক'রে, ধ'রে ইত্যাদি।

* বিবুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন যে খিচুড়ি ভাষার যদি নমুনার আবশ্যক হয়, ত উপরিউদ্ধৃত বাক্যটি তাহাই। কিন্তু আমরা বাস্তবিক মনে করি যে এইরূপ সাহস করিয়া লিখিতে লিখিতেই কথাবার্ত্তায় সহজ সুরটি সাহিত্যের মধ্যে ধরিতে পারিব।

শেষোক্ত কারণে প্রমথ বাবুর কথিত 'মুসলমান আক্রমণ' হইতে একেবারে যে সুফলের অপ্রত্যাশা করি এমন নয়। যিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে উহা অনেক সময় কত সুন্দরভাবে, কথায় কথায় তর্জ্জমা হইতে পারে। শুধু তাহাই নয়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য উপনিষদ অনুবাদ করিয়াছেন, সংস্কৃত কাব্যও অনুবাদ করিয়াছেন। এমন কি বৈষ্ণব কাব্যও অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ এই-সকল রচনা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দ্বারা এমন ভাবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে যে উহা বাঙ্গালা ভাষার একান্ত নিজস্ব জিনিস। অনুবাদের কথায় কেহ এরূপ ভাবিবেন না যে আমরা প্রতিভার অগৌরব করিতেছি। কেননা তাহা হইলে এ প্রসঙ্গে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম করিতাম না। নব্য বাঙলার লেখকদের মধ্যে যদি কাহারও প্রতিভা অবিসম্বাদীরূপে কীর্ত্তিত হইতে পারে ত এই তিন জনের। আমাদের বক্তব্য এই যে বর্ত্তমান অবস্থায় নানা ভাষা হইতে আমাদিগকে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। তবে বাঙলা ভাষাতে লেখকগণের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ রীতি ও শিষ্ট আদর্শের প্রতি যেন বীতশ্রদ্ধ না হন্। কেননা উহারা শিল্পের ন্যায় সাহিত্যের প্রাণ। যদি শিষ্টরীতির যথোচিত মর্য্যাদা না থাকিত তাহা হইলে ইংরাজি ভাষা, পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া, ও নানারূপ প্রাদেশিকতা, অপভাষা ও উচ্চারণবৈষম্য সত্ত্বেও, কখন সাহিত্যের এমন একটা অখণ্ড আদর্শ বজায় রাখিতে পারিত না—সুতরাং যদি আমরা ২৫।২৬টি জিলার মধ্যে লিখিত ভাষার একটা সমন্বয় স্থাপিত করিতে না পারি, এবং যাহার যাহা ইচ্ছা সেইরূপভাবে লিখি, তবে তাহা একটা বিশেষ পৌরুষের কথা নহে। ভাষার শৈশবে প্রতিভাশালী লেখক বা dialect বিশেষের অনেকটা আধিপত্য খাটিতে পারে। কিন্তু ভাষা একরূপ গড়িয়া উঠিলে, ততটা স্বাধীনতা থাকে না, থাকা বোধ হয় উচিতও নয়। অবশ্য যখন আমরা বাঙলা ভাষার শিষ্ট আদর্শ রক্ষা করার কথা বলিতেছি, তখন কেহ যেন আমাদের কথা ভুল না বুঝেন। আমরা বাঙলা ভাষাকে 'বাবু' করিতে চাহি না, ইহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে প্রমথ বাবুর সহিত আমাদের সম্পূর্ণ এক মত। আমাদের বিশ্বাস আমরা বাঙলা সাহিত্যকে প্রাত্যহিক সহস্র প্রয়োজনের সহিত ভাল করিয়া মিলাইতে পারি নাই। জীবনে বিচিত্র কর্ম্মশালার অনেক প্রকোষ্ঠের দ্বারই আমাদের সাহিত্যের নিকট রুদ্ধ। একদিকে যেমন দর্শন, বিজ্ঞান, সুকুমার সাহিত্য, রাজনীতি ও সভ্য জগতের নানা উচ্চতর ব্যবসায়ের নিমিত্ত সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই হাট, বাজার, মাঠ, পথ, ঘাট, আসর, আখ্ড়া, অন্তঃপুর, এক কথায় আমাদের সনাতন দেশীয় জীবনের সহস্র আচার ব্যবহার ও মেলামেশার মধ্য হইতে সজীব, চলিত ভাষার বীজ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে হইবে। সুখের বিষয় এই যে, সাহিত্যের শিষ্টরীতি বজায় রাখিলে, বাঙলার সকল প্রদেশ হইতেই, শুধু শব্দ নয়, অনেক সজীব idiom, সংগ্রহ করা যাইতে পারে, এবং তাহাই হওয়া উচিত। আমাদের চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা শুধু কলিকাতা অঞ্চলের চলিত ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকিবে এরূপ কোন কথাই নাই।

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা বলিয়া সাহিত্যের কোন সোনার কাঠি, রূপার কাঠি নাই। ইংরাজির দৃষ্টান্ত দেখিলেই বুঝা যায়, মানসিক প্রকৃতির রুচি ও বিষয় অনুসারে, কোন লেখক সাধু শব্দ বেশী প্রয়োগ করেন, কোন লেখক চলিত শব্দ বেশী প্রয়োগ করেন। কৃতী লেখকের হাতে উভয়বিধ রচনাই সজীব হইয়া উঠে। মূলে দুইটি জিনিসের প্রধান আবশ্যক। লিখিবার মত একটা বিষয় থাকা চাই ও লিখিবার একটা নিষ্ঠা থাকা চাই। এই দুটি জিনিস থাকিলে, শিক্ষিত লেখক যেরূপ ভাষায়ই লিখুন না কেন, তাহা কখনই অকিঞ্চিৎকর হইবে না। তবে ভাষায় যথার্থ ভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠার যে মূল মন্ত্র, তাহা স্বতন্ত্র। উহার নাম প্রতিভা। নব্য বঙ্গভাষায়

দুই চারিটি প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। অবশ্য ভবিষ্যতে আরও হইবে। আমাদের সাধারণের কর্ত্তব্য যে ভবিষ্যতের প্রতিভাবান লেখকের জন্য আমরা ভাষার ক্ষেত্র প্রশস্ত ও উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারি। কাল পূর্ণ হইলে যখন সেইরূপ প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইবে, তখন দেখিতে পাইব যে তাঁহার হস্তে এই আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গভাষা পুরাণ-বর্ণিত মন্ত্রপূত দৈবাস্ত্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবে, এবং তাঁহার লিখিত বা কথিত বাণী, সাধুচলিত শব্দ নির্ব্বিশেষে, শ্বেত পক্ষযুক্ত নিশিত সায়কের ন্যায় বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিবে।

১৩২২ পৌষ
সাধু ভাষা ও কথিত ভাষা।

আমরা কথাবার্ত্তায় যেরূপ ভাষা ব্যবহার করি, সাহিত্যের ভাষাও তদ্রূপ হওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন দেশেরই সাহিত্যিক ভাষা বোধ হয় ঠিক্ কথাবার্ত্তার ভাষার মত নয়। কিন্তু বাস্তব জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগ ও সাদৃশ্য রক্ষা করিতে হইলে লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে বেশী প্রভেদ রাখাও চলে না। বাংলায় এই পার্থক্য বড় বেশী। ইহা কমান দরকার। কিন্তু কথিত ভাষা কতকটা চালাইতে গেলেই কথা উঠে, "বাংলা দেশের সর্ব্বত্র কথিত ভাষা ত এক নয়; সুতরাং কোন্ জায়গার কথিত ভাষা চালান যাইবে?" ইহার সোজা উত্তর এই যে লেখক নিজে যে ভাষায় কথা বলেন তিনি তাহাই ব্যবহার করিবেন; কারণ তাহাই তাঁহার পক্ষে সকলের চেয়ে সোজা ও স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে এই আপত্তি হইবে যে লেখক যদি কলিকাতার লোক হন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ভাষা বাঁকুড়া মানভূম, রংপুর, বগুড়া, কিম্বা শ্রীহট্ট চট্টগ্রামের লোকেরা বুঝিবে না। অতএব তাঁহার পক্ষে নিজের কথিতভাষা ব্যবহার করা "জবরদস্তী" হইবে। কিন্তু ইহাতে জবরদস্তী কোথায়? আমি যাহা লিখিব, তাহা পড়িয়া তুমি যদি আনন্দ পাও, উপকার পাও, তাহা হইলে পড়িও; নতুবা পড়িও না। সাধুভাষায় লিখিত বহিও ত বিনা আয়াসে বুঝা যায় না; অভিধান দেখিতে হয়। কথিত ভাষা বুঝিবার জন্যও লোকে সেইরূপ কষ্টস্বীকার করিবে, তাহার অভিধান প্রস্তুত করিবে, যদি তাহাতে লিখিত জিনিষ শ্রেষ্ঠ মূল্যবান্ সাহিত্য হয়। প্রত্যুত্তরে "সাধুভাষার" পক্ষপাতী বলিবেন, "এত হাঙ্গামা করিয়া লাভ কি বাপু? সাধুভাষাতেই লেখ না কেন?" তাহার উত্তর বোধ হয় এই, "আনন্দে সাহিত্যের জন্ম। যে ভাষা ব্যবহারে আমার প্রাণটা সকলের চেয়ে বেশী খোলে, যাহাতে সকলের চেয়ে ভাল করিয়া কথার স্রোত চলে, ও কলম সরে, আমি তাহাই ব্যবহার করিব।"

বাঁকুড়াবাসী প্রবাসী-সম্পাদকের বাঁকুড়ার ভাষা চালাইবার মত সাহিত্যিক প্রতিভা ও শক্তি নাই, কলিকাতার বা অন্য কোন জায়গার ভাষা জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক নকল করিবারও প্রবৃত্তি নাই; অজ্ঞাতসারে যাহা অনুকৃত হয়, তাহার

উপর হাত নাই। কিন্তু কথিত ভাষা ব্যবহার করি বা না করি, উহার যে উপযোগিতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আটপৌরো ধুতিচাদরেও বিদ্যাসাগরের মূল্য কমিত না; খুব সম্মান হইত; কিন্তু ভূও বড়মানুষদের পোষাকের ভড়ং না হইলে চলে না। তেমনি যাহার বলিবার কিছু আছে, তাহার লেখা কথিত ভাষাতেও আদর পায়; কিন্তু যাহার বলিবার জিনিযটা মূল্যহীন, তাহাকে ভাষার আড়ম্বরের আশ্রয় লইতে হয়। অবশ্য সাধু ভাষাতেও খুব সারবান্ আনন্দপ্রদ সাহিত্য রচিত হইয়াছে ও হইবে। কথিত ভাষায় ভাব ও চিন্তার দৈন্য লুকান কঠিন, সাধুভাষায় তত কঠিন নয়, ইহাই আমাদের বক্তব্য।

১৩২২ বৈশাখ

সাহেবী বাঙ্গালা

সাহেবী বাঙ্গালা সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাব যাহা, মোটের উপর তাহাতে আপত্তি করিবার মত কিছু দেখিতেছি না। কিন্তু এ বিষয়ে "শুচিবায়ু" গ্রস্ত হওয়াও আমরা ভাল মনে করি না। আমাদের দেশের অনেকে সাহেবী পোষাক ভাল বাসেন না; কিন্তু তাঁহাদের আপত্তির দৌড় সাহেবী টুপি, বুক-খোলা কোট এবং নেক-টাই পর্য্যন্ত। ইংরেজদের নিকট হইতে ধার-করা কামিজ, ইংরেজী কেতার পা-জামা ও জুতা এবং গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা কোট, সাহেবী পোষাকের বিরোধীরাও অনেকে ব্যবহার করেন। ভাষা সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে, যে, লিখিবার বা বলিবার সময় অকারণ কতকগুলা ইংরেজী শব্দ বাংলার সহিত মিশান ত উচিত নয়ই, ইংরেজী শব্দের ঠিক্ ঠিক্ বাংলা প্রতিশব্দ দিয়া বাক্য রচনা করাও উচিত নয়। কিন্তু ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী সাহিত্যের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মেশামিশি হওয়ায় অনেক পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তা আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। সেগুলি প্রকাশ করিতে গেলে, আধুনিক বাঙ্গালী যেমন আর ধুতি ও উত্তরীয়তে সর্ব্বত্র কাজ চালাইতে পারেন না, কেহ বা মুসলমানী কিম্বা আধ-মুসলমানী চোগা চাপকান শাম্‌লা পাগড়ী, কেহ বা পুরা সাহেবী পোষাক, কেহ বা কতকটা সাহেবী পোষাক পরেন, তেমনই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাও কতকটা ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়া পড়ে;—যেমন মুসলমানী আমলের বাঙ্গালায় এবং এখনকার আদালতের বাঙ্গালায় আরবী ফারসীর ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী লেখকদের একচেটিয়া ব্যাধি-বিশেষ বলিয়া মনে করিতে পারি না। আধুনিক যে কোন দেশের সাহিত্যে বিদেশী সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রভাবের এইরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। চসারের কাব্যে একই কথা একবার এংলো-সাক্সন ও আবার ফরাসী শব্দ দ্বারা বলা হইয়াছে; পদ-যোজনার রীতি অনেক স্থানে ফরাসী। অনেক স্থানে ভাষা এমন যে বোধ হয় যেন দেহটা ইংরেজের আত্মাটা ফরাসীর। এই জন্য আর্ল্ বলিয়াছেন—

"The French language has not only

left indelible traces on the English, but it has also imparted to it some leading characteristics."

চসারের ফরাসী ধবণ ধারণ, ফরাসী ভাব সত্ত্বেও তিনি ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আমরা যখন ছেলেবেলায় মিল্‌টন পড়িতাম তখন উহার টীকার মধ্যে কতই না গ্রীক লাটিন ও ইহুদীভাষার অনুকরণের দৃষ্টান্ত মুখস্থ করিতে হইয়াছিল। টীকাকার কোন্‌টিকে Hellenism, কোন্‌টিকে Latinism, কোন্‌টিকে Hebraism বলিয়াছেন, তাহা মনে করিয়া রাখিতে হইত। কিন্তু মিল্‌টনের লেখায় এইরূপ বিদেশী সাহিত্যের স্পষ্ট ছাপ পড়াতেও কেহ মিল্‌টনকে অপকৃষ্ট লেখক বলে না, বা ঐসব লাটিনিজ্‌ম্ প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করে না। আরও অনেক শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকের রচনায় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের ছাপ (Gallicism) এবং জার্ম্মেন ভাষা ও সাহিত্যের ছাপ (Germanism) লক্ষিত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, কার্লাইল তাঁহার গ্রন্থাবলীতে বহুস্থানে শব্দ ইংরেজীই ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শব্দযোজনার রীতি জার্ম্মেন, ভাব ও চিন্তা জার্ম্মেন: ঠিক্ যেন এক্‌জন জার্ম্মেন ইংরেজী শব্দের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কার্লাইলের এই যে জার্ম্মেনীভূত ভাষা, ইহা সত্ত্বেও তিনি আমেরিকান ও ইংরেজদের নিকট একজন খুব বড় লেখক বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজী-জানা বিদেশীরাও তাঁহাকে খুব সম্মান করেন। ভাষার ও সাহিত্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করা খুব উচিত। কিন্তু বাড়াবাড়ি কোন বিষয়েই ভাল নয়। সাহেবীপোষাক-পরা বাঙ্গালী মাত্রেই যেমন দেশদ্রোহী বা দুরাত্মা নহেন, ধুতি-ও উত্তরীয়-পরিহিত বাঙ্গালী মাত্রেই যেমন দেশভক্ত ও পুণ্যাত্মা নহেন; তেমনি কাহারও রচনায় ইংরেজীর গন্ধ পাওয়া গেলেই তিনি অপকৃষ্ট লেখক হইয়া যান না, এবং কাহারও রচনায় বিদেশী সাহিত্যের বিন্দুমাত্রও প্রভাব লক্ষিত না হইলেই তিনি "সাহিত্যসম্রাট", "সাহিত্য-সুলতান", বা "সাহিত্য-খলিফা" হইয়া যান না। কেবল খোসা বা বাহিরের আবরণটা দ্বারা বিচার না করিয়া যেমন মানুষটার ভিতরে কি জিনিষ আছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য, তেমনি লেখকদেরও কেবলমাত্র ভাষা দ্বারাই বিচার করিলে অবিচার হয়। তাঁহাদের লেখার মধ্যে মহৎ চিন্তা, মহৎ ভাব, মহৎ আদর্শ, জ্ঞান, রস, সৌন্দর্য্য, আছে কি না-আছে, তাহা দেখা নিতান্ত অনাবশ্যক না হইতেও পারে।

"রচনার বই"

শাস্ত্রীমহাশয় বলেন :—

বাঙ্গালায় রচনার বই বড় কম, নাই বলিলেও হয়। যে কখানি সেকেলে বই আছে, প্রায়ই তর্জ্জমা। বাঙ্গালী নানা বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া হেল্প সাহেবের মত বা এডিসন সাহেবের মত রচনা লিখিতেছে—এ ত দেখা যায় না। যাহা কিছু আছে এক কমলাকান্তের দপ্তরে—অতুল্য অমূল্য। আর ত দেখি না। আমাদের দেশের লোক এ

পথটা কেন ছাড়িয়া দিতেছে, বুঝিতে পারি না।

আমাদের বোধ হয় প্রবন্ধের "সেকেলে বই"গুলির উপর শাস্ত্রী মহাশয় অবিচার করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর বিস্তর প্রবন্ধ আছে। সে গুলি ত তর্জ্জমা নয়। ভূদেববাবুর সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, এইসকল চিন্তাপূর্ণ বহিও ত তর্জ্জমা নয়। শাস্ত্রী মহাশয় "সাহেবী" বাঙ্গালার বিরোধী। সেইজন বলিতে সাহস হইতেছে যে হেল্পস্ "সাহেব" বা এডিসন "সাহেব"দিগের ধাঁচের রচনা না হইলেও বাংলায় ভাল ভাল সন্দর্ভ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরে "অতুল্য অমূল্য" জিনিষ থাকিতে পারে। কিন্তু পরিহাস ও তৎসদৃশ রসে ভরা অন্য ধরণের ভাল রচনা বাংলায় আরো আছে। কোন গ্রন্থ বা রচনাকে ভাল হইতে হইলে স্বদেশী বা বিদেশী আর-কোনটির মত হইতে হইবে, এরূপ মনে হয় না।

জীবিত লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করিতে সাহস হয় না; যদিও তাঁহার অনেক গদ্য রচনা খুব মূল্যবান্, অনুবাদেও সমজ্‌দার বিদেশীরাও তাহার মূল্য বুঝিয়াছে। কেননা, বঙ্গ দেশে রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। এইজন্য তাঁহাকে বাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও কি ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা লিখেন নাই?

১৩২৩ পৌষ

বাঁকুড়ার কথিত ভাষা।

ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমরা জানি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের লোকেরা 'কৃ' ধাতু খুব ব্যবহার করিয়া থাকে। 'খাওয়া হইল' স্থলে তাহারা 'খাওয়া করা হইল' বলিবে।" আমরা বাঁকুড়ার মানুষ, সেইখানেই আমাদের জন্ম ও বসবাস। আমরা কৃ ধাতু বেশী ব্যবহার করি বটে। যেখানে পুব্যালোকে বলিবে "আনা", আমরা কেহ কেহ সেখানে বলি, "আনা করা"। কিন্তু "খাওয়া করা হইল'টা ভূতপূর্ব্ব জজ বাহাদুরের সৃষ্টি। ওরূপ কথা আমরা বলি না। "ভারতী"র কোন কোন লেখিকাও মধ্যে মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত বাঁক্‌ড়ী কথার উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। বাঁকুড়ার কথিত ভাষার জন্য আমরা একটু লজ্জিত নহি। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে অদ্ভুত কথা চাপাইলে জংলী বাঁক্‌ড়ী মনুষ্য আমরা, আমাদেরও হাসি পায়।

১৩৩৩ অগ্রহায়ণ

বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলস্বরূপ ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক বৃহৎপুস্তকখানি সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের প্রচলিত নীতিসমূহ যথাযথ বজায় রাখিয়া বাঙলাভাষায় ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (Historical Grammar) ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। বাঙলাভাষা বিষয়ক গভীর তত্ত্বালোচনা ছাড়াও এই পুস্তকে অধ্যাপক মহাশয় হিন্দি, গুজরাঠী, মারাঠী, আসামী, ওড়িয়া এমনকি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাসমূহ লইয়াও প্রভূত আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী ব্যতীত উক্ত ভাষাশিক্ষার্থীরাও এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট উপকার পাইবেন। বিভিন্ন ভাষা লইয়া তুলনামূলক আলোচনা দেওয়াতে পুস্তকখানির মূল্য ও গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ বাঙলা ভাষা ও বাঙলা ব্যাকরণ লইয়া এমন চমৎকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলার জনসাধারণের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

সুনীতি-বাবুর বইখানি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হইল। ঠিক এক শতাব্দী পূর্ব্বে ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় লিখিত খাঁটি বাঙলা ভাষার প্রথম প্রকৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার পুস্তকে সম্ভ্রম নিবেদন করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভারতের নব যুগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজীতে ১৮২৬ সালে আপনার মাতৃভাষার ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মাতৃভাষাতেই উক্ত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। বাঙলা ভাষা বলিতে কি বুঝায় তাহার স্পষ্ট ধারণা তাঁহার ছিল।"

সুনীতি-বাবুর পুস্তক হইতে আমরা বাঙলা ভাষার উৎপত্তি বিষয়ক অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইতেছি; বহুদিন অবধি আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙলা ভাষা, আধুনিক ভাষা—ইহার ইতিহাস খুব অধিক দিনের নহে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবার লাইব্রেরীতে যে চর্য্যাপদ, বৌদ্ধগান ও দোহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও বাঙলা ভাষা প্রচলিত ছিল। ইহা আমাদের যথেষ্ট গর্ব্বের বিষয়। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙলা ভাষার উৎপত্তি হইতে ক্রমবিকাশের যে ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে অনেক নূতন কথা আছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণ এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। বিবিধ শব্দের কি ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, প্রাচীন শব্দ রূপান্তরিত হইতে হইতে কি ভাবে বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে অধ্যাপক মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। শব্দের এই ক্রমবিকাশের মধ্যে বাঙলার সামাজিক জীবনের অনেক রহস্যও উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বাঙলা ভাষার পুঁথির (দোহার ও পদাবলীর) সংখ্যা করা দুরূহ; ইহার অনেকগুলিই কালপ্রভাবে লোপ পাইয়াছে; কতগুলি যে অযত্নে রক্ষিত অবস্থায় কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে তাহার

ইয়ত্তা নাই। এখনও যে কত পুঁথি পারিবারিক পেঁটরার মধ্যে রক্ষিত আছে তাহাও বলা যায় না। সাধারণ্যে প্রকাশিত ও সাধারণ পাঠাগার ইত্যাদিতে প্রাপ্তব্য পুঁথির প্রায় সবগুলিরই সাহায্য সুনীতি-বাবু লইয়াছেন। যে-কোনো ভাষার জাতি ও কুল নির্ণয় অতীব দুরূহ কার্য্য, বাঙলার মত ব্যাকরণহীন ভাষার ত আরো দুরূহ। সুনীতি-বাবু এক অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।

ইণ্ডো-ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্বে অগ্রণী স্যার জর্জ গ্রিয়ার্‌সন্ সাহেব এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

"বাঙলা ভাষার অন্তর্নিহিত সম্পদের জন্যই বাংলা ভাষার আলোচনা ও গবেষণা করিবার সময় আসিয়াছে। অনেক শতাব্দীর সযত্ন-রক্ষিত-সাহিত্য এই ভাষার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে। ভারতের অন্য যে-কোনো ভাষা অপেক্ষা এই ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার উপাদান বেশী। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে "মগধী প্রাকৃত" নামে যে বিপুল ভাষা প্রচলিত ছিল এই বাঙলা ভাষাই তাহার যথার্থ উত্তরাধিকারী। মহান্ সম্রাট্ অশোকের সময়ে রাজসভায় এই মগধী ভাষা চলিত ছিল; বুদ্ধ ও মহাবীবের প্রথম উপদেশাবলীও এই মগধীরই কোনো সহোদর ভাষায় বিবৃত হইয়াছিল।"

এইরূপ বিশিষ্টতা-সম্পন্ন ভাষার অনুশীলন করিয়া ইহার বৃহৎ ইতিহাসের অংশমাত্র পরিস্ফুট করিয়া তোলাই যথেষ্ট কৃতিত্বের বিষয়। অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে এই ভাষায় সম্পূর্ণ ও বিশদ ব্যাকরণ লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহা সমগ্র বাঙালী জাতির ও বাঙলার পণ্ডিত-মণ্ডলীর গৌরবের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলা সাহিত্যকে বিশ্বজনবিদিত করিয়াছেন; সুনীতিবাবু ইহাকে সর্ব্বদেশের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের অবশ্য অনুশীলনীয় করিয়া তুলিলেন। এই বিপুল গ্রন্থের সমাপ্তি ও প্রকাশে আমরা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দিত করিতেছি ও এই পুস্তকখানির দিকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ

বাংলা বানান

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান্ ও অবশ্যপাঠ্য "রবীন্দ্র-জীবনী"র কিছু পরিচয় দান উপলক্ষ্যে ঐ পুস্তকের কিছু দোষত্রুটি উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 'সর্ব্ব', 'পূর্ব্ব', 'কর্ত্তৃক' ইত্যাদি শব্দের বানানে রেফের নিম্নস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব লোপের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। ইহা সত্য, যে, আমরা 'সর্‌ব' বলি না, বলি, 'সর্‌ব্ব', সুতরাং বানান উচ্চারণের অনুযায়ী করিতে হইলে, 'সর্ব্ব' লেখাই উচিত। কিন্তু আমরা লিখি 'তর্ক', কিন্তু উচ্চারণ করি 'তর্‌ক্ক' 'তর্‌ক' বলি না; লিখি "স্বর্গ", কিন্তু বলি 'স্বর্‌গ্গ'; ইত্যাদি। অতএব আমাদের বানানে ও উচ্চারণে সকল স্থলে সঙ্গতি নাই দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে, আমাদের বোধ হয়, কেবল সেই সব স্থলেই

রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রাখা ভাল যেখানে ব্যুৎপত্তি বুঝাইবার জন্য তাহা আবশ্যক। অন্য সব স্থলে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব পরিহার করা ভাল—উচ্চারণ যাহাই হউক।

'বানান' কথাটি কেহ কেহ লেখেন 'বাণান'। তাহার কারণ বোধ হয় তাঁহাদের মতে শব্দটি 'বর্ণন' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু উহা কি প্রস্তুত করা, রচনা করা, তৈরি করা যে-'বানানো' শব্দটির অর্থ, তাহারই রূপান্তর হইতে পারে না? ইংরেজীতে যেমন word-building শব্দের প্রয়োগ আছে, তেমনি আমরাও মনে করিতে পারি, 'বানান' দ্বারা আমরা দেখাই, কি কি বর্ণের বা অক্ষরের সহযোগে এক একটি শব্দ 'বানানো' বা তৈরি করা বা রচনা করা হইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

দেশ-বিদেশের কথা

১৩৩৫ মাঘ

লণ্ডন বাংলা সাহিত্য সম্মিলনী

লণ্ডনে সম্প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদিগের একটি সাহিত্য-সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা উহার কর্ম্ম-সচিবগণের নিকট হইতে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটি পাইয়াছি।—

লণ্ডনে বাঙালী ছাত্র অনেক, অথচ তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইতে পারে এ রকম কোনও বৈঠক লণ্ডনে ছিল না। অনেকদিন ধরিয়াই এখানকার বাঙালী ছেলেরা এই রকম একটা সমিতির অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। তাই কয়েকজনের উৎসাহে, বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের চেষ্টায়, গত ৫ই চৈত্র (ইং ১৮ই) মার্চ্চ এই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার উদ্দেশ্য বাঙ্লাভাষী লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের মধ্যে বাঙলা ভাষায় নানা রকম প্রসঙ্গের আলোচনা করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া। সম্মিলনীর অধিবেশনগুলি সাধারণতঃ মাসে দুইবার হইয়া থাকে। সভায় যে-সকল লঘু-গুরু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।—

"বঙ্গীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্লা ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।"

"বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।"

"প্রাচ্যসভ্যতা প্রাচ্যের অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায়।"

"আন্তর্জাতিক শান্তি ও মানব-সভ্যতার উন্নতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয়।"

"ভারতীয় নারীর আদর্শ।"

"ভারতে পল্লী-সংগঠন।"

"ভারতে প্রজনন শাসনের প্রয়োজনীয়তা।"

"উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিরুদ্ধ হওয়া উচিত।"

এই সমস্ত বিষয়ের বাদানুবাদের ভিতর দিয়া আমাদের ছেলেদের মনের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। "বিবাহ-অনুষ্ঠান বর্জ্জনীয়" এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশীর ভাগ সভা মত দিয়াছিলেন, "প্রজনন-শাসনের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে প্রায় সকলেই

একমত ও অধিকাংশ সভ্যই মনে করেন যে, "উত্তরাধিকারসূত্রে অর্থলাভ বিধিবিবুদ্ধ হওয়া উচিত।"

লণ্ডন-প্রবাসী সমস্ত বাঙলাভাষী লোকদিগকে সম্মিলিত করিবার জন্য ও নূতন ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন করিবার উদ্দেশ্যে গত ১৪ই অক্টোবর একটা উৎসবের আয়োজন হয়। এই উৎসবে প্রায় তিনশত লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও তাঁহার পত্নী, লর্ড সিংহ প্রভৃতি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। একাজে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেকে আমাদের সাহায্য করিয়াছিলেন, মহিলাদের মধ্যে শ্রীমতী তটিনী দাস ও শ্রীমতী মৃণালিনী সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত ২৪শে নভেম্বর শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত "গঠনের কাজ" সম্বন্ধে সম্মিলনীতে তাঁর স্বাভাবিক চিত্তাকর্ষক ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। সমিতির কাজ বাড়িয়া চলিয়াছে, সেইজন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহার দ্বারা সমিতির কার্য্যের সহায়তা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আপাততঃ এই সম্মিলনীর সভ্যদের জন্য একটা পুস্তকাগারের বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

আমরা দেশ হইতে এই কাজে উৎসাহ ও সাহায্য পাইব এই উদ্দেশ্যে স্বদেশবাসীদের কাছে আমাদের সমিতির কথা জানাইতেছি।

শ্রী বীরেশচন্দ্র গুহ
শ্রী লাবণ্যবালা দাস
শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন
কর্ম্মসচিব।

১৩৪১ কার্ত্তিক
প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় হইবে, ইহা পাঠকেরা খবরের কাগজে দেখিয়া থাকিবেন। এবারকার অধিবেশনের জন্য এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাজও কিছু দিন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদায়ভোজ উপলক্ষ্যে স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুর মত প্রসিদ্ধ [আইনজ্ঞ ব্যক্তি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের] আইনজ্ঞান, স্বাধীনচিত্ততা ও নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতার বর্ণনা করেন এবং বলেন, যে, তিনি এক জন 'গ্রেট জজ' (মহৎ বিচারপতি)। মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জন্য বিচক্ষণতার সহিত দীর্ঘকাল বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে।

এই সম্মেলনের নাম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইলেও ইহাতে বাঙালীর সংস্কৃতির শিল্প বিজ্ঞান সঙ্গীত প্রভৃতিরও আলোচনা হইয়া থাকে—কেবল রাজনীতির আলোচনা হয় না, হইতে পারে না; কারণ গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারী অনেকে ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন।

কলিকাতায় ইহার অধিবেশন এই উদ্দেশ্যে করা হইতেছে, যে, যাহাতে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা মিলিত হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার উদ্বোধন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে অনেক বাঙালী আছেন। তাঁহারা সম্মেলন উপলক্ষ্যে যত অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আগমন করিবেন, অধিবেশন তত অধিক সাফল্যলাভ করিবে। কলিকাতার অধিবেশনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সকলকে সাদর ও সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে বহু লক্ষ লোককে নিমন্ত্রণ করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য সংবাদপত্রের মারফতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বঙ্গের সকল বাঙালীর পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বঙ্গের সব বাঙালীকে বঙ্গের বাহির হইতে আগত অতিথিদিগের আদরযত্ন করিতে হইবে। আমরা বঙ্গের বাহিরে গেলে প্রবাসী বাঙালীরা যেরূপ আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা আমাদের সাধ্যাতীত হইলেও আদর্শস্থানীয় নিশ্চয় বটে। বঙ্গের বাঙালী সমাজ মনোযোগী হইলে কিছু অতিথিসৎকার আমরা করিতে পারিব।

১৩৪২ ফাল্গুন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন *

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত]

প্রবাস শব্দটি প্রাচীন। পঞ্চতন্ত্র রঘুবংশ অভিজ্ঞান-শকুন্তল উত্তররামচরিত ভর্ত্তৃহরির বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রবাসী শব্দটিও পুরাতন। সুতরাং যখন ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি এলাহাবাদ হইতে এই মাসিকপত্রটি বাহির করিবার সঙ্কল্প স্থির করি, তখন আমাকে প্রবাসী শব্দটি রচনা করিতে হয় নাই। কিন্তু এই মাসিকপত্রটির এই নাম দিবার পূর্ব্বে আমাকে অন্যান্য কয়েকটি নামের বিষয়ও চিন্তা করিতে হইয়াছিল। শেষে যখন প্রবাসী নাম রাখাই স্থির করিলাম, তখনও যে উহার সমালোচনা শুনিতে হয় নাই, বা আমারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না, এমন নয়।

যাহা হউক, এই কাগজখানার নাম প্রবাসী রাখায় পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া লোকমুখে ছাপার অক্ষরে প্রবাসী শব্দটির ব্যবহার যত বার হইয়াছে, আগে তত বার বোধ হয় ৩৫ বৎসরে কখনও হয় নাই। বঙ্গের বাহিরে যে-সকল বাঙালী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করেন, যাঁহাদিগকে প্রবাসী বাঙালী বলা হয়, তাঁহাদের বিষয়ে এই কাগজখানাতে যত বেশী বার যত বেশী লেখা হইয়াছে, ইহার জন্মের পূর্ব্বে ও পরে বোধ হয় কোন বাংলা পত্রিকায় তত বার তত লেখা হয় নাই। ইহার প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যার গোড়াতেই জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত

---

* এই প্রবন্ধটির যে-সকল ছবির নীচে কোন ফোটোগ্রাফারের নাম নাই, সেগুলির ফোটোগ্রাফ শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার সৌজন্য-সহকারে তুলিয়া দিয়াছেন। [ছবিগুলি অবশ্য সংকলনে মুদ্রিত হয়নি।]

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছবি ছিল ও ভিতরে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লেখা ছিল। ঐ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রবাসী বাঙালীর একখানি স্নেহাপ্লুত পরিহাসাত্মক ছবিও ছিল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" নামক যে বৃহৎ পুস্তক লিখিয়াছেন এবং, আশা করি, যাহার আরও একখণ্ড তাঁহার বাংলা অভিধানের নূতন সংস্করণ বাহির হইয়া গেলে তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহারও উৎপত্তি "প্রবাসী" হইতে হয়। প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে বিজ্ঞাপিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবু সেই পদকটি পান এবং তাঁহার প্রবন্ধটি "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয়। অতএব, প্রবাসী, প্রবাসী বাঙালী প্রভৃতি কথার আধুনিক প্রয়োগ ও প্রচলনের দায়িত্ব ও অপরাধ আমি অস্বীকার করিতে পারি না। নয়া দিল্লীর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। যে-কেহ সেই প্রবন্ধ শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যে, ইহার জন্মের জন্য আংশিক দায়িত্ব আমার ছিল না, তাহার জন্য গৌরব ত নিশ্চয়ই আমার প্রাপ্য নহে; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান নামটির জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব হয়ত এই একটু ছিল, যে, ইহার নামকরণ যখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল, তখন হয়ত নামদাতারা আমার কাগজখানার নামের দ্বারা ও তাহাতে বহুবার ব্যবহৃত প্রবাসী বাঙালী শব্দ দুটি দ্বারা অজ্ঞাতসারে বিপথচালিত হইয়াছিলেন। উপরে শুধু আমার দায়িত্বের কথা বলি নাই, অপরাধের কথাও বলিয়াছি। তাহা বলিবার কারণ এই, যে, সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনেই দেখিলাম কেহ-না-কেহ উহার "প্রবাসী" নামটির সমালোচনা করিয়াছেন, এবং, যদি নামটি পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও কেহ-না-কেহ করিবেন। যে নাম সমালোচনার কারণীভূত, তাহার জন্য পরোক্ষ দায়িত্ব খুব সামান্য থাকিলেও তাহা অপরাধ বিবেচিত হইতে পারে।

বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বাস করেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাদের কর্ম্মস্থানে ঘরবাড়ী করিয়া সপরিবারে বাস করেন; তাঁহাদের অনেকের বঙ্গে এখন ঘরবাড়ী পর্য্যন্ত নাই বা না-থাকার মধ্যে। তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা যায় না—বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের ও যাঁহাদের পিতৃপিতামহের জন্ম হইয়াছে বঙ্গের বাহিরে। যাঁহারা অস্থায়ী ভাবে বঙ্গের বাহিরে থাকেন, তাঁহাদিগকেও ঠিক প্রবাসী বলা চলে কি না তাহা নির্ণয় করিবার মত সংস্কৃত জ্ঞান আমার নাই; তবে বাংলায় হয়ত চলে। ইহার উপর আরও একটি তর্ক আছে— "ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, ভারতবর্ষের যেখানেই থাকি তাহা প্রবাস নহে।" ইহা রাষ্ট্রনৈতিক তর্ক, এবং সত্যও বটে। কিন্তু যে-সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে কোথাও স্থায়ী ভাবে ২।৩।৪ পুরুষ বাস করিতেছেন তাঁহারাও কি তত্রত্য পূর্ব্বতন ভিন্নভাষাভাষী সেই সব বাসিন্দার সহিত মিশিয়া একসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন যাঁহারা পুরুষানুক্রমে আরও দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিতেছেন? ভারতভক্তিজাত ভাবুকতা হইতে আমরা যাহাই বলি না কেন, অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী-অবাঙালী বিবাহ হইলেও, বাঙালীর ঔদ্বাহিক ক্রিয়াকলাপ বাঙালীর সঙ্গেই করিতে হইতেছে, এবং আরও কত দীর্ঘকাল করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। একটি সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতি (culture) এবং চিন্তা ও ভাবের ধারা থাকিলেও ভারতের প্রত্যেক ভাষাভাষীর এক একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং ভাব

ও চিন্তার ধারাও আছে। বাঙালীর সংস্কৃতি এবং ভাবচিন্তাধারা অন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট এ দাবী করিতেছি না, কিন্তু তাহার নিকৃষ্টতাও স্বীকার করি না। যাঁহাকে বাঙালী সমাজে থাকিতে হইবে, তাঁহাকে বাঙালীর সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ভাবচিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতে ও তৎসমুদয়কে নিজের করিতে হইবে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন দ্বারা এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধিত হয়।

আমাদের এই সম্মেলনের প্রবাসী নামের বিরুদ্ধে যা-কিছু বলা যাইতে পারে, স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় ইহার গোরখপুরের অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে সংক্ষেপে তাহা প্রায় সমস্তই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবাসী নামটারও যে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা তিনি মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের কথাই উদ্ধৃত করি।

যদিচ আমরা বাঙ্গালা দেশের বাইরে বাস করি, তবু নিজেদের প্রবাসী বল্‌তে আমি সঙ্কোচ করি। ভারতে বাস ক'রে ভারতবাসী নিজেকে পরবাসী কি ক'রে বলবে? সেটা বড়ই অশোভন। তাই আমি প্রথম থেকেই প্রবাসী আখ্যার বিরোধী। একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ-সম্বন্ধে কথা হয়; তিনিও 'প্রবাসী' নামের পক্ষপাতী নন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'বহির্বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' বললে কি রকম হয়; তিনি বলেছিলেন—বেশ ভাল কথা, 'বহির্বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার অথবা 'বঙ্গেতর সাহিত্য-সম্মেলন' বলতে পার। যদিও আমাদের এ সম্মেলনের একাধিক বার নাম পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবু আমি এ-বিষয়ে পরিচালকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিছি। তবে এ-কথা বলতেই হবে, 'প্রবাসী' নামটা চলে গেছে, কেমন যেন ছাড়ানো যায় না। প্রবাস কথাটার মানে হয় দাঁড়িয়েছে বাঙ্গালা দেশের বাইরে। প্রবাসী নামে যত কিছুই আপত্তি উত্থাপন করি না কেন, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে বাঙ্গালা দেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের এ কথাটি নূতন ক'রে যেন মনে করিয়ে দেয়। এ দেশকে আমরা আপন দেশ বলে ম'নে করব, কিন্তু জন্মভূমি যে সকল দেশের চেয়ে আপন তা ভুললে চলবে কেন? তাতে এ দেশকে একটুও অবজ্ঞা করা হয় না। আমরা অনেক স্ত্রীলোককে 'মা' বলে সম্বোধন করি, তাতে মাতৃত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যে মা পেটে ধরেছে সে মা কিন্তু অন্য মা'দের চেয়ে একটু পৃথক, সে জননী, শুধু মা নয়। বাঙ্গালা জননী, এ-কথাটি মনে রাখা বড় দরকার।

সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাদের তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলেন। তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মানদীর ধার সেই খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, পাখীর গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা, সব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্ট দেশটি আমার চোখের সামনে আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হ'ল আমি ভুলি নি ভুলিনি আমার দেশমাতাকে যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাই নি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মার টান বড় টান।

যদিও এ-দেশও আমাদের দেশ, এ-দেশেই আমরা অনেকে ঘর বেঁধেছি, নানা কাজে এ-দেশেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি, এ-দেশের লোকদের বড় আপন মনে হয়, তাদের স্নেহ করি, তাদের স্নেহ পাই, তাদের সেবা করে আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই, হয়ত এ-দেশেই ছাইটুকু রেখে যাব, তবু—তবু—সেই যে বড় বড় নদীর দেশ, বর্ষা ও ঝড়ের দেশ, সেই যে ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট আমার ভাইবোনগুলি আর সেই যে ভাটিয়ালী বাউল ও কীর্তন গান, সেই যে ভাবপ্রবণ জাতিটি, আর সেই যে আমার অতি মিষ্ট

বাঙ্গালা কথা ও বাঙ্গালা ভাষা, সে যে আমার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি, তাকে ত ভুলতে পারি না।

তবে এ কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে, যদিও আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে রয়েছি, তবু এ-দেশও আমাদেরই দেশ, এ আমাদের জন্মভূমি না হলেও কর্ম্মভূমি অন্নভূমি। এ দেশই আমাদের জীবিকার সংস্থান করে দিচ্ছে। অনেক বাঙ্গালী আছেন যাঁদের এ দেশই জন্মভূমি। এ দেশের অধিবাসীরা আমাদের ভাইবোন; ভাইবোন ভেবেই এদের বুকে টেনে নিতে হবে। অন্তরের ভালবাসা এদের দেওয়া চাই। মনে বা মুখে এ দেশের লোকদের তাচ্ছিল্য করলে নিজেদেরই হীনতা ও অনুদারতা প্রকাশ পাবে। চাণক্য বলে গেছেন—'উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'—মনে রাখবার কথা, জীবনে পালন করবার কথা।

অতুলপ্রসাদ ঠিকই বলিয়াছিলেন।

নয়া দিল্লীর অধিবেশনে শ্রীমতী শৈলবালা দেবী মহিলা বিভাগের অর্ভ্যথনা-সমিতির নেত্রীরূপে এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও যথার্থ। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"যখন বাংলা দেশে ছিলাম তখন জন্মভূমিকেই একমাত্র স্বদেশ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু প্রবাসে থাকিয়া আমাদের মনের প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে—

হইয়া প্রবাসী হয়েছে ধারণা
ভারত আমার দেশ,
স্বদেশ আমার বিশাল বিপুল
নরনারী নানা বেশ।
নহি আর আমি গণ্ডীর মাঝে
বাংলা দেশের আঁকা
হৃদয়ের টান হয়েছে আমার
সকল ভারতে মাখা।
মহান ভারত আমার স্বদেশ
আমি যে ভারতবাসী
তাহাতেই মনে গৌরব সাথে
জাগে আনন্দরাশি।
তবু মাঝে মাঝে জেগে উঠে তার
শ্যামল মূর্ত্তি খানি
কত অতীতের স্নেহ স্মৃতি আর
কত সুমধুর বাণী।

"যদিও অনেক কাল দেশছাড়া তবু সেই স্নেহ মায়া যেন বাঙ্গালীর মুখে দেখিতে পাই, সেই সুমধুর বাণী যেন বাঙ্গালীর মুখে শুনি। আজ মনে হয় পুণ্যভূমি ভারতের যেখানে বাস করি সেই আমার দেশ। ভারতবাসী মাত্রেই আমার স্বজাতীয়, আমাদের প্রীতি স্নেহ শ্রদ্ধা সকলের উপরেই রাখিতে হইবে। তবুও বাংলার সহিত অন্তরের নিবিড় যোগ—সুমধুর মাতৃভাষা ও ভাবধারার ঐক্যের মধ্য দিয়া আগে আমরা বাঙ্গালী পরে ভারতবাসী। বাঙ্গালী যে বাঙ্গালীর কত আপনার বাঙ্গালী-বিহীন দেশে গেলে তাহা বুঝা যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা কাশ্মীর গিয়াছিলাম। ডিঙ্গিতে অবিরত নানা জাতীয় লোক ভ্রমণে বাহির হইত, আমি বোটের জানালায় বসিয়া কিংবা বেড়াইতে বাহির হইয়া সর্ব্বদা বাঙ্গালী খুঁজিতাম। নানদেশীয় পোষাক-পরিচ্ছদধারী লোক চলিয়া যাইত, বাঙ্গালী কদাচিৎ চোখে পড়িত। একদিন বেড়াইতে গিয়া দূর হইতে একখানি বোটে বাঙ্গালী মহিলা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে গেলাম। তাঁহারাও আমাদের দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। তাঁহারা ছিলেন মুঙ্গেরপ্রবাসী। এই মনের টানের প্রধান কারণ আমাদের চিন্তার ধারা এক। এই যোগসূত্র যাহাতে ঘনিষ্ঠতর হয় ইহাই আমাদের এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা। এই জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বাঙ্গালী জাতির বিশেষ কল্যাণকর। বৎসর বৎসর গুণী জ্ঞানী, চিন্তাশীল

ও বিদ্বান লোকের মেলামেশা ও আলোচনা হয়, আমরাও বিদুষী মহিলাগণের আগমনে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করি এবং আগ্রহের সহিত আমরা এই মিলনের প্রত্যাশা করিয়া থাকি। আমরা জন্মভূমি হইতে যত দূরেই থাকি আমরা বাঙ্গালী। আমরা চাই আমাদের পুত্রকন্যারাও বাঙ্গালী হইবে, বাংলার প্রাণ হইতে, ভাবধারা হইতে, তাহারা যেন বিচ্যুত না হয়। এ বাংলা ভাষাকেই যেন তাহারা মাতৃভাষা বলিয়া মনে করে। যেন সুশিক্ষা দ্বারা তাহাদের মধ্যে যথার্থ মনুষ্যত্ব জাগিয়া ওঠে।"

কলিকাতায় সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং সর্ব্বাগ্রে স্মর্ত্তব্য। তিনি বলেন :—

"এমন এক দিন ছিল যখন বাংলা প্রদেশের বাহিরে বাঙালী পরিবার দুই এক পুরুষ যাপন করতে করতেই বাংলা ভাষা ভুলে যেত। ভাষাব যোগই অন্তরের নাড়ীর যোগ,—সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'লেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। বাঙালীচিত্তের যে বিশেষত্ব, মানবসংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব। নদীর ধারে যে জমি আছে তার মাটিতে যদি বাঁধন না থাকে তবে তট কিছু কিছু করে ধ্বসে পড়ে; ফসলের আশা হারাতে থাকে। যদি কোনো মহাবৃক্ষ সেই মাটির গভীর অন্তরে দূরব্যাপী শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে তাকে এঁটে ধরে, তা হ'লে স্রোতের আঘাত থেকে সে ক্ষেত্রে রক্ষা পায়। বাংলা দেশের চিত্তক্ষেত্রকে তেমনি করেই ছায়া দিয়েছে ফল দিয়েছে নিবিড়; ঐক্য ও স্থায়িত্ব দিয়েছে বাংলা সাহিত্য। অল্প আঘাতেই সে খণ্ডিত হয় না। একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলা দেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরো পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ঘটত তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্ম্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে, তার প্রধানতম কারণই বাংলা সাহিত্য। বাংলা দেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে. এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালী উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালী-চিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালার চৈতন্যকে ব্যাপক ভাবে গভীর ভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালী যতদূরে যেখানেই যাক্ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলা দেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙালীর ছেলে বিলাত গেলে ভাষায় ভাবে ও ব্যবহারে যেমন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক অবাঙালীত্বের আড়ম্বর করত এখন তা নেই বললেই চলে,—কেন না বাংলা ভাষায় যে সংস্কৃতি আজ উজ্জ্বল তার প্রতি শ্রদ্ধা না প্রকাশ করা এবং তার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই আজ লজ্জার বিষয় হয়ে উঠেছে।"

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ প্রবাস শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সাতিশয় প্রণিধানযোগ্য।

"রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধনার তরফ থেকে ভারতবর্ষে বঙ্গেতর প্রদেশের প্রতি প্রবাস শব্দ প্রয়োগ করায় আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু মুখের কথা বাদ দিয়ে বাস্তবিকতার যুক্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অকৃত্রিম আত্মীয়তার সাধারণ ভূমিকা পাওয়া যায় কিনা সে তর্ক ছেড়ে দিয়েও সাহিত্যের দিক থেকে ভারতের অন্য প্রদেশ বাঙালীর পক্ষে প্রবাস সে কথা মানতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের পার্থক্য এত বেশী যে অন্য প্রদেশের বর্ত্তমান সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলা সংস্কৃতির সামঞ্জস্যসাধন অসম্ভব। এ ছাড়া সংস্কৃতির প্রধান যে বাহন ভাষা, সে সম্বন্ধে বাংলার সঙ্গে অন্যপ্রদেশীয় ভাষার কেবল ব্যাকরণের প্রভেদ নয়, অভিব্যক্তির প্রভেদ। অর্থাৎ ভাবের ও সত্যের প্রকাশ কল্পে বাংলা ভাষা নানা প্রতিভাশালীর সাহায্যে

যে রূপ ও শক্তি উদ্ভাবন করেছে অন্য প্রদেশের ভাষায় তা পাওয়া যায় না, অথবা তার অভিমুখিতা অন্য দিকে, অথচ সে সকল ভাষার মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ে বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে। অন্যপ্রদেশবাসীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে বাঙালীর হৃদয়ের মিলন অসম্ভব নয়। আমরা তার অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখেছি—যেমন পরলোকগত অতুলপ্রসাদ সেন। উত্তর-পশ্চিমে যেখানে তিনি ছিলেন, মানুষ হিসাবে সেখানকার লোকের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল, কিন্তু সাহিত্য-রচয়িতা বা সাহিত্যরসিক হিসাবে সেখানে তিনি প্রবাসীই ছিলেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

"তাই বলছি আজ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন বাঙালীর অন্তরতম ঐক্যচেতনাকে সপ্রমাণ করবে। নদী যেমন স্রোতের পথে নানা বাঁকে বাঁকে আপন নানাদিক্‌গামী তটকে এক ক'রে নেয়, আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তেমনি করেই নানা দেশ প্রদেশের বাঙালীর হৃদয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাকে এক প্রাণধারায় মিলিয়েছে। সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে ব'লেই, আপনার কাছে আপনি সে আর অগোচর নেই বলেই, যেখানে যাক আপনাকে আর সে ভুলতে পারে না, এই আত্মানুভূতিতে তার গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা স্থানে নানা সম্মিলনীতে বারম্বার উচ্ছ্বসিত হচ্চে।"

আমিও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছি। তাহার কোন কোন কথার পুনরাবৃত্তি করা এখানে একান্ত অনাবশ্যক হইবে না।

যাহাদের ভাষা এক, তাহারা যেখানেই থাকুক, তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ রক্ষা করা আবশ্যক। তাহারা যদি বৃহত্তর লোকসমষ্টির অঙ্গীভূত থাকে, যেমন বাঙালীরা বৃহত্তর ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গীভূত, তাহা হইলেও তাহাদের নিজেদের মধ্যে সংহতি আবশ্যক। ইহার প্রয়োজন আরও বেশী করিয়া অনুভূত হয়, যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর এই লোকসমষ্টি কোন প্রকারে অসুবিধাগ্রস্ত হয়। সেইরূপ অসুবিধা যে অধুনা বাঙালীদের ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। সমগ্রভারতীয় মহাজাতির সাধারণ যে-সব অসুবিধা আছে, বাঙালীদের তাহা ত আছেই। তদতিরিক্ত কতকগুলি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক অসুবিধা বাঙালীদের ঘটিয়াছে। এই জন্য বাঙালীদের ঐক্য খুব বেশী হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, এই ঐক্যের উদ্দেশ্য অন্য কাহারও অনিষ্টসাধন নহে—ইহা কেবলমাত্র আপনাদের কল্যাণসাধন এবং অপর সকলেরও কল্যাণসাধনের নিমিত্ত আবশ্যক।

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের কোন জাতিই সমগ্রভারতীয় মহাজাতির অন্তর্ভূত অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রত্যেক জাতিরই সমগ্র মহাজাতির অন্যান্য অংশের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি হইতে কিছু শিখিবার, কিছু অনুপ্রাণনা লাভ করিবার আছে। আমরা বাঙালীরা বঙ্গে থাকিয়াও এই প্রকার কিছু শিখিতে ও অনুপ্রাণনা লাভ করিতে পারি; আবার যে-সব বাঙালী বঙ্গের বাহিরে বাস করেন, তাঁহাদের মারফতেও শিক্ষা ও অনুপ্রাণনা পাইতে পারি। ভারতীয় মহাজাতির অন্য সব অংশকে আমাদের যাহা দিবার আছে, তাহাও আমরা কিছু সাক্ষাৎভাবে, কিছু বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের হাত দিয়া দিতে পারি।

প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বারা যদি কেবলমাত্র নানা প্রদেশের বাঙালীদের আলাপ-পরিচয় ও সদ্ভাব-বৃদ্ধির সুযোগ হইত, তাহা হইলেও তাহা কম লাভ হইত না। কিন্তু তদতিরিক্ত অন্য লাভও আছে। এই সম্মেলনে যে-সব অভিভাষণ ও প্রবন্ধাদি পঠিত হয়, তাহা এইরূপ অন্যান্য সভার অভিভাষণাদি অপেক্ষা উৎকর্ষে হীন নহে। ইহাতে আলোচনাও যোগ্যতার সহিত হইয়া থাকে। সুতরাং নূতন নূতন স্থান দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ক

জ্ঞানলাভের এবং চিন্তার উন্মেষের সুযোগও সম্মেলনে হয়।...

যাহা হউক, তাহা হইতে যদি ইহা বুঝিবার সুবিধা হয়, যে, বাঙালী যেখানেই থাকুন, সেখানেই বঙ্গের মানসিক পরিবেষ্টন কতকটা বিদ্যমান আছে, সেখানেই ছোট ছোট বঙ্গ বিরাজিত আছে, তাহা হইলে তাহাও কম লাভ নহে। জার্ম্যানদের একটি কবিতা আছে যাহা, "জার্ম্যানদের পিতৃভূমি কোথায়? তাহা কি প্রুশিয়া? তাহা কি সোয়াবেন?" এইরূপ প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ। উত্তর কতকটা এই মর্ম্মের যে, যেখানেই অধিবাসীদের মাতৃভাষা জার্ম্যান সেই স্থানই জার্ম্যানী। আমরাও বলিতে পারি, যেখানেই কোন বাঙ্গালী বাস করে ও বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাহাই বাঙালীর পিতৃভূমিস্বরূপ ও বৃহত্তর বঙ্গের অংশ। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই সব অধিবাসীব মাতৃভাষা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় অংশের মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্য তাহারাও যে-যে প্রদেশে বাস করে তাহা তাহাদের পিতৃভূমিস্বরূপ এবং বৃহত্তর গুজরাট, বৃহত্তর উড়িষ্যা, বৃহত্তর বিহার ইত্যাদিব অংশ। এই প্রকারে ভারতবর্ষের সব অংশ সব ভারতীয়ের পিতৃভূমি।

দীর্ঘকাল হইতে যে-সব অঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গভাষাভাষী লোকদের বাস, এ-রকম কয়েকটি ভূখণ্ড আসাম ও বিহারের সহিত জুড়িয়া দিয়া বাংলা প্রদেশকে ছোট করা হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশেরই কতকগুলি লোকের কোন-না-কোন কারণে অন্যান্য প্রদেশে গিয়া বসবাসের প্রয়োজন হয়। বাংলা প্রদেশের কতকগুলি লোকের এই প্রয়োজন অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশী। কারণ, এক দিকে আমাদের প্রদেশটিকে ছোট করা হইয়াছে, অন্য দিকে ইহার লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী। তাহা বড় প্রদেশগুলির আয়তন ও লোকসংখ্যার নীচের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে।

প্রদেশ।	বর্গমাইলে আয়তন।	লোকসংখ্যা।
বাংলা	৭৭,৫২১	৫,০১,১৪,০০২
মান্দ্রাজ	১,৪২,২৭৭	৪,৬৭,৪০,১০৭
বোম্বাই	১,২৩,৫৭৯	২,১৮,৭৯,১২৩
আগ্রা-অযোধ্যা	১,০৬,২৪৮	৪,৮৪,০৮,৭৬৩
	৯৯,২৬৫	২,৩৫,৮০,৮৫১
বিহার-উড়িষ্যা	৮৩,০৫৪	৩,৭৬,৭৭,৫৭৬
মধ্যপ্রদেশ-বেরার	৯৯,৯৩৮	১,৫৫,০৭,৭২৩

এই জন্য অনেক বাঙালীর বঙ্গের বাহিরে যাওয়া ও থাকা একান্ত আবশ্যক। বঙ্গের বাঙালীরা ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীরা পরস্পরের কোন সাহায্য করিতে পারুন বা না পারুন, উভয়ের হৃদয়ের যোগ থাকা একান্ত আবশ্যক। সংস্কৃতির যোগ তাহার পরিচায়ক ও পরিবর্দ্ধক এবং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মত সম্মেলন—তাহার নাম যাহাই হউক—এই যোগ রক্ষার ও বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়।

নয়া দিল্লীতে এই সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল তথাকার বাঙালী বালকদের বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় উঁচু খোলা প্রশস্ত জায়গায় নির্ম্মিত। বিদ্যালয়গৃহ বৃহৎ। ইহাতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধিদের থাকিবার জায়গা এবং অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কাজের বেশ সুবিধা হইয়াছিল। সাধারণ কর্ম্মসচিব মেজর অনিলচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন। পৌষে দিল্লীতে খুব শীত। বিদ্যালয়টিতে খুব রোদ লাগিত বলিয়া প্রতিনিধিরা শীতে কস্ট পান নাই। অন্যান্য ব্যবস্থাও ভাল হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবকেরা তাঁহাদের কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের হাতায় ঢুকিবার মুখে সাঁচী-স্তূপের তোরণের অনুকরণে একটি তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা দেখিতে বেশ সুন্দর হইয়াছিল। তালকটোরা উদ্যানে বৈকালিক সম্মিলন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়- গৃহেই মহিলাদের একটি স্বতন্ত্র প্রমোদ-মিলন হইয়াছিল। নৃত্যগীতাদি ও "রক্তকরবী"র অভিনয়ে আমি উপস্থিত থাকিতে পারি নাই।

অধিবেশনের সমুদয় বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজে যথাসময়ে বাহির হইয়াছে। মূল সভাপতির, মহিলা-বিভাগের নেত্রীর এবং সমুদয় বিভাগীয় সভাপতিদের অভিভাষণ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পক্ষ হইতে অন্যতম সহকারী সভাপতি ধীমান্ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাও দৈনিকে বাহির হইয়াছে। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করিবার ভার ছিল প্রবাসীর সম্পাদকের উপর। তাঁহার সামান্য বক্তব্যেরও কিছু দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী নীরব কর্ম্মী সহকারী সভাপতি ডাঃ জ্ঞানদাকান্ত সেন মহাশয় বিদায় কালে যে হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা কোন কাগজে দেখি নাই। বোধ হয় কেহ লিখিয়া লন নাই।

মহিলা বিভাগের সভানেত্রীর, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির নেত্রীর, মূল অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতির এবং মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিদিগের বক্তৃতা গুলিও উৎকৃস্ট হইয়াছিল। সেগুলি সমস্তই দৈনিক কাগজে বাহির হওয়ায় বিস্তর লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। কোন মাসিক কাগজে এতগুলি অভিভাষণ যথা-সময়ে ছাপিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু অভিভাষণগুলি শুধু দৈনিকে মুদ্রিত হওয়া যথেষ্ট নহে। তাহার প্রধান কারণ দুটি। দৈনিক কাগজ লোকে মুখ্যতঃ সংবাদের জন্য পড়ে, তাহাতে অক্ষোকৃত দুরূহ বিষয়ের কোন আলোচনা থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পঠিত হয় না; আবার, যেদিনকার কাগজে তাহা থাকে তাহার পরদিন আবার আর একখানা কাগজ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আগেকার দিনের কাগজটি পড়িবার অবসর হয় না। সকল পাঠকের পক্ষে একথা না খাটিতে পারে, কিন্তু অনেকেরই পক্ষে খাটে। দ্বিতীয় কারণ, দৈনিক কাগজ সাধারণতঃ কেহ বাঁধাইয়া রাখে না, বড় বড় অনেক লাইব্রেরীতেও পুরাতন দৈনিকের ফাইল পাওয়া যায় না। সুতরাং অভিভাষণগুলি কেবল দৈনিকে ছাপা হইলে সেগুলির প্রতি অবিচার হয় এবং যাঁহারা ধীরে অবসরমত মন দিয়া সেগুলি পড়িতে চান, তাঁহাদের সুবিধা হয় না। ভবিষ্যতে কেহ সেগুলি দেখিতে বা পড়িতে চাহিলে পান না। এই জন্য দৈনিকে প্রকাশ ছাড়া সেগুলি সম্মেলনের রিপোর্টের আলাদা একটি খণ্ডরূপে মুদ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সম্মেলনে সব ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উদ্যোক্তাদের হাতে প্রায়ই এত টাকা উদ্বৃত্ত থাকে না যাহাতে তাঁহারা বিস্তারিত রিপোর্ট ও অভিভাষণগুলি ছাপিতে পারেন। আমরা কলিকাতার অধিবেশনের সব অভিভাষণ, এমন কি ভাল অন্য প্রবন্ধগুলিও, ছাপিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা করিতে পারি নাই। নয়া দিল্লীর অধিবেশনের অন্যতম অক্লান্ত কর্ম্মী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমের নিকট সংবাদ লইয়া অবগত হইয়াছি, তথাকার

অভ্যর্থনা-সমিতি অভিভাষণাদি মুদ্রিত করিতে পারিবেন। ইহা সুখের বিষয়।

সম্মেলনের মহিলা-বিভাগের নেত্রী, মূল সভাপতি ও বিভাগীয় সভাপতিদিগের মধ্যে বাংলা দেশ হইতে দু-এক জন লওয়া ভাল। তাহাতে বঙ্গের বাঙালী ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্যে যোগ রক্ষিত হয় এবং ভাবধারা ও চিন্তাধারার আদান-প্রদান হয়। কিন্তু অধিকাংশ সভাপতি বঙ্গের বাহিরের বাঙালীদের মধ্য হইতে যে লওয়া হয়, তাহাই ঠিক্। আমি ত কয়েক বারের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছি; দেখিয়াছি বঙ্গের বাহিরের যে-সকল বাঙালী মূল বা বিভাগীয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের বেশ পড়াশুনা ও চিন্তাশীলতা আছে। এ বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গের সমশ্রেণীস্থ শিক্ষিত লোকদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন, বরং কখন কখন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়াছি।

যেখানে যেবার সম্মেলনের অধিবেশন হয়, অধিকাংশ সভাপতি সেখান হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশের প্রবাসী বাঙালীদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু যাতায়াতে অনেক সময় লাগে, কষ্ট ও ক্লান্তি হয়, এবং ব্যয়বাহুল্যও আছে বলিয়া বোধ হয় দূরের লোকদিগকে পাওয়া অনেক স্থলেই কঠিন হয়। ইহার কোন প্রতীকার হইতে পারে কি না, চিন্তিতব্য।

অতঃপর সম্মেলন যেখান হইবে তথাকার উদ্যোক্তদিগের এবং সম্মেলনের পরিচালক-সমিতির নিকট আর একটি কথা নিবেদন করিতেছি। অনেকগুলি দেশী রাজ্যে বাঙালীর বাস আছে। কেহ কেহ আগে তথায় খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এখনও হয়ত কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। দেশী রাজ্যের বাঙালীদের মধ্যে কৃতবিদ্য ও চিন্তাশীল লোকও আছেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে মূল বা বিভাগীয় সভাপতি পাইবার চেষ্টা প্রতি বৎসরই হওয়া উচিত, এবং দেশী রাজ্যসমূহ হইতে মহিলা ও পুরুষ প্রতিনিধি যাহাতে অধিকতর সংখ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত হন, তাহারও চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

ভবিষ্যৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদিগের নিকট আরও একটি নিবেদন আছে। সম্মেলনে সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ও সংগীত, সংস্কৃতির এই তিনটি বাহ্য রূপ বা অঙ্গের আলোচনা হইয়া থাকে। এই তিন দিকেই বঙ্গের বিশিষ্টতা আছে। সাহিত্যের আলোচনা ভালই হইয়া থাকে—অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যের প্রতি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাচ্ছিল্য প্রকাশিত হয় না। কুরুচি, অশ্লীলতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা হয় বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের কোন প্রতিকূল সমালোচনা করা হয় না। কারণ, কুরুচি ও অশ্লীলতা কেবল যে কোন কোন বাঙালী লেখকদেরই দোষ, এমন নয়। সুকুমার শিল্পের আলোচনাও উত্তম রূপে হয়, কোন কোন অধিবেশনে চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাও থাকে। সঙ্গীত সম্বন্ধে বঙ্গের প্রতি অবিচার, অন্ততঃ যথেষ্ট ন্যায্য বিচারের অভাব, আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি—যদিও কোনও অধিবেশনের উদ্যোক্তারা তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন, এরূপ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি সংগীতজ্ঞ নহি। সংগীত ভালবাসি বটে। অন্য কোন সাধারণ আনাড়ী লোকের এ বিষয়ে মতের যে মূল্য, আমার মতের মূল্য তাহা অপেক্ষা বেশী না হওয়াই সম্ভবপর। তথাপি দু-কথা আমাকে বলিতে হইতেছে।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিতার বিষয়, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির, এবং নাটক এবং ছোট

ও বড় গল্পের ও তাহার রচনার রীতির অনাদর আমরা বাঙালীরা করি না। কিন্তু বাংলা কবিতা, নাটক, গল্প সব দিক দিয়া প্রাচীন কবিতা আদির ঠিক্ অনুসরণ করে না বলিয়া বাঙালীরা ও অন্যেরা বাংলা সাহিত্যকেও উপেক্ষা করেন না। কিন্তু সংগীতের বেলায় দেখিতে পাই, এমন বাঙালী ও অবাঙালী আছেন, যাঁহারা বঙ্গের নিজস্ব সংগীতকে হয় আমলই দিতে চান না, নয়ত খুব নিম্নস্থান দিতে চান। যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের আদর করিয়াও বাংলা সাহিত্যের আদর করা যায়, তেমনি চিরাগত প্রাচীন হিন্দুস্থানী সংগীতের বিন্দুমাত্রও অনাদর না করিয়া বঙ্গের নিজস্ব সংগীতের আদর করা যাইতে পারে এবং করা উচিত। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রত্যেক অধিবেশনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত যাহাতে সমবেত শ্রোতৃবর্গ বঙ্গের উৎকৃষ্ট সংগীত শুনিতে পান। বালিকারা বা বালকবালিকারা যে গীতনৃত্যাদির দ্বারা অভ্যাগতদের চিত্তবিনোদন করেন,—এবারও করিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থা ভালই। কিন্তু তার চেয়ে অধিক নিপুণ লোকদের সংগীতেরও প্রয়োজন। বঙ্গের নিজস্ব সঙ্গীত ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, এরূপ লোক পাওয়া গেলে আরও ভাল। ওস্তাদ বা ওস্তাদ বলিয়া বিবেচিত লোকেরা যাহাই ভাবুন, আমরা সাধারণ লোকেরা এই জানি, যে, বঙ্গের রবীন্দ্রনাথ যত রকমের যত অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্ট গান বচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে নানা বিচিত্র সুর বসাইয়াছেন, ভারতে আর কেহ তাহা করেন নাই—পৃথিবীতে কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না। অধিকন্তু হিন্দুস্থানী সংগীতে, তাঁহার শিক্ষা দস্তুরমতই হইয়াছিল এবং তিনি তাহার গুণগ্রাহীও বটেন। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে, কাব্যে তিনি যেমন স্রষ্টা, সংগীতেও তিনি তেমনই স্রষ্টা; পূর্ব্বতন কাব্যের দ্বারা যেমন তাঁহার কাব্যের বিচার হয় না, পূর্ব্বতন সংগীতের দ্বারাও তেমনই তাঁহার সংগীতের বিচার হয় না। যে-কোন লোক বা লোকসমষ্টি বঙ্গের সংস্কৃতির আদর করেন বলিয়া সত্য দাবী করিতে চান, তিনি বা তাঁহারা সঙ্গীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য সমুচ্চ স্থান দিতে বাধ্য।

আর অধিক লিখিবার স্থান নাই। এখন শেষ কথা লিখি। সম্মেলনের কথা বঙ্গের ও বঙ্গের বাঙালীদিগের মধ্যে প্রচার করিবার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা খুব আবশ্যক। গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর প্রচারকল্পে একখানি মাসিক বার্ত্তাবাহিনী পত্রিকা (bulletin) প্রকাশ করা হইবে। শীঘ্রই এই পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। ইহার সর্ব্বত্র প্রচার সাতিশয় বাঞ্ছনীয়। ইহা বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের গৃহে স্থান পাইলে সুফল ফলিবে।

১৩৪৬ বৈশাখ

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশন

গত ২৬শে চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশ অধিবেশনে কুমিল্লায় নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে :

(১) এই সম্মেলন যুক্তপ্রদেশের বোর্ড অফ হাই স্কুল এণ্ড ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার করিবার সম্বন্ধে যে নূতন বিধান প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন। সেই নিয়মানুসারে যাহাতে বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের বাঙ্গালা ভাষাই হিন্দী ও উর্দ্দুর ন্যায় মাতৃভাষারূপে শিক্ষার বাহন হয়, তজ্জন্য নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্য উক্ত বোর্ডকে অনুরোধ করিতেছেন।

(২) এই সম্মেলন যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-বিভাগকে হাই স্কুল সমূহে উর্দ্দু ও হিন্দীর ন্যায় বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তাহাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষাকে শিক্ষার বাহন কবিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) ভারতের যে-সমস্ত প্রদেশে যথেষ্ট-সংখ্যক বাঙ্গালী আছেন সেই সমস্ত প্রদেশে বাঙ্গালী বালক-বালিকাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনস্বরূপ বাঙ্গালা ভাষাকে স্থান দিবার জন্য ঐ সমস্ত প্রদেশের সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৪) এই সম্মেলন দাবী করিতেছেন যে, উড়িষ্যা এবং আসাম প্রদেশে মাতৃভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) এই সম্মেলনের মতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্ধারণের চেষ্টা বর্ত্তমানে কালোচিত নহে এবং অসমীচীন। ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ভাষা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত এবং সেই সময়ে বাঙ্গালীর দাবীও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। "রাষ্ট্র ভাষারূপে" প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার অতিরিক্ত কোনও ভাষাকে ছাত্রছাত্রী ও অন্য ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, এই সম্মেলন তাহার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতেছেন।

(৬) বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বাঙ্গালার মিনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং স্কুল-কলেজের পাঠাগারে সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

(৭) বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষিকথা, ব্রতকথা, উপকথা, প্রাদেশিক শব্দ, হস্তলিখিত পুথি, কুলজী গ্রন্থ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা করা হউক।

(৮) এই সম্মেলন বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচার ও ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া মনে করেন :—

(ক) বাঙ্গালী মাত্রেই দৈনন্দিন কার্য্যে এবং পত্রালাপে যত দূর সম্ভব বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিবেন।

(খ) বাঙ্গালা দেশে প্রবাসী অন্য প্রদেশের ব্যক্তিগণের সহিত যত দূর সম্ভব বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন করা কর্ত্তব্য।

(গ) অ-বাঙ্গালীর মধ্যে ও বাঙ্গালার বাহিরে যাহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রচার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য :— পরীক্ষা গ্রহণ এবং পুরস্কার বিতরণ, বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনাকল্পে নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

এই সম্মেলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যে স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে উহার পরিপুষ্টির জন্য বঙ্গদেশের সাহিত্যানুরাগিবৃন্দকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

(১০) এই সম্মেলন আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক এবং ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগীকে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিলেন।

(১১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক অথবা অন্য সাধারণ অধিবেশনে সমগ্র বঙ্গ-ভাষাভাষী জাতির প্রতিনিধিবর্গের পূর্ণ সম্মেলন করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা দেশে বা বাঙ্গালার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচনার জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান আছে, সেইগুলিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ অথবা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছেন

১৩৪৬ কার্ত্তিক

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন সমারোহ ও সাফল্যের সহিত হইয়াছিল। ইহাতে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। উদ্বোধক, সভাপতি, ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণগুলি ব্যতীত কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়, ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হয়, এবং তদ্ভিন্ন নৃত্যগীতাদি দ্বারা সমাগত পুরুষ ও মহিলাদিগের চিত্তবিনোদন করা হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছিল।

"যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্কুলের ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে উর্দ্দু এবং হিন্দী ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তব লিখিতে হইবে; স্থান এবং অবস্থা বিশেষে অবশ্য ইংবাজী ভাষার সাহায্যে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। সংখ্যালঘিষ্ঠের ভাষা এবং সংস্কৃতির উপব হস্তক্ষেপ না হয় ইহা কংগ্রেসের নীতি। তদনুসারে এই সম্মেলন দাবী করিতেছে যে, যুক্তপ্রদেশের স্কুলসমূহের বাঙ্গালী ছাত্র এবং ছাত্রীদিগের পক্ষে তাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় করা হউক এবং সেই ভাষার সাহায্যে তাহাদের পরীক্ষা গৃহীত হউক এবং যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট যদি কোন শাসন-সংক্রান্ত কারণবশতঃ ইহা প্রতিপালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে বাঙ্গালী ছাত্র এবং ছাত্রীদিগকে হিন্দী, উর্দ্দু অথবা ইংরাজী—এই তিন ভাষার মধ্যে যে-কোন ভাষার সাহায্যে উত্তর লিখিবার অনুমতি দেওয়া হউক।"

"এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাব পণ্ডিত অমর নাথ ঝা মহাশয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করায় এই সম্মেলন তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিতেছে এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।"

"এলাহাবাদ বহু বিশিষ্ট ও স্বনামধন্য বাঙ্গালীর জননী ও কর্ম্মক্ষেত্র। শুধু এই দেশে নয়—দেশ-দেশান্তরে তাঁহাদের অনেকেরই নাম পরিচিত।—ইঁহাদেরই উদ্যম ও পরিশ্রমে এলাহাবাদ নবরূপ প্রাপ্ত

হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটি ইঁহাদের নাম স্থায়ী করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটি কয়েকটি রাস্তা বা পার্কের নাম তাঁহাদের নামানুসারে করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি জাগরিত রাখুন। যথা :—

মেজর বামনদাস বসু, স্যার প্রমদাচারণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়, বিদ্যার্ণব শ্রীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি।"

উপরের নামগুলির পরে 'প্রভৃতি' আছে। এই 'প্রভৃতি' দ্বারা কাহার কাহার নাম সূচিত হইয়াছে, বলা যায় না। আমরা এমন তিন জন পরলোকগত বাঙালীর নাম উল্লেখ করিতেছি, যাঁহাদের নাম অনুসারে এলাহাবাদের কোন কোন রাস্তা বা পার্কের নাম রাখা যাইতে পারে।

এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্র্যাল কলেজ যুক্তপ্রদেশের অন্যতম প্রধান কলেজ। উহা যদিও সরকারী কলেজ কিন্তু উহা স্থাপিত হইয়াছিল প্রয়াগের কয়েকজন নাগরিকের উদ্যোগে। গত শতাব্দীতে আমি যখন এলাহাবাদে চাকরি করিতাম, তখন (বর্ত্তমানে বাঈ-কা-বাগ পাড়ার অধিবাসী) অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেবের সৌজন্যে মিওর কলেজের একটি সচিত্র ইতিহাস দেখিয়াছিলাম। তাহা এখন অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। যত দূর মনে পড়ে, তাহাতে দেখিয়াছিলাম উক্ত কলেজ স্থাপনে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন বাঙালী রামেশ্বর চৌধুরী এবং ('যোদ্ধা মুন্সেফ' উপনামে পরিচিত) প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাদের অন্যবিধ কৃতিত্বও ছিল। তাহা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" পুস্তকে লিখিত আছে।

তৃতীয় যে বাঙালীর নাম করিতে চাই, তিনি চিন্তামণি ঘোষ। তিনি এলাহাবাদে বৃহত্তম এবং যুক্তপ্রদেশে অন্যতম বৃহত্তম ইণ্ডিয়ান প্রেস নামক বেসরকারী ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশালয়ের স্থাপনকর্ত্তা হিসাবে পৌর সম্মান পাইবার অধিকারী। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহার কেবল ব্যক্তিগত সুবিধা হইয়াছে—যদিও তাহা সত্য নহে, সেই জন্য তাঁহার অন্য দুটি জনহিতকর কার্য্যের উল্লেখ আবশ্যক। তিনি সর্ব্বপ্রথম আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দী মাসিক পত্রিকা "সরস্বতী" স্থাপিত করেন। বিখ্যাত হিন্দী লেখক পরলোকগত পণ্ডিত মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীকে তিনি উহার সম্পাদক নিয়োগ করেন। দ্বিবেদীজীর সম্পাদকতাকালে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী মাসিক পত্রিকা ছিল। চিন্তামণিবাবু কাশীর নাগরী-প্রচারিণী সভার সাহিত্যিকদিগের দ্বারা সম্পাদিত তুলসীকৃত রামায়ণের প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে প্রকাশ করেন। কাশীনরেশ ঐ রামায়ণের পুঁথি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে যে-সকল চিত্রে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, চিন্তামণি বাবু তাহার অনেকগুলির প্রতিলিপি ইণ্ডিয়ান প্রেসের সংস্করণে দিয়াছিলেন।

উপরে উদ্ধৃত শেষ প্রস্তাবটিতে প্রয়াগকে যাঁহাদের "জননী" বলা হইয়াছে, তাঁহাদের অন্ততঃ অধিকাংশের জন্ম প্রয়াগে হয় নাই। অবশ্য তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। শ্রীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামনদাস বসুর জন্ম ও শিক্ষা হয় লাহোরে। প্রমদাচরণের জন্ম হয় বালী উত্তরপাড়া বা জনাইয়ে। তিনি বাংলা দেশেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন ইত্যাদি।

যুক্তপ্রদেশে বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বৃদ্ধির নিমিত্ত উপায় সূচিত করিয়া একটি প্রস্তাব অধ্যাপক অমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপিত করেন। তাহাও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে

ইহাও বলা হয়, যে, নিখিল-ভারতীয় কোন সাধারণ ভাষা নির্বাচনের সময় ইহা নহে; সমুদয় প্রদেশের প্রতিনিধিগণের মধ্যে আলোচনা ও বিচারের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু যদি কোন একটি ভাষাকে নিখিল-ভারতীয় ভাষা করিতেই হয়, তাহা হইলে বাংলাকেই নির্বাচন করা উচিত, যেহেতু ইহা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

"নিখিল-ভারত বাংলাভাষা ও সাহিত্য-প্রচার সমিতি"

গত ১লা আশ্বিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দিরে এই সমিতির একটি অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সভাপতি। সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে নীচে কয়েকটি মুদ্রিত হইল।

সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য এবং বাঙ্গালা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সমর্থনের জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলনের ব্যবস্থা করা হউক। ভারতের বিভিন্ন সাহিত্য সঙ্ঘ ও অনুষ্ঠানগুলিকে এই আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

বাঙ্গালা ভাষায় ইংরেজী ও বিভিন্ন বিজাতীয় ভাষার শব্দের প্রতিশব্দ প্রস্তুত ও সংগ্রহ করিয়া একটি প্রামাণিক অভিধান প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা হউক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতিকে এই বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হউক।

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষকে এই প্রকার অভিধান সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

দেবনাগরী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী ও তামিল অক্ষরে বাঙ্গালার বর্ণপরিচয় পুস্তক মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত পরিচয় ও তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রসার বৃদ্ধির জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দি সাহিত্য

১৩২৫ বৈশাখ

হিন্দীসাহিত্য-সম্মেলন

এবার হিন্দীসাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল মহারাজা হোলকারের রাজধানী ইন্দোর নগরে। শ্রীযুক্ত মোহনদাস কর্মচাঁদ গান্ধি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধি ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় উভয়েই যে উর্দ্দু ও হিন্দীকে একই ভাষা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা খুব ঠিক্। হিন্দী ও উর্দ্দুর মধ্যে প্রভেদ কেবল এই, যে, উর্দ্দু ফারসী অক্ষরে লেখা হয়, এবং ইহাতে ফারসী আরবী শব্দ বেশী পরিমাণে চালাইবার চেষ্টা মৌলবীরা করিয়া থাকেন; হিন্দী নাগরী অক্ষরে লেখা হয় এবং পণ্ডিতেরা ইহাতে বেশী পরিমাণে নিছক সংস্কৃত শব্দ চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে তাহা মৌলবীদের উর্দ্দুও নহে, পণ্ডিতদের হিন্দীও নহে। তাহাকে হিন্দুস্থানী বলা যাইতে পারে। হিন্দুস্থানী নামটি-দ্বারা হিন্দী ও উর্দ্দু দুইই অভিহিত হইতে পারে।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের যে-সব উদ্দেশ্য আছে, হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের তা ছাড়াও দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে,—(১) নাগরীকে ভারতীয় সমুদয় ভাষার অক্ষর করা, (২) হিন্দীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করা। সমগ্র ভারতে একই লিপি ও একই ভাষা থাকিলে নিশ্চয়ই অনেক সুবিধা হইত। যদি ভবিষ্যতে সমস্ত দেশে এক লিপি ও এক ভাষা হয়, তাহাতে অনেক সুবিধা হইবে। এক লিপি ও এক ভাষার বিস্তার, এ দুটির চেষ্টা পৃথক্ করা দরকার। কেন না, সমস্ত দেশে এক সাধারণ ভাষার ব্যবহার চালাইবার চেষ্টার অর্থ ইহা নহে, যে, ভারতবর্ষে তামিল, তেলুগু, গুজরাতী, মরাঠী, ওড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি ভাষার প্রচলন কথা-বার্ত্তায় ও লেখাপড়ায় আর থাকিবে না, লোকে ঘরে ও বাহিরে কথা বলিবে কেবল হিন্দীতে এবং চিঠীপত্র ও পুস্তকাদি লিখিবে কেবল হিন্দীতে; এই চেষ্টার অর্থ এই, যে, অন্যান্য ভাষার ব্যবহার যেমন আছে তেমনি থাক্, কেবল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে কথাবার্ত্তা, বাণিজ্য, ভাব ও চিন্তার বিনিময় প্রভৃতির জন্য হিন্দী ব্যবহৃত হইবে, এবং সব প্রদেশের লোক মাতৃভাষা ছাড়া এই ভাষাটিও শিখিবে। আমরা চেষ্টাটির অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি, এবং এইরূপ বুঝিয়াছি বলিয়া ইহার সমর্থনও সর্ব্বান্তঃকরণে করি। এই অর্থে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা যদি কখন ভারতীয় কোন ভাষা হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানীই হইবে; কেন না, ইহা এখনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ভারতবাসী বুঝে ও ব্যবহার করে। শ্রীযুক্ত গান্ধি বলিয়াছেন যে যদি তামিল ভাষী ও তেলুগুভাষী কতকগুলি লোক হিন্দুস্থানী শিখিয়া পরে উহা স্বস্ব প্রদেশে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হিন্দীসাহিত্যসম্মেলন হইতে কাশী ও এলাহাবাদে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। ইহা সাধু উদ্যম।

হিন্দুস্থানীকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা করিবার মানে যদি কোন হিন্দীপ্রেমিক এই বুঝেন যে অন্য সব দেশীভাষাগুলির ব্যবহার বন্ধ হইয়া ও সেগুলি লুপ্ত হইয়া কেবল হিন্দুস্থানীই চলিবে,

তাহা হইলে এই চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা আমরা দেখিতেছি না। এরূপ চেষ্টার সমর্থন আমরা করিতে পারি না।

কেবল মাত্র, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা, বাণিজ্য ও ভাবচিন্তার বিনিময়ের জন্যই যে আমরা লোককে হিন্দুস্থানী শিখিতে বলি তাহা নহে। প্রাচীন হিন্দীসাহিত্যে অনেক অমূল্য রত্ন আছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইতে পারা পরম লাভ, ও পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আধুনিক হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী ও উর্দ্দু) সাহিত্য মূল্যহীন তাহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে হিন্দুস্থানীর সে প্রাধান্য নাই, প্রাচীন সাহিত্যে যাহা আছে। অবশ্য হিন্দুস্থানী যেরূপ বহুবিস্তৃত এবং ইহা যাঁহাদের মাতৃভাষা ইহা তাঁহাদের এরূপ প্রাণের জিনিষ, তাহাতে কালক্রমে ইহার আধুনিক সাহিত্যও যে খুব প্রতিভাব্যঞ্জক, মর্ম্মস্পর্শী ও শক্তিশালী হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

হিন্দুস্থানীকে ভারতের সাধারণ ভাষা করিবার চেষ্টার অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা উপরে বলিয়াছি। নাগরীকে সাধারণ লিপি করিবার অর্থ ঠিক ওরূপ নয়। ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষের সব ভাষাকেই কেবলমাত্র নাগরীতে লিখিতে হইবে। আমরা এ চেষ্টার সমর্থন করি না। তাহার কারণ অনেক, সংক্ষেপে বলিবার নহে। একটা কারণ এই যে নাগরী অক্ষরের ব্যবহার আর সব অক্ষরের চেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক নহে। যদি ভিন্ন ভিন্ন সব প্রদেশের লোকদিগকে নিজের নিজের লিপি ছাড়িয়া দিতেই হয়, তাহা হইলে যাহা শিখিবার ও ব্যবহার করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ইন্দোরে হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশনে পাটিয়ালা প্রবাসিনী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী এক ঘণ্টা ধরিয়া ভাল হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, ইহা বাঙালীর পক্ষে আহ্লাদের বিষয়।

১৩২৮ বৈশাখ

হিন্দী বহির জন্য পুরস্কার।

কলিকাতায় গত হিন্দী সম্মেলনে ঘোষিত হইয়াছে, যে, কাশীর বাবু গোকুলচাঁদ এই উদ্দেশ্যে চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন যে, উহার বার্ষিক সুদ হইতে বারশত টাকা বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তকের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইবে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান আদি কোন্ বিভাগের পুস্তকের জন্য কোন্ বৎসর পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এ বিষয়ে নিশ্চয়ই নিয়মাবলী প্রণীত হইবে। এইরূপ দান খুব প্রশংসনীয়।

১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

হিন্দী সাহিত্যিক পুরস্কার

বৎসর দুই পূর্ব্বে কলিকাতা-নিবাসী বাবু গোকুলচাঁদ হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনকে চল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ এই সর্ত্তে দেন, যে, উহার আয় হইতে ১২০০ টাকার একটি বার্ষিক পুরস্কার তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতা বাবু মঙ্গলাপ্রসাদের নামে স্থাপিত করিতে হইবে, এবং ঐ পুরস্কার হিন্দীতে লিখিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থের লেখককে দিতে হইবে। এই পুরস্কার সর্ব্বপ্রথমে এই বৎসর পণ্ডিত পদ্মসিংহ শর্ম্মাকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার বাড়ী নায়ক-নাগ্‌লা, চাঁদপুর, জেলা বিজনোর। তিনি হিন্দী কবি বিহারীর "সাতশই" কাব্যের আলোচনা করিয়া যে বহি লিখিয়াছেন, তাহার জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন। শর্ম্মা মহাশয় সংস্কৃত, হিন্দী, প্রাকৃত ও উর্দ্দুতে পণ্ডিত। বার বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে যখন তিনি "ভারতোদয়" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন দক্ষ সমালোচক বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সেবকদিগের জন্য এইরূপ পুরস্কার আর আছে কি না, জানি না; বাংলার সাহিত্যিকদিগের জন্য নাই। হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের হিন্দীর প্রতি অনুরাগ অসামান্য; "হিন্দীপ্রেমী" তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রশংসাবাচক শব্দ।

ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতায় যত হিন্দীভাষী লোক আছেন, হিন্দুস্থানী কোনও শহরে তত লোক নাই। কলিকাতার হিন্দীভাষীদের মধ্যে যেরূপ ধনশালী যত লোক আছেন, হিন্দুস্থানী কোন শহরে সেরূপ ধনশালী তত লোক নাই। এইজন্য, কলিকাতার কোন হিন্দুস্থানী যে হিন্দী সাহিত্যের উন্নতির জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে;—বরং দুঃখের বিষয় এই, যে, এখানকার ক্রোড়পতি হিন্দুস্থানীরা যথোচিত বিদ্যোৎসাহী নহেন।

তবে, পুঁথিগত বিদ্যার চর্চ্চা করিলে, যে, টাকা রোজ্‌গার করিবার ক্ষমতা বাড়ে না, তাহা হিন্দুস্থানীদের স্বদেশবাসী বাঙালীদের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিয়া, ব্যবসাদার হিন্দীভাষীরা যদি বিদ্যার প্রতি বিমুখ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, অর্থোপার্জ্জনের দিক্‌ দিয়া, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনই জীবনের শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; এবং এমন বিদ্যাও বিস্তর আছে, যাহা লাভ করিলে টাকা রোজ্‌গার করিবার ক্ষমতা বাড়ে।

১৩৪৩ বৈশাখ

হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের পাঠাগার ও মিউজিয়ম

গত মাসে এলাহাবাদে নিখিলভারত হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক উক্ত সম্মেলনের পাঠাগার ও মিউজিয়মের নবনির্ম্মিত গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য ইতিমধ্যে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং আরও টাকা লাগিবে। হিন্দীর জন্য এরূপ কাজের নিমিত্ত টাকা তোলা বাংলার জন্য টাকা তোলার চেয়ে সহজ। হিন্দী বাংলার চেয়ে বিস্তৃততর ভূখণ্ডে কথিত হয়, হিন্দী প্রচারের জন্য বহু হিন্দীভাষীর যে উৎসাহ আছে, বাংলা সম্বন্ধে সেরূপ উৎসাহ কম লোকেরই আছে, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হিন্দী বহির জন্য যেরূপ প্রতিবৎসর পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা ও টাকা আছে, বাংলার জন্য সেরূপ কিছু নাই। বাংলার পক্ষে কেবল এইটুকু বলা যায়, যে, এলাহাবাদে এখন হিন্দীর জন্য যে কাজ আরম্ভ হইল, কলিকাতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার মফস্বলস্থ দু-একটি শাখার দ্বারা তাহা অনেক আগে হইতে করা হইতেছে।

হিন্দীর পাঠাগার ও মিউজিয়মের দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করেন, তাহার মধ্যে বলেন:—

"লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিলেও ভাষার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বঙ্গে ভাবের বন্যা আনিয়াছেন এবং বাংলা ভাষাকে প্রাণবান্ ভাষায় পরিণত করিয়াছেন, হিন্দীভাষীর মধ্যে তেমন লোক জন্মগ্রহণ কবিলেই শুধু ইহা সম্ভব হইতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ যে বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু ইহাও সত্য যে বঙ্গে ভাবের বন্যা আসিয়াছে এবং বঙ্গভাষা প্রাণবান্ হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক আরও অনেক কবি ও গদ্যগ্রন্থকারের চেষ্টাতে। হিন্দীভাষীদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, আধুনিক কালে রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া সুপণ্ডিত ও প্রতিভাশালী বহু ব্যক্তি বাংলা-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা বাংলা ভাষাকে কৃপা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই, ইংরেজী লিখিয়া ও ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াই আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু শীর্ষস্থানীয় বাঙালী বাঙালীকে ইংরেজীতে চিঠি লেখার প্রশ্রয় কোন কালে দেন নাই।

হিন্দীভাষীদের মধ্যে এরূপ যুগ আসিয়া কিনা, আমরা অবগত নহি।

মুসলমানি সাহিত্য

১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ

[মুসলমানদের জন্য বিশেষ প্রকার বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রস্তাব]

সম্প্রতি ঢাকায় যে প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি বসিয়াছিল, তাহাতে মুসলমানদের জন্য বিশেষ করিয়া এক প্রকার বাঙ্গালা সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। ঢাকার নবাব, বাঙ্গালীর ঐক্যের শত্রু রাজপুরুষদের হাতে ক্রীড়ার পুতুল। তিনি এই শিক্ষাসমিতির মুরুব্বি। এই প্রস্তাবের মধ্যে, সেই কিছু দিন আগেকার বঙ্গভাষা-বিভাগের সরকারী প্রস্তাব নূতন মূর্ত্তিতে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে। আমরা এরূপ ভাগাভাগি দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের শক্তিক্ষয়ের বিরোধী। ইহা সত্য যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য অতিমাত্রায় হিন্দুসাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণ রহিয়াছে। যে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাট্ বলা হয়, তিনিও এই সংকীর্ণতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই, হিন্দুত্ব ছাড়াইয়া উদার মানবত্বে পৌঁছিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকেও এই দোষ দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে হিন্দুদের দোষ নাই; মুসলমানেরা বাঙ্গালার চর্চ্চা করিলে এই দোষ সারিয়া যাইবে। ইংলন্ড খৃষ্টান দেশ। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র বা ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ বা কার্লাইল প্রভৃতির পুস্তকাবলীতে খৃষ্টীয় সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতার ছাপ নাই। উহাতে উদার মানবীয় ভাবই দেখা যায়। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালী বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করিলে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যেও কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্ত্তে উদার মানবীয় ভাব বা আদর্শ (broad humanity) আসিবে। দুই চারিটা বেশী আরবী ফারসী কথা মুসলমানেরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করেন। তাহার জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ মুসলমান লেখকলেখিকাদের বাঙ্গালা সাধারণ বাঙ্গালারই মত। ইহা বদ্‌লাইবার দরকার নাই। তবে, অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য ভাষা সোজা করা উচিত। কিন্তু অল্পশিক্ষিত হিন্দুদের জন্যও এরূপ সোজা ভাষার দরকার।

আজকাল এই জাতীয়তার আন্দোলনের দিনেও দেখিতেছি, অনেকে জাতীয়ত্ব মানে হিন্দুত্ব মনে করেন। কিন্তু কেবল হিন্দু লইয়া ভারতীয় জাতি (Indian nation) বা বাঙ্গালী জাতি গঠিত নহে। অনেকে ভুলিয়া যান যে সাড়ে চারি কোটি (সপ্তকোটি নহে) বাঙ্গালীর মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী মুসলমান। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-সাহিত্যেও মুসলমান প্রভাব বাড়িবে, এবং মুসলমানের উপরও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাব বাড়িবে। খৃষ্টানেরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও ইঁহাদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। কিন্তু আসল কথা এই যে, স্থায়ী বিশুদ্ধ সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা আমাদের বুঝা দরকার। মুসলমান যদি "কাফের ধ্বংস" নামক পুস্তক লেখেন, তাহা স্থায়ী বাঙ্গালা সাহিত্য হইবে না। খৃষ্টান যদি গীতা ও শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিয়া একটি বহি লেখেন, তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য হইবে না। হিন্দু যদি ব্রাহ্মসমাজ বা খৃষ্টান সমাজ বা বিলাতফেরত সমাজের বিদ্রূপপূর্ণ ছবি আঁকেন, তাহাও বিশুদ্ধ সাহিত্য হইবে না। এ সকলের প্রয়োজন থাকিতে পারে : এখন সে তর্ক

করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বক্তব্য, এই, যে, শেক্‌স্‌পীয়র খৃষ্টান হইয়াও যেমন ম্যাক্‌বেথ লিখিয়াছেন, হ্যমলেট্ লিখিয়াছেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার বা অখৃষ্টানদের কুৎসা করিবার বা ভ্রম দেখাইবার জন্য নহে, বিশ্বজনীন মানব চরিত্র অঙ্কন জন্য, আমাদিগকেও সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। যে বাঙ্গালী পরাধীন, যাহার নারীরূপ অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যে সাম্প্রদায়িকতারূপ কূপের মণ্ডুক, যাহার পথে আরও কত বাধা বিঘ্ন, সে এরূপ সাহিত্য কখনও সৃষ্টি করিতে পারিবে কি না জানি না। তবে বাঙ্গালী প্রেমের কবিতায় এবং ভাগবতী গীতিতে সার্ব্বজনীনতায় পৌঁছিয়াছেন বলিয়া অন্যদিকেও আশা আছে।

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার একটা কুলক্ষণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। মুসলমান বা খৃষ্টান লেখকেরা হিন্দু বা ব্রাহ্ম সম্পাদকের নিকট সমালোচনার্থ প্রায়ই বহি পাঠান না। তদ্রূপ মুসলমান বা খৃষ্টান সম্পাদকের কাছেও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লেখকদের বহি সমালোচনার্থ প্রায় যায় না। কিন্তু সাহিত্যের দ্বার সকলের জন্য মুক্ত; এখানে, যার আছে ভক্তি সে পাবে শক্তি, নাহি জা'ত বিচার।

১৩১৮ কার্ত্তিক
[বঙ্গীয় মুসলমানদের বাঙ্গালা চর্চ্চা]

বঙ্গীয় মুসলমানেরা আপনাদের মধ্যে বাঙ্গালার চর্চ্চা বাড়াইবার জন্য একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। দিনাজপুরের উকীল মৌলবী য়াকীন্ উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে এই সমিতির এক অধিবেশন হয়। তাঁহার দুইটি প্রস্তাব বেশ ভাল :— (১) মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিতে গেলে যে সকল আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, সেইগুলির অর্থসহ একটি তালিকা প্রকাশ। (২) বটতলার ছাপা মুসলমানী বহিসকল সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে অশ্লীলতাবর্জিত ও সংশোধিত করিয়া প্রকাশ।

১৩২২ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্য-পরিষদের মুসলমান সদস্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকায় লেখা হইয়াছে :—

বঙ্গদেশে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বড় কম নহে এবং অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, এই সংখ্যা উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও প্রভাব দেদীপ্যমান। বর্ত্তমান সময়েও আমাদের অনেক মুসলমান ভ্রাতা অত্যন্ত উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত বঙ্গভাষার সেবায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের পরিচালিত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহারাই দিন দিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, আর তাহার পঠন-পাঠন বাঙ্গালী মুসলমানের একান্ত কর্ত্তব্য। গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনেও চট্টগ্রামের প্রবীণ সাহিত্যিক মুনশী আবদুল করিম সাহেব উহা সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়া গিয়াছেন; অথচ বাঙ্গালার এই সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য-পরিষদেই মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা এ বিষয়ে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বঙ্গদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্পত্তি। উভয় সম্প্রদায় একযোগে কার্য্য না করিলে ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে। এতদিন ইহা ছিল না বলিয়াই "মুসলমানী বাঙ্গালা" নামে একটা মিশ্রভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ কাল সহৃদয়, শিক্ষিত, বাঙ্গালার সুলেখক মুসলমান ভ্রাতারা সেই অপভাষাকে দমন করিবার চেস্টা করিতেছেন। এইরূপ একক্রিয়তাই বাঞ্ছনীয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মুসলমান শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আশানুরূপ পাইতেছেন না, ইহা বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানেরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হইয়া আরব্য ও পারস্য ভাষায় নিহিত নানাবিধ রত্ন-সম্ভার উদ্ধার করিয়া তাঁহাদেরই মাতৃভাষা বঙ্গবাণীর মন্দিরে উৎসর্গ করিবেন। বঙ্গভাষার অঙ্গ সেই-সকল রত্নে সুশোভিত হইলে তাঁহাদের এবং তাঁহাদেরই মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। ইহাও সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম আশা। আশা করি, আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না এবং সাহিত্য-পরিষদে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

পরিষদের কর্ম্মকর্ত্তাদের যে এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। বর্ত্তমানে রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য যে ভূখণ্ডকে বাংলাদেশ বলা হয়, তাহাতে হিন্দু আছেন ২ কোটি ৯ লক্ষ, মুসলমান আছেন ২ কোটি ৪২ লক্ষ। অতএব বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে উভয় সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগিতা আবশ্যক। পরিষদের মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প কেন, তাহা স্থির করিতে চেস্টা করা উচিত। শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যার অল্পতা বা তাঁহাদের ঔদাসীন্য ছাড়া আর কোন কারণ আছে কিনা, তাহা শিক্ষিত মুসলমানদিগের নিকট হইতে জানা উচিত।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিদ্যালয়-গৃহে মুসলমানদিগের মধ্যে বাংলার চর্চ্চা বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের একটি সভা হয়। তাহাতে মফঃস্বল হইতেও শিক্ষিত মুসলমানেরা আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রভৃতি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মনে পড়িতেছে যে সভাস্থলে

কোন কোন মুসলমান বক্তা এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ করেন, যে, বাংলা হিন্দুদের মত তাঁহাদেরও মাতৃভাষা, কিন্তু হিন্দুদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আছে, মুসলমানদের তদ্রূপ কোন সমিতি বা পরিষৎ নাই। আমরা ঐ সভায় কিছু বলিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ইহাও বলিয়াছিলাম যে সাহিত্য-পরিষৎকে কেবল হিন্দুর সমিতি মনে করা ভুল, বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে তাহাদের সকলেরই পরিষদে দাবী আছে। আমাদের মনে হয় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এরূপ ধারণা আছে যে পরিষৎ হিন্দু সমিতি। এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা শিক্ষিত মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

১৩৩৯ বৈশাখ
মুস্লিম সাহিত্যসমাজ

মুস্লিম সাহিত্যসমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহ্‌মদ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার একস্থলে লিখিত হইয়াছে :—

কবি বলিয়াছেন—

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে॥

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—যে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আমাতেই অবস্থান করেন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, এই সেবা দ্বারাই জীবনসমস্যা সমাধান করিতে হইবে এবং এই সেবার আদর্শে জীবনযাত্রাই মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেবার অর্থ ইহা নহে যে, একজনকে দুইটি পয়সা দিয়া তাহার কর্ম্মশক্তিকে বিনাশ করিয়া দিতে হইবে। সেবার প্রকৃত অর্থ মানুষের বিধিমত অভাবমোচন। সেবার প্রেরণায়ই মানব আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে ব্যক্তি তত উন্নত যে যত বেশী লোকের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে; সেই জাতিই উন্নতিশীল যে আপনার সেবার মহিমায় অন্যের অভাব অভিযোগের সমাধানে সমর্থ হইয়াছে। বেতারযন্ত্র, উড়ো জাহাজ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ যাহা জগৎবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে তাহা সকলই কি এই সেবার প্রেরণার ফল নয়? এই বৈজ্ঞানিক উন্নতি কোরানবিশ্বাসীগণের করা উচিত ছিল, এবং বাস্তবিকই একদিন কোরানবিশ্বাসীগণ জ্ঞানগরিমায় সমস্ত জগতের বরণীয় ছিলেন।

মুসলমান সমাজে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সেবার---ন্যূনকল্পে কেবল মুসলমানদের সেবার—প্রবৃত্তি জাগিলে প্রভূত কল্যাণ হইবে। তাঁহারা বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলেও উপকৃত হইবেন।

মুসলমান বাঙালীর অতীত গৌরব

বঙ্গীয় মুসলিম তরুণসংঘের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মৌলবী সেরাজ উল হক্ যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে অনেক খাঁটি কথা আছে। তাঁহার মুসলমান শ্রোতারাও যে তাহাতে সায় দিয়াছিলেন, ইহা আশাপ্রদ। তাঁহার বক্তৃতার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সমবেত তরুণ বন্ধুবর্গ! নিখিলের কেন্দ্রে জাগরণ-ভেরী নিনাদিত হওয়ায় সমস্ত দেশের সমগ্র জাতি রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মত্ত, প্রমত্ত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানগণ আজ নিজেদের অদূরদর্শিতা, গোঁড়ামী এবং অন্ধতার ফলে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ভ্রাতৃগণ! আজ তুরস্ক, ইরান, পারস্য প্রভৃতি নিজ নিজ দেশের প্রাচীন স্মৃতি স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্বগৌরবের 'সংবোধ' ও 'সংবেদ' লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। আরব আরবের ভাবে, পারস্য পারস্যের ভাবে, তুরস্ক তুরস্কের ভাবেই জাগিতেছে। পারস্য, তুরস্ক, আফগানীস্থান, আরব-গৌরবের কানাকড়িও গ্রহণ না করিয়া স্বকীয় অমুসলমান পূর্ব্বপুরুষদের অতীত যুগের কীর্ত্তিকাহিনীর, গৌরবকাহিনীর, স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়া আধুনিক দুনিয়ার স্কেল কম্পাস হাতে পলিটিক্স ও পলিসির মারপেঁচ দেখিয়া দূরবীক্ষণ চোখে নূতন রাষ্ট্রজীবন গঠন করিতেছে।

মহোদয়গণ! পারস্য আরবীয় যুগের বিজাতীয় গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগের জামশেদ, জোহাক, ফরিদুন, কায়কোবাদ, খশরু, এবং জাল ও রোস্তমের নামেই মাতিয়া উঠিতেছে। প্রাচীন জেন্দাবেস্তার ধর্ম্ম বা আধুনিক কোরানের ধর্ম্ম এই জাতীয় গৌরবের আলোকপুঞ্জের পথে কোন ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। তুরস্কও তাহার বৌদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ চেঙ্গীস্, হালাকু, কুবলয় ও মঙ্গুখাঁ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবর্গের ছবি বা আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জাগিয়া উঠিতেছে। মোস্তফা কামাল পাশা আরবীয় পর্দ্দা ও বোরকা ঝাড়িয়া ফেলিয়াই আধুনিক তুর্কী রমণীদিগকে প্রাচীন তুর্কী রমণীদিগের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে ও গিরিশৃঙ্গে ধাবিত এবং সাগরতরঙ্গে দোলায়িত হইতে শিক্ষা দিয়াছেন। কারণ এই প্রকার স্বাধীনচেতা তেজস্বিনী রমণী ব্যতীত অরিনিসূদন বীর সন্তান লাভ করা অসম্ভব।—কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণই ভারতের প্রাচীন গৌরবময় মহিমাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। (শুনুন, শুনুন)।

অতঃপর বক্তা বলিতেছেন—

বন্ধুগণ! যে-সকল মুসলমানের রক্তে এখনও হিন্দু রক্তের তাজা গন্ধ আছে, তাঁহারা পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা এবং অতুলনীয় ক্ষাত্রবীর্য্যমহিমার বাণী ভুলিয়া গিয়াছেন এবং সেই ভুলিয়া যাওয়াটাকেই গৌরবকর বোধ করেন! (বিস্ময়কোলাহল)। মহোদয়গণ! যে মহাবীর ভীষ্ম, সত্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র, সব্যসাচী অর্জ্জুন, শূরকুলসূর্য্য কর্ণ প্রভৃতি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিবংশীয়গণের অসাধারণ বীর্য্যগরিমার জন্য কোন গৌরবই বোধ করে না এবং করাটাকেও কলঙ্কজনক মনে করে, অন্যদিকে সে আরব বা পারস্যের বীরপুরুষদিগের গৌরবের বড়াই করিলেও তাহাতে মনে কোন জোর পায় না, কারণ সে জানে যে, তাহাদের সঙ্গে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই। (করতালি-ধ্বনি)।

ইহার ফলও মৌলবী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—

ভ্রাতৃগণ! বিগত দশ বৎসর কাল প্রচারকার্য্যের জন্য বাংলার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু সভাসমিতিতে যোগদানকরতঃ অনেক সময় বিশাল জনশ্রেণীকে উত্তেজিত করিবার ও গৌরবে মাতাইবার জন্য মুসলিম গৌরবগাথার প্রাণময়ী উদ্বোধিনী বাণী শুনাইয়াছি। তাহার ফলে মূর্খ লোকদের চেহারায় কোন প্রকার আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে দেখি নাই। বরং

লজ্জায় অনেকের মুখ মলিন হইতেই দেখিয়াছি। (শোন! শোন!!) কারণ মিথ্যা গৌরবকে বরণ করিয়া লইতে মন বেচারা কোন প্রকারেই প্রস্তুত নহে। মহোদয়বৃন্দ! এই জন্য দেখিতে পাই—বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সামান্য-সংখ্যক মোগল, পাঠান ও খাঁটী সৈয়দের সন্তান ব্যতীত আর কাহারও মনে স্বাধীনতার ভাব, আত্মমর্য্যাদা, আত্মগৌরব, আত্মবিশ্বাস, আত্মানুভূতি ও আত্মসম্ভ্রমশীলতা নাই। (হাঁ হাঁ)। ইহার ফলে অধুনা আমাদের শত শত যুবা গ্র্যাজুয়েট, আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট হইলেও আত্মানুভূতি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রমশীলতার অভাবে শ্রেষ্ঠবংশসম্ভূত উচ্চশ্রেণীর জ্ঞানগরিমা ও গুণমহিমা তাহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে না। অথচ বাংলার এই লক্ষ লক্ষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুতের জ্যোতি ও তেজপূর্ণ রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান আছে। (শোন শোন)। কিন্তু তাহারা কেহই সেই গৌরবের স্মৃতি সম্মুখে ধরিতে না পারায় নীচতা ও অন্ধকারেই ঘুরপাক খাইতেছে। কেহ কেহ কৃত্রিমভাবে আপনাদিগকে মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ বলিয়া দাবি করিলেও মন তাহাতে মোটেই জোর পাইতেছে না। তার মানে, মনের কাছে কোন চালাকিই খাটিতে পারে না। বাংলার মুসলমানদের দুর্গতির ইহাই এক কারণ! (নিশ্চয় নিশ্চয়—বিস্ময়ধ্বনি)।

ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে প্রভেদ কি হইয়াছে, বক্তা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বন্ধুবর্গ! আজ যেখানে অতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও আর্য্য গৌরব-গরিমা-কাহিনীতে মাতিয়া উঠিতেছে এবং বুকের পাটা উঁচু করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পতাকা লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান যুবক গৌবব ও মহিমার পথে কিছুই অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। (শোন শোন)। যখন শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীম, পার্থ, কর্ণ, প্রভৃতি বীরপুরুষগণ, কিম্বা কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, গৌতম, জৈমিনী প্রভৃতি জগৎগুরু দার্শনিকগণ, অথবা ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, ভারবী, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভাস প্রভৃতি কবিগণ, বা চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ভিষকগণ, এবং ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী অথবা সতীকুলশিরোমণি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, প্রভৃতি মহাপুরুষ ও মহতী নারীবৃন্দের গৌরবের কথায় হিন্দু ছাত্র বা যুবকের বুক ফুলিয়া ওঠে, ঠিক সেই সময়ে হিন্দুকুল সম্ভূত মুসলমান ছাত্র ও যুবকদের মন দমিয়া যায়। তাহারা চারিদিক হাতড়াইয়া গৌরবের কিছুই দেখিতে পায় না! কি ভীষণ ব্যবস্থা! (শোন শোন)। অথচ হিন্দু ছাত্র এবং সেই হিন্দুকুলসম্ভূত মুসলমান ছাত্রের পক্ষে প্রাচীন ভারতের গৌরবের অধিকার সম্পূর্ণ তুল্য! (শোন শোন। করতালিধ্বনি)।

বক্তা মুসলমান বাঙালীদিগকে তাঁহার অনুরোধ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন।

তরুণমণ্ডলি! আজ বিশ্বের জাগরণ-দিনে আমাদের জাতীয় জীবনের গভীর দুর্দ্দিনে তরুণ ছাত্রবর্গকে মুসলমান নেতৃবৃন্দের আদেশ ও অনুরোধ, তাঁহারা যেন প্রাচীন ভারতের জ্বালাময় গৌরবের জন্য মুসলমানদিগকেও দাবীদার করিতে চেষ্টা করেন। অন্যথায় মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় জীবনের অভ্যুত্থান সুদূরপরাহত হইয়াই থাকিবে।

তিনি বলেন,

মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, জাঠ, রাজপুত ও শিখ ছিল। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে প্রাচীন হিন্দুর বেদ বেদান্ত উপনিষদ, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, কাব্য, মহাকাব্য ও দর্শন এবং বিজ্ঞান রচনায় জ্ঞানের সে গৌরব—সে গৌরবের কাছে প্রাচীন গ্রীক ব্যতীত প্রাচীন ফিনিসিয়া, মিডিয়া, জুডিয়া, বাক্‌ট্রিয়া, কার্থেজ, রোম, মিনার, কালডিয়া, ট্রয়, বাবিলে নিয়া ও পার্থিয়া প্রভৃতি সকলেরই মাথা নত। অথচ সেই প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের মহাজ্যোতিঃ হইতে ভারতীয় মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিলে মুসলমানেরা কখনও ভারত-বক্ষে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এজন্য হিন্দুকে শুধু আপনার মনে করিলে চলিবে না, তাহার সমস্ত গৌরবকেই হিন্দুর ন্যায় কুক্ষিগত করিয়া লইতে হইবে। (বিস্ময়, আনন্দ ও করতালিধ্বনি)।

১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন

গত বৈশাখ মাসে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে যাঁহারা সরকারী ও বেসরকারী হিসাবে বাঙালী মুসলমানদের নেতা বলিয়া গৃহীত হন এবং যাঁহারা তাঁহাদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক নেতা বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহারা কোন-না-কোন প্রকারে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা এবং সাধ্যমত তাহার পরিপুষ্টি সাধন বাঙালী মুসলমানদের কর্ত্তব্য বলিয়া সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে নির্দেশ বা স্বীকার করেন। ইহাও তাঁহাদের কথায় ব্যক্ত হয় বা স্পষ্ট উহ্য থাকে যে, বাংলা বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গে যত মুসলমানের বাস, অন্য কোন প্রদেশে তত নহে। এই কারণে বাংলাকেই বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকৃতির গুরুত্ব আছে। কারণ, অনেক অবাঙালী ও কোন কোন বাঙালী মুসলমান উর্দুকে বাঙালী মুসলমানদেরও মাতৃভাষা বলিয়া চালাইতে বা বানাইতে অভিলাষী। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। তামিল যে-সব মুসলমানের মাতৃভাষা, তাঁহারা যেমন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, বাংলা যে-সকল মুসলমানের মাতৃভাষা তাঁহারাও সেইরূপ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু মাতৃভাষা বলিয়া নহে।

প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খাঁ বাহাদুর আজিজল হক সাহেব প্রভৃতি সকলেই বঙ্গের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি যেমন প্রার্থনীয় মনে করেন, সেই সঙ্গে ইহাও বলেন যে, সাহিত্যিকদিগের চেষ্টায় সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট বা প্রশমিত হইতে পারে। তাঁহাদের এই ইচ্ছা প্রকাশ ফলপ্রসূ হইলে সুখের বিষয় হইবে।

মুসলমান সাহিত্য-সম্মেলনে মুসলমান মহিলা ও ভদ্রব্যক্তিগণ যে অভিভাষণগুলি পাঠ করিয়াছেন বা মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া খবরের কাগজে লেখা না-থাকিলে শুধু ভাষা হইতে বুঝা যাইত না যে, সেগুলি মুসলমানদের লিখিত বা কথিত। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান বাঙালীদের ও তাঁহাদের প্রতিবেশী হিন্দু বাঙালীদের ভাষা—অন্ততঃ উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত লোকদের ভাষা—এক, এবং মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্য পুস্তকসকলে যে "মুসলমানী" বাংলা চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা কৃত্রিম জিনিষ। শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান-সমাজে ইহার আদর নাই, তাহা সম্মেলনটির অভিভাষণ ও বক্তৃতাগুলির ভাষা হইতে ও তাহার অন্তর্গত কোন কোন উক্তি হইতে বুঝা যায়।

এই সম্পর্কে সম্মেলনের মূল সভাপতি সাহিত্যবিশারদ পণ্ডিত আবদুল করীম মহাশয়ের অভিভাষণের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্যিক জাগরণের যে দিকটি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবেশীদের চোখে পড়িয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ভাষাসংশ্লিষ্ট। তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরা বাঙ্গালা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। এই অভিযোগ একেবারে অসার নহে। কতিপয় প্রতিক্রিয়াশীল

মুসলমান লেখক (আমি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যিক বলিলাম না) আজ যেন কোমর বাঁধিয়া কাজে অকাজে বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত বা অল্প-প্রচলিত ফারসী বা আরবী শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুলেখকদের অদ্ভুত সংস্কৃত শব্দের আমদানীর অত্যাচারে বা সংস্কৃত ব্যাকরণের জুলুমে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা যে-অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের লেখায়ও বাঙ্গালা ভাষার সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তবে আতঙ্কিত জনগণ নিজেদের দোষের প্রতি যেমন উদার, মুসলমানদের দোষের প্রতি তেমন অসহিষ্ণু। এই জন্যই তাঁহারা মনে করেন, বাঙ্গালা ভাষা দ্বিখণ্ডিত হইতে উপক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী—সংস্কৃত নহে। আরবী বা ফারসীর সহিত বাঙ্গালা ভাষার সৌষ্ঠববৃদ্ধির যে-সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিতও ইহার সেই একই সম্বন্ধ।

কারণে অকারণে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের আমদানীতে যদি ভাষার প্রতি জুলুম করা না হয়, তবে আরবী বা ফারসীর আমদানীতে কেন তাহা ঘটে, তাহা সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারা কঠিন। আমার মতে এই উভয় প্রকারেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি জুলুম করা হয়। এই দুই দলের হাত হইতেই বাঙ্গালা ভাষাকে বাঁচাইতে হইবে।

হাজার হাজার এরূপ শব্দ অতীত কালের ও বর্ত্তমান কালের বাংলা বহিতে ও রচনায় আছে যাহা বাংলা বটে, সংস্কৃতও বটে। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আছে যাহার চলন সংস্কৃতে আছে কিন্তু বাংলায় নাই। বাংলা রচনায় এই রকম শব্দের আমদানী অবাঞ্ছনীয়। এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা রচনায় লেখকেরা অত্যধিক পরিমাণে অনাবশ্যক ঐরূপ সংস্কৃত শব্দ চালাইতেন। ঐ প্রকার আচরণের বিরুদ্ধে, মুসলমানদের তিরস্কার বা উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া, হিন্দুরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংগ্রাম. করিয়া আসিতেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণকেই বাংলা ব্যাকরণ মনে না-করিয়া খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনায় হিন্দু বাঙালীরা রামমোহন রায়ের সময় হইতে মন দিয়া আসিতেছেন, এবং অনেক হিন্দু আভিধানিক ছোট ও বড় বাংলা অভিধান হইতে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়াছেন। ফলে, দেখা যাইতেছে, এখন এমন প্রসিদ্ধ বা কতকটা প্রসিদ্ধ হিন্দু বাঙালী লেখক নাই বা খুব কম আছেন যাঁহাদের লেখা সংস্কৃত-শব্দবহুল বা অকারণ সংস্কৃত শব্দবহুল। যাঁহারা বর্ত্তমানে অকারণে তাঁহাদের রচনায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ আমদানী করিতেছেন,—যদি এরূপ সাহিত্যিক থাকেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইলে বুঝা যাইত তাঁহারা কে। সংস্কৃত দর্শন বা শাস্ত্র-গ্রন্থাদির অনুবাদে বা আলোচনায় এরূপ শব্দের ব্যবহার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়. সেগুলি তাহা নহে।

বাংলা ভাষার জননী প্রাকৃত হইলেও, সংস্কৃতের সহিত যে বাংলার নিকট সম্পর্ক আছে এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত যে পরস্পরের সহিত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ, তাহাও ভুলিলে চলিবে না। একই ভূখণ্ডে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাংলার জন্ম; তাহারা একই ভাষাবংশে জাত। আরবীব সহিত বাংলার বা প্রাকৃতের ভাষিক কোন সম্পর্ক নাই। আরবীর জন্ম আলাদা ভূখণ্ডে পৃথক্ ভাষিক বংশে। আরবী হিব্রু প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত লাটিন গ্রীক প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ অন্য একটি শ্রেণীর ভাষা। এই জন্য ইহা স্বীকার্য্য নহে যে, আরবীর সহিত বাংলা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির যে-সম্বন্ধ, সংস্কৃতের সহিতও ইহার সেই একই সম্বন্ধ। অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দও বাংলায় আমদানী করিলে তাহা বাংলায় সহিত যেমন খাপ খায়, অপ্রচলিত আববী শব্দ আমদানী করিলে তেমন

খাপ খায় না। সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় আরবী ও ফারসীকে এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই দুটি ভাষা ভিন্নজাতীয়। যে-সকল আরবী বা অন্য বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় আসিয়াছে, আমরা সেগুলি রাখার পক্ষপাতী, কিন্তু নূতন আরবী শব্দ আনার বিরোধী।

আমরা অকারণে বাংলায় সংস্কৃত শব্দের আমদানীর বিরোধী। কিন্তু ন্যায্য ও সঙ্গত "কারণে", অর্থাৎ যদি বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি পারিভাষিক নূতন শব্দের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমরা সংস্কৃতের সাহায্য গ্রহণ করিতে চাই। ইহাকে আমরা জুলুম মনে করি না, করিব না। বাংলা ভাষা সম্পর্কে সংস্কৃত ও আরবীকে একই শ্রেণী বা পর্য্যায়ে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহা ভাষাবিজ্ঞানসম্মতও নহে।

সাহিত্য : বিবিধ

১৩১৮ শ্রাবণ

[সাময়িকপত্রের প্রচারসংখ্যা]

১২ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে দেখিলাম, গত ৩১শে মার্চ্চ যে তিন মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম বাঙ্গালায় একভাষায় মোট ৬৯৩ খানি, দ্বিভাষায় ১৩৭ খানি, ত্রিভাষায় ২ খানি, সর্ব্বসমেত ৮৪৮ খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে একভাষায় বাঙ্গালা ৩০০, ইংরাজী ১৯০, উড়িয়া ৯১, হিন্দী ৩৫, সংস্কৃত ৩২, ও উর্দ্দু ১৯ খানি। সাময়িক পত্র এক ভাষায় ৩০১, দ্বিভাষায় ২৩ এবং বহুভাষায় ১ খানি বাহির হইয়াছে। এক ভাষায় বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের সংখ্যা ১৬৫, ইংরাজীর ১১৩। ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে প্রকাশিত বিবিধ বিষয়ক প্রধান প্রধান বাঙ্গালা সাময়িক পত্রগুলি কত ছাপা হইয়াছিল তাহা, ইংরাজী বর্ণানুক্রমে, কলিকাতা গেজেটে এইরূপ লেখা আছে :— অর্চ্চনা ৫০০, অর্ঘ্য ৫০০, আর্য্যাবর্ত্ত ৬০০, ভারতী ১৬০০, দেবালয় ১০০০, মানসী ৭৫০, মুকুল ১০০০, মৃণ্ময়ী ২০০, নব্যভারত ১৫০০ (মাঘ ফাল্গুন ১৬০০), প্রকৃতি ১০০০, প্রবাসী ৪০০০, সাহিত্য ১০০০, সাহিত্য সংহিতা ৫০০, শিল্প ও সাহিত্য ৫০০, সুপ্রভাত ৯০০, বামাবোধিনী পত্রিকা ৭৫০, বঙ্গদর্শন ৮০০, বাণী ১১০০, বীরভূমি ১০০০, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৩০০।

বর্ত্তমান বৎসরে প্রবাসী ৫০০০ করিয়া ছাপা হইতেছে।

১৩২১ আষাঢ়
কবিতার আদর।

আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক ম্যাকমিলন কোম্পানীর সভাপতি জর্জ ব্রেট বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্যে কবিতারই বিক্রী বেশী। উপন্যাসের কাট্‌তি খুব ছিল; কিন্তু এখন যে-কোন উপন্যাস বায়োস্কোপে দেখান যায়। কবিতা ত বায়োস্কোপে দেখাবার জিনিষ নয়।

ব্রেট্ বলেন, যাঁহার খাঁটি কবিপ্রতিভা আছে, তাঁহার এখন যত শ্রোতা জুটিবে, পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও তত বেশী শ্রোতা কোন সাহিত্যিকের জুটে নাই। অন্যান্য গ্রন্থকারের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া বলেন, "যে-সব উপন্যাসের কাট্‌তি খুব বেশী, ইঁহার কাব্যগ্রন্থের বিক্রী তার চেয়েও বেশী। তাঁহার "Gardener"এর বিক্রী আমেরিকাতেই এক লক্ষের উপর হইয়াছে। লোস্ এঞ্জেলীস্ সহরের একজন পুস্তকবিক্রেতাই ঐ বহি ৫০০ খানা বিক্রী করিয়াছে। টেনিসনের খ্যাতি প্রতিপত্তি যখন চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল, তখন তাঁহার এক এক খানি নূতন কাব্যগ্রন্থ বাহির হইবামাত্র ইউরোপ আমেরিকা উভয় মহাদেশে কথা-প্রসঙ্গের বিষয় হইয়া উঠিত। তাহার পর আর কাব্যগ্রন্থের বিক্রী কখনও বর্ত্তমান সময়ের মত হয় নাই।" রবিবাবুর Gardener কয়েক মাস মাত্র বাহির হইয়াছে।

আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য নানাবিধ পুস্তকের মধ্যে কাব্যগ্রন্থের বিক্রীই সর্ব্বাপেক্ষা কম।

১৩২২ পৌষ
ইংলণ্ডে সম্পাদকের উপার্জ্জন

ইংলণ্ডে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজের সম্পাদকেরা কিরূপ বেতন পান, বা উপার্জ্জন করেন, জানি না। তবে পূর্ব্বে একখানি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক কিরূপ বেতন পাইতেন, তাহা সম্প্রতি আমাদের চোখে পড়িয়াছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্কটের দৌহিত্র লক্‌হার্ট ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কোয়াটার্লী রিভিউ নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রখানি এখনও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। লক্‌হার্ট বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড বা ১৫০০০, টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। তদ্ভিন্ন, তিনি কোন প্রবন্ধ লিখিলে তাহার জন্য স্বতন্ত্র দক্ষিণা পাইতেন।

আমাদের দেশে অ-সম্পাদকেরা ও হিংসুটে সম্পাদকেরা কোন কোন সম্পাদকের অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিয়া ম্রিয়মাণ হন বটে; কিন্তু বিলাতী ত্রৈমাসিকের চারিটি সংখ্যা বৎসরে বাহির

করিবার জন্য ৯০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ সম্পাদককে যে বেতন দেওয়া হইত, আমাদের দেশে কোন দৈনিক কাগজেরই দেশী সম্পাদক বর্ত্তমানেও তাহার এক-তৃতীয়াংশ বেতন পান না; মাসিকপত্র-সম্পাদকের ত কথাই নাই।

১৩২৩ শ্রাবণ

ভ্যাঙান।

ছেলেমেয়েদের জন্য খৃষ্টিয়ানদের "বালক" নামে একটি মাসিক কাগজ আছে। তাহার বর্ত্তমান বৎসরের মার্চ্চ সংখ্যায়, "দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন", শীর্ষক ধর্ম্মসঙ্গীতটির একটি "রঙ্গানুকৃতি" দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রচলিত কবিতার ব্যঙ্গ অনুকরণ রচনা করিবার একটা রীতি আছে বটে; কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ধর্ম্মসংগীতগুলিকে না ভ্যাঙাইলেই ভাল হয়;—বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশিত কাগজে।

১৩২৫ আষাঢ়

আমেরিকার নিগ্রোদের একখানি মাসিক

আমেরিকার নিগ্রোদের ক্রাইসিস (The Crisis) নামক একখানি মাসিকপত্র সাত বৎসর আট মাস পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার কাট্‌তি এখন মাসে এক লক্ষ। আমেরিকার নিগ্রোদের সংখ্যা এককোটি কুড়ি লক্ষ। বাঙালীদের সংখ্যা চারি কোটি আশি লক্ষের উপর, অর্থাৎ আমেরিকার নিগ্রোদের চারিগুণ। বাংলা দেশে কোন একখানি মাসিক কাগজের একলক্ষ কাট্‌তি ত হয়ই না, সমুদয় মাসিকগুলি জড়াইলেও তাহাদের মোট কাট্‌তি একলক্ষ হইবে না, অনেক কম হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে বাঙালীদের মধ্যে যতটা লেখাপড়ার বিস্তার হইয়াছে, আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে তদপেক্ষা লেখাপড়ার প্রচলন বেশী হইয়াছে, এবং পাঠে অনুরাগও তাহাদের বেশী। আর একটা কথা;—কিনিবার সামর্থ্য থাকিতে ধার করিয়া কাগজ পড়া আমেরিকায় সম্মানবর্দ্ধক বিবেচিত হয় না।

১৩২৫ পৌষ
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার জন্য দান

সম্প্রতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে যে বাংলা এবং আরও কোন কোন দেশীভাষা ও সাহিত্যে পরীক্ষা দিয়া ছাত্রেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধি পাইতে পারিবে। বোধ হয় সেই উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার জন্য মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বিশহাজার টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দান তাঁহার পক্ষে নূতন নহে। অধ্যাপক অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ উদ্দেশ্যে সাড়ে পনর হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়াছেন। ইঁহার রচিত ইংরেজী ভারতবর্ষের ইতিহাস কয়েকবার প্রবেশিকার পাঠ্যপুস্তক থাকায় ইনি অনেক পনর হাজার টাকা পাইয়াছেন, এবং এখনও পাইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা হইলেও এই দান প্রশংসনীয়। আরও অনেকে, যুগপৎ এবং একাধারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, অধ্যাপক, পাঠ্যপুস্তকলেখক, বক্তা প্রভৃতি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনেক হাজার টাকা পাইয়াছেন এবং এখনও পাইতেছেন। তাঁহারা লাভের কিছু অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে দিলে ভাল হয়। আশুবাবু তাঁহার প্রিয়পাত্রদিগকে হুকুম না করিলে তাঁহাদের দানশীল হইবার সম্ভাবনা নাই।

১৩২৭ কার্ত্তিক
বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরেজ বিদ্বানের মত

শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডার্সন্ বাংলা দেশে সিবিল সার্বিসে কাজ করিতেন। অনেক বৎসর হইল, তিনি পেন্স্যন লইয়া কেম্ব্রিজে বাস করিতেছেন। তিনি সেখানে ও লণ্ডনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শৈশবের ৮।৯ বৎসর এদেশেই যাপন করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ আছে। তিনি হিন্দী, অসমীয়া, প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা জানেন, এবং নিজ মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাও জানেন। তাঁহাকে সাহিত্যাচার্য্য (Doctor of Literature) উপাধি দিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার পাণ্ডিত্য স্বীকার করিয়াছেন ও তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক উন্নতির উল্লেখ করিয়া কয়েকবার ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে লণ্ডন টাইম্সের সাহিত্যিক ক্রোড়পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"It happens that the first volume of a new series of Cambridge Guides to Modern Languages is a little manual of the Bengali language. It is much to be hoped that this is a facit academical recognition of the fact that our forty-five millions of Bengali fellow-subjects

possess a great modern literature already comparable with those of the nations of Europe, and full of a promise which in some. Western nations has for the time been ruined by the political and social results of war... novels,... a modern form of literary art in which Bengal stands apart from other Indian nations and provinces, a new modern literature which deserves the same attentive and respectful study that we give to the fiction of France and Germany".

তিনি আরও লিখিয়াছেন :—

"Surely we should be proud that in the British Empire we have now at least two great literatures."

"নিশ্চয়ই আমাদের গৌরব অনুভব করা উচিত যে এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুইটি (অর্থাৎ ইংরেজী ও বাংলা) মহৎ সাহিত্য বিদ্যমান আছে।"

সাহিত্যাচার্য্য এণ্ডার্সন্ মহাশয় বাংলা দেশ তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

১৩২৭ ফাল্গুন

চাষী গাড়ী-চালক জেলে ও মাঝির নোবেল্-পুরস্কার প্রাপ্তি।

নরওয়ের ঔপন্যাসিক ক্নুট্ হাম্সন্ (Knut Hamsun) সাহিত্যের নোবেল্ পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বাঙালীজাতি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকেরাই এই পু স্কার পান।

ক্নুট্ হাম্সন্ গত (উনবিংশ) শতাব্দীর আশীর কোটায় প্রথম যৌবনে আমেরিকার শিকাগো শহরে ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়ীর চালক (conductor) ছিলেন, তার আগে একজন কৃষকের ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া মজুরী পাইতেন। যখন কণ্ডাক্টারী করিতেন, তখন তাঁহার কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া কোটের আস্তিন্ হাতের কব্জি পর্য্যন্ত পৌঁছিত না; এত গরীব তিনি ছিলেন। অথচ কোটের পকেট বহিতে পূর্ণ থাকিত,—ইউরিপিডিস্, আরিস্টট্ল, থ্যাকারে, প্রভৃতির বহি। গাড়ী-চালকের কাজ করিবার সময়ও তাঁর দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি এমনতর ছিল যে বোধ হইত যেন তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! এমন ছেলের দ্বারা কণ্ডাক্টারের কাজ যে চলিতে পারে না, তাহা ত বুঝাই যাইতেছে। চলিলও না। তিনি পদচ্যুত হইলেন। তার পর তিনি একজন জেলের মাছ ধরিবার নৌকায় মজুর নিযুক্ত হন। পরে নাবিকের চাকরী লইয়া আমেরিকা হইতে স্বদেশ নরওয়েতে ফিরিয়া যান।

পাশ্চাত্য দেশ-সকলে শ্রেণীনির্ব্বিশেষে গুণী ও শক্তিশালী লোকদের কাছে সাফল্য ও সম্মানের দ্বার যতটা উদ্ঘাটিত, আমাদের দেশে ততটা নয়; পাশ্চাত্য দেশ সকলে দৈহিকশ্রমজীবী ও মানসিকশ্রমজীবী লোকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ও পার্থক্য ততটা নাই, যত আমাদের দেশে আছে; তথায় মানুষ অপেক্ষাকৃত অল্প বাধা অতিক্রম করিয়া একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে যাইতে

পারে, আমাদের দেশে পারে না; তথায় শিক্ষার বিস্তার সকল শ্রেণীর মধ্যে যতটা হইয়াছে, আমাদের দেশে ততটা হয় নাই। পাশ্চাত্য জাতি-সকলের প্রগতি ও শক্তিমত্তার এবং আমাদের জাতির পশ্চাৎপদতা ও শক্তিহীনতার অন্যতম কারণ ইহা হইতে প্রতীত হয়। প্রতিকারের উপায়ও সহজবোধ্য।

১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

কবিতা-চুরির অভিযোগ

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী লিখিয়াছেন, যে, শ্রীমনীশ ঘটক নামক একজন লেখক তাঁহার "পত্র-লেখা" নামক পুস্তকের "কর্ম্মচক্র" নামক কবিতাটি ঢাকার "শান্তি" নামক মাসিক পত্রিকায় নিজের বলিয়া ছাপাইয়াছেন। ইহার বিশেষ আলোচনা আবশ্যক মনে হইলে উক্ত পত্রিকাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবাসীর সম্পাদক।

১৩৩৫ শ্রাবণ

"শনিবারের

মুখে মুখে এবং কোন কোন সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় ইহা বার বার বলা হইয়াছে, যে "শনিবারের চিঠি" আমার কাগজ। ইহা যে মিথ্যা, তাহা "শনিবারের চিঠি"তেই লেখা হইয়াছে। আমাকে কোন কোন বন্ধু মৌখিক ও চিঠি দ্বারা জিজ্ঞাসা করায় আমিও তাহা বলিয়াছি। কিন্তু তথাপি এই অমূলক কথাটির পুনরুক্তি হওয়ায় আমাকে লিখিতে হইতেছে, যে, ঐ কাগজটির প্রতিষ্ঠাতা বা সম্পাদক আমি নহি, পরিচালকবর্গের একজন আমি নহি, স্বত্বাধিকারী আমি নহি, অন্যতম অংশীদার আমি নহি, পরামর্শদাতা আমি নহি—এক কথায়, উহার উপর আমার কোন হাত নাই এবং কোন কালে ছিল না। ঐ কাগজটির সহিত ব্রাহ্মসমাজেরও কোনই সম্পর্ক নাই। ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য আমি ইহা লিখিতেছি। কাগজখানির সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিবার আমার প্রয়োজন নাই। আমি কোন মাসিকেরই সমালোচনা করি না।

১৩৩৭ বৈশাখ

একটা ন্যক্কারজনক জঘন্য পুস্তিকা

আমাদের নিকট একটা ন্যক্কারজনক জঘন্য পুস্তিকা প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মলাটে "প্রভুপাদ শ্রীতুলসী চন্দ্র গোস্বামী বিরচিত" এবং "পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ" ছাপা আছে। মলাটে কোন একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিং সম্বন্ধে জঘন্য মিথ্যা কুৎসা রচিত হইয়াছে। এরূপ কোন বোর্ডিঙেই আজকাল শুধু ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান সমাজের দেড় শত বালিকা থাকে না। সুতরাং এই কুৎসা হিন্দুসমাজকে স্পর্শ করে নাই মনে করিয়া হিন্দুসমাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ পুস্তিকার ২য় সংস্করণ হওয়া সমগ্র দেশের ও জাতির কলঙ্কের বিষয়।

এই চটি বহিখানাতে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মিথ্যা কুৎসা করা হইয়াছে। কিন্তু নাম করিয়া যে-সকল ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কুৎসা করা হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন। তাঁহারা যে সমাজেরই হউন, জীবিত ব্যক্তিরা প্রয়োজন মনে করিলে নিজ নিজ সুনাম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন। একজন ভক্তিভাজন পরলোকগত ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, কেবল সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে এবং তাঁহার কল্পিত কোন কন্যা ও জামাতা সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার একটি বর্ণও সত্য নহে। তাঁহাদের সকলকে আমরা বিশেষরূপে না জানিলেও এরূপ গল্প বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতাম।

ইহাতে হিন্দু ব্রাহ্ম সমুদয় শিক্ষিত "বাবুর দল"কে ও তাঁহাদের বাড়ীর মহিলাদিগকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। অনেকগুলি বালিকা শিক্ষালয়ের বোর্ডিংয়ের ব্যাপকভাবে মিথ্যা কুৎসা করা হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন গবর্ন্মেণ্ট কেন পাস করিতে দিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই মর্ম্মের মিথ্যা কথা লেখা হইয়াছে, যে, মিস্ মেয়োর বহির উত্তরে কোন কোন ভারতীয় পাশ্চাত্য সমাজের দুর্নীতির চিত্র অঙ্কিত করায়, "এরূপে 'কেঁচো খুড়িতে সাপ' বাহির হইয়া পড়ায় গবর্ন্মেণ্টের টনক নড়িল—তাঁহারা 'শিখণ্ডি'কে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুনের ভীষ্মবধের মত রায়সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার দ্বারা আইন সভা হইতে এই আইন পাশ করাইয়া লইলেন—লোকে বলে, ভারতীয় কুমারীদের মধ্যেও এই লাম্পট্য ও ব্যভিচারের সহায়তার জন্য।"

গবর্ন্মেণ্ট সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও হিতকর বহিও কখন কখন বাজেয়াপ্ত করেন, অথচ কলিকাতার রাস্তায় এই ধরণের অনেকগুলি বহি প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় হইতেছে। অশ্লীল, দুর্নীতিমূলক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিবার ভার একজন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত আছে, তাহা আমরা জানি। তাঁহার কার্য্যরীতি কিরূপ এবং তাঁহার সুনীতি দুর্নীতির আদর্শ কি, তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই। তবে এই ধরণের পুস্তক-পুস্তিকার অবাধ প্রচার হইতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যদি নিতান্ত অযৌক্তিক না হয়, তাহা হইলে একথা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না, যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায়, এবিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের অভিরুচি ও কর্ম্মনীতি কি, একথা

প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র গবর্ন্মেণ্টকে দোষী করিলে এবং গবর্ন্মেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না। এই ধরণের পুস্তক রচনা এবং উহাদের অবধি প্রচার বন্ধ করিবার ক্ষমতা একমাত্র দেশের জনসাধারণেরই আছে। দেশের জনমত যদি এই সকল কুৎসা প্রচারকে নিন্দনীয় মনে না করে, দেশের লোকের যদি নিজেদের কন্যা এবং ভগিনীকে এই সকল জঘন্য কুৎসা হইতে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি না থাকে, তাহাদের পরোক্ষ সমর্থনের জন্যই যদি এই সকল পুস্তকরচনা একটা লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে শুধু গবর্ন্মেণ্টকে দোষ দিয়া কি লাভ? উহা আমাদেরই নিদারুণ লজ্জা ও শোচনীয় অধোগতির পরিচয়।

১৩৪৩ আশ্বিন

পি ই এন্ আন্তর্জাতিক কংগ্রেস

পি ই এন্ (P. E. N.) লেখকদের সভ্যজগদ্ব্যাপী একটি ক্লাব। Poets and Playwrights (কবি ও নাট্যকার), Editors & Essayists (পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রবন্ধলেখক), এবং Novelists (ঔপন্যাসিক)—এই সকলের আদ্য অক্ষর লইয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে। অবশ্য অন্যবিধ লেখকেরাও ইহার সভ্য হইতে পারেন। এই ক্লাবটির মুখ্য কেন্দ্র লণ্ডনে। তাহার সভাপতি এইচ্ জি ওয়েল্স্। রবীন্দ্রনাথ অন্যতম সহকারী সভাপতি। প্রত্যেক সভ্যদেশে সেই সেই দেশের একটি কেন্দ্র আছে। ভারতবর্ষের পি ই এন্ ক্লাবের কেন্দ্র বোম্বাইয়ে; সভাপতি রবীন্দ্রনাথ; সহকারী সভাপতি সরোজিনী নাইডু, সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা দেশে ইহার শাখা আছে। তাহার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ, এবং কালিদাস নাগ ও মণীন্দ্রলাল বসু সম্পাদকদ্বয়।

এই ক্লাবের উদ্দেশ্য সকল দেশের লেখকদের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপন। তাহার দ্বারা সকল দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও মৈত্রী স্থাপনের সহায়তা হইতে পারে। কিন্তু যত দিন সম্পাদক ও অন্য সাংবাদিকদিগের মধ্যে অনেকে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও হিংসাদ্বেষ উদ্রেকের ও তদ্দ্বারা বিবাদের কারণ হইয়া থাকিবেন, যত দিন ঐতিহাসিক ও কবিদেব অনেকে যুদ্ধের মহিমা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ঘোষণা করিতে থাকিবেন, যত দিন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেকে পৃথিবীর কতকগুলি জাতিকে জন্মতঃ নিকৃষ্ট ও অপর কতকগুলিকে জন্মতঃ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকিবেন, এবং যত দিন অপরের উপর প্রভুত্বের ও ঐশ্বর্য্যের মোহে জাতিসমূহ ও তাহাদের গবর্ন্মেণ্টগুলা আবিষ্ট থাকিবে, তত দিন পি ই এনের দ্বারা সম্যক্ হিত সাধিত হইবার আশা কম। তথাপি, এরূপ আন্তর্জাতিক মিলনের সুযোগের মূল্য আছে।

পি ই এনের গত আন্তর্জাতিক কংগ্রেস স্পেনের বার্সিলোনা শহরে হইয়াছিল। এ বৎসর

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম সাধারণতন্ত্র আর্জেন্টিনার রাজধানী বোয়েনোস আইরাস নগরে বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসে হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে ইহাতে দুই জন প্রতিনিধি গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া ভারতবর্ষের কেন্দ্রের সম্পাদিকা; তিনি গিয়াছেন। এবং বাংলার শাখার অন্যতর সম্পাদক অধ্যাপক কালিদাস নাগ গিয়াছেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার ডারবান বন্দর হইতে চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছেন, যে, সমগ্র এশিয়া মহাদেশ হইতে ভারতবর্ষের দুজন প্রতিনিধি ছাড়া আর কেবল জাপানের দু-জন প্রতিনিধি যাইতেছেন। এক জন জাপানের বিখ্যাত কবি ও গদ্যলেখক তোসোন সিমাজাকি আর এক জন ইকুমা আরিশিমা, জাপানের গল্পলেখক ও চিত্রকর। ইঁহারা নিপ্পন (জাপান) পি ই এন ক্লাবের সভাপতি ও সহকারী সভাপতি। অধ্যাপক কালিদাস নাগের মত ইঁহারা কিছু কাল প্যারিসে ছিলেন। ইংরেজী অল্প জানেন। ভারতীয় প্রতিনিধির সহিত কথাবার্ত্তা ফ্রেঞ্চ ভাষাতেই হয়। ইঁহাদের ইচ্ছা, যে, ১৯৪০ সালে যখন জাপানের রাজধানী তোকিওতে ওলিম্পিক গেম্‌স্ হইবে, তখন তাঁহারা এশিয়ার পক্ষ হইতে সব দেশে পি ই এনের সভ্যদেরও নিমন্ত্রণের আয়োজন করিবেন। এ-বিষয়ে বোয়েনোস আইরাসের কংগ্রেসে সকলের সঙ্গে পরামর্শ হইবে।

চীনেও পি ই এনের কেন্দ্র আছে। কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা যুদ্ধবিগ্রহবিপ্লবাদিতে বিব্রত থাকায় কোন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন নাই।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের অল্পসংখ্যক লোকদের মধ্যেও যদি বন্ধুভাবে মিলামিশা হয়, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদের সকলেরই উপকার হয়, এবং বিদেশ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

১৩১১ বৈশাখ

জিজ্ঞাসা—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রচিত। এই গ্রন্থে যে ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই সুলিখিত সুপাঠ্য এবং শিক্ষাপ্রদ। রামেন্দ্রবাবুর মত সুপণ্ডিত এবং সুলেখক ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারো হস্তে বিবিধ কঠোর তত্ত্বের এমন সরল এবং সবল ব্যাখ্যা হইতে পারিত না। কোন কোন প্রবন্ধে বোধ করি ব্যাখ্যা অতিশয় বিশদ করিতে যাওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়াছে। মুক্তি প্রবন্ধটিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদান্তের নানা শাখা এবং নানা ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের "আমি ব্রহ্ম" মতটি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের ক্ষমতার প্রশংসা করিতে হয়। যে সাহিত্যে এমন গ্রন্থ লিখিত হয়, সে সাহিত্য যে এখনো অনেক বিদ্যাভিমানীদিগের অবজ্ঞার পদার্থ, ইহাই ক্ষোভের কথা।

১৩১৭ শ্রাবণ

অমৃত—শ্রীরজনীকান্ত সেন প্রণীত। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক। মূল্য চার আনা। কবি রজনী সেনের পরিচয় বাঙালী পাঠকের নিকট নূতন করিয়া অনাবশ্যক। তাঁহার "সেথা আমি কি গাহিব গান, যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম ঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান।" বা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই" প্রভৃতি গান বাঙালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। রজনীকান্ত একাধারে ত্রিমূর্ত্তি—এক মূর্ত্তিতে তিনি মজলিসি রসিক, তাঁহার হাসির গানে বা ব্যঙ্গ কবিতায় আসর হাসির ফোয়ারায় পরিপ্লাবিত হয়; অপর মূর্ত্তিতে তিনি জননী জন্মভূমির ব্যথিত ভক্ত সন্তান, অকপট প্রাণের সরল ব্যাকুলতা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেও অস্থির করিয়া তোলে; ভিন্ন মূর্ত্তিতে তিনি ভগবদ্‌ভক্ত সাধক, তাঁহার সে ভাবের স্পর্শে চিত্ত নির্ম্মল ও ঈশ্বরাভিমুখ হয়। তাঁহার প্রাণময় সাধনার ধন কল্যাণী বাণী তাঁহাকে মাতৃস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, তাই কবির কল্যাণী বাণী আজ ঘরে ঘরে সমাদৃত, অনেকের সুখ দুঃখের সান্ত্বনা সম্বর্দ্ধনা। কান্ত কবি এখন রোগশয্যায়, কণ্ঠক্ষততে বাকহীন। কিন্তু যে বাণীকে তিনি অন্তর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তিনি আজ রোগক্লান্ত কবিকে দিয়া আমাদের অমৃত পরিবেষণ করিতেছেন।

অমৃত অমৃত। অষ্টপদী কবিতায় নীতিকথাগুলি সরল রূপকের সোনালি ইন্দ্রজালে ঢাকা পড়িয়া প্রাণের রাজ্যে একটি অপূর্ব্ব ভাবরসের মায়া বিস্তার করে। এইরূপ ধরণের কবিতা রবীন্দ্রনাথের কণিকায় প্রথম। কান্তকবি সেই পথের সম্ভ্রান্ত পথিক, স্বতন্ত্র স্বাধীন।

এই বইখানি অভিভাবকেরা শিশুদের পড়িতে দিলে অনেক নীরস উপদেশের চেয়ে অধিক ফল লাভ করিবেন। এক একটি কবিতা ভাবের মহত্ত্বে রত্ন বিশেষ।

কবি রজনীকান্ত এক্ষণে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যাগত। তথাপি তাঁহার সাহিত্য শ্রমের বিরতি নাই। ভগবান তাঁহাকে সত্বর নিরাময় করিয়া আমাদিগকে আনন্দ বিধান করুন।—মুদ্রারাক্ষস।

১৩২০ ভাদ্র

সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা— শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—বঙ্গাবাসী কলেজ-স্কুল বুকষ্টল। ২৬ পৃষ্ঠা। মূল্য দুই আনা।

এই পুস্তিকার বিষয়টি প্রবন্ধাকারে যখন ঢাকা-রিভিউ (সম্মিলন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়. তখন আমরা প্রবাসীর কষ্টিপাথরে তাহার পরিচয় দিয়াছিলাম। এক্ষণে পুনরায় তাহার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। অধ্যাপক ললিতবাবু বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার সহিত বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বানান সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিতেছেন তাহা বাংলা সাহিত্য-সেবী মাত্রেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখা উচিত। এই-সকল আলোচনা পাঠ করিলে বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও ধাত বুঝিয়া ঠিক পথে চলিবার বিশেষ সাহায্য ও সুবিধা হইবে; আমরা এইগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি এবং আমাদের অনেক মতের পোষকতা দেখিয়া বল পাইয়াছি, অনেক মতের বিরুদ্ধ মত দেখিয়া চিন্তা করিয়া ঔচিত্য নির্দ্ধারণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি। এই পুস্তিকায় নিছক সাধুভাষা ও নিছক চলিতভাষা ব্যবহারের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তি ধীর-ভাবে প্রয়োগ করিয়া উভয় পক্ষের তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুবিধা অসুবিধা দেখাইয়া বিদেশী শব্দ ব্যবহারের ঔচিত্য অনৌচিত্য বিচার করিয়া অধ্যাপক মহাশয় শেষ মীমাংসা করিয়াছেন এই যে 'আধা ডিক্রী আধা ডিসমিস ছাড়া উপায় নাই।' এই নিষ্পত্তি আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

১৩২১ মাঘ

লঘুরামায়ণ

ভারতের মানুষকে রামায়ণ যেমন করিয়া গড়িয়াছে, আর কোন একখানি বহি বোধ হয় তেমন করিয়া গড়ে নাই। অথচ মূল বাল্মীকির রামায়ণ সমগ্র পড়া অনেকেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সংস্কৃত মৃত ভাষা না হইলেও উহা এখন আর চলিত ভাষা নয়। উহার ব্যাকরণ কঠিন বলিয়া অনেকে উহা শিখে না। স্কুলের ছাত্রেরা সংস্কৃত রামায়ণের এক আধ সর্গ মাত্র পড়ে। সমস্ত বহিটিতে পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে। তাহা অধ্যয়ন করা সময়সাপেক্ষ। অথচ রামায়ণের মূল কাহিনীটি বলিবার জন্য পঁচিশ হাজার শ্লোকের প্রয়োজন হয় না। বাবু গোবিন্দনাথ গুহ অবান্তর কথা পুনরুক্তি আদি বাদ দিয়া মহর্ষি বাল্মীকিরই রচিত তিনহাজার শ্লোকে গ্রথিত রামায়ণের মূল আখ্যায়িকাটি লঘুরামায়ণ নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি বর্ণও তাঁহার স্বরচিত নহে। এখন মূল রামায়ণের আনন্দ উপভোগ ও তাহা হইতে উপকারলাভ সুসাধ্য হইল। শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ বিশেষ ভাবে আদৃত হওয়া উচিত। গোবিন্দবাবু সংস্কৃতেই একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাহাতে বাল্মীকির কাল, অধুনা-প্রচলিত রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত কিছু আছে কি

না, রামায়ণের সহিত হোমরের ইলিয়াডের তুলনা, প্রভৃতি বিষয় সাতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে বিন্যস্ত হইয়াছে। কিছু টীকাও আছে। গোবিন্দবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতবাসীদের কৃতজ্ঞতাভাজন

১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা, ১৩২১

১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। মফঃস্বলের সদস্যগণের সংখ্যা গণনায় ভুল হইয়াছে। ১০৯৯ এর পরই ২০০০ ছাপা হইয়াছে। উহা ১১০০ হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং মফঃস্বলের মোট সদস্যসংখ্যা ২০৬৪ না হইয়া ১১৬৪ হইবে। এই সংখ্যাই দ্বিতীয় খণ্ডের ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে।

"দেশমধ্যে লোকশিক্ষা, মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ প্রদান, নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ, পুরাতন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ ও রক্ষার ব্যবস্থা, একটি প্রাদেশিক চিত্রশালার উপযুক্ত সম্ভার সংগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যে পরিষৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে সে-সকল কার্য্য আশানুরূপে অগ্রসর হইতেছে না। দুই সহস্রাধিক সদস্য লইয়াও পরিষৎকে প্রকৃত কর্ম্মীর সাহায্যবিহনে অন্যদেশের তুলনায় কার্য্যক্ষেত্রে এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে। পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে গণ্য, মান্য, বিদ্বান্, ধনী, পণ্ডিত, অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই আছেন; কিন্তু এখনও পরিষৎ যে-সকল উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন, সে-সকল সুসম্পন্ন করিবার জন্য যত কর্ম্মীর আবশ্যক, তাঁহাদের মধ্য হইতে তত বেশী কর্ম্মী পাওয়া যাইতেছে না; কাজেই বলিতে হয়, এখনও ইহার সদস্যসংখ্যা বর্দ্ধনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এখনও আশা করা যায় যে, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে।"

পরিষদের সদস্যদিগের মধ্যে যথেষ্ট কর্ম্মী থাকিলেও সদস্যসংখ্যা বাড়া আবশ্যক হইত। যথেষ্ট কর্ম্মী যখন নাই, তখন ত সদস্য বাড়াইবার দরকার আছেই। কিন্তু সদস্য বাড়িলেই কর্ম্মী বাড়িবে, নিশ্চয় করিয়া এরূপ বলা যায় না; কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে জানিতে হয়।

পরিষদের মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ

এই তালিকায় পঞ্জিকাতে ১৯ জন সদস্যের এবং তদ্ব্যতীত ৮ জন সাহিত্যসেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গীয় শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

বাঙ্গালা শিক্ষাব উন্নতিকল্পে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু টাকা দিয়া গিয়াছেন। ইহাব উপস্বত্ব হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা অধ্যাপক পদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নিজ পিতা এবং মাতার স্মৃতি রক্ষার্থ "রামতনু পদক" ও "গঙ্গামণি পদক" নামে প্রতি বৎসর বিএ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ও ছাত্রীকে দুইটি পদক দিবার উপযুক্ত পরিমাণে অর্থও দান করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :—

৺চন্দ্রশেখর বসু—ইনি একজন প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন। ইঁহার রচিত প্রলয়-তত্ত্ব, পরলোক-তত্ত্ব, বেদান্তদর্শন, হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ, সৃষ্টি, বক্তৃতা-কুসুমাঞ্জলি, অধিকার-তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বহু পূর্ব্বে তিনি পরিষদের সদস্য ছিলেন।

সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শনশাখার অভিভাষণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, যাঁহারা দর্শনের আলোচনা বিস্তাবে সাহায্য করিয়াছেন এরূপ বাঙ্গালীদের মধ্যে বসু মহাশয়ের নাম করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকায় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র-প্রণেতা ৺নগেন্দ্রনাথ যেমন সুলেখক, তেমনি সুবক্তা ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। সকল অবস্থাতেই সকল স্থানে সকল উৎপীড়নের মধ্যে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "সমদর্শী" নামক কাগজে তাঁহার বাঙ্গালা লেখার আরম্ভ হয়। তাঁহারা স্বাধীনচিত্ততা আমরণ বজায় ছিল। তিনি নিজের মতের বিরুদ্ধে কোথাও মাথা নোয়াইতেন না। তিনি সুতার্কিক ছিলেন। তাঁহার ভাষা অতি সহজ এবং সরল ছিল। তাঁহার "রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র" এই শ্রেণীর সাহিত্যেব আদর্শ। এতদ্ভিন্ন তাঁহার 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রভৃতি আরও অনেক সদ্‌গ্রন্থ আছে। তিনি ছল বা কল-কৌশল জানিতেন না—সোজাসুজি যাহা বুঝিতেন, সোজাসুজি তাহাই বলিতেন; সত্যকথা বলিতে হইবে বলিয়া তিনি লাঠিমারা কথা কহিতেন না। তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুরসিক ছিলেন, তাঁহার কথায় হাসিতে হইত, তাঁহার ভাবে হাসিতে হইত।

তাহার "ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়" নানা দার্শনিক বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে। ইঁহার নামও হীরেন্দ্রবাবু তালিকায় থাকিলে ভাল হইত।

১৩২৪ অগ্রহায়ণ

“বাংলা সাময়িক-পত্র”

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে যত বাংলা দৈনিক, অর্দ্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, দ্বিসাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রিসাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজ বাহির হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুস্তকে, তাহাদের নাম এবং কিছু কিছু বৃত্তান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনেক কাগজের একটি পৃষ্ঠার বা পৃষ্ঠাংশের ফোটোগ্রাফিক চিত্রও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকটি খুব কৌতুহলোদ্দীপক। ইহা সংকলন করিতে গ্রন্থকর্তাকে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে ইহাতে বহু চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক উপকরণও সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় ২৫০টি কাগজের বৃত্তান্ত আছে। তাহাদের মধ্যে এখনও জীবিত আছে বোধ হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ, এবং ধর্ম্মতত্ত্ব, এই তিনখানি। সাবেক কাগজগুলির কোন কোনটির নাম বেশ মজাদার; যেমন ‘আক্কেলগুড়ম’। নূতন নূতন কাগজ এখনও বাহির হইতেছে। যদি নূতন কোন কাগজের কোন প্রকাশক তাহার কি নাম রাখিবেন চট্ করিয়া ঠিক করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি এই বহিখানা দেখিতে পারেন।

এই গ্রন্থে একখানি দৈনিকের উল্লেখ আছে যাহা বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষায় বাহির হইত। ইহার নাম ‘সমাচার সুধাবর্ষণ’। ইহাই প্রথম হিন্দী দৈনিক। জনৈক বাঙালী ইহা সম্পাদন করিতেন।

১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ

মোগল বিদুষী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মোস্‌লেম প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং কলিকাতা। ১১৭+৩ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা।

বইখানির ছাপা ও বাঁধা অতি সুন্দর। বিশেষতঃ মলাটের কাপড়ের গভীর নীলকৃষ্ণ রঙ্গে চক্ষুর তৃপ্তি হয়। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই জ্বলন্ত লাল বা হলদে রঙ্গ অথবা “ছাতার কাপড়ে” বাঁধান বইগুলির যুগ হইতে অনেক দূরে আসা গিয়াছে।

এই পুস্তিকার বিষয় আক্‌বরের খুড়ী গুল্‌বদন এবং আওরংজীবের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেবউন্নিসার জীবনী। এই দুই মহিলা সম্বন্ধে যত কিছু তথ্য ইংরেজী বা ফার্সী ইতিহাসে আছে তাহার সমস্তই এখানে সমাবেশ করা হইয়াছে; কিছু বাদ দেওয়া হয় নাই, কল্পনার সাহায্যে বা অলঙ্কারের ছটা দিবার জন্য কিছুই যোগ দেওয়া হয় নাই। শুধু সমসাময়িক কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিয়া কাহিনীকে সম্পূর্ণ ও মনোরম করা হইয়াছে। ফলতঃ এই দুই “বিদুষী” সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহা এবং পণ্ডিতেরা আলোচনা করিয়া ইংরেজীতে যে-সব নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার সারাংশ এই বাঙ্গালা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে; এই বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠককে ইংরেজী কোন পুস্তকের অপেক্ষা রাখিতে হইবে না, ইহাই এই গ্রন্থের গৌরব।

গুল্‌বদন ফার্সীতে আত্মজীবনী রচনা করেন

এবং সৌখীন পদ্যও লেখেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে ঠিক বিদুষী বলা যায় না। সে উপাধি জেবউন্নিসার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু গুল্‌বদনের সরল জীবনে যে করুণা, গার্হস্থ্য স্নেহ, ধর্ম্মভক্তি, ও স্নিগ্ধ শান্ত নারীহৃদয়ের পরিচয় পাই, তাহা, মহিমায় দীপ্ত ভাব-বিচলিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেবের দীপ্তজীবনে দেখা যায় না। মার্কিন-লেখক হোম্‌সএর কথার প্রথম জনকে হৃদয়বতী রমণী (heart-woman) ও দ্বিতীয় জনকে মস্তিষ্কশালিনী নারী (brain-woman) বলিলে ঠিক হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে জেবের প্রাণের সকল মায়া-মমতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা হতভাগ্য আক্‌বরের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, এবং এইজন্য সম্রাটের প্রিয় দুহিতাকে শেষ জীবন সুদীর্ঘ কারাবাসে কাটাইতে হয়। তাই তাঁহার জীবনকাহিনী অম্লমধুর রসে সিঞ্চিত।

কবি বলিয়া জেবউন্নিসার খ্যাতি ছিল। কিন্তু প্রচলিত "মখ্‌ফী পদ্যমালা" তাঁহার রচনা নহে। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমান পণ্ডিত আবদুল মুক্‌তাদির মহাশয়ের গবেষণার ফল ব্রজেন্দ্রবাবু অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠকেরা বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্র "রাজসিংহে" জেবের কুৎসা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আমি মডার্ণ রিভিউ পত্রে ফার্সীগ্রন্থের সাহায্যে নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়াছি যে ঐ অপবাদ পঞ্জাবী কোন কোন মুসলমান লেখকের সৃষ্টি এবং আগাগোড়া মিথ্যা ও ইতিহাসবিরুদ্ধ। এই চূড়ান্ত মীমাংসা ব্রজেনবাবু (২১-৩৭ পৃঃ) বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া মুসলমান সমাজ কেন, সমস্ত সত্যসন্ধানী সুধীবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এরূপ বিশুদ্ধ ইতিহাসের যতই প্রচার হয় ততই আমাদের ভাষার ও দেশের মঙ্গল।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

১৩২৭ চৈত্র

একখানি পৃথিবীর ইতিহাস।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক এইচ্, জী, ওএল্‌সের লেখা পৃথিবীর ইতিহাস (The Outline of History, Cassell and Company, 21s. net) নিখুঁত না হইলেও একখানি শ্রেষ্ঠ বহি। ইহা ইংরেজী-জানা ভারতীয়দের পড়া উচিত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইনি অনেক হক্ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞানবুদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, গত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের ইংরেজ আম্‌লাদেব শিক্ষা ও যোগ্যতা সেরূপ বাড়ে নাই; তাহারা নিজেদের অপকর্ষ জানিয়া অস্বস্তি বোধ করে, এবং জবরদস্তি জুলুম ও মধ্যে মধ্যে নৃশংসতা দ্বারা (যেমন পঞ্জাবে) নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষার চেষ্টা করে। ওএল্‌সের মতে পাশ্চাত্য জাতিদের বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠতা বেশী দিন টিকিতে পারে না; তাহারা জানে না যে ত্রয়োদশ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীতে মোঙ্গোল প্রভৃতি প্রাচ্য জাতিরা ইউরোপের অনেক অংশ জয় করিয়াছিল; তাহারা জানে না যে বিজ্ঞান ও তাহার ফল কাহারও একচেটিয়া নহে, ইহা হাত বদ্‌লাইতে পারে ("They had no sense of the transferability of science and its fruits")। তাহারা উপলব্ধি করে না যে চীনা ও ভারতীয়েরা গবেষণার কাজ ফরাসী বা ইংরেজদের সমান

দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে ("They did not realise that Chinamen and Indians could carry on the work of research as ably as Frenchmen or Englishmen")। ওএল্‌স্‌ বিশ্বাস করেন, যে, প্রাচ্য লোকদের কোন বংশগত বা জন্মগত আলস্য বা উন্নতিবিমুখতা নাই, এবং পাশ্চাত্য লোকদেরও কোন বংশগত বা জন্মগত একচেটিয়া মানসিক উদ্যমশীলতা নাই যাহার দ্বারা তাহারা চিরকাল পৃথিবীতে প্রাধান্য ভোগ করিতে পারিবে। তাঁহার মতে, "এশিয়ার মানুষের মস্তিষ্ক ইউরোপের মানুষের মস্তিষ্ক অপেক্ষা একবিন্দুও নিকৃষ্ট নহে; ইতিহাসে দেখা যায় যে এশিয়াবাসীরা ইউরোপীদেরই মত সাহসী, তেজস্বী, শক্তিমান্‌, সদাশয়, স্বার্থত্যাগী, এবং দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে সমর্থ, এবং পৃথিবীতে ইউরোপীয় অপেক্ষা এশিয়ান্‌দের সংখ্যা বেশীই থাকিবে। বিশেষ কোন জাতির মধ্যে জ্ঞানকে আবদ্ধ রাখা সব যুগেই দুঃসাধ্য ছিল; ইহা এখন অসাধ্য হইয়াছে; জ্ঞান কোন না কোন পথ দিয়া এক জাতি ও দেশ হইতে অন্য জাতি ও দেশের মধ্যে চুয়াইয়া যাইবেই। আধুনিক সময়ে সভ্যতায় ও আর্থিক বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী সাম্য অনিবার্য্য। এশিয়া ইউরোপ-আমেরিকার এক শতাব্দী পশ্চাতে পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু তাহা ১০।২০ বৎসরেই সারিয়া লইবে। এখন, চীনা ভাষা এবং চীনা জীবন ও চিন্তার ধারা যেখানে একজন ইংরেজ জানেন, সেস্থলে শত শত চীনা আছেন যাঁহারা ইংরেজদের সমুদয় জ্ঞানের অধিকারী। ভারতবর্ষে এবম্বিধ জ্ঞান ও জ্ঞানীর আধিক্য হয়ত আরও বেশী। ভারতবর্ষ ব্রিটেনে বিদ্যার্থী প্রেরণ করেন, ব্রিটেন ভারতবর্ষে আম্‌লা প্রেরণ করেন। ভারতে গিয়া তথাকার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও চলিত ঘটনা ছাত্ররূপে অনুশীলন করিবার ও জানিবার জন্য ইংলণ্ডীয় লোক পাঠাইবার কোনই ব্যবস্থা নাই।" ওএল্‌সের মতে জ্ঞানবিষয়ে এই প্রকারে প্রাচ্যের প্রাধান্য জন্মিতেছে।

ধর্ম্মবিষয়েও ওএল্‌স্‌ অনেক সার কথা বলিয়াছেন। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বাসভূমি ভারতবর্ষে সেইসব কথা আমাদের প্রণিধান ও স্মরণের যোগ্য। তিনি বলেন, "ধর্ম্মেধর্ম্মে যে রেষারেষি প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহা তাদের ত্রুটি ভেজাল বিকৃতি ভাষা ও বাহ্যরূপের মধ্যে; কোন একটি ধর্ম্ম অন্য কোনটিকে পরাজিত করিবে বা নূতন কোন ধর্ম্ম আসিয়া তাহাদের সকলের স্থান দখল করিবে, এরূপ কোন ভবিষ্যতের দিকে আমরা তাকাইয়া থাকিব না; আমরা চাহিব, যে প্রত্যেক ধর্ম্মের খাদ পুড়িয়া গিয়া শুভ্র ধাতুটি নির্ম্মল হইয়া বাহির হইবে, এবং তখন সকলগুলি একই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সেই সত্য এই, যে, সকল মানুষের হৃদয়, জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সেই এক সর্ব্বময় ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার অনুগত হওয়া চাই যিনি সকলের নিয়ন্তা।" ওএল্‌স্‌ ভবিষ্যৎ জগৎ-রাষ্ট্র (world-state) এবং জগৎ-ধর্ম্মে (world-religion) বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন, "জগৎ-রাষ্ট্র সাধারণ জগৎ-ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; উহা সরল, বিশ্বজনীন, অধিকতর সহজবোধ্য হইবে। উহা খ্রীষ্টীয়, মুসলমান বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইবে না, কিম্বা তদ্রূপ বিশেষ কোন রূপধারী কোন ধর্ম্মমত হইবে না; উহা হইবে স্বয়ং বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ধর্ম্ম।"

১৩৩০ কার্ত্তিক

আবোল-তাবোল—শ্রীসুকুমার রায়, বি. এস্. সি, এফ্-আর্. পি. এস্ কর্ত্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। প্রবাসীর আকারের ৫২ পৃষ্ঠার বই। বহুচিত্রে ভূষিত। দামের উল্লেখ নাই। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড সন্স্, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। ১৩৩০।

সুকুমার রায়েব লেখার সঙ্গে বঙ্গাদেশের শিশু-সমাজ সুপরিচিত, ইঁহার অকাল-বিয়োগে বঙ্গাদেশ ও বঙ্গাভাষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইঁহার নানা সময়ের যে সব রঙ্গাভরা রসরচনা "সন্দেশ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া বই ছাপা হইতেছিল, দুঃখের বিষয় সুকুমার-বাবু ইহার প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, তাঁহার মরণোত্তর-কালে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। সুকুমার-বাবু বঙ্গাসাহিত্যে এইরূপ উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্ন কথায় আবোল-তাবোল কবিতা-রচনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। শিশুরা সংলগ্ন চিন্তাধারা অপেক্ষা অসংলগ্ন আবোল-তাবোল রচনায় আনন্দ অধিক পায়; কর্ম্মক্লান্ত প্রবীণেরাও এই অনাবিলহাস্যপূর্ণ রসরচনা সমানই উপভোগ করে। ভাব অসংলগ্ন, ভাষা আবোল-তাবোল হইলেও রচনার বাক্যরীতি বিশুদ্ধ, ছন্দ ও মিল নিখুঁত সুন্দর; এই কবিতা পড়িলে শিশুদের ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভাষা-শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়া হইবে। এরূপ এই বাংলা ভাষায় এই একমাত্র ও ইহা নূতন প্রবর্ত্তনা—এজন্য ইহার বিশেষ প্রচার ও সমাদর হওয়া উচিত।

—স

১৩৩৪ পৌষ

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের আত্মজীবনী

বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৮) প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ অশীতির কোঠা পার হইয়া গিয়াছেন। তখন এই আত্মজীবনী পাঠ করিয়া সকলে অনুভব করিয়াছিলেন, যে, ইহা বাঙলা সাহিত্যের একটি চিরন্তন সম্পদ এবং বাঙলার ধর্ম্ম-প্রেরণাব নব উন্মেষের ইতিহাসে একটি স্থায়ী অধ্যায়। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই অমূল্য গ্রন্থখানি বাঙলার পাঠক-পাঠিকা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভক্তিভরে পাঠ করিয়া আসিতেছেন। এই পুস্তকের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সতীশবাবুই প্রথম প্রস্তুত করিয়া সকলের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করিলেন। ভক্তজীবনের সরল কাহিনীর গভীর তাৎপর্য্যটি পরিস্ফুট করিতে সতীশবাবু যেমন প্রয়াস পাইয়াছেন, তেমনি পরিশ্রম করিয়াছেন ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের আসল স্থানটি আধুনিক বাঙলার ইতিহাস

প্রতিষ্ঠিত করিতে। যিনি ধৈর্য্যের সহিত সতীশবাবুর বহু গবেষণা পূর্ণ আলোচনা গুলি পরিশিষ্টে পাঠ করিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন, সতীশবাবু দেবেন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমাদের উপহার দিতেছেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার বৎসর দেবেন্দ্রনাথের জন্ম এবং ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রদোষে তাঁর তিরোধান; সুতরাং প্রায় ৯০ বৎসর ধরিয়া তিনি তাঁর জীবন-সূত্রে বাঙলার অনেক সংগ্রাম ও সাফল্য, সাধনা ও সিদ্ধির ইতিহাস গাঁথিয়া গিয়াছেন। ১৮২৬-২৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া তাঁর উদার চরিত্রের প্রভাব অনুভব করিতে আরম্ভ করেন। ১৮২৮ (২০শে আগষ্ট) রামমোহন যখন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ ১১ বছরের বালক;তার এক বছরের মধ্যে (১৮২৯) সতীদাহ নিবারণ আইনে রামমোহনের জয়-নির্ঘোষ শ্রুত হয়। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণ ও ট্রষ্টডীড্ প্রস্তুত করিয়া রামমোহন বিলাত যাত্রা (১৮৩০) করেন। দেশ ছাড়িবার পূর্ব্বে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে উৎসুক হন এবং তাঁর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইয়া যান। এই ঘটনাটির গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য পরে আমরা বুঝিয়াছি। এই ভেদের দেশে অভেদ মন্ত্রের সাধক রামমোহন, এই অনৈক্যজর্জ্জরিত ভারতে ঐক্যবেদের প্রবর্ত্তক ঋষি রামমোহন তাঁর অমর উত্তরাধিকার তরুণ বন্ধু দেবেন্দ্রনাথকে নীরবে দান করিয়া যান; তিনি আর দেশে ফিরিতে পারেন নাই। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহন সুদূর ব্রিস্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা দেবেন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বাঙলায় এক নবযুগের প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৯ সালে দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত Landholders' Association লণ্ডনের British India Societyর সহিত একযোগে ভারতবাসীদের হিতকামনায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করে এবং সেই বৎসরেই ২২ বছরের যুবক দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বরঞ্জিনী বা তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করিয়া বাঙলা সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব্ব সৃষ্টির যুগ আরম্ভ করেন। স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত, মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। ১৮৪৫ সালে ডফ্ সাহেব যখন উমেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সুরু করেন, তখন তাঁহার বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার "তত্ত্ববোধিনী" দণ্ডায়মান হন এবং জাতীয় আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা কল্পে "হিন্দুহিতার্থী" বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার তিন বছরের মধ্যে পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যুর ও কার ঠাকুর কোম্পানী উঠিয়া যাওয়ার ফলে যখন দেবেন্দ্রনাথ অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া প্রায় পথে বসিলেন, তখনও কি তাঁর একাগ্র ধর্ম্ম সাধনা! "প্রতিদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ছাতের উপর কম্বল পাতিয়া বসিয়া বন্ধুগণসহ ধর্ম্মচর্চ্চা" করিতেছেন! এই সময়েই (১৮৪৮) তাঁর "তত্ত্ববোধিনী"তে ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হয়। দিদিমার মৃত্যুতে শ্মশানে যে-ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল, আজ সাংসারিক সঙ্কটে তাহা যেন শতগুণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আত্মজীবনীতে দেখি—"সে শ্মশানের সেই একদিন আর অদ্যকার এই আর এক দিন! আমি আর এক সোপানে উঠিলাম, চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া

পরা খুব পরিমিত করিলাম, কল্য কি খাইব কি পরিব তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব কি এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে তাহার ভাবনা নাই...।" যে প্রিন্স দ্বারকানাথের বেলগেছিয়া ডিনারে হাজার হাজার টাকা খরচ হইত, তাঁহার পুত্র মাত্র চার আনায় ডাল ও রুটি খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অথচ এই বৎসরেই তাঁর উপনিষৎ সমুদ্র মন্থন করা রত্ন "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ রচনা; এই সময়ের আঘাত, অবসাদ ও দুঃসহ সংগ্রাম-সংঘর্ষের মধ্যেই ভারতের শাশ্বত অমৃত-মন্ত্র দেবেন্দ্রনাথের জীবন ভেদ করিয়া উঠিল "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্"! এ হেন জীবনের সার্থকতা বাঙালীর কাছে ত চিরদিবসের জন্য থাকিবেই; ইহা সমগ্র ভারতবাসী ও বিশ্বের সাধনপিপাসুদিগের আদরের সামগ্রী হইয়া থাকিবে। আজও ভারত চারিদিক হইতে আক্রান্ত ও প্রত্যহ অপমানিত হইতেছে---আজও ভারতের ইতিহাসগগন দ্বন্দ্ববিরোধের ধূলায় আচ্ছন্ন—আজই তাই ভারতবাসীর প্রাণ আকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপ্রাণ সাধক স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে ভারতের চিরন্তন মন্ত্র উচ্চারণ করেন,—"শান্তম্ শিব-অদ্বৈতম্"।

এই অমূল্য জীবনীখানির নব সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বিশ্বভারতী ও সতীশ-বাবু সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৩৩৪ পৌষ

অনাগত (উপন্যাস)—শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃঃ ১৭৬। মূল্য ১৷৷০। ১৩৩৪।

"আনন্দবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহাকে এতদিন আমরা Statistics-গবেষণাকারী প্রবীণ সাংবাদিক বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু তিনি হঠাৎ কথা-সাহিত্যের দরবারে হাজির হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আজকালকার অতি-আধুনিক তথাকথিত সাহিত্যিকদের ন্যাকামীর জ্বালায় সাহিত্য-সরস্বতী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। এইসকল 'নবযুগ প্রবর্ত্তক'দের কুরুচিপূর্ণ প্লট, তাহাদের বাগাড়ম্বরস্ফীত একঘেয়ে মামুলি ব্যথাভরা প্রেম-কাহিনী এবং তাহাদের অমার্জিত ও অপ্রচলিত প্রাদেশিকতা দোষ-দুষ্ট ভাষা বাঙ্‌লার পাঠক-সমাজকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসখানি ঐ দুর্ভোগের হাত হইতে পাঠক-সমাজকে নিষ্কৃতি দিয়াছে। বইখানির ভাষা সুন্দর, প্লটও বেশ উপভোগ্য। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্র-চিত্রণে লেখক বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

প্র

১৩৩৪ ফাল্গুন

বসন্তসেনা ও অন্যান্য কবিতা—লেখক ও প্রকাশক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রাপ্তিস্থান—বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। ৮৫ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

লেখক ভূমিকায় লিখিয়াছেন—'আমার বিশ্বাস আমার কবিতাগুলি ভাল।' এবং ইহার পরেই সমালোচক ও মাসিকের শেষ পত্রস্থ সমালোচনার বৃশ্চিক-হুলের সম্বন্ধে 'একহাত' লইয়াছেন। সুতরাং সেই মাসিকেই সমালোচনার জন্য বইখানি পাঠাইয়া তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'দুর্জ্ঞেয় মধ্যপন্থাটি' মনে রাখিয়া সমালোচনা করিবার সময় আমাদের নাই। সংক্ষেপে আমরাও বলি, প্রমথবাবুর কবিতাগুলি ভাল। ছন্দ ও শব্দযোজনা নিখুঁত, ভাব স্থানে স্থানে অপরূপ। তবে অনেক কবিতাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

কজ্জলী—পরশুরাম রচিত, যতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত, এম-সি সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২এ হ্যারিসন রোড কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

অদ্ভুত নামের ধাঁধা লাগাইবার ক্ষমতা পরশুরামের আছে। প্রথমত, তাঁহার নিজের নাম, যিনি অপরূপ রসসৃষ্টিতে অদ্বিতীয়, তিনি রূপধ্বংসকারী 'পরশুরাম'। রবীন্দ্রনাথ 'গড্ডলিকা' প্রসঙ্গে এই নাম লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তারপর 'গড্ডলিকা'—জলজ্যান্ত মানুষ ও পশুর চিড়িয়াখানাকে গড্ডলিকা বলা যায় কি করিয়া? এই বার কজ্জলী—বিশ্বকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম খুলিয়া দেখিলাম কজ্জলীর দুই অর্থ। ১। মিশ্রিত রস-গন্ধকম অর্থাৎ মিশ্রিত পারদ ও গন্ধক। ২। মৎস্যবিশেষ। প্রচ্ছদপটের ছবি দেখিয়া প্রথম অর্থের কথা মনে হইলেও দ্বিতীয় অর্থটিই বোধ হয় ঠিক। কজ্জলী নিশ্চয়ই অগাধ জলের মৎস্যবিশেষ এবং ইহা পরশুরামের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই পুস্তকে বিরিঞ্চিবাবা, জাবালি, দক্ষিণরায়, স্বয়ম্বরা, কচিসংসদ ও উলট পুরাণ এই ছয়টি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে; প্রত্যেকটিই চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক বিচিত্রিত।

পরশুরামের পৈতাখানা পাঠকসাধারণের নাকের সম্মুখে এমন প্রকট হইয়া আছে যে বামুন বলিয়া তাঁহার পরিচয় দিতে সঙ্কোচ হয়। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত পরশুরামের গল্প দেখিতে দেখিতে অতি অল্পকাল মধ্যে বাঙলাভাষাভাষী যেখান যত লোক আছে সকলের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে—ইহাই তাঁহার ক্ষমতার সব চাইতে বড় সার্টিফিকেট। শুধু প্রচার নয়, 'কচি-সংসদে'র নকুড় মামা হইতে বোদা, 'বিরিঞ্চিবাবা'র বরদা মুখুয্যে, সত্য, ননী, নিবারণ, 'স্বয়ম্বরা'র চাটুয্যে মশায় প্রভৃতি চরিত্র ও কথাবার্ত্তা এমনই জীবন্ত যে আমরা বই বন্ধ করিয়াই ভুলিয়া যাই যে বইয়ের পাতার মধ্যেই শুধু তাহাদের সন্ধান পাইয়াছি। মনে হয়, এরা আমাদের কতকালের চেনা। চেহারা, কথা বলিবার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত যেন স্বচক্ষে কতবার লক্ষ্য করিয়াছি। পাঠক-সাধারণকে এইভাবে জাদু করিবার ক্ষমতার গর্ব্ব বাঙলাদেশে খুব অল্প লেখকই করিতে পারেন; বিশেষ করিয়া যে দিকটা পরশুরাম লইয়াছেন সেদিকে তিনিই একা, তাঁহার আশেপাশে ত আর কাহাকেও দেখি না।

তন্দ্রারত বরদা খুড়োর 'তিনে কত্তি তিন',

সত্যের তিন টন আরসোলা, পরমার্থ, নিবারণ ও সত্যের থিওরী অব রিলেটিভিটির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, প্রফেসর ননীর হেক্সা-হাইডক্সী ডাইএমিনো, নিতাই বাবুর নাইন্টিন ফোর্টিন, মিষ্টার সেনের 'মাই ঘড়', মহাদেবের 'আঃ ছাড়—ছাড়—লাগে, মাইরি, এখন ইয়ারকি ভাল লাগে না'—বুঁচির 'যাঃ', বালখিল্য মুনিদের 'রে রে রে রে', বকুলালের দশ লাখ, চাটুয্যে মশায়ের—'পরণে একটি দেড়-হাতি গামছা' ও 'ঠোঁটের সিঁন্দুর অক্ষয় হোক', নকুড় মামার ওভারকোট, কচিসংসদের পেলব রায়, শিহরণ সেন, দোদুল দে, লালিমা পাল (পুং), পদ্ম ও কেষ্টর হাইকোর্টশিপ, বোদার 'বাবু বাগ্ গিয়া', উলট পুরাণের সুবোধ ইংরাজ শিশুগণ সকলই আজ বাঙলার পাঠক সমাজের অত্যন্ত পরিচিত। আজিও যাঁহাদের উপরিল্লিখিত বস্তুগুলির সহিত পরিচয় ঘটে নাই তাঁহারা অচিরাৎ যেন কজ্জলী পড়িয়া লন—সাধারণ লোকের অতি সাধারণ কথাই ছাপার অক্ষরে কিরূপ হাস্যোদ্রেক করিতে পারে পরশুরামের বইখানি পড়িবার পূর্ব্বে সে খবর কেহ পাইবেন না।

আমাদের এই অশ্রুপ্লাবিত দেশে ব্যঙ্গারস অত্যন্ত কম, নির্দ্দোষ ব্যঙ্গারস ত নাই বলিলেই হয়। এরূপ ক্ষেত্রে একই হাতে গড্ডলিকা ও কজ্জলীর মত দুখানি অপূর্ব্ব ব্যঙ্গারসের বহি যে পৃথিবীর ব্যঙ্গরস-সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযোগী হইয়াছে ইহা আমাদের বাঙলা সাহিত্যের নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

কজ্জলীর চিত্রের প্রশংসা একমুখে করা যায় না, পরশুরামের ব্যঙ্গাকে যিনি পেন্সিল বা কলমের কয়েকটা টানেই ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম তিনিও রসিক কম নন। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "লেখার দিক দিয়া বইখানি (গড্ডলিকা) আমার কাছে বিস্ময়কর, ইহাতে আরো বিস্ময়ের বিষয় আছে, সে যতীন্দ্রকুমার সেনের চিত্র। লেখনীর সঙ্গে তুলিকার কি চমৎকার জোড় মিলিয়াছে, লেখার ধারা রেখার ধারা সমান তালে চলে, কেহ কাহারো চেয়ে খাটো নহে।" কজ্জলীতে যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের খ্যাতি বজায় আছে, মনে হয় কচিসংসদের চিত্রে তিনি অধিকতর নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। ছাপাই বাঁধাই চমৎকার।

শিকার ও শিকারী—[শিকারী-কাহিনী] শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ১৬।১এ বীডন স্ট্রীট হইতে শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা। কাপড়ে বাঁধান, বহিখানি বড় বড় অক্ষরে ছাপা। আর্ট পেপারে ছাপা অনেকগুলি ছবি আছে।

পূর্ণ অহিংসাবাদী ভিন্ন হিংস্র জন্তু শিকার সম্বন্ধে অন্য লোকদের বিশেষ মতদ্বৈধ হইবে না; অহিংস্র যে-সব প্রাণী মানুষের প্রাণবধ বা অন্য অনিষ্ট করে না, তাহাদের হত্যা সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। এই পুস্তকটির পরিচয়-দান উপলক্ষ্যে এইসব গুরুতর প্রশ্নের আলোচনা না করিলে ক্ষতি নাই। বহিখানি শিকারীদের খুব কাজে লাগিবে। ভাষা সরল ও সহজ বোধ্য। যাঁহারা শিকারী নহেন, তাঁহারাও শিকার-কাহিনী আগ্রহের পড়িতে পারিবেন। তা ছাড়া, নানাবিধ জীব-জন্তুর প্রকৃতি, চাল-চলন, অভ্যাস প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও এই পুস্তক হইতে পাওয়া যায়। রাজনীতির পরোক্ষ আভাসও সাধারণ পাঠকেরা স্থানে স্থানে পাইবেন—যদিও তাহা লেখকমহাশয়ের অভিপ্রেত না হইতে পারে! যথা—

"আর একটি হাস্যোদ্দীপক গল্প এখানে বলিতেছি। কোন বিশিষ্ট স্থানে, তত্রত্য বড়

লোকের একটি পোষা টাইগার ছিল। তাঁহার 'লড়াইয়ে' ভেড়ারও খুব সখ ছিল। হঠাৎ একদিন একটি ভেড়া ছুটিয়া, তাঁহার সুয়োরাণীর প্রিয় দাসীর হাঁটুতে ঢুঁ দিয়া জখম করিয়া ফেলে। রাজার নিকট সেই অভিযোগ পৌঁছিলে, তিনি বিচার করিয়া এই গুরুতর অপরাধের জন্য ঐ ভেড়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, উহাকে বাঘের মুখে সমর্পণের ব্যবস্থা করিলেন। রাজাদেশ পালিত হইলে, ভেড়া বেচারার মনের ভাব যে কি হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করা ছাড়া বুঝিবার উপায় নাই। বাঘটি ভেড়াকে পাইয়াই যখন উহাকে ধরিবার জন্য, এক কোণে 'খাপ' পাতে, তখন বেচারা ভেড়া নিরুপায় হইয়া আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ক্রমাগত পিছু হটিতে থাকে। যে-মুহূর্ত্তে দেওয়ালে উহার পিছন ঠেকিল, ভয়ঙ্কর বেগে ধাবিত হইয়া, শেষ চেষ্টা করিবার জন্য, বাঘের মাথায় এমন প্রচণ্ড বেগে ঢুঁ মারে, যে, তাহাতে উহাকে একেবারে শরিষার ফুল দেখাইয়া দেয়। ইহার পরই বাঘের লাফালাফিতে ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক বিষম আলোড়িত হইয়া উঠিল। ভেড়া যে-দিকে যায় বাঘও তাহার বিপরীত দিকে পালায়; সে আর কিছুতেই ভেড়াটিকে ধরিতে সাহস করে না। দুনিয়াই শক্তির ভক্ত। কিন্তু মহারাজের ন্যায়বিচারে, ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ লঙ্ঘন হইতে পারে না বলিয়া, পরদিন পুনরায় উহার চারি পা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, আত্মশক্তি ছাড়া আত্মরক্ষা হয় না। সব যুগেই সর্ব্বত্র দুর্ব্বলে সবলে এই সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। যেখানে আত্মশক্তির বিকাশ হয়, সেইখানেই রক্ষা পাওয়া যায়; অন্যথায় ধ্বংস অনিবার্য্য। এইরূপে একটি ঘোড়ার দ্বারা একটি বাঘিনী কিরূপে জব্দ হইয়াছিল, তাহা স্থানান্তরে বলিব।"

বৈজ্ঞানিক পুস্তকে যাহা অনাবৃত ভাষায় লেখা আবশ্যক, সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য কোন বহিতে তাহা আবরণ দিয়া লেখাও অনেক সময় অবাঞ্ছনীয়। এইজন্য গ্রন্থকার অল্প কোন কোন অংশ বাদ দিলে বা অন্য ভাবে লিখিলে ভাল হইত। যেমন ১৯৭ হইতে ১৯৯ পৃষ্ঠার কোন কোন বাক্য।

—স

১৩৩৭ শ্রাবণ

"চলন্তিকা"

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মানবচরিত্রজ্ঞ ও সুরসিক গল্পলেখক বলিয়া ছদ্মনামে পরিচিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি কতকগুলি জিনিষের নামকরণ তিনি করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহার শব্দ রচনানৈপুণ্যও আমরা অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন "চলন্তিকা" নামক তাঁহার অভিধানখানি হাতে পড়ায় সেই অনুমান যথার্থ মনে হইতেছে।

ইহার নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া

হইয়াছে। "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল শব্দের যথোচিত বিবৃতির স্থান করিবার জন্য অল্পপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ এবং অধুনা অপ্রচলিত প্রাচীন বাংলা শব্দ দেওয়া হয় নাই।" যাহা সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে, গ্রন্থকার এরূপ একটি অভিধান রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

অভিধানখানিতে ছাব্বিশ হাজারের অধিক শব্দের বিবৃতি আছে। তদ্ভিন্ন বানান, ণত্ব ষত্ব-বিধি, সন্ধি, শব্দরূপ ক্রিয়ারূপ, সংখ্যাবাচক শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ক ও বহু পারিভাষিক শব্দসম্বলিত বিস্তৃত পরিশিষ্ট আছে।

আমরা আমাদের সাধারণ কাজের জন্য ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেছি।

যিনি ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিবেন, তিনি ইহার কিছু খুঁৎ দেখাইতে পারিবেন। সেরূপ খুঁৎ প্রথম সংস্করণে অনিবার্য্য।

পুস্তকখানির আয়তন ও মূল্য বেশ সুবিধাজনক হইয়াছে।

১৩৩৭ পৌষ

বাংলায় বৌদ্ধ জাতক-মালা

ষোল বৎসরের পরিশ্রম এবং প্রায় দশ হাজার টাকা খরচ করিয়া শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ বৌদ্ধ জাতকসমূহ বাংলায় অনুবাদ করিয়া ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরেজী অনুবাদ কয়েকজন বিদ্বান লোকের পরিশ্রমে এবং অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। ঈশান বাবু একা নিজের পরিশ্রমে ও ব্যয়ে বাংলা অনুবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি একাধিক দীর্ঘ ভূমিকা এবং বহু টীকা সংযোজন করিয়াছেন। এই সব কারণে তাঁহার কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। জাতকগুলির গল্প মনোরম এবং উপদেশপূর্ণ। তৎসমুদয় হইতে প্রাচীন ভারতের যুগবিশেষের সমাজিক অবস্থার ইতিহাসও কতকটা সংগ্রহ করিতে পারা যায়। এরূপ গ্রন্থ বাঙালীদের মধ্যে যত বেশী লোক পড়িবে, ততই বঙ্গীয় জনগণের মঙ্গল হইবে।

১৩৪০ অগ্রহায়ণ

বাংলা অভিধান

বৃহতের সহিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রের সাদৃশ্য দেখাইয়া বলিতে পারা যায়, ইংরেজী ভাষায় যেমন ডাঃ মারের অক্সফর্ড অভিধান বৃহত্তম, বাংলা ভাষায় বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশমান শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাংলা অভিধান সেইরূপ এপর্য্যন্ত প্রকাশিত অভিধানগুলির মধ্যে বৃহত্তম হইবে। আবার, ইংরেজী ছোট অভিধানগুলির মধ্যে পকেট অক্সফর্ড অভিধান যেমন নিত্যব্যবহার্য্য কাজের জিনিষ হইয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু কৃত "চলন্তিকা" অভিধান সেইরূপ নিত্যব্যবহার্য্য কাজের জিনিষ হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা কোন কোন বিষয়ে ইংরেজী পকেট অক্সফর্ড অভিধানের চেয়ে বেশী মূল্যবান হইয়াছে। ইহার প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হয়, তখন হইতেই ইহা আমাদের টেবিলে থাকে। দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার শব্দসংখ্যা বাড়িয়াছে, অথচ ইহার নিত্য ও অনায়াস ব্যবহার্য্যতা রক্ষিত হইয়াছে। সংস্কৃত যে-সব শব্দ সাধারণতঃ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদয়ের অর্থ ইহাতে যেমন পাওয়া যায়, সাহিত্যে ব্যবহৃত 'দেশজ' চল্‌তি শব্দসকলের অর্থও তেমনি পাওয়া যায়। বিদেশী পারিভাষিক বহু শব্দের বাংলা প্রতিশব্দও ইহাতে আছে। সংবাদপত্রের লেখক পরিচালক সম্পাদক প্রভৃতি অর্থে 'সাংবাদিক' কথাটি আমরা প্রথমে রচনা করি ও চালাই। 'চলন্তিকা'য় ইহা নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। 'প্রচেষ্টা' শব্দটি সম্ভবতঃ সংস্কৃতে আগে হইতেই ছিল। ইংরেজী 'মুভ্‌মেন্ট' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে উহা আমরা প্রথমে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। রাজশেখরবাবু এই অর্থ—"কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহুলোকের চেষ্টা, movement ('শিশুমঙ্গল'-)" দিয়াছেন। অভিধানখানির শেষে রাজশেখরবাবু যে পরিশিষ্টগুলি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের যে ভিত্তি রামমোহন রায়ের মত পূর্ব্বজ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ব্যাকরণঘটিত পরিশিষ্টগুলিতে তাহা পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধাবিত হইবার যোগ্য। তাহা নির্দ্ধারিত হউক বা না-হউক, বাংলাশিক্ষার্থী সকলে যেন ইহা অধ্যয়ন করেন।

১৩৪১ কার্ত্তিক

বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য—শ্রীসুকুমার সেন। রঞ্জন প্রকাশালয়, কলিকাতা ১৩৪১। পৃ. ২২২।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের নাম বাঙ্গালা ভাষা সমালোচনার ক্ষেত্রে অপরিচিত নহে। তাঁহার এই সারগর্ভ পুস্তকখানি যে শুধু তাঁহার পাণ্ডিত্যের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে,—বর্ত্তমান ভাষা-বিকৃতির যুগে এরূপ ঐতিহাসিক সমালোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বলিয়া, ইহা সময়োপযোগীও হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গালা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য কীর্ত্তির মধ্যে, গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টিও একটি প্রধান কীর্ত্তি। সেই গদ্য-সাহিত্য-সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস সাধারণ পাঠকের অজ্ঞাত না হইলেও, খুব সুস্পষ্ট নহে। সুকুমার বাবুর বহুপ্রযত্নসাধ্য রচনা, উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, সেই সাহিত্যের যে তথ্যপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল খসড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, তাহা শুধু বিশেষজ্ঞের নহে, সাধারণ পাঠকেরও আদরণীয় হইবে। এ-পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে-সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য বিবরণ হইতে পারে নাই; কারণ, এই সকল রচনা হয় তথ্য ও অতথ্য নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছে, অথবা শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাসে পর্য্যবসিত হইয়াছে। জ্ঞাতব্য তথ্য-সংগ্রহ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হিসাবে সুকুমার বাবুর পুস্তক নাতিদীর্ঘ হইলেও মূল্যবান্, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে, তাঁহার রচনাই পূর্ণাবয়ব না হইলেও, এ-পর্য্যন্ত একমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকের গোচরে আনিয়াছে।

কিন্তু সুকুমার বাবু যে-মনোভাব লইয়া তাঁহার গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-রসিকের নহে, তথ্যমাত্র সন্ধানী বৈয়াকরণের মনোভাব। ব্যাকরণ-অভিধানের দিক লইয়া যাঁহারা চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রম নিরর্থক, এ-কথা বলিতেছি না; কিন্তু একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকার জন্য, নিছক বৈয়াকরণ অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া বসেন। সুকুমার বাবু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা লেখকদের গদ্য-রীতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন। গবেষণা হিসাবে তাহার মূল্য কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু ভাষায় খুঁটিনাটি বিশ্লেষণই কোনও বিশিষ্ট গদ্য-রীতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার একমাত্র উপায় নহে। ইহা ভাষাতত্ত্ব হইতে পারে, কিন্তু তত্ত্ব সকল সময়ে সত্য না হইতেও পারে। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণ-পদে স্ত্রীপ্রত্যয়ের বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, অথবা অসমাপিকা ক্রিয়া প্রচুর ব্যাকরণ দুষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন, অথবা তৎসম ও তদ্ভব শব্দের নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণের দ্বারাই কি বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব গদ্য রীতির প্রকৃত সৌন্দর্য্য-বোধ হইবে? দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, সুকুমার বাবুর বিবরণ পড়িয়া মনে হইল যে, লোকে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনার অযথা অত্যুক্তিপূর্ণ সুখ্যাতি করে; বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে অতি বিশ্রী গদ্যই লিখিতেন। সুকুমার বাবুর বহু পরিশ্রমপ্রসূত পুস্তকের অযথা গুণাপকর্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তিনি পুস্তকের নামকরণ ব্যাপক নামকরণ করিয়াছেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য'। এ-ক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নহে; কিন্তু সাহিত্যে গদ্য-রীতির বিচারে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, ভাষার অস্থি-সংস্থান এবং তাহার দেহ-লাবণ্য এক বস্তু নহে; একের বিচারে অপরটির উপর শাসন জারি করিলে, উভয়েরই অবিচার করা হয়।

শ্রীসুশীলকুমার দে

নরবাঁধ—শ্রীমনোজ বসু। রসচক্র সাহিত্য সংসদ্, ১৫, রাজা বসন্তরায় রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০।

'নরবাঁধ' আর 'মাথুর'—এই দুইটি গল্পে প্রায় আধাআধি করিয়া ১৫০ পাতায় বইখানি জুড়িয়া আছে।

যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাবান লেখক একেবারে জয়পতাকা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নামেন, শ্রীমনোজ বসু তাহাদেরই মধ্যে একজন। এর ব্রত বাংলাকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করা। দেশের অন্তর্লক্ষ্মীর পরিচয় পাইতে হইলে যেখানে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে সেই মর্ম্মস্থলটির পথ লেখকের ভাল ভাবেই জানা আছে।

লেখার মধ্যে এমন একটি অপরূপ সরসতা আছে যে, যে বিস্ময় আর অবোধ আনন্দের সহিত ছেলেবেলায় রূপকথা শোনা যাইত, বইখানি পড়িবার সময় তাহারই যেন একটা আবছায়া স্মৃতি মনকে অভিভূত করিয়া বসে। ভাষা বেশ সুরাল—মাঝে মাঝে ঝঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠে। চরিত্রগুলি খুব সজীব—ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া ঘুরে।

এমন বইখানিকে এক জায়গায় কিন্তু একটু নিরাশ হইতে হইল। 'নরবাঁধ' গল্পটি ২৪ পাতায় আসিয়া শেষ হইয়া গেছে; তাহার পর আর টানিয়া লইয়া যাওয়া ভাল হয় নাই। ২৪ হইতে ৭০ পাতায় মধ্যেও লেখার সব বিশিষ্টতাই বর্ত্তমান, কিন্তু ঐ ২৪ পাতায় জোড়ের কথাটা বরাবরই মনকে পীড়া দেয়। সম্পূর্ণতার বাহিরে যায় নাই বলিয়া মাথুর গল্পটি নিখুঁৎ হইয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই, কাগজ—সবই বেশ ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩৪১ ফাল্গুন

মহারাজ দিব্য

রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার অভিভাষণে সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত "রামচরিত" এবং কোন কোন তাম্রশাসনের বিচার করিয়া মহারাজ দিব্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন।

"প্রকৃতিপুঞ্জকর্ত্তৃক গোপালের রাজপদে প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন শত বৎসর পরে বাঙ্গালায় আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঘটিয়াছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের অনন্তসামন্তচক্রের নির্ব্বাচিত নায়ক ছিলেন দিব্য বা দিব্বোক।"

বিদ্রোহ হইয়াছিল মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে—যেহেতু তিনি অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন।

"গৌড়েশ্বর দ্বিতীয় মহীপাল সন্দেহের বশে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, সুরপাল এবং রামপালকে, লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বিপ্লবের অপর কারণ স্বরূপ কবি বলিয়াছিলেন, মহীপাল 'অনীতিকারম্ভরত', অর্থাৎ নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত, এবং 'ভূতনয়াত্রাণযুক্ত', অর্থাৎ সত্যের এবং নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ছিলেন। দিব্যের বিদ্রোহ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না; ঘটনাচক্রে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তিনি রাজদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন নাই, উপায়ান্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। ভণ্ড তপস্বী হওয়া দোষের কথা, কিন্তু ভণ্ড বিদ্রোহী, অর্থাৎ যে সাধ করিয়া বিদ্রোহ করে না, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিদ্রোহ করে, সে মহৎ ব্যক্তি। এই বিদ্রোহ কোন জাতিবিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। ইহা সার্ব্বজনীন বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিপ্লব।"

রমাপ্রসাদ বাবু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক। রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব ও আন্দোলন তিনি করেন না, তাহা তাঁহার কাজ নয়। এই কারণেই তাঁহার অভিভাষণের শেষে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রণিধানযোগ্যতা বাড়িয়াছে। তিনি বলিয়াছেন :—

"মিলিত অনন্ত সামন্তচক্র নির্ব্বাচিত গোপাল দেব এবং দিব্য জাতিবর্ণের অতীত মহাপুরুষ ছিলেন। সেকালের সামন্তচক্রের স্থলবর্ত্তী বর্ত্তমান জননায়কগণ। গোপাল দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং দিব্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন সার্দ্ধ আট শত বৎসর পূর্ব্বে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে দেশের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পরিবর্ত্তন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ভিত্তি পল্লীসমাজ, যাহা মুসলমানগণকেও আপনার করিয়া ভাই, চাচা, নানায় পরিণত করিয়াছিল, তাহা প্রাণ হারাইয়াছে, এবং পল্লীসমাজের প্রাণশূন্য দেহ এখন আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনীতির বর্ত্তমান লক্ষ্য স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা চরম লক্ষ্য (end) নহে চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবার পথ (means) মাত্র। রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য, সার্ব্বজনীন কল্যাণ, সার্ব্বজনীন সুখসম্পদ।

"এই লক্ষ্যে পঁহুছিতে হইলে সেকালেও যে উপায় অবলম্বন করিতে হইত, এখনও তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সেই উপায় অনন্তসামন্তচক্রের মিলন; সকল জনসেবকের ঐক্য। এরূপ ঐক্য বর্ত্তমানে অসাধ্য মনে হয়। যে দুই জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপদকালে এদেশে অনন্ত সামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্‌বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিতকথা আমাদের স্মরণীয়, মাননীয় এবং কীর্ত্তনীয়। এইরূপ স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন আমাদের মনে ঐক্যের সুমতি উদ্বোধনের সহায়তা করিতে পারে। ইহাই দিব্যস্মৃতি-উৎসবের সার্থকতা। আর এক কারণেও এই উৎসব বড় সময়োপযোগী হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ আত্মনির্ভর এবং আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে। তাহাকে আবার দেশের দিকে ফিরাইয়া আনার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় দেখা যায় না।"

১৩৪৩ বৈশাখ

"চণ্ডীদাস-চরিত"

বর্ত্তমান বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথী ছাপিতে আরম্ভ করিলাম। ইহার সংশোধিত নকল করাইতে এবং টীকা করিতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামানুজ কর বাঁকুড়া জেলার সাহিত্যানুরাগী বণিক। তিনি পুথীটি সংগ্রহের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন মূল সংস্কৃত পুথীটির রচয়িতা উদয় সেনের প্রপৌত্র কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের প্রপৌত্র। কৃষ্ণপ্রসাদ সেন উদয় সেনের মূল সংস্কৃত পুথীটির বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। তাহাই আমরা ছাপিতেছি।

১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ

নেপালে বিদ্যাপতির গীতাবলীর পুথী

পাটনার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সবাল নেপালের বাজকীয় গ্রন্থাগারে একটি প্রায় ৫০০ বৎসরের পুরাতন বিদ্যাপতির গানের পুথী দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা তালপাতার ১০৯টি পাতায় মৈথিলী অক্ষরে লেখা। মৈথিলী অক্ষর বাংলারই মত। বিদ্যাপতির পদাবলীর বঙ্গে একাধিক সংস্করণ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বহু পরিশ্রমে একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই নবাবিষ্কৃত পুথী মিলাইয়া দেখা উচিত। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একাধিক শিক্ষিত বাঙালী আছেন। তাঁহাদের কাহারও পুথীটি নকল করা কর্ত্তব্য। নেপাল সরকারের নিকট অনুমতি চাহিলেই অনুমতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে নেপাল সরকার খুব উদার।

১৩৪৩ পৌষ

আধুনিক বাংলা সাহিত্য— শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। ঢাকা এলবার্ট লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৬। মূল্য ২৷৷০ ও ৩৲ টাকা।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন নৈরাশ্য জন্মিয়া গিয়াছে যে নিজের লেখা ছাড়া অন্য লেখা পড়া ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম এমন সময়ে মোহিতবাবুর আধুনিক বাংলা সাহিত্য নামে সমালোচনা-গ্রন্থ হাতে পড়িল। ব্রিটিশপ্রভাবোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ চিন্তাপূর্ণ ধারাবাহিক রচনা ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। বাঙালীর সমালোচনার মধ্যপন্থ নাই, তাহাতে

হয় 'চমৎকার আহা মরি মরি'র সুমেরু, নয় ব্যক্তিগত গালাগালির কুমেরু; প্রকৃত সমালোচক মধ্যপন্থার পথিক, মোহিতবাবু সেই মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি আছে :-

আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, শরৎচন্দ্র ও আধুনিক সাহিত্যের ভাষা।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের উপরে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাব এত গভীর ও ব্যাপক যে অপরিণামদর্শীর দৃষ্টিতে ইহা সর্ব্বতোভাবে অ-বাঙালী। কিন্তু লেখকের কৌশলী দৃষ্টি ইহার ভিত্তিতে পূর্ণ বাঙালীয়ানাকে আবিষ্কার করিয়াছে। এই সাহিত্যের মূলে জাতীয় ভিত্তি ছিল বলিয়াই তাহা বৈদেশিক প্রভাবের গরলকে নীলকণ্ঠের মত অতি সহজে ধারণ করিতে পারিয়াছিল; এবং ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সাহিত্যের "দেহ ও প্রাণধর্ম্ম দেশেরই, বাহির হইতে আসিয়াছিল। কেবল সঞ্জীবনী ভাব প্রেরণা। অতএব আজ সাহিত্য ও ভাষার এই আদর্শসঙ্কটের দিনে, জাতির প্রতিভা ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি—এক কথায় তাহার স্বধর্ম্ম, এই নব্য সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।"

এই প্রয়োজন হইতে বর্ত্তমান গ্রন্থের রচনাগুলির উদ্ভব। লেখক বাংলায় এই পুনর্জ্জীবন-পর্ব্বের দুইটি বিশিষ্ট লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইংলণ্ডের পুনরুজ্জীবন-পর্ব্বের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার অঙ্গহীনতা ধরা পড়িবে।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে যে পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছিল তাহা উভয়মুখী ছিল—বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। বহির্লোকে ড্রেক ও র‍্যালে, অন্তর্লোকে শেক্সপীয়র ও স্পেন্সর ইংলণ্ডের বাণীর বনিয়াদ রচনা করিয়াছিল। স্পেনের নৌবহর ধ্বংসের মূলে ছিল ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুশাসনকে ।। ড্রেক পারসমুদ্রে যে নব দিগন্তের অনুসন্ধান করিতেছিল তাহার দোসর ছিল শেক্সপীয়রের অন্তর্মুখী অনুসন্ধিৎসায় আর র‍্যালে সাত-সমুদ্র-তের-নদীর পারে যে স্বর্ণপুরীর সন্ধান কোনদিন পায় নাই লণ্ডনে বসিয়া শেক্সপীয়র তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল—মানুষের দুস্তর হৃদয়সমুদ্রের পরপারে।

এই জাতীয় জাগরণ উভয়মুখী ছিল বলিয়াই তাহা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে পারিয়াছিল এবং উত্তরকালে ইংলণ্ডকে এমন গৌরবময় করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যাইবে বাঙালীর পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত একপেশে ও অঙ্গহীন। ইংরেজের ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য-পত্তনে, রাষ্ট্রশৃঙ্খলায়, আইন-প্রণয়নে ও সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য আদর্শের বিস্তারে বাঙালী শান্তি ও সাম্য অনুভব করিয়াছিল। এই শান্তি ও সাম্য যে-পরিমাণে তাহার ভাবলোকে মুক্তির আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছিল বহির্লোকে সে তুলনায় কিছুই দিতে পারে নাই। বাঙালী আর্মাডা ধ্বংস করে নাই, রাজ্য বিস্তার করে নাই, উপনিবেশ স্থাপন করে নাই—কেবল সাহিত্য রচনা করিয়াছিল। পশ্চিমের এই প্রচণ্ড আঘাতে তাহার সুপ্ত বাঙালী ধর্ম্ম—চৈতন্যদেবের সময় হইতে যাহা সুপ্ত ছিল—জাগিয়া উঠিয়া আর একবার, বোধ হয় শেষবার, আপন অস্তিত্বকে অনুভব করিয়াছিল। মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বাহ্য আড়ম্বর, ভাষার ঐশ্বর্য্য, ভঙ্গী বৈদেশিক প্রভাবকে যতই উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করুক না কেন, তাহার "দেহ ও প্রাণধর্ম্ম" দেশেরই। সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ এই যে তাহাতে তৎকাল ও সর্ব্বকালের, অর্থাৎ তথ্য ও সত্যের সমন্বয় ঘটিয়া থাকে। চিরকালের সত্য তৎকালের রথে আরোহণ করিয়া দেখা দেন। মাইকেল-বঙ্কিম- রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মহত্ত্বের বাহন এই বাঙালীত্ব। এ বাঙালীত্ব এতই শক্তিমান যে বিশ্ববোধের বিশাল গিরি গোবর্দ্ধন অনায়াসে ধারণ করিতে সমর্থ। ইঁহাদের রচিত সাহিত্য বিশিষ্ট হইয়াও বিশ্বজনীন। ইহা বাঙালীর

বাংলা সাহিত্য আজ জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন; ইহার মূল জাতির নাড়ীর সঙ্গে আর বদ্ধ নহে, তাহার একমাত্র যোগ শিল্পীর অত্যুগ্র আত্মার সঙ্গে। শিল্পীর আত্মা ও জাতির আত্মার মধ্যে আজ আর সামঞ্জস্য নাই—এই বিশ্ববিহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা (আত্মবিলাস) বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালী জাতির অধঃপতনের মূলে। জাতিকে বাদ দিয়া আন্তর্জাতিকতাকে, অপরকে বাদ দিয়া আত্মকে, বিশিষ্টকে বাদ দিয়া নির্ব্বিশেষকেই বাঙালী সাধনার পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। বাংলা সাহিত্য প্রলয় পাদক্ষেপে যে নিয়তির দিকে চলিয়াছে, বিহারীলালের "সারদামঙ্গল" সর্ব্বপ্রথমে সেই দিকেই যেন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু বিহারীলাল ভারতীয় ভাবসাধনার সঙ্গে যুক্ত-আত্ম ছিলেন বলিয়া বিনাশ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্য লেখক মাইকেল-বঙ্কিম-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মধ্যে দেখিয়াছেন, তাহা শেষ বারের জন্য ধরা পড়িয়াছে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যে। তার পর হইতে কাব্য ক্রমে জীবন-নিরপেক্ষ (বাস্তব-নিরপেক্ষ) হইয়া পড়িয়াছে, বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্য এখন ভিন্ন পথের পথিক।

রচিত বিশ্বসাহিত্য। সেই জন্য লেখক মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন :— "পশ্চিমের প্রবল প্রভাব... যাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যেই বাঙ্গালীর বাঙ্গালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই একেবারে গুমরিয়া উঠিল;... হোমার, ভার্জ্জিল, ট্যাসোর কাব্য-গৌরব বিফল হইল—বীর বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল—বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা বাঙ্গালী বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মত নিদারুণ হইয়া উঠিল। ...ইহাই হইল বাঙ্গালীর মহাকাব্য। ...মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতি কাব্য।" লেখক বলিতেছেন, মধুসূদন, বিদেশের ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করিয়া অচিন্ত্য সমুদ্রের দিকে তরণী চালনা করিয়াছিলেন কিন্তু "সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাহার কাব্যতরণীর গতি নির্দ্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী'।"

লেখক এই গ্রন্থে মেজর ও মাইনর দুই শ্রেণীর লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই জাতীয় চৈতন্য আছে, কিন্তু মেজর লেখকদের রচনায় সব সময়ে তাহা চোখে পড়ে না; শিল্পের ইন্দ্রজালে তাহা আচ্ছন্ন। মাইনর লেখকদের রচনায় শিল্পের ইন্দ্রজাল তেমন দৃঢ়পিনদ্ধ না হওয়াতে জাতীয় চৈতন্য বেশ সহজে ধরা পড়ে। মেজর লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে মাইনর লেখকদের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার ইহাই প্রধান কারণ।

লেখক বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্গতির ও অধঃপতনের মূলে এই জাতীয় চেতনার তিরোভাব। সেইজন্য সাজসরঞ্জাম, বাহ্য আড়ম্বর সত্ত্বেও যেন ইহা প্রাণহীন। একদিন বাঙালী যে গাণ্ডীবকে যুদ্ধজয়ের জন্য অনায়াসে ব্যবহার করিয়াছিল, প্রাণদৃঢ়তার অভাবে আজ তাহাকে তুলিবার সাধ্যও তাহার নাই।

লেখকের সব মত স্বীকার করিতে পারি না, প্রয়োজনও নাই, এ-সব বিষয়ে মতভেদ থাকিবেই। সাহিত্য-সমালোচনার প্রধান গুণ লেখকের রচনায় আছে—পাঠকের চিত্তকে নাড়া দিবার শক্তি। গ্রন্থের প্রতি ছত্রে পাঠকের মন আন্দোলিত হইতে হইতে অগ্রসর হইতে থাকে; আবার রচনার প্রৌঢ়ত্বের জন্য মাঝেমাঝে থামিয়া চিন্তা করিতে হয়। আরাম চেয়ারে বসিয়া এ-বই পাঠ করিবার নয়; ইহা লইয়া চিন্তা করিতে হইবে, আলোচনা করিতে হইবে ও অবসর-কালে ধ্যান করিতে হইবে। নবন্যাসবিলাসী বাঙালী জাতির মধ্যে এখনও যে এই রকম গ্রন্থ লিখিত হয়, ইহাতেই মনে হয় বাঙালীর হয়ত এখনও কিছু আশা আছে। কিন্তু বাঙালীকে জানি, তাহার দ্বারা এ গ্রন্থ আদৃত হওয়া অসম্ভব, কাজেই সে অনুরোধ করিব না। মোহিতবাবু রবীন্দ্রোত্তর

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, আবার তিনি সমালোচনা-সাহিত্যেরও প্রধান পথপ্রদর্শক।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বাঙ্গালীর সার্কাস—শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু প্রণীত। পাবলিসিটি ষ্টুডিও; ৩৬৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ১।০। পৃ. ৮৫, ১৭ খানি চিত্র।

বইখানিতে বাঙালীর সার্কাসের এবং বিশেষ করিয়া বোসেস সার্কাসের ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রিয়নাথ বসু ভিন্ন কৃষ্ণলাল বসাক, শ্যামাকান্ত, ভীম ভবানী প্রভৃতি অনেকের কথাও ইহা হইতে জানা যায়। বাঙালীর সার্কাস প্রচেষ্টার মধ্যে কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি বিদেশী সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তবু বাঙালী খেলোয়াড়গণের মধ্যে তাঁহার নাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য ছিল।

বইখানি মোটের উপর বেশ ভাল হইয়াছে। ইহার ছবিগুলি ভাল, প্রচ্ছদপটখানি সুন্দর। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

ছলনাময়ী—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬১। মূল্য দুই টাকা।

দশটি ছোট গল্প লইয়া বইখানি। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার সজীবতায় এবং প্লটের মৌলিকতায় সমস্ত গল্পগুলিই অতিশয় চিত্তাকর্ষক। একটি দুর্ল্লভ জিনিষ এই বইখানিক বিশিষ্টতা দিয়াছে; তাহা কয়েকটি গল্পের রুদ্র রস। বাংলা লেখকদের মধ্যে যাঁহারা এ-রস লইয়া কারবার করেন তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়; যে কয়জন আছেন তাঁহাদের মধ্যে তারাশঙ্করবাবুর স্থান খুব উচ্চে। করুণ রসেও তিনি তেমনই কৃতী; তাহা ভিন্ন "রঙীন চশমা" "মুখুজ্জে-মশায়" গল্প দুইটির মধ্য দিয়া যে একটি হাস্যরসের ধারা বহিয়াছে তাহাও খুব উপভোগ্য।

ছোট গল্পের পাঠক স্বভাবতই একটু বিচিত্রতা আশা করেন, এই বইখানিতে তিনি পুরাপুরিই তাহা পাইবেন একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

ছাপার কিছু কিছু ত্রুটি আছে। কাগজ বাঁধাই ভাল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১৩৪৪ আশ্বিন

"সংবাদপত্রে সেকালের কথা", প্রথম খণ্ড

ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহুশ্রমসাধিত ও সুবিন্যস্ত এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা তাঁহাদের ব্যবহারের অনেক বেশী উপযোগী হইয়াছে। ইহার সংকলয়িতা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্করণে জ্ঞাতব্য বহু নূতন বিষয়, ১৮১৮-১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দকালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয়, অধুনা-অপ্রচলিত কিন্তু তৎকালপ্রচলিত বহু শব্দের অর্থসংকলিত সূচী, সম্পাদকীয় কতকগুলি মন্তব্য, এবং শতবর্ষ পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিল্পীর আঁকা বাঙালী সমাজের কতকগুলি চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া পুস্তকখানির আকর্ষণশক্তি ও মূল্যবত্তা বাড়াইয়াছেন। ছবিগুলি দেখিলে বুঝা যায়, সেকালের বাঙালী পুরুষ ও মেয়েরা রোগা-পটকা ছিল না!

বিজ্ঞান

প্রাসঙ্গিক কথা

বর্তমান গ্রন্থের সাধারণ ভূমিকায় বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট সম্পাদকের ছাত্ররূপে আনুগত্য এবং আচার্যের বিজ্ঞানকে জনগোচর করবার জন্য ব্যাপক প্রয়াসের কথা বলা হয়েছে। একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনার পরিচয়-সমন্বিত এমন বিস্তৃত রচনা আর কোনো পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি। *প্রবাসী* ও *মডার্ন রিভিউ* পত্রিকার এই বিষয়ক ভূমিকা গৌরবময়। *প্রবাসী*-র পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের পরে জগদীশচন্দ্রই মানব-প্রতিভার প্রকাশ ক্ষেত্রে সর্বাধিক স্থান অধিকার করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সঙ্গে রামানন্দর দীর্ঘস্থায়ী আদানপ্রদান ও বন্ধুতার সম্পর্ক, তিনি যে *প্রবাসী* পত্রিকায় বিশেষ গুরুত্ব পাবেন তা বোধগম্য। কিন্তু বিজ্ঞান তৎকালীন ভারতবর্ষে জনচিত্তহারী কোনো বিষয় ছিল না। সেখানে জগদীশচন্দ্র ও অন্য বৈজ্ঞানিকদের বিষয়ে রচনাদি প্রকাশ ক'রে রামানন্দ জাতীয় জীবনে বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত করার যে প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন তা তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

সংকলনে জগদীশচন্দ্রের বহু চিত্রসম্বলিত একটি রচনা গৃহীত হয়েছে ('বিজ্ঞানে সাহিত্য', ১৩১৮ বৈশাখ)। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হয়েও স্থূল বস্তুবাদী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে সতত বিদ্যমান একটি কবিসত্তা। তার উত্তম পরিচয় 'অব্যক্ত' গ্রন্থটিতে মিলবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং যে-ভাষায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, সাহিত্যবিচারে সেগুলি উৎকৃষ্ট। সাহিত্যানুরাগের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ ভাববিনিময়ের কথা আমরা স্মরণ করব এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলা গল্প ইংরেজি অনুবাদের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টার কথাও। তাঁরই ইচ্ছায় ভগিনী নিবেদিতা কাবুলিওয়ালা, দেনাপাওনা, ছুটি অনুবাদ করেছেন, যার মধ্যে কেবল কাবুলিওয়ালার অনুবাদটি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী' কাব্যটি জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন :

সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনা মাত্র দিনু উপহার।

জগদীশচন্দ্র মৌল সত্যের সন্ধানী ছিলেন যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত মিলিত। এ-বিষয়ে তাঁর বন্ধু ও গুণগ্রাহী স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ। উৎকলিত লেখাটিতে একটি উপবিভাগ 'কবিতা ও বিজ্ঞান'। তাছাড়া লেখাটির অন্যত্র একই মনোভাব দেখা গেছে। ভারতীয় অদ্বৈত

বেদান্তের দ্বারা জগদীশচন্দ্র গভীরভাবে প্রভাবিত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ *'Response in the Living and Non-living'* (১৯০২)-এর সূচনায় ঋক্‌বেদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। রামানন্দ তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন : "The Real is one, wise men call it variously." কেবল বৃক্ষে নয়, অজৈব পদার্থের (মাটি, পাথর, লৌহ, তাম্র অজৈব শ্রেণীভুক্ত) মধ্যে স্নায়বীয় স্পন্দন তিনি যন্ত্রযোগে প্রমাণ করেছেন। এছাড়া *প্রবাসী*-র ১৩২০ আশ্বিন সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের আরেকটি বড় আকারের সচিত্র প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। ('উদ্ভিদে স্নায়বীয় পদার্থ')।

জগদানন্দ রায় একাধিক সচিত্র প্রবন্ধে আচার্য বসুর নানা আবিষ্কারের কথা লেখেন। যথা, ১৩০৯ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'অধ্যাপক বসুর কয়েকটি আবিষ্কার' প্রবন্ধে জৈব এবং অজৈব উভয়ের মধ্যে চেতনার স্পন্দন কীভাবে জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করেছেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি রচনার শেষে লিখেছেন : "প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ ও নির্জীব বাজ্যের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক সীমান্তরেখা আবিষ্কারের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ বহু চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের দাম্ভিকতা... 'শারীরক্রিয়া', 'জীবনীশক্তি' প্রভৃতি কতকগুলি নিরর্থক শব্দের কোলাহলে সত্য কথা চাপা দিয়া, কতকগুলি নিছক্ কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগে এপর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের অদ্ভুত আবিষ্কারগুলির দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতগণের সেই কল্পনার মোহ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল লক্ষণ দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জীবনীক্রিয়ার অস্তিত্ব বুঝিয়া কাহাকেও প্রাণী কাহাকেও উদ্ভিদ এবং কাহাকেও বা নির্জীব সংজ্ঞায় আখ্যাত করিতেন, অধ্যাপক বসু মহাশয়ের পরীক্ষায় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই সেই লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে যেমন বলিতেন— 'এইস্থলে জীবনী শক্তির কার্য্য আরম্ভ এবং এই স্থানে তাহার শেষ',— এখন সে সকল কথা কোন ক্রমেই বলা চলিবে না। ইঁহারা যে ভিত্তির উপর আধুনিক বিশাল শারীরবিদ্যাকে দাঁড় করাইয়াছেন, বসু মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা তাহার ধ্বংস-সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।"

জগদানন্দ অন্য প্রবন্ধেও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানসাধনার ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল দিবস ১৯১৭ সালের ৩০ জানুআরি—ওইদিন কলকাতায় বসুবিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে জগদীশচন্দ্র স্থির করেছিলেন, মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুদিনে বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করবেন, কারণ নিবেদিতার মধ্যস্থতায় মিসেস বুল জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় ধারাবাহিকভাবে অর্থ সাহায্য ক'রে গেছেন। মিসেস বুল ছিলেন নরওয়ের বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের সহধর্মিণী। তিনি আমেরিকার বস্টন শহরের সামাজিক জীবনে অন্যতম নেত্রী। স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার প্রভাবে তিনি জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানসাধনায় প্রভূত অর্থসাহায্য করেন। সে যাই হোক, জগদীশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত নিজের জন্মদিনেই বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করার সিদ্ধান্ত করেন। সম্পূর্ণ ভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এই বিজ্ঞানমন্দিরে জগদীশচন্দ্র নিজ বিজ্ঞানসাধনায় ভগিনী নিবেদিতার দীর্ঘকালের সহযোগিতা ও উজ্জীবক প্রেরণার স্মরণে নিবেদিতার একটি রিলিফ মূর্তি বিজ্ঞানমন্দিবের প্রবেশপথের একদিকে স্থাপন করেন, নাম দেন Lady of the Lamp -- অর্থাৎ এই মন্দিরে প্রবেশের পথে আলোকদূতী হিসাবে নিবেদিতা আছেন। উভয়েই ভারতীয় শিল্পধারার একান্ত

অনুরাগী ছিলেন—জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার দ্বারা বুদ্ধগয়া থেকে সংগৃহীত বজ্রচিহ্নকে স্থাপন করেন মন্দির শীর্ষে। ভিতরে মঞ্চের পিছনে উপর দিকে নন্দলাল বসুর এক অসাধারণ রূপক চিত্র, নাম 'অন্বেষণ'—'জ্ঞান' ক্ষুরধার অসি নিয়ে পথ পরিষ্কার ক'রে অগ্রসর হচ্ছে, যে-যাত্রায় তার বধূ-সঙ্গিনী 'কল্পনা'। সভাগৃহের কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ব্রোঞ্জ রৌপ্য ও স্বর্ণনির্মিত সূর্যদেবের সুমহান মূর্তি—সূর্যদেব রথারোহে চলেছেন তিমিরহরণ করে আলোকবর্ষের নিত্যযাত্রায়।

এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র অসাধারণ ভাষণ দিয়েছেন। (ভাষণটি *প্রবাসী*-র ১৩২৪ পৌষ সংখ্যায় "নিবেদন" নামে পত্রিকার প্রথম রচনা হিসাবে মুদ্রিত হয়। সেটি পুরোপুরি সংকলন অংশে ছাপা হয়েছে)। তিনি উচ্চারণ করেছিলেন আবেগে আনন্দে মহান গাম্ভীর্যে সঘন ভাষায় বিজ্ঞানসাধনায় কোন্ ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন :

> যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।...ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল, তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এ বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জুনের।...সর্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে।... এই স্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার... জগতের সম্পত্তি হইবে... বাইশ বৎসর পূর্ব্বে [১৮৯৫ সালে যখন তিনি বিজ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গের ব্রত নিয়েছিলেন] যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে।

প্রতিষ্ঠাভাষণে জগদীশচন্দ্র কেবল নিজ পিতার বিশেষ উল্লেখ করেছিলেন। বাকি সহায়কদের মধ্যে নিজ পত্নীর কথা নাম না ক'রে বলেছেন। আর বলেন :

> বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

জগদীশচন্দ্রের জীবিত বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ সহায়ক রবীন্দ্রনাথের পৃথক উল্লেখ না করায় কোনো গুঞ্জন উঠেছিল কিনা জানি না। যাই হোক তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় রচিত প্যাট্রিক গেডেসের বসু-জীবনীতে আছে :

> Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest has been that with the poet Rabindranath Tagore.

আর সপ্ততিতম জন্মোৎসব ভাষণে জগদীশচন্দ্র বলেন :

> In all my efforts, I have not altogether been alone. In days of our common insecurity my life-long friend Robindra Nath Tagore was with me. Even in those doubtful days his faith never faltered.

গেডেস-রচিত জীবনীতে নিবেদিতার বিষয়ে বলা হয়েছিল :

> Latest among these friendships, but in some ways of the very highest importance, came that with Margaret Noble, better Known as Sister Nivedita.

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিবেদিতার বন্ধু ও গুণগ্রাহী। জগদীশচন্দ্র যে, রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে পরিচিত করাবার জন্য নিবেদিতাকে দিয়ে কাবুলিওয়ালা, ছুটি ও দেনাপাওনা অনুবাদ করিয়েছিলেন—সেকথা রামানন্দ জানতেন এবং বসুর বিজ্ঞানে নিবেদিতার ধারাবাহিক নিরলস সহায়তার কথাও তাঁর অজানা ছিল না। তাই জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মোৎসব সভার বিবরণের মধ্যে নিবেদিতার ভূমিকার বিশেষ উল্লেখ না ক'রে পারেননি। তার মধ্যে নানা কথার সঙ্গে বলেন :

> এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত কেহ হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে সেখান হইতে যোগ দিতেছেন। তিনি এই আশা করিতেন, যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও অচিরে জগৎকে নূতন কিছু শিখাইবে। বসু মহাশয়ের বিজ্ঞানমন্দির তাঁহার জীবিতকালে নির্মিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেন যে, বসু বিজ্ঞানমন্দিরে নূতন জ্ঞানলাভার্থ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীর আগমন হইবে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক নিকোলা টেসলার প্রসঙ্গ *প্রবাসী*-র ১৩০৮ অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় রামানন্দ উল্লেখ করেছেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নিকোলা টেসলার একটি বিস্ময়কর মন্তব্য এই : "কয়লা জল জড় পদার্থ ত; চারিদিকে এত অফুরন্ত আকাশপদার্থ আছে, তাহা হইতে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যাইবে।" চমকিত রামানন্দ বলতে পেরেছেন টেসলার কল্পনার সাহসের তুল্য সাহস কারও নেই। টেসলার ঐকথা বলার কারণ তাপোৎপাদক কয়লার ভাণ্ডার সীমিত। তা শেষ হওয়ার পর তাপ কোথা থেকে আসবে সে বিষয়ে গবেষণা এবং উপায় নির্ধারণ এখনই প্রয়োজন। টেসলা এক্ষেত্রে সূর্যরশ্মিকে ব্যবহারের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য বর্তমানে গৃহকর্ম ও অন্যক্ষেত্রে সূর্যরশ্মি-চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রয়োগ প্রমাণ করে টেসলার বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টির কথা। এখানে উল্লেখ্য, টেসলা ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন। স্বামীজী ই টি স্টার্ডিকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬-তে লেখা পত্রে বলেছেন :

> মিঃ টেস্‌লা বৈদান্তিক প্রাণ ও আকাশ এবং কল্পের তত্ত্ব শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কেবল এই তত্ত্বগুলিই গ্রহণীয়। আকাশ ও প্রাণ আবার জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতের সাহায্যে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, জড়

ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখবার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

পরবর্তীকালে *প্রবাসী*-র ১৩৪৭ কার্ত্তিক সংখ্যার এক লেখায় ঈথর-তরঙ্গ, পরমাণুর গঠন, কোয়ানটম্-বাদ, রশ্মি-বিক্ষেপণ-এর মতো পদার্থবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের অবদানপ্রসঙ্গে ক্রমান্বয়ে জগদীশচন্দ্র বসু, শিশিরকুমার মিত্র, মেঘনাদ সাহা, দেবেন্দ্রমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সি ভি রমন, কে এস কৃষ্ণানের গবেষণাসাফল্যের পরিচয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য দিয়েছেন। ('পদার্থবিদ্যায় ভারতবাসীর অবদান')।

জগদীশচন্দ্র ছাড়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্র রায় *প্রবাসী*-তে বিশেষ উল্লিখিত। এক্ষেত্রে বিবিধ প্রসঙ্গ-র অন্তর্গত ১৩৪৮ ভাদ্রের 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জয়ন্তী' রচনাটির নাম করা যেতে পারে। রামানন্দ সেখানে আবেগময় ভাষায় আশি বছর পূর্ণ হওয়ায় তাঁর শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রের মহিমাজ্ঞাপন করেছেন। ঐ লেখাটিতে প্রফুল্লচন্দ্রের নানামুখী ভূমিকার সুষ্ঠু উল্লেখ আছে। যেমন তিনি—প্রাচীন ভারতে রসায়নী বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে গ্রন্থরচয়িতা, প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়র্কস্-এর প্রতিষ্ঠাতা, ভালো সাংবাদিক হওয়ার গুণসম্পন্ন, সর্বোপরি অসীম ছাত্রদরদী এক শিক্ষক যাঁর বেতনের বড়ো অংশ ছাত্রদের জন্য ব্যয়িত হতো—এই মানুষটির জীবনী বহু বৎসর আগে রামানন্দ প্রদীপ পত্রিকায় লিখেছিলেন। মুগ্ধ রামানন্দর কলমনিঃসৃত একটি বাক্য : "টাকার পরিমাণ হিসাবে তাঁর চেয়ে বেশী দান ভারতবর্ষের বাইরে, ভারতবর্ষে, বাংলাদেশেও অনেকে করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রদত্ত জিনিষের সঙ্গে নিজেকেও দান করেছেন।...প্রফুল্লচন্দ্র শুধু নিজের যথাসর্বস্ব নয়, নিজেকেও দেশের সেবায় মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন।" কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের বিষয়ে রামানন্দর মন একমুখী ছিল না। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সরকারি ব্যয়বরাদ্দের খরচ সম্পর্কে গবর্নমেণ্টের চাপানো অনুশাসন বিষয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের দ্বিমুখী কথা রামানন্দের পছন্দসই হয়নি। সেখানে প্রফুল্লচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা তিনি করেছেন।

বাংলায় বিজ্ঞানসাধনা কেবল দুই বিরাট বৈজ্ঞানিকের কীর্তিকথা জানানোতেই প্রবাসী থেমে ছিল না। জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক শিষ্যগণের কথা রামানন্দ প্রবাসীতে অনেকবার উল্লেখ করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলাদেশে যেন বিজ্ঞান-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এইসব তরুণ বৈজ্ঞানিক পরে বিশ্ববিজ্ঞানের আসরে স্থান ক'রে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (রাসায়নিক), রসিকলাল দত্ত (রাসায়নিক), নীলরতন ধর (রাসায়নিক), মেঘনাদ সাহা (পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত) প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশই আচার্যপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছাত্র এবং স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত। তরুণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মেঘনাদ সাহার কৃতিত্বের বিষয়ে *প্রবাসী*-তে বেশি সংখ্যক সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে

বিশ্ববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ড. সাহার কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লিখিত। তা ভিন্ন প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, অনুকূলচন্দ্র সাহা, শিখিভূষণ দত্তর নাম পাওয়া গেছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ রাধানাথ শিকদার (এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণায়ক), ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসুর আবিষ্কারাদি *প্রবাসী*-তে গুরুত্ব পেয়েছে। সে-বিষয়ে বিবরণাত্মক মন্তব্য আছে। নৃতত্ত্ববিদ্ শরৎচন্দ্র রায় *প্রবাসী*-র অন্যতম লেখক ছিলেন। স্বতই তাঁর কৃতিত্বের কথা *প্রবাসী*-তে লিখিত। অবাঙালি বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাণ্ডারকর, রামানুজমের কথা পাই।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন সম্বন্ধে রামানন্দর বিস্তারিত মন্তব্য আছে। মন্তব্যগুলি একেবারে দুই প্রান্তীয়। এক পর্বে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, অন্য পর্বে কঠোর সমালোচনা। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পটভূমিকা বলা প্রয়োজন--

চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন (পরে স্যর সি ভি রামন) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক থাকাকালে ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কারের ফলে নোবেল পুরস্কার পান। সেই সময় কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি প্রদত্ত সংবর্ধনার উত্তরে তিনি কলকাতা সম্বন্ধে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দেন ('অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের সংবর্দ্ধনা', ১৩৩৮ শ্রাবণ, *প্রবাসী*)। তারপর ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ মাসের *প্রবাসী*-র সম্পাদকীয় মন্তব্যে ('অধ্যাপক রামনের অবদান পরম্পরা') কিছু বেসুরো কথা শোনা যায়। মধ্যে প্রায় তিন বৎসরের ব্যবধান। তারপরে *প্রবাসী*-র ১৩৪৯ আশ্বিনের সম্পাদকীয় মন্তব্য একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙা কাণ্ড। ('প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর উন্মত্ত প্রলাপ')। মধ্যে আরও আট বৎসরের ব্যবধান। সেই কালে স্যর চন্দ্রশেখর বাঙালিদের সম্বন্ধে প্রশংসার বদলে অতি কুৎসিত নিন্দা করেছেন। প্রবাসী-সম্পাদক, স্যর চন্দ্রশেখরের মন্তব্য এবং বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা (যা আগে মাদ্রাজ থেকে বেরোত) 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার'-এর মন্তব্য উৎকলন করেছেন। ঐ পত্রিকা যেভাবে স্যর চন্দ্রশেখরের প্রলাপ ভাষণের কঠোর উত্তর দিয়েছে, এবং ভারতীয় জীবনের নানা অংশে বাঙালিদের বিপুল দান সম্বন্ধে স্বীকৃতি সূচক-মন্তব্য করেছে, তার তুল্য কিছু বাঙালিদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না, কেন না তাতে আত্মশ্লাঘার দোষ ঘটত। স্যর চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাঙালিদের কোনোই দান নেই, তাদের ধমনীতে মঙ্গোলীয় রক্ত বইছে, সেজন্য এই অসুস্থ অঙ্গটিকে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিচ্ছিন্ন করে বর্মার সঙ্গে যুক্ত করাই উচিত। রামন উগ্র আত্মাভিমানী এবং স্বেচ্ছাচারী—একথা মনে রেখেও বলতে হবে বাঙালি-নিন্দায় তিনি নীচতার শিখর স্পর্শ করেছিলেন।

রামনের গবেষণা প্রথমত ঘটেছে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর কাল্টিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে যেখানে তিনি ১৯০৭-১৯৩৩, এই ২৪ বৎসর কাজ করেন। তারপর স্যর আশুতোষের আনুকূল্যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার পালিত-অধ্যাপক হন। এই সময়েও তাঁর গবেষণাগার কাল্টিভেশন অব সায়েন্স। পালিত-অধ্যাপক থাকাকালেই তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি। সে সময়ে কলকাতাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ নমস্কার জানিয়েছেন। তারপর ১৯৩৪ সালের শেষদিক থেকে কলকাতা ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে তাঁর কুৎসাপ্রবৃত্তি হঠাৎ কেন জেগে উঠল—তার তথ্যমূলক কাহিনি 'দেশ' পত্রিকার ৮ জুলাই ১৯৮৯ সংখ্যায় এনাক্ষী

ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ('একটি বিতর্কিত প্রস্থান')। স্যর চন্দ্রশেখরের ভোল বদলানোর পিছনে কী ছিল তা পাঠকদের বুঝে নেবার জন্য ঐ বিস্তারিত প্রবন্ধ থেকে কিছু কথা সংকলন করছি।

রামনের সঙ্গে বিবাদের একটা কারণ বলা হয়— ড. মেঘনাদ সাহার সঙ্গে চাকরিসূত্রে তাঁর স্বার্থসংঘাত। এ-সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায়-দম্পতির লেখা থেকে পাচ্ছি, রামন ও সাহার গবেষণাবিষয় ভিন্ন খাতে বয়েছিল। ১৯১৬ সালে রামন যখন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি নিয়ে গবেষণা করছেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের দুই প্রদীপ্ত ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা নব আবিষ্কৃত 'আপেক্ষিকতাবাদ, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, বোর-এর তত্ত্ব—ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাই বেশি কাম্য মনে করেছিলেন।' সাহার তাপ-অয়নন তত্ত্ব দেশেবিদেশে সাড়া জাগিয়েছিল, 'জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের নতুন দরজা খুলে' গিয়েছিল। সাহা বিলেত থেকে খয়রা-অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় ফেরেন, কিন্তু বিভাগীয় প্রধান রামনের সঙ্গে তাঁর ছোটোখাট বিষয়ে সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। সাহা অগত্যা চলে যান এলাহাবাদে। 'উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনার আর কোনো নজির নেই।' রামন এফ-আর-সি-এস হলেন ১৯২৪ সালে, আর সাহা হলেন ১৯২৭ সালে। রামনের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি, আগেই জেনেছি, ১৯৩০ সালে। এইকালে বাঙ্গালোরের ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের কাজকর্ম যাচাই করার জন্য যে রিভিউ কমিটি গঠিত হয়, তার অন্যতম সদস্য হিসাবে সাহা সেখানে পরবর্তী ডিরেক্টর পদের জন্য রামনের নাম সুপারিশ করেন। ১৯৩২ সালে সাহার 'ট্রিটিজ অন হিট' বইটির ভূমিকা লেখেন রামন, তাতে বিরোধের নাম-গন্ধ তো নেইই, 'উল্টে যথেষ্ট প্রশংসা আছে।' ১৯৩৩ সালে দেখা যায়, সাহা স্মৃতিচারণাকালে রামনের বিশেষ প্রশংসা করেছেন। সুতরাং রামন ও সাহার ব্যক্তিগত স্বার্থসংঘাত রামনের কলকাতা ত্যাগের কারণ, এর যথেষ্ট তথ্যভিত্তি নেই। রামন-পক্ষীয়দের দ্বারা প্রচারিত সাহা-সম্পর্কিত আরও নানা ভ্রান্ততথ্য চট্টোপাধ্যায় দম্পতি খণ্ডন করেছেন। আসল সংঘাতের ক্ষেত্র অন্যত্র।

মোট কথা, রামন স্থায়ীভাবে কলকাতার কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-কে কুক্ষিগত ক'রে রাখতে চাইছিলেন—যখন তিনি অন্য জায়গায় চাকরি করছেন তখনও—এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে যাতে কেবল তাঁর পক্ষপুটের লোকরাই কর্তৃত্ব করেন, তার ব্যবস্থা করতে তৎপর ছিলেন। এইখানে কলকাতার বিশিষ্ট মহলের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বাঁধে, যাতে রামনের বিরোধীপক্ষে নেতৃত্ব নিয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গালোরের বিখ্যাত ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর নতুন ডিরেক্টর মনোনীত হবার পরেও রামন কলকাতায় কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর ভার সামলাবার জন্য নব-স্থাপিত 'মহেন্দ্রলাল সরকার' অধ্যাপক-পদে কৃষ্ণানকে যোগ্যতম প্রার্থী মনে করেন; এই পদের জন্য সাহার অনুরোধে কর্ণপাত করলেন না। এলাহাবাদের বিরূপ বৈজ্ঞানিক পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পেতে অস্থির ড. সাহা কলকাতায় ছুটে এসে উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু রামনের ডানা একমাত্র ছাঁটতে পারে কল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর জেনারেল বডি, যা রামনের পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে ক্ষুরধার বুদ্ধি শ্যামাপ্রসাদ কিছু লোককে ঐ বডিতে ঢোকাতে সমর্থ হলেন। ফলে জেনারেল বডি-র মিটিং-এ রামন ও শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হলো। জেনারেল বডি ভোটাধিক্যে ১৯ জুন ১৯৩৪ তারিখের

সভায় রামনকে সেক্রেটারির পদ থেকে অপসৃত করলেন। জেনারেল বডি-তে রামন-বিরোধীদের প্রবেশ করাতে শ্যামাপ্রসাদকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। রামন নিজের কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের সংবিধানে মৌল পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হন। সংবিধান অনুযায়ী দু-ধরনের সদস্যপদ ছিল—সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্য। বেশি টাকা দান করলে আজীবন সদস্য হওয়া যেত। রামন চাইলেন, কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর সংবিধান সংশোধন ক'রে আজীবন সদস্যপদ যেন ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ হয়। খুব দ্রুত তিনি কাজ করলেন। সাধারণ সভা ১৯ জুন। তার আগেই ১০ জুন ম্যানেজিং কমিটির সভায় সংবিধান বদলের প্রস্তাব নেওয়া হয়। সাধারণ সভায় তা গৃহীত হওয়া দরকার। কিন্তু সাধারণ সভা মাত্র ৯ দিন পরে। এক্ষেত্রে রামনকে ঠেকাবার একমাত্র উপায় ট্রাস্টিদের দ্বারা আজীবন সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা। শ্যামাপ্রসাদ ট্রাস্টিদের মারফৎ ৬৮ জন সদস্য ক'রে ফেললেন, এবং রামনকে অবধারিত পরাজয় স্বীকার করতেও হলো।

চট্টোপাধ্যায়-দম্পতি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যগুলি থেকে দেখা যায়, রামন-সাহার একটা সংঘর্ষ ছিলই। তার মূলে ছিল সাহার মতো যোগ্য ব্যক্তিকে ঠেকিয়ে কৃষ্ণানকে অধ্যাপক-পদ দেবার প্রয়াস। অর্থাৎ রামন কলকাতার বিজ্ঞানক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয়দের প্রাধান্য বলবৎ করতে চেয়েছিলেন। কলকাতা তখন ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার মূল কেন্দ্র, এবং সর্বভারতীয় উদার আবহাওয়া বজায় থাকবে, এই ছিল প্রত্যাশিত, যার সৃষ্টি করেছিলেন স্যর আশুতোষ। কিন্তু অতি উগ্র আত্মম্ভরী এবং কটুভাষী রামন আত্মকর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টায় সেই পরিবেশ বিষাক্ত ক'রে তোলেন। বাধা পাবার পরে তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বাঙালিদের সম্বন্ধে তাঁর বিষোদ্‌গারের মূলে তাই ছিল।

জগদীশচন্দ্র বসু

১৩০৮ আষাঢ়
অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।

যে জাতির আত্মশ্রদ্ধা নাই, তাহার পক্ষে বড় হওয়া কঠিন। অতীত বা বর্ত্তমান অবদান এই শ্রদ্ধার ভিত্তিভূমি। পুরাকালে উন্নত অবস্থাপন্ন কোন জাতি বর্ত্তমানে অধঃপতিত হইয়া যদি নিজ পূর্ব্বগৌরব ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরম হিতকারী বন্ধু কে? যিনি সেই জাতিকে তাহার পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, পূর্ব্বগৌরব আবার লাভ করিতে উৎসাহ দেন, তিনি সে জাতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এই জন্য, আচার্য্য মোক্ষমূলরের মৃত্যুর পর যখন লোকে এই আলোচনায় ব্যস্ত ছিল যে, স্বর্গীয় আচার্য্যদেব ভারতবর্ষের কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, যে সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলা যায় যে, আচার্য্য মোক্ষমূলর ভারতবাসীদিগকে তাহাদের লুপ্ত আত্মশ্রদ্ধা পুনঃপ্রদান করিয়া গিয়াছেন। একা মোক্ষমূলরই যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নয়। আরও অনেকে তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, আমরা এককালে বড় ছিলাম। এই ক্ষীণ আশাও আমাদের মনে জাগিয়া উঠে যে হয় ত আমরা পরে আবার বড় হইতে পারিব। বহুশতাব্দীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দাসত্বে আমরা এরূপ জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিলাম, যে তন্দ্রা, মোহাবেশ যেন ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছিল না। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে, সাহিত্যে, প্রতিভাশালী লোক দেখা দিয়াছিলেন। আমাদের আলস্য দূর করিবার জন্য একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু সেই বৈজ্ঞানিক। তিনিও একা আসেন নাই।

এখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে আমরা বর্ত্তমানকালে জ্ঞানের জন্য কেবলই জগতের লোকের মুখ চাহিয়া থাকিব, বিধাতার এ ইচ্ছা নয়। অপর দশজন যেমন শিখিতেছে ও শিখাইতেছে, আমরাও তেমনি শিখিতে ও শিখাইতে পারি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরাধীনতা আমাদের চিরসহচর হইবে না, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক বসু তাঁহার এক বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা লর্ডকেল্‌বিন্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণকে বিস্মিত করেন। সম্প্রতি তিনি আর এক অধিকতর বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিদ্বন্মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

গত ১০ই মে লণ্ডনের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিট্যুষ্যনে অধ্যাপক বসু একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় The Response of Inorganic matter to Mechanical and Electrical Stimulus, অর্থাৎ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড়পদার্থের প্রতিচেষ্টা। এই বক্তৃতাতে বসু মহাশয় জীব ও জড়ের ঐক্য বহুপরিমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কেহ যদি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহার শরীরে যেমন আক্ষেপ উপস্থিত হয়, জড়েও তদ্রূপ হয়। জৈবপদার্থের উপর বিষের যেমন ক্রিয়া আছে জড় পদার্থের উপরও তেমনি আছে। এইরূপ নানা বিষয়ে তিনি জড় ও জীবের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। জগদীশ বাবু উপনিষদের একটি শ্লোকের অনুবাদ আবৃত্তি করিয়া তাঁহার বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করেন। তাহার অর্থ,

"এই বিশ্বের পরবির্ত্তনশীল বহুত্বের মধ্যে যাঁহারা সেই এককে দেখেন, সনাতন সত্য তাঁহাদেরই অধিগত হইয়াছে, আর কাহারও নয়, আর কাহারও নয়।"

বসু মহাশয়ের সম্পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিবার সুযোগ আমরা এখনও পাই নাই। বিজ্ঞানজগতে তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য কতটুকু, তাহাও ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু উহার প্রকৃত গুরুত্ব যাহাই হউক, আমাদের নিকট উহা অমূল্য। নীতিশতককার সত্যই বলিয়াছেন—

"পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সম্পূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীম্ তৃণসমাম্।
অতশ্চানৈকান্ত্যাদ্ গুরুলঘুতয়ার্থেষু, ধনিনাম্
অবস্থা বস্তুনি প্রথয়তি সঙ্কোচয়তি চ॥"

আমাদের পূর্ব্বগৌরব ও বর্ত্তমান আশা যেরূপই হউকনা কেন, ইহাতে আমাদের অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কিছুই কারণ নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আমাদের লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া উচিত; এবং আমরা যে তাঁহাদের একান্ত অযোগ্য সন্তান নহি, তাহাই আমাদের চরিত্র ও কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। জগদীশবসু প্রমুখ ভারতবাসী বৈজ্ঞানিকগণের কথাও যেন আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করে। আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী, এই ত সম্পর্ক। তাঁহার একাগ্রতা, স্বার্থত্যাগ, কঠোর তপস্যার অনুকরণ আমরা যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে আপনার লোক বলিতে অধিকারী হইব। রক্তের সম্পর্ক, একদেশবাসিতা, একজাতীয়তা, এসকল কিছুই নয়; চরিত্রের সাদৃশ্য ও আচরণের ঐক্যই আত্মীয়তার, জ্ঞাতিত্বের প্রকৃত ভিত্তি। আমরা যদি নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মহতের পদানুসরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের তাঁহাদের কীর্ত্তিতে গৌরব অনুভব করিবার কি অধিকার আছে?

১৩১৮ বৈশাখ

বিজ্ঞানে সাহিত্য

[জগদীশচন্দ্র বসু লিখিত]

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্য্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় এলোমেলো মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদুস্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্লভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্ত্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমাঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্ত্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের

পরিবর্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবল মাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাসগত, কতকটা খামখেয়ালী। এইরূপ বহুবিধ ভিতর বাহিরের আঘাতবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহুবৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি।

জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞান-সেবকের স্থান আছে?

এই সভা বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য-সম্মিলন। ভারতসাগর যখন আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাসিত মেঘকে আকাশে সঞ্চিত করিয়া তোলে, তখন সে আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। তখন তাহার বক্ষের উপর বাতাস বহিতে থাকে, এবং একদিন তাহার এই মেঘসঞ্চয়কে সে আপনার বঙ্গ-উপকূলে পাঠাইয়া দেয়। অবিরাম বায়ু তাহাকে এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে বিস্তীর্ণ করিয়া দিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে দেশ দেশান্তর সফলতায় ভরিয়া উঠে।

তেমনি বাঙ্গালা দেশের চিত্তসাগর হইতে যে সকল উচ্ছ্বাস নানা আকার ধরিয়া এখানকার আকাশে সঞ্চিত হইতেছে, সে কি কোন দিক্‌প্রান্তে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের কে ঘনীভূত চেতনাকে বাঙ্গালাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীর ভাবে জাগাইয়া চলিতেছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি এই সাহিত্য-সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রে সাহিত্যকে কোন্ বিশেষ শ্রেণীতে স্থান দিয়াছে তাহা লইয়া এখানে আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। এখানে মনে হয় যেন আমরা সাহিত্যকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে যাঁহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্ত্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

আপনারা জানেন পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে; তাহার ফলে নিজকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এরূপ জাতিভেদ প্রথায় উপকার করে— তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে, বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেই দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই

একেকে দেখিতে পাই—আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা এক স্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাতে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি, তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান।

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাষে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব- সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিন রাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্ব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতিবিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে উদ্ভিদ্‌কে সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিকের দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া নাই। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি, অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই—কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু

কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মেলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশি দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান, এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখন কোন অংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক।

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীমরহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি কেবল মাত্র তাহার সম্বন্ধেই দু-একটি কথা বলিব।

কবির চক্ষু এই বহু রঙ্গে রঞ্জিত আলোকসমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটী রং তাহার চক্ষুর তৃষা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই সসীম আলোকের সাত সমুদ্র পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্তনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্মানীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-ঊর্ম্মি সঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোক দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল, যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচবর্ত্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণ ভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎবর্ত্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। ফলতঃ দৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটী সপ্তকমাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। দুঃসহ এই জ্যোতির ভার, অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস।

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেইজন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদ রাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদজগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদতত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চাননা। বিখ্যাত বার্ডন সেন্ডাবসন বলেন যে কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাত দৃশ্যভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর-প্রমুখ উদ্ভিদ শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে বৃক্ষ স্নায়ুহীন, আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয় পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। আমাদের জীবনলক্ষ্মী উদ্ভিদজীবনের কোন ভার গ্রহণ করেন নাই। উদ্ভিদজীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ--সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস।

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয়, বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয়, তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় তাহা যদি ধরিতে ও মাপিতে পারি।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাতত অসম্ভব কার্য্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার একান্ত শোচনীয় তাহার সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত— অশিক্ষিত কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ!

সে যাহা হউক মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক— প্রথমত গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়ত গাছ ও কলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে আজ্ঞাপালন করান অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষ্যে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিমটি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব না। তবে আজ জানি যে এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায়, তাহার কোন মূল্য নাই—ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

এখন বুঝিতে পারিতেছি তাড়াহুড়ো করিলে, কিম্বা অতিরিক্ত আঘাত করিলে প্রকৃত কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সকাল বেলা, আমাদের মত তাহাদের একটা জড়তা আইসে। সুতরাং উত্তর কতকটা অস্পষ্ট। দ্বিপ্রহরের গরমের সময় দুই চারিটা উত্তর দিয়া গাছ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যেদিন ঝড় কিম্বা অন্য দৈবদুর্য্যোগ ঘটে সেদিন গাছ মৌনভাব ধারণ করে। এসব বিরক্তির কারণ ত্যাগ করিয়া শুভ দিন ও ক্ষণ নিরূপণ করিলে, বহুঘণ্টাব্যাপী সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়।

গাছের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করিতে হইলে গাছের নিকটই যাইতে হইবে। সেই ইতিহাস অতি জটিল এবং বহু রহস্যপূর্ণ। সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে বৃক্ষ ও যন্ত্রের সাহায্যে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লিপি বৃক্ষের স্বলিখিত এবং স্বাক্ষরিত হওয়া চাই। ইহাতে মানুষের কোন হাত থাকিবে না, কারণ মানুষ তাহার স্বপ্রণোদিত ভাব দ্বারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।

গাছের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তের ইতিহাস উদ্ধার করাই আমাদের লক্ষ্য। সে জন্য জানিতে চাই তাহার উপর প্রত্যেক অনুকূল, প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনার ছাপ—তাহার সহিত আলো ও অন্ধকারের ক্রীড়া, তাহার উপর পৃথিবীর টান ও ঝটিকার আঘাত। কত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ, কত প্রকারের আঘাত, কত প্রকারের সাড়া! এই স্থির এই নিশ্চলবৎ প্রতীয়মান জীবন প্রতিমার ভিতরে কত অদৃশ্য ক্রিয়া চলিতেছে। কি প্রকারে এই অপ্রকাশকে সুপ্রকাশ করিব?

এই যে তিল তিল করিয়া বৃক্ষশিশুটী বাড়িতেছে, যে বৃদ্ধি চক্ষে দেখা যায় না, মুহূর্ত্তের মধ্যে কি প্রকারের তাহাকে পরিমাণের মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে পারিব? সেই বৃদ্ধি বাহিরের আঘাতে কি নিয়মে পরিবর্ত্তিত হয়? আহার দিলে কিম্বা আহার বন্ধ করিলে কি পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইতে কত সময় লাগে? ঔষধ সেবনে কিম্বা বিষ প্রয়োগে কি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়? এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের প্রতিকার করা যাইতে পারে কি? বিষের মাত্রা প্রয়োগে কি ফলের বৈপরীত্য ঘটে?

তার পর গাছ বাহিরের আঘাতে যদি কোনরূপ সাড়া দেয় তবে সেই আঘাত অনুভব করিতে কত সময় লাগে? সেই অনুভব-কাল ভিন্ন অবস্থায় কি পরিবর্ত্তিত হয়? সে সময়টা কি গাছকে দিয়া লিখাইয়া লইতে পারা যায়? তারপর বাহিরের আঘাত ভিতরে কি করিয়া পৌঁছে? স্নায়ুসূত্র আছে কি? যদি থাকে তবে স্নায়বীয় প্রবাহ কিরূপ বেগে ধাবিত হয়। কোন্ অনুকূল ঘটনায় সেই প্রবাহের গতি বৃদ্ধি হয়, কোন্ প্রতিকূল অবস্থায় নিবারিত অথবা নিরস্ত হয়? আমাদের স্নায়বিক ক্রিয়ার সহিত বৃক্ষের ক্রিয়ার কি সাদৃশ্য আছে? সেই গতি ও সেই গতির পরিবর্ত্তন কোন প্রকারে কি স্বতঃ লিখিত হইতে পারে? জীবে হৃৎপিণ্ডের ন্যায় যেরূপ স্পন্দনশীল পেশী আছে

উদ্ভিদে কি তাহা আছে? স্বতঃ স্পন্দনের অর্থ কি? পরিশেষে যখন মৃত্যুর প্রবল আঘাতে বৃক্ষের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয় সেই নির্ব্বাণ-মুহূর্ত্ত কি ধরিতে পারা যায়? এবং সেই মুহূর্ত্তে কি বৃক্ষ কোন একটা প্রকাণ্ড সাড়া দিয়া চিরকালের জন্য নিদ্রিত হয়?

এই সব বিবিধ অধ্যায়ের ইতিহাস বিবিধ যন্ত্র দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ হইলেই গাছের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইবে।

"যদি গাছ তাহার লেখনী-যন্ত্রেব সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত।" কিন্তু এই কথা ত দিবাস্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য, কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চাহি তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছে না। কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা।

সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেস্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদেব ঈর্ষা কবিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর! মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশ জনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, সমস্ত দুঃখ ধৈর্য্যের সহিত তাহারা বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতি লাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে—কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

তরুলিপি যন্ত্র।

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্ব্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নির্ণীত হইবে, তাহার

স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্ম্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদেরই কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়। এখন গাছের সাড়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু চারিটা কথা বলিব।

গাছ, লাজুক কি অলাজুক?

তৎপূর্ব্বে তরুজাতিকে যে লাজুক ও অলাজুক—সসাড় ও অসাড়—বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে সেই কুসংস্কার দূর করা আবশ্যক। সব গাছই যে সাড়া দেয়, তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখান যাইতে পারে। তবে কেবল লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছে দেয় না কেন? ইহা বুঝিতে হইলে ভাবিয়া দেখুন যে আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশীর সঙ্কোচনদ্বারাই হাত নাড়িয়া সাড়া দেই। উভয় দিকেরই মাংসপেশী যদি সঙ্কুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকের পেশী আহত হইয়া সমভাবে সঙ্কুচিত হয়, তাহার ফলে কোনদিকেই নড়া হয় না। কিন্তু একদিকের পেশী যদি ক্লোরোফরম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তি সহজেই প্রমাণিত হয়।

অননুভূতি কাল নিরূপণ।

জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায় চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে ন্যূনাধিক সেকেণ্ডের শত ভাগের একভাগ সময় লাগে। ইংরাজী অধ্যয়ে, এই সময়টুকু লেটেণ্ট পিরিয়ড্। "অননুভূতি সময়" ইহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইল।

বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অননুভূতি কালের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। মৃদু আঘাত অনুভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিতে বেশি সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে তাহার অননুভূতিকাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। পুনরায় আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখন অনুভূতি করিবার পূর্ব্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এমন কি সে সময়ে কখন কখন একেবারেই অনুভব শক্তি লোপ পায়। গাছের অনুভূতি সম্বন্ধে একটা প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অননুভূতিকাল সেকেণ্ডের শতাংশের ছয় ভাগ—উদ্যমশীল ভেকের তুলনায় কেবলমাত্র ছয় গুণ বেশী। আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরে সুস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে কি না আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শীতে গাছের অননুভূতি কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছের প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পোনের মিনিট লাগে। তাহার পূর্ব্বে আঘাত করিলে অননুভূতি সময় প্রায় দেড় গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতি শক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না। এ অবস্থাটি যে কিরূপ অবস্থা, আমার দীর্ঘ বক্তৃতার পর তাহা আপনারা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সাড়ার মাত্রা।

সময় ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকালবেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতাজনিত গাছের একটু জড়তা থাকে। আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িতে থাকে; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। দুপ্রহরের সময় এ সব

উল্টা হইয়া যায়; ক্লান্তি বশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে, সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। গ্রীষ্মকালে যাহা পোনের মিনিটে সারিয়া যায় তাহা সারিতে শীতকালে আধ ঘণ্টার অধিক লাগে।

বৃক্ষে স্নায়বীয় প্রবাহ।

জন্তুদেহে এক স্থান আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ু দ্বারা দূরে পৌঁছে। স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমত, স্নায়বীয় বেগ বিবিধ অবস্থায় হ্রাস বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্ব্যতীত বিদ্যুৎপ্রবাহে স্নায়ুতে কতকগুলি বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোন বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্য স্থানে অবসাদ উপলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্ত্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে সেই স্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তেজিত হয়। এতদ্ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোন অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া আর কোন সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয় বেগ বৃক্ষদেহে, ভেকদেহ তুলনায়. মন্থর, কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। বৃক্ষে উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় সাতগুণ বর্দ্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহে প্রারম্ভ কালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থানে উত্তেজিত অন্য স্থলে অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা বৃক্ষের স্নায়বীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা, জীব ও উদ্ভিদে যে এসম্বন্ধে কোন ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

স্বতঃস্পন্দন।

জীবদেহের অংশ বিশেষে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোন ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধানফলে সম্ভবত জীব-স্পন্দন-রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাংটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে এজন্য তাঁহারা হৃদয়টিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়গতির হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দনক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয় কিন্তু ঢেউগুলি খর্ব্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্য দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইথর প্রয়োগে

ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য রহস্য এই যে, কোন বিষে হৃদয়স্পন্দন সঙ্কুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। বিষের এইরূপ পরস্পর বিরোধী গুণ জানিয়া এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি প্রধান ঘটনা বর্ণনা করিলাম। উদ্ভিদেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া গাছও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

বন চাঁড়ালের নৃত্য।

বন চাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখান যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পত্রগুলি আপনা আপনি নৃত্য করিতেছে। লোকের বিশ্বাস যে হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সঙ্গীতবোধ আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বন চাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোন সম্বন্ধ নাই। তরু-স্পন্দনের স্বতঃ লিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমত পরীক্ষার সুবিধার জন্য বন চাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে, স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দন ক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তার পর দেখা যায় যে উত্তাপে স্পন্দনের সংখ্যা বর্দ্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দন ক্রিয়া স্তম্ভিত হয় কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয় উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে কোন কোন উদ্ভিদপেশীতে আঘাত করিলে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এই রূপে আহার-জনিত বল, বাহিরের আলোক উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয়, তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে, সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃত পক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরুচ্ছাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বন চাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহিরের উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা বাহিরের উত্তেজনার কাঙ্গাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙ্গা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেক কাল সাড়া দেয় না; দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরের প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বন চাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থায় জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে সেই অবস্থা

স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই অবস্থাভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন কোন পথ—কামরাঙ্গা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

পরিপূর্ণ অবস্থাই যে স্বতঃস্পন্দনের কাবণ তাহা বিবিধ। মানবিক ব্যাপারেও দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃদুগ্ধ এবং স্নেহাতিশয্যে পরিপূর্ণ হয় তখন তাহাব হাত পার স্বতঃস্পন্দন দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে।

মৃত্যুর সাড়া।

উদ্ভিদের জীবনে পরিশেষে এরূপ সময় আইসে যখন কোন আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অন্তিম মুহূর্ত্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া, কিম্বা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের কথা। মৃত্যুর রুদ্র আহ্বান যখন আসিয়া পৌঁছে, তখন গাছের জীবন তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই অন্তিম মুহূর্ত্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল আকুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বৈদ্যুতপ্রবাহ মুহূর্ত্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্ত্তিত হয়—উর্দ্ধগামী রেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বারের পার্শ্বে নিঃশব্দে যাহাদের জীবনের লীলা চলিতেছে, তাহাদের গভীর মর্ম্মের কথা আজ তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চল্য ও মরণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টিব সম্মুখে প্রকাশিত হইল। এতদিন তরুলতার সহিত মানুষের জীবনগত আত্মীয়তার সংবাদ কেবল কবিকল্পনার আভাষে প্রচারিত হইতেছিল, আজ কঠোর বিজ্ঞান, কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিল।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম "বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া"। কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয় সেটা যৌবনসুলভ অতিসাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইল।

উপসংহার।

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্দ্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্ত্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডকে নানা প্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবর্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি, কখন শিল্পকলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাঁহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচাব কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত

উপকরণ তাঁহারই সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি!

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, এ আমাদের দেশের চিরকালের সংস্কার। দেবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষও সৃজন করিতে পারে এবং সংহারও করিতে পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের নিজের মধ্যে কাজ করিতেছে। আমাদের জীবনে আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে; তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গালা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষৎকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই, এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। অন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকদের সম্মুখে দেবমন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত, এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি, এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপে দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি!

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনের সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণ।

১৩২০ বৈশাখ

অধ্যাপক বসুর নূতন আবিষ্কার।

বিলাতের রয়্যাল সোসাইটী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমিতি। গত ৬ই মার্চ ইহার এক অধিবেশনে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাহাতে তাঁহার একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ও তাঁহার উদ্ভাবিত যে বিস্ময়কর যন্ত্রযোগে ঐ আবিষ্ক্রিয়া সাধিত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আছে। রয়্যাল সোসাইটীতে প্রবন্ধ পঠিত হওয়া গৌরবের বিষয় বটে; কিন্তু আবিষ্ক্রিয়াটিই ভারতবর্ষের পক্ষে নিরতিশয় আনন্দ ও গৌরবের সংবাদ। সকলেই জানেন, মানুষের কোন অঙ্গে সুখ বা বেদনা বোধ হয়, যখন সেই অঙ্গের স্থানীয় "উত্তেজনা" মস্তিষ্কে পৌঁছে। তেমনি মস্তিষ্ক হইতে আদেশ প্রেরিত হইলে আমরা নানাভাবে অঙ্গসঞ্চালন করি। মস্তিষ্কের

সহিত এই যে নানা অঙ্গের যোগাযোগ, ইহা যে সূক্ষ্মতন্তুগুলির দ্বারা সাধিত হয়, তাহাদিগকে সচরাচর স্নায়ু বলা হয়। অধ্যাপক বসু প্রমাণ করিয়াছেন যে প্রাণীদেহে যেমন স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রেরণা আছে, উদ্ভিদ-দেহেও তদ্রূপ উত্তেজনা ও প্রেরণা আছে; মস্তিষ্কের মত ইন্দ্রিয়ও আছে। এবিষয়ে এপর্য্যন্ত সুবিখ্যাত জর্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক পেফের ও হেবারলান্ট সাহেবদিগের মতই গৃহীত হইত। তাঁহারা ঐরূপ উত্তেজনা ও প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বসু মহাশয় তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার যন্ত্রটির ক্রিয়া এরূপ সূক্ষ্ম যে ইহা নিজে নিজেই এক এক সেকেণ্ডের এক সহস্রাংশ পর্য্যন্ত সময় পরিমাণ করিতে পারে। কালের হিসাবে বসু মহাশয়ের এই আবিষ্ক্রিয়াটি নূতন নহে। ইহা দশ বৎসর পূর্ব্বে সাধিত হয়। তিনি একটি নূতন তত্ত্ব বাহির করিবা মাত্রই তাহা প্রকাশ করেন না। অনেক বৎসর ধরিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার পর যখন আর তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, তখন তাহা প্রচার করেন। "নূতন" আরও এই অর্থে বলা যায় যে বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের দশ বার বৎসর লাগে, দেখিতেছি।

বসু মহাশয় আমাদের স্বদেশবাসী, ইহা বলিয়া বড়াই করা অশোভন। আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নই। দীনভাবে ইহা স্বীকার করিয়া, এই যোগ্যতা লাভের জন্য চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

১৩২১ আষাঢ়

জগদীশচন্দ্র বসু।

সংবাদ আসিয়াছে যে গত ২০শে মে বিজ্ঞানচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু অক্সফর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শরীরতত্ত্ববিৎ (physiologists) এবং অগ্রণী ছাত্র সমূহের (advanced students) সমক্ষে উদ্ভিদের উত্তেজনা প্রবণতা সম্বন্ধে নিজ গবেষণালব্ধ তথ্য-সকলের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি যে-সকল তত্ত্ব ঐ বক্তৃতায় প্রচার করেন, প্রাণ-সম্পৃক্ত নানা ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যায় তৎসমুদয়ের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির কার্য্য প্রদর্শিত হয়। বক্তৃতায় যে-সকল শরীরতত্ত্ববিৎ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মতে বসু মহাশয়ের নূতন যন্ত্র এবং তত্ত্বানুসন্ধানের নূতন প্রণালী দ্বারা শরীর-তত্ত্ববিষয়ক গবেষণার অনেক উন্নতি সূচিত হইতেছে।

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র সকল দ্বারা যখন তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইলেন, তখন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস হইল যে বিশ্বে প্রাণ এক। যন্ত্র সহযোগে প্রমাণ স্বচক্ষে দেখিবার পূর্ব্বে বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের সত্যতা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই,—সেগুলি এতই বিস্ময়কর। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রসকলে যে

বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি এগুলি কোথায় তৈরি করাইয়াছেন?" গৌরবের সহিত বসু মহাশয় উত্তর দেন, "ভারতবর্ষে।" রয়্যাল সোসাইটী বিলাতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভা। উহার সভাপতি ডাক্তার বসুর গৃহে আসিয়া তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দিন স্থির করিয়া ছিলেন বলিয়া চিঠিতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

যাঁহাদের বয়স আছে, তাঁহারা বসু মহাশয় দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হউন।

১৩২২ ভাদ্র
ভারতীয় বিজ্ঞানমন্দির।

রামমোহন লাইব্রেরীতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা করেন, তাহার প্রারম্ভে তিনি বলেন যে তিনি কিছুদিন হইতে বিজ্ঞানের যে বিভাগে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাতে ভারতবর্ষ যে ইউরোপ আমেরিকা অপেক্ষা অগ্রসর তাহা ঐ দুই মহাদেশের বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। তথাকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদ্যার্থীরা তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছে। এই প্রকার ঘটনার মধ্যেই প্রকৃত ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা দেখা যাইতেছে। এখন ভারতবর্ষে যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেগুলিকে "ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়" না বলিয়া বলা উচিত "ভারতবর্ষে স্থিত পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়।" কারণ এইগুলিতে ভারতবর্ষের নিজের জ্ঞানরত্ন আবিষ্কৃত, আহৃত বা বিতরিত হয় না, কিম্বা নিজের কোন শিক্ষা প্রণালী অনুসৃত হয় না। নানা প্রদেশে যে-সকল টোল আছে, তাহাদের নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বরং তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়; কারণ তথায় ভারতবর্ষের জ্ঞান ভারতবর্ষের প্রণালী অনুসারে ছাত্রগণ লাভ করে। আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাতে যে বিদ্যামন্দিরের কথা বলিয়াছেন, যেখানে ভারতবর্ষীয় সত্যান্বেষী নিজের আবিষ্কৃত সত্য বিদ্যার্থীদিগের গোচর করিবেন, এবং তাহাদের প্রাণে সত্যজিজ্ঞাসার উদ্রেক করিবেন, সেই বিজ্ঞানমন্দিরই প্রকৃত আধুনিক ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইবে। তখন আবার, যেমন প্রাচীন নালন্দা তক্ষশিলায় নানাদেশ হইতে আগত ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিত, তেমনি সেখানে নানাদেশের ছাত্রেরা বিদ্যা অর্জ্জন করিবে। এই বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী করিতে হইলে, কতকগুলি জ্ঞানতপস্বীর প্রয়োজন, যাঁহারা সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্যের বিষয় ভাবিবেন না এবং যাঁহাদিগকে দেশবাসীগণ খাওয়াপরার জন্য উপার্জ্জনের উদ্বেগ হইতে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভে ও জ্ঞানদানে ব্যাপৃত থাকিবেন।

ইংরেজেরা যখন আমাদিগকে চাকরীর প্রার্থী

না হইয়া সত্যান্বেষী হইতে বলেন, তখন সে উপদেশ আমাদের ভাল লাগে না। কারণ, তাঁহারা মোটা বেতনের সব চাকরীগুলি একচেটিয়া করিয়া লইয়া টাকার থলিগুলির বোঝা বহন করিয়া নিজনিজ সিন্দুক পূর্ণ করিবার ভার নিজেদের উপর রাখেন এবং কেবল উপদেশের বোঝাটা আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাগ করিয়া লইতে চাই। সংবাদপত্রসম্পাদকগণ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ, কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সের বক্তাগণ যোগ্য ভারতবাসীরা যাহাতে উচ্চবেতনের কাজ পান তদ্বিষয়ে চেষ্টিত থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা সত্যান্বেষী তাঁহারা টাকার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। তাঁহারা ভারতের ও জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টাই একাগ্রচিত্তে করিবেন। বেশী টাকার চাকরী করিলেই ভারতের জ্ঞান গৌরব বাড়ে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিক্ষাবিভাগের প্রাদেশিক স্তরেই রহিয়া গেলেন; তাঁহার পর তাঁহার চেয়ে যোগ্যতর নহেন এমন ২।৪ জন ভারতবাসী উচ্চতর বিভাগে কাজ পাইয়াছেন। কিন্তু দেশের জ্ঞানগৌরব কাহার দ্বারা বাড়িতেছে, তাহা সকলেই জানে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু উচ্চতর বিভাগে কাজ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের জ্ঞানগৌরব তিনি বড় চাকরী করিয়াছেন বলিয়া বাড়ে নাই, তাঁহার প্রতিভা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা দ্বারা বাড়িয়াছে।

আমরা জানি উচ্চতর বিভাগে কাজ পাইলে গবেষণার বেশী সুযোগ পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার কয় জন করে? পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাসে দেখা যায় যে সামান্য ব্যয়ে ও সামান্য আয়োজনে গরীব লোকদের দ্বারা অনেক বড় আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে।

জাপান ও ভারতবর্ষ।

আচার্য্য বসু মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে জাপানীরা যেরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার বর্ণনা করিয়া, জাপান যে ভারতবর্ষের আশঙ্কার একটি গুরুতর কারণ তাহার উল্লেখ করেন। আশঙ্কা দুই রকমের, বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। বাণিজ্যিক আশঙ্কার কথা তিনি খুব খুলিয়া বলিয়াছেন, রাষ্ট্রনৈতিক বিপদ্ সম্বন্ধে কেবল ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমরা প্রবাসীতে উভয় প্রকার বিপদের কথা বহু পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি। জাপান কিরূপে আমাদের দেশে বাণিজ্যবিস্তার করিতেছে, এবং জাপানী জিনিষকে প্রায় স্বদেশীর সমান আদরণীয় মনে করা যে কিরূপ ভুল, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। সম্প্রতি ভারতবর্ষের বাজারে অষ্ট্রিয়া, জার্মেনী ও বেলজিয়মের সস্তা জিনিষ সব আর পাওয়া না যাওয়ায় জাপান সব রকম জিনিষে ভারতের বাজার পূর্ণ করিবার জন্য বিপুল উদ্যমে লাগিয়া পড়িয়াছে। জাপানীরা জার্মেনদের চেয়েও সস্তা দরে জিনিষ বেচিতেছে। তাহার নানারকম কারণ আছে। জার্মেনীর চেয়ে জাপানে মজুর সস্তা, জাপানীরা কৃষি ও শিল্প দুই একসঙ্গে চালাইতে অভ্যস্ত। এইরূপ আরও অনেক কারণ আছে। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে জাপানীদের প্রতিযোগিতায় কেবল যে ভারতবর্ষীয় শিল্প নষ্ট হইবে তাহা নয়, ইংলণ্ডের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যও নষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সকলেই জানেন ভারতবর্ষে সূতা ও কাপড়ের কারখানার প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই। ঐ সহরের ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার কাগজে লিখিত হইয়াছে :—

"It is well-known that our local mills have for many years past competed

successfully with foreign suppliers in the coarser varieties of unbleached cotton cloths. Japan has been a large buyer of Indian cotton which is used by our mills: but for the production of its factories it has so far looked to markets nearer home—chiefly China. Recently it has turned its attention to this country with the result that some lines of Japanese gray cloths are now being dumped down in Bombay at cheaper rates than our mills on the pot can quote. And Japan does not propose to do things by halves. Its latest feat, which has made a great stir in the piece goods markets both in Bombay and Calcutta, is the sale of cloths in the style of Manchester goods a long way below Manchester prices."

তাৎপর্য্য :— মোটা কাপড়ের ব্যবসাতে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলি অনেক বৎসর হইতে বিদেশী কলগুলির সঙ্গে টক্কর দিবার সামর্থ্য দেখাইয়া আসিতেছে। বোম্বাইয়ের কল-সকলে অনেক ভারতবর্ষের তুলা ব্যবহৃত হয়; জাপানীরাও এই তুলা কিনিয়া লইয়া যায়। এতদিন কিন্তু এই তুলা হইতে প্রস্তুত থান জাপানীরা তাহাদের দেশের কাছে, প্রধানতঃ চীনদেশে বিক্রী করিত। সম্প্রতি ভারতবর্ষের দিকে তাহারা মন দিয়াছে। ফলে-তাহারা কয়েক প্রকারের কোরা জাপানী থান বোম্বাইয়ে আনিয়া ফেলিতেছে যাহার দর বোম্বাইয়ের কলে উৎপন্ন কাপড়ের চেয়ে সস্তা। জাপানীরা আধাসারা কাজ করিবার লোক নয়। তাহারা ম্যাঞ্চেষ্টারের ধরণে নির্ম্মিত কাপড় ম্যাঞ্চেষ্টারের চেয়ে অনেক সস্তা দরে বোম্বাই ও কলিকাতায় বেচিতেছে। তাহাদের এই বাহাদুরীতে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের বাজারে সাড়া পড়িয়াছে।

শুধু ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হইলে ইংরেজ বণিকেরা গবর্ণমেণ্টকে উহার জীবনরক্ষার জন্য কিছু করিতে বলিবে বা করিতে দিবে, এরূপ আশা খুব বেকুব ভারতবাসীও করে না। তবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিপদে সম্ভাবনা ঘটিলে হয়ত কিছু হইতে পারে। ভাবতবাসী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়ের একাগ্র চেস্টা থাকিলে বিপদ্ কাটিয়া যাইতে পারে। জাপানের গবর্ণমেণ্ট জাপানের শিল্পবাণিজ্যের জন্য যাহা করিতেছেন, আমাদের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ চেষ্টা করিলে জাপান কখনই আমাদের শিল্পবাণিজ্য নষ্ট করিতে পারে না। আমাদের দেশেও মজুর সস্তা, আমাদের মজুর ও কারিগরেরা মোটের উপর পরিশ্রমী ও সচ্চরিত্র, তাহারা শিক্ষা করিতে সমর্থ ও ইচ্ছুক, এবং আমাদের দেশেও কৃষি ও শিল্প অনেকে এক সঙ্গে চালাইতে পারে। অসংখ্য প্রকারের কাঁচা মাল জাপান অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।

জাপান হইতে অন্যবিধ বিপদের আশঙ্কা।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, বাণিজ্য জয়পতাকার পশ্চাদ্‌গমন করে (trade follows the flag); অর্থাৎ কোন জাতি কোন দেশ জয় করিলে জেতাদের ঐ দেশে খুব বাণিজ্য বিস্তার হয়। কিন্তু কখন কখন জয়পতাকাও বাণিজ্যের অনুসরণ করে (the flag follows trade); অর্থাৎ প্রথমে প্রবল কোন রাজ্যের লোক অন্যরাজ্যে বাণিজ্য করিতে গিয়া শেষে তথায় প্রভুত্ব স্থাপন করে। যেমন রুশিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পারস্যের উত্তর অংশে বাণিজ্য করিতেছিল, এখন সেই বাণিজ্য রক্ষার ওজুহাতে কার্য্যতঃ পারস্যের উত্তর অংশ দখল করিয়া বসিয়াছে। খুব সম্ভব, বাণিজ্য

বিস্তার ও রাজ্য বিস্তারের এবম্বিধ পরস্পর সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আচার্য্য বসু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন :— "যাহাদের সঙ্গে জাপানীরা শান্তিতে বাস করিতে চায়, তাহাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য তাহারা যে ভবিষ্যদ্দর্শিতার পরিচয় দিয়াছে, তাহা খুব প্রশংসনীয়। তাহারা বুঝে তাহাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যে বিদেশী কোন জাতির অত্যধিক স্বার্থ ও হাত থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্গে মনোমালিন্য ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। এইজন্য তাহারা বিদেশী পণ্যদ্রব্যের উপর খুব উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া প্রায় কোন বিদেশী জিনিষকেই নিজেদের বাজারে স্থান পাইতে দেয় নাই।"

আচার্য্য বসু এই ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার বঙ্গের ব্যবস্থাপকসভায় দেশী শিল্পসম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় জাপান হইতে ভারতের বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় উভয়বিধ আশঙ্কার কথাই বলিয়াছেন। আমরা জার্মেনী ও চীনের কল্পিত দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রাবণের প্রবাসীতে দেখাইয়াছি, কোন দেশে রাজা হইতে পারিলে সেই দেশে বাণিজ্যবিস্তার যেমন পূর্ণমাত্রায় করা চলে, এমন আর কোন উপায়েই চলে না। ভারতবর্ষে এখনও প্রাচীন বা আধুনিক যে ২।৪ টা শিল্প বাঁচিয়া আছে, জাপানের প্রতিযোগিতায় তাহা যদি নষ্ট হয়, এবং ক্রমশঃ যদি এদেশে বিলাতী বাণিজ্যও ঐ কারণে কমিতে থাকে, তাহা হইলে জাপানের লোক বাড়িতে থাকিবে। তখন যে জাপান ভারতবর্ষে রাজত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবে না, কে বলিতে পারে? তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে, শক্তিও আছে, আয়োজনও আছে। চীনে জাপানের নিযুক্ত লোকেরা ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে এই উদ্দেশ্যে যে তাহা হইলে আত্মরক্ষার ওজুহাতে তাহারা কতকগুলো সৈন্য তথায় স্থায়ীভাবে রাখিবার সুযোগ পায়। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তাহারা যে নানাপ্রকার চক্রান্ত করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? অতএব সময় থাকিতে ভারতবাসীদিগের এবং তাহাদের শাসনকর্ত্তাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদের প্রাণ সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু মত।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এবং অন্যান্য কোন কোন গ্রন্থে উদ্ভিদের প্রাণবত্তা ও অনুভবশক্তির বর্ণনা আছে। রামমোহন লাইব্রেরীতে আচার্য্য বসুর সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় এই সকলের উল্লেখ করিয়া বলেন, "শ্রোতৃবর্গ যেন কল্পনা না করেন, এই সকল উক্তি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা আবিষ্ক্রিয়ার সমান।" তাঁহার মতে এই সকল উক্তি পর্য্যবেক্ষণ ও একাগ্র চিন্তাপ্রসূত অনুমান মাত্র। ইহার এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান অতি গভীর ও অতি বিস্তৃত।

সাহিত্যপরিষদে
অধ্যাপক বসুর অভ্যর্থনা।

রামমোহন লাইব্রেরীর পর সাহিত্যপরিষৎ অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার প্রশংসাসূচক যে-সকল কথা বলা হয়, তাহার উত্তরে তিনি বলেন, যে বিদেশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন, তাহা তাঁহার দেশেরই প্রাপ্য।

বসুমহাশয়ের প্রীত্যর্থ পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ একখানা প্রহসনের অভিনয় করান যাহাতে শিক্ষিতা নারীদের এবং তাঁহাদের আত্মীয়দের হেয় চিত্র আঁকা হইয়াছে। সকলেই জানে ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রহসন লেখা হইয়াছে। বসুমহাশয়

ব্রাহ্মসমাজের লোক। তাঁহাকে সম্মান করিতে গিয়া এরূপ প্রহসনের অভিনয় না করিলে ভদ্রতা রক্ষা হইত। এতটুকু সুবিবেচনা পরিষদের কর্তৃপক্ষের কেন হয় নাই বলিতে পারি না।

হীরেন্দ্রবাবুর আচার্য্য-প্রশস্তি।

এই সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় বলেন :—

"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন স্বদেশে ফিরিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন যে সকল ছাত্র তাঁহার পদমূলে উপবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানের ক, খ, শিখিয়াছিল, আমি তাহাদের অন্যতম। অতএব তাঁহার সম্বর্দ্ধনা-উপলক্ষে কিছু বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি। বিজ্ঞানক্ষেত্রে আচার্য্য মহাশয় যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যে জন্য ভারতবাসীদের নাম জগতে এখন ঘোষিত হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার স্বদেশবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব করিতেছে। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক আছেন। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরীক্ষা করিয়া Facts সংগ্রহ করেন, সজ্জিত করেন, ব্যাপার লিপিবদ্ধ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই সকল facts ও ব্যাপার হইতে অদ্ভুত মনীষাবলে সত্যের আবিষ্কার করেন, নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানবিদ্‌কে যদি বৈজ্ঞানিক বলা হয়, তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈজ্ঞানিককে প্রাজ্ঞানিক বলা উচিত। বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, সেই প্রজ্ঞান দ্বারা তাঁহারা তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করেন। এই প্রজ্ঞানকে পাশ্চাত্যগণ scientific imagination আখ্যা দিয়াছেন।

"জড়ের যে জীবন আছে, উদ্ভিদের যে প্রাণন আছে, উভয়ের যে ক্লান্তি স্ফূর্ত্তি আছে, উভয়ের মধ্যে যে প্রাণশক্তি ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থে একথা অনেকস্থলে উল্লিখিত দেখা যায়। অতএব এ সকল কথা আমরা অনেক দিন শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু কাণে শুনা আর চক্ষে দেখায় অনেক অন্তর। আমরা যে সকল কথা কাণে মাত্র শুনিয়াছিলাম, আচার্য্য মহাশয় তাহা আমাদিগকে চক্ষে দেখাইয়াছেন। এখন আমরা সেই সকল প্রাচীন উপদেশের সারবত্তা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একজন পাশ্চাত্য লেখক তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক যাদুকর আখ্যা দিয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

"এ দেশের যাঁহারা সত্য দর্শন করিতেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিতেন, তাঁহাদিগের প্রাচীন নাম ছিল কবি। যিনি বৈদিক সত্যের আদি দ্রষ্টা, প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলে :—

তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেই আদি কবির প্রতিচ্ছবি। তিনিও তত্ত্বদ্রষ্টা, সত্যের আবিষ্কর্ত্তা। অতএব তাঁহার সমক্ষে আমাদের শির আপনি প্রণত হইতেছে। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।"

শিক্ষার বয়স।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজ আচার্য্য বসু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে যে সম্বর্দ্ধনা করেন, তদুপলক্ষে বসু মহাশয় এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে তাঁহার শরীরে জরার লক্ষণ দেখা দিলেও তিনি এখনও ছাত্র। বাস্তবিক প্রকৃত জ্ঞানী ও জ্ঞানান্বেষীরা চিরজীবন শিক্ষা করেন, তাঁহাদের কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না, শিক্ষাও কখন সমাপ্ত হয় না। মূর্খেরাই মনে করে যে দুচারটা পাস করিলেই শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া যায়।

১৩২২ ফাল্গুন

আমেরিকা এশিয়ার শিক্ষক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

[বিনয়কুমার সরকার লিখিত]

...এইবার [স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচারের প্রায় ২৫ বৎসর পরে] জগদীশচন্দ্র ভারতের বাণী প্রচার করিতেছেন। যে হলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা হইয়াছিল জগদীশচন্দ্রও সেই হলেই বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। দর্শনবিভাগের সম্পাদক অধ্যাপক উড্‌স্ শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বসু মহাশয়কে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে বলিলেন :— "জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলে সুপরিচিত। আমরা হার্ভার্ডের দর্শনবিভাগে ইঁহার অনুসন্ধান সমূহ আলোচনা করিয়া থাকি। আমাদের অধ্যাপকগণ ইঁহার গবেষণার ফলসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই হার্ভার্ডে জগদীশচন্দ্রের অমর্য্যাদা হইবে না।"

এ কয়দিন এমার্সন হলের ল্যাবরেটরীগুলি দেখিতে দেখিতে এইরূপই মনে হইতেছিল। Experimental Psychology বিদ্যাব পশুবিভাগে এবং উদ্ভিদবিভাগে যে-সমুদয় কার্য্য হয় তাহা অনেকটা জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধান সমূহের অনুরূপ। অধ্যাপক ইয়ার্কিস Plant Psychology এবং Animal Psychology বিদ্যায় মানবচিত্তের সঙ্গে ইতর চিত্তের ধারাবাহিকতা এবং সাম্য প্রচার করিতেছেন। ইয়ার্কিসকে যে-সকল দিকে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা চালাইতে হয় জগদীশচন্দ্রকেও খানিকটা সেই দিকে কার্য্য করিতে হয়। তবে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের Physiology সম্বন্ধে বেশী দৃষ্টিপাত করেন, এবং ইয়ার্কিস মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যত্নবান্। জগদীশচন্দ্রের অনুসন্ধানসমূহ হইতে এই কারণেই দার্শনিক এবং মনস্তত্ত্ববিদেরা সাহায্য পাইয়া থাকেন।

বক্তৃতায় প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, দর্শনাধ্যাপক এবং সাধারণ স্ত্রী পুরুষ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন। বক্তৃতার নাম—"The Control of Nervous Impulse in Plants."

আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা হইল। চিত্রগুলি সবই চিত্তাকর্ষক। বক্তৃতা অতি মধুর হইয়াছিল—ব্যাখ্যা প্রণালীতে শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তুষ্ট হইয়াছেন। উদ্ভিদের মদ্য পান, উদ্ভিদের নিদ্রা, উদ্ভিদের মৃত্যু, উদ্ভিদের ক্লান্তি ইত্যাদি (lantern slide) ছায়াবাজির সাহায্যে হৃদয়গ্রাহিরূপে বুঝান হইল। সকলেই বুঝিল—

(১) মানুষ যেরূপ বাহিরের আঘাত পাইলে তাহার যথোচিত উত্তর দিয়া থাকে উদ্ভিদও ঠিক সেইরূপ করে।

(২) মানুষের হৃৎপিণ্ড যেরূপ কার্য্য করে উদ্ভিদেরও সেইরূপ হৃৎপিণ্ড আছে এবং হৃৎপিণ্ডের কার্য্যও সেইরূপ।

(৩) মানবশরীরের ভিতর চেতনাবাহী শিরা আছে, উদ্ভিদেরও তাহা আছে।

বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কয়েকটা এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা দেখান হইয়াছিল। যন্ত্রাদি বসুমহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত।

বক্তৃতা শুনিয়া হার্ভার্ডক্লাবে নৈশভোজনে যোগদান করিলাম। দর্শন-বিভাগের কর্ত্তারা উপস্থিত। দু-একজন বাহিরের লোকও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সাধারণতঃ এইরূপ খানার উৎসবে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এ যাত্রায় তাহা হইল না। পাশাপাশি অথবা মুখামুখি কথাবার্ত্তা মাত্র হইল। হার্ভার্ডক্লাবে বোধ হয় কোন রমণীর যাওয়া আসা নাই—এজন্য জগদীশচন্দ্র একাকী নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। —তাঁহার পত্নী সঙ্গে আসেন নাই। তিনি এমার্সনহলে বক্তৃতার সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার সর্ব্বত্রই জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা সমাদৃত হইয়াছে। ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ইয়াঙ্কি

বিজ্ঞান-সেবীদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। প্রতিবৎসর বড়দিনের সময়ে ভারতবর্ষের মত এদেশেও নানা প্রকার কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, সম্মিলন ইত্যাদি হইয়া থাকে। ফিলাডেল্‌ফিয়ার সম্মিলনে বিজ্ঞানসেবীরা হিন্দুবৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি দেখিয়া এবং বক্তৃতা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছেন। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বষ্টন, উইস্কন্সিন, শিকাগো, মিশিগান ইত্যাদি স্থানেব নানা সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করিয়াছেন।

দর্শন ও কাব্য ছাড়া অন্যান্যবিভাগেও ভারতবাসীর মাথা খেলে—ইয়াঙ্কিরা এই কথা এতদিনে প্রথম বুঝিল। ইয়াঙ্কিস্থানে এবং দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই কথা বুঝাইবার জন্য ভারতবাসীর উপযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। জগৎ মাথার জোরে চলিতেছে—ভারতীয় মস্তিষ্কের শক্তি নানা ক্ষেত্রে দেখাইতে না পারিলে ভারতবাসী মানবজাতির সম্মান লাভ করিতে পারিবে না।

১৩২৪ পৌষ

নিবেদন

[জগদীশচন্দ্র বসু লিখিত]

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দিব, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই-সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জনাই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহা সত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই, যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাসরাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ, পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধশতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনিই শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেস্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে-সকল চেস্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেই-সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে-ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এই-সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জর্ম্মানীতে আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমানকালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম, যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই-সকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর

হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহা সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষপ্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত-মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয়গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই-সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্য্যটন

ভাগ্য-ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম,—উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্য্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; উদ্ভিদ্-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে-সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা-অনুসারে এই-সকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক! জানিতে পারিলাম, সেইদিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মন্টেগু। ইহার পর ভারত-গভর্ণমেন্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটী দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল, যে, এ-সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি, যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যেস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়!

বিজ্ঞান প্রচারে ভারতের স্থান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবনের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। একদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে, তাহার দুইটি চক্ষু একসময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নিম্মার্ণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণমান বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া, নির্ব্বাণ জীবনের বেদনাচাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থির বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধির মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ

সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগদ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়-স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে, যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই-সকল কথা কল্পনা প্রসূত নহে। যে-সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে-সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই-সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব, ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর-একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি যে-আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গভর্ণমেণ্টও এবিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এই-সকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গান দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে।

এস্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে-সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেই-সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এইস্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেন্ট লওয়া হইবে না; কারণ আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরে শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুই দিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন, আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতেব বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি, বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে;তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে-মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদ জগতে, এই তুষ্ণীম্ভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্টা অজর কোন্টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই-সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণ পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড় সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা-প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই! তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের
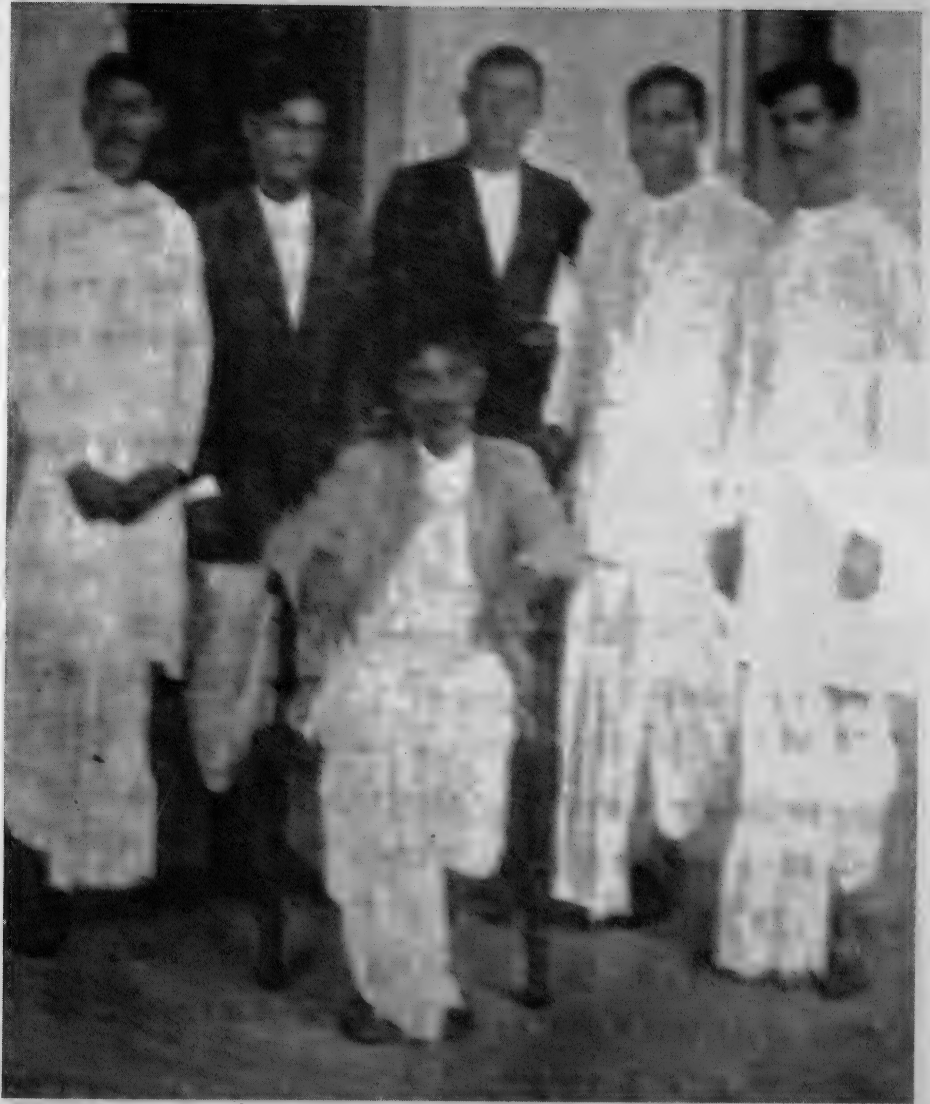
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর শিষ্যগণ • আশ্বিন ১৩২৭

বাঙালি ব্যাবসার প্রেরণাদাতা প্রফুল্লচন্দ্র • ফাল্গুন ১৩৪৭

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় • ফাল্গুন ১৩২২
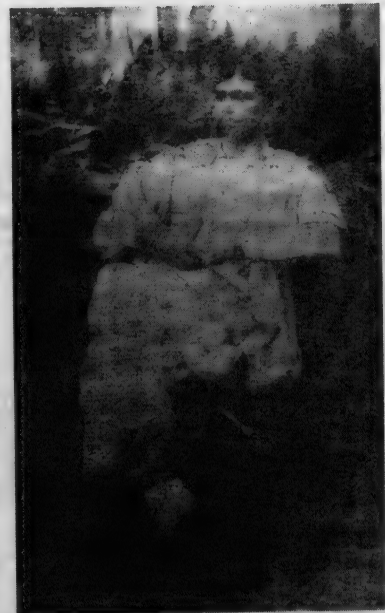
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ • মাঘ ১৩২৫
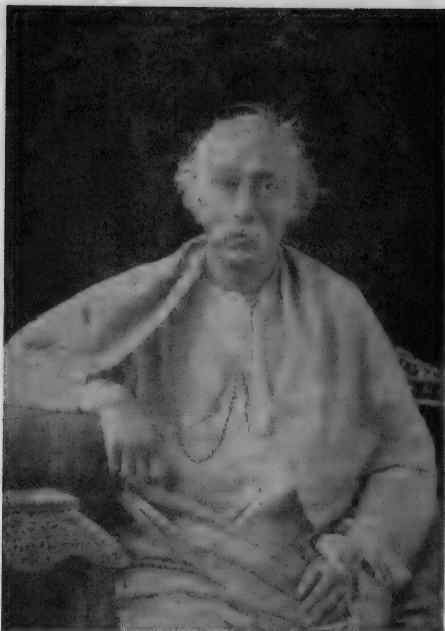
মহেন্দ্রলাল সরকার • মাঘ ১৩৪৩
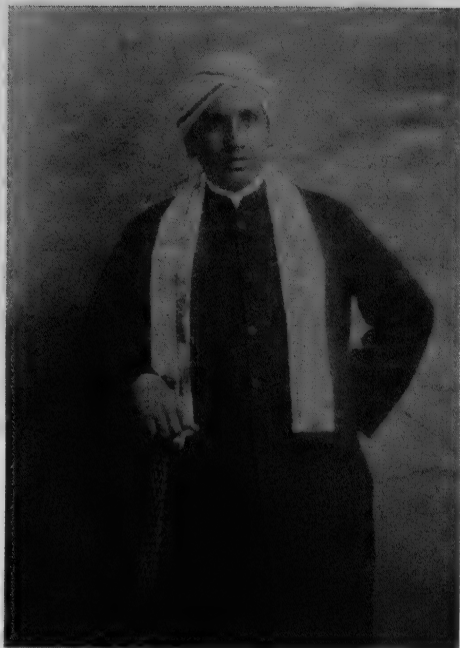
চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন • পৌষ ১৩৩৭

কে এস কৃষ্ণন • কার্তিক ১৩৪৭

শিশিরকুমার মিত্র • কার্তিক ১৩৪৭

মেঘনাদ সাহা • কার্তিক ১৩৪৭

নীলরতন ধর • মাঘ ১৩৪২
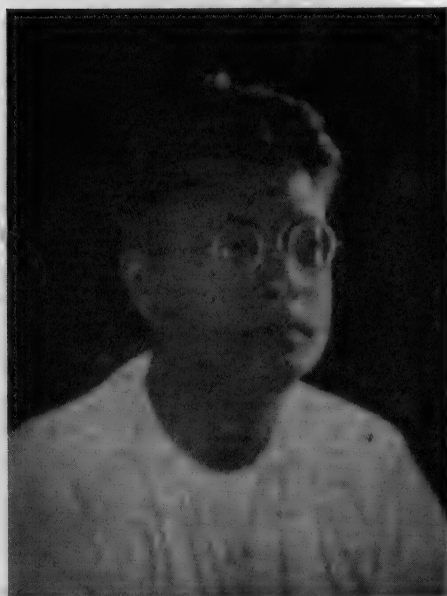
সত্যেন্দ্রনাথ বসু • কার্তিক ১৩৪৭
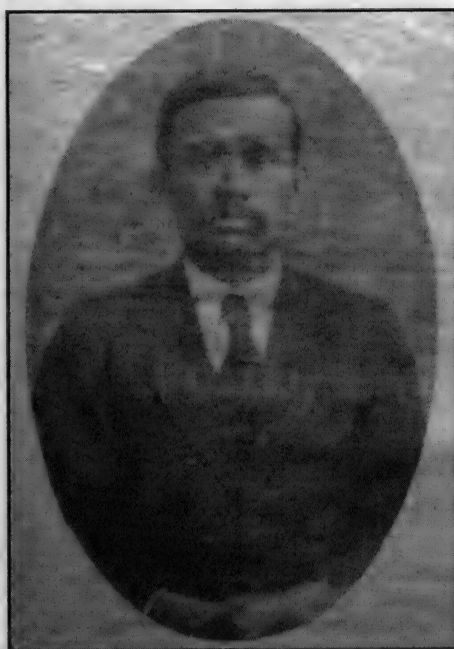
রসিকলাল দত্ত • চৈত্র ১৩২৭

মাদাম কুরি • শ্রাবণ ১৩৪১
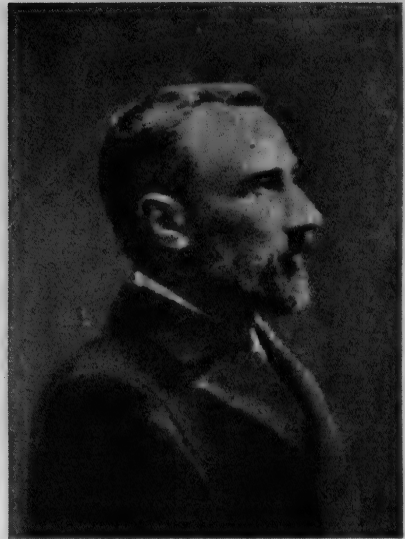
পিয়ের কুরি • শ্রাবণ ১৩৪১

নীলরতন সরকার • মাঘ ১৩২২
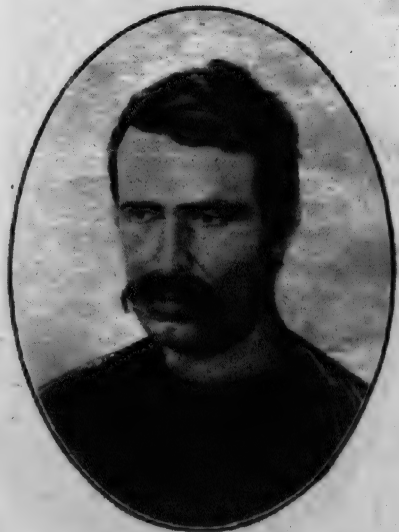
ভূদেব মুখোপাধ্যায় • আষাঢ় ১৩৪১
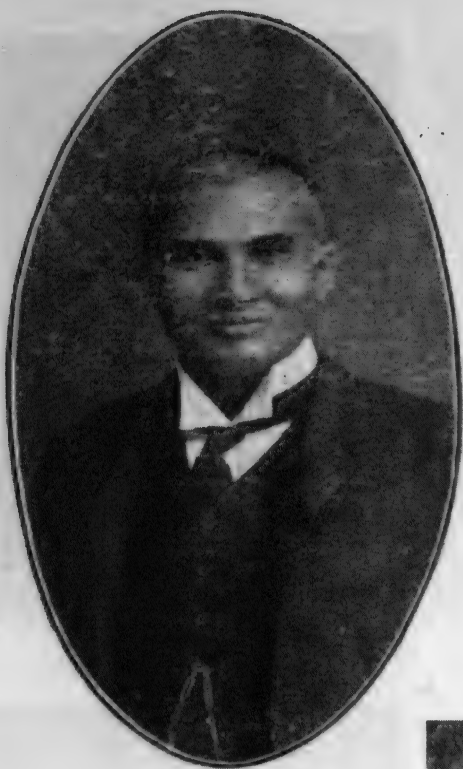
প্রমথনাথ বসু • জ্যৈষ্ঠ ১৩২০

প্রথম বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার
নীলমণি মিত্র • আশ্বিন ১৩৩২
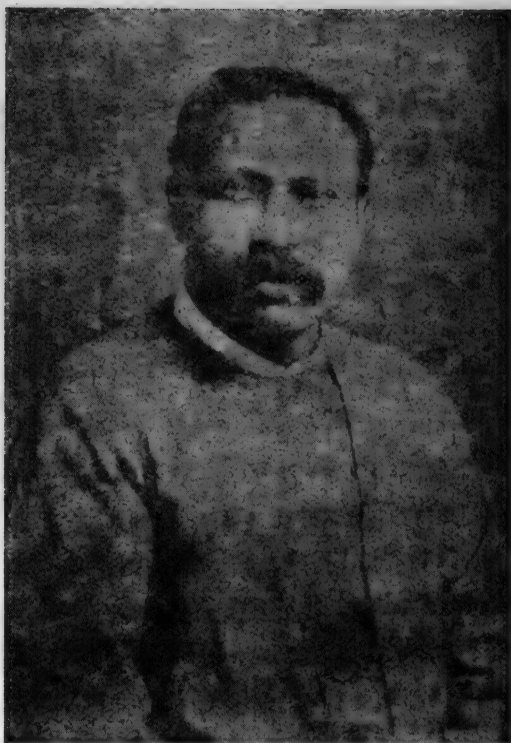
শরচ্চন্দ্র দাস • মাঘ ১৩২৩

দেবেন্দ্রমোহন বসু • কার্তিক ১৩৪৭

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন • শ্রাবণ ১৩৪৯

লর্ড রাদারফোর্ড • শ্রাবণ ১৩৪৯

লুই পাস্তুর • শ্রাবণ ১৩০৮

সিগমুন্ড ফ্রয়েড • জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থির দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়. যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয়মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে। *

* বিজ্ঞানাচার্য্য সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ডি-এস-সি, সি-আই-ই, সি-এস-আই মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দির দেশ-জননীকে নিবেদন উপলক্ষ্যে পঠিত।

১৩২৪ ফাল্গুন
বোম্বাইয়ে আচার্য্য বসুর অভ্যর্থনা

বোম্বাইয়ের লোকেরা মৌখিক আদর করিয়া ও ভিড় কবিয়া মালা পরাইয়া আচার্য্য বসু মহাশয়কে বিদায় দেয় নাই। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকে ৫০,০০০ টাকার টিকিট কিনিয়াছিল। ছাত্রেরা ও অন্যেরা চাঁদা করিয়া তাঁহাকে একাধিক জায়গায় বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য টাকার থলি উপহার দিয়াছে। তাহার পর বোম্বাইবাসীরা সভা করিয়া তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য দুইলক্ষ টাকা দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইবাসী শ্রীযুক্ত এস্ আর বোমাঞ্জী এক লক্ষ, শ্রীযুক্ত মূল্‌জি খাটাউ সওয়া দুই লক্ষ, এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস যমুনাদাস ২৪,০০০ টাকা দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে নিউইণ্ডিয়ার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে বড়োদার মহারাজা গায়কবাড় বসু বিজ্ঞানমন্দিরে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়াছেন।

১৩২৫ বৈশাখ
বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে বাংলা ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায়, সম্প্রতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদে ও রামমোহন- লাইব্রেরীতে বাংলায় বক্তৃতা করায়, তৎপ্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ইহা নূতন ব্যাপার নহে। আচার্য্য বসু মহাশয়ই যখন বহুবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি হন, তখনও তাঁহার একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়া তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল, এবং তিনি বাংলায় বলিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা যত বেশী হয় ততই ভাল। নতুবা বিজ্ঞান বাঙালীর সাধারণ মানসিক সম্পত্তি হইতে পারিবে না।

আচার্য্য বসু ভিন্ন আরও কেহ কেহ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাকে কতদূর পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন হইতে দেওয়া হইবে, জানি না; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যে-সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই, সেখানে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যান এবং আলোচনা বাংলা ভাষার সাহায্যে করা আমাদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন এবং চেষ্টার আয়ত্ত।

১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ
বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সম্মান তাঁহার বহু পূর্ব্বেই পাওয়া উচিত ছিল। কেন পান নাই, তাহার কারণের একটু নমুনা ডাক্তার ওয়ালারের অদম্য হিংসুটে স্বভাবের জন্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার ওয়ালার কেন বসু মহাশয়ের শত্রু তাহা আমরা জানি। হয়ত পরে তাহা প্রকাশ পাইবে। যখন, অনেক বিবেচনার পর, রয়্যাল সোসাইটীর কমীটি তাঁহার নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখনও ডাক্তার ওয়ালারের বাধা দিবার প্রবৃত্তি ও আশা ছিল!

অনেকে মনে করে, আচার্য্য বসু যেন একটা কোন তত্ত্বের আভাস পাইবামাত্রই তাহা প্রকাশ করিয়া বসেন; সুতরাং হঠাৎ তাঁহার ভুল বাহির হইয়া যাইতে পারে। এইসব লোকের জানা উচিত, তিনি বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহে হওয়ার বহু বৎসর পরে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রয়্যাল সোসাইটীও তাঁহার বা অন্য কাহারও কোন আবিষ্ক্রিয়া বা উদ্ভাবিত যন্ত্রের বৃত্তান্ত পাইবামাত্র ছাপেন না; তাঁহারা এদেশের সম্পাদকদের মত বুভুক্ষিত নহেন। অনেক বুঝিয়া-সুঝিয়া পরখ করিযা তবে তাঁহারা ছাপেন।

কোন মানুষই ভ্রমাতীত নহেন। আচার্য্য

বসুরও সব মত চিরকাল অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত না হইতেও পারে। তাহাতে তাঁহার কার্য্যের গৌরব ও যশের হানি হইবে না। কিন্তু সত্য নির্দ্ধারণার্থ বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ প্রকাশ এক প্রকার, যেমন টাইমস্ কাগজে অধ্যাপক বেলিস্ করিয়াছিলেন, আর, হিংসুটে লোকের সন্দেহ প্রকাশ অন্য প্রকারের, যেমন ঐ কাগজেই ডাঃ ওয়ালারের পত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল।

১৩২৭ আষাঢ়
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় রয়্যাল সোসাইটীর সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার ওয়ালারের ইহাতে বাধা দিবার ইচ্ছার অভাব এবং চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়াছে। যে-সব জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হয়ত বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া সমূহের নীরব অনুরাগী সমজদারই থাকিতেন, তাঁহারা প্রকাশ্য সভাগৃহে মৌখিক এবং সংবাদপত্রে চিঠি-লিখিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যের সত্যমূলকতা ও গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা ভারতের নানা ইংরেজী দৈনিকে বাহির হইয়াছে। বিলাতের প্রধান বৈজ্ঞানিক পত্র নেচ্যরের সম্পাদক গ্রেগরী সাহেব এক সভায় বলিয়াছেন, পদার্থবিজ্ঞানের এক ক্ষেত্রে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার যেমন মূল্যবান্, বিজ্ঞানের অপর এক ক্ষেত্রে বসুমহাশয়ের আবিষ্কারগুলির গুরুত্বও তদ্রূপ। ইহা খুব উচ্চ প্রশংসা। শ্রীমতী এনী বেসান্টের নিউইণ্ডিয়ায় বসু মহাশয় সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—

He has carried on a long and weary battle against western bigotry and prejudice, but has at last conquered and is recognised as one of the foremost scientific leaders of the world. We should say "the foremost", because he has opened up a new road;...

শ্রীমতী বেসান্টকে অনেকে কেবল থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর নেত্রী ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারিণী বলিয়াই জানেন। কিন্তু তিনি যৌবনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্‌সী অপেক্ষা কঠিনতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছিলেন, বহু বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আটটি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞানের অনেক ক্লাসে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। অতএব, আচার্য্য বসু বিজ্ঞান-জগতে নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া শ্রীমতী বেসান্ট যে তাঁহাকে বর্ত্তমান জগতের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, তাঁহার এই মত হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না, অন্ততঃ ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

১৩২৭ ফাল্গুন

আচার্য্য বসুর বক্তৃতা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইউরোপ হইতে জয়মাল্যভূষিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ববৎ জ্ঞানদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরে তিনি প্রথম যে বক্তৃতাটি করিয়াছেন, তাহা হইতে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ লোকেরাও বুঝিতে পারিবেন, যে, তাঁহার কতকগুলি আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা মানবের কি হিত হইতে পারে। যে-সকল গবেষক কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহারা ভাবেন না, যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সত্যগুলি মানুষের কি কাজে লাগিবে, তাহা দ্বারা কিরূপে মানুষের ধন বাড়িবে, কার্য্যশক্তি বাড়িবে, রোগ ও দুঃখ কমিবে এবং সুখ বাড়িবে; তাঁহারা সত্যের সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকেন। অন্যেরা সেই সকল সত্য কাজে লাগাইয়া মানুষের সুখসমৃদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি করেন; আসুরিক প্রবৃত্তি যাহাদের তাহারা আবার বৈজ্ঞানিক সত্যকে সংহার-কার্য্যেও নিযুক্ত করে। বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত নানা তত্ত্ব দ্বারা জীবনের অনেক গভীর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। সে সকলের কথা না বলিয়া তৎসমুদয়ের দ্বিবিধ সহজবোধ্য হিতকারিতার কথা বলি।

তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ বা বৃদ্ধিলেখক নামক যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা নানাবিধ। এই যন্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। একটি কচি বা বড় গাছের দিকে তাকাইয়া থাকিলে আমরা অনেক ঘণ্টাতেও বুঝিতে পারিব না যে উহা বাড়িতেছে! বসু মহাশয়ের যন্ত্রদ্বারা নিমেষেও বুঝা যায় যে উহা বাড়িতেছে কি না। শুধু তাহাই নহে; কোন্ অবস্থায় গাছটি কত দ্রুত বাড়িতেছে বা বাড়িতেছে না, তাহাও বুঝা যায়। একই অবস্থায় কোন্ গাছ কত দ্রুত বা আস্তে-আস্তে বাড়ে, তাহাও ইহা দ্বারা বুঝা যায়। গাছে সার দিলে, রাসায়নিক দ্রব্যবিশেষ প্রয়োগ করিলে, গাছ বাড়ে ইহা সবাই জানি। কিন্তু কোন্ সার কি পরিমাণে কোন্ গাছে দিলে উহার বৃদ্ধি খুব বেশী হয়, তাহা জানিতে হইলে এপর্য্যন্ত একমাত্র উপায় ছিল দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করা। কিন্তু বসু মহাশয়ের যন্ত্রদ্বারা দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ে ইহা নির্দ্ধারিত হয়। তাড়িত শক্তির ও আলোকের প্রয়োগে কৃষিকার্য্যের কিরূপ সুবিধা অসুবিধা হয়, তাহাও অতি অল্প সময়ে বসু মহাশয়ের যন্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। তাঁহার যন্ত্র দ্বারা আরও একটি আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন বিষ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে উদ্ভিদে প্রযুক্ত হইলে উদ্ভিদের মৃত্যু হয়, কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে উদ্ভিদ্ খুব বাড়িতে থাকে। তাড়িত প্রবাহের কার্য্যও এইরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। উদ্ভিদে মাঝারি রকম জোরের তাড়িত প্রবাহ প্রযুক্ত হইলে উহা বৃদ্ধির সাহায্য করে, কিন্তু প্রবাহের জোর বাড়াইয়া দিলে বৃদ্ধি অগ্রসর না হইয়া স্থগিত হয় বা কমিয়া যায়।

এই সকল গবেষণা ও আবিষ্কার হইতে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উপকার হইতে পারে। কিন্তু আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ বসু মহাশয়ই করুন, এরূপ আশা ও অনুরোধ অনুচিত হইবে। শুধু তাই নয়; তাঁহার সময় ও শক্তি গবেষণায় প্রযুক্ত হইলে জগতের যে লাভ হইবে,

সাক্ষাৎভাবে কৃষির উন্নতিতে তাহা প্রযুক্ত হইলে সেরূপ হইবে না। কৃষিক্ষেত্রে তাঁহার গবেষণার প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোকের প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বসু মহাশয়ের পাঠকক্ষে আমেরিকার কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি চিঠি দেখিয়াছিলাম;তাহাতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে, একটি বৃদ্ধিলেখক যন্ত্র তাঁহারা পাইতে পারেন কি না। আমাদের দেশের সরকারী কৃষিবিভাগসমূহ, দেশীরাজ্যসকলের কৃষিবিভাগসমূহ, এবং বড় বড় জমীদারেরা এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিবিষয়ক পরীক্ষা করিতে এরূপ উৎসুক হইয়াছেন বলিয়া কোন সংবাদ পাই নাই।

বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়াসকলের হিতকারিতার আর একটি ক্ষেত্র রোগের চিকিৎসায় ও যাতনার প্রশমনে। তিনি দেখাইয়াছেন, অনেক বিষের এবং ঔষধের কাজ জীবজন্তুর দেহে যেমন হয়, উদ্ভিদের দেহেও তদ্রূপ। এইহেতু তাঁহার গবেষণাসকল চিকিৎসাক্ষেত্রেও নূতন পথ খুলিয়া দিতেছে।

মনোবিজ্ঞানবিদেরাও তাঁহার গবেষণা হইতে নূতন আলোক পাইতেছেন।

১৩২৮ শ্রাবণ

আচার্য্য বসুর বিজ্ঞানমন্দির

রাষ্ট্রীয় কোষ হইতে আচার্য্য বসু মহাশয়ের বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণা-কার্য্যের জন্য স্থায়ী সাহায্য লাভ সন্তোষের বিষয়। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য হইতে বিজ্ঞানমন্দিরের আয় যত হইবে, রাষ্ট্রীয় কোষ হইতে তাহার দ্বিগুণ-সাহায্য পাওয়া যাইবে। ভারতীয়েরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিরূপ আদর করেন, সর্ব্বসাধারণের সাহায্যের পরিমাণ দ্বারা তাহার পরীক্ষা হইবে।

বৈজ্ঞানিকের প্রথম ও প্রধান কাজ সত্য অন্বেষণ ও সত্য আহরণ, এবং তাহার প্রচার। তাহার দ্বারা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। সেই জ্ঞান মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য, ধন বৃদ্ধির জন্য, কার্য্যসৌকর্য্য বৃদ্ধির জন্য, কি প্রকারে কাজে লাগান যায়, তাহা যে বৈজ্ঞানিকের কাজ নহে, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু সে-কাজ একজন বৈজ্ঞানিক না করিলেও, তাহাতে তাঁহার গবেষণার গৌরব হ্রাস পায় না, তাঁহারও কোন ত্রুটি হয় না। আচার্য্য বসু মহাশয়ের বিজ্ঞানমন্দিরে উভয় প্রকার কার্য্যই হইতেছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের চেষ্টায় অনেক অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহের সাহায্যে চিকিৎসাবিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইতে পারে, তাহার আভাস তিনি দিয়াছেন। তাঁহার ক্রেস্কোগ্রাফ অর্থাৎ বৃদ্ধিলিপি-যন্ত্র দ্বারা কৃষিকার্য্যের কি প্রকার উন্নতি হইতে পারে, তাহার আভাসও তিনি দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল আভাস দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছেন না। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী সিজ্‌বেড়িয়াতে তাঁহার যে পরীক্ষাক্ষেত্র আছে, তথায় কৃষির উন্নতিবিধায়ক পরীক্ষাও তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে করা হইবে। সম্ভবতঃ এই প্রকার যন্ত্রে দ্বারাই তিনি

পূর্ব্ববঙ্গের কচুরি পানা বিনাশের উপায়ও অনুসন্ধান করিবেন।

বাঙ্গালাদেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এখানে এখানকার গাছপালা লইয়া যে-সকল পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ (experiment and observation) করা হয়, শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশসকলে তাহার অনুকৃতি ও অনুসরণ করা সহজ নহে। এইজন্য, পাশ্চাত্য কোন কোন বৈজ্ঞানিকের অনুরোধে শীতপ্রধান দেশের মত পরিবেষ্টনে ও অবস্থায় তিনি পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য দার্জিলিঙে পরীক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরাও তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরে ছাত্ররূপে স্থান পাইতে পারে। ইতিমধ্যেই এরূপ লোকের আবেদন আসিয়াছে। ভারতবর্ষের পক্ষে বহুযুগ পরে ইহা এক নূতন জিনিষ। প্রাচীনকালে বহু বিদেশী জ্ঞান লাভের জন্য ভারতে আসিয়া ভারতীয় অধ্যাপকদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেন। এই লুপ্ত রীতির স্মৃতি পর্য্যন্ত প্রায় লয় পাইয়াছে। তাহাকে নবজীবন দান করিবার গৌরব আচার্য্য বসুর অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। তাঁহার গৌরবের প্রতিফলিত কিরণে মণ্ডিত হইতে তাঁহার দেশবাসী আমাদের কোন আপত্তি না থাকিবারই কথা; কিন্তু তাঁহার অনুষ্ঠানের কার্য্যতঃ সহায় হইতে পশ্চাৎপদ না হওয়া ও আপত্তি না করা আমাদের পক্ষে সমান স্বাভাবিক হওয়া উচিত।

১৩২৯ পৌষ

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভা

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক সভায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান-মন্দিরের কার্য্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর মধ্যে জীবনের ঐক্য, উদ্ভিদের হৃৎ-স্পন্দন ও স্নায়ু, উদ্ভিদে রস-সঞ্চালন সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার ও নানা আবিষ্ক্রিয়ার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত অতি অদ্ভুত কয়েকটি যন্ত্র প্রভৃতির কথা বলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে হইলে শীঘ্র শীঘ্র যশোলাভ করিবার ও জন-সমাজে আদৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা দমনের শক্তি, গভীর অভিনিবেশের শক্তি, প্রভৃতি আবশ্যক বলেন। বিজ্ঞানমন্দিরে গত পাঁচ বৎসরে একশতের উপর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুসন্ধান হইয়াছে, ইহা কম আনন্দের ও গৌরবের বিষয় নহে।

উদ্ভিদ্-সকল কি প্রকারে রস আকর্ষণ করে, এবং কেমন করিয়া তাহা তাহার শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফলে সঞ্চালিত হয়, সে বিষয়ে বসু মহাশয় প্রচলিত সমুদয় মতকে খণ্ডন করিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার বহি ইংরেজী ও জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত হইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে তাঁহার কোন ছাত্র বাংলাতে ইহা লিখিলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট হয়।

তাঁহার বক্তৃতার পূর্ণ প্রতিলেখন কাগজে বাহির হয় নাই। তিনি তাঁহার বিজ্ঞান-মন্দিরের নানাস্থানের ছবি দেখাইয়া বলেন, যে, বিজ্ঞানসম্পর্কীয় কিছু জিনিষ বা ঘরবাড়ী প্রতিষ্ঠান

আদিকে বিশ্রী হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। বিজ্ঞান যেমন সত্য, সৌন্দর্য্যও তেমনি সত্য। সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত সুষমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে। আমরা স্মৃতি হইতে তাঁহার এতদ্বিষয়ক কথার তাৎপর্য্য দিলাম। বাস্তবিক বিজ্ঞানাগারে যাহা করা হয়, বিশ্বে জলে স্থলে আকাশে তদপেক্ষা বিশাল ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত হইতেছে। অথচ বিশ্বকর্ম্মা এরূপ অনির্ব্বচনীয় চিন্তার অতীত কার্য্য-সকল করিতেছেন বলিয়া বিশ্বকে কার্‌খানার ভাঙ্গা লোহার স্তূপের মত করিয়া রাখেন নাই, তাহাকে নানা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত রাখিয়াছেন।

বসু-মহাশয়ের আর-একটি কথা বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীদের আরো বেশী মনে রাখিবার যোগ্য; তাহাও তাঁহার বক্তৃতার প্রতিলেখনে দেখিলাম না। তিনি এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, আমাদের দেশে আমরা পাশ্চাত্য ধনীদেশ-সকলের মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অত বেশী টাকা পাইতে না পারি। টাকা না পাইলে আমাদিগকে দারিদ্র্য মানিয়া লইতে হইবে, এবং দারিদ্র্য সত্ত্বেও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

বয়োবৃদ্ধ ও বয়ঃকনিষ্ঠ, বিখ্যাত ও অবিখ্যাত ভারতীয় সমুদয় বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীর এই কথা মনে রাখা উচিত। আগেকার দিনে জগতের সুবিখ্যাত অনেক বৈজ্ঞানিক খুব সাধারণ রকমের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্র লইয়া মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন।

১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ

আচার্য্য বসু মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তন

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী দীর্ঘকাল ইউরোপের নানা-দেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়কে সর্ব্বত্রই তাঁহার নূতন আবিষ্ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে দেশী কারিগর দ্বারা নির্ম্মিত যন্ত্র-সকল ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই যন্ত্রগুলির সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও অদ্ভুত কার্য্যকারিতা দেখিয়া সর্ব্বত্র বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। ইহার দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার হইয়াছে, এবং বিদেশে ভারতীয় প্রতিভার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অন্য অনেক অসাধারণ লোকের সহধর্ম্মিণীর সম্বন্ধেও যেমন বলা যায়, আচার্য্য বসু মহাশয়ের পত্নীর সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যায়, যে, তিনি সাংসারিক সমুদয় ঝঞ্ঝাট ও খুঁটি-নাটির সম্পূর্ণ ভার নিজে বহন না করিলে, বসু মহাশয়ের জ্ঞানতপস্যায় বহু বিঘ্ন ঘটিত। কিন্তু আচার্য্যপত্নী মহোদয়ার নিজের লোকহিতকর কাজও আছে। তিনি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদকের কাজ দীর্ঘকাল চালাইয়া আসিতেছেন। নারী-শিক্ষা-সমিতির দ্বারাও নানা উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার

হইতেছে। বসু মহাশয় ও তাঁহার পত্নী স্বদেশে আপনাদের কার্য্যক্ষেত্রে ফিরিয়া আসায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার হউক, এবং নূতন প্রেরণা আসুক, এই প্রার্থনা করি।

১৩৩২ পৌষ

মহাভারত ও আচার্য্য বসুর আবিষ্কার

গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নমুদ্রিত চিঠিটি আমাদের হস্তগত হয়।

"গত সপ্তাহের বঙ্গবাসী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'বৃক্ষের হৃদয় স্পন্দন' উপলক্ষ করিয়া যে বিজ্ঞোচিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে কি না জানি না। উহা কাটিয়া এই চিঠির ভিতরে পাঠাইলাম। আপনার 'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় নোটে উহার উপরে একটি ...টিপ্পনী দেখিতে ইচ্ছা হয়।... বিশেষ এই অংশটুকুর :— 'মহাভারতে বৃক্ষজীবনের সকল রহস্যই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড় বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।'

"আমি বাল্যকাল হইতে কাশীরাম দাসের মহাভারত ও কালীপ্রসন্ন সিংহের দ্বারা সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ পড়িয়া আসিতেছি। এ পর্য্যন্ত জড়বিজ্ঞানের কিছুই তাহা হইতে শিক্ষা করিতে পারি নাই। বৃক্ষজীবনের সকল রহস্য কোন্ পর্ব্বের কোন্ অধ্যায়ে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে জানিতে পারিলে আমি উপকৃত হইব এবং আমার মত আরও অনেকে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আপনি নিশ্চয়ই বলিয়া দিতে পারিবেন।"

যিনি এই চিঠিটি লিখিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে তাঁহার খুব প্রসিদ্ধি আছে। তিনি যখন মহাভারত হইতে জড়বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব, বিশেষতঃ আচার্য্য বসুর আবিষ্কারের মত কিছু, উদ্ধার করিতে পারেন নাই, তখন আমরা কিছু করিতে নিশ্চয়ই পারিব না। সুতবাং সে চেষ্টা করিব না, এবং চেষ্টার পূর্ব্বে বলিবও না, "গমিষ্যামুপহাস্যতাম্ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, যাঁহারা সুদূর চীনদেশ হইতে সোমলতা আমদানী করিয়া তাহা হইতে সালসা প্রস্তুত করিয়া সমুদয় বাঙালীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক হিন্দুর করায়ত্ত মহাভারত হইতে জড়বিজ্ঞানের সমুদায় তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তাহা বঙ্গের আপামরসাধারণ সকল হিন্দুকে এ পর্যন্ত "উপহার" দেন নাই। তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানের ঐ সব তত্ত্বই শিখিবার জন্য বঙ্গীয় যুবকদিগকে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ইউরোপ আমেরিকা গিয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত না; তাহাদিগকে জোর বটতলা বা "বঙ্গবাসী" কার্য্যালয় পর্য্যন্ত যাইতে হইত, এবং তাহাতে জা'ত যাইত না। যাহা হউক, "বঙ্গবাসী" এপর্য্যন্ত যাহা করেন নাই, তাহা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই করিবেন। তখন পাশ্চাত্য

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ও বৈজ্ঞানিককে আচার্য্য বসুর নিকট তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের জন্য ফরমাইস্ না দিয়া "বঙ্গবাসী"- কার্য্যালয়ে অর্ডার দিলেই চলিবে। আচার্য্য বসুও সাবধান হউন। যাহা অচিরে ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীটে পাওয়া যাইবে, তাহার জন্য কেন তিনি অকারণ শক্তি, সময় ও অর্থব্যয় করিতেছেন? "বঙ্গবাসী" কি বলিতেছেন, দেখুন।

বৃক্ষের স্পন্দন।—মানুষের এবং অন্যান্য জীব-জন্তুর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সকলেই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ। বৃক্ষের হৃৎপিণ্ড-স্পন্দন দেখা যায় না, বা স্পর্শদ্বারাও অনুভব করা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে যে. বৃক্ষের সেরূপ কোন স্পন্দন নাই? লৌকিক-অলৌকিক বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর হিন্দুর উপনিষদ্ শাস্ত্র এবং পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি জানাইয়া দিয়াছেন, বৃক্ষেরও জীব-জন্তুর মত ইন্দ্রিয় আছে এবং সেই ইন্দ্রিয়সমূহ ক্রিয়াশীল। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞানে অবশ্য একথা নূতন; এখনও এমন অনেক কথাই এবিজ্ঞানে অজ্ঞাত। কাজেই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বৃক্ষের হৃৎ-স্পন্দনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। সম্প্রতি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বাঙালী বৈজ্ঞানিক স্যার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এইরূপ কথা শুনাইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। তাঁহার বিস্ময়কর বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা অনেকেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি আরও দুইটি নতুন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। সে দুইটি এই,— (১) বৃক্ষসমূহের জীব-জন্তুর মতই মাংসপেশী আছে এবং (২) জীব-জন্তুর হৃৎপিণ্ড-স্পন্দনের মত বৃক্ষের দেহাভ্যন্তরেও এক প্রকার স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। তাঁহার আবিষ্কৃত আরও একটি নূতন তথ্য তিনি আগামী জানুয়ারী মাসে ঘোষণা করিবেন বলিয়াছেন। স্যার্ জগদীশের আবিষ্কারের বিশেষত্ব এই যে, তিনি এইসব তথ্য যাহাতে সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাহার উপযোগী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমূহ তৈয়ারী করিয়াছেন এবং সেইসকল যন্ত্র-সাহায্যেই নিজের বক্তব্য উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। আমরা অনেকবারই বলিয়াছি, হিন্দুর নিকট এ-সব আদৌ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু অনেক হিন্দুর কাছেই ইহা অজ্ঞাত। তাহার কারণ, হিন্দু এখন নিজের পরিচয়ই নিজে জানে না এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে নিজের পরিচয় জানিবার প্রবৃত্তিও তাহাদের ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। হিন্দু বালকের বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই অনেকে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী রেডিং নগরের ডুবালের গল্প পড়িতে আরম্ভ করে; আমাদের অনন্ত জ্ঞানের আকর মহাভারতের উপাখ্যান পড়িবার অবসর তাহাদের অনেকেরই সারা জীবনেও হয় না। মহাভারতে বৃক্ষ-জীবনের সকল রহস্যই বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত আছে। তাহা পাঠ করিলে, হিন্দুকে জড়-বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কারের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কাল-প্রভাবে অনেকে আমাদের পুরাতন সিদ্ধান্তে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছেন, সুতরাং পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের অতি নিম্নস্তরের আবিষ্কারও এখন তাঁহাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। স্যার্ জগদীশের আবিষ্কারের ফলে যদি তাঁহারা হিন্দু প্রাচীন বিদ্যাসমূহে বিশ্বাসবান্ হইতে পারেন, তাহা হইলেও এদেশের অনেক উপকার হইবে।

শুনিয়াছি, আর্য্যসমাজের লোকেরা মনে করেন, বেদে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আমরা দয়ানন্দস্বামী প্রণীত "সত্যার্থ-প্রকাশ" পড়ি নাই; সুতরাং উহা সত্য কিনা বলিতে পারি না।

বাস্তবিকই আমরা একান্ত আত্মবিস্মৃত জাতি। বেদে টেলিগ্রাফ-আদি সব-কিছু আছে; মহাভারতে জড়বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব আছে; রামায়ণে পুষ্পক-রথ অর্থাৎ এরোপ্লেন আছে, মহীরাবণ অহিরাবণের সব্-মেরিন্ আছে; অন্যান্য শাস্ত্রে বে-তার বার্ত্তা, বে-তার টেলিফোন প্রভৃতি আছে। অথচ এই সকল জিনিষের জন্য আমাদিগকে অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য লোকদিগের নিকট ঋণী হইতে হইয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতির লোকেরাও কম বেকুব নহে। বেদ প্রথম ছাপিলেন একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত; বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত এবং অনেক পুরাণ ও তন্ত্র ম্লেচ্ছ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পাশ্চাত্য অল্পবুদ্ধি লোকদেরও, বহুবৎসর হইল, বোধগম্য হইয়াছে। এক-একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত, যেমন প্রাগ্‌বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভিন্টার্‌নিজ্‌, সংস্কৃতের চর্চ্চায় চল্লিশ বৎসর কাটাইয়াছেন। অথচ তাঁহারা নানাবিধ জড়-বিজ্ঞান ও যন্ত্র-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এবং নানা-প্রকার কল তৈয়ার করিবার জন্য বড়-বড় ল্যাবোরেটরী, কার্‌খানা প্রভৃতিতে অকারণ অর্থব্যয় ও আয়ুক্ষয় করেন। সংস্কৃত-শাস্ত্র হইতেই এই সবই খুব কম আয়াসে পাওয়া যাইতে পারিত।

আমরাই একমাত্র আত্মবিস্মৃত জাতি নহি। সেদিন যুগপৎ ইরাকের (মেসোপটেমিয়ার) একখানা ও আফগানিস্তানের একখানা—এই দুখানা আখ্‌বার্‌ অর্থাৎ খবরের কাগজ কলিকাতা পৌঁছিয়াছে। দু'টাতেই একইরকমের আফ্‌সোস জাহির করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে :— "ফেরিঙ্গীরা আসিয়া আস্‌মান হইতে আমাদের মাথায় বোমা ফেলে; আমরা তাহাদের কিছুই করিতে পারি না। কিন্তু আমাদেরই আল্‌ফ্‌ লায়লাহ্‌ (আরব্য উপন্যাস) কেতাবে লেখা আছে, যে, সেকালে আমাদের এমন গালিচা ছিল, যে, তাহাতে বসিয়া ইচ্ছা করিলেই আস্‌মানে উড়িয়া যেখানে-সেখানে আমরা যাইতে পারিতাম; এমন কলের ঘোড়াও ছিল, যাহার পিঠে চড়িয়া কল টিপিলেই সে সওয়ারকে লইয়া আস্‌মানে উঠিত। সেই গালিচা ও ঘোড়া এক-একটা জোগাড় করিলেই ত আমরাও আস্‌মানে উঠিয়া ফেরিঙ্গীদের উপর ইট-পাটকেল আতস-বাজী ছুড়িতে পারি।"

আরব-দেশেরও একখানা কাগজে স্যার্‌ জগদীশ বসু মহাশয়ের কোন-কোন আবিষ্কারের বৃত্তান্ত দিয়া লেখা হইয়াছে, "এটা আর এমন-কি আজব খবর? আমাদের আল্‌ফ্‌ লায়লাহ্‌ (আরব্য উপন্যাস) কেতাবে লেখা আছে, যে, সেকালে শাহ্‌জাদীদের গায়ক-বৃক্ষ ছিল; তাহারা নিজে-নিজেই গান করিত। আর এখন কিনা বসু সাহেবকে কল বানাইয়া, গাছের নাড়ী ছাড়িয়াছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইতেছে!"

বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের বাগানে একটিও গায়ক-বৃক্ষ না থাকা বাস্তবিকই বড় লজ্জার বিষয়।

১৩৩৩ আশ্বিন

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

বিদেশীর হাতে পাসমার্কা না পাইলে আমরা কোনো মনীষীকে সমাদর করি না—এই ধরণের একটা অপবাদ বাঙালীর আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া এই কথা যথার্থ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রাপ্য সম্মান তিনি এখানে কিছুই পান নাই; প্রশংসা ত দূরের কথা। তাঁহার গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞান-জগতে যে-আলোড়ন জাগিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ জন

সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এমন-কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো বিজ্ঞানাধ্যাপককেও আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, জগদীশচন্দ্র ভূয়ো (Bogus) জিনিষ লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন; বিজ্ঞানের বাস্তবতায় কবিতার আকাশ-কুসুম রচনা করিবার প্রয়াস করিতেছেন মাত্র। আইনষ্টাইন্-প্রমুখ মনীষীদের নিছক প্রশংসাবাদ অর্জ্জন করিয়া ফিরিবার পর এইসব বিরুদ্ধবাদীরা কি বলিবেন জানি না—হয়ত একটু হাসিবেন মাত্র। যে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে বসিয়া জগদীশচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে, গুণীর সমাদর থাকিলে সেটি এতদিন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইত। বে-তার টেলিগ্রাফের সম্ভাবনার কথা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই মনে উদিত হইয়াছিল, অথচ সহানুভূতি ও অর্থাভাবে যে তাঁহার সেই গবেষণা পরিণতিপ্রাপ্ত হইল না এই কলঙ্ক চিরদিন বাঙলা দেশকে পীড়া দিবে। অসম্ভব প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি যে বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছেন ইহা তাঁহারই অদম্য উৎসাহ ও প্রতিভা জ্ঞাপন করিতেছে; দেশ তাঁহাকে এতকাল প্রত্যাখ্যানই করিয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি ইউরোপের বিজ্ঞান-জগৎ এই বাঙালী বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব প্রতিভাকে নমস্কার নিবেদন করিয়াছেন। আশা হয়, ইহাতে তাঁহার স্বদেশবাসীর চক্ষু ফুটিবে। ইউরোপের যে যে প্রদেশে তিনি গমন করিয়াছেন সেই সেই দেশেই তিনি প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন। সেদিন জেনেভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক বিশেষ সভায় জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকুলের নিকট যে-প্রশংসা পাইয়াছেন তাহা পৃথিবীর খুব কম বৈজ্ঞানিকেব ভাগ্যেই ঘটিয়াছে, তাঁহার যুক্তির সারবত্তা ও তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম তা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন মুগ্ধ হইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছিলেন—জগদীশচন্দ্র যে-সকল অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন তাহার যে- কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

অক্সফোর্ড্ ব্রিটিশ এসোশিয়েশনে ৬ই আগষ্ট তারিখে জগদীশচন্দ্র ইংলণ্ডের খ্যাতনামা শরীরতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণী তত্ত্ববিদ্‌দিগের সম্মুখে তাঁহার নূতন আবিষ্কারসমূহ যন্ত্র সহযোগে প্রদর্শন করেন। তিনি সেখানে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ কলকব্জা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, আহার গ্রহণ ও পরিপাক ইত্যাদির প্রণালী সম্পূর্ণ এক প্রকার। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ভারতবর্ষের ইহা এক অপূর্ব্ব দান। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী আচার্য্য জগদীশের অপূর্ব্ব গবেষণা শুনিয়া ও তাঁহার যন্ত্রের অসাধারণ সূক্ষ্মতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রভূত প্রশংসা করেন ও বেতার সহযোগে এই প্রশংসা-বার্ত্তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, জগদীশচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও কলিকাতার বসু-বিজ্ঞান-মন্দির জগতের বৈজ্ঞানিকগণের একটি তীর্থস্থলে পরিণত হইবে।

গত কয়েক মাস ধরিয়া আমরা প্রবাসীতে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের যে পত্রাবলী প্রকাশ করিতেছি, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় কি প্রতিকূল ঘটনার সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ২৫ বৎসর ধরিয়া অদম্য উৎসাহে এই বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি যে আজ জয়ী হইয়া বিশ্বের কাছে নিজের মনীষা প্রদর্শন ও ভারতের সম্মান রক্ষা করিলেন, ইহা পরপদানত বাঙালী জাতির একজনের পক্ষে সত্যই অঘটন সংঘটন। এই

চিঠিগুলি হইতে আমরা দেখিতেছি, ভারতের শুভসাধনায় তিনি কি ভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন; তাঁহার মনের গোপন কক্ষে পতিত ভারতের উন্নতির জন্য কি বিপুল ব্যগ্রতা; বৈজ্ঞানিক হইয়াও অন্তরে অন্তরে তিনি কত বড় কবি!

বিজ্ঞানের চর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি স্বদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অভিযোগের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। অতীত ভারতের মহান্ গৌরবের আদর্শ তিনি নিরন্তর সম্মুখে রাখিয়াছেন—ভারতবর্ষকে জগতের চক্ষে সম্মানার্হ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অহরহ ব্যস্ত। তাঁহার মত স্বদেশপ্রীতি আমরা ক্বচিৎ দেখিয়াছি। যে-কেহ বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে একবার পদার্পণ করিয়াছেন তিনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি নিবিড় টান; ভারতের সোনার ভবিষ্যতের কি মহান্ স্বপ্ন তিনি দেখিতেছেন!

আজ তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে করিয়াছেন—আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করা। দেশের মহৎ ও মনীষাশালী ব্যক্তিদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমরা যেন দেশের অকল্যাণ না করি। এই অনাদর ও উপেক্ষা দেখাইতে গিয়া আমরাই বঞ্চিত হইব।

১৩৩৫ পৌষ

আচার্য্য বসুর সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব

গত ১লা ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞানমন্দিরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মদিবসের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। আমরা সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া কয়েকটি কথা মাত্র বলিব।

উৎসবের আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ প্রণীত "জনগণমন অধিনায়ক, জয় হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা" গানটি শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী প্রভৃতি দ্বারা গীত হয়। তাহার পর অধ্যাপক কালিদাস নাগ উৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রচিত যে কবিতাটি পাঠ করেন, তাহা কবির হস্তাক্ষরে অন্যত্র মুদ্রিত হইল। তাহার পর দেশবিদেশে হইতে আগত বহু টেলিগ্রাম ও চিঠি বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ পাঠ করেন। ফরাসী মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁর চিঠিটি মূল ফ্রেঞ্চ ভাষায় পড়িয়া ইংরেজীতে অনুবাদ করেন অধ্যাপক কালিদাস নাগ। তৎপরে বহুসংখ্যক অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়। প্রথমে আচার্য্য মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে আমাকে তাঁহাদের অভিনন্দন- পত্র পাঠ করিতে বলা হয়। তাহা পড়িবার পর আমি মৌখিক পিছু বলিয়াছিলাম। আমি যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা অপেক্ষা অধিক

আনন্দিত কেহ হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে সেখান হইতে যোগ দিতেছেন। তিনি এই আশা পোষণ করিতেন, যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও অচিরে জগৎকে নূতন কিছু শিখাইবে। বসু মহাশয়ের বিজ্ঞানমন্দির তাঁহার জীবিত কালে নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কল্পনানেত্রে দেখিতেন, যে, বসু বিজ্ঞানমন্দিরে নূতন জ্ঞানলাভার্থ বিদেশ হইতে বিদ্যার্থীর আগমন হইবে। সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। নিবেদিতার সহিত সমসাময়িক সমুদয় ভারতীয় মনীষীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই। ঘনিষ্ঠভাবে যাঁহাদের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে জানিয়া যেমন তিনি ভারতের প্রতি ভক্তিমতী হইয়াছিলেন ও ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আচার্য্য বসুকে জানিয়া ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তিনি উজ্জ্বল দেখিয়াছিলেন।

"রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুকে যে কবিতা দ্বারা আজ অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রথম অভিনন্দন নহে। মানুষ কীর্ত্তিমান্ হইবার পর তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহাতে বিশ্বাস ঘোষণা অনেকেই করে। কিন্তু কবি একত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন জগদীশচন্দ্র এখনকার মত বিখ্যাত হন নাই, তখন লিখিয়াছিলেন :—

বিজ্ঞান লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে
হে বন্ধু গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে
সে ধ্বনি গম্ভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হয়ে সিন্ধু পার।
আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্ব্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে।

যে কবির কণ্ঠ দিয়া 'ক্ষীণ মাতৃস্বর' নিঃসৃত হইয়াছিল, তিনি এখন ত অজ্ঞাত অখ্যাত নহেনই—তখনও ছিলেন না—এবং সেই ক্ষীণ মাতৃস্বরের প্রতিধ্বনি আজ দেশ-বিদেশে উঠিতেছে।

"আঠাশ বৎসর পূর্ব্বে আর এক মনীষী বসু মহাশয়কে অসাধারণ প্রতিভাশালী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ১৯০০ সালে প্যারিসে লিখিয়াছিলেন :—

"আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হ'তে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র,—এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগ্‌দেশ-সমাগত সজ্জনসঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহা কেন্দ্রে ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার

অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভমণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস! একা যুবা বাঙালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুৎসঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলে! সমগ্র বৈদ্যুতিকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ— জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন গেহিণী যে দেশে যান, সেথাই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতি।" পরিব্রাজক, ১২২।২৩ পৃষ্ঠা।

"আমি আচার্য্য মহাশয়ের অযোগ্য ছাত্র, বিজ্ঞান শিখিতে পারি নাই, তাঁহার পথের পথিক হই নাই। কিন্তু তাঁহার কৃতিত্ব সকলকেই আশা ও বল দিতে পারে। * তপস্যা ও সাধনার ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও শক্তি এক। ভারতবর্ষে যিনি যে ক্ষেত্রেই সিদ্ধিলাভ করুন না, সংগ্রামে তাঁহার জয় অন্য সকলকেই এই শিক্ষা দিতে পারে, যে, ভারতীয়দের কিছু করিবার শক্তি আছে, জগৎকে নূতন কিছু দিবার আছে। আধুনিক কালে বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে আচার্য্য বসুই প্রথমে দেখাইয়াছেন, ভারত কেবল দেনদার নয়, ঋণী নয়, ভিক্ষুক নয়, ভারতের কিছু দিবার আছে। তাঁহার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত।"

* ইহার অনুরূপ কথা প্রাক্তন ছাত্রদের অভিনন্দনে ছিল। যথা—

"We rejoice that your heroic march into the citabel of the unknown in science has been hope inspiring not only in the realm of scientific endeavour but in other field of thought and activity as well in the Motherland."

অতঃপর আরও কতকগুলি অভিনন্দন পঠিত হয়। তাহার কোন কোনটি হইতে দুএকটি কথার উল্লেখ করিতেছি। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক মোলিশ তাঁহার অভিনন্দনের শেষে বলেন :—

As a representative of the West I wish to convey our heartiest congratulation to you as a leading plant-physiologist. It is my good fortune that I should be the first plant-physiologist from the West who has come to your Institute to cement the bond of intellectual co-operation between the Orient and the Occident. The extraordinary twin trees from a single seed of the palm will be a symbol of this and we shall plant it together. And though we may not gather the fruit of what we sow today, yet we believe in a future which transcends all our hopes.

জ্ঞানরাজ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সহযোগিতার প্রতীকস্বরূপ একটি নারিকেল হইতে জাত যমজ গাছ দুটি আচার্য্য বসু ও অধ্যাপক মোলিশ একত্র রোপণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের সভাপতি ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় ঐ বিভাগের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন পত্র রচনা ও পাঠ করেন, তাহাতে বসু মহাশয়ের কার্য্য ও প্রতিভার যথার্থ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে কেবল দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"The first and greatest of instruments of which you are the master, the instruments. which has been the maker of your other instrument is your synthetic vision—a poetic faculty which

you have harnessed to the great task of a scientific exploration of the universe. This synthetic vision is a peculiarly Indian gift and is associated in you with other characteristically Indian elements, a power of yogic concentration—the capacity of identifying oneself with the object of one's contemplation, a gift of generalisation and abstraction and, above all, the intuition of the unity of all being and all life."

বৃহত্তর ভারত পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার যে অভিনন্দন পাঠ করেন, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন :—

"আমাদের পরিষদ ভারতবর্ষের অতীত কৃতিত্ব ও কীর্ত্তির চর্চ্চা করে। তাহার গৌরব করিবার অধিকার তখনই বৈধ ও সত্য হয়, যখন আপনার মত একজন প্রতিভাশালী জীবিত ভারতসন্তান দেখান, যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টাদের বংশ একেবারে লুপ্ত হয় নাই।"

রমাঁ রলাঁ তাঁহার কবিত্বপূর্ণ চিঠিটিতে বলেন, "আমা অপেক্ষা যোগ্যতর লোকেরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মহিমা গান করিবে। আমি ঘোষণা করিতেছি সেই সত্যদ্রষ্টা আপনার মহিমা যিনি বৃক্ষত্বকের ও পাষাণের আবরণে লুক্কায়িত প্রকৃতির মর্ম্মকথা জগৎকে শুনাইয়াছেন।" (ইহা সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য মাত্র।) "হে সৌম্য জাদুকর, আপনাকে নমস্কার করি।"

চীনের বর্ত্তমান রাজধানী নাংকিঙের ন্যাশন্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট হইতে টেলিগ্রাম আসে :—

"Many happy returns to life devoted to discovering ultimate truth and mystery of life. The world looks to you to lift science into the realm of spiritual reality. All Asia shares in your glory."

তাৎপর্য্য। "চরম সত্য জীবনের রহস্য আবিষ্কারে উৎসর্গীকৃত আপনার জীবনে জন্মদিনের এই উৎসবের এই আনন্দ আরও বহুবার আসুক। জগৎ আপনার নিকট এই আশা করে, যে, আপনি বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার রাজ্যে উন্নীত করিবেন। সমুদয় এশিয়া আপনার গৌরবের অংশী।"

উৎসবের মধ্যে আরও দুটি গান হয়; একটি শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর, অপরটি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

অভিনন্দনের শেষে আচার্য্য বসু সংক্ষেপে ইংরেজীতে উত্তর দেন। তাহাব একটি অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"আমি গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, যে সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, জ্ঞানের সীমা বিস্তারার্থ জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কিছু দান করিয়া জাতিসংঘের মধ্যে তাহার একটি সম্মানিত স্থান অর্জ্জন করিবার জন্য তাহা করিয়াছি। জগৎ আজ যুযুৎসু দুই দলে বিভক্ত; তাহার ফলে সভ্যতার লোপের আশঙ্কা ঘটিয়াছে। জগদ্ব্যাপী ধ্বংসনিবারণের এক উপায় আছে—তাহা সকল মানবের হিতার্থ মনোরাজ্যে সহযোগিতা। ইহাই প্রাচ্যের বাণী। চীন যে বিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিক সত্তার জগতে উন্নীত করিতে বলিয়াছেন, তাহা এই বাণীরই নবতম দ্যোতন। তাহাতে এই সত্যই ঘোষিত হইয়াছে, যে, সকলের মধ্যে প্রাণের একত্বের মত সকল মানবের মহৎ অভিলাষনিচয়ের একত্ব সম্পাদন করিতে হইবে—কেবল তাহার দ্বারাই মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা নিশ্চিতরূপে রক্ষিত হইতে পারে।

"আমার সমুদয় চেষ্টার মধ্যে আমি কখনও সম্পূর্ণ একাকী ছিলাম না। আমরা যখন উভয়েই

অপ্রসিদ্ধ ছিলাম, তখন আমার চিরবন্ধু রবীন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে ছিলেন। সেই সব সংশয়ের দিনেও তাঁহার বিশ্বাস কখনও টলে নাই।

"আমার সম্মুখে আমার অনেক প্রাক্তন ছাত্রকে দেখিতেছি যাঁহারা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চতম দায়িত্ব ও বিশ্বাসভাজনতার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের কৃতিত্ব আমার জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। আমি কেবল তাঁহাদের কথাই বলিতেছি না যাঁহারা যশ ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য অনেকের কথাও বলিতেছি যাঁহারা পৌরুষের সহিত জীবনের দুর্ব্বহ ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন এবং যাঁহাদের পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাময় জীবন অনেকের দুঃখময় জীবনে আনন্দের রশ্মি সঞ্চার করিয়াছে।"

১৩৪৪ পৌষ

জগদীশচন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণে সমগ্র পৃথিবী, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি গত কয়েক বৎসর আগেকার মত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছিলেন না বটে—ব্যাধিতে তাঁহার দেহ অপটু হইয়াছিল; কিন্তু তিনি পরামর্শ, উপদেশ ও পরিচালনা দ্বারা অনেককে গবেষণার পথে অগ্রসর করিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে বহু বৈজ্ঞানিক প্রেরণা লাভ করিতেছিলেন।

আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, ডারুইন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্থান যে-শ্রেণীতে, জগদীশ চন্দ্রের স্থানও সেই শ্রেণীতে। ইহা শুধু অবৈজ্ঞানিক আমাদের মত নহে। বৈজ্ঞানিক কেহ কেহও এইরূপ মনে করেন, এবং আমবা মনে করি, যে, যত সময় যাইবে ততই অধিকসংখ্যক বৈজ্ঞানিক তাঁহার কার্য্যের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

ভাস্করাচার্য্যের পর বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ বিজ্ঞান জগতে নূতন কিছু করে নাই। জগদীশ চন্দ্রের নানা আবিষ্ক্রিয়া বিজ্ঞানে ভারতের নব জাগরণের সূচনা করে। কেবল সূচনাই যে করে, তাহা নহে। তিনি ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এরূপ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করেন, যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অপরিজ্ঞাত—হয়ত অচিন্ত্য—ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতীয়দিগকে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের লোকেরা স্বপ্নবিলাসী এবং কেবল কাব্যে ও দর্শনে কিছু কৃতী মনে করিত। এরূপ জাতির মধ্যে জন্মিয়া, "বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমরাও করিতে পারি", এই বিশ্বাস পোষণ করিবার সাহস ও পৌরুষ তাঁহার ছিল, এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিবার মত দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা তাঁহার ছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত কোন কোন তত্ত্ব বিনা দ্বন্দ্বে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও উদ্ভিদ্-ও জীব-বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার মহৎ আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞানজগতে তিনি এক জন বড় যোদ্ধা। যদি তাঁহার কোন কোন মত এখনও সকল বিজ্ঞানবিৎ

স্বীকার না-করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরে করিতে পারেন। কারণ, মানুষের অন্য কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে যেমন কেহ কেহ তাঁহাদের সমসাময়িকদিগের আগেই এমন অনেক মতের, পথের ও সত্যের সূচনা করেন যাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সমসাময়িকেরা তখনও অর্জ্জন করে নাই, অতীত কালে বিজ্ঞান জগতেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; বসু মহাশয়ের কোন কোন গবেষণা সম্বন্ধেও তাহা সত্য হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতেও এমন মানুষ জন্মিবেন যাঁহারা অগ্রদূত।

এখন কলেজের ছাত্রেরাও গবেষণা করে এবং কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে। জগদীশ চন্দ্র যখন গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন, তখন ছাত্রদের কথা দূরে থাক্, ভারতবর্ষে তখন বিজ্ঞানাধ্যাপকের প্রধান পদগুলির দখলিকার ইংরেজ অধ্যাপকেরাও গবেষণা করিতে পারিতেন না ও করিতেন না—কেবল মোটা বেতনটা লইতেন। জগদীশ চন্দ্রের কৃতিত্বে এই জন্য ভারতবর্ষীয় তরুণ বিজ্ঞানাধ্যায়ীদিগের মনে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাঁহার অতি মূল্যবান "আত্মচরিত" গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :

"বসু পরে উদ্ভিদের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়জগৎ সম্বন্ধে-যে যুগান্তরকারী সত্য আবিষ্কার করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান এ নয়। সে বিষয়ে কিছু বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একটি বিষয়ে বলাই আমার উদ্দেশ্য—ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অপূর্ব্ব আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগৎ কর্ত্তৃক কি ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং নব্য বাংলার মনের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" —১৫৮ পৃষ্ঠা।

"একজন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতা বাংলা কাউন্সিলে একবার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, যে, আইন এদেশের বহু প্রতিভার সমাধিক্ষেত্রস্বরূপ হইয়াছে।" ১৫৯ পৃষ্ঠা।

"বাঙালী প্রতিভার ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব, ধীরে ধীরে হইলেও, নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।" ১৫৯ পৃষ্ঠা।

পাছে কেহ ভুল বুঝেন, এই জন্য এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক। জগদীশ চন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কার ভারতবর্ষের পক্ষে আধুনিক যুগে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করায় কেহ যেন মনে না-করেন, গবেষকবহুল ও বৈজ্ঞানিকবহুল পাশ্চাত্য কোন দেশের পক্ষে তাঁহার গবেষণা ও আবিষ্কার বিস্ময়কর হইত না। সেখানেও বিস্ময়কর নিশ্চয়ই হইত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন আচার্য্য বসুর একটি গবেষণা সম্বন্ধে ত বলিয়াইছিলেন, "ইহা আমার মনকে বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়াছে।" আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, যাহা বিজ্ঞানোজ্জ্বল কোন দেশেও প্রশংসনীয় হইত, তাহা বিজ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত তাৎকালিক ভারতবর্ষে অধিকতর শ্লাঘনীয় হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্র জীবিতকালে প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া নিদ্রালস বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, নিন্দায় কখনও দমিয়া যান নাই। এখন তিনি নিন্দা-প্রশংসার অতীত লোকে গিয়াছেন।

আচার্য্য বসুর গবেষণার বিষয়

আচার্য্য বসুর গবেষণার বিষয় ছিল প্রথমতঃ পদার্থবিদ্যার তড়িৎশাখার কোন কোন বিষয়। সেগুলির কিঞ্চিৎ আভাসও এখানে দেওয়া চলিবে না। কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। তিনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভার্থ যে যন্ত্র উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করেন, পরে বে-তার

বার্ত্তা প্রেরণে ব্যবহৃত কোহিয়্যারার (coherer) যন্ত্রের সহিত তাহা প্রায় অভিন্ন, অর্থাৎ তিনিই এইরূপ যন্ত্র প্রথম উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করেন। এই কথাটিই "এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা" নামক ইংরেজী মহাকোষের নূতন, চতুর্দ্দশ, সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডের ৯২৬ পৃষ্ঠায় একটুকু পেঁচাইয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যথা :—

"His first appearance before the British Association at Liverpool in 1896 was to demonstrate an apparatus for studying the properties of electric waves almost identical with the coherers subsequently used in all systems of wireless."

তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ও টাউনহলে বিনা তারে বৈদ্যুতিক শক্তি চালাইয়া প্রাচীরের অন্তরালে স্থিত পিস্তল আওয়াজ ও ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তাঁহার যন্ত্রের কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহা মার্কোনির বেতারবার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র প্রচারিত হইবার আগেকার কথা।

তাঁহার কোহিয়্যারার-সদৃশ যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি দেখেন, তাহার মধ্যস্থিত ধাতুখণ্ডগুলি জীবের পেশীর মত কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, আবার বিশ্রামের পর বা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে কার্য্যক্ষম হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ অনুসন্ধিৎসাকে জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবের সাদৃশ্য ও ঐক্য নির্দ্ধারণের দিকে চালিত করেন, এবং তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। উক্ত এন্সাইক্লোপীডিয়াতে সংক্ষেপে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা :—

"His discovery of a parallelism in the behaviour of the receiver to the living muscle led him to systematic study of the response of inorganic matter as well as animal tissues and plants to various kinds of stimulus. After laborious researches he proved to the satisfaction of various scientific bodies that the life mechanism of the plant is identical with that of the animal."

বসু মহাশয়ের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়ার বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় এখনও বাহির হয় নাই। তাহার কিছু পরিচয় পরলোকগত অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিস্তৃততর ও সংক্ষেপে সম্পূর্ণ পুস্তক রচনা ও প্রকাশের দুটি প্রধান বাধা আছে। বাংলায় অনেক পারিভাষিক শব্দ নাই, কিন্তু সংস্কৃতের সাহায্যে তাহা রচিত হইতে পারে। তাহা করিবার ও বহি লিখিবার লোক পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বাধা, এরূপ বহি প্রকাশিত হইলে কিনিবে কে ও পড়িবে কে? কিনিবার ও পড়িবার কিছু লোক পাওয়া যাইবে বটে। কিন্তু পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যয়ের সংকুলান তাহাতে না হইবারই কথা। অতএব, এই অত্যাবশ্যক কাজটির জন্য যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ টাকা তুলিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে বাঙালীদের একটি কর্তব্য করা হয় এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়ে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নানা বিষয়ে নানা রকমের হইয়া থাকে। বসু মহাশয় মানবজ্ঞানের যাহা গোড়াকার কথা, এরকম নানা বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, এবং বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রাণের, জীবনের, ও জৈব মূল পদার্থের (protoplasm এর) প্রকৃতি, অজৈব জড়ের ও জৈব পদার্থের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, জীব ও উদ্ভিদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রভৃতি নানা কঠিন প্রশ্ন তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। তিনি প্রকৃতিদেবীর গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃপুরে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার কারখানার গোপন কথা

জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধনায় যত দূর সিদ্ধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর।

বসু মহাশয়ের গবেষণা ও দর্শন

বসু মহাশয়ের কোন কোন গবেষণা দার্শনিকদিগের, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের জ্ঞানের পরিধিবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। ইহা তাঁহার ঐক্যসাধনা ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে সিদ্ধির পরিচায়ক। ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায়, যে, তিনি বৈজ্ঞানিক না হইয়া দার্শনিক হইবার ইচ্ছা করিলে দার্শনিকদিগের মধ্যেও অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। তাঁহার ঐক্যসাধনার তিনটি দিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনসমাজে প্রচলিত ভাষায় যাহাদিগকে অচেতন-জড়, উদ্ভিদ ও জীব বলা হয়, তাহাদের মধ্যে তিনি সাদৃশ্য ও সমধর্ম্মিতা আবিষ্কার করেন; বিজ্ঞানের নানা শাখার মধ্যে তিনি একাত্মতা উপলব্ধি করিয়া বিজ্ঞানের অখণ্ডত্বের আভাস দেন, এবং বিজ্ঞানের ও দর্শনের জগৎ দুটি যে সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তাহাও তাঁহার গবেষণা দ্বারা উপলব্ধ হয়। নানা দিকে এইরূপ ঐক্যের অনুসন্ধান করা এবং তাহার সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া বসু মহাশয়ের প্রতি ভার ভারতীয়ত্বের পরিচায়ক। এই কারণেই হয়ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁহার কোন কোন গবেষণার সত্যতা বুঝাইতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

আর একটা কারণ, তিনি কোন কোন বিষয়ে ছিলেন অগ্রদূত, অগ্রনায়ক, পথনির্ম্মাতা (pioneer)। ইহার আভাস অধ্যাপক বীরবল সাহনীর জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধীয় লেখাটিতে পাওয়া যায়। ডক্টর সাহনী বর্ত্তমানে জীবিত রয়্যাল সোসাইটীর ভারতীয় তিন জন ফেলোর এক জন। তিনি বলেন, "...it is possible that he was well ahead of the times..."। "সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন।"

যন্ত্রোদ্ভাবক জগদীশ চন্দ্র

অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অন্যের উদ্ভাবিত ও নির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা গবেষণা করিয়াছেন। বসু মহাশয়কে অনেক বিস্ময়কর এবং অতিসূক্ষ্ম -পরিবর্ত্তনপ্রদর্শক (delicate) যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে ও নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল। এখানে কেবল একটির উল্লেখ করিব। তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ—বাংলায় বৃদ্ধিমান যন্ত্র বলা যাইতে পারে। এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মতে এই যন্ত্র অতি সামান্য বৃদ্ধিকে এক কোটি গুণ বড় করিয়া দেখাইতে পারে—ইহার বৃহদীকরণ শক্তি (magnifying power) এক কোটি গুণ (ten million times)। ভাল অণুবীক্ষণগুলির বৃহদীকরণ শক্তি এখন যন্ত্রনির্ম্মাতারা কত বেশী করিতে পারিয়াছেন জানি না, বোধ হয় দু-তিন হাজার গুণের বেশী হইবে না। কিন্তু বসুর বৃদ্ধিমান যন্ত্রের বৃহদীকরণ শক্তি এক কোটি গুণ। অর্থাৎ কোন উদ্ভিদ যদি রস আকর্ষণ করিয়া এক ইঞ্চির এক-কোটিতম অংশ (১/১০০০০০০০) বাড়ে, তাহা হইলে এই যন্ত্র দেখাইবে, যে, উহা এক ইঞ্চি বাড়িয়াছে।

অতিসূক্ষ্মপরিবর্ত্তনপ্রদর্শক এইরূপ সব যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য্য বসু এমন সব ব্যাপার মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, যাহা অভাবনীয় ছিল। তিনি তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরে দেখাইয়াছিলেন, মানুষের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, যে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে গাছ কেমন বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদেরও হইয়াছিল।

এই রকম যন্ত্র তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ম্মাণ করিতে পারে, তিনি এইরূপ সুনিপুণ এক জন বাঙালী কারিকর পাইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছিলেন। কোন এক ব্যক্তি (বৈজ্ঞানিক) অধিক বেতনের লোভ দেখাইয়া এই কারিকরটিকে ভাঙাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বসু মহাশয়ের কাজ বন্ধ হয় নাই। তিনি অন্যান্য কারিকরকে শিখাইয়া লইয়াছিলেন। অসূয়াপরবশ ঐ বৈজ্ঞানিকের নাম করিব না। তাহা সহজে অনুমেয়।

আচার্য্য বসুর আত্মসম্মানবোধ

আচার্য্য বসু যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে গবর্ন্মেন্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চান; তাহার কারণ, তিনি ভারতবর্ষীয় লোক। তিনি কম বেতন লইতে রাজী হন নাই, তিন বৎসর কোন বেতনই গ্রহণ করেন নাই। শেষে তাঁহার আত্মসম্মানবোধের জয় হয়—তিনি তিন বৎসরের পুরা বেতন একসঙ্গে পান। তিনি যখন কম বেতন লইতে রাজী না হইয়া বিনা বেতনে তিন বৎসর কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার খুবই অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল ও তজ্জনিত সংগ্রাম চলিতেছিল।

আচার্য্য বসুর বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানানুসরণ

ফাদার লাফোঁ কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। তিনি একবার এক সভায় বলেন, যে, জগদীশ চন্দ্র যদি তাঁহার বেতার যন্ত্রের পেটেন্ট লইয়া ঐ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে মার্কোনীর পরিবর্ত্তে তিনিই বেতারবার্ত্তা প্রেরণের উদ্ভাবক ও পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, এবং, শুধু প্রসিদ্ধ নহে, প্রভূত ধনশালীও হইতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ধনী হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তাঁহার অন্য বহু যন্ত্রের পেটেন্ট লইলেও তিনি ধনী হইতে পারিতেন। কোন কোন পাশ্চাত্য যন্ত্রনির্ম্মাতা কোম্পানী প্রভূত অর্থের বিনিময়ে তাঁহার কোন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার চাহিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হন নাই। তাঁহার কোন কোন পাশ্চাত্য বন্ধু তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার প্রাথম্যের প্রমাণ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার জন্য কোন কোন যন্ত্রের পেটেন্ট লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল, যে, তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রগুলি যাঁহার যোগ্যতা ও ইচ্ছা আছে তিনিই মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করুন।

তিনি মিতব্যয়িতার দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বসু বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য ব্যয় করিয়াছেন ও রাখিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সৎকার্য্যের জন্য দিয়া গিয়াছেন। এই সঞ্চিত ধনের পরিমাণ সতর লক্ষ টাকা।

আচার্য্য বসুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি যন্ত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "শোষণ-গ্রাফ"। তিনি বাংলা লিখিয়াছিলেন কম, কিন্তু যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কবিত্বপূর্ণ, তাহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট। ইংরেজী যাহা লিখিতেন—এবং ইংরেজী পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বিস্তর লিখিয়াছিলেন, তাহাও সাহিতিক উৎকর্ষের জন্য সুবিদিত। বস্তুতঃ তিনি যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করিয়া

সাহিত্যের সেবায় জীবন যাপন করিতেন, তাহা হইলে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মনোজ্ঞ, তেজোগর্ভ, উদ্দীপনাপূর্ণ ও শক্তিসঞ্চারিণী রচনার দ্বারা সাহিত্যকে সম্পৎশালী করিতে ও যশস্বী হইতে পারিতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেন। পরে তিনি উহার সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই পদের কাজ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। গবেষণার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তিনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য- সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার অভিভাষণ ঐ সম্মেলনের অভিভাষণগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমরা যত দূর জানি, প্রবাসীর সম্পাদক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "দাসী" নামক মাসিক পত্রিকার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়, তাহাই মাসিকপত্রে তাঁহার প্রথম রচনা। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদুগীতি এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্র-প্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; বহু-দূর- প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল* এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্ব্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত উর্দ্ধে উঠিতেছি, বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণবায়ু দেবধূপের † সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমস্ত পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে: সেই সঙ্গে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষারপর্ব্বতের বজ্রনিনাদ, স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয়

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার-শিখর দেখা যায়। একটির নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

† তুষারক্ষেত্রজাত এক প্রকার সুগন্ধ গুল্মবিশেষ।

করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে; তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিণী নন্দদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম।

মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের রূপ পরস্পবের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

জগদীশচন্দ্র ও সুকুমার শিল্প

আগে বলিয়াছি, জগদীশচন্দ্র যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সাহিত্যসৃষ্টিতে মন দিতেন, তাহা হইলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারিতেন। কবি-প্রতিভার অনুরূপ প্রতিভা তাঁহার ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সুকুমার শিল্পের, ললিতকলার, অনুশীলন করিলে, তাহাতেও কৃতী হইতে পারিতেন। বসুবিজ্ঞানমন্দির, তাহার উদ্যান ও অন্যান্য অংশের পরিকল্পনায় তাঁহার শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বসু-বিজ্ঞান- মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের চিত্র অন্যের অঙ্কিত, কিন্তু পরিকল্পনা তাঁহার। তাঁহার বাড়ীর বৈঠকখানায় প্রাচীরগাত্রে এবং ছাদের ভিতর পিঠের উপর অঙ্কিত ছবিগুলি অন্যের আঁকা। কিন্তু কি আঁকিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। একটি প্রাচীরের গাত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মাতৃমূর্ত্তি" অঙ্কিত আছে।

কথিত আছে, ম্যাক্সিম-কামান ও নানাবিধ আকাশযানের উদ্ভাবক বিখ্যাত যন্ত্রনির্ম্মাতা সর্ হীর্‌য়াম্ ম্যাক্সিম জগদীশচন্দ্রের নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার হাতখানি দেখিতে চান। তাহা দেখিয়া ও নাড়িয়া-চাড়িয়া বলেন, এরূপ সূক্ষ্ম অনুভবশক্তিসম্পন্ন হাত কেবল হিন্দুরই হইতে পারে। যে প্রতিভা ও সূক্ষ্ম স্পর্শশক্তি তাঁহাকে বিস্ময়কর নানা যন্ত্র-উদ্ভাবনে সমর্থ করিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে চারুশিল্পের সাধনাতেও সিদ্ধি দিতে পারিত, যদি তিনি সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। কবি ও শিল্পী হইতে হইলে যে সৌন্দর্য্যবোধ, যে সুষমার উপলব্ধি, যে রসানুভূতি আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আকস্মিক নহে। উভয়ের প্রকৃতি ও প্রতিভার সাদৃশ্য এই বন্ধুত্বের কারণ। আমরা তাহা অনুভব করিতাম। কবি নিজেও তাহা বলিয়াছেন।

দেশী জিনিষের প্রতি জগদীশ চন্দ্রের অনুরাগ

ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গীয় পণ্যশিল্পজাত নানা সামগ্রী জগদীশ চন্দ্রের প্রিয় ছিল। ইহা যাঁহারা না-জানেন, তাঁহার গৃহসজ্জা হইতে তাহা অনুমান করা তাঁহাদের পক্ষেও সহজ।

বঙ্গের পল্লীগ্রামের জীবন এবং পল্লীগ্রামবাসী লোকদের খাদ্য তাঁহার কিরূপ প্রিয় ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব।

একবার তিনি বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। তখন অপরাহ্নের জলযোগের সময়। উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আসিল। তিনি বলিলেন, এ-সব রাখ; মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা আন। তাহা আনা হইলে কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে লাগিলেন। যাহাতে মুড়ি মিয়াইয়া না যায়, সেই জন্য তাঁহার

মুড়ি কাচের ছিপিযুক্ত বড় কাচের পাত্রে রাখা থাকিত।

জগদীশ চন্দ্রের ভারতভক্তি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা

আচার্য্য বসুর সহিত যাঁহারা মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তিনি কিরূপ ভারতভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও তাঁহার সহিত যে ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের গভীর যোগ ছিল, ইহা তাহার প্রধান কারণ।

পরমার্থ চিন্তায় জগদীশ চন্দ্র

জগদীশ চন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং বৈদান্তিক মত যেরূপ বুঝিতেন তদনুসারে বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন উপাসনায় ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আরাধনা পাঠ করিতেন। প্রার্থনা তিনি কিংবা তাঁহার সহধর্ম্মিণী, যেদিন মনের ভাব যেরূপ হইত, সেইরূপ করিতেন। কবি রজনীকান্ত সেনের নিম্নমুদ্রিত গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল :—

কেন বঞ্চিত হব চরণে!
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা! তাই যদি নাহি হবে গো,
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,—
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে পাযে ব'সে "পার কর" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারী!
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ, তার,
এ কি সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু মরমে।

আচার্য্য বসু তাঁহার একটি বক্তৃতার শেষে বিশ্বের একত্ব সম্বন্ধে ইংরেজীতে ঋষিদের বাক্য বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি,
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ,
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্।"

"সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একেশ্বর যিনি আপনার এক রূপকে বহু করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ (আপনাদের মধ্যে স্থিত) দেখেন, তাঁহাদের সুখ শাশ্বত, অন্যদের নহে।"

বহুর মধ্যে এককে যিনি জানেন, তিনিই সত্য জানিয়াছেন, অন্যেরা নহে, এই মর্ম্মের উপনিষদ্‌বাক্য তাঁহার প্রিয় ছিল। বহুর মধ্যে এই একের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন।

পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কর্ম্মের পথ, রসানুভূতির পথ, ও জ্ঞানের পথ তাঁহার অধিগম্য ছিল, এবং তিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর বৈজ্ঞানিক শিষ্যবৃন্দ

১৩০৮ ভাদ্র

[প্রফুল্লচন্দ্রের আবিষ্কার]

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে Annalen der Chemie নামক সুপ্রতিষ্ঠিত জর্ম্মান রাসায়নিক পত্রে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারদঘটিত গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া সমূহের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। এই পত্রের সম্পাদকগণ বিখ্যাত রাসায়নিক। তাঁহারা অধ্যাপক রায়ের গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া সমূহের অপূর্ব্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

১৩০৮ অগ্রহায়ণ-পৌষ

সাহিত্যিক।

[ইংরেজীতে প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-গ্রন্থ]

প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি. এস্‌সি কয়েক বৎসর হইতে প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহারা সেকালে এবিদ্যার কতটা উন্নতি করিয়াছিলেন, তিনি তাহার ইতিহাস লিখিতেছেন। এতদর্থে তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ কবিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি এবিষয়ে আর্থিক ও অন্যবিধ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার পুস্তকের প্রথমখণ্ড যন্ত্রস্থ হইয়াছে। ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রয়েল আটপেজী আকারের আনুমানিক ৪৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। তন্মধ্যে গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপক্রমণিকা প্রায় ১০০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। গ্রন্থকার ঋগ্বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদে alchemy তে বিশ্বাসের সূচনা পাইয়াছেন. দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদের সময়ের আর্যেরা সোমরসকে এক প্রকার “রসায়ন” মনে করিতেন। অথর্ব্ববেদ হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। আয়ুর্ব্বেদ একটি অথর্ব্ববেদোপাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথমভাগের নাম আয়ুর্ব্বেদিক যুগ রাখা হইয়াছে। ইহাতে চরক সুশ্রুতে রসায়ন সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ডাক্তার রায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের এক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—“এই চরক সুশ্রুত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অনেক কথা বলেন। এডিন বরার ডিউগাল্‌ড্ ষ্টুয়ার্ট বলেন, এসকল তথ্য ব্রাহ্মণেরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে চুরি করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। ক্ষার-কর্ম্ম নামে যে অধ্যায় আছে, তাহাতে ক্ষারভেদে আধার পাত্রাদির যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, আমি সেগুলি নিজে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব ফল পাইয়াছি। যদি এই অধ্যায়টি কেবল মাত্র অনুবাদ করিয়া রস্কোর রসায়ন গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া

দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা কোন মতে তাঁহার ন্যায় রসায়নবিদের পক্ষেও লজ্জাকর হয় না।” আয়ুর্ব্বেদিক যুগের পরই তান্ত্রিক যুগ। এই যুগে বহুসংখ্যক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই যুগ আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ বর্ষব্যাপী। পুস্তকের এই অংশে গ্রন্থকার রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরত্নাকর এবং অন্যান্য তান্ত্রিক গ্রন্থ হইতে অনেক সানুবাদ মূল সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তান্ত্রিক যুগে ভারতবর্ষে রাসায়নিক জ্ঞান যতদূর বিকাশলাভ করিয়াছিল, ইউরোপে ঐযুগে রসায়নজ্ঞান তদপেক্ষা অনেক কম ও নিকৃষ্ট ছিল। গ্রন্থকার নিজের এই সিদ্ধান্ত কপ (Kopp) এবং বার্তলো (Berthelot) প্রণীত প্রামাণিক জর্ম্মান ও ফরাশিশ গ্রন্থনিচয় (Geschiete der chemie, Histoire de chimie ইত্যাদি) হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন ও সপ্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে কার্য্যগত রসায়ন (applied chemistry) বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা metallurgy তে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এই অংশে তাহার বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থখানিতে তীর্য্যক্‌পাতন (distillation), অধঃপাতন, ভস্মীকরণ (Incineration) ধাতুসত্ত্বপাতন (extraction of a metal from the ores) ইত্যাদি প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য বহুসংখ্যক কাষ্ঠখোদিত প্রতিকৃতি আছে। পুস্তকখানি দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম। ডাক্তার রায় পরিষদের জন্য রাসায়নিক পরিভাষা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমাদের আশা ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তিনি যেন অবসর মত হিন্দুরসায়নের ইতিহাসের একখানি অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদও বাহির করেন।

১৩২৪ ফাল্গুন

বাঙ্গালী ও অন্য প্রদেশবাসী।

আচার্য্য [জগদীশচন্দ্র] বসু যখন বোম্বাইয়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে মান্দ্রাজে বক্তৃতা করিতেছিলেন, এবং সমাদর লাভ করিতেছিলেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে দিয়া দাদাভাই নৌরোজি মহাশয়ের একটি চিত্রের আবরণ উন্মোচন করান হয়। মান্দ্রাজে তিনি যাওয়ায় বিজ্ঞানচর্চ্চার উৎসাহ ও প্রকৃত দেশপ্রীতি জাগিয়াছে, এবং লোকে বুঝিয়াছে যে অনাড়ম্বর খোসার ভিতরে মনুষ্যত্ব থাকে। আর একটা এই দেখিলাম, যে, যেমন বোম্বাইয়ে নানা ভিন্নপন্থী দলের লোক আচার্য বসুর প্রশংসা করিয়াছে, মান্দ্রাজেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন দলের কাগজ আচার্য রায়ের প্রশংসায় একমত। তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে বক্তৃতার জন্য যে ৭৫০্ টাকা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিয়া আসিয়াছেন। উহার সুদ হইতে “সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ পুরস্কার” নামক একটি বার্ষিক পুরস্কার রসায়নবিজ্ঞানে

গবেষণায় উৎসাহ দিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী গ্রাজুয়েটকে দেওয়া হইবে।

যোগ্য বাঙ্গালীর গুণের আদর বাংলার বাহিরে হয়। আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে অন্য প্রদেশের যোগ্য লোকদের আদর করিতে, এমন কি, অন্য প্রদেশে যে যোগ্যতা থাকিতে পারে তাহা অন্তরে বিশ্বাস করিতে, আমরা রাজী কি না। বাংলাদেশের অভাবের সময়, কিম্বা বাংলাদেশের বা ভারতের কাজে, অন্য প্রদেশবাসীরা যেরূপ টাকা দেন, আমরা কি সমগ্র ভারতের কাজে বা অন্য প্রদেশের অভাবের সময় সেরূপ টাকা দিতে ইচ্ছা করি?

১৩২৫ মাঘ

"বিলাতী" কৌলীন্য।

[প্রফুল্লচন্দ্রের 'সার্' উপাধি]

বিলাতী কুম্ড়া বা বিলাতী বেগুন বাস্তবিক বিলাত হইতে আসিয়াছে বলিয়া "বিলাতী" বিশেষণ পায় নাই। এক সময়ে আলু অর্থাৎ গোল আলুও বিলাতী আলু নামে পরিচিত ছিল; যদিও "পোট্যাটো" জিনিসটির আদিম উৎপত্তিস্থান আমেরিকা। আমরা যখন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া কলেজে পড়িতাম তখন আমাদের এক খোট্টা চাকর শিশিতে-ভরা সরিষার গুঁড়াকে "বেলাতী চিনি" বলিত; সরিষার গুঁড়াও যে বিদেশ হইতে শিশিবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। বিদেশ হইতে নূতন আগত জিনিসকে বিলাতী বলা আমাদের দেশের রীতি। সেই রীতি অনুসারে "সার্" "সী-আই-ঈ," প্রভৃতি উপাধিগুলি দ্বারা যে নববিধ "আভিজাত্য" সৃষ্ট হইতেছে, তাহাকে বিলাতী কৌলীন্য বলা যাইতে পারে।

এই কৌলীন্যের মূল্য কি? বল্লাল সেন যে কৌলীন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিম্বদন্তী এই, যে, তাহার মূলে ছিল— সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা, দান, এই নয়টি লক্ষণ। এখন বিস্তর কুলীন দেখা যায়, যাহাদের চরিত্রে ও আচরণে ইহার একটি লক্ষণও দেখা যায় না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ইউরোপে লোকে শৌর্য্যের জন্য নাইট উপাধি পাইত। বিলাতে এখন মদ বিক্রয় করিয়া ধনী শুঁড়ি নাইট অনেক আছে। আমাদের দেশে বিলাতী কৌলীন্য কি কি গুণ বা লক্ষণ দেখিয়া মানুষকে পাইয়া বসে, তাহা বলা কঠিন। ভারতবর্ষীয় এমন "সার্" আছেন, যাঁহারা সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, কৃতী ও যশস্বী। কিন্তু এমন "সার্" ও আছে, যাহারা অতি দুর্বৃত্ত, গণ্ডমূর্খ, কৃতিত্বহীন ও অখ্যাতিমান্। "সার্"গণ যে প্রত্যেকেই শ্বেত রাজপুরুষদের পদানত, তাহাও বলিবার জো নাই। সুতরাং তোষামোদ ও মেরুদণ্ডহীনতা "সার্"দের সাধারণ লক্ষণ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না, যদিও অনেকের চরিত্রে এই লক্ষণ বিদ্যমান আছে বটে। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে "সার্" উপাধি পাইলেই মানুষটির বাস্তবিক কোন একটা দোষ আছে, ইহা যেমন

ধরিয়া লওয়া যায় না, তেম্‌নি, কোন ভাল গুণ আছে, ইহাও ধরিয়া লওয়া যায় না।

গত ১লা জানুয়ারীর আগে ইহা বলা চলিত, যে, "সার্"দের সকলেরই ধন বা ধনের খ্যাতি, আছে। কিন্তু ঐ তারিখে খবরের কাগজে দেখা গেল, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নাইট উপাধি পাইয়া "সার্" হইয়াছেন। সুতরাং ধনশালিতা "সার্"দের সাধারণ লক্ষণ, এখন আর বলা চলিবে না।

১৩২৫ মাঘ

দারিদ্র্যব্রতীর নাইটত্ব প্রাপ্তি।

[প্রফুল্লচন্দ্র রায়]

ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত দারিদ্র্যব্রতী কেহ নাইট হন নাই। জানি না, এখন তাঁহাকেও মূল্যবান পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইতে হইবে কি না।

ভারতবর্ষের কোন মানুষ "নাইট" হইলে তাহাতে আমাদের সুখের কোন কারণ নাই। তবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নাইটত্ব লাভ, সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের জন্য কিম্বা আইন চিকিৎসাদি বৃত্তিতে কৃতিত্বের জন্য ঘটে নাই, মানসিক সম্পদই উহার কারণ। এই বিশেষত্বে যদি কাহারও কিছু সন্তোষ হয়, তবে তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু যখন উপাধিধারী নির্বিশেষে উপাধিটির কোন মূল্য নাই বলিয়া আমাদের ধারণা, এবং তাহার কিছু কারণও দেখাইয়াছি, তখন আমরা পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বেও আহ্লাদিত হইতে পারিতেছি না। রায় মহাশয় যতদিন চাকরী করিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ ততদিন তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়া, এখন যে সাধারণের নিকট গুণগ্রাহী বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয় বটে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এবং অধ্যাপনায় কৃতিত্বের জন্য নাইট করা হইয়াছে, আমরা ইহা নিঃসংশয়ে ধরিয়া লইতে পারি না। বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠার মূলে প্রধানতঃ তিনি ছিলেন, এবং এখনও তিনি ইহার রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ বা "এক্স্‌পার্ট" এবং অন্যতম পরিচালক। যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত ও সর্‌বরাহ করিবার জন্য নিযুক্ত মিউনিশ্যন বোর্ড (Munition Board) কে এই কারখানা উচিত মূল্যে অনেক রাসায়নিক ও অন্য জিনিস জোগাইয়া সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। আমাদের অনুমান এই, যে, আচার্য্য রায় মহাশয়ের নাইটত্ব লাভের সহিত এই কার্‌খানার উক্ত কার্য্যের সম্পর্ক আছে।

জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় নাইট না হইয়া যদি রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য অর্থাৎ ফেলো অব্ দি রয়্যাল সোসাইটী নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা হইলে আমরা অবিমিশ্র আনন্দ অনুভব করিতে পারিতাম। ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকের রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হওয়ার পথে যে অন্তরায় আছে, তাহা আমরা জানি: কিন্তু তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

অনেক কৃপণ লোকের সম্বন্ধে এরূপ কথা প্রচলিত আছে, যে, তাহারা তাহাদের মায়ের জীবদ্দশায় ভাল করিয়া খাইতে পরিতে দেয় নাই, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধে দানসাগর করিয়াছে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যতদিন পেন্‌শ্যন লন নাই, ততদিন তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষাবিভাগের প্রাদেশিক শ্রেণীতে রাখিয়াছিলেন, উচ্চতম শ্রেণীতে তিনি স্থান পান নাই; শুনিয়াছি অবসর লইবার একদিন আগে, "পিত্তি রক্ষা"র জন্য, তাঁহাকে এই উচ্চতম "ভারতীয়" শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়। অথচ তিনি যতদিন চাকরী করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় যুবক উচ্চতম বিভাগের কাজেও নিযুক্ত হইয়াছেন: ইংরেজ যুবকেরা ত বরাবরই হইয়া থাকেন। এই যুবকেরা প্রত্যেকে বা অধিকাংশ অধ্যাপনায়, জ্ঞানে ও গবেষণায় রায় মহাশয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। এইসব কারণে, তাঁহার সরকারী চাকরীর কাল শেষ হইয়া যাইবার পর, তাঁহাকে নাইট উপাধি দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না।

তিনি আযৌবন দারিদ্র্যব্রতী, বিজ্ঞানভিক্ষু ও জ্ঞান-তপস্বী; ভবিষ্যতেও তাহা থাকিবেন। বড় চাকরী পাইলে বেশী যে টাকা পাইতেন তাহাও দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থ এবং অন্যবিধ লোকহিতে ব্যয়িত হইত। অধিকন্তু শিক্ষণকার্য্যের উচ্চতম বিভাগে তিনি কাজ পাইলে গুণের সমুচিত আদর হইত, দেশে অনেক অসন্তোষ নিবারিত হইত, যুবা বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হইত। তাঁহাকে নাইট উপাধি দেওয়ায় ইহার কোন একটি সুফলও ফলিবে না। আগেকার কালে যখন লোকে সৈনিক উপাধি পাইয়া "পাঁচ-হাজারী", "দশহাজারী" হইত, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরও পাইত। "সার্" উপাধির সঙ্গে এরূপ কোন জায়গীর-লাভ ঘটে না। রায় মহাশয় জায়গীর পাইলে কিম্বা তাঁহার পেন্‌শ্যন বর্দ্ধিত হইলে আনন্দের কারণ হইত। কেন না, তিনি "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়, মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্", নীতির অনুসরণ করেন; এবং দারোগা বা সব্‌ডেপুটি বা গ্রাম্য চৌকীদারের স্মৃতিরক্ষা বা অন্যবিধ পরোক্ষ সরকারী উদ্দেশ্যে স্থাপিত ফণ্ডে টাকা না দিয়াও যখন নাইটত্ব বজায় রাখা যায় দেখিতেছি, তখন জায়গীরের ও বর্দ্ধিত পেন্‌শ্যনের প্রায় সমস্ত টাকাই লোকহিতে উৎসৃষ্ট হইত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

কেহ "সার্" বা অন্যবিধ উপাধি পাইলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়িবার কারণ কেন ঘটে না, তাহা প্রকারান্তরে আগেই বলিয়াছি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, উপাধিলাভ মানে মনুষ্যত্ববৃদ্ধি নহে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় নাইট হওয়ায় অধিক জ্ঞানী, অধিক চরিত্রবান্, অধিক দাতা, অধিক বিজ্ঞানভিক্ষু, অধিক জনসেবক ও স্বদেশপ্রেমিক হইবেন না। কিন্তু অন্যদিকেও সাবধান থাকা দরকার। অনেকে এরূপ মনে করিতে পারে যে যিনি উপাধিলাভের আগে শ্রদ্ধেয় ছিলেন, উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি আর শ্রদ্ধাভাজন থাকিতে পারেন না। ইহা ভুল। বিস্তর লোক সংসারে আছে, যাহারা উপাধিহীন এবং অশ্রদ্ধেয়। আবার এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা উপাধিযুক্ত ও শ্রদ্ধাভাজন। শ্রদ্ধা মানুষের মানসিক শক্তিসম্পদ, চরিত্র ও আচরণের উপর নির্ভর করে। উপাধি পাইবার আগে যদি কেহ মানসিক শক্তিসম্পদ, চরিত্র ও আচরণের গুণে শ্রদ্ধালাভ করিয়া থাকেন, উপাধি পাইবামাত্র তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন না। অবশ্য যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, যে, কেহ উপাধি পাইবার জন্য লোলুপ হইয়া তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছিল কিম্বা উপাধি পাইয়া আপনাকে মনুষ্যত্বে খাট করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা স্বভাবতই কমিয়া

যাইবে। কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রমাণ ব্যতিরেকে যেমন কাহাকেও শ্রদ্ধা করা যায় না, তেমনি মনুষ্যত্ব হ্রাস বা লোপের প্রমাণ ব্যতিরেকেও কাহাকেও শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত করা যায় না।

খাঁটি মানুষ হওয়ার পথে বিঘ্ন অনেক। উপাধি না লওয়া ভাল বটে; কিন্তু "উপাধি লই নাই", কিম্বা "পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছি," বলিয়া "নিরুপাধি" থাকার বড়াই করিবার নিমিত্ত "নিরুপাধি" থাকা প্রশংসনীয় নয়। বস্তুতঃ, সোপাধি ও নিরুপাধি উভয় অবস্থাতেই উপাধি সম্বন্ধে নির্বিকারচিত্ততা মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত।

যাক্, এ বিষয়ে আর বেশী লিখিবার দর্কার নাই।

১৩২৭ আশ্বিন

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিলাতযাত্রা।

আমাদের দেশে কাঁচা মাল—উদ্ভিজ্জ, খনিজ, প্রাণিজ—অসংখ্য প্রকারের পাওয়া যায়। তাহা হইতে মানুষের ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে তদুপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া জানা দর্কার। এই-সমুদয় প্রক্রিয়াতেই সাধারণতঃ কোন-না-কোন প্রকারে রসায়নের জ্ঞান আবশ্যক হয়। কেবলমাত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্যই শত শত কার্খানা ইউরোপে, আমেরিকায় ও জাপানে আছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ও আয়তন হিসাবে এখানে রাসায়নিক কার্খানা অতি অল্পসংখ্যক আছে। যাহা আছে, তাহার কোনটিই বড় নহে। রাসায়নিক কার্খানা চালাইতে হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সকলে রসায়নের জ্ঞান যতটুকু ও যে-ভাবে দেওয়া হয়, তাহা যথেষ্ট নহে। ব্যবহারিক রসায়ন (applied chemistry) জানা চাই, এবং তা ছাড়া কারখানা চালাইবার মত কার্য্যগত জ্ঞানও চাই। এই উভয়বিধ জ্ঞান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আছে। কিন্তু মহাযুদ্ধের পাঁচ বৎসরে কার্খানার রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রভৃতিতে বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। তৎসমুদয় দেখিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কয়েক মাসের জন্য বিলাত পাঠাইয়াছেন। কেন না, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় দানেব সাহায্যে অচিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক রসায়ন শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং তদ্বিষয়ে আচার্য রায় মহাশয় প্রধান পরামর্শদাতা হইবেন, এবং সম্ভবতঃ পরিচালক বা অধ্যক্ষও তিনি হইবেন। তাঁহার বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার বর্ত্তমান গবেষক শিষ্যগণ তাঁহার যে ছবি তুলাইয়াছিলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি।

১৩৪৮ ভাদ্র

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জয়ন্তী

গত ১৭ই শ্রাবণ (২রা আগস্ট) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবনের আশী বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সেই দিন সেই উপলক্ষ্যে কলকাতার সেনেট হাউসে সর্বসাধারণের পক্ষ থেকে জয়ন্তী কমীটি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তা ছাড়া, কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্‌ ও বিজ্ঞান বিভাগ দুটির অভিনন্দনপত্র এবং অনেক সভাসমিতির অভিনন্দনপত্র পড়া হয় ও তাঁকে দেওয়া হয়। অভিনন্দনপত্রের সংখ্যা বেশী হওয়ায় এবং সবগুলি পড়বার সময় না থাকায়, অনেকগুলি সভাসমিতির অভিনন্দনপত্রের কেবল উল্লেখ করা হয় ও সেগুলি আচার্য রায়ের হাতে দেওয়া হয়। ফুলের মালাও তাঁর গলায় কয়েকটি পরাবার পরেই দেখা গেল যে, আরো বেশি পরাতে গেলে সেটা হবে প্রীতিশ্রদ্ধার অত্যাচার; সুতরাং অধিকাংশ মালা স্তূপাকার ক'রে রাখা হয়েছিল।

আচার্য রায়ের বিখ্যাত ছাত্রের সংখ্যা বড় কম নয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সর্‌ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত অভিভাষণ সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল এবং সেটি পড়বার সময় তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, প্রত্যেকটি কথা তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে বেরচ্ছে।

বলা বাহুল্য, সেনেট হাউস ও তার বারাণ্ডা শ্রোতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন।

আচার্য রায় বাংলা ও ইংরেজী অনেক খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। তার অনেকগুলি যে তাঁর লেখা, তা সকলের জানা নাই, কিন্তু অনেক সম্পাদক তা জানেন। যে-গুলি তাঁর নাম দিয়ে ছাপা হয়েছে, সে-গুলি যে তাঁর লেখা, তা সব পাঠক জানেন। তিনি যদি বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক না হ'য়ে সাংবাদিক হ'তেন, তা হ'লে জ্ঞানবান ও নিপুণ সাংবাদিক হ'তে পারতেন; কিন্তু হন নি যে, দু দিক্‌ দিয়ে তা ভালই ক'রেছেন। হ'লে তিনি বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা মানুষের হিত করতে পারতেন না, এবং তাঁর নানা মত ও প্রচেষ্টা তাঁর কাগজ ছাড়া অন্য কাগজে সমর্থিত হ'ত না ও তাঁর প্রশংসায় সব কাগজ মুখর হ'ত না।

তিনি খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে কেবল প্রবন্ধ লিখেই যে সম্পাদকদের ও পরিচালকদের সাহায্য করেছেন তা নয়, তাঁর সাক্ষাৎ চেষ্টা ও পরোক্ষ প্রভাবে দেশে ব্যবসাবাণিজ্য ও কারখানা বৃদ্ধি পাওয়াতেও খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রগুলি নানা প্রকারে উপকৃত হয়েছে। এই জন্যে যখন সেনেট হাউসে অনেক অভিনন্দনপত্র পড়া হচ্ছিল, তখন আমরা ভাবছিলাম ইণ্ডিয়ান জার্ন্যালিস্টস্‌ এসোসিয়েশন আচার্য রায়কে অভিনন্দিত করবেন কি না; কিন্তু দেখলাম তাঁরা তা করলেন না। (১৯শে শ্রাবণ।)

আচার্য রায়ের জীবন শুধু বেঁচে থাকা নয়

ইংরেজী 'লিব' (live) ক্রিয়াপদটির একটি অর্থ 'to enjoy life, to lead a life of varied emotions and experience', 'to get full pleasure, etc. from existence', অর্থাৎ, সংক্ষেপে, 'জীবন সম্ভোগ করা, নানা রকম

ভাববিলাসে ও অভিজ্ঞতায় জীবন যাপন করা', 'বেঁচে থাকার থেকে পুরা মজা পাওয়া।' ইংরেজী 'লিব্' শব্দটির অন্য এবং উচ্চতর অর্থও আছে। কিন্তু মজায়, আরামে, আমোদপ্রমোদে, বিলাসিতায় দিন কাটানও একটা অর্থ। চিরকুমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে ৮০ বৎসর বেঁচে আছেন, তাঁর বেঁচে থাকার মানে ওরকম কিছু নয়।

প্রফুল্লচন্দ্রের আশীবৎসরব্যাপী জীবন গাছপালার জীবন নয়, পশুপক্ষীর জীবন নয়। তাঁর জীবন উচ্চ চিন্তা ও উচ্চভাবের এবং তার অনুযায়ী কাজের জীবন। তাঁর চিন্তা ও তাঁর হৃদয়ের নানা উচ্চ ভাব তাঁকে নানা কার্য্যক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে।

তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নী বিদ্যা শিখে ডী. এস্‌সী (বিজ্ঞানাচার্য) উপাধি লাভ করেন। সেখানে ছাত্র থাকবার কালেই তিনি গবেষণা করতে শিখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর মন তখন নিবিষ্ট থাকলেও তিনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব সম্বন্ধে সেই সময় এমন একখানি বই লিখেছিলেন, যা বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হ'লে, লেখকের কোন শাস্তি না হ'লেও, বইখানি অন্ততঃ নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হ'তে পারত।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেকালে সাধারণতঃ ইংরেজরাই যে-সব উচ্চতর চাক্‌রী পেত, সেরকম কোন উচ্চ অধ্যাপকের পদ তিনি পান নি। তখন তাঁর চেয়ে খুব কম যোগ্যতাবিশিষ্ট ইংরেজ উচ্চ অধ্যাপকপদ পেত, —এখনও পায়। এতে ভারতীয়দের অপমান হয়েছিল, কিন্তু তাঁর অধ্যাপনার উৎকর্ষ কমে নি; গবেষণা দ্বারা নূতন আবিষ্কার করবার ক্ষমতাও তাঁর লোপ পায় নি। তিনিই আধুনিক ভারতের প্রথম রাসায়নিক আবিষ্কর্তা। তিনি শুধু যে বিস্তর ছাত্রকে পাস করিয়েছেন তা নয়, তাঁর অধ্যাপনা, উপদেশ ও পরিচালনায় এবং তাঁর দৃষ্টান্তে তাঁর কয়েক জন ছাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষকও হয়েছেন। বস্তুতঃ, তাঁর দৃষ্টান্তের প্রভাব তাঁর ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, ভারতবর্ষে বাংলা দেশের বাইরে ও তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর বাইরে যে রাসায়নিক গবেষণা বেড়েছে, তা অংশতঃ তাঁর দৃষ্টান্তের ও প্রভাবের পরোক্ষ ফল।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে রসায়নী বিদ্যার উন্নতি কত দূর হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখে এ বিষয়ে জগতের জ্ঞান বাড়িয়েছেন। এই গ্রন্থটি লিখবার জন্যে তিনি অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়েছিলেন। সেই কাজে তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁর সাহায্য করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দু রসায়নী বিদ্যা সম্বন্ধীয় তাঁর ইংরেজী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড লিখেছিলেন মহাপণ্ডিত ডক্টর সর্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। এর দ্বারা গ্রন্থখানির গুরুত্ব বেড়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ইংরেজীতে আত্মচরিত লিখেছেন এবং তার বাংলা অনুবাদও হয়েছে। তা ছাড়া তিনি বাংলায় আরো কোন কোন বই লিখেছেন;—যেমন একখানি সরল সচিত্র প্রাণিবৃত্তান্তের বই। ইংরেজীতে ও বাংলায় তিনি খবরের কাগজে ও সাময়িক পত্রে বিস্তর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে-সব বাঙালী সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় কৃতী হয়েছেন, তাঁদের কারো কারো পরিচয় তিনিই প্রথম সাময়িক পত্রে দিয়েছেন। বাঙালীকে ব্যবসা-বাণিজ্যমুখো করবার জন্যে তিনি, এবং অন্য কোন কোন বাঙালীও, বিস্তর বক্তৃতা করেছেন ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

তাঁর সাহিত্যিক চেষ্টা এই রকম সব রচনার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। সাহিত্যের কাব্য বিভাগেরও

তিনি রসজ্ঞ। দেশী ও বিদেশী বহু কবি ও অন্য মনীষীর বিস্তর কবিতা ও বাণী তিনি আবৃত্তি করতে পারেন। এই সে-দিনও তিনি ক্যালকাটা রিবিয়ুতে শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রতিভা কেবল শিক্ষাদানে এবং নিজের গবেষণা ও ছাত্রদের গবেষণায় সাহায্য করায় পর্য্যবসিত হয় নি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তার দ্বারা নানা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করবার চেষ্টাও তিনি অনেক বৎসর ধ'রে ক'রে আসছেন। কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস্ স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান এখন বৃহৎ যৌথ কারবারে পরিণত হয়েছে। এর দৃষ্টান্তে বঙ্গে ও বঙ্গের বাইরে আরো অনেক রাসায়নিক কারখানা স্থাপিত হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের প্রভাবে শুধু যে রাসায়নিক কারখানাই স্থাপিত হয়েছে, তা নয়, কাপড়ের কল প্রভৃতিও হয়েছে। তিনি এক দিকে সুতা ও কাপড়ের কল, অন্য দিকে চরকার সুতা ও হাতের তাঁতের খদ্দব, উভয়কেই উৎসাহ দিয়ে আসছেন। জলপ্লাবন্ ভূমিকম্প ঝড় প্রভৃতিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্যে তাঁর উৎসাহে সঙ্কটত্রাণ সমিতি স্থাপিত হয়। সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি এর উৎসাহী কর্মীদের মারফৎ এই সমিতি হাজার হাজার বিপন্ন গরীব লোককে সাহায্য করেছেন। তুলা ও চরখা দিয়ে সুতা নেওয়া ও মজুরি দেওয়া এই সমিতির একটি কার্যপ্রণালী।

কারখানা ও কুটীরশিল্পের বিস্তারে দেশের যত ধন আগে বিদেশে যেত, এখন তত যায় না। অনেক বেকার লোকের অন্ন হচ্ছে, এবং পণ্যশিল্পে মানুষের বুদ্ধি খেলছে ও দক্ষতা বাড়ছে।

আচার্য রায় কত ছাত্রকে সাহায্য দিয়ে শিক্ষিত হতে সমর্থ করেছেন, তার কোন হিসাব আছে কি না, জানি না। যত দিন তিনি সরকারী চাকরী করতেন, তাঁর বেতনের একটা বড় অংশ এই কাজে খরচ হ'ত। যখন হ'তে পেন্স্যান নিয়েছেন তখন থেকে পেন্স্যানেরও এইরূপ একটা অংশ ছাত্রদের জন্যে ব্যয়িত হ'য়ে আসছে। সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ'য়ে সেই পদের মোটা বেতন তিনি নেন নি;—তা জমা হ'য়ে সেই থোক টাকার আয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ও গবেষণার সাহায্য হচ্ছে।

এ ছাড়া তাঁর চেষ্টা, প্রভাব ও উৎসাহে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তিনি সাহায্য ক'রে থাকেন। নারীশিক্ষা সমিতি তার মধ্যে অন্যতম।

তিনি রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির প্রভৃতির সদস্য। অনেক বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতির কাজ তিনি করেছেন।

তাঁর নিজের চরিত্র পবিত্র। সমাজের সকল স্তরে তিনি সুনীতি সুরক্ষিত দেখতে চান। কোন ব্যক্তির চরিত্র মন্দ হ'লেও যদি তাকে তার ধন বা সামাজিক মর্য্যাদার খাতিরে সার্বজনিক নানা অনুষ্ঠানে উচ্চ স্থান দেওয়া হয়, তিনি তার প্রতিবাদ করেন।

দুর্বৃত্তদের অত্যাচারে ও সামাজিক কুসংস্কারের দোষে অনেক বালিকা ও নারী নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়ে। নারীকল্যাণ আশ্রম তাদের আশ্রয় ও শিক্ষার স্থান। প্রফুল্লচন্দ্র এর সভাপতি। কেবল নামে সভাপতি নন্—দুর্বল জরাগ্রস্ত দেহ নিয়েও এর কাজ কিছু কিছু করেন এবং এতে টাকাও দিয়ে থাকেন।

তিনি সব রকম সামাজিক কুপ্রথার বিরোধী সমাজ-সংস্কারক। তিনি প্রথমে ছিলেন সরকারী চাকর্য়ে, তার পর এখন সরকারী পেন্স্যনভোগী। কিন্তু যখনই রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তাঁর ডাক পড়েছে, তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন এবং তাঁর অভিভাষণে নির্ভীক ভাবে সত্য কথা বলেছেন। অনেক অবাঞ্ছনীয় ও অনিষ্টকর বিলের দোষ উদ্‌ঘাটন ক'রে তিনি তার প্রতিবাদ ক'রেছেন।

অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, বৈজ্ঞানিক হ'লেই মানুষ নাস্তিক কিংবা সংশয়বাদী হ'য়ে থাকে। কিন্তু, বিজ্ঞানচার্য জগদীশচন্দ্রের মত, প্রফুল্লচন্দ্রও ভগবদ্বিশ্বাসী। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান সভাপতি। কয়েক বৎসর পূর্বে আসাম ও বাংলার ব্রাহ্ম সম্মিলনীর সভাপতি রূপে তিনি যে অভিভাষণ রচনা করেন, তাতে তিনি সমগ্র জাতির উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস, ঈশ্বরের আনুগত্য, ধর্ম এবং সৎচরিত্র কত আবশ্যক, তা বিশদ ভাবে লিখেছিলেন। এই রকম মত তিনি আরো অনেক বার প্রকাশ করেছেন।

যাঁরা তাঁকে দেখেছেন বা তাঁর ছবি দেখেছেন, তাঁরাই তাঁর গরীবানা কাপড়চোপড় দেখে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বিস্মিত হবার কোন কারণ নাই। বাইরের আড়ম্বরের জোরে তিনি বড় মানুষ নন্, অন্তরের ঐশ্বর্যের গুণে তিনি বড়। বাইরের আড়ম্বর তিনি করবেন কি নিয়ে? সামান্য ভাত কাপড় মুড়ি, ভাঙা দু-একটা চেয়ার বেঞ্চি, একটা সেকেলে খাট, নিজের জন্যে রেখেছেন; বাকী সব অন্যকে দিয়ে আসছেন। কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানকে তিনি সাহায্য করেছেন, তার একটা অসম্পূর্ণ ফর্দ সে দিন দৈনিক কাগজে দেখছিলাম। কিন্তু কোন্ কোন্ মানুষকে তিনি সাহায্য করেছেন, তার ফর্দ কে দিতে পারে?

টাকার পরিমাণ হিসাবে তাঁর চেয়ে বেশী দান ভারত বর্ষের বাইরে, ভারতবর্ষে, বাংলা দেশেও অনেকে করেছেন। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রদত্ত জিনিসের সঙ্গে নিজেকেও দান করেছেন। আমেরিকান কবি লাউয়েলের লেখা "The Vision of Sir Launfal" নামক কবিতায় একটি বাক্য আছে, "The gift without the giver is bare," "দাতা যদি নিজেকে নিজের জন্যে রেখে দান করেন, দানের সঙ্গে নিজেকেও না দেন, সে দান যথেষ্ট নয়।" প্রফুল্লচন্দ্র শুধু নিজের যথাসর্বস্ব নয়, নিজেকেও দেশের সেবায় মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

তাঁর জয়ন্তীর দিনে তাঁকে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রগুলির উত্তরে তিনি সর্বশেষে বলেন :—

"বন্ধুগণ যখন আমার দিন ফুরিয়ে যাবে, তখনও আমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকতে চাইব তাদেরই মাঝে যারা অন্যায়, অত্যাচার, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম ক'রে—যত দিন না আমার নির্যাতিত দেশজননীর ললাট থেকে মুছে যায় এই কলঙ্ককালিমা।"

তিনি জাতিধর্মশ্রেণীনির্বিশেষ সকল মানুষকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত ও সচ্ছল দেখতে চান। গরীবদুঃখী গ্রাম্য লোকদের সঙ্গ যে তাঁর প্রিয়, তার কারণ তাঁর মানবপ্রেম। (২০শে শ্রাবণ।)

["প্রবাসী"র আগে আমার "প্রদীপ" নামে একটি মাসিক কাগজ ছিল তাতে আমি প্রায় আধ শতাব্দী আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলাম। কয়েক মাস আগে সেটি "সংহতি" মাসিকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তার পর আবার তাঁর জয়ন্তীর দিনে দৈনিক "বসুমতী"তেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।]

১৩২২ ফাল্গুন

কনিষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক গবেষক।

[জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব অল্পই হইতেছে। অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভাশালী ব্যক্তি ধৈর্য্য, পরিশ্রম ও প্রতিভা দ্বারা জগতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের মত বৃহৎ, বহুজনাকীর্ণ ও প্রাচীন সভ্যতাগৌরবমণ্ডিত দেশের পক্ষে তাহা অতি সামান্য। তাহা হইলেও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। বরং আশার কারণ অনেক আছে।

কোন দেশে কোন যুগে মানুষ যাহা করিয়াছে, অন্য দেশে অন্য যুগেও মানুষ তাহার মত কাজ করিতে পারে। প্রতিভা ও শক্তি কোন দেশে, কালে বা জাতিতে আবদ্ধ নহে। আজ যে জাতি অসভ্য বা দুর্ব্বল বা প্রতিভাহীন বলিয়া পরিগণিত, কাল সে সভ্য, শক্তিমান্ ও প্রতিভাশালী হইতে পারে। এরূপ ঘটনা পৃথিবীব ইতিহাসে বরাবর ঘটিয়া আসিতেছে, এখনও ঘটিতেছে। এখন বিজ্ঞানে যে-সব জাতি উন্নততম, তাহারা ঐতিহাসিক যুগেই নগ্নচিত্রিতদেহ বর্ব্বর ছিল; প্রাগৈতিহাসিক যুগে ত সকলেই বর্ব্বর ছিল। অতএব আমরা যে বিজ্ঞানের উন্নতি লাভ করিতে পারি তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

যে জাতির লোক এক সময়ে সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদের বংশধরদের ত আশান্বিত হইবার অধিকতর কারণ আছে। ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাচীন কালেও সভ্য ছিল, এবং জ্ঞানে অগ্রণী ছিল। বিজ্ঞানেও তাহারা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং আমাদের পক্ষে আশান্বিত হওয়া অযৌক্তিক নহে।

যে জাতি বর্ত্তমান সময়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কিছু সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাদের আশা করিবার কারণ আরো বেশী। আমাদের মধ্যে যদি কেবল ২।১ জন বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকই থাকিতেন, তাহা হইলে শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে ব্যতিক্রমস্থল মনে করিলেও আমরা তাহা মনে করিতাম না; এবং সেরূপ মনে না করা বিন্দু মাত্রও অযৌক্তিক হইত না। কিন্তু ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষকদিগের মধ্যে এখন যেমন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আছেন, তেমনি প্রৌঢ় এবং যুবকও আছেন। আমরা যতদূর জানি, গবেষকদিগের মধ্যে যাঁহাদের পারদর্শিতা বিদেশেও স্বীকৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্-এস্‌সী, ও শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এস্-এস্‌সী কনিষ্ঠতম। ইহাঁদিগকে বালক বলিলেও চলে; কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহাঁরা অনেক রাসায়নিক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণা আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নেলে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি তাঁহারা তাঁহাদের গুরু আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় অপেক্ষাও কৃতী ও যশস্বী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিবেন। অল্পবয়সে সিদ্ধি ও প্রশংসা লাভ করিয়া কাহারও কাহারও মাথা খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা বাস্তবিকই বুদ্ধিমান ও বিবেচক, তাঁহারা কখন ভুলিয়া যান না যে মনস্বীশ্রেষ্ঠ নিউটনও বলিয়াছিলেন যে তিনি অপার জ্ঞানজলধির তীরে উপলখণ্ডমাত্র আহরণ করিতেছেন।

১৩২৫ মাঘ

রাসায়নিক গবেষণায় যুবকের কৃতিত্ব.

[জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ]

প্রায় দু বৎসর পূর্ব্বে আমরা দুজন বাঙালী যুবার রাসায়নিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি গবেষণা-কার্য্যে আরও অগ্রসর হইয়াছেন। ভাণ্ট হফ্, আর্হেনিয়াস্ এবং গিব্‌সের মত রাসায়নিকগণ যেখানে নিয়মের রাজত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র তথায় নিয়ম দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। বিষয়টি কি, তাহা, পারিভাষিক শব্দের অভাবে, বাংলায় বুঝাইবার জো নাই। জানুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউ কাগজে ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আছে। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের আবিষ্কার বিলাতী রাসায়নিক কাগজে বাহির হইতেছে। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পাঁচ জন ছাত্র ঐ বৃত্তি পাইয়াছিল। ইনি ষষ্ঠ।

১৩২৩ শ্রাবণ

একজন রাসায়নিক আবিষ্কারক।

[রসিকলাল দত্ত]

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত নানা রাসায়নিক আবিষ্কারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ডি-এসসী উপাধি পাইয়াছেন। আবিষ্ক্রিয়ার জন্য এই উপাধি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম পাইলেন। তিনি সম্প্রতি ক্লোরোপিক্রিন নামক যৌগিকপদার্থ প্রস্তুত করিবার নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জিনিষটি ব্যবসাবাণিজ্যে কোন কাজে লাগে না, কিন্তু ইহা খুব কম পরিমাণেও কোন জনতাপূর্ণ বৃহৎ হলের মেজেয় ছড়াইয়া দিলে তথাকার সকলে অশ্রুপাত করিতে আরম্ভ করে। এই গুঁড়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে। শত্রুপক্ষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে অশ্রুমোচনে ব্যাপৃত রাখিলে তাহারা লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে না। ইহাকেই বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

১৩২৫ চৈত্র
বিজ্ঞানাচার্য্য নীলরতন ধর।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের যে-সব ছাত্র দেশে ও বিদেশে তাঁহার ও নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, শ্রীযুক্ত নীলরতন ধর তাঁহাদের অন্যতম। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডী-এস্‌সী উপাধি পাইয়া ফ্রান্সের পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সম্প্রতি তথাকার ষ্টেট্ ডী-এস্‌সী হইয়াছেন। তিনি স্বাধীন গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করিয়া এই উপাধি পাইয়াছেন। ইহার বলে তিনি ইচ্ছা করিলে ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপক হইতে পারিবেন।

শ্রীমান্ নীলরতন দেশে থাকিতেই অনেক রাসায়নিক গবেষণা করিয়াছিলেন। এদেশে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রির রীতিমত অনুশীলনের সূত্রপাত তিনিই করেন। এবিষয়ে মৌলিক গবেষণা দ্বারা তিনি বিদেশেও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে, রসায়নের এই শাখার অন্তর্ভূত একটি বিষয়ের আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বিখ্যাত ফ্যারাডে সোসাইটীর এক অধিবেশনে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আর্হেনিয়স্ (Arrhenius) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সহিত ডাক্তার নীলরতন ধরেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

১৩২৯ অগ্রহায়ণ
বাঙালী রাসায়নিক

বিদেশী নানা রাসায়নিক কাগজে গত দশ বৎসরে কোন্ কোন্ ভারতবাসী রাসায়নিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, তাহার তালিকা দিতে গিয়া আমরা পাঁচ জনের নাম করিয়াছিলাম। ইহাতে শুনিতে পাই অনেকে দুঃখিত হইয়াছেন। তাহা দুঃখের বিষয়। কারণ, সমুদয় রাসায়নিক গবেষকের পুরা তালিকা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, এবং কাহার গবেষণার গুরুত্ব ও উৎকর্ষ কিরূপ তাহা নির্দ্দেশ করাও আমাদের অভিপ্রেত ছিল না। রাসায়নিক কোন্ গবেষণার মূল্য ও উৎকর্ষ কিরূপ তাহা নির্ণয় করিবার ক্ষমতাও আমাদের নাই, যদিও রসায়নী বিদ্যার সামান্য রকম শিক্ষা এক সময়ে আমরা পাইয়াছিলাম। যাঁহারা ঐ বিদ্যায় খুব পারদর্শী, তাঁহাদের মধ্যেও এক একটি গবেষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেবল যে-বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না, তাহা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যা, কারণ তাহা যে কেহ গণনা করিতে পারে। এবং আমরা কেবল সংখ্যার নির্দ্দেশই করিয়াছিলাম।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র গুহ, অনুকূলচন্দ্র সরকার, শিখিভূষণ দত্ত, প্রভৃতির নাম আমাদের তালিকায় ছিল না বলিয়া ইহা অস্বীকৃত

হয় নাই, যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই অনেকগুলি সারগর্ভ স্বাধীন গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এবিষয়ে আরো কিছু বক্তব্য "আলোচনা"র মধ্যে দৃষ্ট হইবে।

১৩২৭ চৈত্র

বিজ্ঞানাচার্য্য মেঘনাদ সাহা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, ডী-এস্‌সী, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতে গবেষণা দ্বারা দেশে থাকিতেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন কোন গবেষণা বিদেশী উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিলাতে গিয়া তাঁহার খ্যাতি আরও বাড়িয়াছে। আমেরিকার পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার ক্রেহর্ন্ (Dr. Crehorne) তাঁহার "পরমাণু" (The Atom) নামক পুস্তকের ভূমিকায় ও মূলপুস্তকে ডাক্তার সাহার নিকট বহুবার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। যেসব দুরূহ বিষয়ে ডাঃ সাহা গবেষণা করিয়াছেন, বাংলাভাষায় তৎসম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দ এখনও রচিত না হওয়ায় তাহার আভাস দিতে পারিতেছি না। মার্চ্ মাসের মডার্ন্ রিভিউয়ে বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের একখানি চিঠি হইতে এবং ডাক্তার ক্রেহর্নের পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া কিছু আভাস দিয়াছি।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। বঙ্গে সাহা জাতির সামাজিক স্থান বামুন কায়েত বদ্দি কামার কুমার প্রভৃতির নীচে। ইহা হিন্দুসমাজের একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা। মানুষের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপকর্ষ যে জা'তের উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রমাণ হাজার হাজার মানুষের আচরণে, কাজে ও জীবনে দেখা যায়। ডাক্তার মেঘনাদ সাহার চরিত্র ও কার্য্য আর-একটি দৃষ্টান্ত। হিন্দুসমাজ বৈদিক যুগের মত স্থিতিস্থাপক থাকিলে ইনি ও ইহাঁর মত আরও অনেক যুবক দ্বিজ পদবী পাইতেন। কারণ ব্রাহ্মণের অন্যতম কার্য্য যে জ্ঞানান্বেষণরূপ তপস্যা, তাহা ইহাঁরা নিষ্ঠার সহিত কবিতেছেন। যাহা হউক, ইহাঁকে কেহ দ্বিজ বলুক বা না-বলুক, ইনি সাতিশয় সম্মানার্হ।

১৩২৮ অগ্রহায়ণ

আচার্য্য সাহার গবেষণা সম্বন্ধে আইন্‌স্‌টাইনের মত

ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয় যে, জগদ্বিখ্যাত জার্মেন বৈজ্ঞানিক আইন্‌স্‌টাইন আচার্য মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"উচ্চ তাপে মৌলিক পদার্থের তাপ-গতি বিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত (Thermodynamical and optical) আচরণ কিরূপ সে বিষয়ে গবেষণা করিয়া ডক্টর মেঘনাদ সাহা বিজ্ঞানজগতে সম্মানিত নাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডলের অবস্থার সঠিক বৃত্তান্ত নিরূপণের এক নূতন পথ খুলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার গবেষণা আরো প্রসারিত হয়, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ইহা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।" (অনুবাদ)।

১৩৩৩ চৈত্র

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংলণ্ডের রয়্যাল সোসাইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-পরিষৎ। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা ইহার ফেলো বা সদস্য। ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ইহার সদস্য হওয়া যত সহজ, বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে তত সহজ নহে। অতএব, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত যুবা বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ইহার সদস্য হওয়া যে খুব শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বয়স এখনও পঁয়ত্রিশ হয় নাই। সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁহার দ্বারা জগতের, ভারতের, বঙ্গের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডার আরও পুষ্ট হইবে, এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রামানুজম্ নামক গণিতবিদ্। যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বৈজ্ঞানিকজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার পর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হন। অনেক বৈজ্ঞানিকের নানা মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে নিজ মত সকল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে বলিয়া সম্ভবতঃ তাঁহার এই সম্মান পাইতে বিলম্ব হইয়াছে। এখনও তাঁহাকে পরমত খণ্ডন করিতে হইতেছে। এই সম্মান না পাইলেও তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াগুলির গৌবরহানি হইত না। তাঁহার পরে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্ রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হইয়াছেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই, শিক্ষার সুযোগ ও শিক্ষার সমুদয় উপকরণ ও সরঞ্জাম বিনা চেষ্টায় তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। তিনি নিজের ধীশক্তি ও পরিশ্রমের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া কৃতী ও যশস্বী হইয়াছেন।

ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মেঘনাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ সাহা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন; অতি কষ্টে

তাঁহাকে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত। মেঘনাদ প্রথমে তাঁহার গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। সেখানে আর বেশী শিখিবার উপায় না থাকায় তিনি দশ বৎসর বয়সে ছয় মাইল দূরবর্তী সিমুলিয়া গ্রামে প্রেরিত হন। এখানে কাশিমপুরের জমীদারদের গৃহচিকিৎসক দয়ালু ডাক্তার অনন্তকুমার দাসের বাটীতে থাকিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে থাকেন এবং ১৯০৫ সালে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিভাগে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন ও বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি ঢাকা কলীজিয়েট্ স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি অন্য বিদ্যালয়ে যাইতে বাধ্য হন, এবং ১৯০৯ সালে এন্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহাতে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে প্রথমস্থান লাভ করেন এবং ভাষার পরীক্ষাতেও পূর্ব্ববঙ্গে প্রথম হন। গণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। এন্ট্রেন্স্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি ব্যাপ্টিস্ট সোসাইটী কর্ত্তৃক গৃহীত বাইবেল পরীক্ষায় বঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একশত টাকা পুরস্কার পান। তিনি ঢাকা কলেজ হইতে আই-এস্‌সি পাশ করেন; তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন, এবং গণিত ও রসায়নে প্রথম হন। তাহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এস্‌সি ও এম্-এস্‌সি পাশ করেন। উভয় পরীক্ষাতেই তিনি দ্বিতীয় স্থান এবং বর্ত্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রথম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও গবেষণাক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন. তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা-বাদের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে মেঘনাদ, অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, ও অধ্যাপক সী ঈ কালিসের নিকট শিক্ষালাভ করেন। তিনি গণিত-চর্চ্চাতেই ব্যাপৃত থাকিতেন বটে, কিন্তু তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করেন, এবং তাঁহার অনেক জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহকারী ছিলেন।

১৯১৬ সালে স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতার বিজ্ঞান্ কলেজে পদার্থবিদ্যা ও মিশ্র গণিত শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই কাজ করিতে করিতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাচার্য্য (D. Sc.) উপাধির জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন। তাহা উপযুক্ত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার পর তিনি ১৯১৯ সালে ঐ উপাধি পান। ঐ বৎসরেই তিনি আর-একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি ও গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি পাইয়া তিনি ১৯২০ সালে বিলাত যান এবং তথায় অনেক গবেষণা করেন। পর বৎসর তিনি বার্লিন গিয়া সেখানেও গবেষণা করেন। বাংলায় পারিভাষিক শব্দের অভাবে তাঁহার গবেষণার বৃত্তান্ত সহজবোধ্য বাংলায় লেখা কঠিন। ভবিষ্যতে চেষ্টা করা যাইবে। ইংরেজীতে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের মডার্ন্ রিভিউতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অধ্যাপক সাহার গবেষণার কতকটা সহজবোধ্য বিবরণ লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে খয়রার রাজার প্রদত্ত অর্থ হইতে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, এবং তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঐ কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু তথায় তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা নিজের মত সমর্থন করিবার উপযুক্ত

পরীক্ষাগার ও যন্ত্রপাতি চেষ্টা করিয়াও পান নাই। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে কেবল যে তিনিই এইরূপ ভুগিয়াছেন, তাহা নয়। ইহার জন্য কে বা কাহারা দায়ী, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। যাহা হউক, অধ্যাপক সাহা ১৯২৩ সালে তাঁহার বন্ধু অধ্যাপক নীলরতন ধরেব চেষ্টায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইযা তথায় গমন করেন। কিছু কাল পরে যখন তাঁহার ঐ পদে স্থায়ী হইবার সময় আসে, তখন কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের একজন সর্ব্বঘটে বিরাজমান অকর্ম্মক অধ্যাপক এলাহাবাদে সাধ্যমত এরূপ ষড়যন্ত্রাদি করেন যাহাতে মেঘনাদ-বাবুর কাজটি পাকা না হয়। এই দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এলাহাবাদে অধ্যাপক সাহা প্রায় চারি বৎসর আছেন। সেখানে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের উন্নতির জন্য, গবেষণাকার্য্যের প্রবর্ত্তন জন্য এবং বিদ্যাচর্চ্চার সুশৃঙ্খল নূতন ব্যবস্থা করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কখন একা, কখন বা তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহযোগে তিনি অনেক মূল্যবান্ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ কবিয়াছেন। পরমাণুর গড়ন (The structure of the Atom) সম্বন্ধে তাঁহার নূতন মতবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নাই। হইলে তাহা পদার্থবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে একটি রত্ন বিবেচিত হইবে বলিয়া আশা হয়।

ইতিমধ্যে তাঁহার অন্য প্রধান একটি বৈজ্ঞানিক মতের আদর ক্রমশ বাড়িতেছে। অন্য বৈজ্ঞানিকেরা ইহা অবলম্বন পূর্ব্বক গবেষণার দ্বারা ফল লাভ করিতেছেন, এবং তিনি বৈজ্ঞানিক অনুমান-শক্তির দ্বারা যে যে ফল পাওয়া যাইবে বলিয়াছিলেন, পরীক্ষা দ্বারা এই বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা তাহা পাইয়াছেন। তাঁহাদেব মধ্যে আমেরিকার প্রিন্সটন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেন্‌রী মরিস্ রাসেল্ অন্যতম। বিলাতের আর এইচ ফাউলার এবং ঈ এ মিল্‌ন্ অধ্যাপক সাহার সিদ্ধান্ত অবলম্বনপূর্ব্বক গবেষণা করিয়া যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে রয়্যাল সোসাইটীর সদস্য হইয়াছেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, যে, সাহা বিলাতে থাকিলে ও ইংরেজ হইলে ১৯২৪ সালে রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো হইতে পারিতেন। অবশ্য তাঁহার গবেষণার গুরুত্ব ও মূল্য আগে ফেলো না হওয়ায় যে কম হইয়া গিয়াছে বা যাইতে পারে, এমন নয়।

তিনি ফ্রান্সের জ্যোতিষিক পরিষদের জীবন-সভ্য (Life Member of the Astronomical Society of France) এবং লণ্ডনের পদার্থবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ফাউণ্ডেশন ফেলো (Foundation Fellow of the Institute of Physics, London)। তিনি ১৯২৬ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থ বিদ্যা বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন, এবং অভিভাষণে নিজের সমুদয় গবেষণায় বিবরণ দেন।

কলিকাতায় থাকিতে তিনি, উত্তর বঙ্গো জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ প্রধানতঃ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে যে অর্থ সংগৃহীত হয় ও সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়, তদ্বিয়ক সংবাদ প্রচার কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন এবং এই কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করেন।

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইতালীর বৈজ্ঞানিক ভল্টা তাড়িত সম্বন্ধে যে আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, তাহার ফলে পৃথিবীতে তাড়িত-যুগের প্রবর্ত্তন বা প্রসারণ হইয়াছে, বলা যায়। এই ভল্টার মৃত্যুর শতবার্ষিক স্মৃতি-উৎসব মহাসমারোহে এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার

জন্মস্থান কোমোতে হইবে। এই উৎসবের উদ্যোগকর্ত্তারা পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

এলাহাবাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষাবিষয়ক কার্য্যে ব্রতী প্রধান প্রধান লোকেরা মেঘনাদ-বাবুর কাজের যথেষ্ট সাহায্য করেন ও তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করেন। সুতরাং কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়া তাঁহার কাজের সুবিধাই হইয়াছে, যদিও কলিকাতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যেকারণেই হউক, তাঁহার মত লোকেরা কলিকাতা ছাড়িয়া গেলে শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গের ও কলিকাতার গৌরব রক্ষা করা সহজ হইবে না।

১৩৪৫ বৈশাখ

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মত এক জন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ বঙ্গের পক্ষে আহ্লাদের বিষয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এলাহাবাদের লীডার কাগজে কেহ কেহ তাঁহার এলাহাবাদ ত্যাগে দুঃখ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন।

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক

১৩২০ জ্যৈষ্ঠ

ময়ূরভঞ্জে লৌহ আবিষ্কার।

[প্রমথনাথ বসুর আবিষ্কার]

গত বৎসর ফাল্গুন মাসে প্রবাসীতে তাতা'র সাকচীস্থ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার একটি সচিত্র বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল। ঐ বৃত্তান্তটিকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ইহা জানা দরকার যে, এই কারখানায় যে মিশ্র লৌহকে বিশুদ্ধ লৌহ ও ইস্পাতে পরিণত করিয়া তাহা হইতে নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, তাহার আকর কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা অনেকে জানেন না যে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ই এই আবিষ্কার করিযাছেন। বসু মহাশয় অনেক দিন হইতে জানিতেন যে মধ্যপ্রদেশে, বিশেষতঃ রাইপুর ও জব্বলপুর জেলায়, লৌহ পাওয়া যায়। তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিবরণীতে (Records of the Geological Survey of India) এই বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত জামশেদ্‌জি নসেরবানজি তাতা লৌহকারখানা স্থাপন করিবার জন্য ১৯০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে লৌহের অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি রাইপুর জেলার দল্লি বা ধল্লী নামক স্থানে লৌহের অস্তিত্বের বিষয় অবগত হন। বসু মহাশয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই আকর আবিষ্কার করেন; এতদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ববিষয়ক বিবরণীর বিংশখণ্ডের প্রথম ভাগে (Records of the Geological Survey, Vol. XX, Part 1) প্রকাশিত হয়। বসু মহাশয় পেন্‌সন লইলে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরভঞ্জের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা মহোদয় কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্যে খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার করিতে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জের খনিজ সম্পদ নির্ণয় করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। বসু মহাশয় গুরুমাইশানি পাহাড়ের পার্শ্ব ও পাদদেশে অপর্য্যাপ্ত লৌহের অস্তিত্বের প্রমাণ পান। রাজ্যের অন্যান্য স্থানে অন্যান্য খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার করেন। গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ব-বিবরণীর একত্রিংশ খণ্ডের তৃতীয় ভাগে তাঁহার এতদ্বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাতা মহাশয় মধ্যপ্রদেশে লৌহের অনুসন্ধান করিতেছেন, জানিতে পারিয়া, ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রমথ বাবু তাঁহাকে জানান যে, ময়ূরভঞ্জে লৌহ আছে। তিনি তাঁহাকে জানান, যে, এই লৌহক্ষেত্র বহুবিস্তৃত, ইহাব লৌহের পরিমাণ খুব বেশী, এবং ইহা বঙ্গের কয়লার খনি-সকলের নিকটবর্ত্তী। বসুমহাশয় মধ্যপ্রদেশের লৌহ-ক্ষেত্র-সকলের কথা আগে হইতেই জানিতেন; সুতরাং তিনি উভয়ের তুলনা করিয়া সহজেই ময়ূরভঞ্জকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাতা মহাশয়ের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা পিতার কাজটি ছাড়িয়া দিলেন না। তাঁহারা প্রমথ বাবুর সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা পেরিন সাহেব নামক একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লওয়া স্থির করিলেন। পেরিন সাহেব বসু মহাশয়ের সহিত ময়ূরভঞ্জ পরিদর্শন করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলেন। তাহার পর ক্রমশঃ সাক্‌চীতে কারখানা স্থাপিত হইল।

প্রমথ বাবু পাটিয়ালা রাজ্যেও বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত লৌহের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু নিকটে কয়লার খনি না থাকায় এখনও তথায় কোন কারখানা স্থাপিত হয় নাই।

সাক্‌চীতে ধাতু-পরীক্ষাগার।

শ্রীযুক্ত তাতা লৌহের কারখানা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার চেষ্টা করেন। গবর্ণমেণ্টে বৎসরে অন্যূন ২০,০০০ টন্ ইস্পাতের রেল ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হন; কিন্তু এই সর্ত্ত করেন যে রেলগুলির উৎকর্ষ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হইবে। এই উৎকর্ষ পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্‌চীতে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। ইংলণ্ডে শেফীল্ড লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা সমূহের কেন্দ্রস্থল। শেফীল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ম্যাক্‌উইলিয়ম সাহেব এই পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ, এবং শ্রীযুক্ত আলোকনাথ বসু ও আরউইন সাহেব তাঁহার সহকারী। এই পরীক্ষাগারে "পাস্" করিয়া না দিলে গবর্ণমেণ্ট কোন রেল ক্রয় করেন না।

তাতার কারখানা সম্বন্ধে একটি দুঃখের বিষয় এই যে ইউরোপ ও আমেরিকায় উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন কোন ভারতীয় যুবক থাকা সত্ত্বেও এই কারখানায় সমুদয় বৈজ্ঞানিক কাজ বিদেশী (প্রধানতঃ জার্ম্মেন ও আমেরিকান) দিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এই-সব কাজে কোন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয় না। তাহারা যাহাতে পরে উচ্চতর কাজের যোগ্য হইতে পারে, নিম্নতর কাজে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে এরূপ সুযোগও দেওয়া হয় না। অন্ততঃ এরূপ সুযোগ দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

প্রমথনাথ বসু

প্রায় আশী বৎসর বয়সে রাঁচীতে সুপণ্ডিত ও সুলেখক, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর অনুরাগী এবং সমর্থক প্রমথনাথ বসু মহাশয় পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু ছোটনাগপুর নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ভারতবর্ষের বাহিরে যাঁহারা ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব অনুভব করেন, তাঁহারাও এই ক্ষতি অনুভব করিবেন।

তিনি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে, কিন্তু পরে নিজের চেষ্টায় সাহিত্য ও দর্শনেও জ্ঞানবান ও পাবদর্শী হয়েন। তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলী ও নানা প্রবন্ধ দ্বারা স্বদেশবাসীদিগকে সেই জ্ঞানের অংশী কবিয়া গিয়াছেন।

তিনি গিলক্রাইষ্ট বৃত্তি লইয়া বিলাত যান এবং সেখানে প্রধানতঃ ভূতত্ত্ব এবং তাহার সঙ্গে অন্য কোন কোন বিজ্ঞান শিখিয়া ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। চাকরী তিনি দক্ষতা ও স্বাধীনচিত্ততার সহিত করিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় লোক বলিয়াই তাঁহার অধস্তন একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে তাঁহাকে ডিঙাইয়া উচ্চপদ দেওয়ায় তিনি ১৯০৩ সালে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গোরুমহিষানী, বাদামপুর, পাঁচগীর ও কালীমাটিতে তিনি লৌহ আবিষ্কার করেন। তিনিই মিঃ জামশেদজী টাটাকে জামশেদপুরে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন, এবং তদনুসারে সেইখানে কারখানা স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে ভারতবর্ষের

প্রধান এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান লোহা-ইস্পাতের কারখানা।

সরকারী চাকরী ছাড়িয়া দিবার পর তিনি ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতত্ত্ববিৎ নিযুক্ত হন এবং তখন গোরুমহিষানীতে লৌহের খনি আবিষ্কার করেন। তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেব এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মহারাজা অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়ের ছাত্র ছিলেন। যোগেশ বাবু একদা তাঁহাকে বলেন, "তোমার রাজ্যে কোথায় কি বহুমূল্য সম্পদ আছে, তাহা তুমি জান না; তুমি কিরূপ মহারাজা?" অতঃপর বসু মহাশয় ভূতত্ত্ববিদের কার্য্যে নিযুক্ত হন। গবর্ন্মেণ্টের চাকরীতে থাকিবার সময় তিনি জব্বলপুর ও দার্জিলিঙে কয়লা এবং রায়পুব জেলায় গ্র্যানাইট ও অন্যান্য খনিজ আবিষ্কার করেন।

প্রমথনাথ বসু মহাশয় চরিত্রবান্, বিনয়ী পুরুষ ছিলেন। লোহার খনি আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—

"Well, to compare small things with great, I discovered them in the sense that Amerigo Vespucci is said to have discovered the continent which is called after him. But, as I have shown in my *Epochs of Civilization*, for many centuries before him it was well known to the Asistics, and the Chinese and the Japanese had probably small settlements there. All that Amerigo and Columbus a few years before him did was to bring it to the notice of the Europeans. The iron ores of Mayurbhanj had long been worked by the melters of the State before I came upon them. All that I did was to make them known to the industrial public."— *Tisco Review*, April 1933, p.18.

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য। বড় জিনিষের সঙ্গে ছোট জিনিষের তুলনা করিলে বলা যায়, যে, আমেরিগো ও কোলম্বস্ যে-অর্থে আমেরিকার আবিষ্কারক, আমিও সেই অর্থে গোরুমহিষানী প্রভৃতি স্থানের লোহার খনির আবিষ্কারক। আমার "সভ্যতার যুগাবলী" গ্রন্থে দেখাইয়াছি, যে, তাঁহাদের অনেক শতাব্দী আগে এশিয়াবাসীরা আমেরিকার অস্তিত্ব অবগত ছিল এবং চৈনিক ও জাপানীদের বোধ হয় সেখানে ছোট ছোট উপনিবেশ ছিল। আমি ময়ূরভঞ্জের লোহার খনিগুলির সন্ধান পাইবার অনেক আগে হইতে সেই রাজ্যের লৌহদ্রাবক ও সংশোধকেরা তথাকার প্রাকৃত খনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত করিত। আমি কেবল আকরগুলিকে নানা শিল্পনেতাদের গোচর করিয়াছিলাম।"

টাটা কোম্পানী জামশেদপুর কারখানার যে প্রস্পেক্টস বা অনুষ্ঠানপত্র বাহির করেন, তাহাতে বসু মহাশয়কে আকরগুলির আবিষ্কারক না বলিয়া এইরূপ ধারণা জন্মান হয়, যে, সেগুলি স্বর্গীয় জামশেদজী টাটা মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত খনিজ-অনুসন্ধান চেষ্টাবলীর ফল। যথা—

"...the first prospectus of The Tata Iron and Steel Company...created the impression that the discovery... was made in the course of the prospecting operations instituted by the late Mr. J. N. Tata."

ইহা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় তিনি টাটা কোম্পানীর অন্যতম কর্ম্মী মিঃ বি জে পাদশাহকে চিঠি লেখেন। সেই চিঠির নিম্নমুদ্রিত উত্তরে বসু মহাশয়ের কথাই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। যথা :—

Navsari Buildings, Bombay,
3rd July, 1907.

Dear Mr. Bose,

Your statement of facts is perfectly correct, and I shall bear it in mind when we come to the publishing of a final prospectus. In a commercial document one is not always able to reserve place for giving due credit to every one, but it is perfectly fair that the document should not be so worded as to imply that credit elsewhere than where it is due.

তাৎপর্য্য। প্রিয় মিঃ বসু, আপনার তথ্যসমূহের বর্ণনা সম্পূর্ণ নির্ভুল। আমাদের শেষ প্রস্পেক্টস্ বাহির করিবার সময় আমি ইহা মনে রাখিব। ব্যবসাঘটিত দলিলে প্রত্যেককে তাঁহার ন্যায্যপ্রাপ্য প্রশংসা দিবার নিমিত্ত জায়গা সব সময়ে রাখা যায় না; কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত যে, দলিলটির বয়ান এরূপ হওয়া উচিত নয় যাহাতে একজনের প্রাপ্য প্রশংসা অন্যের প্রাপ্য বলিয়া বুঝায়।"

টাটা-কোম্পানী শেষ প্রস্পেক্টস্ বাহির করিয়াছিলেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে তাহাতে বসু মহাশয়ের কৃতিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল কিনা, জানি না। কিন্তু ইহা সন্তোষের বিষয় যে সম্প্রতি জামশেদপুরে কারখানার সাধারণ ম্যানেজার কীনান সাহেবের সভাপতিত্বে যে সর্ব্বসাধারণের সভা হয়, তাহাতে প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের কীর্ত্তি প্রশংসিত এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কীনান সাহেব আমেরিকান। ইহাও বক্তব্য, যে, জামশেদপুরের কারখানায় বসু মহাশয়ের পুত্রেরা যথাযোগ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।

আজকাল কেহ বিদ্যালাভ, বাণিজ্য বা দেশভ্রমণের জন্য সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গেলে, দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। বসু মহাশয় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যখন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন, তখন কুশদহ সমাজ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন। তিনি রাজী হন নাই, প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর এবং রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তাঁহার পোষাক, চালচলন, ও জীবনযাত্রা প্রণালী ছিল ইংরেজদের মত। কিন্তু পরে তিনি সাহেবিয়ানা বর্জ্জন করিয়া সাবেক বাঙালী ভদ্রলোকদের মত থাকিতেন। স্বাদেশিকতার জন্য, দেশের লোকদের সহিত সংহতি ও সহানুভূতি রক্ষার জন্য, জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত, তাহা আবশ্যক। কিন্তু তাহাতে এদেশে আরামও বেশী পাওয়া যায়, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ও দীর্ঘজীবনলাভেরও তাহা উপযোগী।

১৩২১ চৈত্র
প্রাচীন-ভারতে ইস্পাত।

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পশ্চিম চক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত দিবাকর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর গ্বালিয়র রাজ্যের বেশনগরে কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি খুড়িয়া বাহির করিয়াছেন। তথায় "থাম বাবা" নামক একটি স্তম্ভ আছে। উহার নীচে তিনি দু টুকরো লোহা পান। তাহার এক খণ্ড রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য তিনি সার রবার্ট হ্যাডফীল্‌ডের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা বিশ্লেষণ করিয়া উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সার রবার্টের এরূপ ধারণা হয় যে তিনি ফারাডে সোসাইটীর এক অধিবেশনে উহার সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে গত কয়েক বৎসরে প্রাচীন লোহা ও তথাকথিত ইস্পাতের যে সকল নমুনা তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই তিনি এরূপ পরিমাণে অঙ্গার দেখিতে পান নাই, যাহাতে তাহাকে আধুনিক অর্থে ইস্পাত বলা চলে; ভাণ্ডারকর-প্রেরিত এই ইস্পাতের নমুনাটিই আধুনিক সময়ে প্রদর্শিত একমাত্র ধাতুখণ্ড যাহা অধিক পরিমাণে অঙ্গার মিশ্রণজাত ইস্পাত এবং যাহা জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শক্ত করা হইয়াছে। সার্ রবার্ট হ্যাড্‌ফীল্‌ডের বিশ্লেষণ-ফল "এঞ্জিনীয়ারে" ছাপা হইয়াছে। তাহা দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় যে ভাণ্ডারকরের নমুনাটি খাঁটি ইস্পাত। এতদিন কেবল সাধারণ লোকে নয়, প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও মনে করিতেন যে মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে হিন্দুরা ইস্পাতের ব্যবহার বা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানিত না; তাঁহারা হয়ত এরূপ শুনিলে হাঁ করিয়া থাকিতেন যে প্রাচীন হিন্দুরা ইস্পাত নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ অব্দে পারিতেন; কেন না "থাম বাবা" স্তম্ভটির ঐরূপ তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে যে প্রাচীন হিন্দুরা ইস্পাতের ব্যবহার জানিতেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তে অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন; এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থক কোন বহুপ্রাচীন ইস্পাতখণ্ডও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকরের আবিষ্কারের এবং সার্ রবার্ট হ্যাড্‌ফীল্‌ডের বিশ্লেষণে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

ভাণ্ডারকরের আর একটি আবিষ্কার।

শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর খুব পুরাতন একটি ইটের প্রাচীর খুড়িয়া বাহির করিয়াছেন। তাহা গাঁথিবার জন্য যে মশলা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করিবার জন্য তিনি পুণার কৃষিকলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ম্যানের নিকট পাঠাইয়া দেন। ম্যান সাহেব উহা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে উহা চূণমিশ্রিত এক রকম মশলা যাহা প্রাচীন ফিনিশিয় বা গ্রীকদের দ্বারা প্রস্তুত যে-কোন গাঁথনীর মশলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং যাহা প্রাচীন রোমানদের মশলার সমকক্ষ। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া খুব আশ্চর্য্য রকমের। কারণ এ যাবৎ সমুদয় প্রত্নতাত্ত্বিকের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে প্রাচীন হিন্দুরা চূণমিশ্রিত গাঁথনীর মশলা ব্যবহার করিতে জানিত না, এবং উহা মুসলমানরা প্রথম ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করে। এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্য শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর ধন্যবাদার্হ। মহারাজা শিন্ধিয়া

প্রত্নতাত্ত্বিক খননাদি কার্য্যের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন, এবং ভাণ্ডারকর মহোদয়ের অন্য সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য তিনি ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন।

১৩২২ পৌষ

জিজ্ঞাসুর আদর।

[নৃতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র রায়]

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রত্নতত্ত্ব ও অন্য নানা বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাঁচির উকীল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়, এম্ এ, বি এল্। তিনি উহার ত্রৈমাসিক পত্রিকারও সম্পাদক। ইহার প্রথম সংখ্যা নানা নূতন তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে। শরৎ বাবু সমিতির নৃতত্ত্ব বিভাগেরও সম্পাদক। তিনি ছোটনাগপুরের অন্যতম আদিম-অধিবাসী মুণ্ডা এবং ওরাওঁদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়া দুখানি সুন্দর বহি লিখিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে লিখিত অনেক বিষয় প্রবাসীতে বর্ণিত হইয়াছিল। এই গবেষণার কাজ করিতে গিয়া তাঁহার ওকালতী ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার সুবিধার জন্য বিহার-উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা সমিতির নৃতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদকের জন্য বার্ষিক ৩০০০্ টাকার বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। শরৎ বাবু ঐ বিভাগের সম্পাদক বলিয়া তিনি ঐ টাকা পাইবেন। তাহাতে তাঁহার কিছু ক্ষতিপূরণ হইবে। এই উৎসাহ দানের জন্য বিহার গবর্ণমেণ্ট প্রশংসার যোগ্য।

শরৎ বাবুর সম্বন্ধে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন :—

"এ দেশের বুনো অসভ্যদের রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ রাজপুরুষেরা অনেক সময় যখন তাহাদের প্রতি অন্যায় বিচার করিতেন, তখন তাঁহার প্রাণ এই অসভ্যদের জন্য কাঁদিয়া উঠিত এবং তিনি ইহার প্রতিবিধানের উপায় খুঁজিতেন। এইরূপে তিনি নীরবে মুণ্ডা ও ওরাওঁ জাতির ইতিহাস ও অন্যান্য তথ্য সঙ্কলনে নিযুক্ত হইলেন। সর্ব্বদা এই গবেষণায় আপনাকে নিমজ্জিত রাখিয়া পর্ব্বতে বনে ও গ্রামে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইংরেজ রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিতে এই অসভ্য জাতিদিগকে আনিবার জন্য তিনি ১৯১২ সালে "মুণ্ডা ও তাহাদের দেশ" এবং ১৯১৫ সালে "ছোটনাগপুরের ওরাওঁ জাতি" নামক দুইখানি ইংরেজী গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

"বিদেশে ও স্বদেশে বিদ্বৎসমাজ উক্ত দুই পুস্তকের ভুয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়াছেন। এখনও তিনি এই প্রৌঢ়বয়সে যুবার মত উৎসাহে তাঁহার ছুটীর দিনগুলি গ্রামে গ্রামে পর্ব্বতে পর্ব্বতে মানবতত্ত্বের গবেষণায় অতিবাহিত করিয়া প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ও লৌহযুগের মাল-মসলা

সংগ্রহে নিযুক্ত রহিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে এবং কি গ্রীষ্মে কি শীতে অসভ্যদের কুঁড়ে ঘরের আশে পাশে, গভীর বন জঙ্গালের মধ্যে এবং নির্জ্জন গিরিকন্দরে কত রজনী মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া বিপদসঙ্কুল স্থানে কাটাইতে হইয়াছে।

"ধুমকুড়িয়াতে অসভ্যেরা রাত্রিকালে গভীর অরণ্যানীর মধ্যে আগুন জ্বালাইয়া নানারূপ অত্যাচার করে। ইহা তাহাদের অতি গোপনীয় বিষয়। বাহিরের কেহ আসিয়াছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিতে পারে। অসভ্যদের ধুমকুড়িয়ার বিষয় জানিবার জন্য তাঁহাকে রাত্রিকালে কখনও উচ্চ বৃক্ষের উপর, কখনও গভীর অরণ্যানীর মধ্যে অনেক কষ্টসহ্য করিয়া লুক্কায়িত থাকিয়া দেখিতে ও শুনিতে হইয়াছে।

"রাঁচীতে খৃষ্টান মুণ্ডা ও ওরাওঁদের জন্য অনেক বোর্ডিং ও স্কুল রহিয়াছে। কিন্তু অখৃষ্টান মুণ্ডা ও ওরাওঁদের জন্য কোন বোর্ডিং বা স্কুল নাই। তিনি এই অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় আছেন এবং এক্ষণে একটি ছোট ছাত্রনিবাস ও তৎসংলগ্ন একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ছাত্রনিবাসে এক্ষণে ৬০ জন অখৃষ্টান মুণ্ডা ও ওরাওঁ ছাত্র রহিয়াছে এবং প্রাইমারী স্কুলে দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। ছাত্রনিবাসের অনেক বালক রাঁচীর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ও অন্য স্কুলে পড়ে।"

১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ

নৃতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র রায়

রাঁচির প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিৎ রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে বাঙালী সমাজ ও ভারতবর্ষ এক জন সুপণ্ডিত নৃতত্ত্ববিৎ, স্বদেশপ্রেমিক ও ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসীদের অকপট দরদী বন্ধু হারাল। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" এই বাক্যের তিনি দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ হয়েছিল। গত শতাব্দীতে যখন কলকাতার সিটি কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে প্রবাসীর সম্পাদকের স্থান ছিল, তখন শরৎচন্দ্র ঐ কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি বিখ্যাত হবার পর এই কথা বোধ হয় তাঁরই প্রমুখাৎ জানতে পেরেছিলাম। বার্দ্ধক্যেও তিনি ছাত্রের মত ব্যবহার করতেন। প্রথম যখন আমি রাঁচি যাই ও তাঁর বাড়ীতে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন তিনি তাঁরই বাড়ীতে তাঁর ও পরিবারস্থ অন্য সকলের জন্য যে নানা মিষ্টান্ন তৈরি হ'ত, তা দিয়ে ত তৃপ্ত করলেনই, অধিকন্তু আমার মানসিক পুষ্টির যা ব্যবস্থা করলেন অন্যত্র তা দুর্লভ। তাঁর বৈঠকখানাটি দেখলাম নৃতত্ত্বের একটি ম্যুজিয়মবিশেষ। প্রাগৈতিহাসিক বহু প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মানবসভ্যতার নানা স্তরের যে-সব নিদর্শন সেখানে কালানুক্রমে সাজান ছিল, সবগুলি সম্বন্ধে তিনি আমাকে পাঠ দিলেন বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর শিক্ষাদানশক্তি তাঁর

সৌজন্যের সমতুল্য ছিল।

নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি নিশ্চয়ই অনেক বই পড়েছিলেন। কিন্তু বই-পড়া বিদ্যা তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল না। গবেষণালব্ধ জ্ঞান তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু এই গবেষণা লাইব্রেরিতে ব'সে গবেষণা নয়। ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসী ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি নানা উপজাতি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবার জন্যে তাঁকে তাদের সঙ্গে মিশতে হয়েছিল, সুপরামর্শ ও অন্যবিধ নানা সাহায্য তাদিগকে দিতে হয়েছিল, তাদের ভাষা শিখতে হয়েছিল, তাদের গান ও উপকথা ও তাদের বিবাহ-আদি আচারের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করতে হয়েছিল, এবং কোন কোন উপজাতি তাদের যে-সব আচার খুব গোপন রাখে ও যে-সব অনুষ্ঠান বাইরের কাউকে দেখতে দেয় না, সেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবার জন্যে তিনি কখন কখন প্রাণ যাবার ভয় সত্ত্বেও গহন বনে গাছের ডালে লুকিয়ে থেকে কোন কোন অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শিলা-যুগের ও তাম্র-যুগের নানা সামগ্রী তিনি দুর্গম স্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

ছোটনাগপুরের মুণ্ডা, ওরাওঁ, হো প্রভৃতিদের সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ অনেকগুলি মূল্যবান সচিত্র পুস্তক আছে। ফোটোগ্রাফগুলি তাঁর নিজের তোলা। কোন কোনটির অনেক অধ্যায় মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। 'প্রবাসী'তেও তিনি নৃতত্ত্ববিষয়ক অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তিনি তার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর অভিভাষণটির স্বজাতি বাঙালীর প্রতি প্রীতি, আদিম নিবাসীদের প্রতি মৈত্রী এবং নৃতত্ত্ববিষয়ক পাণ্ডিত্যের সমাবেশে অপূর্ব হয়েছিল। তাঁর বৃত্তি ছিল ওকালতী। আইনের জ্ঞান এবং তার প্রয়োগে দক্ষতা তাঁর যথেষ্ট ছিল, কিন্তু অনুরাগ ছিল নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, গবেষণা ও বিতরণে। তিনি "ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া" নামক নৃতত্ত্ববিষয়ক উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। এতে তাঁর এবং ভারতীয় ও বিদেশী বহু নৃতত্ত্ববিদের অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজম্।

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রামানুজম্ মহাশয়ের মৃত্যুতে জগতের ও ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি হইল। তিনি জগতের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞদের মধ্যে একজন ছিলেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে বিলাতের রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো অর্থাৎ সদস্য হইয়াছিলেন। ইহা অতি উচ্চ সম্মান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর হইয়াছিল। যাঁহার প্রতিভায় মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, এত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু গভীর পরিতাপের বিষয়। তিনি মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় সকল বিষয়ে (গণিতেও) ফেল হইয়া মান্দ্রাজ বন্দর অফিসে ২০।৩০ টাকার কেরানীগিরি করিতেছিলেন। এমন সময়ে কোন কোন সদাশয় ইংরেজের চোখে তাঁহার

গণিতের খাতাকয়েকটি পড়ায় তাঁহারা উহা কেম্ব্রিজের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক হার্ডির গোচর করেন। তখন তাঁহার প্রতিভা জানা পড়ে, ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বৃত্তি দিয়া কেম্ব্রিজে পাঠাইয়া দেন। তিনি তথায় ট্রিনিটী কলেজের ফেলো হন, এবং রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

১৩২৯ ফাল্গুন

দেশ-বিদেশের কথা

সায়ান্স্ কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা

[স্যার বিশ্বেশ্বরায়্য]

লক্ষ্ণৌ সহরে সম্প্রতি সায়ানস্ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্যার বিশ্বেশ্বরায়্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানা রকমের হিসাব-নিকাশ খতাইয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, ভারতের দারিদ্র্য জগদ্দল পাহাড়ের মত ভারতের ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিবার কোনোই মানে নাই—নানা দিকে তাহার এমন সব ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যে-সব ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে পারিলে তাহার দারিদ্র্য সহজেই ঘুচিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন, এই-সব ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উন্নততর পদ্ধতিগুলিই অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষি সম্বন্ধে, খনিজ বিদ্যা সম্বন্ধে, ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি মানিয়া লইয়া সেই অনুসারে কর্ম্মপথ নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে এই বিজ্ঞানের যুগে উন্নতি লাভ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। তিনি বলিয়াছেন— আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের কৃষি, আমাদের খাদ্যাভাব, আমাদের জীবনযাত্রার ধারা, এককথায় আমাদের সমস্ত প্রকার সমস্যার সমাধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পথ এবং নানা রকমের গবেষণার পথ ধরিয়া চলা একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। এই পথের অনুসরণের উপরেই এসব সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। অথচ এজন্য আমাদের মনের ভিতর বিশেষ তাগিদ জাগে নাই। যুদ্ধের ফলে আর সমস্ত জাতির ভিতর নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং নানা রকম অনুসন্ধিৎসার যে ঝোঁকটা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতে আমরাই কেবল বঞ্চিত হইয়া আছি। দারিদ্র্য জিনিসটা এমন, যে চেষ্টা করিলেই তাহার প্রতিরোধ করা যায়। আমাদের ভিতর সেই চেষ্টাই জাগিতেছে না।

১৩৩৫ কার্ত্তিক

অধ্যাপক মোলিশের কলিকাতা আগমন

পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উদ্ভিদবিদ্যাবিৎ, ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো রেক্টার অধ্যাপক মোলিশ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভিয়েনা প্রবাসকালে তাঁহার যন্ত্রগুলির সাহায্যে তাঁহার উদ্ভাবিত নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া তাঁহারই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহা তিনি ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক কাগজ নেচ্যরে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতা আসিবেন। উদ্দেশ্য, বসু-বিজ্ঞান- মন্দিরে অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে অভিনব প্রণালীতে গবেষণার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়লাভ। তিনি প্রবীণ লোক। ইতিপূর্ব্বে জাপানে গিয়াছিলেন। "উদীয়মান সূর্য্যের দেশে" নামক তাঁহার জাপানসম্বন্ধীয় পুস্তক হইতে একটি ছবির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হইল। জাপানে লোমশ কেশশ্মশ্রুবহুল আইনু জাতিদের একটি গৃহের নিকটে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকৃতি পুরুষ অধ্যাপক মোলিশ। তাঁহার মূর্ত্তির একটি পদকের প্রতিলিপি দিতেছি। মূল ছবি ও পদক কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য্য সহায়রাম বসু মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অধ্যাপক মোলিশ জাপান সম্বন্ধে যেমন বহি লিখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া গিয়া হয় তো ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও সেই রূপ বহি লিখিবেন।

১৩৩৫ অগ্রহায়ণ

এভারেষ্ট শৃঙ্গের আবিষ্কারক বাঙালী

[রাধানাথ শিকদার]

এভারেষ্ট হিমালয়ের এবং পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২৯১৪৪১ ফুট। ভারতবর্ষের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার জেনার‍্যাল স্যার জর্জ্জ এভারেষ্টের নামে ইহার নামকরণ হয়, কিন্তু তিনি ইহার আবিষ্কর্ত্তা ছিলেন না। ইহা আবিষ্কৃত হয় ১৮৫২ সালে, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে ১৮৪৩ সালে পেন্সন লইয়াছিলেন। এভারেষ্ট আবিষ্কারের বৃত্তান্ত সিমলায় প্রদত্ত মেজর কেনেথ সেসনের একটি বক্তৃতায় পাওয়া যায়। এই বক্তৃতায় সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বর্ত্তমান ১৯২৮ সালের ১২ই নবেম্বরের ইংলিশম্যানে ১৭ পৃষ্ঠায় জর্ন্যাল অব দি সোসাইটী অব আর্টস্ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে আবশ্যক অংশ আমরা নীচে তুলিয়া দিতেছি।

"It was during the computations of the North eastern observations that a babu rushed on one morning in 1852 into the room of Sir Andrew Waugh, the successor of Sir George Everest and exclaimed; "Sir, I have discovered the highest mountain on the earth." He had been working out the observations taken

to the distant hills. It was Sir Andrew Waugh who proposed the name Mount Everest, and no local name has ever been found for it on either the Tibetan or the Nepalese side."

নিম্নপদস্থ কোন দেশী কর্ম্মচারী কোন একটা বড় আবিষ্ক্রিয়া করিলে তাহার যশটা উপরওয়ালা ইংরেজের হয়। অতএব এক্ষেত্রে যে একজন ইংরেজ নাম না করিয়া, গোড়ার বি অক্ষরটা ছোট করিয়া, একজন ব্যাবুকে কিঞ্চিৎ যশোভাগী করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশী লোকদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ছোট বি গোড়ার দিয়া ব্যাবু লিখিলে ইংরেজীতে তাহার মানে হয় নেটিভ কেরাণী। ইংরেজরা যে এই নেটিভ কেরাণীর বেশী সম্মান করে নাই, তাহার জন্য তাহাদিগকে দোষ না দিয়া আমাদের ঘাড়ে এই দোষ লওয়া উচিত যে, আমরা অনেকে এই বাঙালী ভদ্রলোকটির নাম জানি না। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ইনি পরলোকগত রাধানাথ শিকদার। সেকালে গণিতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খুব নাম ছিল। বাড়ী ছিল কলিকাতার শিকদার পাড়ায়। ইনি দেরাদূনে সার্ভে আফিসে কাজ করিতেন। ঐ আফিসে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার কোন লিখিত দলিল থাকিলে কেহ তাহার নকল প্রকাশ করিলে একটি সৎকর্ম্ম করা হইবে। ইনি বিবাহ করেন নাই, ইহাঁর ভ্রাতার বংশ আছে।

১৩৩৭ পৌষ

অধ্যাপক রামনের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ ১৯৩০ সালে পদার্থবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্ক্রিয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এশিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাহা সাহিত্যের জন্য। অধ্যাপক রামন্ তাহার পর, এশিয়ার মধ্যে, এই পুরস্কার পাইলেন। ইহা এশিয়াবাসীর, ভারতীয়দের, মান্দ্রাজীদের, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের বিষয়। এই পুরস্কারের মূল্য প্রায় ৬৫০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে মোটামুটি ৯০,০০০ টাকা।

আলফ্রেড্ নোবেল সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসাতে রাসায়নিক ও এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ডাইনামাইট ও তদ্বিধ অন্য অনেক জিনিষ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন, এবং মৃত্যুকালে পাঁচটি পুরস্কারের জন্য প্রায় তাহার সমস্ত রাখিয়া যান। জাতিধর্ম্মভাষা-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর যে-কোন দেশের লোক ইহা পাইতে পারেন। পাঁচটি পুরস্কারের মধ্যে একটি সাহিত্যের জন্য, একটি পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ ও শান্তি স্থাপনের প্রয়াসের জন্য, একটি রসায়নী বিদ্যার (কেমিষ্ট্রীর) জন্য, একটি পদার্থ-বিজ্ঞানের (ফিজিক্সের) জন্য, এবং একটি চিকিৎসা বিদ্যা কিম্বা শারীর বিজ্ঞানের (ফিজিয়লজির) জন্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের জন্য কিম্বা দর্শন ইতিহাস,

ললিতকলা প্রভৃতির জন্য কোন নোবেল পুরস্কার নাই।

অধ্যাপক রামনের আবিষ্ক্রিয়াটি কি, তাহা সহজে সংক্ষেপে বাংলায় বলা যায় না। মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি।

১৩৩৮ শ্রাবণ

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের সংবর্দ্ধনা

গত ১১ই আষাঢ় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী অধ্যাপক স্যার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্‌কে পদার্থবিদ্যা- বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিত করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এশিয়ায় অধ্যাপক রামন্‌ই প্রথমে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা, এবং ইহার দ্বারা তিনি স্বয়ং প্রসিদ্ধিলাভ ত করিয়াইছেন, অধিকন্তু ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের ও এশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব তাঁহার সংবর্দ্ধনা খুব ঠিক্‌ই হইয়াছে।

অধ্যাপক রামন্ বিশেষ করিয়া যে আবিষ্ক্রিয়াটির জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহার পর তিনি আরও গবেষণা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য আরও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা তাঁহার অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়া অপেক্ষা গরীয়ান্ বলিয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে।

মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিস্তারের নিমিত্ত এবং গবেষণার দ্বারা নূতন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের জন্য ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশ্যন ফর দি কাল্টিভেশ্যন অফ সায়েন্স" স্থাপন করেন। এই বিজ্ঞানসভার পরীক্ষাগারেই যুবা বেঙ্কট রামন্ অধ্যাপক হইবার পূর্ব্বে গবেষণা করিতেন। তখন তিনি বিখ্যাত হন নাই। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই উভয় ঘটনার উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক রামন্ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, গত পনর বৎসর তিনি অনেক মনস্বী সহকর্ম্মী পাইয়াছেন, ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। তাঁহার মতে গবেষণায় তাঁহার অনেক কৃতিত্ব তাঁহাদের সাহায্যের ফলে সম্ভব হইয়াছে। "সাধারণতঃ ইহাই মনে করা হয়, যে, অধ্যাপকের চালনা অনুসারে কাজ করিয়া ছাত্রেরাই উপকৃত হয়। বস্তুতঃ, অধ্যাপকও, তাঁহার অধীনে যে-সব প্রতিভাশালী ছাত্রেরা কাজ করে, তাহাদের সাহচর্য্যে সমান উপকৃত হন।"

কলিকাতা সম্বন্ধে ডাঃ রামন্ বলেন :—

"For a hundred years, Calcutta has been the intellectual metropolis not only of Bengal, or of India, but of the whole of Asia. From Calcutta has gone

forth a living stream of knowledge in many branches of study. It is inspiring to think of the long succession of scholars, both Indian and European, who have lived in this city, made it their own, and given it of their best. It must be a profound privilege to be able to work and live in such an environment."

"গত এক শত বৎসর কলিকাতা বিদ্যাবুদ্ধিবিষয়ে, শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র এশিয়ার প্রধান নগর হইয়া আছে। বিদ্যানুশীলনের বহু শাখায় কলিকাতা হইতে জ্ঞানের প্রাণবান্ স্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে-সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিত পরম্পরা এই শহরে বাস করিয়াছেন, ইহাকে নিজের করিয়াছেন, এবং ইহাকে তাঁহাদের মনীষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিলে মন অনুপ্রাণিত হয়। এরূপ স্থানে বাস করা ও কাজ করা একটি বিশেষ অধিকার।"

আমরা বাংলার ও কলিকাতার মানুষ। আমাদের মন সহজেই কলিকাতার এই প্রশংসা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার তৃপ্তি পাইতে চায়। সেই জন্য, কলিকাতার সহিত যাঁহাদের কোনই সম্পর্ক নাই, এই প্রশংসা কি পরিমাণে ন্যায়তঃ কলিকাতার প্রাপ্য, তাঁহারাই তাহার যথার্থ বিচারক।

আমরা যাহা লিখিলাম, তাহার সংবাদ-অংশের উপকরণ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের শোভন ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশেষ "রামন্ সংখ্যা" হইতে গৃহীত।

১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

অধ্যাপক রামনের অবদানপরম্পরা

পাছে প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সের সদর আফিস কলিকাতায় হয় এইজন্য স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্ ঐ নাম দিয়া ইতিমধ্যেই একটা বৈজ্ঞানিক সমিতি বাঙ্গালোরে রেজিস্ট্রী করিয়া ফেলিয়াছেন!* উদ্যোগী পুরুষ বটে! নইলে বাঙালীকে বোকা বানাইয়া তাহাদেরই কয়েক লক্ষ টাকার যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিলেন, আর কোন অধ্যাপক বা বাঙালী ছাত্রকে সেগুলি ব্যবহার করিতে দিলেন না, এবং ছুটি লইয়া বাঙ্গালোর যাইবার সময় সেগুলি সঙ্গেও লইয়া গেলেন! এখন তিনি দয়া করিয়া বলিয়াছেন, আর কলিকাতায় ফিরিবেন না, যন্ত্রগুলিও ফেরত দিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসক বীরদল তাঁহাকে এই প্রকার আচরণ করিতে দিয়াছেন সম্ভবতঃ এইজন্য যে, তিনি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁর "সাতখুন মাফ।" বাংলায় যে "কর্ত্তার ভূত" সম্বন্ধে প্রবাদ-বাক্য আছে, তাহা স্মর্ত্তব্য।

* এই বিষয়ে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-কমিটির অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটরীদ্বয় ডক্টর মেঘনাদ সাহা ও ডক্টর এস পি আঘরকর সংবাদপত্রে একটি ধীর সংযম ও সত্যবাদিতাব্যঞ্জক বৃত্তান্ত বাহির করিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠের প্রবাসী ছাপিবার উদ্যোগ করিবার সময় তাহা দেখিতে পাওয়ায় উহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারিলাম না। প্রবাসীর সম্পাদক।

১৩৪১ মাঘ
জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান

স্যর চন্দ্রশেখর রামন্ বাঙ্গালোরে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ও তাহার নাম ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (Indian Academi of Science) দিয়া সমগ্র ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিষদটি নিজের প্রভুত্বের অধীন রাখিবার চেষ্টা করেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও বাগ-বিতণ্ডার ইহাই সূত্রপাত। সুখের বিষয় এই যে, এই ঝগড়া মিটিয়া গিয়াছে এবং সমগ্র ভারতের জন্য "জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান" (National Institute of Science) কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে। শুনিলাম, এই মিটমাট প্রধানত একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারীর মধ্যস্থতায় হইয়াছে। কেবল দেশী লোকদের সুবু৷ হইলে আরও সন্তোষের বিষয় হইত।

এই "জাতীয়" প্রতিষ্ঠানটির প্রথম (অবৈতনিক) কর্ম্মচারী ও সদস্যদের তালিকা দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের মোট সংখ্যা ৩৩। তাঁহাদের মধ্যে ১৩ জন ইংরেজ। সভাপতি ইংরেজ ও সরকারী কর্ম্মচারী, সহকারী সভাপতি ইংরেজ ও সরকারী কর্ম্মচারী। ২০ জন ভারতীয়ের মধ্যে ৬ জন বাঙালী। দু'জন সাধারণ সেক্রেটারির মধ্যে একজন সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারী।

ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এত বেশি পরিমাণে ইংরেজদের দ্বারা হইয়াছে ও হয়, তাহা সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞাত।

১৩৪৯ আশ্বিন
প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর উন্মত্ত প্রলাপ

শেক্সপিয়ার ব'লে গেছেন, "Genius is to madness allied," "প্রতিভার সঙ্গে উন্মাদের সম্পর্ক আছে।" এর অর্থ এ নয় যে, প্রতিভাশালী লোক মাত্রেই পাগল, কিম্বা পাগল মাত্রেই প্রতিভাশালী। এর মানে এই যে, প্রতিভাশালী কারো কারো স্বভাব-চরিত্রে পাগলামি দেখা যায়। অনেক স্থলে তা নির্দোষ পাগলামি—যেমন ছিটওআলা বা খেয়ালী কোন কোন প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর যে উন্মত্ত প্রলাপের কথা বলতে যাচ্ছি, বিদ্বেষ ও অকৃতজ্ঞতা তাকে কলুষিত করেছে।

গত ১৬ই আগস্টের সাপ্তাহিক "বোম্বাই ক্রনিক্‌ল্" কাগজে সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তাতে তাঁর অনেক প্রশংসা আছে, তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা আছে। এই সবই সত্যি কথা, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁর চরিতাখ্যায়ক মদনগোপাল নামক জনৈক লেখক কেন যে খাপছাড়া ভাবে বিজ্ঞানী রামনের বাঙালীদের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তি লিপিবদ্ধ

করেছেন এবং বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলরী কেনই বা তা ছেপেছেন বুঝতে পারি না।

He is a man of strong likes and dislikes. His prejudice against Bengal. for instance, is very deep-set. He sees nothing good in Bengal and sincerely believes that the Bengalees have made no contribution whatsoever to the life of the country. In a mood of half-jest and half-seriousness he said to me : "Don't you think they have these Bengalees, some taint of Mongoloid blood in them? At least I do. After the war when the provincial boundaries are re-drawn, it would be a very good thing if Bengal could be shunted out of India and joined to Burma. We in India would be a happier family."

শোনা যায়, একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক জন বন্ধু তাঁকে বলেন, "অমুক লোকটা আপনার খুব নিন্দা করছিল।" তাতে তিনি বলেন, "কই, আমি তার কখনো কোন উপকার ক'রেছিলাম ব'লে ত মনে পড়ছে না; তবে কেন সে আমার নিন্দা করছে?" রামন্ খুব প্রতিভাশালী লোক, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা দেশ ও বাঙালী তাঁকে প্রতিভা বিকাশের ও প্রকাশের সুযোগ ও উপকরণ না দিলে তিনি জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী হ'তে পারতেন না। কাজেই তিনি বঙ্গের ও বাঙালীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে বিষম বাঙালীবিদ্বেষী হয়েছেন। এতে বাঙালীর কিছু ক্ষতি নাই। এতে কেবল তাঁর ক্ষুদ্রাশয়তা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছে।

বাংলা দেশ ও বাঙালীর নিকট থেকে প্রাপ্ত উপকারের বোঝা অসহ্য হওয়াতেই যে বিজ্ঞানী রামন্ বাঙালীর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করেছেন তা নয়;—অন্য কারণও আছে। তিনি কল্‌কাতায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভা ও তার পরীক্ষণাগার প্রভৃতি দখল করবার চেষ্টায় ছিলেন। বাঙালীর চেষ্টায় সেখান থেকে তাড়িত হন। বাঙ্গালোরে তিনি জামশেদজী তাতা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানভবনের ডিরেক্টর ছিলেন। সেখানে তাঁর স্বৈরাচাব স্বার্থপরতা ও খামখেয়ালি ব্যবহারে তিনি কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন এবং অনেকটা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাঙালী সদস্যদের চেষ্টায় ডিরেক্টর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখন একজন বাঙালী—ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—তার ডিরেক্টর।

রামন্ বলেছেন, বাঙালীদের রক্তে মোঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণও আছে। এটা নূতন কথা নয়। রিজলী অনেক আগে বলে গেছেন যে, বাঙালীরা কতকটা মোঙ্গোলোদ্রাবিড়, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তা স্বীকার করে গেছেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে নৃতত্ত্বের বিচারে কোনো অমিশ্র জা'ত ("Pure race") নাই। তথাকথিত আর্য্যেরাও খাঁটি আর্য্য নয়। আর মোঙ্গোলীয় হওয়াতে ত কোন অপমান নাই। মোঙ্গোলীয় চীনেরা প্রাচীন কালেই মুদ্রণশিল্প ও অন্য নানা শিল্প উদ্ভাবন করে।

কংফুচ লাওৎসে প্রভৃতি চীন উপদেষ্টারা জগদ্বরেণ্য। চা রেশমে চিনি সয়া শিম প্রভৃতির উৎপাদন প্রাচীন কাল থেকে চীনে চ'লে আসছে। চৈনিক ও জাপানী চিত্রকরেরা জগতে প্রসিদ্ধ। জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা অনেক নূতন আবিষ্ক্রিয়া করেছে। বর্তমান সময়ে জাপানের আসুরিক দৌরাত্ম্যে পৃথিবী কম্পমান, এবং স্বাধীনতা ও স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে চীনের শৌর্য্য অনতিক্রান্ত।

সর্ চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামনের উন্মত্ত প্রলাপের সমুচিত জবাব দিয়েছেন বোম্বাইয়ের

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার ২২শে আগস্টের সংখ্যায়। এই কাগজ যোগ্যতার সহিত ৫২ বৎসর চলছে। এর সম্পাদক রামনেরই মত মান্দ্রাজী এবং খুব যোগ্য সাংবাদিক। রির্ফমার লিখেছেন :—

SIR C. V. RAMAN ON BENGALEES

Last week's *Sunday Chronicle* published what purported to be character sketch of Sir C. V. Raman the eminent Indian physicist, by Mr. Madan Gopal. In it, the writer without rhyme or reason introduced a venomous tirade against Bengal and Bengalees, which has not value whatever as a key to the life and work of his subject. The writer described his hero as a man of "strong likes and dislikes," which no scientist should be, and to illustrate this trait in Sir Chandrasekhar, mentioned his antipathy to Bengal and Bengalees. He said :

"His (Raman's) prejudice against Bengal, for instance, is very deep-set. He sees nothing good in Bengal and sincerely believes that the Bengalees have made no contribution whatsoever to the life of the country. In a mood of half-jest and half-seriousness he said to me : "Don't you think they have, these Bengalees, some taint of Mongoloid blood in them? At least I do. After the war when the provincial boundaries are re-drawn, it would be a very good thing if Bengal could be shunted out of India and joined to Burma. We in India would be a happier family." He also believes that the Pakistan cry has been raised and backed up by the vested interests here."

Mr. Madan Gopal himself says that these words were not spoken in entire seriousness. It was quite wrong of him to repeat remarks so wounding to the feelings of over fifty millions of his countrymen, especially as every educated Indian knows that every statement in Sir Chandrasekhar's outburst is untrue, is, indeed, palpably false. Sir C. V. Raman when he speaks of "the taint of Mongoloid blood" in Bengali veins, strays from his proper field of Physics. His opinion on racial mixtures is worthless. He was indulging in a pseudo-scientific assumption solely with a view to invest his prejudice with an air of scientific precision. Why should an admixture of Mongoloid blood be a "taint" any more than an admixture of "Austroloid" blood which some anthropologists suspect in the South Indian? Lovat Fraser who reported a tour of Lord Curzon in East Bengal, wrote of the Pandits who presented an address in Sanskrit to the Viceroy, as resembling, in their ceremonial dress, ancient Romans more than any Indian people.

That the Bengalees have made no contribution to the culture and life of the country is so monstrous a mis-statement that it is incredible that it should have proceeded from any sane Indian. Even in Sir C. V. Raman's own field, Sir Jagadish Chunder Bose achieved a world-wide reputation before anybody heard of Sir C. V. Raman. And Sir Jagadish unlike Raman, traced his own great discoveries to the inspiration of the ancient wisdom of India. Then

in the larger sphere of life, Bengalee thinkers and workers have led the way for the rest of India—Raja Ram Mohan Roy, the Tagores, Iswarchandra Vidyasagar, Ramakrishna Paramahamsa. What province has produced such a fine galaxy of women leaders like Mrs. P. K. Roy, Lady Bose, Mrs. Saraladevi Choudarani and Mrs. Sarojini Naidu? Bengalees are said to be clannish but Bengalee women have married non-Bengalees and set examples of progressive womanhood in whatever part of the country they live in. Bengalee scholars like Kalidas Nag, Benoy Kumar Sarcar, have taken as their field wide areas which were neglected by most other provincials. Speaking broadly, there have been more Bengalees with a world outlook than natives of other provinces. As for original ideas, it is enough to say that Swami Vivekananda had the largest following in Madras and Arabindo Ghose's Ashram flourishes in South India. But for these and other illustrious Bengalees where would India be today? In religion, in literature, in social reform, in politics, Bengal has been the vanguard of Indian progress. Sir Syed Ahmed said that the Bengalees were the only people of whom Indians might be proud. Gokhale many years later said that what Bengal thinks today, the whole of India thinks tomorrow. There is no province in India which has a prouder and fuller record of contributions to national life than Bengal. Sir C. V. Ramam would be glad to see Bengal joined to Burma in the post-war settlement. Then, he thinks, India will be a happy home. Yet he is apparently opposed to Pakistan which rests on the same illusion. India without Bengal would be a nation without eyes and ears.

Sir. C. V. Raman would be spending his days in the pensioned obscurity of a retired official but for the far-seeing patriotism and breadth of outlook of the great Bengalee, Sir Asutosh Mukherjee. It was Sir Asutosh who drew to Calcutta, the cream of India's intellect from all parts of the country and gave it the opportunity to make its contributions to world culture. One of the most touching tributes to Sir Asutosh at his death came from an Anglo-Indian. Sir Asutosh who was no ornamental Vice-Chancellor, saw from the young man's college work and examination papers that he had real talent. He provided him with a scholarship to pursue post-graduate studies abroad. Sir Asutosh was not content with that. He saw him off at the Bunder and kept up a correspondence with him about his progress, amidst his heavy engagements as a Judge of the Calcutta High Court and the greatest Vice-Chancellor of the largest Indian University. It is, to say the least, ungracious of Sir C. V. Raman to speak, of the people from whom Sir Asutosh sprang and whom Sir Asutosh loved, in the terms in which he is reported to have spoken of them. We have been expecting a repudiation which we hope may yet be forthcoming. It is true that at present Bengal has rather gone into the background. She

has not yet recovered from the wounds of the Partition. Communalism has persisted even after the modification of the Partition, and hampered Bengal functioning in the full vigour of her genius. The Gandhian Congress, with its particularist and provincial ideas, added to her difficulties. But she is emerging out of her travail. The Hindu-Muslim question is being solve there on the basis of the common Bengali origin and culture of the two communities. Bengal has played a great part in the evolution of modern India and she has a yet greater part to play in shaping the country's future. It is a Bengali poet who was inspired to compose the beautiful hymn which all India has accepted as the National Anthem.

আমাদের বাঙালীদের দোষত্রুটি অনেক আছে। অন্যান্য জাতিরও তা আছে, ব'লে আমরা আত্মদোষক্ষালন করতে চাই নে। আমাদের নানা দোষত্রুটিসত্ত্বেও যে একজন মান্দ্রাজী সাংবাদিক ভ্রাতা বাঙালীদের কৃতিত্বের কথা লিখেছেন, তার জন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি যা লিখেছেন, তাতে আর একটা কথা যোগ ক'রে দেওয়া যায়। বাংলা সাহিত্য যে বাঙালীর একটা অসাধারণ কৃতিত্ব, তার এই একটা প্রমাণই যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষের অন্য সব আধুনিক প্রাদেশিক সাহিত্যে বাংলা বিস্তর গ্রন্থের অনুবাদ আছে, এবং বাংলা সাহিত্য থেকে অন্যান্য প্রদেশের লেখকেরা অনুপ্রাণনা পেয়েছেন।

১৩৪৬ কার্ত্তিক

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

ভিয়েনার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের লণ্ডনে মৃত্যু হইয়াছে। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। এই জন্য অষ্ট্রিয়া যখন জার্মেনীর হস্তগত হয়, তখন তিনি জার্ম্যানদের ইহুদীবিদ্বেষের ফলে অষ্ট্রিয়া ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে বাধ্য হন। তিনি মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) বিদ্যার জনক। এ-বিষয়ে তিনি প্রথম প্রথম যে-সকল মত প্রকাশ করেন, পরে নিজেই তাহার কোন কোনটি পরিত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করেন; তাঁহার শিষ্য ও সমালোচকগণও কিছু কিছু ভুল দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণতার খোরাক জোগান যে-সব গল্প-লেখকের প্রধান উপজীব্য, তাহারা ফ্রয়েডের কতকগুলি থিওরির দোহাই দিতে এখনও ছাড়ে নাই।

বিজ্ঞানের নানা কথা

১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ

[আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের টোটেম চিত্র]

পর পৃষ্ঠায় যে চিত্রটি দেওয়া গেল, উহা লাল ইণ্ডিয়ান্ বা আমেরিকার আদিম নিবাসী কতকগুলি ব্যক্তির একখানি দরখাস্ত। তাহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতির নিকট সুপীরিয়র হ্রদের (১০) নিকটবর্ত্তী কতকগুলি হ্রদের (৮) স্বত্বের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ছবিগুলির অর্থ বুঝা চাই। তৎপূর্ব্বে আর একটি কথা জানা দরকার। ইণ্ডিয়ানদের এক এক গোত্রের এক একটি টোটেম (totem) আছে। এই টোটেমটি কোন জড় বস্তু, উদ্ভিদ্ বা ইতর প্রাণী হইতে পারে। এক গোত্রের লোকেরা এই টোটেমের বংশজাত ও তাহার সহিত আপনাদিগকে অদৃশ্য গূঢ় সম্বন্ধে সম্বন্ধ মনে করে। যদি মাছ কাহারও টোটেম হয়, তাহা হইলে সে মাছের প্রাণ বধ করা বা মাছ ভক্ষণ করা মহাপাপ মনে করে। টোটেম বধ বা ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ, কখন কখন টোটেম স্পর্শন বা দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইণ্ডিয়ানেরা আপনাদিগকে টোটেমের নামে অভিহিত করে এবং শরীরে টোটেমের ছবির উল্কি ধারণ করে। এক্ষণে দরখাস্তটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। দরখাস্তকারীদের দলপতি অস্কাবাবিসের টোটেম বক। এইজন্য একটি বক (১) দ্বারা তাহাকে সূচিত করা হইয়াছে। তাহার অনুচরদের কাহারও টোটেম ভালুক, কাহারও ক্ষুদ্র কচ্ছপ, কাহারও মার্টেন নামক নকুলসদৃশ জন্তু, আবার কাহারও টোটেম বা নরমৎস্য (৬)। এইজন্য অনুচরেরাও দলপতির মত নিজ নিজ টোটেম দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অনুচরদের চোখ এক একটি রেখা দ্বারা দলপতির চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তাহাদের মত এক। তাহাদের হৃৎপিণ্ডগুলিও এই রূপে যুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তাহাদের ভাবের (feeling) ঐক্য আছে। দলপতির চক্ষু হইতে একটি রেখা যুক্তরাজ্যের সভাপতি মহাশয়ের দিকে গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে আবেদনটি তাঁহারই নিকট করা হইয়াছে। আর একটি রেখা, কিসের জন্য দরখাস্ত করা হইতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য (৮) চিহ্নিত হ্রদগুলির দিকে গিয়াছে। কিরূপে লিখনের সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হইবে বলিয়া এই অদ্ভুত দরখাস্তটির অবতারণা করিয়াছি। সংক্ষেপে লিখনবিদ্যার ক্রমবিকাশ এইরূপে হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। প্রথমে কোন বস্তু বা জন্তু বুঝাইতে হইলে তাহার চিত্র আঁকা হইত। তাহার পর কোন গুণ বা ভাব বা মানসিক অবস্থা বুঝাইতে হইলে তদুপযোগী ছবি আঁকা হইত। যেমন, ধূর্ত্ততা বুঝাইবার জন্য শৃগালের, আনন্দ বুঝইবার জন্য নৃত্যগীতপরায়ণা নারীর চিত্র। তাহার পর শৃগালের ছবি দ্বারা হয়ত কেবল শৃ এই অক্ষর (syllable) টি বুঝাইত। ক্রমে উহা কেবল "শ্" এই ধ্বনিসূচক একটি বর্ণে পরিণত হয়। অবশ্য ইহা একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত মাত্র। সকল দেশেই যে এই ক্রম অনুসারে লিখনবিদ্যার বিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নয়।

[কাগজের আবিষ্কার]

কে প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল, কেহই বলিতে পারে না। কোন জাতি প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে, তদ্বিষয়ে তত সন্দেহ নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে মিসর দেশের লোকেরাই প্রথমে

কাগজ প্রস্তুত করে। চীনারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে কাগজ তৈয়ার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানুষের আগে আর একটি ক্ষুদ্র জীব কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিত এবং এখনও কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। তাহা বোল্‌তা। বোল্‌তার মুখে দুটি ধারাল করাত আছে। তাহার বর্দ্ধিতায়তন ছবি এখানে দেওয়া গেল। এই করাতদুটির সাহায্যে বোল্‌তা কাঠ কাটিয়া সূক্ষ্ম করাতের গুঁড়ার মত গুঁড়া প্রস্তুত করে। তাহার পর নিজ মুখনিঃসৃত শিরিশের মত চট্‌চটে লালা মাখাইয়া এই গুঁড়াগুলির তাল পাকায়। তাহার পর এই মণ্ডটিকে জিহ্বা, ঠোঁট ও পায়ের দ্বারা বিস্তৃত করিয়া কাগজ প্রস্তুত করে। তাহার ছোট ছোট কামরাগুলি এই কাগজ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। মানুষেও আজকাল কাষ্ঠমণ্ড দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। ছেঁড়া কাপড় হইতে প্রস্তুত কাগজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাষ্ঠমণ্ডের কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার না করিলে কোন পদার্থ হইতেই কাগজ প্রস্তুত হয় না। আজকাল আমেরিকায় কাপাসের বীজের খইল হইতে কাগজ তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা সফল হইলে এই কাগজই সকলের চেয়ে সস্তা হইবে। আমাদের দেশে সাবে বা বাবুই ঘাস হইতে সস্তাকাগজ প্রস্তুত হয়। অন্বেষণ করিলে আমাদের দেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপযোগী আরও অনেক উদ্ভিদ্ পাওয়া যাইতে পারে।

১৩০৮ আশ্বিন ও কার্ত্তিক

[গণিতবেত্তা আব্রাহাম দ্যঃ মোয়াভ্র্]

আব্রাহাম দ্যঃ মোয়াভ্র্ (Abraham de Moivre) অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গণিত বেত্তা। ইনি ফরাসীজাতীয় হইলেও ইংলণ্ডেই বাস করিতেন, এবং ইংরাজী ভাষায় তাঁহার পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। ইহাঁর মৃত্যু অত্যন্ত বিস্ময়কর। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ দেন যে, সেই দিন হইতে প্রত্যহ তিনি পূর্ব্বদিন অপেক্ষা ১৫ মিনিট অধিক ঘুমাইবেন এবং নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে যেন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করা না হয়। যে দিন তিনি ২৪ ঘণ্টা অধিক ঘুমাইলেন, সেই দিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে গিয়া তাঁহার ভৃত্য দেখিল যে, প্রভু পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অদ্ভুত ঘটনাটী মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের একটি ভাবিবার বিষয়।

[জ্যামিতির আবিষ্কার]

ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞার চিত্রকে গ্রীক গণিতবেত্তা ও দার্শনিক প্লেটো (Plato) তাঁহার State নামক গ্রন্থে 'বৈবাহিক চিত্র' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরবদেশীয় গণিতবেত্তাগণ ইহাকে 'নবোঢ়া-পত্নী-চিত্র' বলিয়াছেন*। আরব্য নামটী যে গ্রীক্ নামের সংস্কারমাত্র তাহা সহজেই বুঝা

* "The Arabs call the 47th proposition of the 1st book of Euclid 'the figure of the bride'. I do not know why"—E. Strachey's *Bija Ganita* p 54

যায়। কারণ আরবীয়েরা গ্রীক্ এবং হিন্দুদিগের নিকট অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীক্-ইতিহাসবেত্তা প্লুটার্ক বলেন, প্লেটো এই নাম পিথাগোরাস্এর নিকট পাইয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ সমকোণী ত্রিভুজের লম্বকে পুং-রেখা, ভূমিকে স্ত্রী-রেখা এবং কর্ণকে সন্তান-রেখা কহিয়াছেন। অল্‌মান্ (Allman) নামক একজন ইংরাজ সম্প্রতি একখানি বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রীক্ জ্যামিতির ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি এই বিচিত্র নামকরণের একটী বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্যামিতির সৃষ্টিকর্ত্তা ঈজিপ্টের পুরোহিতগণই সমকোণী ত্রিভুজের ভুজত্রয়কে প্রথম এই সকল নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, ঈজিপ্টের প্রাচীন পুরোহিতগণের গ্রন্থে দেখা যায় যে, একটী বস্তু আর দুইটী বস্তু হইতে উৎপন্ন হইলে, ইহাঁরা শেষোক্ত বস্তুদ্বয়কে জনক ও জননী এবং পূর্ব্বোক্ত বস্তুকে সন্তান বলিতেন। সমকোণী ত্রিভুজের ভুজত্রয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রগুলির পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্পর্ক। কারণ, কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের বর্গফল, অপর দুইটী ক্ষেত্রের বর্গফলের সমষ্টির সমান। সুতরাং পুরোহিতগণের নামকরণ প্রণালী অনুসারে কর্ণস্থিত বর্গক্ষেত্র সন্তান-ক্ষেত্র এবং অপর দুইটী স্ত্রী এবং পুরুষ ক্ষেত্র হইবে। আবার বর্গক্ষেত্রের বর্গফল উহার ভুজ-পরিমাণের বর্গ, সুতরাং সমকোণী ত্রিভুজের তিনটী ভুজেরও পরোক্ষভাবে উৎপাদক-উৎপন্ন সম্পর্ক। এই জন্য কর্ণ সন্তান-রেখা এবং অপর ভুজদ্বয় স্ত্রী এবং পুরুষরেখা নামে অভিহিত।

১৩০৮ অগ্রহায়ণ ও পৌষ

বৈজ্ঞানিক।

[নিকোলা টেস্‌লা প্রসঙ্গ]

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত জানেন যে, আমাদের চারিদিকে যে বায়ু আছে, তাহার পাঁচ বোতল হইতে এক এক বোতল অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়। ঐ গ্যাস ব্যতীত, কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থ পুড়িতে পারে না, এবং ঐ গ্যাসে পোড়াইলে এত প্রবল বেগে কাষ্ঠাদি পুড়িতে থাকে যে তখন প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে। নাইট্রোজেনের দাহিকা শক্তি নাই। তাই বায়ুতে কাষ্ঠাদি মৃদুবেগে পুড়িতে থাকে, তাপও তত পাওয়া যায় না। পাঁচ বোতল বায়ুতে এক বোতল অক্সিজেন, চারি বোতল নাইট্রোজেন। বিলাতের ব্রিণ কোম্পানি বায়ু হইতে অক্সিজেন পৃথক্ করিয়া কয়েক বৎসর হইতে বিক্রয় করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের রাসায়নিক উপায়ে বিস্তর ব্যয় হয়, কাজেই সকল আবশ্যক কাজে অক্সিজেন ব্যবহার করিতে পারা যায় না। সম্প্রতি রাউল পিক্‌টে নামক এক ব্যক্তি অল্পব্যয়ে অক্সিজেন পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বায়ুকে জমাইয়া জলের মত দ্রব করিতে পারা যায়। কিন্তু অক্সিজেন---১৮৩°শ, এবং নাইট্রোজেন—১৯৫°শ শীতে জমাইতে পারা যায়। সুতরাং বায়ুকে—১৮৩°শ পর্য্যন্ত শীতল

করিলে অক্সিজেন গ্যাসকে জলের মত দ্রবাকারে পাওয়া যায়, কিন্তু তখন নাইট্রোজেন গ্যাসের আকারেই থাকে। এইরূপে উভয়কে পৃথক করা সহজ হইয়া পড়ে। যাহাহউক, উদ্ভাবক বলেন, এক ঘন গজ অক্সিজেন পাইতে আধ পয়সারও কম খরচ পড়ে। এত সুলভ হইলে খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন অল্পব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। এখন যত কয়লা পোড়াইতে হইতেছে, অক্সিজেনের সহিত পোড়াইতে পারিলে তদপেক্ষা অনেক কম কয়লায় ইচ্ছানুরূপ তাপ পাওয়া যাইবে। বড় বড় লোহা, ইস্পাত জুড়িতে আর তাপের ভাবনা করিতে হইবে না। থিয়েটার, হাঁসপাতাল, প্রভৃতি স্থানের বায়ুকে বিশোধিত করা সহজ হইয়া পড়িবে। ফলে অনেক ব্যবসায়, কারখানায় যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে।

আমাদিগের চারিদিকের বায়ুরাশি বা আবহ প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে প্রায় ৭ সের চাপ প্রয়োগ করে। ইঞ্চ হিসাবে আবহের প্রভূত চাপের আন্দাজ পাওয়া যায় না। গণিত দ্বারা জানা যায় যে, প্রতি বর্গ ফুট জায়গায় আবহের চাপ প্রায় এক টন (২৭ মণ), দশ বর্গফুট জায়গায় প্রায় ১০০ টন। যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে ৩২।৩৩ ফুট গভীর জল থাকিত, সেই জল ভূপৃষ্ঠকে যত ভারে চাপিত, আবহের ঠিক তত চাপ। কলিকাতার ঘর বাড়ির তার তথাকার ভূপৃষ্ঠকে বহিতে হইতেছে। কলিকাতার উপরের আবহের চাপও প্রায় ঐ সকল ঘরবাড়ীর সমান।

এত চাপের খানিকটা কম পড়িলে তাহার ফল প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। বায়ুমানের (baromoeter) পারা আধ ইঞ্চও নামিয়া আসিলে জানা যায়, প্রত্যেক বর্গফুট স্থান হইতে ১৮ সের চাপ কম পড়িয়াছে। বহুবিস্তৃত স্থানে তখন যে কত চাপ কম পড়ে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আবহের চাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে সমুদ্রের জলও উচ্চনীচ হইতে পারে। এতদ্দারা ভারের এত প্রভেদ ঘটে যে, তাহাতে কঠিন ভূপৃষ্ঠেও প্রত্যক্ষযোগ্য ফল ঘটিতে পারে। সমুদ্রের জোয়ারের জল এক ফুট কম হইবার অর্থ, প্রত্যেক বর্গ মাইল জলপৃষ্ঠ হইতে ৮০০০০০ টন ভার কম পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আবহের চাপ এমনই কম পড়িবার সময় ভূকম্প হইয়া থাকে। কথাটা অসম্ভব নয়। উপরের চাপ কম পড়িলে ভূনিম্নস্থ গ্যাস বাহিরে আসিবার সুযোগ পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির উপক্ষেপ ঘটাইতে পারে।

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে আবহের উষ্ণতা ও অন্যান্য অবস্থার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এতদিন কিন্তু তাহা জানা ছিল না। গত বৎসরের ২৮মে দিবসের সূর্য্যগ্রহণ কালীন আবহের অবস্থা বিচার করিয়া আমেরিকার আবহবিৎ হেল্‌ম ক্লেটন সাহেব এক নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, সূর্য্যগ্রহণ সময়ে একটা ছোট খাট বাতাবর্ত্ত জন্মে। তাহার শীতল কেন্দ্র চন্দ্রের ছায়ার সহিত পৃথিবীর উপর দিয়া ঘণ্টায় ৬৫০০ হাত বেগে ধাবিত হইয়াছিল। আবহের উষ্ণতাহ্রাসই ঐ বাতাবর্ত্তের প্রধান কারণ। এই অল্প হ্রাসে যে বাতাবর্ত্ত জন্মিতে পারে, তাহা আবহবিদ্যার একটি নূতন তত্ত্ব। ইহা হইতে ক্লেটন সাহেব আর একটি তত্ত্ব অনুমান করিয়াছেন। সকলেই জানেন, এক অহোরাত্রের মধ্যে আবহের চাপ দুইবার বাড়ে, দুইবার কমে। এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ জানা ছিল না। ক্লেটন সাহেব মনে করেন, আবহের উষ্ণতার বৈষম্যেই আবহের এই প্রকার জোয়ার ভাটা দেখা যায়। প্রতিদিন দিবাভাগে আবহ খুব গরম হয়, এবং রাত্রে তেমনই শীতল হয়। উষ্ণতার প্রভেদে একদিনের মধ্যেই দুইবার

ছোটখাট বাতাবর্ত্ত জন্মিবার সম্ভাবনা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৯ আগস্ট তারিখে একবার সূর্য্যগ্রহণ হয়। তখনকার আবহের অবস্থা বিচার করিয়া নরওয়ের বৈজ্ঞানিক এক্কেল ষ্টীন সাহেব দেখিয়াছিলেন যে, আবহের চাপের দৈনন্দিন হ্রাসবৃদ্ধির মত উক্ত সূর্য্যগ্রহণ সময়েও ঘটিয়াছিল।

বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগে, আজকাল নানাবিধ কৃত্রিম বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। রসায়নবিদ্যার প্রসার কোথায় শেষ হইবে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। কৃত্রিম নীলরঙ্গের উৎপাত এদেশের কৃষককুলও বুঝিতে পারিয়াছে। কৃত্রিম হীরামাণিক রেশমের সংবাদও অনেকে পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম বস্তু দ্বারা চমৎকারা অন্নচিন্তার লাঘব হইতেছে না। কোন উপায়ে যদি ধানচাল উৎপাদন করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে জৈব রসায়নের উন্নতির সার্থকতা বুঝিতে পারিতাম। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু এই রকমের একটা সংবাদ প্যারিসের পাস্তর চিকিৎসালয়ের জনৈক রাসায়নিক প্রচার করিয়াছেন। কার্পাস হইতে রেশম করা, কিংবা কাঠের গুঁড়া বা নেকড়ার টুকরা হইতে চিনি তৈয়ারি করায় বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু তত নাই। কেননা এক্ষণে জৈবপদার্থ ব্যতীত এই সকল জৈবপদার্থের উৎপত্তি হইতেছে না। চাউলের মূল উপাদান কয়লা, জল, নাইট্রোজেন, ও খানিকটা মাটী। রাসায়নিক চাউলকে বেশ স্বচ্ছন্দে এই সকল মূল উপাদানে ভাঙ্গিতে পারিতেছেন, কিন্তু ঐ সকল উপাদান লইয়া একটি চাউল গড়িতে পারেন না। এখন পারেন না বলিয়া যে কোন কালে পারিবেন না, তাহা বলা ধৃষ্টতা। কিছু কাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক বার্থেলো (Berthelot) বলিয়াছিলেন যে ভবিষ্য মানবকুল রাসায়নিক মন্দিরে প্রস্তুত খাদ্যের উপর নির্ভর করিবে। কথাটা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাজারে বিলাতী কৌটা পূর্ণ নানাবিধ প্রস্তুত খাদ্য দেখিলে প্রকৃতির কতখানি কাজ রাসায়নিকের হাতে আসিয়াছে তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ইহাদের সহিত উপস্থিত প্রসঙ্গের আকাশ পাতাল প্রভেদ। পাস্তর চিকিৎসালয়ের রাসায়নিক ডাঃ এটার্ড সম্প্রতি নাকি এমন কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে গড়িতে পারিবার গুপ্তবিদ্যার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন অজৈব পদার্থ (যেমন কয়লা, হাইড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক) হইতে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যদি চাউলকে ভাঙ্গিতে পারা যায়, এবং কোন কোন জৈব পদার্থ জীব বিনা গড়িতেও পারা যায়, তাহা হইলে চাউলই বা কেন গড়িতে পারা যাইবে না। কৃত্রিম চিনি, কৃত্রিম কুইনীন রাসায়নিকের মন্দিরে প্রস্তুত হইয়াছে। যদি ফুলের রঙ্গ, ফুলের গন্ধ, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তবে চাউল ডাইল আলু মাছ কেননা পারা যাইবে? উল্লিখিত পরীক্ষা সমূহে নাকি এই প্রকার গড়া কাজের হদিশ পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু তবুত কয়লা জল চাই। একটা বিষম চিন্তা সম্প্রতি নিকোলা টেস্লার মস্তিষ্ক গরম করিয়াছে। ইহাঁর নাম সকলেই জানেন। এডিসনের ন্যায় ইহাঁর নামও জগদ্বিখ্যাত। ইনি অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর নিকটে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি তাড়িতের কারখানায় কাজ করিয়া ১৯ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় এডিসনের কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে অল্পকাল কাজ করিয়া আর এক তাড়িত কোম্পানীর সহিত জুটিয়াছেন।

মানুষটির পরিচয় এই, কিন্তু এপরিচয়ে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না। সকল লোকেরই

কল্পনাশক্তি আছে, কাহারও বেশী, কাহারও বা কম। কিন্তু টেস্‌লার কল্পনার সাহসের তুল্য কাহারও নাই। তিনি বলিতেছেন, কয়লা জল জড় পদার্থ ত; চারিদিকে এত অফুরন্ত আকাশপদার্থ আছে, তাহা হইতে তৈয়ারি করিয়া লইতে পারা যাইবে! তাঁহার নিকট বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ একটা ছেলেখেলা। সমুদ্রের এপার হইতে ও পারে বিনা তারে তাড়িত সংবাদ পাঠানও বড় একটা কঠিন কথা নয়। সমুদ্রই বা কতটুকু! এই পৃথিবীতে এমন একটা তুমুল তাড়িত সংক্ষোভ জন্মাইতে পারা যাইবে, যাহার ধাক্কা শুক্র ও মঙ্গালের ন্যায় নিকটবর্ত্তী গ্রহের 'মানুষেরা' টের পাইতে পারিবে!

কাঠ কয়লা না পোড়াইয়া তাপ পাইবার যোগাড় টেস্‌লা করিতেছেন। সূর্য্যের এত তাপ; সেই আদি তাপাধার ছাড়িয়া বনের কাঠ, মাটীর কয়লার জন্য লালায়িত হওয়া বাস্তবিক অসভ্যতা। তিনি দর্পণ ও আতশী কাচ যোগে সূর্য্যের তাপ ঘনীভূত করিয়া এমন প্রচণ্ড তাপের যোগাড় করিতেছেন যে, তাহার তুলনায় কাঠ কয়লার আগুন শীতল বোধ হইবে। তাপ পাইলে তাড়িত উৎপাদনের ভাবনা থাকিবে না, তাড়িতের ভাবনা গেলে যে সে লোকের ঘর কন্নার রাঁধাবাড়া, প্রদীপ জ্বালা, সবই অনায়াসে চলিতে পারিবে। খরচই বা কি? সূর্য্যের তাপ একত্র করার কথা। কাজেই কাঠই বল, কয়লাই বল, কেরোসিনই বল, কিছুই দরকার থাকিবে না।

এসকলেও তাঁহার সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল না। মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তার আসনে বসাইতে না পারিলে আর কি হলো! জড়ের যোগাযোগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব। সেই জড় যদি উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই মানুষ একটি ছোট খাট সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারিবে। বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্র বলেন যে, জড় লোপও করিতে পারা যায় না, সৃষ্টিও করিতে পারা যায় না। একথা সত্য, কিন্তু তাঁহার মতে বলা উচিত এ পর্য্যন্ত লোপ বা সৃষ্টি করিতে পারা যায় নাই। কেননা, সৃষ্ট জড় লইয়াই রাসায়নিকেরা নাড়াচাড়া করিতেছেন। কিন্তু তা বলিয়া জড়ের ধ্বংস বা সৃষ্টি করা অসম্ভব বলা অন্যায়। লর্ড কেল্‌ভিন জড়ের যে আদিরূপ বলিয়াছেন, তাহাকেই ধরিয়া টেস্‌লা প্রত্যক্ষ যোগ্য জড় সৃষ্টি করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন। লর্ড কেল্‌ভিনের অনুমান আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের মতের তুল্য। বিশ্বব্যাপী আকাশ পদার্থ হইতে যাবতীয় জড়ের উৎপত্তি। পুষ্করিণীর স্থির জলে আবর্ত্ত জন্মিলে যেমন তাহা চারিদিকের জল হইতে পৃথক দেখায়, তেমনই সর্ব্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় আকাশের কোন স্থানে আবর্ত্ত জন্মিলে তাহা জড়ের আকার ধারণ করে। কথাটা মোটামুটি এই। তবে আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা আবর্ত্তিত আকাশ মাত্র। আকাশে আবর্ত্ত জন্মাও, জড় সৃষ্টি হইবে; আবর্ত্ত ভাঙ্গিয়া দাও, জড় আকাশে লীন হইবে। তবে আর জড়ের বিনাশ ও সৃষ্টি তত কঠিন কর্ম্ম কি? খুব শীতে বা অন্য উপায়ে আকাশাবর্ত্ত ভাঙ্গিতে পারিলে, এবং প্রচণ্ড তাড়িতে বা ইহার মত কোন প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আবর্ত্ত উৎপাদন করিতে পারিলে, জড়ের ধ্বংস বা সৃষ্টি করা বাকি থাকিবে না। সুধু কি তাই? যে কোন পদার্থই তখন ইচ্ছামত উৎপাদন করিতে এবং তেমনই ইচ্ছামত তাহাকে শূন্যে মিলাইতে পারা যাইবে। যেখানে এখন কোন জড় দেখিতেছি না, মনে করুন একটা গ্রহ, সেখানে একটা গ্রহের সৃষ্টি হইতে পারিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

১৩০৮ অগ্রহায়ণ ও পৌষ

[যোগেশচন্দ্র রায় এবং নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানগ্রন্থ]

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ভাষায় একখানি হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ"। লেখক গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমখণ্ডে বৈদিককাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমাদের প্রধান জ্যোতিষিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। গ্রন্থকার ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্যোতিষের ক্রমোন্নতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে—হিন্দু জ্যোতিষ। এই অংশ প্রস্তাবত্রয়ে বিভক্ত। পুরাণে, জ্যোতিষসংহিতায় ও জ্যোতিষসিদ্ধান্তে যে যে জ্যোতিষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ এই তিন ভাগে দেওয়া গিয়াছে। জ্যোতিষসিদ্ধান্ত পৃথক্ রাখিয়া গ্রন্থকার অপরাপর বিষয়গুলি পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই খণ্ড প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা হইবে। তিন চারি মাসের মধ্যে এই প্রথম খণ্ড ছাপা শেষ হইবার কথা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিষয়গুলি শুনিয়াই গ্রন্থকারকে পুস্তকখানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। স্বয়ং প্রুফ দেখিবার ভার পর্য্যন্ত লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই গ্রন্থখানির গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

কৃষিবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, "প্রবাসীতে" শর্করাবিজ্ঞান নাম দিয়া যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় মহাজনবন্ধুনামক উৎকৃষ্ট ব্যবসা বিষয়ক মাসিকপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, এবং তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তিকাতে কিছু সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং চিনি প্রস্তুত করিবার এক নূতন যন্ত্র ও প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি সংযুক্ত হইয়াছে।

"কটকের দক্ষিণে বার্হামপুর সহরের ১২ ক্রোশ অন্তরে জে, এফ্, ভি, মিঞ্চিন (Mr. J. F. V. Minchin) সাহেব স্থাপিত আস্কা সুগার ওয়ার্কস নামক চিনির কারখানায় এক অভিনব উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। ইক্ষুদণ্ডগুলি পেষিত না হইয়া কেবলমাত্র ইহাদের বিশেষ একটী কলের দ্বারা চিরিয়া লওয়া হয়। এই সকল চেরা আক্ কতকগুলি নলের মধ্য দিয়া চালিত হয়। প্রত্যেক নলের মধ্যে অতিশয় উষ্ণ জল থাকাতে, এবং চেরা আক্‌গুলি একটী নল হইতে অপর একটী নলে চালিত হওয়াতে, সমস্ত শর্করাভাগ ঐ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত হয়; এবং জৈব পদার্থগুলি উষ্ণতাপ্রযুক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইক্ষুদণ্ডে স্বভাবতঃ যে ৯০ বা ৯১ ভাগ রস থাকে, উহার ৮৪ হইতে ৮৬ ভাগ এই উপায়ে বাহির হইয়া আইসে। পরে নলগুলির মধ্যস্থিত উষ্ণজল ভাল করিয়া ছাঁকিয়া স্ফটিকের ন্যায় পরিণত করিয়া লইয়া শুকাইয়া উহা চিনিতে পরিণত করা হয়। প্রত্যহ ৭০০০ মণ ইক্ষুদণ্ড এই উপায় দ্বারা পরিষ্কার শর্করাতে পরিণত করিতে হইলে, ৪ লক্ষ টাকা দিয়া কল বিলাত হইতে আনাইতে হয়। এই কল প্রেগ্ (Prague) সহরের Bohmisch Mahrische-Maschine fabrik কারখানায় পাওয়া যায়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় Handbook of Indian Agriculture নামক একখানি প্রায় সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী উৎকৃষ্ট কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক

কৃষিজীবী, সুতরাং এরূপ পুস্তক যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিক্ষিত কৃষিজীবী গৃহস্থ মাত্রেরই ইহা কাজে লাগিবে। অনেকে বলেন যে আমাদের দেশের নিরক্ষর চাষারা যে ভাবে চাষ করে, তাহার উপর আর কোন দেশোপযোগী উন্নতি করা যায় না। গ্রন্থকার সেরূপ মনে করেন না। অন্যদেশের কথা দূরে থাক্, আমাদের এই ভারতবর্ষেই মান্দ্রাজ অঞ্চলে তিনি বঙ্গদেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চাষের প্রণালী দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা রক্ষণশীল বটে, কিন্তু, তাহাদের চক্ষের সমক্ষে নূতন যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার সুবিধা দেখাইয়া দিলে তাহারা তাহা অনায়াসে অবলম্বন করে। মান্দ্রাজে একটি কৃষিবিষয়ক কলেজ আছে। পুনা এবং শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রদেশে কানপুরে যে কৃষিবিদ্যালয় আছে, তাহাকে কলেজে পরিণত করা হইবে এবং তথাকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈজ্ঞানিক উপাধি (Degrees in Science) দেওয়া হইবে। পরীক্ষার বিষয়াদি স্থির করিবার জন্য মাননীয় বাবু শ্রীরাম রায় বাহাদুর এবং মেঃ কক্স্, ওয়ার্ড ও হিলকে লইয়া সেনেট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহাঁরা শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এবং কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া সমুদয় বিষয় স্থির করিবেন। বঙ্গদেশেও এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকখানির একখানি সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা সংস্করণ হইলে ইংরাজী অনভিজ্ঞ অনেক গৃহস্থ উপকৃত হইবেন।

১৩২১ শ্রাবণ

তাতার বিজ্ঞানমন্দির।

এলাহাবাদের ইংরাজী দৈনিক লীডার বলেন যে প্রধানতঃ জামষেদ্‌জী তাতার প্রদত্ত অর্থে স্থাপিত বাঙ্গালোর বিজ্ঞানশিক্ষালয়ের প্রথম পরিচালক (director) বিজ্ঞানাচার্য্য মরিস্ ট্রেভার্স্ সাহেব উহার কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হইবার আগেই মাসিক ৬২৫ টাকা পেন্সনে অবসর লইয়াছেন। অধ্যাপক ট্রেভার্সের বৈজ্ঞানিক বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু তিনি যে কাজের জন্য আসিয়াছিলেন তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। শিক্ষালয়ের বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার আমলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, ছাত্রেরাও বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। লীডার বলেন যে এই কাজে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, এবং বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম করিয়াছেন। লাহোরের পঞ্জাবী নামক ইংরাজী সংবাদপত্রও এই মতের সমর্থন করেন। কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে অধ্যাপক রায় মহাশয়কে নিযুক্ত করার পক্ষে একমাত্র ব্যাঘাত এই যে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজের রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, চেষ্টা করিলে উভয় কাজের জন্যই যে ভারতীয় অধ্যাপক পাওয়া যায় না, এরূপ বোধ হয় না।

তাতার বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, ভারতীয় রাসায়নিক নিয়োগ না করিলে, সুদূর-পরাহত বলিয়া বোধ হয়। যে যে দেশে রাসায়নিক নানা শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, তাহারা সকলেই ভারতবাসীদিগকে ক্রেতা রাখিতেই ব্যগ্র। সে-সব দেশের কোন অধ্যাপক সমস্ত হৃদয়ের সাহিত ভারতীয় ছাত্রদিগকে রাসায়নিক শিল্প শিখাইয়া স্বজাতির মুখের অন্ন কাড়িয়া লইবার সাহায্য করিবেন, ইহা খুব সম্ভব মনে হয় না। অধ্যাপক রায় মহাশয় বিস্তর নূতন রাসায়নিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে যেমন তাঁহার দক্ষতা, তেমনি তাঁহার উৎসাহ। তাঁহার অনেক ছাত্রও রাসায়নিক আবিষ্কার দ্বারা খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাহার পর তিনি একটি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কারখানার স্থাপনকর্ত্তা ও পরামর্শদাতা। কেমন করিয়া নানা রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা তিনি বেশ শিখাইতে পারেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা ও নানাপ্রকারের ছাত্রহিতৈষণার পবিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কলিকাতা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিবে না। কিন্তু তিনি বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানমন্দিরের পরিচালক হইলে আমরা আনন্দিত হইব না, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলি?

১৩২৮ অগ্রহায়ণ

তাতা গবেষণা-মন্দির

পরলোকগত জাম্‌শেদ্‌জী তাতার প্রদত্ত ত্রিশলক্ষ টাকার সম্পত্তিকে ভিত্তি করিয়া মৈসুর রাজ্য ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বাঙ্গালোরে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য এরূপ গবেষণা শিক্ষা দেওয়া যাহার দ্বারা ভারতবর্ষের উদ্ভিজ্জ খনিজ ও প্রাণিজ নানা দ্রব্য হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কার্‌খানায় নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহার কাজ ভাল চলিতেছে না, এইরূপ অভিযোগ কয়েক বৎসর হইতে শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি এবিষয়ে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট একটি কমীটী নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং কেম্ব্রিজের রসায়ন-অধ্যাপক সার্ উইলিয়ম্ পোপ্‌কে তাহার সভাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। কমীটী নিয়োগের সমর্থন আমরা করি। অধ্যাপক পোপের বৈজ্ঞানিক যোগ্যতা সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু কিছু একটা অনুসন্ধান করিতে হইলেই বিলাত হইতে লোক আনাইতে হইবে, ইহার মানে কি? একাজের জন্য ত ভারতবর্ষেই লোক মিলে? কার্জনের আমলে তাতা দান করেন। কিন্তু গবেষণা-মন্দিরটির প্রতিষ্ঠায় বহু বিলম্ব ঘটে। এইজন্য ভারতীয়েরা সন্দেহ করেন, যে, এরূপ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক উৎসাহ নাই ও থাকিতে পারে না; কারণ আমরা নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা কার্‌খানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে শিখিলে কালক্রমে বিলাতী বহু পণ্যশিল্পের ক্ষতি হইবে। গবেষণা-মন্দিরটি স্থাপিত হইবার পর উহার কাজ ভাল করিয়া না-চলারও ভিতরের কারণ ইংরেজদের স্বার্থপরতা

বলিয়া ভারতবাসীরা সন্দেহ করেন। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজ বৈজ্ঞানিকদের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এইসব সন্দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সহজেই বুঝা যায়, যে, বিলাত হইতে আম্‌দানী একজন অধ্যাপকের সভাপতিত্বে যে কমীটী অনুসন্ধান করিবেন, তাহার রিপোর্টে এদেশের লোকেরা হয়ত আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, অধ্যাপক পোপ্ এদেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। এই অনুসন্ধান প্রধানতঃ এরূপ নিরপেক্ষ দেশীলোক দ্বারা হওয়া উচিত ছিল যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী নহেন।

শুনা যাইতেছে, স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে গবর্ণমেণ্ট এই কমিটির অন্যতম সভ্য মনোনীত করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাসায়নিক নহেন, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিবার কোন কার্‌খানাও তিনি স্থাপন বা পরিচালন করেন নাই। তাঁহার কাজ দেখিয়া মনে হয়, যে, তিনি মনে করেন, ওয়ার্কশপ্ ব্যতিরেকেও অধ্যাপক দীর্ঘকাল ব্যবহারিক রসায়ন শিখাইতে পারেন! বলা যাইতে পারিত বটে, যে, তিনি বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনে বিশেষ দক্ষ ও অভিজ্ঞ। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খল দেউলিয়া অবস্থা দেখিয়া তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। উহার অনেক অধ্যাপক নিজেদের কাজে খুব অবহেলা কবেন, কিন্তু কোন তত্ত্বাবধান ও শাসন নাই, তাহার বন্দোবস্ত নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এক প্রস্তাব স্থির হইয়া আছে। বলা বাহুল্য, ইহার মানে মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরই কাজের উপর কমিটি বসান। এমত অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাতা গবেষণা-মন্দিরের অনুসন্ধান কমিটির সভ্য নিয়োগ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতি কার্য্যতঃ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রকারে পরোক্ষভাবে আশু-বাবুর পক্ষ অবলম্বন করায়, তিনিও গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের রিপোর্টটি যেমন চান,তাহা তদ্রূপ করিবার দিকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঝুঁকিয়া পড়িতে পারেন। অবশ্য তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা যে তাঁহাকে এরূপ পক্ষপাত হইতে রক্ষা করিবে না, ইহা আমরা বলিতে পারি না।

যাহা হউক গবর্ণমেণ্ট আশু-বাবুকে যখন নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন আশা করি তাঁহার কাজ তিনি যথাসাধ্য করিবেন। কিন্তু বাংলা দেশে, শুধু বাংলাদেশে কেন, ভারতবর্ষে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্রকে রাসায়নিক গবেষণায় প্রবৃত্ত, উৎসাহিত ও শিক্ষিত করিয়াছেন, এবং যিনি রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসারে কার্‌খানায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন কার্য্যেও দক্ষ এবং অভিজ্ঞ, সেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে এই কমিটির সভ্য কেন করা হইল না, এ প্রশ্ন লোকে করিবেই করিবে। অবশ্য, সর্‌কারী রাসায়নিক চাকরী বিভাগ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে তিনি নিজের যে-যে মত ব্যক্ত করেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিকর না হইবারই কথা। কিন্তু সেই কারণেই ত লোকে বলিতেছে, যে, তাঁহাকে কমিটিব সভ্য না করায়, অনুসন্ধানের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট কিরূপ চান, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

১৩২২ ভাদ্র

বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এমাসের প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন কালের হিন্দু পণ্ডিতেরা কেবল মনস্তত্ত্ব লইয়াই থাকিতেন না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চাতেও প্রাচীন ভারত তদানীন্তন অন্যান্য দেশের অপেক্ষা বহু পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রাচীন হিন্দুরা পরীক্ষা (experiment) দ্বারা বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা কিরূপ বুঝিতেন, তাহা তিনি ঢুণ্ঢুকনাথের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ঢুণ্ঢুকনাথ বলেন—

"যাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয় পরীক্ষা দ্বারা দেখাইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। যে-সকল ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে পরীক্ষাগুলি শিখিয়া নিজে নিজে সেইগুলি করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষার্থী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রগণ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা মাত্র।"

আমরা প্রাচীন ভারতের প্রশংসা করিতে বড় ভয় পাই। প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি আমাদিগকেও আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু পাছে উহা আমাদিগকে আফিঙ্গের নেশার মত পাইয়া বসে, পাছে উহা আমাদিগকে বর্ত্তমানে কর্ম্মবিমুখ করিয়া বসে, এই আশঙ্কা সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণে জাগে। তথাপি যে প্রাচীন ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চ্চার কথা তুলিলাম, তাহা কেবল এই বিশ্বাসটা প্রাণে দৃঢ় করিয়া মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য যে আমরা স্বপ্নবিলাসীদের বংশধর নহি; আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে যেমন সাধক, সিদ্ধ ও অগ্রসর ছিলেন, তেমনি কর্ম্মীও ছিলেন, এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সাধনাতেও সিদ্ধ ছিলেন। ভাল করিয়া নিদ্রা দিবার জন্য প্রাণে এই বিশ্বাস আনিতে চাই না, কাজ করিবার জন্য এই বিশ্বাস চাই।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিচার, ভূবিদ্যা, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বহি পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কখনও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মুখ দেখি নাই। অন্যান্য বহির মত বৈজ্ঞানিক বহিও মুখস্থ করিতাম, এবং কল্পনার সাহায্যে যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেও শিশুদিগকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। আমরা পল্লীগ্রামতুল্য মফঃস্বলের ছোট সহরে পড়িতাম। সেখানে অনায়াসে আমাদের পাঠ্য যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের "উদ্ভিদ্‌বিচারে" উল্লিখিত উদ্ভিদ্ লতা পাতা ফল ফুল মূল সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে কোন দিন একটাও গাছগাছড়া সংগ্রহ করিতে বা দেখিয়া আসিতে বলেন নাই, নিজে যে কখন আমাদিগকে দেখাইবার জন্য সংগ্রহ করেন নাই, কিম্বা স্কুলে ভৃত্যকে সংগ্রহ করিতে বলেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা বরং শৈশবসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া দু-একটা উদ্ভিদ্ খুঁজিয়া বাহির করিতাম। অন্যান্য বিষয় পড়াইবার সময় যেমন করিতেন, উদ্ভিদ্‌বিচারের ঘণ্টাতেও তেমনি পণ্ডিত মহাশয় চটি-জুতা হইতে পা দুখানি বাহির করিয়া টেবিলের উপর তুলিয়া দিতেন, এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন, "মূল কাহাকে বলে?" আমরা অমনি মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিতাম, "উদ্ভিদের যে অংশটি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, যাহার বলে উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার উপর সোজা থাকে, এবং যদ্দ্বারা মৃত্তিকার রস শরীরস্থ করিয়া

উদ্ভিদ্ জীবিত থাকে, তাহাকে মূল কহে।" তখন পণ্ডিত মহাশয় হয় ত আবার প্রশ্ন করিতেন, "মূলের এই সংজ্ঞায় কি কি দোষ আছে?" তখন আমরা আবার গ্রামোফোনের মত বলিতাম, "মূলের উক্ত প্রকার নির্ব্বাচন করিলে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি লক্ষিত হয়। যথা:— গিরিগুহা বা গৃহাদির উপরিভাগ হইতে লম্বমান উদ্ভিদের মূল অধোধাবিত না হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে। এতদ্ভিন্ন বায়ব্য এবং জলীয় উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকা পর্য্যন্ত নামিতে না পারে (এরূপ সচরাচরই ঘটিয়া থাকে), সুতরাং সে স্থলে উক্ত উদ্ভিদ্ পোষণসামগ্রী মৃত্তিকা হইতে আকর্ষণ করে না।"

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা এইরূপ চমৎকার প্রণালীতে সম্পন্ন হইত। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই চল্লিশ বৎসরে জাপান "সেকেলে" অবস্থা হইতে আধুনিকতম জাতিদের প্রথমশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এমন যে স্থিতিশীল দেশ চীন, তাহাও ঘুম ভাঙ্গিবার পর চোখ্ রগড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘর গুছাইয়া নিজের বিষয়কর্ম্মে মন দিয়াছে। কিন্তু আমাদের বাংলা স্কুলগুলিতে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

বাংলাস্কুলগুলির কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, দেশের অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা বাংলা স্কুল পাঠশালাতেই হয়; কলেজে পড়িবার সুযোগ কয়জনের হয়? অতএব শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে ঐ পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। পাঠশালা ও বাংলা বিদ্যালয়ে খুব অল্প বিজ্ঞান শিখান হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু উহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে। তজ্জন্য সামান্য যাহা জিনিষপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা গবর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে।

ইংরেজী বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিখাইবার ত কোন প্রয়োজনই অনুভূত হয় না; কারণ ম্যাটিকুলেশ্যন বা প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান শিখিতে হয় না। ছাত্রেরা বিজ্ঞানের একটি বর্ণও না জানিয়া এম্-এ, ডি-লিট্, পি এইচ্ ডি, প্রভৃতি কত কি বড় বড় উপাধি পাইতে পারে,—বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার এমনি সুবেন্দাবস্ত! তাহা অপেক্ষা আরও সুবন্দোবস্ত এই যে লাহোর কলিকাতার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে বা অধোতে, কিম্বা পৃথিবী রসগোল্লার মত, বা শিংহাড়ার মত, বা লুচির মত, কিম্বা গজার মত, তাহা না জানিয়াও ছাত্রেরা এম্-এ, এম্-এস্ সি, ইত্যাদি কত কি হইতে পারে; কারণ ভূগোল না জানিয়াও ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, এবং তাহার পর আর ভূগোল জানায় প্রয়োজন হয় না। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ আচার্য্য ওল্ডেন্‌বার্গ বেথুন কলেজ দেখিতে গিয়া যখন শুনিয়াছিলেন যে সেখানে বিজ্ঞান শিখান হয় না, তখন কতক ক্ষণ, যেন অসম্ভব কিছু একটা শুনিলেন এই ভাবে, হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তবু ত উহা কেবল মেয়েদের কলেজ, এবং তাহাতেই তিনি এত বিস্মিত হইয়াছিলেন। যদি পাশ্চাত্য দেশের বিদ্বান্ লোকেরা শুনে যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সকলের অধিকাংশ উপাধিধারী বিজ্ঞানের এক বর্ণও জানে না, তাহা হইলে তাহারা কি মনে করিবে জানি না।

সত্য বটে, সকলে সকল বিষয়ে পণ্ডিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলেও প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের কিছু জ্ঞান সকল শিক্ষিত লোকেরই থাকা কর্ত্তব্য। এইজন্য পাঠশালা, বাঙ্গালা-বিদ্যালয় ও ইংরেজীবিদালয়-সকলে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার

সাহায্যে অল্প অল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত। এরূপ করিলে সর্ব্বপ্রধান সুফল এই হইবে যে আমাদের দেশের লোকেরা "সেকেলে" জাতি না থাকিয়া আধুনিক উন্নতিশীল জাতিদের সমকক্ষ হইবার উপায়স্বরূপ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পাইবে। এই বিশ্বে সর্ব্বত্র নিয়মের রাজত্ব, স্বপ্নের মত অসম্বদ্ধ যা তা কোথাও কিছু ঘটে না, ক্রমশঃ লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়া অনেক কুসংস্কার নির্ম্মূল হইবে। আনুসঙ্গিক সুফল এই হইবে যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী লোককে শিখান অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। আরও অনেক বিষয়ে সুবিধা হইবে। এখন যাহারা এম্-এস্ সি, বি-এস্ সি পাস করে তাহাদের অনেকে আবার আইন পড়িয়া উকীল হয়, বা কেরাণীগিরি করে, বৈজ্ঞানিক কোন রকমের কাজ অল্প লোকেই পায়। কিন্তু সমুদয় এন্ট্রেন্স্ স্কুলে যদি বিজ্ঞান পড়ান হয়, তাহা হইলে অনেক এম্-এস্ সি, বি-এস্ সি, বিজ্ঞানের শিক্ষকতা করিতে পারে। পাঠশালা ও বাংলাবিদ্যালয়ে যদি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার (observation and experiment) সাহায্যে বিজ্ঞান শিখান হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানজানা অনেক এন্ট্রেন্স্-পাস্ ছেলে তথায় শিক্ষকতা করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যদি কতকগুলি কারখানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাতেও ২।৪ জন করিয়া বি-এস্ সি, এম্-এস্ সি কাজ পাইতে পারে; যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল্ এণ্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে কয়েকজন রসায়নশাস্ত্রবিৎ এম্-এ কাজ করিতেছেন।

১৩২২ ভাদ্র

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাযন্ত্রের কারখানা।

চলিত কথায় বলে, কান্ টান্‌লে মাথা আসে। কোন একটা দিকে দেশের উন্নতি করিতে গেলেই দেখা যায় যে আর কোন কোন দিকে উন্নতি না করিলে তাহা সম্ভবপর হয় না। বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য যে-সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার নিমিত্ত নানাবিধ যন্ত্রের (apparatus) প্রয়োজন হয়। বিদেশ হইতে যন্ত্র আনাইতে হইলে অনেক খরচ পড়ে। আমাদের দেশের গরীব পাঠশালা ও বিদ্যালয়-সকলে দামী বিদেশী যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর নয়। যন্ত্রসকল এদেশেই নির্ম্মিত হওয়া উচিত। বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষালয়-সকলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের প্রয়োজন হইলে, একটি কারখানার সম্বৎসরের কাজ বেশ চলিতে পারে। যন্ত্রনির্ম্মাণ করিবার কারিগরের অভাব হইবে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যে-সকল যন্ত্র দেখিয়া ইউরোপ আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা বিস্মিত হইয়াছেন, সেগুলি সমস্তই ভারতবর্ষে দেশী মিস্ত্রীর দ্বারা নির্ম্মিত।

কোন জিনিষের জন্য বিদেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে আর-এক রকমের ব্যাঘাত হয়। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যুদ্ধের পূর্ব্বে

ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষালয়-সকলে জার্মেনী হইতে বিস্তর বৈজ্ঞানীক যন্ত্র আমদানী হইত। ঐ-সকল কল ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয় না। এখন যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া বিলাতের কোন কোন কলেজের পরীক্ষাগারে জার্মেনী হইতে আমদানী বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ভাঙ্গিয়া বা বিগড়িয়া যাওয়ায় ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষাকার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে যতটা সম্ভব নিজের দেশের আবশ্যক সবজিনিষ দেশেই প্রস্তুত করা উচিত। "যতটা সম্ভব" এই জন্য বলিতেছি যে সবজিনিষ সবদেশে প্রস্তুত করা সুসাধ্য নয়। তাহার চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ব্যয়ও অনেক সময় অত্যন্ত বেশী পড়ে।

১৩৩৮ শ্রাবণ

কলিকাতায় বাঙালী পদার্থ-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার সুযোগ

কলিকাতা মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক অধ্যাপক রামনের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের যে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে, অধ্যাপক রামন্ যে পদার্থবিদ্যা-বিষয়ে একটি গবেষক- সম্প্রদায় ("School of Physics") প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বলেন, তৎসম্বন্ধে একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়, যে,

"Prof. Raman's position in the world of science to-day depends on the fact that he has not only himself been an investigator of the first rank, but has also inspired a who'e group of men whose work has firmly established the reputation of Calcutta as a centre of research." "The call to the Calcutta University in July, 1917, freed him from the bondage of official work and enabled him to devote attention to the training of a long succession of students in the laboratories of the University College of Science and of the Indian Association for the Cultivation of Science. An idea of the influence Prof Raman has exerted in building up an Indian School of Physics may be obtained by mentioning some of the physicists who, at one time or another, worked in Calcutta in these two institutions and now occupy independent scientific positions."

তাৎপর্য্য। "আজ বৈজ্ঞানিক জগতে অধ্যাপক রামনের স্থান কেবল ইহার উপরই নির্ভর করে না, যে, তিনি নিজে একজন প্রথম শ্রেণীর গবেষক, কিন্তু ইহার উপরও নির্ভর করে, যে, তিনি এমন এক দল লোককে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন যাঁহাদের কাজ গবেষণার কেন্দ্ররূপে কলিকাতার খ্যাতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।" "১৯১৭ সালে জুলাই মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে আহ্বান [করিয়া] তাঁহাকে সরকারী কাজের

দাসত্ব হইতে মুক্ত করে, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভাব পরীক্ষাগার দুটিতে দীর্ঘ ছাত্রপরম্পরাকে শিক্ষিত করিবার কাজে মনোযোগ দিতে সমর্থ করে। যে-সব পদার্থ- বৈজ্ঞানিক কোন-না-কোন সময়ে এই দুটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক পদে আসীন আছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিলে, অধ্যাপক রামন্ একটি ভারতীয় পদার্থ-বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় গঠনে কিরূপ প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে।"

ইহার পরে, সরকারী আবহবিদ্যা-বিভাগে, সরকারী প্যাটেন্ট আপিসে এবং ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক পদে অধিষ্ঠিত আটত্রিশ জন ভদ্রলোকের নাম আছে। প্রবন্ধটি হইতে উদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যায়, যে, ইঁহারা হয় অধ্যাপক রামনের শিষ্যরূপে কিংবা তাঁহার প্রভাব ও অনুপ্রাণনার বশে কলিকাতার দুটি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ঢাকার অধ্যাপক আইন্সটাইনের একটি মতের সংশোধক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিরও নাম আছে। ইঁহারা অধ্যাপক রামনের শিষ্য ছিলেন কিংবা অন্য প্রকারে তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে।

দেখা যাইতেছে, বাঙালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানতঃ বাঙালীদের অর্থে পরিচালিত বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় অবস্থিত দুটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ৩৮ জন নাম-করা বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছেন। এই ৩৮ জনের মধ্যে ১৫ (পনের) জন বাঙালী, ২৩ (তেইশ) জন বাঙালী নহেন। বাঙালীর সংখ্যা কম হইবার কারণ অনেক প্রকার হইতে পারে। ১ম—বাঙালী বিদ্যার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানে অনুরাগ ও শ্রমশীলতা এত কম, যে, তাঁহারা যত জন নিজেদের প্রদেশে স্থিত কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক কার্য্য করিয়াছেন, দূর প্রদেশ হইতে আগত তাহা অপেক্ষা বেশী জন কলিকাতায় ঐরূপ কাজ করিয়াছেন। ২য়—হয়ত আরও অধিকসংখ্যক বাঙালী বিদ্যার্থী কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা না-থাকায় তাঁহারা নাম করিতে পারেন নাই। ৩য়—হয়ত আরও অধিকসংখ্যক বাঙালী কাজ করিতে পারিতেন ও ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্যদের সমান সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। ৪র্থ—যত বাঙালী এখানে বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত অন্যদের সমকক্ষ হইলেও তালিকায় তাঁহাদের নাম উঠে নাই। (দেখা যাইতেছে, যে লাহোরের দয়ানন্দ এংলো-বেদিক কলেজের শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনলাল দত্ত ছাড়া, পাটনা, কাশী, আগ্রা, পঞ্জাব, নাগপুর, চিদাম্বরম্, বোম্বাই, রেঙ্গুন, এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং সরকারী প্যাটেন্ট আফিসে নিযুক্ত যে-সব বৈজ্ঞানিক কলিকাতার প্রতিষ্ঠান দুটিতে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ১৮, কিন্তু ১৮ জনই অবাঙালী। ইহা হইতে অনুমান হইতে পারে, যে, (সম্ভবতঃ) ৫ম—বঙ্গের বাহিরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের লোকদিগকে কলিকাতার প্রতিষ্ঠান দুটিতে গবেষণা করিবার সুযোগ যেরূপ দেওয়া হয়, বাঙালী বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীরা ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর সুযোগ সেরূপ পান না। কিংবা, ৬ষষ্ঠ—কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম করিবার সুযোগপ্রাপ্ত অবাঙালীরা অন্যত্র কাজের জন্য দরখাস্ত করিলে যেরূপ সুপারিশ পান, কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম করিবার সুযোগপ্রাপ্ত বাঙালীরা অন্যত্র কাজের জন্য দরখাস্ত

করিলে তদ্রূপ সুপারিশ পান না।

এই অনুমানগুলির মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্ কোন্‌টি সত্য, কিংবা একটিও সত্য কিনা, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ। কিন্তু আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে, বাঙালী যুবকেরা অটলপ্রতিজ্ঞ হইলে সকল প্রকারের অসুবিধা ও বাধা অতিক্রম করিয়া কৃতী হইতে এবং বঙ্গের নাম উজ্জ্বল করিতে পারেন।

১৩৩৯ আষাঢ়

বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্র

[সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত]

খবরের কাগজে দেখিলাম, ইংরেজীতে একখানি সাময়িক পত্র বাঙ্গালোর হইতে বাহির হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষে কৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত এবং মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাহির হইবে। এরূপ পত্রিকার প্রয়োজন আছে এবং ইহার প্রকাশ সন্তোষের বিষয়। আমাদের কেবল জানিতে ইচ্ছা হয়, যে, ইহা কেন কলিকাতা হইতে বাহির হইল না। ভারতবর্ষের সব বড় কাজ বাঙালীরাই করিবে, আর কেহ কিছু করিবে না, আমাদের বক্তব্য ইহা নহে। আমাদের জিজ্ঞাসুতার কারণ অন্যরূপ। ভারতবর্ষে ভারতীয়দের দ্বারা উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাঙালীরাই প্রথমে করেন। অবাঙালী খুব বিখ্যাত গবেষক স্যর চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্‌ও তাঁহার সব গবেষণা কলিকাতায় করিয়াছেন। এই জন্য এরূপ কাগজের আবির্ভাব বঙ্গেই হওয়া উচিত ছিল। বঙ্গদেশে যে-সব বৈজ্ঞানিক কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগিতা ও একতা এবং উদ্যোগিতা না থাকাতেই কি যাহা কলিকাতায় হওয়া উচিত ছিল, তাহা বাঙ্গালোরে হইল?

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা "প্রকৃতি" নাম দিয়া যে বৈজ্ঞানিক ঋতুপত্রখানি বাহির করেন, তাহা বাংলায় লিখিত বলিয়া সমগ্র ভারতের কাজে লাগে না। তিনি কিংবা অন্য কেহ ইংরেজীতেও ঐরূপ একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বাহির করিলে ভাল হয়। কিন্তু বাংলাটিও থাকা চাই। তবে, দুঃখের বিষয় বেশী লোকে ইহার খবর রাখেন না ও পড়েন না। ইহার অনেক গ্রাহক ও পাঠক হওয়া উচিত। কবিতা উপন্যাস প্রভৃতি ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করে বটে, কিন্তু কেবল উহার দ্বারাই কোন ভাষা ও সাহিত্য সম্যক সমৃদ্ধ হইতে পারে না, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতি নানাপ্রকারের সাহিত্যও আবশ্যক।

১৩৪৬ মাঘ

শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদের অতি সামান্য বিজ্ঞানচর্চা

বাঙালী মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চান ও করেন, তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রীই বিজ্ঞানের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারদিগের ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি এমন হয় যে, ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান শিখিবার সুযোগ যথেষ্ট নাই, তাহা হইলে সুযোগ বাড়াইয়া দিতে হইবে।

বঙ্গে মহিলাদের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার অযথেষ্টতার একটি নির্দর্শনের উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে পঠিত ও আলোচিত হইবার নিমিত্ত গবেষণামূলক যত প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ১৫ (পনের) টি মহিলাদের রচিত। তাঁহারা কেহ বা একাই গবেষণা করিয়া তন্মূলক প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কেহ বা অন্যের সহযোগিতায় লিখিয়াছেন। এই পনেরটি প্রবন্ধের একটিও কোন বাঙালী মহিলার লেখা নহে।

উচ্চ শিক্ষিতা বাঙালী মহিলাদের মধ্যে খুব অল্প মহিলাই যে বিজ্ঞান শিখেন এবং যে সামান্য কয় জন শিখেন তাঁহারাও যে প্রায়ই বিজ্ঞানের চর্চা রাখেন না, সুযোগের অভাব ছাড়া হয়ত রুচি ও প্রবৃত্তির অভাবও তাহার কারণ। এই অরুচি ও অপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকার কথা মনে পড়ে। কাব্য উপন্যাস গল্প রবীন্দ্রনাথ অনাবশ্যক বা মূল্যহীন বা অল্পমূল্য মনে করেন না। কিন্তু কোন সাহিত্যে তাহারই প্রাচুর্য্য ও আধিক্য থাকিলে তাহার পাঠক লোকসমষ্টির বিজ্ঞান শিক্ষায় ও বিজ্ঞান অনুশীলনে অপ্রবৃত্তির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। এই অরুচি ও অপ্রবৃত্তি বঙ্গীয় মহিলাদিগকে হয়ত বেশী পাইয়া বসিয়াছে, কারণ বাংলা উপন্যাসাদি পাঠ তাঁহারা খুবই করিয়া থাকেন।

আরও দু-একটা কারণে হয়ত বঙ্গের "উচ্চশিক্ষিত" এবং রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত "অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মনে মননশক্তির দুর্বলতা এবং চরিত্রের শৈথিল্য ঘটবার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠছে।" চিত্রাঙ্কণাদি ললিতকলাসমূহের অনুশীলনের, অভিনয় করিবার এবং দেখিবার ও শুনিবার, এবং চলচ্চিত্র দর্শনের নির্বিচারে সর্বব্যাপক নিন্দা কোন বিবেচক ব্যক্তি করিতে পারেন না। গীতবাদ্য নৃত্য চিত্রাঙ্কণ অভিনয় চলচ্চিত্র প্রভৃতি মাত্রই অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর নহে। প্রত্যেকেরই কোন কোনটির উপযোগিতা আছে। কিন্তু কোনটিরই অবিচারিত প্রাদুর্ভাব বাঞ্ছনীয় নহে। সেরূপ প্রাদুর্ভাব হইলে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় কবিতা ও গল্প ছড়াইয়া পড়ায় যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, গীতবাদ্যনৃত্যাদির প্রাদুর্ভাবেও সেই কুফলের আশঙ্কা আছে।